ক্ষমা কর, হে প্রভু
রূপক সাহা

ক্ষমা করো, হে প্রভু

ক্ষমা করো, হে প্রভু

রূপক সাহা

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কবি সমরেন্দ্র দাসকে

ভূ মি কা

এই উপন্যাস হয়তো আমার লেখা হত না, যদি না ঋতুপর্ণ ঘোষ উৎসাহ দিতেন। বছর আটেক আগের কথা। সেই সময় আমি কলকাতার বহুল প্রচারিত এক সেলেব্রিটি পত্রিকার সহ সম্পাদক। ঋতুপর্ণ তখন ওই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেবার পুজো সংখ্যায় আমার 'মোক্ষ' উপন্যাসটি পড়ার পর ঋতুপর্ণ কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এর পর তুমি কী লিখছ?'

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান নিয়ে একটা প্লট মাথায় ঘুরছিল। তার জন্য বছর তিনেক রিসার্চও করেছিলাম। ওই বিষয় নিয়ে লেখার ইচ্ছে হয়েছিল 'লাস্ট সেভেন ডে'জ অফ হিটলার' বইটা পড়ার পর। ওঁরা যদি হিটলারের জীবনের শেষ সাতদিনের ঘটনাবলি নিয়ে উপন্যাস লিখতে পারেন, তা হলে আমরাও কেন মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কয়েকদিনের ঘটনাবলি নিয়ে লিখতে পারব না। আমি তো আর ইতিহাস লিখছি না। সেই কারণে কারও কাছে জবাবদিহি করার দায় আমার নেই। কীভাবে উপন্যাসটি লিখব, তা নিয়ে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেই কথা বলতেই ঋতুপর্ণ খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন।

লেখাটা শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সাংবাদিকতার পেশা থেকে সাময়িকভাবে অবসর নেওয়ার পর ফের তাগিদ অনুভব করলাম, নাহ্ এ বার শেষ করতে হবে। গোটা দশেক চ্যাপটার লিখে ফেলার পর হঠাৎ একদিন ঋতুপর্ণের ফোন পেলাম, 'চৈতন্যদেবকে নিয়ে তোমার লেখাটা কি শুরু করেছ?'

মাঝে পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে। তবুও লেখাটার কথা ঋতুপর্ণের মনে আছে দেখে সেদিন আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তখন উনি 'প্রতিদিন' সংবাদপত্রের রবিবারের ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক। ওঁকে বললাম, 'হ্যাঁ, শুরু করেছি।'

ঋতুপর্ণ বললেন, 'তুমি কি একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবে? তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করার আছে।'

দু'একদিন বাদে টালিগঞ্জের ইন্দ্রাণী পার্কে ঋতুপর্ণের বাড়িতে গেলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপন্যাসের প্লট জেনে নেওয়ার পর ঋতুপর্ণ বললেন, 'তোমার এই উপন্যাস আমি ছাপতে চাই। রবিবার ম্যাগাজিনে ধারাবাহিক হিসেবে। বছরখানেক টানতে হবে। যতটুকু লেখা হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।'

দু'হাজার দশ সালের জানুয়ারি মাস থেকে উপন্যাস বেরুতে শুরু করল 'রবিবার' ম্যাগাজিনে। নাম দিলাম 'ক্ষমা করো হে প্রভু'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, মহাপ্রভুর

অন্তর্ধানের পিছনে গভীর রহস্য ছিল। নানা কারণে তাঁর প্রচুর শত্রু একটা সময় হাত মিলিয়েছিলেন। তাঁকে গুমখুন করা হয়েছিল।যাঁরা এই দুষ্কর্মটি করেন, তাঁদের উদ্দেশেই আমার উপন্যাসের নামকরণ। অমৃতলোক থেকে মহাপ্রভু যেন তাঁদের ক্ষমা করেন। সেইসঙ্গে আমাকেও। যদি অনিচ্ছাকৃত কারণে তথ্য ও যুক্তির কোনও ফাঁক থেকে যায়, তা হলে। সেই সময় খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। পাঠকরা কীভাবে নেবেন, সে সম্পর্কে কোনও আন্দাজই ছিল না। কিন্তু কয়েকটা সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই টের পেতে শুরু করলাম, পাঠকদের ভালো লাগছে। প্রচুর সংখ্যক পাঠক পড়ছেন। আমার কাছে খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন, পরবর্তী সংখ্যায় কী থাকবে। পাঁচশো বছর আগেকার এক মহাপুরুষের চরিত্রকে ঘিরে উপন্যাস। তাঁর সম্পর্কে মানুষের এখনও কী অসীম কৌতূহল! লিখতে লিখতে হঠাৎ একটা সময় মনে হল, ঋতুপর্ণ আমাকে যে সময়সীমা দিয়েছেন, তার মধ্যে উপন্যাস শেষ করা সম্ভব হবে না। আসলে চরিত্রগুলোর উপর তখন আমার আর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ধারাবাহিক লেখার সময় পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ থাকে। এর আগে অপর্ণা সেন সম্পাদিত এক পত্রিকায় 'বিষপাথর' উপন্যাসটি ধারাবাহিক লেখার সময়ই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। মাঝে মাঝে নিজেও জানতে চাইতাম, রবিবার দফতরের সাংবাদিকদের কাছ থেকে। প্রচুর পাঠক ফোনও করতেন। ভুলত্রুটি দেখলে ধরিয়ে দিতেন। সবথেকে বেশি আনন্দ হয়েছিল, এক রবিবার পাতাল রেল করে যাওয়ার সময়, মেট্রোর কামরায় এক বয়স্কা মহিলার আশীর্বাদ পেয়ে। উলটোদিকের সিট থেকে উঠে এসে উনি আমাকে বলেছিলেন, 'লেখাটা চালিয়ে যেয়ো বাবা। তোমার কাছ থেকে অনেক ভালো লেখা আশা করি।' অনেকে আবার আশঙ্কাও করতেন আমাকে নিয়ে। কেননা, চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন, তাঁদের প্রাণসংশয় হয়েছে।

আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ল, একবছরের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যখন রবিবার পত্রিকার অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় আরও লিখে যেতে বললেন। আসলে পাঠকদের মনোগত ইচ্ছা ওঁরাই প্রথমে বুঝতে পারেন। প্রায় দু'বছর লেগে গেল, উপন্যাসের শেষ অংশে পৌঁছতে। তারপরও মনে হল, আরও কয়েক সংখ্যা লিখলে হয়তো ভালো হত। ধারাবাহিক লেখার সময় কলেজ স্ট্রিটের অনেক প্রকাশক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁরা বইটা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু দীপ প্রকাশনের শংকর মণ্ডল যখন চাইলেন, তখন না করতে পারিনি। কেমন হল, তা বিচারের ভার, এখন পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

গলফ গ্রিন, কলকাতা
২০১৩ বইমেলা

রূপক সাহা

সদর স্ট্রিটের মুখে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল জয়দেব। যাক, ঠিক টাইমেই তাহলে মিউজিয়ামে পৌঁছতে পারল। সুশোভনদা বলেছিলেন, বেলা ঠিক তিনটের সময় সদর স্ট্রিটে, মিউজিয়ামের পিছনের গেটে এসে উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। পারমিশন নিয়ে রেখেছেন, ওকে ভেতরে নিয়ে যাবেন। জয়দেব জানে, এক মিনিট দেরি হলেও সুশোভনদা মারাত্মক চটবেন। নিজে খুব পাংচুয়াল, তাই কারও জন্য কোথাও অপেক্ষা করা উনি পছন্দ করেন না। হাতঘড়িতে নজর দিয়ে জয়দেব দেখল, তিনটে বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই, কাঁধের ব্যাগটা সামলে নিয়ে ও পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল।

এই সময়টায় সদর স্ট্রিটে লোকজন খুব বেশি দেখা যায় না। তবে কিছু বিদেশি মুখ চোখে পড়ে। এই অঞ্চলটায় বেশকিছু ছোটো হোটেল আছে। অল্প খরচে থাকা যায় বলে, বিদেশিরা এইসব হোটেলে এসে ওঠে। তাদের পিছনে ঘুরঘুর করে দালালরা। পুঁতির মালা, সেন্ট, রুপোর গয়না...এইরকম আরও অনেক জিনিস তিনগুণ দামে গছানোর চেষ্টা করে। সন্ধে নামলেই মাদক, এমনকী, যুবতী মেয়ের সন্ধানও দেয়। দালালরা কীভাবে এই বিদেশিদের উত্যক্ত করে, রাতে মিউজিয়ামের গ্যালারি কীভাবে নিশিবাসর করে তোলে, তা নিয়ে একটা ফিচার লিখেছিল জয়দেব। ওর সেই লেখা নিয়ে তখন খুব হইচই হয়েছিল। সদর স্ট্রিট দিয়ে হাঁটার সময় সে কথা ওর মনে পড়ল।

ঠিক তিনটে বাজার এক মিনিট আগে জয়দেব গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক উলটোদিকে আর্মেনিয়ানদের ছোটো একটা গির্জা, বাচ্চাদের স্কুল। গেটের দু'ধারে লোহার দুটো বিরাট কামান দেখে জয়দেব নিশ্চিন্ত হল, নাহ্, ঠিক জায়গায় এসেই ও দাঁড়িয়েছে। সুশোভনদা এখনও আসেননি। কলেজ স্ট্রিটে ওর বইয়ের দোকান থেকে জয়দেব রওনা হয়েছে প্রায় দেড়টার সময়। প্রথমে ট্যাক্সি পাচ্ছিল না। পনেরো বছরের পুরনো গাড়ি সরকার বাতিল করে দেওয়ার পর থেকে রাস্তায় ট্যাক্সির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পর্যন্ত হেঁটে এসে, যাও বা একটা খালি ট্যাক্সি পেল, ড্রাইভার বলল, কুড়ি টাকা বেশি দিতে হবে। আবদার শুনে মাথায় তড়াক করে রাগ উঠে গেছিল। কিন্তু সুশোভনদার কথা ভেবে জয়দেব তখনকার মতো রাগ সামলে নিয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটের একটা ছোট্ট প্রকাশনা সংস্থার মালিক জয়দেব। বছর দুয়েক ধরে ও একটা মাসিক পত্রিকাও বের করছে। পত্রিকাটার নাম দিনকাল। ওর পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখেন সুশোভনদা। আর্ট ও কালচার নিয়ে। শিল্প সমালোচক হিসাবে খুব নাম আছে সুশোভনদার। কলকাতার মিউজিয়াম নিয়ে একটা এক্সক্লুসিভ লেখা উনি দেবেন বলেছিলেন কয়েকদিন আগে। আগামী সংখ্যাটা বেরনোর সময় চলে এসেছে। অথচ লেখাটা জয়দেব পায়নি। প্রেস থেকে তাগাদা আসছে। বাধ্য হয়েই আজ সকালবেলায় সুশোভনদাকে ফোন করেছিল ও। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর সুশোভনদা ফোন ধরে খুব খুশি খুশি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ম্যাগাজিনের সারকুলেশন কত জয়দেব?'

'খুব বেশি নয় সুশোভনদা। কেন বলুন তো?'

'এবার এমন একটা লেখা তোমায় দেব, ম্যাগাজিন দ্বিগুণ ছাপতে হবে। একেবারে হইচই পড়ে যাবে।'

'লেখাটা কী নিয়ে, বলবেন?'

'ফোনে বলা যাবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছ, তা নিয়ে। জানো, দিনকয়েক হল, আমার মনে হচ্ছে, আমার ফোনটা কেউ ট্যাপ করছে। সাবধানের মার নেই। তুমি কি আজ বেলা তিনটের সময় একবার মিউজিয়ামে আসতে পারবে? সামনের গেটে নয় কিন্তু। তোমাকে এমন একটা জিনিস দেখাব, দেখে তুমি চমকে যাবে ভাই।'

ফোন ট্যাপিংয়ের কথা শুনে, প্রসঙ্গটা আর টানতে চায়নি তখন জয়দেব। বলেছিল, 'মিউজিয়ামের ওপর লেখাটা তাহলে আর এ সংখ্যায় দিচ্ছেন না। ঠিক আছে, আপনার এই এক্সক্লুসিভ লেখাটা কবে পাব সুশোভনদা, আইডিয়া দেবেন?'

'আজই দিয়ে দেব। সেই সঙ্গে একটা পেন্টিংয়ের কপি। ছবির সঙ্গে লেখাটা ছাপলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন না। জানি না, আমি ঠিক করছি কি না। হয়তো প্রচণ্ড একটা ঝুঁকিই নিচ্ছি। কিন্তু তুমি তো জানোই, কাউকে আমি ভয় পাই না। আমি শুধু ভাবছি, তোমার কথা। লেখাটা ছেপে তুমি না আবার প্রবলেমে পড়। তুমি এসো, আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা সেরে নিই। তারপর....লেখাটা তুমি ছাপবে কি না, সেই ডিসিশন নিয়ো।'

জয়দেব বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি যাব।'

কিন্তু সুশোভনদার পাত্তাই নেই। মিউজিয়ামের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল জয়দেব। টানতে টানতে সেটা শেষ হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রায় সোয়া তিনটে বাজে। নাহ্, এত দেরি করার মানুষ তো সুশোভনদা নন। পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে ও সুশোভনদাকে ধরার চেষ্টা করল। রিং হয়েই যাচ্ছে। বারবার বলছে, নট রিচেবল। কী হল মানুষটার? গেলেন কোথায়? কী এমন লেখা উনি দিতে চান, যা নিয়ে প্রবলেমে পড়তে পারেন? গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জয়দেব বিভ্রান্ত। আজ পর্যন্ত কোনওদিন এমন হয়নি। লেখা দেবেন বলেছেন, অথচ সুশোভনদা লেখা নিয়ে হাজির হননি।

প্রায় কুড়িটার মতো ওঁর প্রবন্ধ, দিনকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব প্রবন্ধ নিয়ে ভালো-মন্দ অনেক চিঠিও পেয়েছে জয়দেব। সুশোভনদার লেখার এমনই জোর যে, ওঁর সামান্য প্রশংসা অনেক অনামী শিল্পীর ভাগ্য বদলে দেয়। জয়দেব তার সাক্ষী। নামী শিল্পীরাও সমীহ করে চলেন সুশোভনদাকে। দিন কুড়ি আগে, জয়দেব প্রস্তাব দিয়েছিল, 'দিনকাল-এ আপনার যেসব লেখা বেরিয়েছে, সেগুলো নিয়ে যদি একটা বই বের করি, তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো সুশোভনদা? আমি কিন্তু আপনাকে খুব বেশি টাকা দিতে পারব না।'

শুনে খুশি হয়েছিলেন সুশোভনদা, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয়, পাবলিশ কোরো।'

বইমেলায় সেই বই বেরনোর কথা। পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে জয়দেব। কাঁধের ঝোলায় রয়েছে। এক ঢিলে ও দুই পাখি মারবে। সুশোভনদাকে প্রুফ দেখে দিতে বলবে। সেই সঙ্গে যাতে বইয়ের নামটা উনি ঠিক করে দেন, সেই অনুরোধ করবে। কিন্তু কোথায় গেলেন মানুষটা? একবার ভেতরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা ভাবল জয়দেব। কিন্তু সিকিউরিটি লোক গেটে পাহারা দিচ্ছে। অনুমতি ছাড়া এদিক দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেবে না।

কিছুদিন আগে মিউজিয়াম থেকে প্রাচীন একটা বুদ্ধমূর্তি চুরি হয়ে গেছে। কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল। তারপর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। মাঝে একদিন কথায় কথায় সুশোভনদা বলে ফেলেছিলেন, 'কর্তাদের অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙল, বুঝলে? অ্যাদ্দিন ধরে যা চুরি হয়ে গেছে, তার মূল্য কোটি কোটি টাকা।' কথাগুলো বলেই সেদিন উনি নিজেকে সামলে নেন। জয়দেব ওর পত্রিকায় এ নিয়ে আর্টিকেল লিখতে বলেছিল। কিন্তু সুশোভনদা রাজি হননি।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে প্রায় চারটে বেজে গেল। জয়দেব বুঝে উঠতে পারল না, আর অপেক্ষা করা উচিত হবে কি না। একবার ভাবল, সুশোভনদার বাড়িতে ফোন করে খবর নেবে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন কি না, কে জানে? কিন্তু শরীর খারাপ হয়ে থাকলে, সুশোভনদা ফোন করে অবশ্যই তা জানিয়ে দিতেন। উনি আগে থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৈতৃক বাড়িতে। এখন থাকেন সল্টলেকে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বাড়িটা উনি তৈরি করেছিলেন, নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করবেন বলে। স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। একমাত্র ছেলে চাকরি করে আমেরিকায়। সুশোভনদা এখন একেবারে ঝাড়া হাত-পা। সল্টলেকের বাড়িতে উনি একাই থাকেন। ওখানে ফোন করে লাভ নেই।

'আরে জয়দেবদা, আপনি এখানে?'

পাশ ফিরে জয়দেব দেখল, কণিষ্ক হাজরা। ম্যুরাল-এর কাজে ইদানীং খুব নাম করেছে। সুশোভনদা এই ছেলেটাকে নিয়ে ওর পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলেন মাসছয়েক আগে। তখনই কণিষ্কের সঙ্গে আলাপ জয়দেবের। ও বলল, 'সুশোভনদা আসবেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এ দিকে?'

কণিষ্ক বলল, 'আমি এসেছিলাম আর্ট কলেজে। যাব ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক হোটেলে।

বাংলাদেশের এক নামকরা আর্টিস্ট কলকাতায় এসেছেন। কবিরুল ইসলাম, থাকেন প্যারিসে। উনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। ভালোই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাল ফোনে সুশোভনদার কথা কবিরুল জানতে চাইছিলেন। নেট-এ ওঁর লেখা পড়ে ভীষণ ইম্প্রেসড। সুশোভনদা কি এখন আসবেন?'

জয়দেব বলল, 'আসার কথা তো ঘণ্টাখানেক আগে। কী হল, কে জানে?'

কণিষ্ক বলল, 'বোধহয় কোথাও ফেঁসে গেছেন। ধর্মতলায় রোশনি বার-এ গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। এই সময়টায় মাঝে মাঝে সুশোভনদা যান ওখানে। দেখা হলে কবিরুলের কথা সুশোভনদাকে বলবেন। আজ আমার একটু তাড়া আছে। চলি জয়দেবদা। পরে দেখা হবে।'

পা চালিয়ে চলে গেল কণিষ্ক। আর দাঁড়িয়ে থাকার উৎসাহ পেল না জয়দেব। হাঁটতে হাঁটতে ফের ও জওহরলাল নেহরু রোডের ক্রসিংয়ে এল। কলেজ স্ট্রিটেই ফিরে যাবে। সুশোভনদার লেখাটা পাওয়া গেল না। কিন্তু পত্রিকার ইস্যু তো আর থেমে থাকবে না। পাতা ভরাট করতেই হবে। নতুনদের লেখা প্রচুর গল্প দফতরে পড়ে থাকে। আজই তার মধ্যে থেকে একটা বেছে, প্রেসে পাঠিয়ে দিতে হবে। আনমনা হয়েই ও জওহরলাল নেহরু রোড ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। ফুটপাতে হকারদের ভিড়। রাস্তা দিয়ে বাস, মিনি বাস আর ট্র্যাকে করে লোক যাচ্ছে স্লোগান দিতে দিতে। তা দেখে, জয়দেবের মনে পড়ল, কার্জন পার্কে কোনো একটা পার্টির যেন মিটিং ছিল। মিটিং বোধহয় ভেঙে গেছে। লোকজন তাই ফিরে যাচ্ছে। অফিসও ছুটি হতে শুরু করেছে। এই সময়টায় ট্যাক্সির আশা করে লাভ নেই। তার চেয়ে পাতাল রেলে করে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত চলে যাওয়া ভালো। তারপর না হয়, একটা রিকশা অথবা ট্রামে করে ও সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে গ্র্যান্ড হোটেল পেরিয়ে জয়দেব দেখল, সামনেই এসপ্ল্যানেড স্টেশন। দেখে, জয়দেব পাতাল রেলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

আর তখনই সামনে থেকে কে যেন ওকে ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে রেলিংটা ধরে না ফেললে, জয়দেব সিঁড়ির কয়েক ধাপ গড়িয়ে পড়ত। নিজেকে সামলে ও দেখল, ধাক্কায় কাঁধের ব্যাগটা নিচে পড়ে গেছে। সিঁড়ির ওপর পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা ছড়িয়ে। তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠতে গিয়ে যে ওকে ধাক্কা মেরেছে, সে বাইশ-তেইশ বছর বয়সি একটা ছেলে। লজ্জিত মুখে সে সিঁড়ি দিয়ে ফের নিচের দিকে নেমে আসছে। তারপর উবু হয়ে পাণ্ডুলিপির পাতা জড়ো করে, ছেলেটা বলল, 'মাফ করবেন। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

এই বয়সি ছেলেরা সাধারণত উদ্ধত হয়। মাফ চাওয়ার ধারটার ধারে না। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেবের বিরক্তি উবে গেল। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। খুব ফরসা। মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। কাঁধের ওপর নেমে এসেছে লম্বা চুল। পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি, আর নীল জিনসের ট্রাউজার্স। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, ছেলেটার পিছনে সাদা আলোর একটা বলয় দেখা যাচ্ছে। ওকে হাতজোড় করে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়দেব বলল, 'না, না। ঠিক আছে। মাফ চাওয়ার কিছু নেই। ভিড়ের মাঝে....হতেই পারে।' শুনে ছেলেটা যেন নিশ্চিন্ত হল।

প্ল্যাটফর্মে গিয়ে জয়দেব কিন্তু ছেলেটার কথা ভুলে গেল। ওর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল সুশোভনদাকে ঘিরে। এম এ পড়ার সময় থেকেই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সুশোভনদার লেখার সঙ্গে ও পরিচিত ছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ হয় এক টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে গিয়ে। গত দেড় বছরে সুশোভনদার সঙ্গে আলাদা একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জয়দেবের। বোহেমিয়ান টাইপের মানুষ। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যান। তারপর দিন পনেরো কুড়ি বাদে ফিরে, ফোন করে বলেন, 'একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট আছে। তুমি ছাপবে?'

না করার কোনও কারণ নেই। জয়দেব যত্ন করে সেই সব লেখা ছেপেছে। বার দু'তিনেক উনি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে ওর বইয়ের দোকানেও এসেছেন। তখন গল্প করতেন, 'দেখবে, কলকাতায় আর্ট গ্যালারির সংখ্যা অনেক বাড়াবে। তখন সুবিধে হবে আর্টিস্টদের। এখন যেসব আর্টিস্ট খেতে পায় না, তারা তখন দু'হাতে টাকা কামাবে। কেন জানো? আর্ট ওয়ার্ক কালেকশনের হ্যাবিট ক্রমশ লোকের মধ্যে বাড়ছে। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করবে পেন্টিংয়ে। যে টাকায় কিনবে, তার দ্বিগুণ দামে বিক্রি করবে বিদেশে।' সুশোভনদার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

পাতাল রেলের ট্রেনে ওঠার পর, জয়দেবের হঠাৎই মনে হল, আরে...সুশোভনদা কোনও বিপদের মধ্যে পড়েননি তো? ইদানীং উনি সপ্তাহে তিনদিন করে মিউজিয়ামে যাচ্ছেন। সেই বুদ্ধমূর্তিটা চুরি যাওয়ার পর থেকে, কর্তাদের হঠাৎ টনক নড়েছে। মিউজিয়ামের স্টোর রুমে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও মূল্যবান ঐতিহাসিক সামগ্রী অনাদরে এদিক-ওদিক পড়ে আছে। সেগুলোর গুছিয়ে দেওয়ার জন্য তো বটেই, দাম ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণের জন্যও, পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ একটা কমিটি গড়েছেন। সেই ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন কমিটিতে আছেন সুশোভনদা। মিউজিয়ামের চারতলায় বসে ওঁরা পাঁচজন এখন, যে যাঁর বিষয়ে ক্যাটালগ তৈরি করছেন।

হয়তো সুশোভনদা ওই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসের মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন, যা চাঞ্চল্যকর। হয়তো, সেটা নিয়ে উনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিউজিয়াম ঘিরে থাকা দুষ্ট চক্র টের পেয়ে গেছে। সেই চক্র হয়তো চায় না, লেখাটা বেরুক। তারা সুশোভনদার ক্ষতি করে দিতে পারে। সুশোভনদা কি এই চক্রের কথাই সকালে বলছিলেন? না হলে কেন উনি বললেন, কেউ ওঁর ফোনটা ট্যাপ করছে? কেন উনি বললেন, ঝুঁকি নিয়েই লেখাটা দিতে চান? কাউকে উনি ভয় পান না। সকালে ওঁর সঙ্গে ফোনে যেসব কথা হয়েছিল, তা মন দিয়ে ভাবতে লাগল জয়দেব।

সুশোভনদা বলেছিলেন, 'তুমি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছ, সেই বিষয় নিয়েই আমি লিখতে চাই।' তার মানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে। এম এ পাশ করার পর থেকে এই বিষয়টা নিয়েই তো জয়দেব ডুবে আছে। গবেষণা করছে গোপনে। খুব

অল্প মানুষই জানেন সে কথা। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে কলকাতার জাদুঘর থেকে সুশোভনদা কী এমন আবিষ্কার করলেন, যা নিয়ে হইচই পড়ে যাবে? মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য জটিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই রহস্য যাঁরা উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের অনেকেরই জীবনসংশয় হয়েছে। সেই কারণেই জয়দেবের এত গোপনীয়তা, সাবধানতা। গত চার বছরে অন্তত বারদশেক ও পুরীতে গিয়েছে। চেষ্টা করছে, সত্য উদ্‌ঘাটনের। একবার মারাত্মক বিপদেও পড়েছিল, ভুবনেশ্বরে খোঁজখবর করতে গিয়ে। খুব ভালোভাবেই তখন ও টের পেয়েছিল, মহাপ্রভু পাঁচশো বছর আগে অপ্রকট হয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও একটা চক্র সক্রিয়। তারা পছন্দ করে না, বিষয়টা নিয়ে কেউ আর আগ্রহ দেখাক।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই জয়দেব মহাত্মা গান্ধী স্টেশনে পৌঁছে গেল। পাতাল রেল থেকে ওপরে উঠে, হাঁটতে হাঁটতে ও যখন ট্রাম লাইনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। পকেট থেকে সেটটা বের করে, সুইচ অন করতেই ও দেখল, সুশোভনদার নাম। উত্তেজনায় জয়দেব বলে উঠল, 'আরে, কী হল সুশোভনদা, আপনি কোথায়?'

দুই

কার্জন পার্কে দলিত পার্টির মিটিং ছিল। বেলা আড়াইটায় কালীঘাট স্টেশন থেকে পাতাল রেলে চড়ার সময়ও গোরা ভাবতে পারেনি, এসপ্ল্যানেড পৌঁছতে ওর সোয়া চারটে বেজে যাবে। মাত্র ছয়টা তো স্টেশন। বারো মিনিটের বেশি লাগা উচিত ছিল না। কিন্তু ময়দান স্টেশন থেকে ছাড়ার পর, খানিকটা এগিয়েই ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে কে একজন নাকি আত্মহত্যা করেছে। তাই গাড়ি আর এগোবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক কামরায় বসে থেকে গোরা মারাত্মক বিরক্ত। মিটিংয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা দলিত পার্টির নেতা কেশব রামের। উত্তর ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে, ইদানীং উনি খুব নাম করেছেন। এই প্রথম উনি কলকাতায় এলেন। ওঁর বক্তৃতা শোনার খুব ইচ্ছে ছিল গোরার। কিন্তু সব গুবলেট হয়ে গেল ট্রেন বিভ্রাটে।

এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নেমেই গোরা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। হঠাৎ ওর সঙ্গে ভদ্রলোকের ধাক্কা লেগে গেল। আচমকা ধাক্কা লাগায় ভদ্রলোকের কাঁধ থেকে ব্যাগ ছিটকে পড়েছে। গোরা ভেবেছিল, মাফ চাওয়ার পরও, ভদ্রলোক বোধহয় কটু কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু উনি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উলটে বললেন, 'এরকম তো হতেই পারে।' সত্যি, জগতে এরকম ভালো মানুষও তাহলে আছেন। অন্য কেউ হলে, যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিত।

রাস্তায় বেরিয়ে, ঘরমুখো বাস-মিনিবাস থেকে দলিত কর্মীদের স্লোগান শুনে গোরা বুঝতে পেরে গেল, মিটিং সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে। দূর থেকে আসা মানুষজন বাড়ি

ফিরে যাচ্ছেন। দেখে ও একটু হতাশই বোধ করল। ইস, বাড়ি থেকে বেলা বারোটার সময় বেরিয়ে এলেই ভালো হত। কাল রাতে পার্টির নেতা অদ্বৈত চ্যাটার্জি বলে দিয়েছিলেন, 'কার্জন পার্কের সমাবেশে প্রচুর লোক হবে। তুমি কিন্তু বেলা একটার মধ্যেই মঞ্চের কাছে পৌঁছে যেয়ো। দেখি, কেশব রামের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি কি না। দেখবে, ওঁর সঙ্গে কথা বলে, তোমার ভালো লাগবে।' কিন্তু সেটা আর আজ সম্ভব হল না। অদ্বৈতবাবু কী ভাবলেন কে জানে? নিজেকে ও সান্ত্বনা দিতে লাগল। এই যে এত কাছে আসা সত্ত্বেও কেশবজির সঙ্গে ওর দেখা হল না, এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে। ঈশ্বর চান না, এখানে ওর সঙ্গে কেশব রামের যোগাযোগ হোক। হয়তো তাঁর মনে অন্য কোনও ইচ্ছে আছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা যখনই ও ভাবে, তখন আর কোনও আফসোস হয় না গোরার। অদ্বৈতবাবুর মুখেই কাল রাতে ও শুনেছে, আগামী মাসে ভুবনেশ্বরে, দলিত পার্টির একটা কর্মী সমাবেশ আছে। ওখানে কেশবজি দু'তিনদিন থাকবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোরা ভাবল, ভুবনেশ্বরে কেশবজির সঙ্গে ওর দেখা হবেই। কেননা, সমাবেশ সংগঠনের দায়িত্বও হয়তো ওর ঘাড়েই এসে পড়বে। পার্টির নেতারা জানেন, ভুবনেশ্বর ওর নিজের জায়গা। জন্ম জাজপুরে হলেও, গোরা বড়ো হয়েছে ভুবনেশ্বরে। মাত্র পাঁচ বছর হল, ও কলকাতায় এসেছে পড়াশুনো করতে। ভুবনেশ্বরে দলিত পার্টির সংগঠনে ও জড়িয়ে পড়েছিল চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই। ছুটিছাটায় সময় পেলে, প্রায়ই ও ছুটে যায় ভুবনেশ্বরে।

গোরা এখন পাতাল রেলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ইলেকট্রনিক ঘড়িতে ও দেখল, পৌনে পাঁচটা বাজে। সন্ধে ছ'টার আগে রাসবিহারীতে ফেরার কোনও তাগিদ নেই। কী মনে হওয়ায়, ও কার্জন পার্কের দিকে হাঁটতে লাগল। ফুটপাত দিয়ে হাঁটার উপায় নেই। মেট্রো সিনেমার ভিড়, হকার, ক্রেতা মিলিয়ে যেন হট্টমেলা। তুলনায় রাস্তার উলটো দিকের ফুটপাতে লোকজন কম। টাইলস বসানো। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। ইদানীং ওখানে একটা পার্ক হয়েছে। গাছ-গাছালি দিয়ে চমৎকার করে সাজানো। কলেজের দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে ওই পার্কে গোরা বারতিনেক এসেছে। নির্বিঘ্নে হাঁটার জন্য রাস্তা পেরিয়ে ও উলটো দিকের ফুটপাতে চলে গেল।

কিন্তু কয়েক পা হাঁটার পরই, সেই পুরনো উৎপাত। সামনে জটাধারী এক সাধু। হাতজোড় করে ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে লাল কৌপীন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, হাতে ত্রিশূল। ফুটপাতের গাছতলায় বসেছিলেন বোধহয়। ওকে দেখে উঠে এসেছেন। সাধুকে দেখে গোরা খুব বিব্রত বোধ করল। বরাবর দেখেছে, কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হলে, তাঁরা হাতজোড় করে এসে নতমস্তকে দাঁড়ান। এ অভিজ্ঞতা ওর জীবনে অনেকবার হয়েছে। সাধুটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, পিছনে পিছনে আসবেন। ভিক্ষা দেওয়া যাবে না। শুধু তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে। নাহলে সাধুটি সামনে থেকে নড়বেন না। অনেক সময় লোক জড়ো হয়ে

যায়, তামাশা দেখার জন্য। ব্যস্ত রাস্তায় যাতে ফের লোক জড়ো না হয়ে যায়, সেজন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোরা সাধুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল।

তখনই ওর চোখে পড়ল, একজন ফোটোগ্রাফার ছবি তুলছেন। দেখে তাড়াতাড়ি সাধুর মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে, গোরা দক্ষিণমুখো হাঁটতে শুরু করল। এইসব ফোটোগ্রাফারকে ও মোটেই পছন্দ করে না। ও মনে করে, অনুমতি ছাড়া কারও ছবি তোলা অনুচিত। কে কী উদ্দেশ্যে ওর ছবি ব্যবহার করবে, কে জানে? ফোটোগ্রাফারটি ওর ছবি তুলল কেন, এই প্রশ্নটাই ওর মাথায় ঘুরতে লাগল। ও তো সেলিব্রিটি নয় যে, কাগজে ছবি ছাপতে হবে। ও ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র। কলকাতায়, বলতে গেলে খুব অল্পসংখ্যক লোকই ওকে চেনেন। ওকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

এক ফোটোগ্রাফারের জন্য মাসকয়েক আগে, গোরা খুব সমস্যায় পড়েছিল। একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির লোকেরা ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল। কোথায় যেন ওর ছবি তুলে সেই ফোটোগ্রাফার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে পাঠিয়েছিল। লোকগুলো এসে ধরল, পার্ক হোটেলে একটা গ্ল্যাম হান্ট কম্পিটিশন হচ্ছে। সেখানে ওকে অংশ নিতে হবে। লোকগুলো আরও বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, জিতলে মডেলিং কেরিয়ার নিয়ে ওকে ভাবতে হবে না।

গোরা রাজি হয়নি। ও জানে, সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য ও জন্মায়নি। লোকহিতকর কাজের জন্য ও এই পৃথিবীতে এসেছে। সাধারণ লোকের মঙ্গলের জন্য ও সারাজীবন কাজ করে যাবে। ঈশ্বর সেটাই চান। ছোটোবেলা থেকে গোরা সেই ইঙ্গিত পাচ্ছে। ওর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে, যা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ওর নেই। ও ঠিক করেছে, দলিত মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এখনও সমাজে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষ বলেই বিবেচিত হয় না। সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হলে এদের হাত শক্ত করা দরকার। এই কাজটা একা ও করতে পারবে না। চাই একটা দলীয় সংগঠন। গোরা সেই কারণেই ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। ও বিশ্বাস করে, দলিতরা একদিন জাগবেই।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতেই গোরা একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, সাধুটি ফের তাঁর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়েছেন। ফোটোগ্রাফারটি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। খুব ছোটোবেলায় মা একবার বলে দিয়েছিলেন, সাধুসন্তদের কখনো অসম্মান করবে না। এঁরা ঈশ্বরের দূত। কখনো কখনো নাকি ঈশ্বরই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সাধু রূপে মানুষের সামনে এসে দাঁড়ান। জাজপুরে হোক অথবা ভুবনেশ্বরে—কখনও কোনও সাধু বাড়িতে এলে, মা তাঁদের ফিরিয়ে দিতেন না। অতিথির মতো ব্যবহার করতেন। জল দিয়ে তাঁদের পা ধুইয়ে দিতেন। তারপর ফলাহারের ব্যবস্থা করতেন। পুরো পরিবারের জন্য আশীর্বাদ চাইতেন। বসে তাঁর কাছে অমৃতবাণী শুনতেন।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে, আনমনা হয়েই গোরা কার্জন পার্কের দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ শুনল, 'আরে গোরাদা, আপনি? মিটিংয়ে ছিলেন নাকি?'

ছেলেটাকে গোরা চিনতে পারল। তরুণ মাজি। দলিত পার্টির এন্টালি ইউনিটের নেতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনো করত। হঠাৎ ওর বাবা মারা যান। বাবার চাকরিটা পেয়ে এখন কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী। দাঁড়িয়ে পড়ে গোরা জিজ্ঞেস করল, 'মিটিং কি শেষ হয়ে গেছে?'

তরুণ বলল, 'আরও অনেকক্ষণ চলত। কিন্তু পুলিশ তাড়াতাড়ি শেষ করে দিল। বেলা তিনটের সময় লালবাজার থেকে খবর পাঠাল, আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা ফাঁকা করে দিতে হবে। লালগড় থেকে বহু মানুষ এসেছেন। তাঁরা নাকি পথ অবরোধ করবেন। এসব শুনে অদ্বৈতবাবু বললেন, মিটিং শেষ করে দাও। তাই অনেকেই বক্তব্য রাখতে পারলেন না। অন্য কোনও পার্টির মিটিং চললে কি পুলিশ এভাবে ফোর্স করতে পারত? বলুন গোরাদা? আমরা দলিত বলেই গা-জোয়ারিটা করতে পারল।'

'কীরকম লোক হয়েছিল তরুণ?'

'হাজার কুড়ির মতো হবে। কার্জন পার্কের মতো জায়গায়, বলতে গেলে কিছুই না। মিটিংটা এত তাড়াহুড়ো করে লিডাররা করলেন, সব জেলায় ঠিকমতো খবরই পৌঁছল না। দেখছেন তো, অন্য পার্টিগুলো আজকাল ফুঁ দিলে লাখখানেক লোক এসে জড়ো হয়। সেই তুলনায় আমাদের মিটিংটা আজ খুব সাকসেসফুল হল না।'

'তাহলে তো কার্জন পার্কে এখন গিয়ে আর লাভ নেই।'

'এখন ওখানে কেউ নেই গোরাদা। লিডাররা রাজভবনে গেছেন। গভর্নরের কাছে ডেপুটেশনে। কিন্তু আপনি এলেন না কেন? মিটিং চলার সময় তো আপনার নাম করে, অনেকবার মাইকে অ্যানাউন্স করা হল। আমাদের মনে হল, আপনি মিটিং অ্যাভয়েড করার জন্যই আজ আসেননি।'

'না, তেমন কিছু না। আমারই ব্যাডলাক। পাতাল রেলে আটকে গেছিলাম। যাক, কেশব রামের বক্তৃতা কেমন শুনলে?'

'সো সো। আমার অন্তত ভালো লাগেনি। ওড়িশার মুভমেন্ট কেমন চলছে, সেটা শুনে আমার লাভ কী? আমরা নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর আর লালগড়ের কথা শুনতে চাই। ওখানকার আন্দোলন যে আসলে দলিত সম্প্রদায়ের... লিডাররা জোর দিয়ে সেটা কেন বলছেন না? মাঝখান থেকে লাভের গুড় অন্য পার্টি খেয়ে যাচ্ছে। টিভিতে ভুলভাল দেখাচ্ছে, কাগজে যা-তা লিখছে, লিডাররা কিছু বলবেন না?'

'বলে কী হবে? কাগজ কি ছাপবে?'

'না ছাপুক, অন্তত আমাদের লোকগুলো তো জানতে পারবে। অদ্বৈতবাবুরা এই যে কিছুদিন ধরে নিউ ডেমোক্রেসির কথা বলছেন, সেটা এইসব জায়গায় যদি আমাদের বিশদভাবে না বলেন, তাহলে আমরা বুঝব কী করে? সত্যি বলছি গোরাদা, আমি খুব ডিসাপয়েন্টেড। একটা কথা বলব। অদ্বৈতবাবুদের বয়স হয়ে গেছে। লিডারশিপ দেওয়ার ক্ষমতা ওঁদের নেই। আপনার মতো কেউ এসে যদি হাল ধরেন, তাহলে পার্টির গ্রোথ কেউ আটকাতে পারবে না।'

'এ ধরনের কথা আর কখনো বোলো না তরুণ। ঈশ্বর যখন চাইবেন, তখন আপনা-আপনিই লিডারশিপ আমার হাতে চলে আসবে। আপাতত, পড়াশুনোটা আমাকে শেষ করতে দাও।'

'কেন বলব না গোরাদা? স্ট্রেটকাট বলছি, আমরা, দলিত পার্টির নিচুতলার কর্মীরা কেউই চাই না, পার্টির লিডারশিপ কোনও ব্রাহ্মণের হাতে থাকুক। অদ্বৈত চ্যাটার্জিকে আমরা কেউ মানতে পারছি না। আমাদের কথা ভেবে মুভমেন্টটা উনি শুরু করেছিলেন, ঠিক আছে। তার জন্য ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা, আমাদের মধ্যে থেকেই কাউকে নেতা হিসাবে চাই।'

এসব জঙ্গি কথা কানে গেলে অদ্বৈতবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য গোরা বলল, 'তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবে?'

'না গোরাদা, আমাকে একবার মেডিকেল হাসপাতালে যেতে হবে। সিউড়ি থেকে আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই, আমার কাছে এসেছে। আমাদের পার্টিরই কর্মী। মেডিকেলে ভর্তি আছে। সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড। তাকে একবার দেখতে যাব।'

'ইনজিওর্ড কেন? তার কী হয়েছে তরুণ?'

'যুগ যুগ ধরে যা হয়ে আসছে...। দলিত পার্টির হয়ে কাজ করতে গিয়ে, হার্মাদ বাহিনীর হাতে এমন মার খেয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না। স্পাইনাল কর্ডে চোট। হার্মাদরা ওর বোনকে রেপ করেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই শহরে বসে আমরা তেমন টের পাই না। কিন্তু জেলায় জেলায় এই হার্মাদ বাহিনী এমন অত্যাচার চালাচ্ছে, গোরাদা আপনি ভাবতেও পারবেন না।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল গোরার। দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসীদের উত্থান দেশের কোনও বড়ো পার্টিই পছন্দ করছে না। বিহারে রণবীর সেনারা দমন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। বাংলায় গড়ে উঠেছে বামপন্থী পার্টির মদতপুষ্ট হার্মাদ বাহিনী। এরা বুঝতে পারছে না, মার খেয়ে দলিত, আদিবাসীরা ক্রমে ক্রমে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। উচ্চবর্ণের মানুষদের আর তারা মানবে না। কয়েকদিন আগে, খবরের কাগজে একটা ছবি দেখে গোরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এসপ্ল্যানেডের মতো জায়গায় পথ অবরোধ করেছে লালগড় থেকে আসা কিছু মানুষ। এক আদিবাসী মহিলা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরনে ডুরে শাড়ি। তাঁর হাতে টানটান তিরধনুক। মহিলার চোখে বহুদিনের বঞ্চনার আগুন। ফোটোগ্রাফারদের দিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন। যেন এখুনি তির জ্যামুক্ত করে দেবেন। ওই মুখে ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই। ছবিটা দেখে গোরা একদিকে যেমন অবাক হয়ে গেছিল, অন্যদিকে আশার আলোও দেখতে পেয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে তরুণকে ও জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেছ?'

'করে কোনও লাভ নেই। ওর মা রিপোর্ট লেখাতে গেছিল, কিন্তু পুলিশ তাকেই আটকে রেখেছে চুরির অপবাদ দিয়ে। দেখি কী হয়। আজ চলি গোরাদা। পরে দেখা হবে।'

তরুণ হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর দিকে চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গোরা ফের পাতাল রেলের দিকে এগোতে লাগল। তরুণ বলল বটে, এই শহরে বসে আপনারা তেমন কিছু টের পান না। কিন্তু কাগজ খুললেই আজকাল পাতা জুড়ে দলিত, অন্ত্যজ, আদিবাসীদের নিপীড়নের খবর আকচার দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য সমানাধিকারের কথা লেখা আছে। কিন্তু দলিতরা এখনও এ দেশে সেই অধিকারের খুব সামান্যই ভোগ করতে পারে। দলিতদের ওপর অত্যাচারের খবর গোরা যখন শোনে, তখন ভীষণ রাগ হয়। আর তখনই গোরার মাথার ভেতরে লাল রঙের কী যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

গভীর লাল সুড়ঙ্গে কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বুঁজে ফেলে। তখন চোখের সামনে অজানা কিছু দৃশ্য দেখতে পায়। এটা কোনও অসুখ কি না, তা গোরা জানে না। কাউকে কোনওদিন কিছু বলেওনি। তবে ছোটোবেলা থেকেই ওর জীবনে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতিবারই ও নতুন নতুন দৃশ্য দেখে। কার্জন পার্ক দিয়ে হাঁটার সময় আজ দেখল, কোনও এক প্রাচীন জনপদ দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে। ওর পেছনে অসংখ্য দলিত শ্রেণির মানুষ, সমস্বরে কী যেন বলতে বলতে যাচ্ছে। তাদের কারও হাতে মৃদঙ্গ, খোল, করতাল। তারা দু'হাত তুলে নাচছে। গোরা প্রাণপণ চেষ্টা করল, সেই আওয়াজ শোনার। কিন্তু শুনতে পেল না। দৃশ্যগুলো মিলিয়ে যাওয়ার পরও গোরা বুঝতে পারল না, কোন জনপদ দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছিল। লোকগুলোই বা ওকে কেন অনুসরণ করছিল? মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর ওই দৃশ্যগুলো ওর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। নিজেকে সামলে ও দেখল, পাতাল রেলের প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীচে নামার জন্য সিঁড়িতে পা দেবে, এমন সময় গোরা শুনতে পেল, 'এক্সকিউজ মি, একটু দাঁড়াবেন প্লিজ। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

মুখ ফিরিয়ে গোরা দেখল, সেই ফোটোগ্রাফার। একটু আগে যে ওর ছবি তুলেছিল। কড়া কথা বলবে বলে ও ঘুরে দাঁড়াল।

তিন

সুশোভনদার ফোনটা পেয়ে, জয়দেব স্থান-কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আপনি কোথায়? আপনার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করে করে, এইমাত্র আমি ফিরে এলাম।'

ও প্রান্ত থেকে সুশোভনদা বললেন, 'শোনো, বেশি কথা বলার সময় আমার নেই। কাজের কথাটা আগে সেরে নিই। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তুমি একটা প্যাকেট পেয়ে যাবে। কুরিয়ারের লোক তোমার কাছে প্যাকেটটা পৌঁছে দেবে। সেটা খুললেই তুমি বুঝতে পেরে যাবে। আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কোরো না। বিপদে পড়বে। এখন ছাড়ি, কেমন?'

জয়দেব বলল, 'এক মিনিট সুশোভনদা। আপনার লেখাটাও কি ওই প্যাকেটের মধ্যে আছে?'

'আছে। শোনো জয়দেব, আমি দিনকয়েকের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি। দরকার হলে পরে নিজেই তোমাকে ফোন করব। ছাড়ছি।'

বলেই সুশোভনদা ফোনটা ছেড়ে দিলেন। রাস্তায় কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়দেব। এই হেঁয়ালির মানেটা ও বুঝতে পারল না। সুশোভনদা হুটহাট বাইরে চলে যান, সেটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগে বহুবার গেছেন। কিন্তু এবারের যাওয়ার মধ্যে কীরকম যেন একটা রহস্যের গন্ধ রয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের কথাবার্তা। তার মধ্যেই ওর মনে হল, সুশোভনদা কোনও বিপদে পড়েছেন। কারও ভয়ে উনি পালিয়ে যাচ্ছেন। না হলে কেন বললেন, ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে বিপদ হবে? খুব গভীরভাবে জয়দেব চিন্তা করতে লাগল। কথা বলার সময়, ফোনে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনতে পাচ্ছিল ও। বড়ো রেল স্টেশনে যে ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়। একসঙ্গে অনেক লোকের কথা বলার আওয়াজ পাচ্ছিল। তাহলে কি সুশোভনদা কোনও স্টেশন থেকে কথা বলছিলেন? জয়দেব ফের স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। ওই সময় ঘোষিকা ঠিক কী বলছিলেন। তখনই ওর মনে পড়ল, 'পাঁশকুড়া লোকাল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে...।' পাঁশকুড়া তো হাওড়া লাইনে। তার মানে সুশোভনদা নিশ্চয়ই হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করেছিলেন।

ট্রামে না উঠে, জয়দেব হাঁটতে হাঁটতেই ফিরে এল সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। ভ্যাপসা গরমে প্রচণ্ড ঘেমেছে। জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। দোকানে উঠেই ও পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দিল। দোকান বলতে পনেরো বাই দশ একটা ঘর। আর তাতে পুরনো আমলের কিছু আসবাব এবং ওদের প্রকাশিত বইয়ের সম্ভার। ওর বাবা জীবেন মিত্র এই প্রকাশনা সংস্থাটা শুরু করেছিলেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। প্রথম দিকে তিনি শুধু পাঠ্যপুস্তক ছাপতেন। গিল্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কয়েকজন নামী সাহিত্যিকের সাথে ওঁর পরিচয় হয়। মূলত, তাঁদেরই উৎসাহে বইমেলার সময় উনি একটা দুটো করে উপন্যাস, গল্পসমগ্র, প্রবন্ধ, জীবনীমূলক গ্রন্থ ছাপতে শুরু করেন। বাড়তে বাড়তে বইয়ের সংখ্যা এখন প্রায় দুশো হয়ে গেছে। এই ছোট্ট দোকানের আয় থেকেই, ভালোভাবে সংসার চালিয়েছেন ওর বাবা। দিদি আর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। দিদির বিয়ে দিয়েছেন। বেহালায় একটা দোতলা বাড়িও রেখে গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর এখন ব্যবসা চালাচ্ছে জয়দেব।

দোকানে বাবার আমল থেকেই রয়েছেন সুরেশদা। বই ছাপার কাজকর্মগুলো উনিই দেখেন। দিনকাল পত্রিকা চালানোর জন্য জয়দেব রেখেছে সুমিতা আর কৌশিক বলে দু'টি ছেলেমেয়েকে। এরা প্রুফ রিডিং থেকে এডিটিং সব ধরনের কাজই করে। ঘোস্ট রাইটিং থেকে ইন্টারভিউও। ছেলেমেয়ে দুটোকে নিজের হাতে গড়েপিটে নিয়েছে জয়দেব। কোনও কাজে ওরা না বলে না। দোকানে ঢুকে জয়দেব দেখল, কৌশিক নেই। কম্পিউটারের

সামনে বসে সুমি কী যেন করছে। ও বলল, 'আমার নামে একটা প্যাকেট আসার কথা আছে সুমি। এলেই, ওপরে পাঠিয়ে দিয়ো, কেমন।'

মুখ তুলে সুমি ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'আপনি এসে গেছেন, ভালোই হল। প্রেস থেকে সুরেশবাবু একটু আগে জানতে চাইছিলেন, সুশোভনবাবু লেখাটা পাঠিয়েছেন কি না?'

জয়দেব বলল, 'সুরেশদার সঙ্গে আমি কথা বলে নিচ্ছি। তুমি কী করছ এখন?'

'আপনার এডিটোরিয়ালের প্রুফটা দেখে রাখছি। কেন জয়দা?'

'একটা গল্প বেছে এখুনি প্রেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করো তো। আর কৌশিক এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। দরকার আছে।'

পুরনো আমলের বাড়ি, সিলিং অনেক উঁচুতে। কাঠের তক্তা দিয়ে জয়দেব তাই দোকানের ভেতরই একটা তলা তৈরি করে নিয়েছে। নিরিবিলিতে লেখালেখির কাজ করতে সুবিধে হয় ওর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ও ওপরে উঠে গেল। বেশ কিছুদিন ধরেই ও ভাবছে, একটা এয়ার কন্ডিশনড মেশিন বসিয়ে নেবে। অন্তত কম্পিউটারগুলোর জন্য নেবে। কিন্তু বাড়িওয়ালা অংশুমানবাবুকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। দেওয়াল খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। প্লাস ইলেকট্রিকের বিলের জন্য বাড়তি কত দিতে হবে, তা নিয়েও কথা বলা দরকার। নিজের চেয়ারে বসে জয়দেব টেবল ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

প্লাস্টিকের ট্রে-তে কয়েকটা চিঠি পড়ে আছে। পত্রিকা সংক্রান্ত কিছু চিঠি। তার মধ্যে সাদা লম্বা একটা খাম দেখে, জয়দেব সেটা তুলে আনল। দেখেই ও বুঝতে পারল, পুরী থেকে পাঠিয়েছেন অবধূত গোস্বামী। মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে গবেষণার কাজে পুরীতে গেলে ও মা চিন্ময়ীর আশ্রমে গিয়ে ওঠে। ওই আশ্রমেরই সর্বাধ্যক্ষ গোস্বামীজি। খুব পণ্ডিত মানুষ। মহাপ্রভু সম্পর্কে নতুন কোনও তথ্য পেলেই উনি পাঠিয়ে দেন। সে সব ওর গবেষণার কাজে লাগে। দিনকাল পত্রিকায় একটা পাতা আছে অমৃতবাণী। তাতে ধর্মসম্পর্কিত প্রবন্ধ অথবা সাক্ষাৎকার বেরোয়। গোস্বামীজি সেই পাতায় কখনো কখনো লেখা পাঠান।

খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠি বের করে আনল জয়দেব। গোস্বামীজির হাতের লেখা দেখে ওর মন ভরে গেল। একদম ছাপার অক্ষরের মতো। উনি লিখেছেন, 'অনেকদিন আপনার কোনও সংবাদ নাই। বাধ্য হইয়াই এই পত্র লিখিতেছি। আপনার পত্রিকার শেষ সংস্করণ পাইয়াছি। পাঠ করিয়া বড়োই প্রীত হইলাম। আপনার উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করি।'

'আপনার অবগতির জন্য জানাই, কেন্দ্রপড়াতে প্রাচীন একটি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি। তাহাতে মহাপ্রভু সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পুঁথিটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা। যাঁহার হেফাজতে ইহা আছে, তাঁহার দাবি, পুঁথিটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত-র কয়েক বৎসর আগের লেখা। আমি কেন্দ্রপড়ায় যাইব, মনস্থ করিয়াছি। নিজের চক্ষে পুঁথিটি দেখিতে চাহি। তাহার পর, আপনাকে বিস্তৃত জানাইব।'

'সম্প্রতি ইন্টারনেট ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একটি বিদেশি পুস্তকের সন্ধান পাইলাম। ওই পুস্তকে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, মহাপ্রভু সমকামী ছিলেন। পুস্তকটি সম্পর্কে জানিয়া আমার মনে বড়োই ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে। মূর্খ ওই বিদেশি লেখক জানিবেন কী করিয়া, মহাপ্রভু রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বাহ্যিক আচরণ, সমকামিতার লক্ষণ হিসাবে ধরিয়া লওয়া, মূর্খতার শামিল। আমি ওই বিদেশি লেখককে একটি চিঠি লিখিতে চাহি। আপনি ওই পুস্তকের প্রকাশকের নিকট হইতে লেখকের ঠিকানা জোগাড় করিয়া দিলে, বিশেষ ধন্য হই।'

'শ্রীক্ষেত্রে আবার কবে আসিতেছেন, জানাইবেন। শুভাশিসসহ অবধূত গোস্বামী।'

চিঠিটা পড়ে জয়দেব কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। গোস্বামীজি মারাত্মক চটেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা সময় উনি দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। মা চিন্ময়ীর সংস্পর্শে আসার পর চাকরি ছেড়ে আধ্যাত্মিক লাইনে চলে এসেছেন। খুবই আধুনিকমনস্ক। গত চার-পাঁচ বছরে জয়দেব আশ্রমে অনেকটা সময় গোস্বামীজির সঙ্গে কাটিয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব অবতার ছিলেন কি না, তা নিয়ে কখনো ওঁকে কোনও মন্তব্য করতে শোনেনি। কিন্তু চৈতন্যদেব যে একজন সোস্যাল রিফর্মার ছিলেন, সে সম্পর্কে গোস্বামীজি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পুরীতে যেসব জ্ঞানীগুণী চৈতন্যচর্চা করেন, উনি তাঁদের অন্যতম। ওঁর সঙ্গে কথা বলে জয়দেবের মনে হয়েছে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে গোস্বামীজির থেকে বেশি বোধহয় আর কেউ জানেন না। উনি ইচ্ছে করলে, নিজেই এই বিষয়টা নিয়ে থিসিস জমা দিতে পারেন।

জয়দেব ঠিক করল, ঠান্ডা মাথায় এই চিঠির উত্তর দেবে। গোস্বামীজিকে লিখবে, কোন বিদেশি লেখক মহাপ্রভু সম্পর্কে কী লিখলেন, তা নিয়ে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। এই বইটি এখনও ভারতের বাজারে আসেনি। এই বিতর্কের মধ্যে আপনি ঢুকবেন না। বিতর্কটা বাণিজ্যিক কারণেই তোলা হয়েছে। এবং এতে প্রকাশকের স্বার্থ আছে। নিজে প্রকাশক বলেই জয়দেব জানে, এই বইটি বাজারে এলে কিছু কৌতূহলী পাঠক গোগ্রাসে গিলবেন। ভালো কাটতি হবে। কিন্তু লেখক ও প্রকাশকের দুর্ভাগ্য, বইটি কোনও লাইব্রেরিতে স্থান পাবে না।

গোস্বামীজির চিঠির অন্য অংশটাই বরং জয়দেবকে বেশি টানল। 'মহাপ্রভুর ওপর লেখা একটা প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।' মহাপ্রভু সম্পর্কে পড়াশুনো করার জন্য জয়দেব নিজে বেশ কয়েকবার ভুবনেশ্বরে স্টেট লাইব্রেরিতে গেছে। প্রাচীন পুঁথি উলটে-পালটে দেখেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তর্ধান পর্ব নিয়ে প্রামাণ্য তেমন কিছু পায়নি। তাঁর জীবনীকাররা একেক জন একেক রকম লিখেছেন। কেউ লিখেছেন, উনি 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলতে বলতে পুরীর সমুদ্রে নেমে যান। কেননা, সমুদ্রের রং শ্রীকৃষ্ণের গায়ের মতো নীল। কেউ লিখেছেন, পুরীর মন্দিরে গিয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথের মূর্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যান। আবার কারও মতে, মহাপ্রভু রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে। তারপর ওঁর মরদেহ কোথাও সমাধিস্থ করা হয়।

কেউ কেউ এও বিশ্বাস করেন, মহাপ্রভু, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, নিজেই গোপনে পালিয়ে আসেন গৌড়ে। নদিয়ার কোনও এক স্থানে তিনি দু'শো বছরেরও বেশি বেঁচে ছিলেন।

জয়দেব এরকম বহু তথ্য জোগাড় করেছে। কিন্তু এখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কীভাবে মহাপ্রভুর জীবনাবসান হয়েছিল।

'জয়দা, আমাকে ডেকেছেন?'

কৌশিকের গলা শুনে জয়দেব ওর দিকে তাকাল। ছেলেটা এত লম্বা, ওপরে এলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সিলিংয়ে ওর মাথা ঠেকে যায়। তাই তাড়াতাড়ি ও বলল, 'চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো। তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা করার আছে।'

চেয়ারে বসে কৌশিক বলল, 'সিরিয়াস কিছু জয়দা?'

জয়দেব বলল, 'দিনকালের লাস্ট ইস্যুর কত কপি রিটার্ন এসেছে, জানো? প্রায় তিন হাজার। প্রতি ইস্যুতেই ঘাটতি। ক'দ্দিন পত্রিকাটা চালাতে পারব, জানি না।'

কৌশিক চমকে উঠে বলল, 'এই কথাটা মাথাতেই আনবেন না জয়দা। শুরু থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছি। লাভ-লোকসানের কথা কখনো ভাবিনি। বাজারে একটা গুডউইল তৈরির কথাই শুধু ভেবে গেছি। এখন যেটা হয়েছে সেটাই বা কম কীসে। এবার লাভের কথা চিন্তা করতে হবে। বিজ্ঞাপন আনার জন্য আপনি শুধু একটা এফিসিয়েন্ট লোককে রাখুন। মানে...অন্য ম্যাগাজিনগুলো যেভাবে চলে, সেভাবেই আমাদের চলতে হবে।'

'তোমার জানাশুনো এমন লোক আছে?'

'আমার এক বন্ধু আছে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' বলে চুপ করল কৌশিক। তারপর বলল, 'আমি বুঝতে পারছি জয়দা, পত্রিকার চক্করে পড়ে আপনার রিসার্চের কাজ আটকে যাচ্ছে। সেই কারণেই...বন্ধ করার কথা ভাবছেন। আপনি এক কাজ করুন, আমার আর সুমিতার ওপর খানিকটা দায়িত্ব ছেড়ে দিন। আমরা চালিয়ে নিতে পারব। দরকার হলে আপনি তো মাথার ওপর আছেনই। আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

জয়দেব বলল, 'তুমি যা ভাবছ, তা নয়। তোমাদের ওপর ভরসা করেই তো পত্রিকাটা চালাচ্ছি। আচ্ছা, বলো তো...কেন আমাদের তিন-চার হাজার কপি আনসোল্ড থাকছে?'

'জয়দা, এটা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যুগ। ঘরে বসে টিভিতে লোকে সবকিছু দেখা ও জানার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এর জন্য তাকে আলাদা খরচা করতে হচ্ছে না। হকারদের সেন্টারে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা কথা বলি। পাঠকদের মতামতও জানার চেষ্টা করি। এখন ম্যাগাজিন চালানো এত সহজ নয়। জানতে চাইলেন বলেই বলছি, দিনকালের প্রতি ইস্যুতে এমন কোনও মেটিরিয়াল আমাদের দিতে হবে, যা পাঠকরা অন্য কোথাও পাবে না। ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট...কোনও মিডিয়াতেই না। আমি সেনসেসনাল স্টোরির কথা বলছি। দরকার হলে, এই ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে জয়দা।'

'কিন্তু প্রতি সংখ্যায় ওই ধরনের স্টোরি তুমি পাবে কোথায় কৌশিক?'

'সুমি অনেক খোঁজখবর রাখে। অনেক সময় আমাকে বলেও। তিনজনে একসঙ্গে

বসে আলোচনা করলেই দেখবেন, ঠিক বেরিয়ে আসবে। মাসে একটা করে পাব না! তা হয় নাকি?'

কৌশিক কথাটা বলার সময়ই সিঁড়ির গোড়ায় সুমিতার মুখটা দেখা গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ও হাসিমুখে বলল, 'কৌশিকটা আমার নামে কী চুকলি কাটছে জয়দা?'

জয়দেব হেসে বলল, 'চুকলি কাটেনি। বরং তোমার প্রশংসাই করছিল। এসো, বসো।'

বলতে বলতেই ও দেখল, সুমির হাতে একটা বাদামি রঙের প্যাকেট। সেটা এগিয়ে দিয়ে সুমি বলল, 'এই নিন জয়দা, আপনার প্যাকেট। এখুনি কুরিয়ারের লোক দিয়ে গেল।'

নিশ্চয়ই সুশোভনদার প্যাকেট। ওপরে লেখা, ডু নট ফোল্ড। তার মানে ভেতরে এমন কিছু আছে, ভাঁজ করলে নষ্ট হয়ে যাবে। সুশোভনদা একটা ছবির কথা বলেছিলেন। ওঁর লেখার সঙ্গে সেই ছবিটা ছাপতে হবে। তাহলে সেই ছবিটাই এর ভেতরে রয়েছে। কাঁচি দিয়ে সাবধানে জয়দেব প্যাকেটটা খুলে ফেলল। তারপর ভেতরকার কাগজগুলো বের করে আনল। সবার ওপরে রয়েছে সুশোভনদার চিঠি। তারপর কয়েক পাতার লেখা। একদম নিচে একটা পিচবোর্ডের ওপর রাখা আছে রঙিন ছবি।

ছবিটা দেখে জয়দেব লাফিয়ে উঠল। লেখাটা প্রথমেই দ্রুত পড়ে ফেলল ও। তারপর কৌশিককে বলল, 'একটু আগে তুমি সেনসেশনাল স্টোরির কথা বলছিলে না? দ্যাখো, ভগবান আছেন। এই যে, সুশোভনদা একটা লেখা পাঠিয়েছেন। এই স্টোরি নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। সুমি, প্রেসে কি গল্পটা তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ? পাঠালে ওদের ফোন করে বলে দাও, কম্পোজ করতে হবে না। তুমি এই লেখাটা নিজে প্রেসে নিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে কম্পোজ করাবে। এটাই দিনকালের নেক্সট ইস্যুর কভারস্টোরি হবে। আর একটা কথা, ইস্যু বেরনোর আগে কেউ যেন, স্টোরিটার কথা জানতে না পারে, বুঝলে?'

চার

সারাটা বিকেল আজ খুব ধকল গিয়েছে। তিলজলায় দলিতদের বস্তিতে একটা সমস্যা মেটাতে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন অদ্বৈতবাবু। গরমে গোরা খুব ঘেমেছিল তখন। বারতিনেক গেঞ্জি ভিজে চপচপ করছে আর শুকিয়েছে। তখনই শরীরটা কেমন যেন করছিল। বাড়ি ফেরার সময় দেখল, গা বেশ গরম। জ্বর আসছে বোধহয়। গাড়ি থেকে অদ্বৈতবাবু রাসবিহারীর মোড়ে নামিয়ে দেওয়ার পর, চেতলা ব্রিজের দিকে হাঁটার সময়, গোরা একবার ভাবল, ওষুধের দোকান থেকে ক্যালপল কিনে নেবে কি না। রাতে জ্বর বাড়লে মুশকিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ওষুধ কিনে লাভ নেই। ওষুধে ওর জ্বর ছাড়ে না। তার চেয়ে ভাগবত মন্দিরে গিয়ে বসলে, জ্বরটা ছেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ও এটা পরীক্ষা করে দেখেছে।

পশ্চিমদিকে হাঁটার সময়ই গোরা শুনতে পেল, ভাগবত মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহরের ব্যস্তবহুল এই জায়গায় এত সুন্দর একটা মন্দির আছে, আগে ও

জানতই না। আধ কিলোমিটারের মধ্যেই কালীঘাটে মায়ের মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। পুজো দিতে সেখানেই যায়। পাণ্ডাদের টানাটানির জন্য তো বটেই, গিজগিজে ওই ভিড়ের কারণেও, কালীঘাটের মন্দিরে গোরার যেতে ইচ্ছে করে না। ওর বাড়ির আরও কাছে এই ভাগবত মন্দির। ওখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটা ওকে বেশি টানে। সন্ধেবেলায় আর আরতির পর ওখানে নামসংকীর্তন হয়। বাড়ি ফেরার পথে কোনও কোনওদিন সময় পেলেই গোরা ভাগবত মন্দিরে গিয়ে বসে। খোল করতালসহ যখন শ্রীহরির নামসংকীর্তন হয়, তখন ওর মনে অদ্ভুত এক ভাবাবেশ হয়। চোখ বুজে ও যেন অন্য কোনও পৃথিবীতে পৌঁছে যায়।

আজ মন্দিরে ঢুকেই গোরা বুঝতে পারল, কোনও পার্বণ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে সোনার অলঙ্কার। রজনীগন্ধা আর বেল ফুলের সিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা। ফুলের মিষ্টি গন্ধ চারদিকে ম ম করছে। রঙিন কাগজের টুকরো আর গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সমস্ত প্রাঙ্গণটা সাজানো হয়েছে। সারা উঠোন জুড়ে ফরাস পাতা। ঠিক মধ্যিখানে দু'তিনটে চৌকি। সুন্দর কাশ্মিরী কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া। চৌকির ওপর হারমোনিয়াম, তবলা আর বড়ো একটা সিনথেসাইজার রাখা। বৃন্দাবনের মতো...এই মন্দিরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। মোহান্তজি গত বছর নিয়ে এসেছিলেন ভজন গায়ক অনুপ জালোটাকে। এত ভিড় হয়েছিল যে, রাসবিহারীর মোড়ে যানজট হয়ে গেছিল। চৌকির ওপর বাদ্যযন্ত্র দেখে গোরা বুঝতে পারল, সম্ভবত আজও নামকরা কেউ গাইতে আসবেন।

'আপনি এখানে? কী আশ্চর্য, সকাল থেকে আপনার কথাই আজ ভাবছিলাম মোহান্ত।'

কথাটা শুনে গোরা পাশ ফিরে তাকাল। মনটাকে বৃন্দাবন থেকে সরিয়ে এনে দেখল, ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ভাগবত মন্দিরের মোহান্তজি। সদ্যস্নান সেরে এসেছেন। কপালে তিলক। পরনে শ্বেতশুভ্র পট্টবস্ত্র। মোহান্তজি প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রয়েছেন। গোরা প্রথম যেদিন এই মন্দিরে ঢুকেছিল, সেদিনই মোহান্তজি নিজে এসে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন থেকে উনি গোরাকে মোহান্ত বলে সম্বোধন করেন। কয়েকবার মানা করা সত্ত্বেও মোহান্তজি শোনেননি। নমস্কার করে গোরা বলল, 'আমার কথা ভাবছিলেন কেন মোহান্তজি?'

'আপনার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করছিল যে। আজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে, আমাদের সব উদ্যোগই যে ব্যর্থ হয়ে যেত মোহান্ত।'

কথার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে, গোরা বলল, 'এদিক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। সন্ধ্যারতির আওয়াজ শুনে ভেতরে ঢুকলাম। সব কুশল তো মোহান্তজি?'

'ঢুকতেই হবে। সব নির্দিষ্ট করা আছে যে।' বলেই থালার ওপর রাখা একটা রজনীগন্ধার মালা তুলে নিয়ে, গোরার গলায় পরিয়ে দিয়ে মোহান্তজি বললেন, 'আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আজ ভজন শোনাতে আসছেন মৃদুলকুমার শাস্ত্রী। বৃন্দাবন থেকে ওঁকে আমরা নিয়ে এসেছি। খুব নামী গায়ক। ওঁর এক-একটা ভজনের ক্যাসেট এক দেড় কোটি কপি বিক্রি হয়।'

বাড়ি ফেরার অবশ্য তাড়া নেই গোরার। শুধু শরীরটা যদি ঠিক থাকে, তাহলে মন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে ওর কোনও আপত্তি নেই। মৃদুল শাস্ত্রীর নামটা ও জানে। কেননা, ও মৃদুল শাস্ত্রীর ভজন শুনেছে। ওদের জাজপুরের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। খুব ভোরে মা মৃদুল শাস্ত্রীর ভজনের ক্যাসেট চালিয়ে দেন। ক্যাসেট শুধু ওদের বাড়িতে বাজে, তা নয়। জাজপুরের প্রতিটি বৈষ্ণবের বাড়িতে বাজে। বেশ কয়েকটা গানের কলি গোরার মুখস্থ। 'রাধে রাধে জপে চলো, আয়েঙ্গে বিহারী।'...রাধার নাম জপ করো, কৃষ্ণ আসবেনই। গানের সুরগুলো খুব সুন্দর। 'রাধে মেরি চন্দা, চকোর হ্যায় বিহারী', 'রাধা রানি মিছরি, তো সোয়াদ হ্যায় বিহারী'। কলকাতায় এসে পড়াশুনো আর পার্টির চক্করে গোরা এত ব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখন ভজন শোনার সময় পায় না। তবে এখনও গানের লাইনগুলো ও ভোলেনি।

'কী ভাবছেন মোহান্ত?'

প্রশ্নটা শুনে গোরা বলল, 'না, কিছু নয়। আপনার অনুষ্ঠান কখন শুরু মোহান্তজি?'

'ব্যস, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে। হাইকোর্টের একজন জজ গান শুনতে এসেছেন। জাস্টিস রুদ্রপ্রসাদ চ্যাটার্জি। এই মন্দিরের অতিথিশালাটা উনি তৈরি করে দিয়েছেন। এতক্ষণ তাঁর জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ভক্তরাও বাইরে জড়ো হয়েছেন। আর দেরি করব না। আপনি সামনে গিয়ে বসুন। আমি মৃদুল শাস্ত্রী আর জাস্টিস চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসছি।'

মোহান্তজি ভেতরে চলে যাওয়ার পর গোরা দরজার কাছে একটা থামের আড়ালে গিয়ে বসল। উঠে যাওয়ার ইচ্ছে হলে, যাতে মোহান্তজির চোখে না পড়ে। বিকেলটা ও কাটিয়েছে তিলজলার এক বস্তিতে। পূতিগন্ধময় এক নরকের মধ্যে। আর এখন ও বসে রয়েছে, ফুলের গন্ধ সুরভিত এক মন্দিরে। মা বলতেন, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে। তাহলে তো বিশ্বাস করতে হয়, একদল ভগবান বসবাস করেন নরকেও। কী অদ্ভুত সেই ভগবানদের সমস্যা। তিলজলায় না গেলে গোরা জানতেও পারত না, এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই সমস্যা আছে। আশপাশে ছোটোখাটো কারখানায় কর্মীরা থাকেন, এমন কিছু দলিত মানুষের একটা বস্তি আছে ওই অঞ্চলে। মূলত, তারা ওড়িয়াভাষী। ওখানে পানীয় জলের খুব অভাব। এতদিন ওরা পানীয় জল পেত, বস্তির কাছেই সরকারের বসানো এক নলকূপ থেকে। সেই নলকূপের হাতল ভেঙে গেছে। জল পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে দলিতরা ছুটেছে আধ কিলোমিটার দূরে আরেকটি নলকূপে। কিন্তু সেটি ওদের ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না ভদ্রলোকেরা।

এ নিয়ে প্রথমে বচসা, তারপর মারামারি। বস্তির কয়েকটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। স্বভাবতই বস্তির মানুষ উত্তেজিত। অদ্বৈতবাবু ওদের শান্ত করার চেষ্টা করেছেন কয়েকদিন। কিন্তু উনি ওড়িয়া ভাষা ভালো বলতে পারেন না। তাই দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে গোরাকে উনি অনুরোধ করেন, 'তুমি তো জাজপুরের ছেলে। ফ্লুয়েন্টলি ওড়িয়া

বলতে পারো। তুমি আমার সঙ্গে চলো, ওদের বোঝাবে।' অদ্বৈতবাবুর অনুরোধ ফেলতে পারেনি গোরা। তিলজলার বস্তিতে ঘোরার সময় ও দেখে, টিভি চ্যানেলের এক রিপোর্টারও হাজির। ছেলেটা বলছিল, স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরেও সমাজটা বদলাল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা দলিতদের টিউবওয়েল ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। এটা আমাদের কাছে খবর। গোরা ছেলেটাকে তখন বলে, স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে কেন এই প্রশ্নটা করছেন না? কেন তিনি টিউবওয়েল সারানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন না? দলিত বস্তি ওকে ভোট দেয়নি বলে?'

তিলজলা বস্তিতে ওরা যখন লোকের অভাব-অভিযোগের কথা শুনছিল, তখন একটা ওড়িয়া মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গোরার হাত ধরে মেয়েটা বলল, পানীয় জল না পেয়ে ওরা কয়েকদিন ধরে পুকুরের জল খাচ্ছে। কাল থেকে ওর বাচ্চা ছেলেটা দাস্ত করে করে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। ওকে বেলেঘাটার এক হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। কিন্তু ডাগতারবাবুরা ভর্তি নেয়নি। মেয়েটার নামও মনে পড়ল গোরার, মাধবী। ওর কান্নাভেজা মুখটা ভুলতে পারছে না গোরা। পুকুরের দূষিত জল যে ফুটিয়ে খাওয়া উচিত, এ কথা বোঝানোরও লোক ওখানে নেই। অশিক্ষা, দারিদ্র, উপেক্ষা আর বঞ্চনা রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অথচ এই দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দলিত! কী হবে এই দেশের?

'মোহান্তজি, আপনার শরবত।'

তিলজলা বস্তি থেকে মনটা সরিয়ে এনে গোরা দেখল, সুবেশা এক কিশোরী ওর সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে ট্রে, তাতে মাটির গেলাসে সুরভিত শরবত। পনেরো কিলোমিটার দূরে একদল মানুষ পানীয় জলের অভাবে ধুঁকছে, আর অন্য একদল মানুষ ভজন শুনতে শুনতে শরবত পান করছে! ঈশ্বরকে পাওয়ার চিন্তায় তারা বিভোর! গেলাসটা ও হাতে নিল বটে, কিন্তু বিরক্ত হয়ে ফরাসের ওপর নামিয়ে রাখল। মেয়েটি চোখের আড়ালে যেতেই গোরা উঠে পড়ল। মন্দিরের বাইরে এসে ও টের পেল, জ্বর কমেনি। বাড়ির দিকে হাঁটার সময় বাঁদিকে ও একটা ওষুধের দোকানে ঢুকল।

চেতলা ব্রিজের কাছে গোরা যে ফ্ল্যাটে থাকে, আসলে সেটা ওর জ্যাঠামশাই ভক্তিভূষণের। রিসার্চ স্কলার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করতেন। বৈষ্ণব সমাজ নিয়ে গবেষণালব্ধ ওঁর একটা বই অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিল। কলকাতায় থাকার সময় উনি এই ফ্ল্যাটটি কেনেন। অবসর নেওয়ার পর উনি দেশের বাড়ি জাজপুরে চলে যান। দীর্ঘ সময় কলকাতায় থাকার জন্য বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিকে উনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। প্রকাশ্যেই বলতেন, বাঙালিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। উনিই জোর করে গোরাকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে জামা-প্যান্ট ছেড়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গোরা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ে কম্বলটা টানার ফাঁকে ও লক্ষ করল, মুকুন্দ তখনও ফেরেনি। ফ্ল্যাটে

ওর সঙ্গে থাকে মুকুন্দ নামে দলিত সম্প্রদায়েরই একটা ছেলে। সল্টলেকের এক কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ভুবনেশ্বরে গোরাদের বাড়ির গায়েই মুকুন্দর বাবার ছোট্ট মণিহারি দোকান। মুকুন্দ কলকাতার কলেজে চান্স পাওয়ার পর, উনিই মাকে অনুরোধ করেন, গোরার সঙ্গে যদি ছেলেটা থাকতে পারে, তাহলে হস্টেলের খরচটা বেঁচে যায়। মা না-করতে পারেনি। পঁচিশ বছর আগেও ওড়িয়া সমাজে কেউ ভাবতে পারতেন না, ভোই সম্প্রদায়ের একটা ছেলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। কিন্তু এখন দলিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও স্কুলকলেজে পড়ার আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে, শহরাঞ্চলে। গোরা নিজে দলিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চায় বলেই, মায়ের অনুরোধে, মুকুন্দকে নিজের কাছে রাখতে, রাজি হয়ে গেছিল।

এক বছর ধরে মুকুন্দ এই ফ্ল্যাটে আছে। প্রথম প্রথম ঠিক সময়ে কলেজ থেকে ফিরে আসত। কিন্তু ইদানীং গোরা লক্ষ করছে, মাঝে মাঝেই দেরি করছে। ওকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে আজকাল গোরার। কেননা, রাতে খেতে বসার সময় দু'একদিন ওর মুখ থেকে মদের গন্ধও পেয়েছে। ধমক দেওয়া সত্ত্বেও মুকুন্দর স্বভাব বদলায়নি। ছেলেটা বদসঙ্গে পড়ে বিগড়ে যাবে, অথচ ও চুপ করে বসে থাকবে, তা হয় না। গোরা ঠিক করে নিল, আজ ফিরলে ছেলেটাকে ভালোমতো কড়কে দেবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটা সময় গোরা টের পেল, গায়ে খুব ঘাম দিচ্ছে। ছোটোবেলায় যখন ওর জ্বর হত, তখন মা অনেক সময় বলত, ঘাম হওয়াটা নাকি ভালো লক্ষণ। চোখ বন্ধ করে গোরা মায়ের কথা ভাবতে লাগল। মা অবশ্য আজ ভুবনেশ্বরে নেই। বাপের বাড়ি রৌরকেল্লাতে গেছে। ফোনে তাই মাকে পাওয়া যাবে না। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। জ্বরের কথা শুনলে মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। ওকে নিয়ে মা তো একটা সময় কম ভোগেনি। ওর জন্মের আগে থেকেই মা ভুগছে। মামিদের কাছে গোরা শুনেছে, মায়ের পেটে ও আসার পর দশ মাস পেরিয়ে গেছিল। তবুও ও পৃথিবীর আলো দেখেনি। দুশ্চিন্তায় দাদু তখন মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। সোনোগ্রাফি করে দেখা যায়, পেটের ভেতর ও সুস্থভাবেই নড়াচড়া করছে। ডাক্তার অপারেশন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু যেদিন সিজারিয়ান ডেলিভারি হওয়ার কথা, সেদিন কোত্থেকে জটাজুট তিন সন্ন্যাসী দাদুর বাড়িতে এসে হাজির। তাঁরা বলেছিলেন, গর্ভের চোদ্দো মাস চলার সময় এক পূর্ণিমার রাতে প্রসব বেদনা উঠবে। ঠিক তাই হয়েছিল।

গোরার মনে পড়ল, ওর জীবনে প্রথম এক সাধুর অলৌকিক কীর্তি দেখেছিল ভুবনেশ্বরে। ওর বয়স তখন আট-নয় বছর। স্কুল থেকে ফিরে হঠাৎ জ্বর। প্রায় দেড় মাস শয্যাশায়ী, গায়ে তাপ একেক সময় উঠে যেত চার-এ। ডাক্তাররা অনেক ধরনের পরীক্ষা করেও জ্বর সারাতে পারলেন না। বাড়ির সবাইয়ের ধারণা হয়েছিল, ও আর বাঁচবে না। সেই সময় একদিন খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে, দুজন সাধু এসে হাজির। মায়ের কাছে গোরা গল্প শুনেছে, বাড়ির লাগোয়া বাগানে অপেক্ষা করছিলেন সাধুরা। একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'তোর ছেলেকে উঠোনে নিয়ে আয়। ডাক্তারবদ্যি ওকে

দাঁড়িয়ে তুলতে পারবে না। আমরা ওকে ঠিক করে দিচ্ছি।'

মা আর বাবা ওকে উঠোনে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে, দুজন সাধু ক্রমাগত ওর গায়ে জল ঢালতে শুরু করেছিলেন। একশো বালতি জল ঢালার পর ওঁরা বলেছিলেন, 'যা, তোদের ছেলে ভালো হয়ে গেছে। এবার ঘরে নিয়ে যা।'

বলেই ওই দুই সাধু ভোরের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছিলেন। আশ্চর্য, সেদিনই গোরার জ্বর সেরে গেছিল। রাতে ও ফের দুই সাধুকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিল। পাহাড়ের গায়ে একটা গভীর জঙ্গল। পাকদণ্ডী বেয়ে ও ওপরে উঠছে। অনেকক্ষণ পর ও একটা ভগ্ন মন্দির দেখতে পেয়েছিল। বোধহয় দু'তিন হাজার বছরের পুরনো। সেই মন্দিরে ঢোকার সময় গোরা দেখে, দুই সাধু হাতজোড় করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁরা একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'পরম সাধক ছাড়া এই মন্দিরে কেউ আসতে পারেন না। এই মন্দিরের কথা কাউকে তুই বলবি না। বললে, ফের অসুস্থ হয়ে পড়বি। কথাটা মনে থাকে যেন।'

প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। সাধক কথাটার মানে তখন গোরা বুঝতে পারেনি। পরে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল। স্বপ্নের কথা জেনে, মা ওর মুখ চেপে ধরে, সভয়ে বলেছিল, 'থাক বাবা, থাক। এ কথা তুই আর কাউকে বলিস না। সাধুদের নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। কাল লিঙ্গরাজ মন্দিরে গিয়ে, তোর নাম করে আমি পুজো দিয়ে আসব।'

সেই সময় সাংসারিক কোনও সমস্যায় পড়লেই মা দৌড়ত ওই লিঙ্গরাজ মন্দিরে। এতদিন কেটে গেছে, তবুও স্বপ্নে দেখা মন্দিরটার কথা হুবহু গোরার মনে আছে। শরীর বিগড়োলেই ওই মন্দিরটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেন জানে না, মাঝে মাঝে গোরার মনে হয়, একদিন-না-একদিন ফের ওই মন্দির থেকে ওর ডাক আসবে। আসবেই।

দরজায় খুট করে শব্দ। মুকুন্দ বোধহয় ফিরল। ওর কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ঘরে আলো জ্বলে ওঠার পর গোরা দেখল, মুকুন্দই। ওকে শুয়ে থাকতে দেখে, মুকুন্দ বিছানার একটু দূর থেকেই অপরাধী গলায় বলল, 'আপনার কী হয়েছে গোরাভাই?'

উত্তরটা না দিয়ে রুক্ষ মেজাজে গোরা জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে মুকুন্দ?'

'সিনেমা দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। সরি।'

'তোর বাবা তোকে এখানে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছে, না পড়াশুনো করতে?'

একটু চুপ করে থেকে মুকুন্দ মুখ নিচু করে বলল, 'কলেজের সবাই সিটি সেন্টারে যাচ্ছিল, আমাকে জোর করে নিয়ে গেল। আর কোনওদিন যাব না গোরাদা। আই প্রমিস।'

তিলজলার বস্তির সেই দলিত মেয়েটার মুখ হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার ওপর জ্বরের ঘোর। রাগে গোরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কালই জিনিসপত্র নিয়ে তুই বেরিয়ে যাবি। তোকে আর আমি এখানে রাখব না। কথাটা তোর বাবাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ভেবেছিলাম, দলিত সমাজের জন্য তুই কিছু করবি। এখন দেখছি, পাঁকেই পড়ে থাকবি। যা, দূর হ, আমাকে আর বিরক্ত করিস না।'

পাঁচ

বেহালার এই বাড়িতে জয়দেব ছাড়া এখন আর কেউ নেই। থাকার মধ্যে এক আছে ওর মা। দিন দশেক আগে মা দেশের বাড়ি ঝাড়গ্রামে গেছে। দেশে ওদের কিছু দোফসলা জমি আছে। মা গেছে বর্গাদারদের কাছ থেকে ফসল বুঝে নিতে। জমিতে যা ধান হয়, তাতে সারাবছর ওদের আর চাল কিনতে হয় না। কাল রাতে মা ফোন করে বলল, এবার আলুর চাষ করাবে। চাষের ব্যাপারে আগ্রহ নেই জয়দেবের। মায়ের ওপরই ওসব ছেড়ে দিয়েছে। মা না থাকায়, এই কটা দিন ও নিজের ইচ্ছেমতো চলছে। কানের কাছে কেউ এখন আর বলার নেই, 'বিয়েটা এই বেলা সেরে ফ্যাল বাবা।'

গবেষণার কাজ শেষ না-করা পর্যন্ত বিয়ে করার ইচ্ছে জয়দেবের। মাকে সেকথা বলেওছে। কিন্তু মা ইদানীং একটু অবুঝ হয়ে গেছে। প্রায়দিনই কোনও-না-কোনও মেয়ের ছবি এনে দেখিয়ে বলে, 'দ্যাখ তো বাবা, এই মেয়েটাকে পছন্দ হয় কি না?' রোজই জয়দেব না করে দেয়।

বাড়িতে মা না থাকলে জয়দেব নিজেই ব্রেকফাস্ট তৈরি করে নেয়। সেই সময় ওর টিভিতে খবর শোনার অভ্যেস। সারাদিন টিভি দেখার আর সুযোগ পায় না। পরে টিভির সাউন্ড কমিয়ে দিয়ে পরে, চট করে ও খবরের কাগজেও তখন চোখ বুলিয়ে নেয়। আজ কাগজের বদলে সুশোভনদার প্যাকেটটা নিয়ে বসল জয়দেব। কাল দোকানে বসে সুশোভনদার চিঠিটা পড়ার সময় পায়নি। ছবি আর লেখাটা দ্রুত ও প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে তার আগে ছবি ও লেখাটার একটা কপি জেরক্স করে রেখেছিল। আজ সোফায় বসে ও চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল।

'ভাই জয়দেব,

আজ বিকেলে তোমাকে মিউজিয়ামের গেটে আসতে বললাম। অথচ তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। এই কারণে প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বাধ্য হয়েই আমাকে এটা করতে হল। মিউজিয়ামের কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই একটা দুষ্টচক্র আমার ওপরে নজর রাখছে। আমি কার সঙ্গে দেখা করছি, কে আমার সঙ্গে দেখা করছে, সব তাদের নখদর্পণে। তোমার সঙ্গে যে আমার একটা ভালো সম্পর্ক আছে, তা ওই দুষ্টচক্রের লোকেরা জানে। আজ মিউজিয়ামে এসে টের পেলাম, তোমাকে যে আমি বেলা তিনটের সময় আসতে বলেছি, সেটা এরা জেনে গেছে। কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছিল, তোমাকে যদি আমি ভেতরে নিয়ে আসতাম, তাহলে এরা তোমাকে বিপদে ফেলত। প্যাকেটের ভেতর যে ছবিটা পাঠাচ্ছি, সেটা তোমাকে দিলে, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার সময় এরা গেটে তোমাকে আটকে দিত। এবং সেইসঙ্গে জাদুঘরের অমূল্য জিনিস পাচারের অভিযোগে পুলিশ তোমাকে থানায় টেনে নিয়ে যেত। বিনা দোষে তোমার খুব বদনাম হয়ে যেত।'

এই পর্যন্ত পড়ে জয়দেব প্যাকেট থেকে ছবির জেরক্স কপিটা বের করে আনল। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার পর ও বুঝতে পারল, এটা অরিজিনাল ছবির ফোটো কপি। কিন্তু এত ভালো কপি, যে ছাপাতে কোনও অসুবিধে হবে না। ছবিতে কোনওরকম গ্রেন আসবে না। সুশোভনদা কাগজে নিয়মিত লেখা দেন বলেই, এত ভালোভাবেই ছবিটা কপি করে পাঠিয়েছেন। ছবির বিষয়বস্তু হল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের সামনে হাতজোড় করে বসে আছেন রাজবেশে একজন। ইনি নিশ্চয়ই গজপতি রাজা প্রতাপ রুদ্র। মহাপ্রভুর আশপাশে তাঁর কয়েকজন শিষ্য বসে। ছবিটা রঙিন। প্রায় পাঁচশো বছর আগে আঁকা। তাও বিবর্ণ হয়নি দেখে, জয়দেব একটু অবাকই হল। ও ফের চিঠি পড়ায় মন দিল।

'জয়দেব, প্যাকেটের ভেতর পাঠানো এই ছবিটি আমি উদ্ধার করেছি মিউজিয়ামের স্টোর রুম থেকে। অনাদরে পড়েছিল একটা কাঠের বাক্সের ভেতরে। এই কারণেই ছবিটা নষ্ট হয়নি। একেবারে অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। কারা এই ছবিটাকে মিউজিয়ামে দিয়ে গেছিল, কবে দিয়ে গিয়েছিল, সেই তথ্যটা অনেক কষ্টে আমি উদ্ধার করেছি। পরে জানতে পারলাম, ছবিটা ক্যাপ্টেন রবার্ট কুক নামে এক ইংরেজের হেফাজতে ছিল। ১৮৯৬ সালে তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার সময় ছবিটি মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেন। তৎকালীন কর্তারা এই ছবিটির ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মিউজিয়ামেও তখন চিত্র প্রদর্শনের কোনও গ্যালারি ছিল না। সেই থেকে ছবিটা বাক্সবন্দি হয়েই ছিল।'

'জাদুঘরের পুরনো নথি থেকে জানতে পারলাম, অনুরূপ বিষয় নিয়ে আঁকা আর একটা ছবি ওড়িশার রাজাদের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে পেয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদৌল্লার পার্ষদ জগৎশেঠ। সেটি জগৎশেঠের বংশধররা এখন কোনও ব্যাঙ্কের লকারে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মপঞ্চশতবার্ষিকীতে সেই ছবিটির দাম উঠেছিল এক কোটি টাকা। ছবিটার এত দাম ওঠার কারণও আছে। কেননা, মহাপ্রভুর জীবিত অবস্থায় তাঁকে দেখে আঁকা, ওটাই প্রথম ছবি। সুখের কথা, জগৎশেঠের উত্তরাধিকারীরা প্রলোভনে পা দেননি। ছবিটা তাঁরা বিক্রি করেননি।'

'ভাই জয়দেব, তুমি মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে গবেষণা করছ বলেই, আমি নিশ্চিত, ছবিটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ। মহাপ্রভুর যেদিন মৃত্যু হয়, এই ছবিটি তার দু'তিন দিন আগে আঁকা। ভালো করে লক্ষ করলেই তুমি দেখতে পাবে, শায়িত মহাপ্রভুর পায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই ছবিটি এঁকেছিলেন? মোগল আমলে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকানোর চল ছিল না। মানে...জীবিত অবস্থায় শিল্পীদের দিয়ে নিজের ছবি আঁকানোর কথা কেউ ভাবতেনই না। ছবি আঁকানোর বিলাস ছিল রাজা আর জমিদারদের মধ্যেই। তাহলে মহাপ্রভুর এই ছবিটি আঁকার দায়িত্ব কে দিলেন ওই শিল্পীকে? প্রশ্নটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। সেই সময় যবন...অর্থাৎ মুসলিম শিল্পীরাই ধনী ব্যক্তিদের ছবি আঁকার আমন্ত্রণ পেতেন। তাহলে কি মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কোনও

যবন শিল্পী ছিলেন? যতদূর জানি, জীবনের শেষ দিকে, মহাপ্রভুকে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর পঞ্চসখা। এঁদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন গৌড়ের, বাকিরা সবাই ওড়িশার। এঁদের মধ্যে কেউই যবন ছিলেন না। তাহলে?'

চিঠি থেকে মুখ তুলে জয়দেব এবার গভীর চিন্তায় ডুব দিল। মহাপ্রভুর জীবনের শেষ দিকে তাঁর কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিয়ে ও গবেষণা করেছে। যবন হরিদাসের কথাও ও জানে। কিন্তু তিনি শিল্পী ছিলেন না। ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। এবং বোঝার চেষ্টা করল, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কোনও সূত্র ছবিতে লুকিয়ে আছে কি না। হঠাৎ জয়দেবের মনে হল, রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু রাস্তায় ইঁটের টুকরোর আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এটা জানতে পেরেই সম্ভবত রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে একা দেখা করতে এসেছিলেন। ওই সময় তিনি পুরীতেই ছিলেন। সুশোভনদা লিখেছেন, জগৎশেঠের বংশধরদের জিম্মায় যে ছবিটি আছে, সেই ছবিটা শিল্পীর আঁকা প্রথম ছবি। তাহলে কি এটা দ্বিতীয় ছবি? নাকি দুটো ছবি হুবহু এক? প্রথম ছবিটা নিশ্চয়ই ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। জয়দেব ঠিক করে রাখল, পরে ওই ছবিটা দেখে নেবে। মনটাকে সরিয়ে এনে ফের ও চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

সুশোভনদা লিখেছেন, 'প্রশ্নটা আমাকে তাড়া করে বেরাচ্ছিল। কিন্তু উত্তরটা আমি খুঁজে পাইনি। কী মনে হল, ছবিটা দশগুণ ব্লো আপ করে পর্দায় ফেললাম। তন্নতন্ন করে খোঁজার পরই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। শিল্পীর নাম এক কোণে লেখা ছিল। গোকুলানন্দ দাস। এত ছোটো অক্ষরে লেখা, সাদা চোখে দেখা সম্ভবই নয়। এটা নিশ্চয়ই শিল্পীর সন্ন্যাসোত্তর জীবনের নাম। হয়তো শিল্পী চাননি, তাঁর নামটা কেউ জানুক। কারণটা তুমি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ। আসল নামটা জানালে তিনি ক্ষমতাশালী অনেকের রোষে পড়তেন। তা সত্ত্বেও, আরেকটা ক্লু তোমাকে দিই। এই গোকুলানন্দ দাস পরপর চারটে ছবি এঁকেছিলেন। দুটো ছবি মহাপ্রভুর জীবিত অবস্থায়। বাকি দুটো তার পরে। আমার মনে হয় ওই শেষ দুটো ছবি পাওয়া গেলে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। তুমি হয়তো জানতে চাইবে, বাকি দুটি ছবির হদিশ আমি কী করে পেলাম? তার কারণ হচ্ছে, তোমার কাছে যে ছবির কপিটি পাঠাচ্ছি, তাতে লেখা আছে গোকুলানন্দ দাস ২-৪। অর্থাৎ চারটে ছবির সিরিজে এটি দ্বিতীয় ছবি।'

'ভুবনেশ্বরে আমার খুব বিশ্বস্ত এক বন্ধু আছেন। তিনি কলা গবেষক। নাম নরহরি মহাপাত্র। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তাঁকে আমি মেল করি। দেখলাম, জগৎশেঠের হেফাজতে থাকা ছবিটার ইতিহাস উনি জানেন। উনি লিখেছেন, 'আপনার ধারণাই ঠিক। গোকুলানন্দ দাসের আসল নাম জামিল ফেরদৌস। তিনি মোগল দরবারের একজন নামী চিত্রকর ছিলেন। দেশভ্রমণ করতে করতে একবার তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান। সেখানে মহাপ্রভুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। দিল্লিতে ফিরে না গিয়ে ফেরদৌস শ্রীক্ষেত্রেই থেকে যান। এবং ধর্মান্তরিত হয়ে বসবাস করতে থাকেন সেখানে। ফেরদৌস ছিলেন বলশালী ব্যক্তি। ফলে তিনি মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠদের একজন হয়ে যান। তিনি যে চিত্রকর, একটা সময় এটা জানতে

পারেন মহাপ্রভুর শিষ্যরা। তাদের প্রেরণাতেই প্রথম দুটি ছবি ফেরদৌস আঁকেন।'

'মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর থেকে গোকুলানন্দের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, তিনি সেই রাতেই গোপনে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে বাকি দুটি ছবি আঁকেন। এই দুটি ছবির কথা জানা যায়, মহাপ্রভুর গৌড়ীয় শিষ্যদের কাছে। কারণ ছবি দুটি নাকি মহাপ্রভুর হত্যাকাণ্ডের প্রামাণ্য দলিল। এবং সযত্নে রাখা ছিল বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে। নরহরি মহাপাত্র লিখেছেন, শেষ দুটি ছবি কোথায় আছে, তা তিনি জানেন। তবে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। জয়দেব, ওই ছবি দুটির টানেই আমি বেরিয়ে পড়েছি। আমি উদ্ধার করবই। আমার বয়স হয়ে গেছে। যে কোনওদিন মারা যেতে পারি। ছবি দুটি উদ্ধার করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাতেও পিছব না। কোথায় যাচ্ছি, তা নিজেও জানি না। যে দুষ্টচক্রের কথা চিঠির গোড়াতে লিখেছি, তারা সম্ভবত আমাকে ফলো করছে। জানি, তোমার কাগজে এই লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর ওরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তা সত্ত্বেও, সুযোগমতো তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব। ভালো থেকো। ইতি, সুশোভনদা।'

চিঠিটা পড়ে জয়দেব অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকগুলো প্রশ্ন ওর মনে একসঙ্গে ভিড় করে এল। ছবিটার কথা কি মিউজিয়ামের আর কেউ জানেন? বাকি দুটো ছবির খোঁজে সুশোভনদা কোথায়ই বা গেলেন? কেন সুশোভনদার পিছনে দুষ্টচক্রটা লেগে রয়েছে? কি তাদের স্বার্থ? জামিল ফেরদৌসের আঁকা ছবিটা নিয়ে যে দিনকালে একটা লেখা বেরুচ্ছে, সেটা কী দুষ্টচক্র জানে? সবশেষে যে প্রশ্নটা জয়দেবকে কুরে কুরে খেতে লাগল, এখন ওর কী করা উচিত? একটা একটা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর ও খুঁজতে লাগল।

ছবিটার কথা মিউজিয়ামের আর কেউ জানেন না, এটা কোনওমতেই হতে পারে না। সুশোভনদা তো আর মিউজিয়ামের স্থায়ী কর্মী নন। উনি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের জন্য সাময়িক দায়িত্ব পেয়েছেন মাত্র। কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে নিশ্চয়ই ওঁকে স্থায়ী কর্মীদের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। সুশোভনদা ছবিটার ফোটো কপি করিয়েছেন, দশগুণ ব্লো আপ করে পর্দায় দেখেছেন, লাইব্রেরিতে গিয়ে খোঁজখবর করেছেন, পুরনো রেজিস্টার বাদি থেকে থাকে, তা দেখেছেন, সর্বোপরি কুরিয়ার সংস্থার লোককে দিয়ে প্যাকেটটা ওর বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কথায় কথায় সুশোভনদা একদিন বলছিলেন, মিউজিয়ামে লিফটম্যান থেকে শুরু করে সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসারদের অনেকেই, এই র‍্যাকেটে শামিল। তাঁদের মধ্যে কারও-না-কারও ছবিটার দিকে নিশ্চয়ই নজর পড়েছে। বিশেষ করে, এই ছবিটার বাজারদরও যেখানে কোটি টাকার কাছাকাছি ওঠা অসম্ভব কিছু নয়।

সুশোভনদা লিখেছেন, জামিল ফেরদৌসের বাকি দুটি ছবির হদিশ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে। সত্যিই কি তাই? এই প্রশ্নটাই বেশি করে জয়দেবের মাথা ঘুরতে লাগল। ওই দুটো ছবিতে কী এমন ক্লু থাকতে পারে? ছবি দুটো কি এখনও বৃন্দাবনেই আছে? সুশোভনদা লিখেছেন, নরহরি মহাপাত্র জানেন, ছবিগুলো কোথায় আছে। তাহলে উনি নরহরি মহাপাত্রের কাছেই গেছেন। অর্থাৎ কি

না ভুবনেশ্বরে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর প্রায় একশো বছর, ওড়িশায় তাঁর সম্প্র
কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এত আতঙ্কিত হয়ে ছিলেন যে, ওড়িশা
সর্বত্র হরিনাম সংকীর্তনও বন্ধ হয়ে গেছিল। চার বছর ধরে গবেষণা করছে বলে, জয়দে
আন্দাজ করতে পারল, জামিল ফেরদৌসের আঁকা শেষ ছবি দুটো ওড়িশারই কোথা
লুকনো আছে। যদি ওই সময় বৃন্দাবন থেকে সরাসরি পাচার হয়ে নবদ্বীপে চলে আসে
তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। নরহরি মহাপাত্রের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করতে পারলে
ভালো হত। কিন্তু সেটা সুশোভনদা আবার পছন্দ করবেন কি না, কে জানে?

সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব কম্পিউটার খুলে নেট সার্চ করতে বসল। উইকিপেডিয়ায় নরহরি
মহাপাত্র নামটা টাইপ করতেই পর্দায় তার সম্পর্কে তথ্যগুলো ফুটে উঠল। মাত্র পাঁচ-ছ
লাইন। যে তথ্যটা উল্লেখ্য, সেটা হল ভদ্রলোকের বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। উনি খো
ভুবনেশ্বরে থাকেন না। ভুবনেশ্বর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে খণ্ডগিরি বলে এক
জায়গায় থাকেন। তবে ওড়িশা সাহিত্য অ্যাকাডেমির সঙ্গে ভদ্রলোকের নিয়মিত যোগাযো
আছে। জয়দেব ঠিক করে নিল, দুপুরে দোকানে গিয়ে ভুবনেশ্বরে ওড়িশা সাহিত্য
অ্যাকাডেমিতে ফোন করে নরহরি মহাপাত্রের বাড়ির ফোন নাম্বারটা চেয়ে নেবে। গবেষণা
কাজ করতে গিয়ে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। উনি নিশ্চয়ই নাম্বারটা দিতে
পারবেন। চিঠি ও লেখার জেরক্স কপি ফাইলবন্দি করে জয়দেব উঠে পড়ল।

টিভিটা বন্ধ করার সময় পর্দায় চোখ পড়তেই ও দেখল, কলকাতার কোথাও আগুন
লেগেছে। সেই ছবি টিভিতে দেখানো হচ্ছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পর্দার তলা
দিকে হঠাৎ ওর চোখ গেল। ব্রেকিং নিউজ, কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশনা সংস্থার দফতরে
আগুন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টায়। পুলিশের ধারণা, শট সার্কিট থেকে
আগুন। লাইনগুলো ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরে যাচ্ছে। জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগল
জয়দেবের। কলেজ স্ট্রিট দেখেই ওর কৌতূহল হল। বইপাড়া ওর হাতের তালুর মতো
চেনা। টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিতেই নিউজ রিডারের গলা পেল ও 'মঙ্গলবার গভীর
রাতে কলেজ স্ট্রিটের সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের এক প্রকাশনা সংস্থার দফতরে হঠাৎ আগুন
লাগে। দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে, বাড়ির মালিক দমকলে খবর
দেন। সঙ্গে সঙ্গে দমকলের দুটি ইঞ্জিন চলে আসে। তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর দমকল কর্মীরা
আগুন আয়ত্তের মধ্যে আনেন। দোকানের আশি শতাংশ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পুলিশের
অনুমান, রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর সম্ভবত দোকানে ইলেকট্রিক তার-এ শর্ট সার্কিট হয়।
তাতেই আগুন লাগে। বাড়ির মালিক অংশুমান গুপ্ত সপরিবারে দোতলা থাকেন। তিনি
জানান, রাত একটা নাগাদ ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন...'

পর্দায় অংশুমানবাবুর মুখটা ভেসে উঠল। তিনি কী বলছেন, জয়দেব শুনতে পেল
না। ধপ করে ও সোফায় বসে পড়ল। শট সার্কিটের জন্য ওর দোকানে আগুন। কী
করে সম্ভব? এই মাস তিনেক আগে নতুন করে ও দোকানে ইলেকট্রিকের তার লাগিয়েছে
সেই তারে শর্ট সার্কিট হবে কী করে? চিন্তা করার শক্তিটাও জয়দেব হারিয়ে ফেলল

টিভির খবরে বলল, দোকানে আগুন লেগেছে, রাত একটায়। এখন সকাল ন'টা বাজে। মাঝে আটটা ঘণ্টা কেটে গেল, টিভির লোকেরা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। আর এই ভয়ানক দুঃসংবাদটা ওকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না অংশুমানবাবু? উনি বাড়ির ফোন নাম্বার জানেন, এমনকী, মোবাইল নম্বরটাও। তাহলে? জয়দেব নিশ্চিত, আগুনটা শর্ট সার্কিট থেকে লাগেনি। এর পিছনে কি অন্য কোনও কারণ আছে? সুশোভনদার পিছনে লেগে থাকা দুষ্টচক্রই কি ওকে ভয় দেখাল?

নাহ্, এখুনি একবার কলেজ স্ট্রিট যাওয়া দরকার। জয়দেব উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই, ওর ল্যান্ডলাইনের ফোনটা বাজতে শুরু করল।

ছয়

সকালবেলায় হোটেলে ফিরে, টিভি চালিয়ে পুরন্দর দেখল, খবরটা দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করে ও জানিয়ে দিল, 'প্রথম কাজটা হয়ে গেছে। কোনও ঝামেলা ফেস করতে হয়নি। এবার আমায় কী করতে হবে?'

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'অন্য কোনও হোটেলে চলে যা। পরিস্থিতিটা কী দাঁড়ায়, ভালো করে অবজার্ভ কর। আজ রাতেই কিন্তু তোকে দু'নম্বর কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'

'খবরটা টিভিতে দেখাচ্ছে।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামাস না। তোর কাজ তুই করে যা।'

'হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিছু টাকা পেলে ভালো হত।'

'দুপুর বারোটার সময় কোলে মার্কেটে যাবি। পোস্টাপিসের সামনে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকবি। যে লোকটা টাকা নিয়ে যাবে, তার হাতে থাকবে গেরুয়া রুমাল। কোড... সোনার গৌরাঙ্গ।'

'ঠিক আছে।'

কথাটা বলেই পুরন্দর লাইন কেটে দিল। প্রয়োজনের বেশি একটা কথা বলার অধিকার ওর নেই। হেড কোয়ার্টার্সে পূজ্জাস্পদরা তাহলে চটে যাবেন। এমনিতে, জিভের আড়ষ্টতার জন্য পরিষ্কারভাবে ও কথা বলতে পারে না। মাঝেমধ্যে ওর কথা আটকে যায়। এই কারণে লজ্জায় পুরন্দর মুখ খোলে খুব কম জায়গায়। কিন্তু সুপুরুষ আর সাহসী বলে ওকেই কঠিন কাজের জন্য সব জায়গায় পাঠানো হয়। পুরন্দরকে পছন্দ করার আরেকটা কারণ, ও ওড়িয়া, হিন্দি আর বাংলা...তিনটে ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে পড়তে পারে। কলকাতায় একটা সময় অনেকদিন কাটিয়েছে। রাস্তাঘাট ভালোমতো চেনে। কাজের সূত্রে, এখনও পুরন্দর কলকাতায় মাসে দু'তিনবার আসেই।

হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে কথা বলেই পুরন্দর মোবাইল সেট থেকে সিমকার্ডটা খুলে

ফেলল। তারপর যত্ন করে অন্য একটা সিমকার্ড লাগিয়ে নিল। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ওকে চারটে সিমকার্ড দেওয়া হয়েছে। বারবার কার্ড পালটে ও ওপরওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। মোবাইল সেট টেবলের ওপর রেখে, জুতো খুলে পুরন্দর সোফায় গা এলিয়ে দিল। রাতে এককোঁটাও ঘুম হয়নি। কাল অনেক রাতে কাজ শেষ করার পর, কলেজ স্ট্রিট থেকে হাঁটতে হাঁটতে ও শেয়ালদা স্টেশনে গেছিল। চায়নি, রাতে হোটেলে ফিরে রিসেপশনিস্টের নজরে পড়ুক। ভোর পর্যন্ত পুরন্দর ঘাপটি মেরে প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে ছিল। ভোরে হোটেলে ফিরেছে এমন ভাব দেখিয়ে, যেন মর্নিং ওয়াক করতে গেছিল।

শেয়ালদার এই হোটেলে দু'দিন ধরে রয়েছে পুরন্দর। তার আগের দু'দিন ও ছিল বাগমারী রোডের এক হোটেলে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ওকে বলেই দেওয়া হয়েছে, কোথাও এক বা দু'দিনের বেশি থাকবে না। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেও এড়িয়ে যাবে। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটা সম্পন্ন করে আসা চাই। পুরন্দর হেড কোয়ার্টার্সের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। এই শহরে পূজ্যাস্পদদের অনেক যজমান। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী। ইচ্ছে করলে, তাঁদেরই কারও বাড়িতে পুরন্দর থাকতে পারে। তাহলে অনেক টাকা বেঁচে যায়। কিন্তু পূজ্যপাদর তা চান না। পুরন্দরের কিছু করার নেই। ওদের নির্দেশ মানতে হবে। ছোটোবেলা থেকে ওকে সেটাই শেখানো হয়েছে।

সোফায় আধশোয়া হয়ে পুরন্দর ভাবতে লাগল, কাল বিকালে মিউজিয়ামের উলটোদিকে, গির্জার গেটে ও যখন দাঁড়িয়েছিল, তখনও ভাবতে পারেনি, প্ল্যান অনুযায়ী কাজটা অত সহজে করতে পারবে। হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, সুশোভন বলে একটা বয়স্ক লোকের পিছু নেওয়ার জন্য ও দাঁড়িয়েছিল। ওকে বলা হয়েছিল, এই সুশোভন বলে লোকটা মিউজিয়ামের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসবে। লোকটা সল্টলেকে থাকে। তার বাড়িটা চিনে রাখতে হবে। তারপর, রাতে সেই বাড়িতে গিয়ে একটা ছবি উদ্ধার করে আনতে হবে। যদি বেগড়বাই করে, তাহলে লোকটাকে খতম করে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল। কিন্তু এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন বয়স্ক লোকটা বেরিয়ে এল না, তখন হঠাৎ ফোন এল, সুশোভন বলে লোকটার পিছু নেওয়ার দরকার নেই। ওর জন্য সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা লোক সদর স্ট্রিটের দিককার গেটের সামনে অপেক্ষা করছে। তার পিছু নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরের চোখ পড়েছিল, সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটার দিকে।

লোকটার নাম যে জয়দেব, পুরন্দর সেটা জানতে পারে অনেক পরে। একটা অল্পবয়সি ছেলে লোকটাকে ডেকেছিল 'জয়দেবদা' বলে। কয়েকটা কথা বলে সেই ছেলেটা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর, হতাশ হয়ে জয়দেব পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করে। তখন পুরন্দর ওর পিছু নেয়। পাতাল রেলে ওরা একই কামরায় ওঠে। এইভাবে ফলো করতে করতে ও যখন কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছয়, তখন হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন আসে, জয়দেব সম্পর্কে খোঁজখবর নাও। বইয়ের দোকানগুলোর কাছেই একটা চায়ের দোকান। সেখানে বসে গল্প করতে করতে, পুরন্দর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জয়দেব সম্পর্কে যা জানার, জেনে নেয়। পরে হেড কোয়ার্টার্সকে সব জানানোর পর, ওঁরা বলেন, লোকটা যাতে ভয় পায়, তার

ব্যবস্থা করো। রাতের বেলায় ওর দোকানে আগুন লাগিয়ে দাও।

একটি মানুষ মেরে ফেলা পুরন্দরের কাছে জলভাতের মতো ব্যাপার। আগুন লাগানো ওর কাছে কোনও কাজই নয়। গত দশ বছরে হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে ও অনেক মানুষকেই মেরেছে। তার জন্য ওর কোনও পাপবোধও নেই। দোকান থেকে জয়দেব বলে লোকটা, দুটো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নেমে গেছিল রাত আটটার সময়। বই পাড়ার ওই গলিটা রাত ন'টার মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছিল। একটা বাড়ির গাড়ি বারান্দায় পুরন্দর ততক্ষণ শুয়েছিল। ওই দোকানটায় আগুন লাগানোর জন্য ওকে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। পুরনো দিনের বাড়ি। ভেন্টিলেশনের জন্য কাচের জানলাটা ও আগে থেকেই দেখে রেখেছিল। জানলা সরিয়ে, বইয়ের গাদায় আগুন লাগাতে ওর হাত এতটুকুও কাঁপেনি। এমন নিঃশব্দে কাজটা ও সেরেছিল, সম্ভবত কেউ টেরও পায়নি।

জয়দেবের অপরাধ কী, পুরন্দর সেটা জানে না। প্রশ্ন করার অধিকারও নেই ওর। কিন্তু এটুকু ও জানে, লোকটা নিশ্চয়ই ওর পূজ্জাস্পদদের অবমাননা করেছে। না হলে ওকে ভয় দেখানোর প্রশ্ন উঠত না। এটা প্রথম অপরাধের শাস্তি। এরপরের শাস্তি মৃত্যু। বিছানায় শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে পুরন্দরের শরীরটা শিথিল হয়ে আসছিল। ঝটকা মেরে ও উঠে বসল। এখন ঘুমিয়ে পড়লে ঘণ্টা চার-পাঁচেকের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। কোলে মার্কেটে যে লোকটা ওকে টাকা দিতে আসবে, সে ফিরে গেলে খুব মুশকিল হবে। তার থেকে ভালো, টাকাটা নিয়ে এসে দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া। প্ল্যান বি-র কাজটা ওকে আজ রাতেই সারতে হবে। দুপুরে টানা বিশ্রাম নিয়ে নিলে, রাতের দিকে ঘুম পাবে না।

তার আগে স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে নেওয়া দরকার। বাথরুমে যাওয়ার জন্য পরনের জামাকাপড় খুলে ফেলল পুরন্দর। তারপর নগ্ন শরীরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোনও একটা কাজ সেরে আসার পর হস্তমৈথুন করা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যেস। বীর্যপাত করার পরই ও নিশ্চিত হয়ে যায়, কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে। নেহাতই কুসংস্কার। আর এরকম বহু কুসংস্কার নিয়ে শিশু বয়স থেকে ও বেড়ে উঠেছে, পুরীর মন্দির সংলগ্ন এক কর্মীর আশ্রমে, কঠিন অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে। কৈশোরেই ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল, নারীসম্ভোগ করার জন্য ওর জন্ম হয়নি। দেবসেবার জন্য ওর জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে। কোনও নারীর সঙ্গে যদি কোনওদিন ও সহবাস করে, তাহলে ওর ভয়ঙ্কর চর্মরোগ হবে। দেবতার রোষে সেই চর্মরোগ কোনওদিনই সারবে না। সারা শরীরে ক্ষত, আমৃত্যু ওকে বয়ে বেরাতে হবে। ওই আশ্রমেরই ওপরতলায় তালিম দেওয়া হত, দেবদাসীদের। চোখের সামনে অসামান্যা সুন্দরী নর্তকীরা ঘুরে বেড়াত। তাদেরই একজন অম্বালিকাকে দেখে পুরন্দরের তীব্র কামচিন্তা হত। কিন্তু বহুবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে স্পর্শ করার দুঃসাহস কখনো হয়নি পুরন্দরের।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই নিজের লিঙ্গটা নিয়ে খেলা করতে লাগল পুরন্দর। স্নানসিক্ত অম্বালিকার নগ্ন দেহটা ও চিন্তা করতে লাগল। পাকা ডালিমের মতো ঠোঁটে ও চুম্বন

করতে থাকল। গাঢ় চুম্বন কামনায় ওর নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। কল্পনায় চুম্বন করতে করতে মুখটা ও নামিয়ে আনল অম্বালিকার স্তন পর্যন্ত। সুডৌল স্তন দুটির কথা ভাবলেই পুরন্দরের যৌন ইচ্ছা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। স্তনে কিছু সময় হাত বোলানোর পর, অম্বালিকার ঈষৎ বাদামি স্তনবৃন্ত দুটি, মনে মনে চুষতে লাগল পুরন্দর। কিন্তু আশ্চর্য, অন্যদিন ওর লিঙ্গ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আজ তা হল না। অম্বালিকার সরু কোমরটা ধরে, মনে মনে ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল পুরন্দর। কিন্তু অনুভব করল, লিঙ্গে কোনও উত্তেজনাই টের পাচ্ছে না। হতাশ হয়ে ও বিছানায় বসে পড়ল।

তাহলে, কাজে কি কোনও গাফিলতি হল? দেবতা কি রুষ্ট হলেন?

কিন্তু ওর মতো পুরুষেরা চট করে হাল ছেড়ে দেয় না। মিনিট কয়েক পরেই পুরন্দর ফের উঠে দাঁড়াল। ও তো আর পাঁচটা সাংসারিক পুরুষের মতো নয়। কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি। ওয়ারড্রোব থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে, তাই বাথরুমে ঢুকে পড়ল পুরন্দর। প্রায় তিন মাস হল, ও আশ্রমের বাইরে। কাজ উপলক্ষেই প্রায় একমাস ও ছিল মায়াপুরের এক মন্দিরে। সেখানকার গেস্ট হাউসে হঠাৎই ভুল করে অন্য এক অতিথির ঘরে ও ঢুকে পড়েছিল। তখনই ও এক বিদেশি নারীর নগ্ন শরীর দেখে। সেই নারী সঙ্গম করছিল এক স্থানীয় পুরুষের সঙ্গে। বিদেশিনীর পা দুটি সেই সময় পুরুষের কাঁধের ওপর বেড় দেওয়া। তার শিৎকার ধ্বনি, রতিতৃপ্তির চূড়ান্ত মুহূর্তটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল পুরন্দর। ওরা টেরও পায়নিও, একজন বহিরাগত ওদের সঙ্গম দেখছে।

নিঃশব্দে পুরন্দর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। জীবনে সেই প্রথম ওরও ইচ্ছে হয়েছিল, নারীসঙ্গম করার। কিন্তু নিজেকে ও নিবৃত্ত করে, ঘরে ফিরে হস্তমৈথুন মারফত ও শরীরের উত্তেজনা কমায়। হয়তো নারীসঙ্গমের সেই ইচ্ছেটাই ওর অবচেতন মনে লুকিয়ে রয়েছে। নারীর তপ্ত শরীর না পেলে ওর লিঙ্গ দৃঢ় হবে না। হয়তো সেই কারণেই মনোসংযোগে সাময়িক বিচ্যুতি ঘটছে। কথাটা মনে হওয়ার পরই নিশ্চিন্তে পুরন্দর শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল।

হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, আজ রাতে ওকে যেতে হবে উলটোডাঙার এক ছাপাখানায়। প্রভাবতী প্রিন্টিং হাউসে। ওখান থেকে একটা ছবি ওকে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। ছবিটা ছাপার জন্য ওই প্রেসে পাঠিয়েছে জয়দেব নামে লোকটা। পূজ্জাস্পদ পদ্মনাভ ফোন করে সকালে পুরন্দরকে বলেছেন, ছবিটা চৈতন্যদেবের। ওটা উদ্ধার করতে না পারলে, সমূহ বিপদ। ছোটোবেলা থেকে এই লোকটাকেই ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে ওদের। বলা হয়েছে, গৌড় থেকে আসা শ্রীচৈতন্য নামে এই লোকটা উৎকল সমাজকে একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সকাল সন্ধ্যা হরিনাম করতে বলে, একটা বীর জাতির সর্বনাশ করেছে। এই লোকটার জন্যই একটা সময় কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। তার ভক্ত আর অনুগামীদের বিনাশ করাই পুরন্দরদের একমাত্র কাজ। এই লক্ষ্যে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মতো আরও তেষট্টি জন। ওরা অবশ্য কেউ কাউকে চেনে না।

বাথরুম থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই দরজায় টকটক শব্দ। হোটেলে কেউ ওকে বিরক্ত করুক, পুরন্দর তা চায় না। হোটেলে ঘরে ঢোকার আগে, বাইরে 'ডু নট ডিসটার্ব' লেখাটা ঝুলিয়ে দেয়। এই সময়টায় তো কারও আসার কথা নয়। কোনওরকমে পুরন্দর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। দরজা খুলে ও দেখল, পুলিশ। সঙ্গে হোটেলের রিসেপশনিস্ট। পুরন্দর অবাক হলেও, মুখে তা প্রকাশ করল না। উলটে, বিরক্তির সুরেই জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

রিসেপশনিস্ট ছেলেটি বলল, 'স্যার রুটিন চেকিং। কলকাতায় জঙ্গি হানা হতে পারে। তাই মুচিপাড়া থানা থেকে ইনি এসেছেন। বাইরে থেকে আসা গেস্টদের সঙ্গে হোটেলে কথা বলতে।'

তাহলে আগুন লাগার তদন্তে আসেনি। এটা জেনে পুরন্দর হালকা বোধ করল। তারপর বলল, 'ঘরের ভেতরে আসবেন, না কি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'চলুন, ঘরে বসেই কথা বলা যাক।'

ঘরে ঢুকে পুরন্দর বলল, 'কাল রাতে একদম ঘুমোতে পারিনি। এখানে এত মশা, জানতাম না।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'তাই নাকি? টানটান বিছানা দেখে তো মনে হচ্ছে না, আপনি শুয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল পুরন্দর। লোকটাকে দরজা থেকে বিদায় করে দিলেই ভালো হত। কিন্তু কথায় ওর সঙ্গে পারা মুশকিল। পুরন্দর সেভাবেই নিজেকে তৈরি করেছে। ও চট করে বলল, 'আমার কোমরে একটা ব্যথা আছে। নরম গদিতে শোয়া বারণ। তাই কাল মেঝেতে শুয়েছিলাম।'

'আপনার নাম?'

হোটেলে হোটেলে ওকে নাম বদলাতে হয়। এই হোটেলে ও কী নাম দিয়েছে, সেটা মনে করার জন্য দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল পুরন্দর। সোফায় জায়গা করে দেওয়ার জন্য ও ব্যাগটা সরিয়ে নেওয়ার অজুহাতে। তখনই ওর মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'মৃদুল ত্রিপাঠী। গাজিয়াবাদ থেকে এসেছি। বৈশালী এরিয়ায় থাকি।' বৈশালী নামটাই পুরন্দরের মনে পড়ল। কেননা, একবার ওখানে ও গিয়েছিল।

'আই সি। আপনি ইউ পি-র লোক, অথচ এত ভালো বাংলা বলছেন কী করে?'

মুখটা হাসিতে ভরিয়ে পুরন্দর বলল, 'বলতে পারব না কেন? আমার মা যে বাঙালি। তা ছাড়া, আমার বাবা জন্মেজয় ত্রিপাঠী কলকাতায় বহুদিন চাকরি করে গেছেন।'

'আপনি কী করেন?'

'ব্যবসা। তবে এবার ব্যবসার কাজে আসিনি। আমার এক মাসতুতো বোন বাড়ির অমতে একটা ছেলের সঙ্গে এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ফেরত নিয়ে যাব। নীচু জাতের ছেলে। বুঝতেই পারছেন, বাড়ির অমত কেন? আমাদের ওখানে জাতপাতের ব্যাপারটা খুব বেশি। এটা আপনারাও নিশ্চয় জানেন।'

'আপনার মাসতুতো বোন এখানে কোথায় আছেন, জানেন?'

'ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, কাঁকুড়গাছিতে ছেলেটার এক আত্মীয় থাকে। সে উঠতে পারে।'

• 'মি. ত্রিপাঠী, কতদিন থাকবেন এখানে?'

'দু'তিনদিন তো বটেই। তেমন পরিস্থিতি হলে আরও কয়েকদিন থাকতে হতে পা

'আপনার সঙ্গে কি আর কেউ এসেছেন? কোনও মহিলা?'

'না। কেন বলুন তো?'

'না, বিছানার ওপর বেগুনি রঙের সিল্কের একটা কাপড় দেখছি, তাই জানতে চাইল

'ওহ, ওই পট্টবস্ত্রের কথা বলছেন? এখনই স্নান সেরে পুজোয় বসব।'

পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়লেন, 'ও কে মি. ত্রিপাঠী। এখন চলি। মাসতুতো বো ব্যাপারে...যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিতে পা তবে মেয়েটি সাবালিকা হলে, আমাদের কিছু করার নেই।'

পুলিশ অফিসারটি চলে যাওয়ার পর পুরন্দর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু সেই মুহূ সিদ্ধান্ত নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এক মিথ্যে কথা বলেছে। পুলিশ যদি মনে করে, ওকে ধরে ফেলতে পারে। গাজিয়াবাদ পুলি ফোন করে ওর প্রতিটি কথা ভেরিফাই করতে পারে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পু বেগুনি পট্টবস্ত্রটা পরে নিল। এইবার প্রভু জগন্নাথের পুজোয় বসবে। ঠিক তখনই ডোরবেলের শব্দ। পুজোয় বারবার বাধা পড়ছে। বিরক্তিতে ওর মন ভরে গেল। দ খুলে পুরন্দর দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক হিজড়ে!

সাত

ইউনিভার্সিটির চার তলা থেকে গোরা নিচের দিকে নেমে আসছিল। দোতলায় সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিপ্লবের। বাঁদিকের করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে। রামপন্থী ইউনিয়নের নেতা। ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্নদের মধ্যে একজন। প্রায় ছ'ফুটের ল লম্বা, সুদর্শন। ওর এক ক্লাস সিনিয়র। ওকে দেখেই বিপ্লব হাসিমুখে বলল, 'হনহ যাচ্ছ কোথায় গোরা? তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না।'

গোরা বলল, 'কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আছি ভাই। কিছু বলবে?'

'এতবড়ো একটা খবর তুমি চেপে গেলে?'

গোরা বুঝতে পারল না, বিপ্লব কী বলছে। দু'তিনদিন আগে ওকে সর্বভারতীয় দ পার্টির যুব দলের প্রধান সম্পাদক করা হয়েছে। এই খবরটা অবশ্য বিপ্লবের জানার নয়। দলিত পার্টি এখনও এমন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি যে, তার সংগঠ কোথায় কী বদল হচ্ছে, তা নিয়ে বিপ্লবের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকবে। ও তাই বলল, ' খবরের কথা বলছ বিপ্লব?'

'আরে, তোমার সিনেমার নামার খবরটা। কয়েকটা কাগজে পড়লাম, তুমি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করছ?'

সেই ফোটোগ্রাফারের কীর্তি। দিনকয়েক আগে তাঁর সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর দেবাংশু ব্যানার্জি। উনি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর ছবি করছেন ইংরেজি ভাষায়। ভদ্রলোক এমন অদ্ভুত, বললেন, 'আপনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের চেহারায় খুব মিল আছে। প্লিজ আপনি ছবিটা করুন।' শুনে গোরার হাসি পেয়েছিল। ও তখন সরাসরি না করে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক প্রায়দিনই ফোন করে যাচ্ছেন। ইদানীং গোরা ফোনও ধরে না। অথচ খবরটা কাগজে বেরিয়ে গেল? শুনে গোরা হাসল, 'কাগজগুলোও আজকাল তেমন হয়েছে। ভুলভাল খবর সব দিচ্ছে। না ভাই, তেমন কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

জরিপ করার ভঙ্গিতে বিপ্লব ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

গোরা বলল, 'তেমন কিছু নয়। কেন বলো তো?'

'তোমার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

'চলো, কিন্তু যাবে কোথায়? আমি কিন্তু কফি হাউসে যাব না। কফির গন্ধটা আমার সহ্য হয় না।'

'না, না। ওখানে নয়। অন্য জায়গায় চলো। এই...খুব কাছেই।'

কথাটা শুনেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল গোরা। নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। সবাই একবার করে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে। এটা লক্ষ করে গোরা খুব মজা পেল। সিনেমার এক হবু আর্টিস্টকে ওরা দেখছে। গোরা ভেবে রাখল, বাড়ি যাওয়ার সময় রাসবিহারীর মোড়ে বইয়ের স্টল-এ ও দেখে নেবে, কাগজে ওর কী ছবি বেরিয়েছে।

একতলায় নেমে পিছনে তাকিয়ে গোরা দেখল, বিপ্লব নেই। হয়তো নামার সিঁড়িতে কেউ ওকে আটকেছে। কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কী বলার জন্য বিপ্লব ওকে ডাকল, তা নিয়ে গোরা ভাবতে লাগল। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিপ্লব বেশ জনপ্রিয় ছেলে। ছাত্রদের কাছে তো বটেই, শিক্ষকরাও ওকে খুব পছন্দ করেন। গোরা শুনেছে, ওর বাবা সুধাময় ব্যানার্জি রাজনীতি করেন। বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের কাছের মানুষ। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের মধ্যে ঠাটবাট নেই। ইউনিভার্সিটিতে ও আসে পাতাল রেলে। ভালো সম্পর্ক রাখে অন্য ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গেও। বিপ্লব অনেক চেষ্টা করছিল, গোরাকে ওদের ইউনিয়নে টানার। কিন্তু বারবার গোরা এড়িয়ে গেছে। মার্কসীয় দর্শনে ও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতিতে ও বিশ্বাস করে না। আর মাসছয়েক পর বিপ্লব ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই কারণে বোধহয় অনুরোধ করবে, ওদের ইউনিয়নের হাল ধরার। উত্তরটা কী দেবে, গোরা ভেবে রাখল।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে দুজনে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। একে মারাত্মক

করতে থাকল। গাঢ় চুম্বন কামনায় ওর নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। কল্পনায় চুম্বন করতে করতে মুখটা ও নামিয়ে আনল অম্বালিকার স্তন পর্যন্ত। সুডৌল স্তন দুটির কথা ভাবলেই পুরন্দরের যৌন ইচ্ছা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। স্তনে কিছু সময় হাত বোলানোর পর, অম্বালিকার ঈষৎ বাদামি স্তনবৃন্ত দুটি, মনে মনে চুষতে লাগল পুরন্দর। কিন্তু আশ্চর্য, অন্যদিন ওর লিঙ্গ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আজ তা হল না। অম্বালিকার সরু কোমরটা ধরে, মনে মনে ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল পুরন্দর। কিন্তু অনুভব করল, লিঙ্গে কোনও উত্তেজনাই টের পাচ্ছে না। হতাশ হয়ে ও বিছানায় বসে পড়ল।

তাহলে, কাজে কি কোনও গাফিলতি হল? দেবতা কি রুষ্ট হলেন?

কিন্তু ওর মতো পুরুষেরা চট করে হাল ছেড়ে দেয় না। মিনিট কয়েক পরেই পুরন্দর ফের উঠে দাঁড়াল। ও তো আর পাঁচটা সাংসারিক পুরুষের মতো নয়। কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি। ওয়ারড্রোব থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে, তাই বাথরুমে ঢুকে পড়ল পুরন্দর। প্রায় তিন মাস হল, ও আশ্রমের বাইরে। কাজ উপলক্ষেই প্রায় একমাস ও ছিল মায়াপুরের এক মন্দিরে। সেখানকার গেস্ট হাউসে হঠাৎই ভুল করে অন্য এক অতিথির ঘরে ও ঢুকে পড়েছিল। তখনই ও এক বিদেশি নারীর নগ্ন শরীর দেখে। সেই নারী সঙ্গম করছিল এক স্থানীয় পুরুষের সঙ্গে। বিদেশিনীর পা দুটি সেই সময় পুরুষের কাঁধের ওপর বেড় দেওয়া। তার শিৎকার ধ্বনি, রতিতৃপ্তির চূড়ান্ত মুহূর্তটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল পুরন্দর। ওরা টেরও পায়নিও, একজন বহিরাগত ওদের সঙ্গম দেখছে।

নিঃশব্দে পুরন্দর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। জীবনে সেই প্রথম ওরও ইচ্ছে হয়েছিল, নারীসঙ্গম করার। কিন্তু নিজেকে ও নিবৃত্ত করে, ঘরে ফিরে হস্তমৈথুন মারফত ও শরীরের উত্তেজনা কমায়। হয়তো নারীসঙ্গমের সেই ইচ্ছেটাই ওর অবচেতন মনে লুকিয়ে রয়েছে। নারীর তপ্ত শরীর না পেলে ওর লিঙ্গ দৃঢ় হবে না। হয়তো সেই কারণেই মনোসংযোগে সাময়িক বিচ্যুতি ঘটছে। কথাটা মনে হওয়ার পরই নিশ্চিন্তে পুরন্দর শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল।

হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, আজ রাতে ওকে যেতে হবে উলটোডাঙার এক ছাপাখানায়। প্রভাবতী প্রিন্টিং হাউসে। ওখান থেকে একটা ছবি ওকে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। ছবিটা ছাপার জন্য ওই প্রেসে পাঠিয়েছে জয়দেব নামে লোকটা। পূজ্যাস্পদ পদ্মনাভ ফোন করে সকালে পুরন্দরকে বলেছেন, ছবিটা চৈতন্যদেবের। ওটা উদ্ধার করতে না পারলে, সমূহ বিপদ। ছোটোবেলা থেকে এই লোকটাকেই ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে ওদের। বলা হয়েছে, গৌড় থেকে আসা শ্রীচৈতন্য নামে এই লোকটা উৎকল সমাজকে একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সকাল সন্ধ্যা হরিনাম করতে বলে, একটা বীর জাতির সর্বনাশ করেছে। এই লোকটার জন্যই একটা সময় কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। তার ভক্ত আর অনুগামীদের বিনাশ করাই পুরন্দরদের একমাত্র কাজ। এই লক্ষ্যে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মতো আরও তেষট্টি জন। ওরা অবশ্য কেউ কাউকে চেনে না।

বাথরুম থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই দরজায় টকটক শব্দ। হোটেলে কেউ ওকে বিরক্ত করুক, পুরন্দর তা চায় না। হোটেলে ঘরে ঢোকার আগে, বাইরে 'ডু নট ডিসটার্ব' লেখাটা ঝুলিয়ে দেয়। এই সময়টায় তো কারও আসার কথা নয়। কোনওরকমে পুরন্দর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। দরজা খুলে ও দেখল, পুলিশ। সঙ্গে হোটেলের রিসেপশনিস্ট। পুরন্দর অবাক হলেও, মুখে তা প্রকাশ করল না। উলটে, বিরক্তির সুরেই জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

রিসেপশনিস্ট ছেলেটি বলল, 'স্যার রুটিন চেকিং। কলকাতায় জঙ্গি হানা হতে পারে। তাই মুচিপাড়া থানা থেকে ইনি এসেছেন। বাইরে থেকে আসা গেস্টদের সঙ্গে হোটেলে কথা বলতে।'

তাহলে আগুন লাগার তদন্তে আসেনি। এটা জেনে পুরন্দর হালকা বোধ করল। তারপর বলল, 'ঘরের ভেতরে আসবেন, না কি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'চলুন, ঘরে বসেই কথা বলা যাক।'

ঘরে ঢুকে পুরন্দর বলল, 'কাল রাতে একদম ঘুমোতে পারিনি। এখানে এত মশা, জানতাম না।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'তাই নাকি? টানটান বিছানা দেখে তো মনে হচ্ছে না, আপনি শুয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল পুরন্দর। লোকটাকে দরজা থেকে বিদায় করে দিলেই ভালো হত। কিন্তু কথায় ওর সঙ্গে পারা মুশকিল। পুরন্দর সেভাবেই নিজেকে তৈরি করেছে। ও চট করে বলল, 'আমার কোমরে একটা ব্যথা আছে। নরম গদিতে শোয়া বারণ। তাই কাল মেঝেতে শুয়েছিলাম।'

'আপনার নাম?'

হোটেলে হোটেলে ওকে নাম বদলাতে হয়। এই হোটেলে ও কী নাম দিয়েছে, সেটা মনে করার জন্য দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল পুরন্দর। সোফায় জায়গা করে দেওয়ার জন্য কিট ব্যাগটা সরিয়ে নেওয়ার অজুহাতে। তখনই ওর মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'মৃদুল ত্রিপাঠী। গাজিয়াবাদ থেকে এসেছি। বৈশালী এরিয়ায় থাকি।' বৈশালী নামটাই পুরন্দরের মনে পড়ল। কেননা, একবার ওখানে ও গিয়েছিল।

'আই সি। আপনি ইউ পি-র লোক, অথচ এত ভালো বাংলা বলছেন কী করে?'

মুখটা হাসিতে ভরিয়ে পুরন্দর বলল, 'বলতে পারব না কেন? আমার মা যে বাঙালি। তা ছাড়া, আমার বাবা জন্মেজয় ত্রিপাঠী কলকাতায় বহুদিন চাকরি করে গেছেন।'

'আপনি কী করেন?'

'ব্যবসা। তবে এবার ব্যবসার কাজে আসিনি। আমার এক মাসতুতো বোন বাড়ির অমতে একটা ছেলের সঙ্গে এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, ফেরত নিয়ে যাব। নীচু জাতের ছেলে। বুঝতেই পারছেন, বাড়ির অমত কেন? আমাদের ওখানে জাতপাতের ব্যাপারটা খুব বেশি। এটা আপনারাও নিশ্চয় জানেন।'

'আপনার মাসতুতো বোন এখানে কোথায় আছেন, জানেন?'

'ঠিক জানি না। তবে শুনেছি, কাঁকুড়গাছিতে ছেলেটার এক আত্মীয় থাকে। সেখাে উঠতে পারে।'

• 'মি. ত্রিপাঠী, কতদিন থাকবেন এখানে?'

'দু'তিনদিন তো বটেই। তেমন পরিস্থিতি হলে আরও কয়েকদিন থাকতে হতে পারে

'আপনার সঙ্গে কি আর কেউ এসেছেন? কোনও মহিলা?'

'না। কেন বলুন তো?'

'না, বিছানার ওপর বেগুনি রঙের সিল্কের একটা কাপড় দেখছি, তাই জানতে চাইলাম

'ওহ, ওই পট্টবস্ত্রের কথা বলছেন? এখনই স্নান সেরে পুজোয় বসব।'

পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়লেন, 'ও কে মি. ত্রিপাঠী। এখন চলি। মাসতুতো বোনে ব্যাপারে...যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিতে পারে তবে মেয়েটি সাবালিকা হলে, আমাদের কিছু করার নেই।'

পুলিশ অফিসারটি চলে যাওয়ার পর পুরন্দর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একগা মিথ্যে কথা বলেছে। পুলিশ যদি মনে করে, ওকে ধরে ফেলতে পারে। গাজিয়াবাদ পুলিশে ফোন করে ওর প্রতিটি কথা ভেরিফাই করতে পারে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পুরন্দ বেগুনি পট্টবস্ত্রটা পরে নিল। এইবার প্রভু জগন্নাথের পুজোয় বসবে। ঠিক তখনই যে ডোরবেলের শব্দ। পুজোয় বারবার বাধা পড়ছে। বিরক্তিতে ওর মন ভরে গেল। দর খুলে পুরন্দর দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক হিজড়ে!

সাত

ইউনিভার্সিটির চার তলা থেকে গোরা নিচের দিকে নেমে আসছিল। দোতলায় ও সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিপ্লবের। বাঁদিকের করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে। বামপন্থী ছা ইউনিয়নের নেতা। ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্নদের মধ্যে একজন। প্রায় ছ'ফুটের মে লম্বা, সুদর্শন। ওর এক ক্লাস সিনিয়র। ওকে দেখেই বিপ্লব হাসিমুখে বলল, 'হনহনি যাচ্ছ কোথায় গোরা? তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না।'

গোরা বলল, 'কয়েকটা প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আছি ভাই। কিছু বলবে?'

'এতবড়ো একটা খবর তুমি চেপে গেলে?'

গোরা বুঝতে পারল না, বিপ্লব কী বলছে। দু'তিনদিন আগে ওকে সর্বভারতীয় দলি পার্টির যুব দলের প্রধান সম্পাদক করা হয়েছে। এই খবরটা অবশ্য বিপ্লবের জানার ক নয়। দলিত পার্টি এখনও এমন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি যে, তার সংগঠনে কোথায় কী বদল হচ্ছে, তা নিয়ে বিপ্লবের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকবে। ও তাই বলল, 'কো খবরের কথা বলছ বিপ্লব?'

'আরে, তোমার সিনেমার নামার খবরটা। কয়েকটা কাগজে পড়লাম, তুমি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করছ?'

সেই ফোটোগ্রাফারের কীর্তি। দিনকয়েক আগে তাঁর সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর দেবাংশু ব্যানার্জি। উনি নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর ছবি করছেন ইংরেজি ভাষায়। ভদ্রলোক এমন অদ্ভুত, বললেন, 'আপনার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের চেহারায় খুব মিল আছে। প্লিজ আপনি ছবিটা করুন।' শুনে গোরার হাসি পেয়েছিল। ও তখন সরাসরি না করে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক প্রায়দিনই ফোন করে যাচ্ছেন। ইদানীং গোরা ফোনও ধরে না। অথচ খবরটা কাগজে বেরিয়ে গেল? শুনে গোরা হাসল, 'কাগজগুলোও আজকাল তেমন হয়েছে। ভুলভাল খবর সব দিচ্ছে। না ভাই, তেমন কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

জরিপ করার ভঙ্গিতে বিপ্লব ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

গোরা বলল, 'তেমন কিছু নয়। কেন বলো তো?'

'তোমার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

'চলো, কিন্তু যাবে কোথায়? আমি কিন্তু কফি হাউসে যাব না। কফির গন্ধটা আমার সহ্য হয় না।'

'না, না। ওখানে নয়। অন্য জায়গায় চলো। এই...খুব কাছেই।'

কথাটা শুনেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল গোরা। নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে ছাত্রছাত্রীরা। সবাই একবার করে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে। এটা লক্ষ করে গোরা খুব মজা পেল। সিনেমার এক হবু আর্টিস্টকে ওরা দেখছে। গোরা ভেবে রাখল, বাড়ি যাওয়ার সময় রাসবিহারীর মোড়ে বইয়ের স্টল-এ ও দেখে নেবে, কাগজে ওর কী ছবি বেরিয়েছে।

একতলায় নেমে পিছনে তাকিয়ে গোরা দেখল, বিপ্লব নেই। হয়তো নামার সিঁড়িতে কেউ ওকে আটকেছে। কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কী বলার জন্য বিপ্লব ওকে ডাকল, তা নিয়ে গোরা ভাবতে লাগল। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিপ্লব বেশ জনপ্রিয় ছেলে। ছাত্রদের কাছে তো বটেই, শিক্ষকরাও ওকে খুব পছন্দ করেন। গোরা শুনেছে, ওর বাবা সুধাময় ব্যানার্জি রাজনীতি করেন। বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের কাছের মানুষ। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের মধ্যে ঠাটবাট নেই। ইউনিভার্সিটিতে ও আসে পাতাল রেলে। ভালো সম্পর্ক রাখে অন্য ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গেও। বিপ্লব অনেক চেষ্টা করছিল, গোরাকে ওদের ইউনিয়নে টানার। কিন্তু বারবার গোরা এড়িয়ে গেছে। মার্কসীয় দর্শনে ও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতিতে ও বিশ্বাস করে না। আর মাসছয়েক পর বিপ্লব ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই কারণে বোধহয় অনুরোধ করবে, ওদের ইউনিয়নের হাল ধরার। উত্তরটা কী দেবে, গোরা ভেবে রাখল।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে দুজনে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। একে মারাত্মক

গরম, তার ওপর বাস আর ট্যাক্সির কালো ধোঁয়া। গোরার শরীরটা কেমন যেন করে উঠল। কলকাতার রাস্তায় এই দূষণ ও সহ্য করতে পারে না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরে এই সমস্যাটা ছিল না। শহরের রাস্তায় প্রচুর গাছপালা। বড়ো বড়ো রাস্তা, তুলনায় যানবাহন কম। দূষণও কম। গোরা শারীরিক অসুবিধে উপেক্ষা করেই বিপ্লবের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। বেশিদূর অবশ্য হাঁটতে হল না। উলটোদিকে একটা এয়ার কন্ডিশনড রেস্তোরাঁয় ঢুকে বিপ্লব বলল, 'কী খাবে বলো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

মাত্র এক সপ্তাহ আগে জ্বর থেকে উঠেছে। ডাক্তার ওকে ঠান্ডা লাগাতে বারণ করেছেন। রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে পড়ে গোরার মনে হল, না এলেই ভালো হত। রেস্তোরাঁর ভেতরের ঠান্ডাটা ধক করে এসে ওর গায়ে লাগল। বেশিক্ষণ এই রেস্তোরাঁয় বসে থাকলে, ফের জ্বর অনিবার্য। আবার বেরিয়ে যেতে চাইলেও, বিপ্লব মনে আঘাত পাবে। সেই কারণে রুমাল দিয়ে মুখ আর হাত দুটো মুছে গোরা বলল, 'আমি কিন্তু কিছু খাব না ভাই। আমি মাছ মাংস কিছু খাই না।'

'সে কী, কোনওদিন খাওনি?'

'না। আমি পিওর ভেজিটেরিয়ান। তুমি খাও। শুধু তোমার জন্য অর্ডার দাও।'

'তা কী করে হয়। একা একা কি খাওয়া যায়? তুমি অন্তত এক গেলাস শরবত খাও। এখানকার শরবত খুব বিখ্যাত। গরমকালে সাউথ ক্যালকাটা থেকেও এখানে লোকে শরবত খেতে আসে।'

শুনে গোরা চুপ করে গেল। শরবত খাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। আশপাশে তাকিয়ে ও দেখল, কোনও চেয়ার খালি নেই। বেশিরভাগই অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। কাছাকাছি কয়েকটা স্কুল আর কলেজ আছে। ক্লাস কেটে ছেলেমেয়েরা এখানে এসে ঠান্ডায় গুলতানি মারছে। মুখ ফিরিয়ে গোরা দেখল, বিপ্লব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করেছে। ওর দিকে একটা এগিয়ে দিতেই গোরা বলল, 'না ভাই, সিগারেট আমি খাই না। আমার সামনে কেউ খাক, তাও চাই না। কী বলার জন্য আমায় ডেকে আনলে, বলো।'

সিগারেটের প্যাকেট ফের পকেটে চালান করে বিপ্লব বলল, 'ইউনিভার্সিটির ডিবেট কম্পিটিশন। প্রোফেসর অনিরুদ্ধ মৈত্র আজ আমাকে ডেকে, কম্পিটিশনে যারা পার্টিসিপেট করছে, তাদের নামগুলো দেখালেন।'

'দেখলাম, এবার তুমিও আছো। সেই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কেন? নামগুলো থেকে ঝাড়াইবাছাই হবে নাকি?'

'ঠিক তা নয়। স্যার এবার বাছাই করা দশজনকে নিয়ে ডিবেটটা করতে চান। তোমার সম্পর্কে অবশ্য কোনও প্রশ্নই নেই। উনি জানেন, বক্তা হিসাবে তুমি খুব ভালো। ক্লাসে তোমার সঙ্গে নাকি ওঁর একবার তর্কাতর্কিও হয়েছিল।'

সাদা উর্দি পরা বেয়ারা অর্ডার নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে। মুখ ফিরিয়ে বিপ্লব অর্ডার

দিতে লাগল। ওর কথাবার্তা শুনে গোরার মনে হল, রোজই আসে এবং রেস্তোরাঁতেও বিপ্লব সমান জনপ্রিয়। এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা সমাজের সর্বস্তরে মিশে যেতে পারে। এই গুণটাই ওর নেই বলে গোরা মাঝেমধ্যে খুব আফসোস করে। উচ্চবর্ণের মানুষদের ও পারতপক্ষে এড়িয়ে যায়। প্রোফেসর অনিরুদ্ধ মৈত্র তাঁদেরই একজন। গোরার মনে পড়ল, ক্লাসে একদিন উনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পদ্ধতি নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। তখনই স্পেশাল ইকনমিক জোন বা সেজ-এর কথা ওঠে। উনি সেজ-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সওয়াল করার সময়, গোরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল। প্রোফেসর মৈত্র খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেদিন। মনে হয়, এখনও তা ভোলেননি।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেছে। গোরা জিজ্ঞেস করল, 'এবার ডিবেট-এর বিষয়টা কী, সে সম্পর্কে কি তুমি কিছু জানো? নাম দেওয়ার সময় প্রোফেসর মৈত্র আমাকে বলেছিলেন, পরে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উনি কোনও নোটিশ দেননি। তোমায় কি উনি কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ বলেছেন। কয়েকটা বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কনটেম্পোরারি সাবজেক্ট বাছা হল। শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সেজ অর্থাৎ স্পেশাল ইকনমিক জোন অবশ্যই দরকার। সাবজেক্টটা কেমন লাগছে তোমার গোরা? এখন এটা বার্নিং ইস্যু। সে কারণে আমিও বললাম, স্যার এই সাবজেক্টটাই রাখুন।'

বিতর্কের বিষয়টা 'সেজ' শুনে গোরা হাসল। ওকে হাসতে দেখে বিপ্লব জিজ্ঞেস করল, 'হাসছ কেন, সাবজেক্টটা তোমার ভালো লাগেনি?'

গোরা বলল, 'হাসলাম এই কারণে, ক্লাসে ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই ওঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য হয়েছিল।' ভালোমন্দের প্রশ্ন তুলছি না ভাই। আদিবাসী সমাজকে বাস্তুচ্যুত করে, কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে, শিল্পপতিকে খুশি করার চেষ্টা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। বিশেষ করে দলিত আর পিছিয়ে থাকা মানুষরা। ডিবেটে যদি আমাকে বলতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি মোশন-এর বিপক্ষে বলব। বলব দলিতরা জাগছে। এই শোষণ আর তারা মেনে নেবে না।'

'কিন্তু শিল্পায়নের জন্য যে জমি দরকার, সেটা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না।'

'তাই বলে দোফসলা, তিনফসলা জমি কেড়ে নিতে হবে? কৃষিজীবী গরিব পরিবারের অন্ন কেড়ে নেবে?' তুমি একজন বামপন্থী হয়ে কথাটা বলছ কী করে? আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে হলে এইভাবে শিল্পস্থাপন আর নগরায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে হয়তো তোমরাই প্রথমে এগিয়ে আসতে। তোমাদের হল কি বিপ্লব?

'কিন্তু শিল্পপ্রসার ছাড়া কি কর্মসংস্থান সম্ভব?'

'প্লিজ বিপ্লব, তুমি অন্তত এই ভাঁওতায় আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিকেল কারখানা হওয়ার সময় আমাদের বলা হয়েছিল, বহু বেকার ছেলে চাকরি

পাবে। ক'জন পেয়েছে বলো? অথবা বক্রেশ্বরে? তিরিশ বছর আগে পেপসিকো কারখানা তৈরি হওয়ার সময় ওরা বলেছিল, পঞ্চাশ হাজার ছেলে চাকরি পাবে। পেয়েছে মাত্র চারশো বিরাশি জন। যার মধ্যে দুশো দশ জন অদক্ষ শ্রমিক। এটা আমার বানানো পরিসংখ্যান নয় বিপ্লব। লোকসভার রিপোর্ট থেকে বলছি। পঞ্জাবকে দেখেও আমরা শিক্ষা নিইনি। আমায় বলো তো, সল্টলেকের আই টি ইন্ডাস্ট্রিতে ক'জন সাধারণ ছেলে চাকরি পেয়েছে?'

বেয়ারা খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে। নিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে বিপ্লব খাওয়ায় মন দিল। ওর খাওয়া দেখে গোরার মনে হল, সত্যিই ছেলেটার খিদে পেয়েছিল। হালকা গোলাপি রঙের শরবত লম্বা গেলাসে বেয়ারা রেখে গেছে। তাতে গোরা চুমুক দিল। বিপ্লব ঠিকই বলেছিল, স্বাদটা জিভে লেগে রইল। বিপ্লবের দিকে তাকিয়েও বলল, 'কথাগুলো বলছি বলে, তুমি কিছু মনে করছ না তো?'

বিপ্লব বলল, 'কেন মনে করব? মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবার আছে।'

'ডিবেটের জন্য আমি নিশ্চয়ই আরও ভালোভাবে তৈরি হব। কাগজে পড়লাম, কমার্স মিনিস্ট্রি মনে করছে, আগামী এক বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে সেজ প্রকল্পে। এবং তার ফলে চাকরি পাবে পাঁচ লক্ষ বেকার। চাকরি হয়তো কিছু ছেলেমেয়ে পাবে, কিন্তু কত লক্ষ কৃষক জমি হারিয়ে পথের ভিখারি হবে, কত লক্ষ পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে, কত লক্ষ লোক দূষণের কবলে পড়বে, সেই পরিসংখ্যানটা কে দেবে? এইসব প্রকল্প হবে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ...মুসলিম চাষি, দলিত হিন্দু, আদিবাসী আর পিছড়ে বর্গের লোকেরা। কিন্তু পুরো ফায়দাটা তুলে নিয়ে যাবে উচ্চবর্ণের শিল্পপতিরা। মানতে পারছি না বিপ্লব। এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কই, চীন তো এই প্রলোভনে পা দেয়নি? সারা বিশ্বে সেজ প্রকল্প হয়েছে আটশোর কাছাকাছি। কিন্তু চীনে হয়েছে মাত্র ছয়টি। তা নিয়েই সেখানে কৃষকদের তীব্র প্রতিবাদ, আন্দোলন, গণবিদ্রোহ চলছে। তার কতটুকু খবর আমরা রাখি? সেজ নিয়ে তোমরা...বামপন্থীরা যে সোনালি স্বপ্ন দেখাচ্ছ, তা ভিত্তিহীন।'

বিপ্লব বলল, 'সেজ প্রকল্পের কথা তো আগে আমরা বলিনি ভাই। ওটা কেন্দ্রীয় সরকারই আইন করে উৎসাহ দিয়েছে। সারা দেশ চাইছে।'

'এইখানেই তো ভয়। দেশের মধ্যে ছোটো ছোটো দেশ অনেক হয়ে যাবে। সেজ প্রকল্পের আইনটা আমি পড়ে দেখেছি। কী ভয়ঙ্কর আইন। কমপক্ষে আড়াই হাজার একর জমি এই প্রকল্পে আনা যাবে। ঊর্ধ্বতন সীমা কত, তা নির্দিষ্ট করা নেই। প্রকল্প শুরু হয়ে গেলে দেশের আইন আর সেখানে খাটবে না। শিল্পপতি প্রকল্পে যাদের বলা হচ্ছে ডেভেলপার...সব ব্যাপারে তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ডেভেলপার চাইলে সরকারকে বিনামূল্যে জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। সমস্ত রকমের কর, শুল্ক, লেভি ছাড় দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য থাকবে। পরিবেশ দফতরের কোনও ছাড়পত্র লাগবে না। শ্রমিকদের

ওপর অত্যাচার, শোষণ হলেও সরকারের শ্রম কমিশনার নাক গলাতে পারবেন না। ফৌজদারি ব্যাপারেও পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অবাক লাগছে, দেশের কোনও বড়ো রাজনৈতিক দলই এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলছে না। এক্ষেত্রে বিদ্রোহ ছাড়া গতি কী?'

টানা এতগুলো কথা বলে গোরা থামল। বিপ্লব চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে। প্লেট শেষ করা পর্যন্ত ও একটা কথাও বলল না। গোরা ইচ্ছে করেই খোঁচা দিয়ে কথা বলছে, যাতে পালটা যুক্তি শুনতে পায়। কিন্তু তর্ক করার উৎসাহ দেখাল না বিপ্লব। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হঠাৎ ও বলল, 'একটা রিকোয়েস্ট করব ভাই? ডিবেটে তুমি পার্টিসিপেট কোরো না।'

অবাক হয়ে গোরা বলল, 'কেন বলো তো?'

মুখটা করুণ করে বিপ্লব বলল, 'এবার আমাদের ডিবেটে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, সে কিউবা যাওয়ার সুযোগ পাবে। হাভানা ইউনিভার্সিটি থেকে ইনভিটেশন এসেছে। ওখানে ঠিক এই বিষয়টা নিয়েই আন্তর্জাতিক সেমিনার হওয়ার কথা। তুমি পার্টিসিপেট করলে আমার জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই ভাই। প্লিজ, কথা দাও, তুমি ডিবেটে আসবে না।'

বিপ্লবের চোখ ছলছল করছে। উচ্চবর্ণের একটা মানুষ ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে। এরা পারে বটে, যে-কোনও মূল্যে আপস করে নিতে। বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ গোরার মাথার ভেতরে লাল ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই সময়টায় ও এক অজানা জগতে ঢুকে পড়ে। আজও তা হল। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেল গোরা। চোখের সামনেটা পরিষ্কার হতেই ও দেখল, একটা বিশাল নদীর ওপর একটা পালতোলা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। সেই নৌকোয় ওরই মতো দেখতে একটা ছেলে বসে আছে। তার হাতে তালপাতার পুঁথি। সে পুঁথি পড়ছে। সানে বসে অন্য এক ছেলে একাগ্র হয়ে তা শুনছে। খুব ভালো করে তাকিয়ে গোরা দেখল, কী আশ্চর্য, শ্রোতা ছেলেটা যে একেবারে বিপ্লবের মতো দেখতে। পুঁথি পড়া বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। শ্রোতা ছেলেটা অনুরোধ করছে 'ভাই নিমাই, তোমার এই পুঁথি যেন ছাত্রদের কাছে না যায়। তা হলে আমার লেখা পুঁথি কেউ পড়বে না।' শুনে ওর মতো দেখতে ছেলেটা হঠাৎ পুঁথি জলে ফেলে দিল। শ্রোতা ছেলেটা খুব চেনা চেনা লাগছে। তার নাম মনে করার খুব চেষ্টা করতে লাগল গোরা। অবশেষে ওর মনে পড়ল। রঘুনাথ না?

দৃশ্যগুলো চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতেই নিজেকে সামলে নিল গোরা। তারপর ভাবার একমুহূর্ত সময় নিল না। ও বলল, 'ডিবেটটা কবে যেন বিপ্লব? একত্রিশ তারিখে, তাই না? এই দ্যাখো, একদম ভুলে গেছি। ওই দিন তো আমার ভুবনেশ্বরে থাকার কথা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক বিপ্লব। এবার ডিবেটে আমি পার্টিসিপেট করছি না।'

আট

দোকানের অবস্থা দেখে বুকটা ধক করে উঠল জয়দেবের। বইপত্তর অবশিষ্ট কিছু নেই। ঘরের চারধারের দেওয়াল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। সাধ করে ও যে মেজেনাইন ফ্লোরটা করেছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। সিলিংটা হঠাৎ অনেক ওপরে উঠে গেছে। মেঝেতে পোড়া বইয়ের স্তূপ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দমকলের লোকেদের দেওয়া জল জমে রয়েছে এক কোণে। পুরো ঘরটায় পোড়া পোড়া গন্ধ। নজর বুলিয়েই জয়দেব ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। ক্যাশ বাক্সে কাল হাজার পাঁচেক টাকা ও রেখে গেছিল। প্রেসকে সেই টাকা দেবার কথা ছিল আজ। বোধহয় সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রাস্তায় বেরোতেই ও দেখল, বাড়িওয়ালা অংশুমানবাবু নিচে নেমে এসেছেন। ওকে দেখে বললেন, 'ভোরবেলায় পুলিশ এসেছিল। আপনাকে একবার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যেতে বলেছে।'

অংশুমানবাবুকে দেখেই রাগ হয়ে গেল জয়দেবের। বলল, 'খবরটা আগে দিতে পারলেন না?'

'কী করে দেব? আগে প্রাণ বাঁচাব, তারপর তো খবর দেব। ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি মশাই। গলগল করে আগুন বেরুচ্ছিল তখন। হরিফাইং এক্সপিরিয়েন্স। আর আপনি এসেই বা কী করতেন? দমকল এল আধ ঘণ্টা পরে। তবুও ভেতরের দিককার দরজা ভেঙে যতটা পেরেছি, জিনিসপত্তর বাঁচিয়েছি।'

একটু আশার আলো দেখতে পেল জয়দেব, 'কোথায় সে সব?'

'ভেতরের উঠোনে। যান, গেলেই দেখতে পাবেন।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ঢুকে জয়দেব দেখল, দুটো কম্পিউটার অক্ষত রয়েছে। শ'চারেক আধপোড়া বই, কয়েকটা হিসাবপত্রের ফাইল আর গল্প উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার মাঝে পড়ে আছে তালা বন্ধ ক্যাশ বাক্সটাও। দেখে মনে মনে অংশুমানবাবুকে ধন্যবাদ দিল জয়দেব। ইস, ভদ্রলোককে ও কড়া কথা না বললেও পারত। ক্যাশ বাক্সের তালাটা খুলে ও টাকাগুলো বের করে প্যান্টের পকেটে রাখল। দোকানে ঢোকার দরজাটা ভাঙা। ভেতরের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে ওর মনটা হু হু করে উঠল। দোকানের সামনে দিকে শাটার নামিয়ে, কাল রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় ভেতরের দিককার এই দরজাতেই তিনটে তালা দিয়ে বাড়ি চলে গেছিল। তখন কি জানত, আগুনে ওর কপাল পুড়বে?

স্কুলে পড়ার সময় ও প্রায়ই টিউশন থেকে ফেরার পথে বাবার দোকানে আসত। দোকান বন্ধ করার সময় ও বাবার কাছ থেকে চাবির গোছা চেয়ে নিয়ে এই দরজায় নিজে তালা লাগাত। সেই সময় ও দেখত, দোকান বন্ধ হওয়ার পর কাগজ জ্বালিয়ে, বাবা সেটা দোরগোড়ায় ফেলে দিচ্ছেন। কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বাবা বলেছিলেন, 'এটা

করি কেন জানিস? কোনও ইভিল স্পিরিট দোকানের ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু সেই আগুনই ওর সর্বনাশ করে দিল!

উবু হয়ে বসে, মোহগ্রস্তের মতো জয়দেব ফাইল আর বইগুলো গোছাতে লাগল। মাথা ঠান্ডা রেখে ওকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। আগে থানায় যেতে হবে। তারপর কথা বলতে হবে দমকলের লোকেদের সঙ্গে। ফিরে এসে দোকানটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওকে ফের নতুন করে আসবাব বানাতে হবে। দেওয়ালগুলো রঙ করাতে হবে। লাখখানেক টাকা দরকার। পাবে কোথায়? দোকানে কাজ চালানোর মতো শ্রী ফিরিয়ে বসতে না পারলে, জেলায় জেলায় বইমেলাগুলোতেও স্টল দিতে পারবে না। ওই মেলাগুলো থেকে ভালো ইনকাম হয়। এই মুহূর্তে মায়ের কাছে হাত পাতা যাবে না। দিনকাল ম্যাগাজিন বের করার সময় মা একবার ওকে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা এখনও ফেরত দিতে পারেনি। ফের টাকা চাইবে কোন মুখে? সবথেকে বড়ো কথা, ঝাড়গ্রামে মা যখন এই খবরটা পাবে, তখন ভয়ানক মুষড়ে পড়বে। জয়দেব শুনেছে, দোকানটা কেনার সময় মা নাকি নিজের গয়না বন্ধক দিয়েছিল। পরে বাবা সেই গয়না ছাড়িয়ে নেয়। সেই কারণে মায়ের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে, এই দোকানটার সঙ্গে।

'এই ভয়ানক কাণ্ডটার পেছনে কে আছে জয়দা? আপনার সঙ্গে তো কারও শত্রুতা নেই।'

প্রশ্নটা শুনে জয়দেব মুখ তুলে তাকাল। কৌশিক ঝোড়ো কাকের মতো দাঁড়িয়ে। ওর পাশে সুমিতা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। কৌশিক থাকে নাকতলার দিকে। সুমিতা গল্ফ গ্রিনে। ওরা খবর পেল কী করে? জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। তোমরা কখন এলে?'

'বেলা আটটায়। টিভিতে খবরটা দেখেই বেরিয়ে এসেছি। আপনার এত দেরি হল?'

'অংশুমানবাবু খবর দেননি। তোমরাই বা আমাকে ফোন করলে না কেন?'

'অনেকবার করেছি জয়দা। সুইচ অফ করা ছিল। খুলে দেখুন, প্রচুর মিসড কল পাবেন।'

সুমিতা বলল, 'আপনি আসতে দেরি করছেন দেখে কৌশিক আর আমি থানায় গেছিলাম। ডায়েরি করে এলাম। একটা ইন্টারেস্টিং খবর আছে জয়দা। এখন শুনবেন? নাকি পরে বলব।'

'না এখন বলো।'

'চায়ের দোকানের বসন্ত বলে ছেলেটা বলল, কাল রাতে গাট্টাগোট্টা টাইপের একটা লোককে ও দোকানের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। খুব ফরসা, আর লম্বা চুল। খালি গা, পরনে বেগুনি রঙের ধুতি। আমরা চলে যাওয়ার সময় সেই অচেনা লোকটা নাকি বাবা লোকনাথ প্রকাশনীর গাড়িবারান্দায় অনেক রাত পর্যন্ত শুয়েছিল।'

'বসন্ত দেখল কী করে? রাতে ও এখানে থাকে নাকি?'

'না রোজ থাকে না। কাল রাতে অনেক দেরি হয়ে গেছিল দোকান বন্ধ করতে। তাই সরস্বতী প্রকাশনীর বারান্দায় ও শুয়ে পড়েছিল। তখনই লোকটাকে ওর চোখে পড়ে।

শুনে জয়দেব ভ্রু কুঁচকে বলল, 'ছেলেটা আর কিছু বলল?'

'অনেক রাতে কুকুরগুলো খুব ঘেউ ঘেউ করছিল। তখন ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও তখন দেখে, লোকটা হেঁটে হেঁটে বড়ো রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। তার পরই ও দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে। চেঁচামেচি করে ও সবাইকে জাগিয়ে দেয়। না হলে আরও ড্যামেজ্ হত।'

'পুলিশকে এসব কথা জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ জয়দা। বসন্ত ছেলেটাকেও আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে গেছিলাম। পুলিশকে তো জানেন। উলটে ওকেই নানারকম অড কোয়েশ্চেন করল। ছেলেটার সত্যিই খুব সাহস আছে। জানেন কী করেছে? লোকটার পিছু ধাওয়াও করেছিল। পুলিশকে ও বলল, লোকটা নাকি শেয়ালদা স্টেশনের দিকে গেছে। কে এই লোকটা? আপনার কি কোনও ধারণা আছে?'

'বুঝতে পারছি না ভাই।'

'এখন কী হবে জয়দা। দিনকাল-এর নেক্সট ইস্যু বেরোবে কী করে?'

সুমিতা চুপ করে এতক্ষণ কথা শুনছিল। এবার বলল, 'তার মানে? কী বলছিস তুই কৌশিক? ইস্যু তো বের করতেই হবে। অ্যাট এনি কস্ট। জয়দা আপনি ঘাবড়াবেন না। প্রেসে সব মাল পাঠানো হয়ে গেছে। যতদিন না দোকানটা ঠিকঠাক করা যায়, ততদিন আপনার বাড়িতে বসেই আমরা কাজ তুলে দেব। কী আপনার আপত্তি নেই তো?'

এত দ্রুত চিন্তা জয়দেব আর করতে পারছে না। তবুও ঘাড় নাড়ল ও। সুশোভনদা কাল বিকালেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। সুশোভনদার পিছনে যে চক্রটা লেগেছে, হয়তো তাদেরই মধ্যে কেউ টের পেয়ে গেছে, দিনকাল পত্রিকার জন্য উনি এমন কোনও লেখা দিয়েছেন, যা ওদের ক্ষতি করে দিতে পারে। তাই এই আগুন। ভাড়াটে কোনও গুন্ডার হাতেও এই দায়িত্বটা ওরা দিতে পারে। কিন্তু ছবি আর লেখার কথাটা ওরা জানল কী করে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে মনে মনে খেলা করার সময় হঠাৎ জয়দেবের মাথায় এল, আরে সুশোভনদার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা? কাল প্রুফ দেখার জন্য পাণ্ডুলিপিটা ও দোকানে রেখে গেছিল। সেটা পুড়ে গেলে তো সর্বনাশ। সুশোভনদাকে ও মুখ দেখাতে পারবেন না।

পাণ্ডুলিপিটা ছিল সবুজ রঙের একটা ফাইলের ভেতর। উঠোনে একবার চোখ বুলিয়ে, ডাঁই করা বইয়ের মধ্যে ও সেই ফাইলটা দেখতে পেল না।

'সুশোভনদার ম্যানুসক্রিপ্টটা কোথায়, তোমরা জানো?'

প্রশ্নটা শুনে সুমিতা বলল, 'ম্যানুসক্রিপ্টটা কাল আমি বাড়ি নিয়ে গেছিলাম। প্রুফ দেখার জন্য। ওটা ইনট্যাক্ট আছে। নিশ্চিন্ত থাকুন জয়দা, অন্তত বইমেলায় ওই বইটা বের করা যাবে।'

কৌশিক বলল, 'তাহলে সময় নষ্ট করে লাভ কী? চল সুমি, দু'একটা লোক ডেকে আনি। দোকানটা অন্তত পরিষ্কার করে ফেলা যাক।'

জয়দেব থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না, না। ডেব্রিজ এখনই ফেলাটা ঠিক হবে না। ইন্সিওরেন্সের লোকজন আসুক। ওরা ড্যামেজ আন্দাজ করতে চাইবে।'

কৌশিক আর সুমিতার সঙ্গেই রাস্তায় নেমে এল জয়দেব। আশপাশের প্রকাশকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সমবেদনা জানাতে এসেছেন। একেক জন একেক রকম কথা বলছেন। কথা বলতে ভালো লাগছিল না জয়দেবের। ও হ্যাঁ আর না-য়ে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাঁধে কার স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল, গোপাল কাকাবাবু। রাস্তার ঠিক উলটোদিকেই বাবা লোকনাথ প্রকাশনী। তার মালিক গোপাল মাইতি ঝাড়গ্রামে ওদের প্রতিবেশী। বাবার অনেক আগে থেকে বইয়ের বিজনেসে আছেন। একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'বাবা জয়, এটা বাড়িওয়ালার কাণ্ড নয় তো?'

শুনে চমকে উঠল জয়দেব, 'কী বলছেন আপনি? অসম্ভব। অংশুমানবাবু কিছুতেই এ কাজ করতে পারেন না। আমার অন্তত মনে হয় না।'

'জগতে কোনও কিছু অসম্ভব নয় বাবা। ইদানীং প্রোমোটাররা ঘুরঘুর করছে ওঁর কাছে। তুমি ছাড়া এই বাড়িতে আর কোনও ভাড়াটে নেই। তোমাকে তুলে দিতে পারলে, ঝরঝরে এই বাড়িটা, উনি ছেড়ে দিতে পারেন প্রোমোটারের হাতে। তারপর আর কী...মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংস।'

'কিন্তু কাকাবাবু, ওপরতলায় যে উনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। নিচের তলায় আগুন লাগানোর ঝুঁকি কি কখনও নিতে পারেন?'

'খোঁজ নিয়ে দেখো, ওঁর ফ্যামিলির কেউ কাল রাতে ওপরতলায় ছিলেন না। কাল সকালেই ওদের সবাইকে আমি ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছি। থাক বাবা, আমার কথা যখন তোমার মনঃপূত হচ্ছে না, তখন বিশ্বাস করতে হবে না। তুমি জীবনের ছেলে বলেই কথাগুলো বললাম। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার একটু চোখ কান খোলা রেখে চলো। আমি যাই, দোকান খুলতে হবে।'

গোপালবাবু চলে যাওয়ার পর হতভম্ব হয়ে জয়দেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অংশুমানবাবু এত ক্ষতি করে দেবেন, মনে হয় না। ভদ্রলোক অন্য বাড়িওয়ালাদের মতো নন। কখনো ভাড়া চাইতে আসেন না। দেরি হলে কখনো তাগাদা দেন না। একটা সময় সরকারি চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর বিন্দাস আছেন। রোজ বিকেলে সমবয়সিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যান কলেজ স্কোয়ারে। জয়দেব শুনেছে, ওঁর দুই ছেলেই থাকেন বিদেশে। ওঁর পরিবার বলতে আছেন, স্ত্রী, এক বিবাহিত মেয়ে আর দুই নাতি-নাতনি। জামাইকে মাঝেমধ্যে আসতে দেখেছে জয়দেব! অংশুমানবাবু কোনওদিনই এসে বলেননি, আপনি মশাই ঘরটা ছেড়ে দিন। ওঁর যদি বদমতলব থাকত, তাহলে ভেতরের দরজার তালা ভেঙে, কিছু জিনিস বাঁচানোর চেষ্টা উনি করতেন না।

গোপালবাবুর কথা মাথা থেকে সরিয়ে দিল জয়দেব। সিঁড়ি দিয়ে এক ধাপ উঠে ও দোকানের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল। এই দোকানটা কত কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছিলেন বাবা। সব শেষ হয়ে গেল। নির্জন ঘরে ও যেন বাবার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। ডানদিকের কোণে

একটা বড়ো টেবিল ছিল আগে। দেয়ালের দিকে পিঠ রেখে বাবা চেয়ারে বসতেন। পয়লা বৈশাখের দিনটা তখন কী আনন্দেরই না ছিল! দোকানটার চেহারাই পালটে যেত লেখক আর মফস্‌সলের এজেন্টদের ভিড়ে। সেনমহাশয় থেকে মিস্টির প্যাকেট আসত। স্কুলে পড়ার সময় এমনই একটা দিনে লেখক সমরেশ বসুকে একবার দেখেছিল জয়দেব। বাবা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ওঁর মাথায় হাত রেখে সমরেশ বসু বলেছিলেন, 'তুমি জীবনে কী হতে চাও বাবা?'

জয়দেব কিছু না ভেবেই বলেছিল, 'আপনার মতো সাহিত্যিক হতে চাই।'

শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন সমরেশ বসু, 'বেশ বেশ। বলো তো, তোমার নামেই একজন খুব বিখ্যাত কবি আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম কী? যদি বলতে পারো, তাহলে বুঝব, তুমি সাহিত্যিক হতে পারবে।'

জয়দেব চট করে বলেছিল, 'গীতগোবিন্দ।'

খুশি হয়ে সমরেশ বসু তখন বলেছিলেন, 'গুড, ভেরি গুড। আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি আমার থেকেও বড়ো হও।'

এইতো এসব সেদিনের কথা। বাবার মুখটা সেদিন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে গল্প করেছিলেন সমরেশ বসুর আশীর্বাদ নিয়ে। দৃশ্যগুলো মনে পড়তেই জয়দেবের চোখে জল এসে গেল। ঠিক সেই সময়েই ওর মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল। হয়তো চেনা পরিচিত কেউ টিভি-তে আগুন লাগার খবরটা শুনেছেন। সমবেদনা জানাতে চান। পকেট থেকে সেটটা বের করে জয়দেব, পর্দায় সুশোভনদার নামটা দেখতে পেল। ও কিছু বলার আগেই চাপা গলায় সুশোভনদা বলতে শুরু করলেন, 'খবরটা টিভিতে দেখলাম। জানি, এ সময় ফোন করা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। তবুও না করে থাকতে পারলাম না।'

ঘরের ভেতর কথা ভালো শোনা যাচ্ছে না। সুশোভনদার সঙ্গে কথা বলার জন্য জয়দেব ফের রাস্তায় নেমে এল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখন কোথায়?' রাস্তায় আশপাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে করেই সুশোভনদার নামটা ও উচ্চারণ করল না।

'জানতে চেয়ো না। তোমার জন্য আমার খারাপই লাগছে। দয়া করে আমার আর্টিকেলটা তুমি ছেপো না ভাই। তাহলে তোমার আরও বিপদ হবে।'

অনুরোধটা না-শোনার ভঙ্গিতে জয়দেব বলল, 'বাকি দুটো ছবির কোনও হদিশ পেলেন?'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শোনো, যে কারণে তোমায় ফোনটা করলাম। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে আমার এক ছাত্র আছে। নাম পর্ণব ঘোষদস্তিদার। ওখানকার সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার। পারলে ওর সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করো। ও সব জানে। তোমাকে হেল্প করতে পারবে।'

'সাবধানে থাকবেন দাদা।'

'সাবধানেই আছি। রোজ আমাকে হোটেল বদলাতে হচ্ছে। তবুও ওরা খবর পেয়ে

গাচ্ছে। এমন শক্তিশালী ওদের নেটওয়ার্ক। আপাতত ছাড়ি। দরকার হলে পরে আবার তোমায় ফোন...'। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন সুশোভনদা। কিন্তু হঠাৎ লাইনটা কেটে দিলেন।

নয়

আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে উপাসনা বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগোল। বেহালাগামী মিনি বাস চিড়িয়াখানার মাছ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ও তাই মাছ ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। এই সময়টায় মিনি বাস ফাঁকা থাকে। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই চৌরাস্তায় পৌঁছে যাওয়া যায়। ওর কাকা অবশ্য বাসে আসা-যাওয়া পছন্দ করেন না। গাড়ি নিয়ে বেরোতে বলেন। কিন্তু লাইব্রেরিতে এক-একদিন উপাসনার পাঁচ-ছ'ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অতক্ষণ গাড়ি আটকে রাখার কোনও মানে হয় না। কাকিমা শপিং করতে বেরোন। খুড়তুতো বোন রিমিতাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হয়। কাকার সঙ্গে তাই আপস করে নিয়েছে উপাসনা। গাড়ি করে লাইব্রেরিতে আসে, কিন্তু বাড়ি ফেরে বাসে।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে উপাসনা দেখল, ব্রততী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও থাকে কসবার দিকে। রিসার্চ করছে বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা হয়। কোনও কোনওদিন একসঙ্গে ক্যান্টিনে চা খেতে যায়। সমবয়সি বলে আলগা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে ব্রততী লাইব্রেরি থেকে বেরিয়েছে। এখনও বাস পায়নি? সামনে গিয়ে উপাসনা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছো যে? বাস সার্ভিসে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

মুচকি হেসে ব্রততী বলল, 'না না। একজনের জন্য আমি ওয়েট করছি। আমাকে পিক আপ করবে।'

উপাসনা ঠাট্টা করে বলল, 'কে গো সে? লাইব্রেরিতে যার জন্য মোবাইল সেটটা তোমাকে সাইলেন্ট মোডে রাখতে হয়, সে নাকি?'

'বাব্বা, তোমার চোখটা তো সাংঘাতিক।'

'চোখের আর দোষ কী বলো। কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করলে একদিন-না-একদিন তো চোখে পড়বেই। মিথ্যে বলব না, ভদ্রলোককে আমি দেখেছি। সেদিন তোমরা চিড়িয়াখানা থেকে বেরোচ্ছিলে। রিসার্চারদের প্রেম করা সেফ জায়গা। তা, তোমার প্রেম কাহিনি এখন কোন স্টেজে আছে? স্টেজ টু না থ্রি-তে?'

'মানে? তোমার কথা বুঝতে পারছি না উপাসনা।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখাদেখি, ঘোরাঘুরি, বোঝাবুঝি...এই তিনটে হচ্ছে প্রেমের কম্পালসারি স্টেজ।'

'তোমার অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হচ্ছে।' বলেই নিজেকে সামলে নিল ব্রততী।

তারপর বলল, 'ইস, কী বোকার মতো কথা বলছি আমি। তোমার অভিজ্ঞতা থাকবেই বা না কেন? তুমি সুন্দরী, বিদুষী, স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। তোমার পিছনে ছেলেরা তো দৌড়বেই।'

'ফর ইয়োর ইনফর্মেশন ব্রততী, আজ পর্যন্ত কোনও ছেলে আমার পিছনে দৌড়য়নি। বিলিভ মি। উলটে, স্কুলে পড়ার সময় আমি একজনের পিছনে দৌড়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে এমন ধমক দিয়েছিল যে, তার পর থেকে কোনও ছেলেকে প্রেমিক বলে ভাবতেই আমার ভয়।'

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল ব্রততী। বলল, 'কী বলে ধমক দিয়েছিল গো?'

উপাসনাও হাসতে হাসতে বলল, 'যা বলেছিল, তা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিল, পাকা মেয়ে কোথাকার। আগে পড়াশুনোটা কমপ্লিট করো, তারপর আমার কাছে এসো। ব্যস, ওই কথা শোনার পর থেকে প্রেম করার ইচ্ছে আমার উবে গেছে। আমি ঠিক করেছি, রিসার্চ শেষ করার পর প্রেম ট্রেম নিয়ে ভাবব। গুরুজনের কথা শিরোধার্য, কী বলো?'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। আরেকদিন ডিটেলে শুনব। আমার এখন স্টেজ টু চলছে। ওই উলটোদিকে উনি এসে গেছেন। হর্ন দিচ্ছেন গাড়িতে বসে। আজ চলি। কাল আসছ?'

'অবশ্যই। তখন তোমার কাহিনিটা শুনব। বাই।'

রাস্তা পেরিয়ে ব্রততী চিড়িয়াখানায় মেন গেটের দিকে চলে গেল। দূরে ব্রিজের ঢালে বেহালার মিনি বাস দেখে উপাসনাও এগিয়ে গেল। আজ বেলা প্রায় এগারোটার সময় ও লাইব্রেরিতে ঢুকেছে। টানা চার ঘণ্টা ধরে পুরনো বই ঘেঁটেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে ও গবেষণা করছে। অপ্রকট হওয়ার অনেক আগে মহাপ্রভু নাকি বলে গেছিলেন, পাঁচশো বছর পর তিনি ফের ফিরে আসবেন। যদি সত্যিই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর বয়স এখন হবে তেইশ বছর। উপাসনা পুনর্জন্ম নিয়ে পড়াশুনো করছে। সেই সঙ্গে খোঁজখবর করছে, সত্যিই মহাপ্রভু আবার জন্ম নিয়েছেন কি না। নিয়ে থাকলে কোথায় তিনি আছেন? কী করছেন? ফের তাঁকে অবতার হিসাবে দেখা যাবে কিনা? পুরো এই বিষয়টা নিয়ে উপাসনা খুব ব্যস্ত।

বাসে উঠে লেডিস সিট ফাঁকা পেয়ে গেল উপাসনা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা, ও বাঁদিকে সিটের ওপর রাখল। পৌনে পাঁচটা বাজে। এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বাকি আছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম হয়। তার আগে ওকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। টিভি দেখে দেখে রোজ রান্নার রেসিপি লিখে রাখে উপাসনা। বিশেষ করে, নিরামিষ রান্না। ছুটির দিন সেই রেসিপি অনুযায়ী, রান্না করে ও কাকা-কাকিমাকে খাওয়ায়। টিভি দেখে রান্না শেখার এই অভ্যেসটা ওর হয়ে গেছে নবদ্বীপে থাকার সময় থেকে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই পেন আর ডায়েরি হাতে নিয়ে ও টিভির সামনে বসে পড়ত। ওর বয়সি মেয়েরা সাধারণত রান্না দিয়ে আগ্রহ দেখায় না। ওর বাবা তাই ওকে খুব উৎসাহ দিত। পোড়ামা তলায় মন্দিরের কাছে, ওদের বাড়ির সামনেই বাজার। রেসিপি

অনুযায়ী, ওকে কাঁচা আনাজ আর মশলা জোগান দিতে, বাবা বারবার বাজারে দৌড়ত তখন।

নবদ্বীপে এখনও উপাসনার বাবা-মা আর এক বোন থাকে। বাবা নিশীথরঞ্জন রায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। ভালো পশার আছে ওই অঞ্চলে। নিশীথ ডাক্তারের চেম্বারে যাব বললে, রিকশাওয়ালারাও নবদ্বীপ স্টেশন থেকে সোজা উপাসনাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। আরও একটা কারণে নবদ্বীপে মানুষ ওদের পরিবারটাকে চেনে। ওদের বাড়িতে গোবিন্দর মন্দির আছে। রাস পূর্ণিমার সময় প্রতিবার ওই মন্দিরে খুব ধুমধাম করে উৎসব হয়। বাংলায় এম এ করার জন্য উপাসনা বছর চারেক আগে কলকাতায় কাকার বাড়িতে চলে এসেছিল। পাশ করার পর ও লেক গার্ডেন্সের একটা প্রাইভেট স্কুলে চাকরিও পায়। কিছুদিন চাকরি করার পর বুঝতে পারে, টিচারদের কূটকাচালিতে ও টিকতে পারবে না। তাই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ও নবদ্বীপে ফিরে যায়। সেই সময়টায় ফের কিছুদিন ও রান্না নিয়ে মেতেছিল।

এই রান্না করে খাইয়েই, একজনকে তাক লাগাতে গিয়ে উপাসনা ওর গবেষণার সূত্র পেয়ে গেছিল। যার নেশায় জীবনের অন্য সব দিকগুলো আপাতত সরিয়ে রেখেছে। সেই দিনটার কথা ওর এখনও মনে আছে। সেই রাস পূর্ণিমার দিনের কথা। রাস উৎসবে ওদের মন্দিরে পাঠ করার জন্য এসেছিলেন আচার্য সুধীর মিশ্র মহাশয়। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টায় যাঁরা এখনও অগ্রণী, আচার্য তাঁদেরই একজন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃভূমির কাছে এখনও তিনি একটা টোল চালান। তাতে শ'দুয়েক ছাত্র পড়তে আসে। আচার্যর সেবা করার জন্য উপাসনা সে দিন নতুন ধরনের কয়েক পদ নিরামিষ রান্না করেছিল। তা খেয়ে বৃদ্ধ খুশি হয়েছিলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। ভাগবত পাঠের পর দীর্ঘসময় উনি উপাসনার সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সেই সময়ই তিনি বলেন, কিছু লক্ষণ দেখে তিনি নিশ্চিত, মহাপ্রভু পুনর্বার জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় রয়েছেন, কী করছেন সে সম্পর্কে জানেন সারা ভূমণ্ডলের মাত্র তেরো জন পুণ্যাত্মা। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে থাকেন। এই ভবিষদ্‌বাণীটি নাকি করে গেছেন মহাপ্রভুর এক শিষ্য, তাঁর লেখা প্রাচীন এক পুঁথিতে।

আচার্য সেদিন বলেছিলেন, 'মা, আমি এই পুঁথিটির কথা জানতে পারি, তেইশ বছর আগে। তার মানে যখন মহাপ্রভু ফের মর্ত্যধামে ফিরে এসেছেন। তখন আমার বয়স সাতান্ন বছর। পুঁথির সত্যাসত্য জানার জন্য তখন আমি ওড়িশায় যাই। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাইনি।'

বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে বলেই উপাসনা খুব কৌতূহলী হয়েছিল। আচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিল, 'মাঝে আর কোনও খোঁজখবর নেননি?'

আচার্য বলেন, 'না। ওড়িশায় থাকাকালীন কোনও একটা চক্র আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছিল। আসলে, মহাপ্রভুর মৃত্যু নিয়ে তুমি তো জানোই, একটা ধোঁয়াশা আছে। ওড়িয়া

ইস, তা-ই যেন হয়। মনে মনে ওদের ইষ্টদেবতা গোবিন্দর কাছে প্রার্থনা করল উপাসনা। কাকা শুনলে অসন্তুষ্ট হবেন। আর কোনওদিন বাসে চড়তে দেবেন না। রিকশায় যেতে যেতে ও ভাবতে লাগল, রিসার্চের সব খাতা লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া ওর উচিত হয়নি। কাকা একটা ল্যাপটপ এনে দিয়েছেন। রোজই ও ভাবে, নোটসগুলো ল্যাপটপে তুলে রাখবে। আজ করব, কাল করব...ভেবে তুলে রাখা হয়নি। সেই গাফিলতির মাশুল হয়তো ওকে দিতে হবে। ফের কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে। কাগজপত্তরগুলো জেরক্স করে রাখলেও আজ ওকে আফসোস করতে হত না।

রিকশাওয়ালাটা বকবক করেই যাচ্ছে। তবুও পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ছেলেটা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিল। পর পর তিনটে খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে। কোন বাসটায় ও এসেছে, উপাসনা ঠিক চিনতে পারল না। গুমটিতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে একজন বলল, 'দিদি, টু জিরো নাইন ফোর থেকে একটা লোককে, মেয়েদের সাইড ব্যাগ নিয়ে নামতে দেখেছি। লম্বা, পাঞ্জাবি পরা, সুন্দর মতো একটা লোক। এদিকেই কোথাও থাকে।'

উপাসনা ভেবেই পেল না, কে এই ভদ্রলোক? খালি বাস থেকে মেয়েদের একটা ব্যাগই বা তিনি কুড়িয়ে নেবেন কোন উদ্দেশ্যে? তাঁর তো জমা দিয়ে যাওয়ার কথা গুমটিতে। না, বেহালা থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসা উচিত। কথাটা মনে হওয়া মাত্র রিকশাওয়ালাকে উপাসনা বলল, 'চলো, একবার থানায় যেতে হবে।'

দশ

জ্বরটা এখনও ছাড়েনি। মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে আসছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোরা টের পেল গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। শারীরিক অস্বস্তিটা ভুলে থাকার জন্য ও খবরের কাগজ পড়ায় মন দিল। দলিত পার্টির মিটিংয়ের খবর কোথাও ছেপেছে কি না, তা দেখার জন্য। এই সময় মুকুন্দ এসে বলল, ফিল্মমেকার দেবাংশুবাবু একটা মেয়েকে পাঠিয়েছেন। সে কথা বলতে চায়। কয়েকদিন আগে মুকুন্দ পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে। কথা দিয়েছে, আর কোনওদিন বেচাল কিছু করবে না। তাই ওকে ক্ষমা করে দিয়েছে গোরা। কিন্তু সকালবেলায় এ কী উৎপাত! ওকে সেই সিনেমায় নামানোর চেষ্টা। মেয়েটার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না। তবুও বিরক্ত মুখে গোরা ড্রয়িং রুমে এসে বসল। ওকে দেখে মেয়েটা বলল, 'নমস্কার স্যার, আমার নাম রিনি মণ্ডল। আমি ইউনিক ফিল্ম প্রোডাকসন থেকে এসেছি।'

মেয়েটার পদবি মণ্ডল শুনে গোরার বিরক্তি খানিকটা কমে গেল। সমবয়সি মেয়ে, আলগা শ্রী আছে চোখ মুখে। অভিনয় করে নাকি? আজকাল প্রচুর ইয়ং ছেলে-মেয়ে অভিনয়টাকে কেরিয়ার হিসাবে নিচ্ছে। মেয়েটাকে ও বলল, 'যা বলার, দেবাংশুবাবুকে

তো আমি বলেই দিয়েছি। বারবার না করে দেওয়া সত্ত্বেও আবার উনি তোমাকে পাঠালেন কেন?'

রিনি বলল, 'উনি ডেসপারেটলি আপনাকে চাইছেন গোরাবাবু। প্লিজ, না করবেন না।'

রিনির আবদার শুনে মজাই লাগল গোরার। ও বলল, 'ইউনিক প্রোডাকসনের আপনি কে?'

'আমি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর পাস আউট। দেবাংশুদা বলেছেন, আপনাকে যদি আমি রাজি করাতে পারি, তাহলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসাবে নেবেন।'

'তাহলে...আমার রাজি হওয়া বা না-হওয়ার মধ্যে তোমার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। কী বলো?'

'ঠিক তাই। অনেক কষ্ট করে আমি ইনস্টিটিউটে পড়াশুনো করেছি। এই চান্সটা অ্যাভেল করতে পারলে, পরে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করার সুযোগ পাব। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোক যদি শোনে, আমি দেবাংশুদার কাজ করেছি, তাহলে আমাকে পরে কাজ দেবে। আপনি প্লিজ রাজি হয়ে যান।'

শুনে গোরা মনে মনে হাসল। মণ্ডল মানে...মেয়েটা দলিত সম্প্রদায়ের। হয়তো এর যোগ্যতা আছে। কিন্তু ও কোনওদিন কাজ পাবে না, যতদিন না উচ্চবর্ণের একটি মানুষ ওকে সার্টিফাই করবে। কথাটা মনে হতেই হঠাৎ ওর মাথায় ফের একটা লাল ঝিলিক মারল। মাথার ভেতরে টনটন করে উঠলে ফের অদ্ভুত দৃশ্যগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মেয়েটার সামনে ওকে বিব্রত হতে হবে। সেই ভয়ে গোরা বলে উঠল, 'তোমাদের ছবিটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিতে পারবে?'

'আপনি যদি বলেন, তাহলে কয়েকদিন পর আমি পুরো স্ক্রিপ্টটা আপনাকে দিয়ে যেতে পারি। তবুও যখন জানতে চাইছেন, তখন বলি। ছবিটার নাম...শ্রীচৈতন্য দ্য অবতার। প্রথমদিকে আমরা ভেবেছিলাম, মহাপ্রভু দ্য অবতার নামটা দেব। কিন্তু মহাপ্রভু নামটা বিদেশে তেমন পরিচিত নয়। ইসকনের দৌলতে শ্রীচৈতন্যর নামটা ওখানে সবাই জানেন। এটা আসলে পুরোপুরি পিরিয়ড ফিল্ম। আমাদের রিসার্চাররা গত একবছর ধরে পুরীতে থেকে, শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর রিসার্চ করে, তারপর স্ক্রিপ্টটা লিখেছেন। সময়কালটা হচ্ছে, নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভু পুরীতে গেলেন। তারপর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সেই সময়কার পলিটিক্যাল, সোস্যাল সিনারিওটা ঠিক কী ছিল, ভক্তি মাহাত্ম্যে মহাপ্রভু কীভাবে জন-আন্দোলনটাকে তুঙ্গে নিয়ে গেলেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে তাঁর টাসল্...এই সব আর কী। স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে দেবাংশুদা খুব অথেনটিক। উনি দেখিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যই বিশ্বের প্রথম কম্যুনিস্ট। দেখবেন, এই ছবিটা অস্কার পাক বা না পাক, গোল্ডেন গ্লোব অথবা বাফটা অ্যাওয়ার্ড পাবেই।'

কপালটা ফের টিপটিপ করছে। বসে থাকতে ভালো লাগছে না। গোরার মনে হল, শুয়ে থাকলে একটু আরাম পেত। সরাসরি না করে দিলে রিনি মনে দুঃখ পাবে। তাই ওকে কাটানোর জন্যই বলল, 'আমাকে একটু ভাবার সময় দাও রিনি। ইউনিভার্সিটির

পরীক্ষা খুব সামনে। তোমার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিয়ে যাও। পরে তোমাকে আমি হ্যাঁ বা না জানিয়ে দেব।'

শুনে রিনির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যার। বাঁচালেন। আপনি যে ভুবনেশ্বরের ছেলে, সেটা আমি সেদিন শুনলাম বিপ্লবদার মুখ থেকে। চেনেন তো ওঁকে। আপনার সঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। উনি খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার। বলছিলেন, আপনি নাকি কাউকে না করেন না। চলি স্যার। দিনকয়েক বাদে এখানে এসে আমি বাঁধানো স্ক্রিপ্ট দিয়ে যাব।'

রিনি চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল গোরা। পাশের ঘরে বসে মুকুন্দ পড়াশুনো করছে। কয়েকদিনের পরেই নাকি ওর সেমিস্টারের পরীক্ষা। গরম দুধ খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু করে দেবে কে? মুকুন্দকে বিরক্ত করতে গোরার মন চাইল না। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, বেলা প্রায় দশটা। আজ ইউনিভার্সিটিতে ইমপরট্যান্ট দুটো ক্লাস ছিল। তার মধ্যে একটা প্রোফেসর এ এমের...মানে অনিরুদ্ধ মৈত্রর। যাঁর সঙ্গে ওর একদিন তর্কাতর্কি হয়েছিল। রোল কল-এর সময় স্যার নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, ও অ্যাবসেন্ট। এবং সেটা ভালোভাবে নেবেন না। কিন্তু জ্বর নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গেলে শরীরটা আরও বেঁকে বসতে পারে। কলকাতায় ইদানীং সোয়াইন ফ্লু বলে এক ধরনের জ্বর হচ্ছে। সেটা হলে খুব মুশকিল। তাহলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে, গোরা সিদ্ধান্ত নিল, বিকেলের মধ্যে যদি জ্বর না ছাড়ে, তাহলে কাল রক্ত পরীক্ষা করাবে।

শুয়ে থাকার সময়ই হঠাৎ দেবাংশুবাবুর মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভদ্রলোক পিছু ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে না। ক্রিয়েটিভ মানুষ। একবার মাথায় ঢুকে গিয়েছে, ওকে দিয়ে মহাপ্রভুর রোল করাবেন, সেই সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও বোধহয় নড়বেন না। ভদ্রলোককে সাহায্য করা দরকার। চোখ বুজে ও চিন্তা করতে লাগল। ওদের দেশের বাড়ি জাজপুরে বড়ো একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবেরও ফুল সাইজ ছবি রয়েছে। বাবা আঁকিয়েছিলেন সেই সময়কার বিখ্যাত শিল্পী প্রভাকর মিশ্রকে দিয়ে। গেরুয়া ধুতি পরা, গায়ে গেরুয়া পট্টবস্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে যাচ্ছেন। মনে মনে গোরা নিজেকে ওই পোশাকে সাজাল। নিজেকে মহাপ্রভু হিসাবে কল্পনা করে ওর বেশ হাসিই পেল। ন্যাড়া মাথায় ওকে খুব বিচ্ছিরি লাগবে। না, প্রভাকর মিশ্রের ওই ছবির সঙ্গে একেবারেই মিলছে না ওর চেহারা। ওর মধ্যে কী দেখে যে দেবাংশুবাবু জেদ ধরলেন, গোরা বুঝতেই পারল না।

এই ক'দিনে দেবাংশুবাবু সম্পর্কে গোরা অনেক খোঁজখবর নিয়েছে। সবাই একবাক্যে বলেছেন, উনি খুব ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। ভদ্রলোক যেদিন দেখা করতে আসেন, সেদিন অবশ্য ওঁকে দেখে মনে হয়নি, সিনেমার জগতে এত নামকরা মানুষ। পরনে ময়লা জিনস, হাফহাতা জামা। মুখে একগাল দাড়ি। উসকোখুসকো চুল। তবে চোখ দু'টি উজ্জ্বল। ভদ্রলোক সেদিন নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। এসেই

বললেন, 'গোরাবাবু, আপনি দলিতদের জন্য এত লড়ছেন, জেনে খুব ভালো লাগল। আমার ছবিটা কি আপনি দেখেছেন? ছবিটার নাম দলিত। খুব সেনসেশন হয়েছিল সেই সময় ছবিটা নিয়ে।'

অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে গিয়ে গোরা 'দলিত' ছবিটা হল-এ বসে দেখেছিল। কিন্তু জানত না, ওটা দেবাংশুবাবুর ছবি। তাই বলেছিল, 'ছবিটা দেখেছি। কিন্তু নামটা নিয়ে আমার আপত্তি ছিল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, দলিত কথাটা সংবিধান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওরা পিছিয়ে পড়া মানুষ, পিছড়ে বর্গ।'

'ছবিটা আপনার কেমন লেগেছিল?'

'মন্দ না। তবে একটা পজিটিভ নোট-এ শেষ করলে আরও ভালো লাগত। আপনাকে ধন্যবাদ, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে আপনি অন্তত...ছবি করার কথা ভেবেছেন।'

'শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেভিওর। তাঁর রোল-এ অভিনয় করতে আপনার এত আপত্তি কেন, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি একশোবার মঞ্চে উঠে...একশো ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে যতজনকে জাগাতে পারবেন...আমার এই একটা ছবি করে, তার একশোগুণ বেশি লোকের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন।'

'আপনি যা চাইছেন, আমাকে দিয়ে তা হবে না দেবাংশুবাবু।'

'কে বলল হবে না। আপনাকে না পেলে আমি এই ছবিটাই করব না। শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি যেভাবে ভিজুয়ালাইজ করেছি, আপনি একজ্যাক্টলি তাই। এই ছবিটা প্রোডিউস করছে হলিউডের এক কোম্পানি। ওরা আপনার ছবিটা অ্যাপ্রুভ করেছে। এই দেখুন আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার এই ছবিটা আমরা আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। মেক আপের পর ফাইনালি এই চেহারা এসে দাঁড়াবে।'

কথাগুলো বলে একটা লম্বা খাম এগিয়ে দিয়েছিলেন দেবাংশুবাবু। খামের ভেতর থেকে ছবিটা বের করে এনে গোরা চমকে উঠেছিল। আরে, এ তো প্রভাকর মিশ্রের সেই ছবিটার মতো দেখাচ্ছে ওকে। তাড়াতাড়ি ছবিটা ও ফেরত দিয়েছিল। আর সেই সময় ওর মাথার ভেতরে লাল ফুলকিগুলো ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। চোখের সামনে টালির ঘর। সামনে উঠোনে একদল লোক বসে নামসংকীর্তন করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল, খামের ছবিটার মতো দেখতে এক যুবক। দু'হাত তুলে সে নেচে নেচে গান গাইতে লাগল। প্রতিবারের মতো এবারও চোখের সামনে দৃশ্যগুলো ও দেখতে লাগল। কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেল না। যেন চোখের সামনে একটা টিভি চলছে, কিন্তু তার সাউন্ড অফ করা আছে।

....মোবাইল ফোনটা বাজছে। গোরা ফের বর্তমানে ফিরে এল। বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটটা টেনে নিয়ে পর্দায় দেখল, ওর ছোটোবেলাকার বন্ধু টুবাই। 'হ্যাঁ বল, কোত্থেকে?'

'ভুবনেশ্বর থেকে। ভালো একটা খবর আছে। কলকাতার কাগজে চাকরিটা আমার হয়ে গেছে। আজই ওরা ফোন করে জানিয়ে দিল।'

'ভেরি গুড। কবে আসছিস তাহলে?'

'কলকাতায় যেতে হবে না। ওরা আমাকে ভুবনেশ্বরের করেসপন্ডেন্ট করল।'

'ফাইন। লেগে পড়। আমাদের মনে রাখিস।'

'কী যে বলিস! তুই হেল্প না করলে কলকাতায় গিয়ে আমি সব ঘুলিয়ে ফেলতাম। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে সেদিন ট্রেনে দেখা হয়েছিল। ফিরে আসার পর আমার মা কী বলেছিল, জানিস? গোরা হচ্ছে লাকি ছেলে। ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে...মানে তোর চাকরিটা হবেই। মায়ের কথা ঠিক মিলে গেল। চাকরির খবরটা মাকে দেওয়ার পরই মনে হল, তোকে জানানো দরকার। তাই ফোনটা করলাম।'

'তোর মাকে আমার প্রণাম জানাস।'

'তোর ভেতর একটা কোনও শক্তি আছে ভাই। ছেলেবেলায় লক্ষ করিনি। কিন্তু সে দিন কলকাতায় গিয়ে সেটা বুঝতে পারলাম। দলিতদের নিয়ে তুই লড়ে যা। দরকার হলে আমায় ডাকিস।'

গোরা হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ডাকব। মনে থাকে যেন। ছাড়ি তাহলে? শরীরটা ভালো নেই রে।'

'ঠিক আছে, ছাড়ছি।'

ফোনটা ছাড়ার পর গোরা বিছানায় উঠে বসল। টুবাইয়ের সাংবাদিক হওয়ার খবরটা শুনে ওর খুব ভালো লাগল। টুবাই ওরফে বিশ্বম্ভর মিশ্র ওর ছেলেবেলাকার বন্ধু। ভুবনেশ্বরে ডিএবি চন্দ্রশেখরপুর স্কুলে ওরা একই ক্লাসে পড়ত। মাস্টারমশাইদের মুখে গোরা শুনত, টুবাই নাকি মহাপ্রভুর বংশধর। পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট। স্কুলে আচার-আচরণেও বোঝা যেত, ওর শরীরে নীল রক্ত বইছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রায়ই গোরা ইউনিক টু-তে টুবাইদের বাড়িতে যেত। ওর স্পষ্ট মনে আছে, একবার টুবাই ওদের পুজোর ঘরে নিয়ে গিয়ে, মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ দেখিয়েছিল। পাথরের ওপর ওই পায়ের ছাপটা নাকি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো। কথায় কথায় বুবাই সেদিন বলেছিল, বংশপরম্পরায় ওরা ওই পায়ের ছাপ পুজো করে আসছে। পরে বড়ো হয়ে গোরা অবশ্য মায়ের কাছে জানতে পারে, মহাপ্রভুর কোনও বংশধর ছিলেন না। ওর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার গর্ভে কোনও সন্তান হয়নি।

তবুও ভুবনেশ্বরের অনেকেই মনে করেন, মহাপ্রভুর বংশধররা আছেন। চৈতন্যদেব যখন প্রথমবার পুরীতে যান, তখন রাজরোষে সেখানে থাকতে পারেননি। সেই সময় কিছুদিনের জন্য তিনি কেন্দ্রপড়ায় বসবাস করেন। পরে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে ফের পুরীতে নিয়ে যান। কেন্দ্রপড়াতে থাকার সময় নাকি চৈতন্যদেব সংসার পাতেন। তাঁর সেই বংশধররাই গত পাঁচ শতকে ওড়িশার নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন। কিন্তু কেন্দ্রপড়ার কমারভান্ডি গ্রামে এখনও তাঁদের কেউ কেউ বসবাস করেন। টুবাই অবশ্য নিজের মুখে কোনওদিন বলেনি, ও মহাপ্রভুর বংশধর। গোরা ওকে একবার সরাসরি জিজ্ঞেসও করেছিল। কিন্তু টুবাই বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, উত্তরটা ও দিতে পারবে না। উত্তরটা দিতে পারেন একমাত্র ওর জ্যাঠামশাই। কোথায়

থাকেন তিনি? টুবাই বলেছিল, ওদের দেশের বাড়ি কমারভাণ্ডিতে। ওর জ্যাঠামশাই রাধারমণ মিশ্রকে গোরা কোনওদিন নিজের চোখে দেখেনি। তবে তাঁর অনেক লেখা পড়েছে খবরের কাগজে। রাধারমণের একটা পরিবারই শ্রীচৈতন্যদেবের উত্তরসূরি। পরে সেই লেখাটাই উনি অনেক বড়ো করে লেখেন। এবং বই হিসাবে প্রকাশিত হয়।

বিছানায় শুয়ে থাকার সময়ই গোরার মনে পড়ল, স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় ওরা, চার বন্ধু মিলে কী দুষ্টুমিই না করত! দলের মধ্যে টুবাইও থাকত। ওরা সারা ভুবনেশ্বর চষে বেড়াত। বাজারে গিয়ে, বুবাইকে সামনে রেখে ওরা নানা ধরনের মজা করত। স্কুল থেকে বেরিয়ে হইহই করে ওরা কোনও একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকত। পেট পুরে মিষ্টি খেত। তারপর দোকানদার পয়সা চাইলে ওরা সামনে এগিয়ে দিত টুবাইকে। বলত, মহাপ্রভুর বংশধর। এর কাছ থেকে পয়সা চাইছ? নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না। ওড়িশায় ধর্মভীরু লোকের অভাব নেই। কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করে নিত। মহাপ্রভুর বংশধরকে সামনে দেখে তখন দোকানদার হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, না, না টাকা দেওয়ার দরকার নেই। টুবাই তখন মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করত। ওকে দেখে সত্যিই মনে হত, মহাপ্রভুর বংশের কেউ।

গোরা কলকাতায় চলে আসার পর টুবাইয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই মাসছয়েক আগে ট্রেনে হঠাৎ ওকে দেখে গোরা চমকে উঠেছিল। ছয় ফুটের বেশি লম্বা, সোনার মতো গায়ের রঙ, কাঁধ অবধি আসা চুল। কলকাতায় চাকরির পরীক্ষা দিতে আসছিল ও। ট্রেনে টুবাইয়ের সঙ্গে গল্প করেই সারাটা রাত্তির কাটিয়ে দিয়েছিল গোরা। সকালে ট্রেনটা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই ও জোর করে টুবাইকে চেতলার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। তারপর খাইয়ে দাইয়ে ওকে নিজে পৌঁছে দিয়েছিল চাঁদনি চকে কাগজের অফিসে।

টুবাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গোরার মনে হল, এই টুবাইকেই তো মহাপ্রভুর রোলে দারুণ মানায়। মহাপ্রভুর রোলে মহাপ্রভুরই এক উত্তরসূরি অভিনয় করবে, পাবলিসিটি স্টান্ট হিসাবে এটা দারুণ খেয়ে যাবে। দেবাংশুবাবুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়? টুবাইয়ের এখন টাকার দরকার, আর দেবাংশুবাবুর দরকার...মহাপ্রভুর মতো দেখতে একজনকে। টুবাই রাজি হয়ে গেলে, নিজের ঘাড় থেকে গোরা সিনেমার ভূতটা নামিয়ে ফেলতে পারবে। কথাটা মনে হতেই, ও নিশ্চিন্তে হাঁফ ছাড়ল। টুবাইয়ের মোবাইল নম্বরটা ওর মোবাইলের অ্যাড্রেস বুক-এ লেখা আছে। ইস, এ কথাটা আগে মনে পড়লে রিনি বলে মেয়েটাকে ও টুবাইয়ের ফোন নাম্বার দিয়ে দিতে পারত।

রিনির জন্য কিছু করতে পারলে ও খুব খুশি হবে। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই গোরা টের পেল ওর গা থেকে জ্বর উধাও হয়ে গেছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। বিছানা থেকে ও নেমে পড়ল। স্নান করে ওকে ইউনিভার্সিটি যেতে হবে। প্রোফেসর মৈত্রর ক্লাসে অ্যাবসেন্ট হওয়াটা ঠিক হবে না।

এগারো

কাঁকুড়গাছির মোড়ে ট্যাক্সি ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল পুরন্দর। রাত প্রায় আটটা। কিন্তু রাস্তায় লোকজন কমার কোনও লক্ষণ নেই। কলকাতার এই অঞ্চলটায় যে এত সমৃদ্ধি ঘটেছে, না দেখলে ও তা বিশ্বাস করতে পারত না। বছর পাঁচেক আগে, কাছেই সিআইটি কোয়ার্টারে এক যজমানের কাছে ওকে পাঠিয়েছিলেন পূজ্যপাদ পদ্মনাভ। তখন মোড়ের মাথায় অবাঙালিদের এত বড়ো বড়ো দোকান ওর চোখে পড়েনি। উলটে, বেঙ্গল কেমিকেল যাওয়ার রাস্তাটা সন্ধ্যার পরই নিঝুম হয়ে যেতে দেখেছে। এবার দেখল, পুরো চত্বরটাই গড়িয়াহাটের মতো ঝলমলে লাগছে। মোড়ের গোল চক্করটা অনেক ছোটো হয়ে গেছে। রাস্তা চওড়া করার জন্যই বোধহয় আইল্যান্ডসটা ছোটো করে দিয়েছে। অনবরত গাড়ি যাতায়াত করছে। ফুটপাতে লোকজনের ভিড়, গাড়ির হর্ণ পুরন্দরের সহ্য হল না।

সকাল দেখেই নাকি বোঝা যায় পুরো দিনটা কেমন যাবে। এ কথাটা পূজ্যপাদদের মুখে অনেকবার শুনেছে পুরন্দর। ও মনে মনে বলল, 'পূজ্যপাদরা ঠিকই বলেন।' সকালে হিজড়ের হ্যাপা সামলাতে গিয়ে ও পুজো করার সময়ই পায়নি। হোটেলের ম্যানেজারের ওপর ওর ভয়ানক রাগ হয়েছিল। কী করে একটা হোটেলের ভেতর হিজড়ে ঢুকতে পারে? দরজা খুলে সামনে হিজড়কে দেখে পুরন্দর প্রথমে ঘাবড়ে গেছিল।

হাততালি দিয়ে হিজড়েটা প্রথমে ওর কাছে পয়সা চাইল। আজকাল এভাবে ওরা রোজগার করে নাকি? বিরক্তি দেখিয়ে পুরন্দর দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেলে, হিজড়েটা পা দিয়ে আটকে দেয়। পায়ে বোধহয় ওর লেগেছিল। তখনই ও গালাগাল দিতে শুরু করে। ওর ভাষা পুরন্দর ঠিক বুঝতে পারছিল না। পরে অঙ্গভঙ্গি করে হিজড়েটা বোঝাতে লাগল, 'তুই তো মরদই না। তোকে আমি চিনে গেছি। লোক দেখে আমরা সব বুঝতে পারি। কীসের গরম দেখাচ্ছিস রে তুই?' শুনে গা হিম গেছিল পুরন্দরের। দরজার সামনে বসে পড়েছিল হিজড়েটা। পয়সা না দিলে নাকি নড়বে না।

বেলা বারোটার সময় হিজড়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে পুরন্দর হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে ও কোলে মার্কেট যায়। হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশমতো, পোস্টাপিসের সামনে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা ছেলে। তার কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে ও ফের ট্যাক্সি নিয়ে গড়িয়াহাটে যায়। তার পর সেখান থেকে অন্য একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যায় এসপ্ল্যানেডে। ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাসে চলে আসে কাঁকুড়গাছিতে। আগে থেকেই কাঁকুড়গাছির এক হোটেলে ও কথা বলে রেখেছিল। সেখানে উঠে ও নিশ্চিন্ত হয়। এত ঘুরপথে হোটেলে আসার কারণ একটাই। সাবধানের মার নেই। কেউ পিছু নিতেই পারে। নিজেকে আড়ালে রাখা আর কী!

অপারেশন সারতে যাওয়ার আগেও পুরন্দর সরাসরি সেখানে যায় না। এই মুহূর্তে ওর যাওয়ার কথা উলটোডাঙার তেলেঙ্গাবাগানে। প্রভাবতী প্রিন্টিং হাউস বলে এক

ছাপাখানায়। কাঁকুড়গাছি মোড় থেকে, ইচ্ছে করলে হেঁটেও সেখানে যেতে পারে। মিনিট কুড়ির বেশি লাগবে না। কিন্তু পুরন্দর যাবে না। ট্যাক্সি ধরে ও প্রথমে যাবে পার্ক সার্কাসে। তারপর ট্যাক্সি বদলে ও আসবে মানিকতলায়। ওখানকার এক পাইস হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে, ও যাবে তেলেঙ্গাবাগান। সব টাইম ঠিক করা আছে। কিন্তু শুরুতেই গণ্ডগোল। একটা বড়ো চৌরাস্তার মোড়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তবুও ফাঁকা ট্যাক্সি পাচ্ছে না। বিরক্তিতে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকে চলে এল পুরন্দর।

এবং মারাত্মক ভুল করল। ফুটপাতে ওঠার সময়ই চোখাচোখি হয়ে গেল সিআইটি কোয়ার্টার্সে যজমান বাড়ির যুবতী মেয়েটার সঙ্গে। হাতে সাদা পলিথিনের প্যাকেট, ভুজিয়াওয়ালার দোকান থেকে কী কিনে যেন নেমে আসছিল। ওকে দেখেই মেয়েটা বলে উঠল, 'আপনি? কবে এলেন?'

বলেই নিচু হয়ে পা ছুঁতে গেল। মেয়েটার পরনে ঢিলে টপ, আর জিনসের প্যান্ট। স্তন দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ও নিচু হওয়ার সময় ফর্সা স্তন দুটো দেখে পুরন্দরের সারা শরীর শিরশির করে উঠল। এক পা পিছিয়ে এসে ও বলল, 'মা, তুমি?'

'চিনতে পারলেন না? আমি কালীপদ ভটাচাযের মেয়ে ছোটন। এই কাছেই কোয়ার্টার্সে থাকি। আপনি ভুলে গেছেন বোধহয়। অনেকদিন আগে আমাদের বাড়িতে একবার এসেছিলেন। আমার কিন্তু মনে আছে। আপনাকে আমি ভুলিনি। চলুন, আমাদের বাড়িতে চলুন। না গেলে মা খুব দুঃখ পাবে।'

মেয়েটার স্তনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুরন্দর মোলায়েম গলায় বলল, 'না মা, আজ যেতে পারছি না। আমাকে পার্ক সার্কাসে যেতে হবে।'

'না।' মেয়েটা আবদারের ভঙ্গিতে বলল, 'কাল সকালে যাবেন। আজ রাতটা আমাদের বাড়িতে থাকুন। মা বলেছিল, এ মাসের শেষের দিকে পুরীতে যাবে। পদ্মনাভ মহারাজের কাছে চিঠি লিখবে। ভালোই হল, আপনি এসে গেছেন। প্লিজ চলুন।' বলে হাত ধরে টানল মেয়েটা।

সর্বনাশ! মেয়েটার সাহস দেখে পুরন্দর অবাক হয়ে গেল। একজন পরনারী ওর হাত ধরে টেনেছে এই খবর পূজ্যস্পাদদের কানে গেলে, ওকে একশো বেতের ঘা খেতে হবে। পাপের শাস্তি। ওঁদের কানে যাওয়া অসম্ভবও নয়। প্রগলভা এই মেয়েটাই হয়তো পুরীতে গিয়ে বলে বসবে, রাস্তায় দেখা হয়ে গেছিল। জোর করে ওকে টেনে নিয়ে গেছিল বাড়িতে। পুরন্দর উভয় সংকটে পড়ল। যজমানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা চলবে না। অন্যদিকে, মেয়েটার অনুরোধ মানাও সম্ভব না। তাই হাত ছাড়িয়ে মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে পুরন্দর বলল, 'তা হয় না মা। মহারাজদের না জানিয়ে আমি কারও বাড়ি যেতে পারব না। পারমিশন নেই। আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হোক।'

মেয়েটার গা থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। ওর কমলা কোয়ার মতো ঠোঁট ভিজে আছে লাল টকটকে লিপস্টিকে। সেদিকে তাকিয়ে পুরন্দর টের পেল, ধুতির নীচে ওর লিঙ্গ দৃঢ় হয়ে উঠছে। রাতে হস্তমৈথুন করে নিলেই হবে। আপাতত, এই মেয়েটার সামনে

থেকে চলে যাওয়া দরকার। কথাগুলো বলেই ও সামনের দিকে পা বাড়াল। আর তখনই দেখল, দোকানের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। ট্যাক্সি থেকে প্যাসেঞ্জার নেমে আসছে। পা চালিয়ে ও ট্যাক্সিটাকে ধরল। পিছন দিকে আর না তাকিয়ে পুরন্দর ট্যাক্সির ভেতরে ঢুকে পড়ল। সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে শুধু বলল, 'পার্ক সার্কাস যাব।' মেয়েটাকে এক নজরেই পুরন্দর চিনতে পেরেছিল। পাঁচ বছর আগে, তখন ছিল কিশোরী, এখন যুবতী। মেয়েটাকে ওর খুব ভালোমতো মনে আছে, একটাই কারণে। কেননা, ওই বাড়িতে রাত্রিবাসের সময় সেদিন মেয়েটার চোখে পুরন্দর কামনার আগুন দেখেছিল।

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। ধীরে ধীরে শরীরটা শীতল হয়ে এল। মেয়েটার কথা জোর করে মন থেকে সরিয়ে, পুরন্দর কাজের কথা ভাবতে লাগল। রাত ঠিক একটার সময় ওর কাছে ফোন আসবে। পূজ্যপাদরা জানতে চাইবেন, কাজটা ঠিকঠাক হল কি না। বিকেলে তেলেঙ্গাবাগানে গিয়ে ছাপাখানার চারপাশটা ও ভালো করে দেখে এসেছে। বড়ো রাস্তা থেকে গলির অনেকটা ভেতরে ওই ছাপাখানা। দেড়তলা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে দরজায় প্রাইভেট কোম্পানির দুজন সিকিউরিটি স্টাফ সব সময় বসে থাকে। বইয়ের দোকানটার মতো ছোটো নয়। অনেকটা জায়গা নিয়ে ছাপাখানা। পিছন দিককার গেটে অবশ্য কোনও সিকিউরিটি স্টাফ নেই।

ভেতরে একপাশে দেড়তলা সমান প্রিন্টিং মেশিন। তার পাশে ডাঁই করা আছে কাগজের বড়ো বড়ো রিল। সারা মেঝে জুড়ে নানা ধরনের ছাপা কাগজ, পোস্টার, বইয়ের কভার। দেওয়ালের ধারে বড়ো বড়ো কাঠের আলমারি। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লোককে কাজ করতে দেখেছে ওখানে পুরন্দর। ওখান থেকে খুঁজে ছবি বের করে আনা, আর খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ বের করে আনা—দুই-ই সমান। তবু চিন্তাভাবনা করে একটা প্ল্যান খাড়া করেছে পুরন্দর। কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, চট করে ও পিছিয়ে যায় না। বরং ওর ভালোই লাগে, সেই কাজ সুচারুভাবে করে আসতে। এই কারণেই তো পূজ্যপাদরা ওকে পছন্দ করেন। রাত সাড়ে ন'টার সময় ছাপাখানার পিছনের গেটে পৌঁছে পুরন্দর দেখল, গাছতলায় বসে একজন হিন্দুস্তানি লোক হনুমান চাল্লিশা পড়ছে। তার সামনে জনা কুড়ি বসে, মন দিয়ে সেই পাঠ শুনছে। লোকগুলোকে দেখেই পুরন্দর বুঝে গেল, এরা আশপাশের কারখানার দারোয়ান অথবা ঠেলাওয়ালা। সারা দিন কাজকর্মের পর, রাতে বসে হনুমানজির ভজনা করে। ডান দিকে ছাপাখানার দরজাটা হাট করে খোলা। ভেতর থেকে মেশিন চলার বিকট শব্দ ভেসে আসছে। ছাপাখানার সবগুলো আলোই জ্বালানো। দশ বারোজন লোক নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। ভেতরে আর বাইরে এত লোকজন দেখে, পুরন্দর মাথায় হাত দিয়ে বসল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। একনজরেই ওর মনে হল, ছাপাখানায় বোধহয় ওভারটাইম চলছে। এতগুলো লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে ও কাজটা সারবে কী করে? এই পরিস্থিতিটা ও আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেনি। এখন কী হবে?

নতুন পরিস্থিতিতে কী করবে, সেটা ভেবে ওঠার আগেই, ভেতর থেকে একটা লোক

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। ওকে দেখে বলল, 'তোকে রজনীবাবু পাঠিয়েছে বুঝি। এত দেরি হল কেন?'

মাথায় যা এল, পুরন্দরের মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে গেল, 'জ্যামে ফেঁসে গেছিলাম স্যার।'

'যা ভেতরে যা। আজ রাতের মধ্যে কাজ কিন্তু তুলে দিতে হবে। কাল সকাল থেকে বাইন্ডিং। ম্যানেজারি করতে গিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা। সবকিছু আর্জেন্ট করে দিতে হবে। যাক সে কথা, এখন যাই। পেটে কিছু দিয়ে আসি।' বলেই লোকটা হনহন করে চলে গেল।

ছাপাখানার ভেতরে ঢুকে পুরন্দর দেখতে পেল, মেশিন থেকে ছাপা হয়ে গাদা গাদা কাগজ বেরিয়ে আসছে। আর দশ-বারোজন লোক সেই কাগজ ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখছে। অন্যদের দেখাদেখি পুরন্দরও কাগজ ভাঁজ করার কাজে বসে গেল। কাজ করার ফাঁকেই ও অন্যদের লক্ষ করতে লাগল। শীর্ণ, ভাবলেশহীন, বুভুক্ষু সব শরীর। মুখে কুলুপ এঁটে, যন্ত্রের মতো দ্রুত কাগজগুলো চার ভাঁজ করে যাচ্ছে।

কাগজে কী আছে, সেটা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। হয়তো সারাটা দিন কোথাও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এসেছে। রাতে এখানে বসে গেছে, দুটো বাড়তি টাকা রোজগারের জন্য। কিন্তু মেশিনের ভয়ঙ্কর এই আওয়াজের মধ্যে এরা কাজ করে কী করে? দু'দিনেই তো কানের বারোটা বেজে যাবে। মিনিট দশেকের মধ্যেই পুরন্দর অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। ধুস, এই লোকগুলোর মাঝে কি ওকে মানায়? ওর ভয়ই হতে লাগল, যেন ধরা না পড়ে যায়! কাজটা আজ করা সম্ভব নয়।

ম্যানেজার লোকটা ফিরে আসার আগেই কেটে পড়তে হবে। তাহলে ওকে কেউ লক্ষ করবে না। এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে, পুরন্দর ছাপা কাগজগুলো উলটে পালটে দেখতে লাগল। আর তখনই ওর একটা হেডিং চোখে পড়ল। 'শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্যে নতুন দিশা।' তলায় একটা ছবি। সেটা দেখে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'ওড়িয়া সমাজের শত্রু' ওই লোকটাকে নিয়ে আবার কে কী লিখল? পড়তেই হবে। দ্রুত কাগজটা ভাঁজ করে ধুতির নিচে চালান করে দিল পুরন্দর। তারপর সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল। না, অন্য লোকগুলোর কোনও হুঁশ নেই। মুখ নিচু করে, রোবটের মতো ওরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয়। কোমরে ছোটো থলিতে লুকিয়ে রাখা ওর মোবাইল ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। আর তখনই কুড়ি-বাইশটা বিস্ফারিত চোখ একসঙ্গে ওর দিকে ঘুরে গেল।

এইসব পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, পুরন্দর ভালোমতো জানে। সুইচ অন না করেই, ও তাড়াতাড়ি কানের কাছে সেটটা নিয়ে গিয়ে, সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ জগন্নাথবাবু, আমি পৌঁছে গেছি। মনে হয়, সারা রাত্তির এখানে থাকতে হবে।' মেসিনের আওয়াজে ও প্রান্তেও কিছু শোনা সম্ভব না। তাই কথা বলতে বলতেই পুরন্দর দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোনটা আসার কথা ছিল রাত একটার সময়। দু'ঘণ্টা আগে এল কেন? নিরাপদ দূরত্বে এসে পুরন্দর সুইচ অন করে পূজ্যপাদ

পদ্মনাভর গলা শুনতে পেল। উনি বললেন, 'শোন, হোটেলে আর ফিরে যাস না। তোর পিছনে পুলিশ লেগে গেছে।'

'ওখানে যে আমার কিট ব্যাগটা রয়ে গেছে।'

'সেটা তোর কাছে পৌঁছে যাবে। আপাতত তুই ইস্টার্ন বাইপাসে চলে যা। হোটেল মেনকায় দু'শো সাতাশ নম্বর রুমটা তোর নামে বুক করা আছে। ফের রাত তিনটেয় তোকে ফোন করছি।'

লাইনটা কেটে গেল। ছাপাখানায় ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। সময় নষ্ট না করে পুরন্দর বড়ো রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। তখনই ওর চোখে পড়ল, দূরে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাপাখানার ম্যানেজার। বড়ো রাস্তায় পৌঁছতে হলে, লোকটার পাশ দিয়ে যেতে হবে। তখন চিনে ফেললে মুশকিল। ঝামেলা এড়ানোর জন্য পুরন্দর দাঁড়িয়ে পড়ল। সকাল থেকে কোনওকিছুই আজ ঠিকঠাক হচ্ছে না। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে ও সিদ্ধান্ত নিল, ম্যানেজার লোকটা ছাপাখানায় ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত ও অপেক্ষা করবে। ওর কোনও তাড়া নেই।

রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। ডান দিকে টালির বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘর। জানলা দিয়ে বিবর্ণ হলুদ আলো বাইরে এসে পড়েছে। আলোছায়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পুরন্দর দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎই কানের সামনে ফিসফিস করে যেন বলল, 'চল মিনসে, ভেতরে চল।'

পুরন্দর ভাবতেই পারেনি, কেউ ওকে লক্ষ করছে। পাশ ফিরে তাকাতেই দেখল, উগ্র সাজগোজ করা একটা মেয়ে গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর অভিজ্ঞ চোখ। দেখেই বুঝতে পারল, মেয়েটা কে হতে পারে। বাজারের কাছে তাহলে বেশ্যাপটিও আছে? ও কিছু বলার আগে, মেয়েটা বলল, 'বেশি লাগবে না। একসো ট্যাকা দিস, তা'লেই চলবে। আজ শ্লা সন্ধে থেকে কোনও খদ্দের নেই।'

বড়ো রাস্তার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও পুরন্দর পিছিয়ে এল। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিকে আসছে ছাপাখানার ম্যানেজার। সেই সুযোগে ফের মেয়েটা হাত ধরে টানছে। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল পুরন্দর। হাতে লেগেছে বোধহয়। কঁকিয়ে উঠল মেয়েটা, 'স্লা, দামড়া। মাগিপাড়ায় এসে সতীপনা? দাঁড়া, লোক ডাকচি।'

শুনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল পুরন্দরের। চট করে মেয়েটার পিছনে চলে গিয়ে ডান হাত দিয়ে ওর মুখটা ও চেপে ধরল। যাতে চেঁচাতে না পারে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে রাখল। মেয়েটা পা ছুঁড়ছে। হাত কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পুরন্দর গায়ের সব শক্তি দিয়ে ওকে চেপে রাখল। মুখ তুলেই ও দেখল, দু'হাত দূর দিয়ে ছাপাখানার ম্যানেজার হেঁটে যাচ্ছে। ডান দিকে তাকালেই ওদের দেখতে পাবে। ওর ভাগ্য ভালো, লোক দুটো এদিকে তাকাল না। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই, বাঁ হাত দিয়ে মেয়েটার মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে দিল পুরন্দর। কট করে একটা শব্দ হল। সেই শব্দটা শুনে ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, মেয়েটার ঘাড় ভেঙে গেছে।

মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে পুরন্দর রাস্তায় নেমে এল। আর তখনই দপ করে রাস্তা আর বাড়িঘরের আলো সব নিভে গেল। লোডশেডিং বোধহয়। কলকাতায় প্রায়ই হয়। অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলতে লাগল ও। হঠাৎই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল, দু'পাশের ছোটো-বড়ো বাড়িগুলোকে প্রেতপুরী বলে মনে হতে লাগল ওর। অন্ধকারকে পুরন্দর ভয় পায় না। দিনের পর দিন শাস্তি ভোগ করার জন্য ওকে মন্দিরের পাতালপুরীতে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ও অনুভব করল, বাতাস কমে আসছে। ওর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ কী হল, তা দেখার জন্য মুখ তুলে তাকাতেই আতঙ্কে ওর পা দুটো কাঠ হয়ে গেল। আকাশে আধভাঙা চাঁদ। তারই আশপাশে একটা ছোটো বিন্দু দেখতে পেল পুরন্দর। অশান্ত হয়ে সেই বিন্দুটা এদিক-এদিক ছুটে বেরোচ্ছে। অন্ধ আক্রোশে যেন ধরাধামে নেমে আসবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরন্দরের সারা শরীর হিম হয়ে এল। ও জানে, ওই বিন্দুটা আসলে কী। কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। পূজ্যস্পাদের কাছ থেকে ও সেই উপাখ্যান শুনেছে।

পুরন্দর ভুলে গেল, একটু আগে ও একজনকে খুন করে এসেছে। তার মৃতদেহটা কয়েক গজ পেছনেই পড়ে রয়েছে। লোকজন সেই মৃতদেহ আবিষ্কার করলে, ও ধরা পড়ে যাবে। লম্বা গলি, অত রাত্তিরে আশেপাশে আর কেউ নেই। এই মুহূর্তে ওর বড়ো রাস্তায় চলে যাওয়া দরকার। কিন্তু কে যেন ও পা স্ক্রু দিয়ে আটকে দিয়েছে। ইচ্ছে করলেও ও পালিয়ে যেতে পারবে না। মুখ তুলে দ্বিতীয়বার ওর আকাশের দিকে তাকাল। সাদা মেঘের কাছে আরও কয়েকটা বিন্দু ওর চোখে পড়ল। সেগুলো দেখেই শরীরের সারা শক্তি জড়ো করে পুরন্দর হঠাৎ ছুটতে শুরু করল।

বারো

ম্যানটনেই মিনি বাসটা খালি হয়ে গেছিল। চৌরাস্তায় বাঁকের মুখে নামার সময়ে জয়দেব লক্ষ করল, লেডিস সিটের তলায় একটা সাইড ব্যাগ পড়ে আছে। ওই সিটে হলুদ শাড়ি পরা একটা মেয়ে বসে ছিল।

অন্যমনস্ক থাকা সত্ত্বেও, মেয়েটাকে ও উঠতে দেখেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে। তার মানে পড়াশুনো করে, অথবা রিসার্চ। বয়স ওর থেকে তিন-চার বছর কমই হবে। মেয়েটা বাসে ওঠার সময়ই জয়দেবের চোখে পড়ে অন্য কারণে। দু'বেণীর জন্য। কলকাতার মেয়েরা সাধারণত দু'বেণী নিয়ে রাস্তায় বেরয় না। তখনই জয়দেবের মনে হয়েছিল, শহুরে মেয়ে নয়, হয়তো মফস্‌সলের। এমন ভোলে ভালা, ব্যাগটাই ফেলে গেছে? নিচু হয়ে সাইড ব্যাগটা ও তুলে নিল।

অন্যের ব্যাগে কী আছে, তা দেখা উচিত না। তবুও জয়দেব একবার দেখে নিল। কয়েকটা খাতা আর ছোটো একটা জলের বোতল ছাড়া আর কিছু নেই। তার মানে মহার্ঘ

কিছু নয়। সিটের ওপর ব্যাগটা রেখে, স্বচ্ছন্দে ও নেমে যেতে পারে। কিন্তু জয়দেবের মন তা চাইল না। কী একটা কারণে কনডাকটর আগের স্টপে নেমে গেছে। ব্যাগটা ড্রাইভারের হাতে দিলে হয়তো কোথাও ফেলে টেলে দেবে। তাই মনস্থির করে, ব্যাগটা সঙ্গে নিয়েই জয়দেব নেমে পড়ল। মেয়েটা সম্ভবত, খুব কাছাকাছিই থাকে। ভেতরে ঠিকানা থাকলে পাড়ার কোনও ছেলে বা কৌশিককে দিয়েও, ওর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। খাতাগুলো ফেরত পেলে মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে। জয়দেব সেই খুশিটাই দিতে চায়। সকালের দিকে দোকানে গিয়ে একটা ভালো খবর পেয়েছে। বাড়ির দিকে হাঁটার সময় ও হালকা বোধ করল।

আজ দোকানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই কৌশিক এসে বলল, 'জয়দা, মার দিয়া কেল্লা।'

ওর মুখে চওড়া হাসি দেখে জয়দেব জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

'দিনকালের লেটেস্ট ইস্যুর একটা কপিও হকারদের কাছে পড়ে নেই। পাঁচ হাজার ছাপতে দিয়েছিলেন। দু'দিনের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। একটু পরে হকাররা সব দল বেঁধে আসছে। আরও কপি ছাপতে বলছে। আজ কিন্তু বসন্ত কেবিনের কাটলেট খাওয়াতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, খাওয়াব। আগে সুরেশদাকে বলে দাও। প্রেসে গিয়ে অর্ডারটা দিয়ে আসুক।'

'আপনাকে বলেছিলাম না জয়দা, প্রতি ইস্যুতে যদি একটা করে এক্সক্লুসিভ দিতে পারি, তাহলে কোনও কপি রিটার্ন হবে না। এই দেখুন, সুশোভনদার লেখাটা কীরকম সেনসেশন ক্রিয়েট করেছে। তার মানে...চৈতন্যদেব এখনও বাজারে খায়।'

অত দুঃখের মধ্যেও, কৌশিকের শেষ কথাটা শুনে জয়দেবের হাসি পেয়েছিল। দোকানে বসার জায়গা নেই। ঘরে বেশিক্ষণ বসা যাচ্ছে না, এমন পোড়া পোড়া গন্ধ। সুরেশদা রঙের মিস্তিরিকে খবর দিয়ে এসেছে। আজ সকালে তার আসার কথা ছিল। কিন্তু আসেনি। না আসায় অবশ্য ভালোই হয়েছে। সকালে দোকান খোলার সময় বাড়ির মালিক অংশুমানবাবু বলে গিয়েছেন, দিন সাতেক দোকান বন্ধ রাখতে হবে। পুরনো আমলের বাড়ি। কড়িকাঠ দিয়ে তৈরি। আগুনে কড়িকাঠের ক্ষতি হয়েছে। যে কোনওদিন ওপর থেকে ধসে পড়তে পারে। রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে সে সব মেরামত করতে হবে। কৌশিক এতসব খবর জানে না। ম্যাগাজিনের সাফল্যে বুঁদ হয়ে আছে। দোকান বন্ধ রাখার খবরটা দিলে ওর মন খারাপ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গটা ঘোরানোর জন্য জয়দেব বলেছিল, 'সুমিতা আসেনি?'

'ও বোধহয় আজ আসতে পারবে না। বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। পাত্রপক্ষ আজ দেখতে আসবে ওকে। কেন জয়দা, ওকে কি খুব দরকার?'

'না। এমনিই জানতে চাইছিলাম। ও এলে নেক্সট ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা যেত।'

'সে নিয়ে ভাববেন না। আমরা কাল ডিসকাস করে নিয়েছি। নেক্সট ইস্যুর কভার স্টোরি উত্তমকুমার। ওই সময় উত্তমকুমারের জন্মদিন। সুমি কোত্থেকে শুনেছে, টালিগঞ্জ

মেট্রো স্টেশনের নাম বদলে নাকি মহানায়ক উত্তমকুমার রাখা হবে। এখনও কেউ জানে না। আমরা এক্সক্লুসিভ করব।' শুনে খুশি হয়েছিল জয়দেব।

এই ধরনের খবরই তো দরকার।

বাড়ি পৌঁছে জয়দেব দেখল, লেটার বক্স ভর্তি হয়ে রয়েছে। চিঠিপত্তরগুলো বের করে নিয়ে, তালা খুলে ও ভেতরে ঢুকল। বেলা পাঁচটার সময় ও কোনওদিন বাড়ি ফেরে না। দোকান থেকে ফিরতে ফিরতে ওর রাত ন'টা সাড়ে ন'টা হয়ে যায়। আজ এত তাড়াতাড়ি চলে আসার কারণ একটাই। সেদিন সুশোভনদা দেখা করতে বলেছিলেন, মিউজিয়ামের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার, ওঁরই এক ছাত্র পর্ণব ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে। সেই ছেলেটিকে ফোনে ধরেছিল জয়দেব। ও বলল, মিউজিয়ামে বসে কথা বলা যাবে না। অন্য কোথাও দেখা করাটাই ভালো।

পর্ণব থাকে জোকার দিকে। তার মানে বেহালা চৌরাস্তার খুব কাছে। শুনে ওকে বাড়ি আসতে বলেছে জয়দেব। ওর আসার কথা সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময়। হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক আছে। তার আগে একটু চা খেয়ে নিলে ভালো হয়। মা নেই বলে, বিকেলে মনার মায়ের আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। চা নিজেকেই বানিয়ে খেতে হবে। এই সময়গুলোতে বউ টউয়ের খুব দরকার। মায়ের বলা কথাটা ভেবে নিজের মনেই হাসল জয়দেব। দিদি থাকলে নির্ঘাত মনে করিয়ে দিত। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে, গ্যাস ওভেনে ও চায়ের জল চাপিয়ে দিল।

মিনিট দশেক পর চায়ের কাপ নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসার সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের চোখ পড়ল, বাস থেকে কুড়িয়ে আনা সাইড ব্যাগটার দিকে। চায়ের কাপ সেন্টার টেবলে রেখে ও ব্যাগ থেকে খাতাগুলো বের করল। কোনও ঠিকানা বা ফোন নাম্বার পেলে মেয়েটাকে আজই জানিয়ে দেবে, ব্যাগটা ওর কাছে রয়েছে। প্রথম খাতার প্রথম পাতা খুলেই ও দেখল মেয়েটার নাম লেখা আছে। উপাসনা রায়। পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ। তলায় একটা ফোন নাম্বার, বেহালা এক্সচেঞ্জেরই। ঠিকানাই দেখে জয়দেব মনে মনে নিজেকে তারিফ করল। ও তাহলে ঠিকই ভেবেছিল। মেয়েটা মফস্‌সল শহরের। খাতার দু'চারটে পাতা উলটে ও কৌতূহল বোধ করল। আরে, মেয়েটা তো চৈতন্যদেবকে নিয়ে রিসার্চ করছে। কী আশ্চর্য! নোটসগুলো শেষ পর্যন্ত ওর হাতেই পড়ল। খাতার পাতাগুলো উলটে যেতে যেতে জয়দেব দেখল, নবদ্বীপের কোন এক চৈতন্যচর্চা কেন্দ্রের আচার্য নাকি মেয়েটাকে বলেছেন, চৈতন্যদেব আবার জন্ম নিয়েছেন।

দ্বিতীয় খাতায় জয়দেব কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং পেল। সব জেরক্স কপি। সম্ভবত ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা। সাতাশি সালের স্টেটসম্যান কাগজের একটা খবর ওর নজর টানল। ডেট লাইন ভুবনেশ্বর। 'চৈতন্য রিইনকার্নেট'। জয়দেব দ্রুত খবরটা পড়ে নিল। যাজপুরে বৈষ্ণবদের একটা সম্প্রদায় দাবি করেছে, চৈতন্যদেব আবার জন্ম নিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন মাত্র এক বছর। পুনর্বার জন্ম নেওয়া এই চৈতন্যদেবও নাকি...আসল চৈতন্যদেবের মতো, জন্মের আগে মায়ের গর্ভে ছিলেন চোদ্দো

মাস। বাচ্চাটির লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি চৈতন্যদেবই। প্রথম তাঁকে এক আশ্রমে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মুখেমুখে কথাটা ছড়িয়ে যাওয়ায় দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে যান। তারপরই তাঁকে গোপন কোনও এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ নিয়ে ওড়িয়া বৈষ্ণব সমাজে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।'

জেরক্স কপিগুলোতে চোখ বোলাতে গিয়ে জয়দেব আবিষ্কার করল, ওড়িশার কেন্দ্রপড়াতেও বৈষ্ণবদের এক আশ্রম জানিয়েছে, চৈতন্যদেবের পুনর্জন্ম হয়েছে। ডেটলাইন কটক। খবরটা বেরিয়েছে উৎকল টাইমস কাগজে। দুটো খবরের বয়ান প্রায় একই রকম। তবে কটকের খবরে বাড়তি আর একটা লাইন আছে। শ্রীচৈতন্যদেব নাকি মৃত্যুর আগে বলে গেছিলেন, পাঁচশো বছর পর ফের তিনি মর্ত্যে ফিরে আসবেন। কাকে তিনি বলে গেছিলেন, সে কথার কোনও উল্লেখ নেই। কাগজের দুটো খবর পড়ে জয়দেব একটু অবাকই হল। ও নিজে রিসার্চ করছে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে। প্রচুর বইও পড়েছে। কিন্তু কোথাও দেখেনি, উনি পুর্নজন্ম নেবেন, এই কথাটা বলে গিয়েছেন। উপাসনা বলে মেয়েটা যখন গবেষণা করছে, তখন নিশ্চয় সূত্র পেয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে ভালো হত।

জেরক্স কপিগুলোতে চোখ বোলানোর সময় আরেকটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখতে পেল জয়দেব। খবরটা পুরী ডেট লাইনে। জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন একটা জায়গায় একটা নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো। নরকঙ্কালটি শ্রীচৈতন্যদেবের। এ নিয়ে পুরীর বৈষ্ণব সমাজে প্রবল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। খবরটা লিখেছেন, উৎকল টাইমস-এর স্থানীয় প্রতিনিধি। খবরটা পড়ে গুম হয়ে বসে রইল জয়দেব। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে গবেষণা করছে, অথচ এই খবরটা ও জানতই না। দ্রুত ও খবরটা ভালো করে পড়তে লাগল। উৎকল টাইমস-এ খবরটা বেরয় সাতানব্বই সালের মার্চ মাসে। মাত্র বারো বছর আগেকার কথা। সেই সাংবাদিক নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। পুরীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলা যায়। একটা-না-একটা ক্লু পাওয়া যাবেই। কারা মাটি খুঁড়েছিল, সেই শ্রমিকরা মন্দিরেরই কর্মী কী না, কঙ্কালটা তারা কী অবস্থায় পেয়েছিল, অন্য কারা কঙ্কালটা দেখেছিল, সেটা পরে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, তার ডিএনএ হয়েছিল কি না...এই প্রশ্নগুলো জয়দেবের মনে ভিড় করে এল।

সোফায় অনেকক্ষণ ও চুপ করে বসে রইল। দিনকাল পত্রিকাটা বের করার পর থেকেই রিসার্চের কাজে জয়দেব ভালো করে মন দিতে পারছে না। সারা মাসে লেখা জোগাড় করার, একটা চাপ তো থাকেই। তার ওপর বই ছাপার প্ল্যান করা, ঠিক লোককে দিয়ে সেই বই লেখানো, ভালোভাবে বইটা বের করা...এতেই ওর অনেকটা সময় চলে যায়। বছরে দশটা করে বই ছাপে জয়দেব। পাঁচটা পয়লা বৈশাখের আগে, পাঁচটা অক্ষয় তৃতীয়ার সময়। যারা বই কিনতে আসে, তারা দেখে প্রকাশকের টাইটেল কত? অর্থাৎ কত বেশি সংখ্যক বই প্রকাশক ছেপেছেন। যার টাইটেল বেশি, তার দোকানে ভিড় বেশি। এ ছাড়া,

সারাবছর ধরে জেলায় জেলায় বইমেলা হয়। সেখানে স্টল নেওয়া, সুরেশদাকে পাঠিয়ে সেই স্টল চালানো...চাট্টিখানি কথা নয়।

বাড়িতে হালকা মেজাজে ফিরেছিল। উপাসনা বলে মেয়েটার ব্যাগ খোলার পর থেকে ওর মনটা ফের চঞ্চল হয়ে উঠল। ইস, ব্যবসা সামলাতে গিয়ে ও আসল কাজটাই করতে পারছে না। গত আট মাসে একবারও পুরীতে যাওয়ার সময় পায়নি। কে জানে, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে ইতিমধ্যে অন্য কেউ রিসার্চ শেষ করে ফেলেছেন কি না? তখন তো ওর পুরো গবেষণাটাই মাটি হয়ে যাবে। চার-পাঁচ বছরের পরিশ্রম একেবারে বিফল। সে দিন কৌশিক ঠিকই বলেছিল। পত্রিকা চালানোর কাজ কিছুটা ওর আর সুমিতার হাতে ছেড়ে দিতে। সকালের দিকটা তাহলে ফাঁকা পাওয়া যেতে পারে। জয়দেবের হঠাৎ মনে হল, দোকানে আগুন লাগার জন্য ওর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছে। হাতে সাতটা দিন ফাঁকা পাওয়া যাবে। অংশুমানবাবু ঘর মেরামত করে দেবেন, বলেছেন। এই সময়টার স্বচ্ছন্দে একবার পুরীতে ঘুরে আসা যায়।

কথাটা মনে উদয় হতেই জয়দেব উঠে গিয়ে ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করল অবধূত গোস্বামীকে। বিকেলের দিকে এই সময়টায় উনি সন্ধ্যারতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা চিন্ময়ীর আশ্রমে এই সময় প্রচুর ভক্ত হাজির হন। গোস্বামীজিকে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তবুও জয়দেব পেয়ে গেল। গলা চিনতে পেরে ও প্রান্ত থেকে গোস্বামীজিকে বললেন, 'আপনার চিঠি আর পত্রিকা দুটোই পেয়েছি। ধন্যবাদ।'

জয়দেব বলল, 'শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে সুশোভনদার লেখাটা পড়েছেন?'

'না, চোখ বুলিয়েছি মাত্র। ভালো করে পড়ে তারপর মতামত জানাব। বাই দ্য বাই, আপনার লেখক স্বয়ং আমার কাছে এসেছিলেন দু'তিনদিন আগে। তাঁর সঙ্গেও কথা হল।'

সুশোভনদা তাহলে পুরীতে। ফোনে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভালো। জয়দেব বলল, 'গোস্বামীজি যে কারণে ফোনটা করলাম, সেটা বলি। আমি দিনসাতেকের জন্য পুরীতে আসছি। ডিউক হোটেলে যদি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে রাখেন, তাহলে ভালো হয়।'

'তাই নাকি। চলে আসুন।' ও প্রান্তে গোস্বামীজি উৎফুল্ল, 'আপনি এলে কিছু জিনিস আমি দেখাব। হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে। কবে আসবেন, তারিখটা জানিয়ে দেবেন।'

'দেখি কবে ট্রেনের টিকিট পাই। এখন ছাড়ি। প্রণাম নেবেন।'

ফোন ছেড়ে দেওয়াল ঘড়িতে জয়দেব দেখল, ছ'টা বেজে কুড়ি। পর্ণব বলে ছেলেটা এখুনি এসে পড়বে।

তার আগে উপাসনাকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া দরকার, সাইড ব্যাগটা ও কুড়িয়ে পেয়েছে। খাতায় লেখা টেলিফোন নাম্বারটা দেখে জয়দেব ফোন করল। ও প্রান্তে এক বয়স্ক মানুষের গলা, 'হ্যালো, কাকে চাই? কুমুদ বলছি।'

'উপাসনা রায় আছেন?' আজ বাসে একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। তাতে ওর নাম লেখা আছে।'

'ধরুন। কথা বলুন উপাসনার সঙ্গে।'

ও প্রান্তে ভদ্রলোকের সঙ্গে কার যেন কথা হচ্ছে। রিসিভার হাতবদল হল। একটু পরে মেয়েটা ফোন করে বলল, 'উপাসনা বলছি। ওটা আমারই ব্যাগ। প্লিজ বলুন, কোত্থেকে আমাকে কালেক্ট করতে হবে।'

'ব্যাগটা আপনারই কি না, তা বুঝব কী করে?'

'ওটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। ওর ভেতর আমার অনেক দিনের পরিশ্রম রয়েছে। আমার রিসার্চের নোটস। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি মিথ্যে বলছি না।'

'না না, আমায় ভুল বুঝবেন না ম্যাডাম। আমি চৌরাস্তার কাছেই থাকি। মনে হয়, আপনি কাছাকাছি কোথাও থাকেন। আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন। কাউকে দিয়ে ব্যাগটা পাঠিয়ে দেব।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমার কাকার নাম কুমুদরঞ্জন রায়। ম্যানটনে পুকুরের কাছে এসে যে কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই কাকার বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে। আপনার ব্যাগ আজ রাতের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।'

'আপনার নামটা কী জানতে পারি।'

'জয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ জয়বাবু। অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ফোন নাম্বারটা দেবেন প্লিজ।'

ফোন নাম্বারটা দিয়ে জয়দেব বলল, 'আপনার নোটসগুলো আমি দেখেছি। রিসার্চের সাবজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং।'

'কিন্তু আমি যে ক্রমশই ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছি।'

'কেন বলুন তো?'

'সে অনেক ব্যাপার। ঠিকঠাক এগোচ্ছে না। গাইড করার লোকও আমি পাচ্ছি না।'

জয়দেব ভাবল, একবার বলে, আমি আপনাকে গাইড করব। কিন্তু বলতে গিয়েও নিজেকে ও সামলে নিল। নিজের থিসিসই সাবমিট করতে পারল না। নিজেই রিসার্চের কাজে মন দিতে পারছে না। ও অন্যকে সাহায্য করবে কী করে? একটু চুপ করে থেকে জয়দেব বলল, 'চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। লেগে থাকুন। ঠিক রাস্তা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ছাড়ি তাহলে। ব্যাগটা কুড়িয়ে আনার পর থেকে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমায় নিশ্চিন্ত করলেন।'

ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর জয়দেব অনেকক্ষণ সোফায় চুপ করে বসে রইল। একটা ভালো লাগার রেশ অনেকক্ষণ ওকে বুঁদ করে রাখল। বাসে উপাসনাকে ও ভালো করে দেখেনি। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে মনটা হালকা হয়ে গেল। পর্ণবের সঙ্গে মিটিংটা হয়ে গেলে ও পাড়ার ক্লাবে যাবে। ছেলেদের অনেকেরই বাইক আছে। তাদেরই কাউকে বলবে, ব্যাগটা ম্যানটনে দিয়ে আসতে। প্রত্যেক বছর পাড়ার দুর্গাপুজোর সুভেনিরটা জয়দেব বিনে

পয়সায় ছেপে দেয়। ক্লাবের ছেলেরা খুব খাতির করে ওকে। কোনও অনুরোধ করলে, কখনও না করে না।

ডোরবেলের শব্দ হল। বোধহয় পর্ণব এল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই জয়দেব দেখল অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সুঠাম স্বাস্থ্য, চুল ছোটো করে ছাঁটা। ভদ্রলোকের হাতে দিনকাল পত্রিকার লেটেস্ট কপি। উনি জানতে চাইলেন, 'আপনি জয়দেববাবু?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'লালবাজার থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ভেতরে আসতে পারি?'

তেরো

রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে উপাসনা ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় কাকা বললেন, 'উপা, বোস মা, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

রিসার্চের নোটসগুলো ফেরত পাওয়া যাবে, এই খবরটা পেয়ে উপাসনা তখন খুব খুশি। কাকার ডাকে ও সোফায় বসে পড়ল। এই সময়টায় কাকা আর কাকিমা একসঙ্গে বসে টিভিতে সিরিয়াল দেখেন। কেউ ওঁদের বিরক্ত করে না। ওঁরাও চান না, কেউ বিরক্ত করুক। সেই কাকা সিরিয়াল দেখার মাঝে ওকে বসতে বললেন দেখে, উপাসনা একটু অবাকই হল। লাইব্রেরি থেকে ফেরার পর, পুরো বিকেলটা মনে মনে ও গোবিন্দকে ডেকেছে। বাবা ঠিকই বলেন, গোবিন্দর কাছে মনেপ্রাণে কিছু চাইলে, উনি ফিরিয়ে দেন না।

অতীতেও উপাসনা তার প্রমাণ পেয়েছে। ঠাকুরঘরে সেই গোবিন্দকেই ও প্রণাম করতে যাচ্ছিল। কাকা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর রিসার্চ শেষ হতে আর কতদিন লাগবে রে মা?'

উপাসনা বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না কাকা। এখনও তেমন এগোতে পারিনি।'

'তুই কি সিওর, রিসার্চটা শেষ করতে পারবি?'

'কেন কাকা, হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'প্রশ্নটা তোকে করতাম না মা। কিন্তু কী জানিস, নবদ্বীপ থেকে এবার ফিরে আসার পর, মনে কেমন যেন খটকা লাগছে রে। অ্যাদ্দিন তোকে বলিনি। বললে, তোর মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু তোর নোটিস হারিয়ে যাওয়ার খবরটা শুনে মনে হচ্ছে, কথাটা তোকে বলা উচিত।'

'কী কথা কাকা?'

'নবদ্বীপে এবার শ্রীবৎসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, ও তোর বাবাকে দেখা করতে বলেছিল। তোর বাবার সঙ্গে আমিও গেছিলাম। শ্রীবৎস কীরকম ছেলে, তুই

তো মা জানিস। এমন ভিন্ডিক্টিভ, দেখা না করতে গেলে তোর বাবার পিছনে লেগে যেত। টুকটাক কথার পর, শ্রীবৎস হঠাৎ দাদাকে বলল, শুনলাম, উপা মহাপ্রভুকে নিয়ে রিসার্চ করছে? ওকে বারণ করুন নিশীথদা।...'

এ পর্যন্ত শুনে উপাসনা চমকে উঠে বলল, 'তাই না কি, বাবা কী বলল?'

'ওর বলার ভঙ্গিতে আমার একটু রাগই হয়ে গেল, বুঝলি মা। আমি বললাম, তা কী করে হয়? আচার্য সুধীর মিশ্র মশাই ওকে রিসার্চ করতে বলেছেন। তুমি মানা করার কে? তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে তুমি আচায্যিমশাইকে বলো। শ্রীবৎস বোধহয় আশা করেনি, আমরা পাশ কাটিয়ে যাব। তাই চটে গিয়ে বলল, আপনি তো জানেন কুমুদদা, আমি আচায্যিমশাই ফশাইকে পাত্তা দিই না। যা বললাম, তা-ই করুন। না হলে আপনাদের কিন্তু প্রবলেমে পড়তে হবে।'

উপাসনা বলল, 'আমি কী নিয়ে রিসার্চ করব, সে আমার ব্যাপার। ওর এত মাথাব্যথা কেন?'

'জানি না। ঠারেঠোরে যা বোঝাল, তা হল, মহাপ্রভুকে নিয়ে রিসার্চ করতে হলে বৈষ্ণব সমাজের পারমিশন নিতে হবে। ওদের সমাজই বিধান দেবে, বিষয় ঠিক করে দেবে। দাদা বলল, মহাপ্রভুকে নিয়ে এত রিসার্চ হয়েছে, সবাই কি তোমাদের পারমিশন নিয়ে করেছে? ও বলল, ওইসব রিসার্চকে আমরা গুরুত্ব দিই না। ওরা দেয়। ওরা বই বের করে, মহাপ্রভুকে ভাঙিয়ে বিজনেস করে। ওরা মানে তুই তো জানিস, ইসকন।'

'ভারী আশ্চর্যের কথা তো?'

'গা জোয়ারি, তা ছাড়া আর কী? শোনই না, শেষে যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে, শ্রীবৎস ইসকন-এর নামে যা তা বলতে শুরু করল। আমি বলি কী, ওদের তো তুই চিনিস। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের একটা অংশ চায় না, তুই এই সাবজেক্টটা নিয়ে রিসার্চ করিস। দুম করে কেউ শাপ দিয়ে দেবে। হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েও দিয়েছে। না হলে তোর নোটস হারিয়ে যাবে কেন? ওদের শাপ ভয়ানক। আমাকে কীরকম ভুগতে হয়েছে, তুই তো জানিস মা। তুই বরং অন্য কোনও সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ কর।'

'কী বলছেন কাকা? আমি যে আচায্যিমশাইকে কথা দিয়েছি।'

'শোন মা, শ্রীবৎসের হুমকি তোর মায়ের কানেও গেছে। বউঠান ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কথায় কথায় সেদিন আমায় বলছিল, এ দিকে ভালো ছেলে-টেলে থাকলে, সন্ধান দিতে। এবার যে তোর বিয়ের কথা আমাদের ভাবতে হবে রে।'

'এত তাড়াহুড়োর কী আছে কাকা? আমার তো সবে পঁচিশ প্লাস। শ্রীবৎসের মতো একটা গোঁয়ার কী বলল, তাতে ভয় পেয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে? ও তো আমাকেও একবার ধরেছিল।'

'দ্যাখ মা, তুই হচ্ছিস আমাদের বংশের বড়ো মেয়ে। তোর বিয়েটা আমাদের খুব দেখেশুনে দিতে হবে। তোর বাবার বয়স হচ্ছে। তোকে সেটল করে দিতে পারলে, দাদা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। শোন মা, যে কারণে তোকে বসতে বললাম। তোর কাকিমা ভালো

একটা ছেলের খোঁজ পেয়েছে। সফটওয়ার তৈরির ব্যবসা করে। নিজেদের বাড়ি। প্রচুর পয়সা। বছরের অর্ধেক সময় বিদেশে থাকে। ছেলেটা নাকি খুব হ্যান্ডসামও...।'

'কিন্তু কাকা, বিয়ে করার জন্য মেন্টালি আমি প্রিপেয়ার্ড না।'

কাকিমা বলল, 'শোন সোনা, বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর না। আমার তো উনিশ বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। কী খারাপটা আছি বল? ভালো ছেলে হাতের কাছে পাওয়া খুব মুশকিল, বুঝলি। এই ছেলেটাকে আমি ভালো করে চিনি। তোর বিলুমামার কাছে টিউশন নিতে, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখে থাকবি।'

'তাহলে আমার রিসার্চের কী হবে কাকিমা?'

'বিয়ের পরও তুই রিসার্চ কর না, কে তোকে বারণ করেছে?'

'কিন্তু ছেলেটা যদি পছন্দ না করে?'

'দূর বোকা, এখনকার যুগে এমন ছেলে আছে নাকি? বউকে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখবে? ছেলেটার সঙ্গে তা'লে কথা বলে নে। ফ্যামিলিতে বাবা-মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবাটা তো খুবই প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডের। তোর রিসার্চের কথা আমি ওঁকে বলেছি। শুনে খুব আগ্রহ দেখালেন।'

'সবাই প্রথম প্রথম ওরকম বলে কাকিমা। কমপ্লিকেশনটা তারপরে শুরু হয়।'

কাকা বলল, 'কীরকম ছেলে তোর পছন্দ বল তো মা।'

'পড়াশুনো জগতের হলে ভালো হয় কাকা।'

'তোর পছন্দের কেউ আছে। যদি থাকে বল, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজি।'

'না, না। সেরকম কেউ নেই। আমি বলছিলাম কী, আগে রিসার্চের কাজটা আমি শেষ করে নিই। তারপর আপনারা ছেলে দেখুন।'

'তুই চিন্তা করিস না উপা। আজ বললে কালই হুট করে তোর বিয়ে হয়ে যাবে, এমনটা কিন্তু হবে না। দেখিস, কথাবার্তা এগোতেই বছর ঘুরে যাবে। আমি বলি কী, এই ছেলেটার সঙ্গে তুই একবার কথা-টথা বল। তোর যদি ভালো লাগে, তবেই আমরা এগোব। নইলে নয়।'

কাকিমা বলল, 'দ্যাখ সোনা, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, সবই ভগবানের হাতে। যার সঙ্গে তোর লেখা আছে, তার সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। আমি বলি কী, ছেলেটাকে একদিন বাড়িতে নেমতন্ন করি। আলাপ করেই দ্যাখ না। তোকে কিন্তু সেদিন রান্না করতে হবে। কী বল, রাজি?'

কাকা-কাকিমার কথার অবাধ্য উপাসনা কোনওদিনই হয়নি। 'আপনাদের যা ইচ্ছে' বলে ও উঠে পড়ল। নোটস ফিরে পাওয়ার আনন্দটা সেই মুহূর্তেই ওর উবে গেল।

উপাসনা জানে, বিয়ের উদ্যোগটা ক'দিন আগে নিয়েছে মা। তার একটা কারণ আছে। নবদ্বীপে ওদের প্রতিবেশী বিরজাকাকুর মেয়ে স্বপ্না, ওর মতোই কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল। হঠাৎ ও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির বিরজাকাকু জানতে পারে, স্বপ্না একটা নীচু জাতের ছেলেকে বিয়ে করে, দিল্লি চলে গেছে। ব্যস, খবরটা শোনার

পর থেকেই মায়ের মাথা খারাপ। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ বিরজাকাকুকে একঘরে করে দিয়েছে। সেই খবরটা কানে যাওয়ার পর থেকে মা, ওর বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। মাকে উপাসনা কী করে বোঝাবে, সব মেয়ে সমান নয়? নিজের ঘরে ফিরে ও অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। বিয়েটা বোধহয় আর ঠেকানো যাবে না। রিসার্চ চালিয়ে যাওয়ার কথা কাকাকে ও বলল বটে, কিন্তু আট মাস হয়ে গেল, একবিন্দুও এগোতে পারেনি।

প্রথমত, গাইড হতে কেউ রাজিই হচ্ছেন না। সাত থেকে আট জন প্রোফেসরের বাড়ি উপাসনা ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু কেউই ওর বিষয়বস্তু নিয়ে আগ্রহ দেখাননি। এমনকি ওর প্রিয় প্রোফেসর অনিরুদ্ধ মৈত্রও। অথচ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় উনি উপাসনাকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন। কিন্তু তিনিও বলে দিয়েছেন, 'তুমি যা করতে চাইছ, কোনও ইউনিভার্সিটি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। একটা জনশ্রুতি কখনও রিসার্চের সাবজেক্ট হতে পারে না। তোমাকে আমি দমিয়ে দিতে চাই না উপাসনা। গবেষণা চালিয়ে যাও। পরে তোমার ফাইন্ডিংস বই হিসাবে বের করতে পারো। বিদেশে আকচার এইসব সাবজেক্ট নিয়ে বই বেরয়। এই তো একটা বই বেরিয়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব নাকি নারীবিদ্বেষী ছিলেন।'

সত্যি বলতে কী, যতদিন যাচ্ছে, ততই উপাসনা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে। আট মাসে মাত্র একটা ক্লু ও পেয়েছে। চৈতন্যদেব জন্ম নিয়েছেন। হয় যাজপুরে, না হয় কেন্দ্রপড়াতে। তেইশ বছর আগের একটা খবর। সেটা সত্যি কি না, তা বের করতে হলে; ওকে ওই দুটো জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু কার সঙ্গে ও যাবে? তাছাড়া, ওখানে গিয়েই যে চৈতন্যদেবের সন্ধান পেয়ে যাবে, তেমনটা হবে কি? তাঁকে তো রাখা হয়েছে গোপন কোনও জায়গায়। তর্কের খাতিরে উপাসনা যদি ধরেও নেয়, যাজপুর বা কেন্দ্রপড়ায় গেলে চৈতন্যদেবের খোঁজ ও পেয়ে যাবে, তাহলে প্রমাণ করবে কী করে, কয়েক জন্ম আগে উনিই চৈতন্যদেব ছিলেন? লেখালেখি করে, কার কাছেই বা থিসিসটা ও জমা দেবে?

আরও একটা সমস্যা আছে। সেই ধাক্কাটা আসবে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ থেকে। ওরা ভয়ানক গোঁড়া। উপাসনার এক পিসির বিয়ে হয়েছে গোঁসাই পরিবারে। অপূর্বসুন্দরী সেই পিসিকে ওঁরাই পছন্দ করে নিয়ে যান। পিসির বিয়ের পর থেকে বৈষ্ণবদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি সব কঠোরভাবে পালন করতে হচ্ছে উপাসনাদের। না করলে গোঁসাই পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বতার সম্পর্ক থাকবে না। নবদ্বীপে ওদের বাড়িতে মাছ, মাংস, পেঁয়াজ-রসুন ঢোকে না। খাওয়া-দাওয়া হয় কাঁসার বাসনে। পরিবারের বয়স্করা এখনও কলকাতায় আসতেন চান না। এলেও, জল পর্যন্ত মুখে দেন না। ওদের পরিবারে একমাত্র কাকাই বিদ্রোহ করে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কলকাতায় এসে পড়াশুনো করেছেন। প্রেম করে বিয়েও। বৈষ্ণব সমাজ অবশ্য কাকিমাকে এখনও গ্রহণ করেনি। কাকিমা কায়স্থ পরিবারের মেয়ে। কখনো-সখনো নবদ্বীপের বাড়িতে গেলে, কাকিমা মন্দিরে ঢুকতে পারেন না।

শ্রীবৎসকে খুব ভালো করে চেনে উপাসনা। পিসির ভাসুরের ছেলে। রাজনীতি করে বলে, নবদ্বীপের লোক ওকে একটু সমঝেই চলে। শ্রীবৎসের একটা টোল আছে রামেশ্বরী মন্দিরের কাছে। উপাসনা জানে, একবার রাস উৎসবের সময় শ্রীবৎসের সঙ্গে কাকার ঝগড়া হয়েছিল। ও খুব অপমান করেছিল কাকাকে। সে বার নবদ্বীপের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে, ইসকনের মন্দির দেখানোর জন্য কাকিমাকে মায়াপুর নিয়ে গেছিল কাকা। কথাটা কীভাবে যেন শ্রীবৎসের কানে যায়। ইসকনের লোকজনদের ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। ব্যস, রাসের দিন রামেশ্বরী মন্দিরে যেতেই কাকাকে যা-তা বলতে শুরু করে শ্রীবৎস। উপাসনা তখন সবে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছে।

তবুও ওর মনে আছে, কাকাকে সিআইএ-র দালাল বলেছিল শ্রীবৎস। আরও বলেছিল, যে ইসকনের দালালি করবে, সে নির্বংশ হয়ে যাবে। শুনে মা-জেঠিমারা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। পিসি দুজনের মাঝে গিয়ে না দাঁড়ালে, সেদিন মন্দিরেই খুনোখুনি হয়ে যেত। শ্রীবৎসের শাপ অবশ্য লেগে গিয়েছিল বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই। কাকার ছেলে রাহুলের বয়স তখন সাত। স্কুল থেকে বাড়ি আসছিল। ফেরার পথে স্কুল বাসেই অ্যাক্সিডেন্ট। ব্রেক ফেল করে বাস গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরেছিল লোহার ডিভাইডারে। রাহুল মারা যায়। কাকা আর কাকিমা তারপর থেকে নবদ্বীপে যাওয়া কমিয়ে দেয়।

রাহুল মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে পোড়ামাতলার মন্দিরে শ্রীবৎসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল উপাসনার। খালি গা, পরনে সাদা ধুতি। কপালে চন্দনের টিপ। একটা দশকর্মা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীবৎস কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। ওকে দেখেই ধমকের সুরে বলেছিল, 'হ্যাঁরে শুনলাম তুই নাকি মহাপ্রভুকে নিয়ে কীসব রিসার্চ-টিসার্চ করছিস?'

লোকটাকে দেখেই রাগ হয়ে গেছিল উপাসনার। যেন শুনতে পায়নি, এমন ভাব দেখিয়ে ও চলে যাচ্ছিল।

পথ আগলে দাঁড়াল শ্রীবৎস। বলল, 'কীরে উপা, তোকে বলছি। শুনতে পাচ্ছিস না?'

উপাসনা তখন চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'আমাকে বলছ? কেন বলো তো?'

'কলকাতায় থাকিস বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি? চার পাতা ইংরেজি পড়ে নিজেকে দিগগজ ভাবছিস বুঝি?'

আর সহ্য হয়নি উপাসনার। ও বলেছিল, 'আমি যদি নিজেকে দিগগজ ভাবি, তাহলে তোমার আপত্তির কারণটা কী শ্রীবৎসদা? তোমার টোলের পাশে তো টোল খুলতে যাচ্ছি না...'।

'খুব সাহস বেড়েছে দেখছি। মহাপ্রভু সম্পর্কে তুই কী জানিস যে, রিসার্চ করছিস?'

'তোমার তাতে কী? চোখ গরম করলে আমি কিন্তু মানব না। জগৎটা অনেক বড়ো। তোমাদের বৈষ্ণব সমাজ কী বলল না বলল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। পথ ছাড়ো।'

সেদিন পথ ছেড়ে দিয়েছিল বটে, শ্রীবৎস কিন্তু ভয় দেখিয়েছিল, 'দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা আমি করছি। তোদের ফ্যামিলি নবদ্বীপে থাকে কী করে, দেখাচ্ছি।'

বাড়িতে ফিরে কাউকে কিছু বলেনি উপাসনা। বললে বাবা আর মা ঘাবড়ে যেত। পিসির মুখ চেয়ে বাবা শ্রীবৎসকে কিছু বলতে পারেন না। তাহলে গোঁসাই বাড়িতে পিসিকে ওরা কষ্ট দিতে পারে। পিসিও তখন এ বাড়িতে এসে কান্নাকাটি করবে। তারপর বাবা-মা পিসির কথাই মেনে নিয়ে, চুপ করে যাবে। কিন্তু অত্যাচারের তো একটা সীমা আছে। অভিশাপের ভয়ে কদ্দিন আর মুখ বুঁজে থাকা যায়? এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরনের কুসংস্কার মানতে হবে কেন?

সারা নবদ্বীপের মানুষ জানে, অপছন্দের লোককে শাপ দেওয়ার ব্যাপারে, শ্রীবৎসের দাদা সনাতন গোঁসাই আরও এককাঠি ওপরে। একবার তাঁর অভিশাপের হাত থেকে উপাসনা নিজে বেঁচে গেছিল। টিভিতে তখন মহাপ্রভু বলে একটা সিরিয়াল হত। তাতে ওকে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য, বাবার কাছে হত্যে দিয়ে পড়েছিল প্রোডাকশনের লোকজন। বোধহয় ওকে কোথাও দেখেছিল। বাবা আর মা দ্বিধা করছিল। হয়তো রাজিও হয়ে যেত। দু'একদিনের মধ্যে কথাটা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে রটে গেছিল। হঠাৎ গোঁসাই বাড়ি থেকে একদিন পিসি এসে হাজির। বলল, 'সনাতন বলেছে, উপা বিষ্ণুপ্রিয়ার রোল করবে, ওর এতবড়ো স্পর্ধা? ওকে মানা করো।'

বাবা বলেছিল, 'সনাতনের আপত্তির কারণটা কী রে?'

পিসি বলেছিল, 'তা জানি না দাদা। সনাতন বলেছে, ওই রোল যে করবে, সে কিন্তু বেশিদিন বাঁচবে না। অপঘাতে তার মৃত্যু হবে। আমি শাপ দিচ্ছি।'

ভয়ে বাবা পিছিয়ে গেছিল। প্রোডাকশনের লোকজনকে পরদিনই ফিরিয়ে দিয়েছিল। উপাসনার নিজের যে অভিনয় করার খুব ইচ্ছে ছিল, তা নয়। কিন্তু পিসির কথা শুনে ওর রাগ হয়েছিল। সিরিয়ালে ও অভিনয় করেনি বটে, কিন্তু রোজ ওই সময় টিভির সামনে বসত। চুমকি বলে একটা মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করত তখন। সে কিন্তু বিখ্যাত হয়ে গেছিল। আশ্চর্য, মেয়েটা সত্যিই খুব বেশিদিন বাঁচেনি। হঠাৎ একদিন ঘরে ওকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে জানা গেছিল, চুমকি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু পরে পুলিশ সন্দেহ করে, ওকে খুন করা হয়েছে। খবরটা কাগজে পড়ে, চমকে উঠেছিল উপাসনা। শাপটা চুমকির লেগেছিল বলে। চুমকি তো আর শাপের কথা জানত না। জানলে, কে জানে পিছিয়ে যেত কি না? বহুদিন পর চুমকির কথা মনে পড়ায় উপাসনা শিউরে উঠল। শ্রীবৎস আর সনাতনের মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, এই প্রথম ও দ্বিধা অনুভব করল। মহাপ্রভুর পুনর্জন্ম নিয়ে সত্যিই আর মাথা ঘামাবে কি না।

চোদ্দো

তিলজলার গফফুর মোল্লার বস্তিতে গোরা যখন পৌঁছল, তখন বেলা দশটা বেজেছে। অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে আগে ও এই বস্তিতে ঘুরে গেছে। মাধবী বলে মেয়েটার সঙ্গেও সেদিন

কথা বলেছিল। ফলে জায়গাটা চিনতে ওর অসুবিধে হল না। বড়ো রাস্তা থেকে গলিতে ঢোকার মুখেই ও দেখতে পেল, পুলিশের একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ারলেসে কী কথা চালাচালি হচ্ছে। জায়গাটা থমথম করছে। দোকানপাট বন্ধ। এসব দেখে ট্যাক্সি ড্রাইভার আর ভেতরে যেতে চাইল না। ভাড়া মিটিয়ে গোরা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। আগের দিন এই রাস্তাটা এত গমগম করছিল যে, ও ভালো করে হাঁটতে পারছিল না। আজ একটাও লোক নেই। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বস্তির দিকে ও হাঁটতে লাগল।

সকাল সাতটার সময় অদ্বৈতবাবু ফোন করে যখন ওকে ডাকেন, তখনও গোরা বুঝতে পারেনি, এমন মারাত্মক কিছু ঘটেছে। উনি শুধু বলেন, 'মাধবী বলে মেয়েটা খুন হয়েছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো।' তার মানে, উনি এখন নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার ঘরের কাছাকাছি আছেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই, বস্তির মুখে গোরা দেখল, প্রায় হাজারখানেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই খুব ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত। অদ্বৈতবাবু ওদের ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ ওঁর কথা শুনতে চাইছে না। তর্ক জুড়ে দিয়েছে। ভিড়ের মাঝে গোরা এন্টালি ইউনিটের তরুণ মাজিকে দেখতে পেল। ঘটনাটা ঘটেছে তিলজলায়। তরুণ এখানে কী করছে? গোরার মন বলল, আজ আরও খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এরা বদলা নেওয়ার কথা বলছে।

ওকে দেখে হঠাৎই বস্তির মানুষ চুপ করে গেল। একটা টুল দিয়ে তরুণ বলল, 'বসুন গোরাদা। আপনি এসেছেন, ভালোই হল। অদ্বৈতবাবুকে আপনি চলে যেতে বলুন। না হলে কিন্তু ওর সম্মান আজ আমরা রাখতে পারব না।'

অদ্বৈতবাবু বেশ খানিকটা দূরে। কথাটা ওঁর কানে যাওয়া সম্ভব নয়। শুনে গোরা মুখটা কঠিন করে বলল, 'এত এক্সাইটেড হওয়ার কী আছে তরুণ? কী হয়েছে, পুরো ব্যাপারটা আমায় বলো।'

'বস্তির জলের প্রবলেমটা তো আপনি জানেন। পুকুরের দূষিত জল খেয়ে অর্ধেক লোকই পেটের অসুখে ভুগছে। কাল ভোর রাতে লুকিয়ে, ভদ্দরলোকদের পাড়া থেকে জল আনতে গেছিল মাধবী বলে মেয়েটা। জানত না, ওরা নাইট গার্ড রেখেছে। টিউব ওয়েল থেকে জল নেওয়ার সময় ও ধরা পড়ে যায়। চোর অপবাদ দিয়ে নাইটগার্ডরা ওকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। এত মার খাওয়া সত্ত্বেও, মেয়েটা কোনওরকমে বস্তি অবধি এসেছিল। মনে হয়, ওর ছেলেটাকে শেষ দেখা দেখতে। কিন্তু বস্তিতে ঢুকেই এক্সপায়ার করে। কাল সকালে পুলিশ ওর লাশটা নিয়ে গেছিল। পোস্ট মর্টেম করার পর আজ ফেরত দিয়েছে।'

'পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে কজ্ অব ডেথ কী লেখা আছে?'

'হার্ট ফেল করে মারা গেছে। ভাবতে পারেন, ইনজুরির কোনও উল্লেখই নেই! রিপোর্টটা দেখার পর তিলজলা থানার ও সি-কে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইনজুরির কথা লেখা নেই কেন? উনি বললেন, আমরা কিছু জানি না। ডাক্তার যা রিপোর্ট দিয়েছে, সেইভাবেই আমাদের কেস সাজাতে হবে।'

'মেয়েটাকে কে মেরেছে, কেউ দেখেছে?'

'দেখার মতো লোক তখন কোথায়? ভোর রাতে কে জেগে থাকবে, বলুন? সকালে উঠে বস্তির লোক দেখে ওর ডেডবডিটা নালায় পড়ে আছে। এখানে এসে শুনলাম, এটা টাকলা জগাইয়ের কাজ। ওর সঙ্গেই অ্যাদ্দিন ঝামেলা চলছিল এদের। খুন যে ও-ই করেছে, আমি কনফার্মড। এদিকে লোকজন জড়ো হতে দেখে, জগাই পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। আমরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না গোরাদা। মারের বদলে মার। দু'একটা লাশ না-ফেলা পর্যন্ত আমরা থামব না।'

গোরা ঠান্ডা গলায় বলল, 'তাহলে আমায় ডাকলে কেন তরুণ? নিজেরাই যখন ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ, তখন যা ইচ্ছে করো। আমি চললাম।'

শুনে তরুণ মিইয়ে গেল, 'এই সময়....আপনি রাগ করছেন গোরাদা?'

'করব না কেন বলো? মারপিট করলেই সমস্যার সমাধান হবে? যা বলছি শোনো। আগে মেয়েটার সৎকার করা দরকার। তারপর প্রেশার সৃষ্টি করা যাবে। আমার সাজেশন যদি চাও, তাহলে আশপাশে আমাদের যত ইউনিট আছে, প্রত্যেককে খবর দাও। দলে দলে ওরা চলে আসুক। তোমার এন্টালি, পাশে শেয়ালদা থেকে শুরু করে, এদিকে মল্লিকবাজার, বেনেপুকুর, কড়েয়া, ওদিকে গোবরা, তপসিয়া, জানপুকুর, চার নম্বর ব্রিজ, পিকনিক গার্ডেন্স, পার্ক সার্কাস...চার পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসে, আমাদের পার্টির যত লোক আছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে হাজির করো, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টস-এর মোড়ে। সব মিছিল যেন একই সময়ে ওখানে পৌঁছয়। তারপর দেখো, কী হয়। জল আন্দোলনকে সামনে রেখে কলকাতার এ দিকটা আমরা প্যারালাইজড করে দেবো।'

শুনতে শুনতে তরুণ উত্তেজিত, 'গুড আইডিয়া। আমি ফোনে ফোনে সবাইকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।' মাধবী বলে মেয়েটার লাশ একটা চাটাইয়ের ওপর শোয়ানো। সেদিকে একবার তাকিয়ে গোরা মুখ ফিরিয়ে নিল। চেনাই যাচ্ছে না। মানুষ এত নৃশংস হতে পারে? কী অপরাধ করেছিল মেয়েটা? তৃষ্ণা মেটানোর জন্য জল আনতে গেছিল। ছোটোবেলা থেকে গোরা শুনে আসছে, জলের আরেক নাম জীবন। ভুল জেনেছিল। জলের আরেক নাম মৃত্যু। স্বাধীনতার তেষট্টি বছর হয়ে গেছে। এখনও বহু মানুষ পানীয় জল পায় না। দেশের অনেক জায়গায় এখনও অনেক মানুষকে পানীয় জল আনতে হয়, আধবেলা পথ হেঁটে। এই স্বাধীনতার কী মানে হয়? সরকার চালান উচ্চবর্ণের মানুষরা। দেশটা চলে ওদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কী হল না হল, তাতে ওঁদের কী আসে যায়? জল আন্দোলনে শহিদ এই মাধবীর মৃত্যু ওঁদের মনে কোনও রেখাপাতই করবে না। টাকলা জগাই না কে.....আর ক'দিন পর পাড়ায় ফিরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। পুরো কেসটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। অন্য দিকে, মাধবীর ছেলেটা না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

'স্যাড, খুব স্যাড।'

মুখ ফিরিয়ে গোরা দেখল, বুম হাতে ইলেকট্রনিক চ্যানেলের এক রিপোর্টার। এই

ছেলেটা আগের দিনও হাজির ছিল। নামটা সেদিন জানা হয়নি। তিলজলার জলের সমস্যাটা সেদিন ওদের চ্যানেলে দেখানো হয়েছিল কি না, গোরা তা জানে না। টিভি দেখার সময় ও পায় না। মনে তো হয়, দেখায়নি। দেখালে এই ক'দিনে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মিডিয়াও চালায় উচ্চবর্ণের লোকেরা। সাধারণ মানুষের দুর্দশা নিয়ে ভাবার সময় ওদের কোথায়? যাদের বাড়িতে টিভি আছে, ওরা তাদের জন্য। অদ্বৈতবাবু একদিন বলছিলেন, এইসব রিপোর্টারের হাত-পা বাঁধা। ওদের যা করতে বলা হয়, ওরা তাই করে। ওদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। কথাটা মনে পড়ায় গোরা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'গোরাবাবু, আমি চন্দন গাঙ্গুলি। আপনার সঙ্গে সেদিন আমার পরিচয় হয়েছিল।'

গাঙ্গুলি পদবি শুনেই গোরার কথা বলার ইচ্ছেটা চলে গেল। ও বলল, 'তাই নাকি? আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আপনি কোন চ্যানেলের?'

'আমাদের বাংলা। আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল। আপনাদের নেক্সট স্টেপ কী?'

'কী হওয়া উচিত বলুন তো?'

'আমার তো মনে হয়, ডেডবডিটা নিয়ে গিয়ে, আপনাদের থানা ঘেরাও করা উচিত।'

চালাক ছেলে। নিউজের কথা ভাবছে। ডেডবডি নিয়ে ওর থানা ঘেরাও করলে, খবরটা বড়ো হবে। ওর চ্যানেলে ফলাও করে দেখানো হবে। রিপোর্টারগুলো স্বার্থপর হয়। বিরক্তি চেপে গোরা বলল, 'আপনি কি অদ্বৈতবাবুকে চেনেন? ওই যে উনি, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, বস্তির লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন, ওর কাছে যান উনি দলিত পার্টির নেতা। কথাটা ওর কাছে গিয়ে বলুন।'

'ওকে চিনি। উনি কিন্তু আমাকে আপনার কাছেই পাঠালেন।'

'তাহলে একটু ওয়েট করুন।' বলেই হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল গোরা। তারপর বলল, 'আর ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা ডেডবডি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

......বেলা বারোটার সময় মাধবীর ডেডবডি নিয়ে গোরা যখন বেরল, তখনই শোক মিছিলে হাজার চারেক লোক। কোনও স্লোগান নেই। ব্যানার ফেস্টুন কিছু নেই। গোরা সবাইকে মানা করে দিয়েছিল। মিছিলটা এমনভাবে নিয়ে যেতে হবে, যাতে মনে হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছে। গফফর মোল্লা বস্তি থেকে বেরিয়ে ওরা বড়ো রাস্তার দিকে এগোল। অবরোধের কথা শুনে অদ্বৈতবাবু আধঘণ্টা আগে চলে গেছেন। সিদ্ধান্তটা ওঁর মনঃপূত হয়নি জানা সত্ত্বেও, গোরা কিন্তু সুযোগটা ছাড়তে চায়নি। সংঘর্ষে না গেলে প্রশাসন কোনও কথা শুনবে না। এটা ও ভালোমতো জানে। মিছিল নিয়ে বেরনোর আগে ও তিনটে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। দাবি মানা না হলে অবরোধ চালিয়ে যাবে। ওর প্রথম দাবি, টাকলু জগাইকে গ্রেফতার করতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, তিনজলার কাউন্সিলারকে ক্ষমা চাইতে হবে। তৃতীয় দাবি, গফফর মোল্লা বস্তিতে ইমিডিয়েটলি দুটো টিউবওয়েল বসাতে হবে।

পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টসের দিকে এগোনোর সময়ই গোরা টের পেল, মিছিলের লেজ ক্রমশই লম্বা হচ্ছে। কাতারে কাতারে লোক আসছে অলিগলি থেকে। ক্রসিংগুলোয় যানজট হয়ে গেছে। কাজের দিন, এই সময়টায় খুব ট্রাফিক ফ্লো থাকে। ইচ্ছে করেই

মাধবীর ডেডবডিটা নিয়ে ওরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল। আশপাশের বাড়ির বারান্দায় লোকজনের ভিড় জমেছে। দোকানপাট থেকেও লোক বেরিয়ে এসেছে। সবার মুখেই কৌতূহল। মিছিলে তারা শাসক দলের আস্ফালন দেখেছে, অথবা বিরোধী দলের হিংস্র প্রতিবাদ। এরকম নীরব মিছিল তো কলকাতার মানুষ কোনওদিন দেখেনি! মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে গোরার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। একটা পানশালার পাশ দিয়ে হাঁটার সময়, মরাঠি কবি নামদেব দাশালের একটা কবিতার কথা ওর মনে পড়ল। দলিত কবিদের কয়েকটা লেখা বাংলায় অনুবাদ করে, পার্টির সদস্যদের মধ্যে বিলি করেছেন অচিন্ত্য বিশ্বাস বলে একজন। সেই কবিতাটি একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে গেছে গোরার। হাঁটতে হাঁটতেই মনে মনে ও আবৃত্তি করতে লাগল।

'সোডা বোতলের ছিপি খোলার শব্দ ওদের ডানায়
স্বল্পকালের কিংবা
পাঁচ দশ মিনিট উছলে ওঠার,
শোঁকে নারীর শরীর
চলার পথের দু'ধারে ওদের সম্পদের বাহার
বড় বাড়ি, কারখানার চূড়া
শহরের রেস্তোরাঁ, সেখানকার সুস্বাদু খাবার
সবকিছুতে দখলদারি
সর্বত্র ওদের ডানার বিস্তার
আমি কেন জন্মালাম এই দেশে
দারিদ্র মাথায় করে
আমি শালা, কেন আমৃত্যু সইব এ সব?'

কবিতাটা কয়েকবার আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে গোরার মনের জোর আরও বেড়ে গেল। কবিতার শেষ লাইনটাই ওকে সাহস জোগাল। ওই সময় মোবাইল ফোনটা বাজতে দেখে ও সুইচ অন করে দেখল, অচেনা নাম্বার। 'হ্যালো' বলতেই, ও প্রান্তে থেকে ভরাট গলা, 'গোরাবাবু, আমি তিলজলা থানার ও সি বলছি। একটু আইডিয়া দেবেন, আপনাদের মিছিলটা কোথায় যাচ্ছে?'

গোরা বলল, 'কেন, মিছিলের সঙ্গেই তো আপনাদের একটা ওয়ারলেস ভ্যান আছে। ওদের জিজ্ঞেস করুন। ওরাই তো বলতে পারবে।'

'আপনারা কী চান, বলুন তো?'

'আগে টাকলু জগাইকে অ্যারেস্ট করুন। তারপর বাকি ডিম্যান্ডগুলো জানাব।'

'অফিস আওয়ার্সে রাস্তা জ্যাম করার মানেটা কী?' ও সি-র গলা তাতছে, 'আমি কিন্তু ড্রাসটিক অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব।'

'আপনার যা ইচ্ছে করুন। থানায় বসে লম্বাচওড়া কথা বলবেন না। পারলে এখানে আসুন। এসে সামনাসামনি কথা বলুন।' বলেই লাইনটা কেটে দিল গোরা।

আধ ঘণ্টা পর পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টসের মোড়ে এসে গোরা দেখল, লোকে লোকারণ্য। থিয়েটার রোডের দিকটা ছাড়া বাকি কোনও রাস্তা ফাঁকা নেই। আইল্যান্ডস-এর পাশে ডেডবডিটা রেখে, তরুণকে ও খুঁজতে লাগল। বস্তি থেকে বেরনোর আগে গোরা ওকে বলে দিয়েছিল, মিছিলের একেবারে শেষদিকে থাকতে। কেননা মিছিলে পুলিশ আজেবাজে লোক ঢুকিয়ে দিতে পারে। এই বিশ্রী অভিজ্ঞতাটা ওর আছে, ব্যারাকপুরে। তরুণকে আশপাশে দেখতে না পেয়ে মোবাইলে ফোন করে ও বলল, 'একটা মাইকের ব্যবস্থা করতে পারো, তরুণ?'

'ব্যবস্থা হয়ে গেছে গোরাদা। ইসতাক বলে আমাদের ইউনিটের একটা ছেলে অলরেডি মাইক ফিট করে ফেলেছে। আপনি এখন কোথায়?'

'ডেডবডির কাছাকাছি আছি।'

'ওখানেই থাকুন। আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে গোরাদা। আজ জমায়েতে আপনি কিছু বলুন। পার্টির বুড়ো ভামগুলো নেই। ভালোই হয়েছে। দেখছেন তো, আপনার নামে কত লোক হাজির হয়েছে? তাও কত অল্প সময়ের মধ্যে?'

শুনে গোরা খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি এদিকে চলে এসো।'

তরুণ ছেলেটা যে এত করিৎকর্মা, গোরা ভারতেও পারেনি। ওর ছেলেরা কোত্থেকে চৌকি জোগাড় করে, কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মঞ্চও বানিয়ে ফেলল। সেই মঞ্চে উঠে গোরা যখন মাইক হাতে নিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হচ্ছে, সেই সময় ও দেখল, দূরে চার নম্বর ব্রিজের দিক থেকে দ্রুত একটা অ্যাম্বুলেন্স নেমে আসছে। পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে ভিড় দেখে অ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়িয়ে গেল। সাইরেন বাজিয়েই যাচ্ছে। ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও রোগী আছেন। সম্ভবত পার্ক সার্কাস ব্রিজ ধরে অ্যাম্বুলেন্সটা চলে যেতে চায় এসএসকেএম হসপিটালের দিকে।

অ্যাম্বুলেন্সটাকে আটকালে মিডিয়ায় অ্যান্টি পাবলিসিটি হয়ে যাবে। গোরার মনে পড়ল, 'আমাদের বাংলা' চ্যানেলের এক রিপোর্টার....চন্দন মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে। আজকাল টিভি চ্যানেলগুলো একটা ইস্যু পেলেই হল। হয়তো অ্যাম্বুলেন্সের আটকে পড়ার খবরটা ওরা বারবার দেখাতে শুরু করবে। সাধারণ লোক ওর ওপর বিরক্ত হয়ে যাবে। বিরক্ত হবে বা-ই না কেন? এই ক'দিন আগে উলটোডাঙার বস্তিতে আগুন লাগল। কোন একটা পার্টির অটো চালকরা তখন রাস্তা অবরোধ করেছিল। দমকলের লোকেদের নাকি তারা আটকে দেয়। আগুন তাতে আরও ছড়িয়ে পড়ে। খুব অ্যান্টি-পাবলিসিটি হয়ে গেছিল। না, সেই সুযোগ চ্যানেলগুলোকে ও দেবে না।

মাইক হাতে নিয়ে গোরা বারবার বলতে লাগল, 'অ্যাম্বুলেন্সটাকে জায়গা করে দিন প্লিজ। পেশেন্টকে আপনারা আটকাবেন না।'

মঞ্চ থেকেই গোরা দেখতে পেল, লোকজন পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গোরা। অ্যাম্বুলেন্সটা চলে গেলেই ও বক্তৃতা শুরু করে দেবে। দাবি না মেটা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়েই যাবে। কী বলবে,

সেটা মনে মনে গুছিয়ে নেওয়ার সময়, অ্যাম্বুলেন্সের গতিবিধির দিকে ও নজর রাখছিল। হঠাৎ দেখল, সেভেন পয়েন্টস-এর কাছে এসে, সোজা ব্রিজের দিকে না গিয়ে, অ্যাম্বুলেন্সটা ওদের মঞ্চের দিকে বাঁক নিল। তারপর সাইরেন বন্ধ করে ধীরে ধীরে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারও পর পিছনের দরজা খুলে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখে গোরা অবাক হয়ে গেল।

যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি আর কেউ নন, চিফ মিনিস্টার তথাগত ভটচায! ভদ্রলোকের সঙ্গে জেড ক্যাটাগরি সিকিউরিটির বলয় থাকার কথা। অথচ তিনি গাড়ি থেকে নেমে এলেন, সিকিউরিটি ছাড়াই।

পনেরো

লালবাজার থেকে আসা ভদ্রলোককে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে জয়দেব বলল, 'কী দরকার, বলুন।'

'আমার নাম সুগত পাঠক। একটা কেস-এর ইনভেস্টিগেশনের জন্য এসেছি।' কথাগুলো বলেই হাতে ধরা দিনকাল-এর লেটেস্ট ইস্যুটা দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এই পত্রিকাটা কি আপনি ছাপেন?' জয়দেব বলল, 'হ্যাঁ, আমিই এডিটর।'

'এই পত্রিকার ভেতরে শ্রীচৈতন্যদেবের যে ছবিটা আপনি ছেপেছেন, সেটা কোথায় পেয়েছেন?'

'ছবিটা পাঠিয়েছেন প্রবন্ধের লেখক সুশোভনবাবু।'

'আপনি কি জানেন, এই ছবিটা ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম থেকে চুরি গিয়েছে? মিউজিয়াম অথরিটি আমাদের কাছে অফিসিয়ালি কমপ্লেন করেছেন?'

'না, জানি না। তবে সুশোভনবাবু আমার কাছে যে ছবিটা পাঠিয়েছেন, সেটা অরিজিনাল নয়। ফোটো কপি। ওঁর প্রবন্ধে সেটা বলাও আছে।

'ফোটো কপিটা কি দেখতে পারি?'

'সরি, সেটা এখন আমার কাছে নেই। প্রেসে আছে।'

'প্রেসের নামটা কি বলা যেতে পারে?'

'প্রভাবতী প্রিন্টিং হাউস। উলটোডাঙায়।'

'সুশোভনবাবুকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?'

'অনেকদিন ধরে। বলতে পারেন, আমার পত্রিকার জন্মকাল থেকে।'

'আপনি কি জানেন, উনি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই মিউজিয়ামের এই ছবিটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। অথরিটির ধারণা, উনিই এই ছবিটা চুরি করেছেন।'

'আমার তা মনে হয় না। সুশোভনবাবুকে আমি যতটুকু চিনি, উনি এ কাজ করতে পারেন না।'

'তাহলে কে করেছে বলে আপনার মনে হয়?'

'সেটা বলতে পারব না।'

'সুশোভনবাবু এখন কোথায়, আপনি জানেন?'

'না, আমার কোনও আইডিয়া নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, উনি কলকাতায় নেই।'

'আপনার সঙ্গে শেষ কবে যোগাযোগ হয়েছে?'

'গতকাল সকালে। উনি ফোন করেছিলেন। কথা বলে মনে হল, উনি কারও ভয়ে পালিয়ে বেরাচ্ছেন। এই ছবি আর প্রবন্ধটি ছাপতে মানা করলেন। উনি জানতেন না, পত্রিকার ওঁর লেখা অলরেডি বেরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দু'চারটে কথা বলেই উনি লাইন কেটে দেন।'

'সেটা আমরা জানি। ফোনটা উনি করেছিলেন ভুবনেশ্বর থেকে। ফোনের টাওয়ার থেকে এটা আমরা জানতে পেরেছি। ওঁর এগেনস্টে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছে। খুব শিগগির অ্যারেস্ট হবেন।'

শুনে চমকে উঠল জয়দেব। সুশোভনবাবুর মতো একটা নিরীহ মানুষ বিনা দোষে অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন? যদি কাগজে সেই খবর পাবলিশড হয়, তাহলে তো কেলেংকারি হয়ে যাবে। মুখ ফসকে ও বলে ফেলল, 'আমার মনে হয়, আপনারা ভুল লোককে টার্গেট করেছেন।'

'কেন বলুন তো?'

'সুশোভনবাবুর মুখেই আমি শুনেছি, মিউজিয়ামের ভেতরেই বিরাট একটা র‍্যাকেট খুব অ্যাকটিভ। তারা স্মাগলারদের হাতে বহু অ্যান্টিকস তুলে দিয়েছে। এই র‍্যাকেটের ভেতর আছেন নটরাজন বলে ফর্মার এক ডিরেক্টর। তাঁর সময়ে নটরাজন কিছু এমপ্লয়ি রিক্রুট করেছিলেন। তাদের মাধমেই এই র‍্যাকেট এখনও উনি চালিয়ে যাচ্ছেন। মিউজিয়ামে বুদ্ধমূর্তি চুরি যাওয়ার পর সুশোভনবাবু একদিন আমায় বলছিলেন, ওখানে এত দুর্নীতি যে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।'

'সুশোভনবাবু আর কী বলেছেন, প্লিজ মনে করে একটু বলবেন? আপনার সামান্য ইনফর্মেশন আমাদের বড়ো কাজে লেগে যেতে পারে।'

'মিউজিয়ামে রীতা সিনহা নামে সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার আছেন, যার সঙ্গে নটরাজনের অবৈধ সম্পর্ক আছে। ভদ্রমহিলা সুন্দরী। আগে চাকরি করতেন বিশ্বভারতীতে। নটরাজন একবার বোলপুরে বেড়াতে যান। সেখানেই রীতা সিনহার সঙ্গে ওর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। নটরাজন চাকরি দিয়ে রীতা সিনহাকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে নিয়ে আসেন। বছর তিনেক আগে রিটায়ার করার পর নটরাজন বেঙ্গালুরুতে চলে যান। কিন্তু প্রায়ই উনি কলকাতায় আসেন। দু'চারদিন রীতা সিনহার ফ্ল্যাটে থেকে আবার চলে যান। সুশোভনবাবুর মুখে শুনেছি, নটরাজনের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটের যোগাযোগ আছে। উনি এমন সব মূল্যবান অ্যান্টিকস পাচার করেছেন, যার কোনও রেকর্ড মিউজিয়ামেও নেই।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনি আর কী জানেন জয়দেববাবু? প্লিজ আমাকে হেল্প করুন। আমিই ছবি চুরির কেসটা হ্যান্ডেল করছি।'

'আমার মনে হয়, এই রীতা সিনহাকে আপনারা ভালো করে ইন্টেরোগেট করুন। চাপ দিলেই উনি সব বলে দেবেন। বিশ্বভারতী থেকে উনি চলে আসার পরই নোবেল প্রাইজ চুরি হয়। সুশোভনবাবু মাঝে একদিন আমাকে বলেছিলেন, বিশ্বভারতী থেকে নোবেল প্রাইজ আর মিউজিয়াম থেকে বুদ্ধমূর্তি চুরি—একই গ্রুপের কাজ। সুশোভনবাবু এসব ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর রাখেন। আমার মনে হয়, উনিই ঠিক। উনি পণ্ডিত মানুষ। প্লিজ, ওঁকে হ্যারাস করবেন না।'

'আপনার কি মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের ছবিটাও ওই একই র‍্যাকেট চুরি করেছে?'

'হতেও পারে। ওরা নিজেরাই ছবিটা পাচার করে, এখন সুশোভনবাবুর নামে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা।'

'একটা কথা, সুশোভনবাবু যদি নির্দোষই হন, তাহলে তো আমাদের কাছে এসেও তো এসব কথা বলতে পারতেন। তা না করে তিনি আত্মগোপন করলেন কেন?'

'কিছু মনে করবেন না সুগতবাবু। পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা খুব খারাপ। আপনি আমার বাড়িতে এসে জানতে চাইছেন বলে, আমি সব বলছি। না এলে, কখনও এসব কথা বলতাম না।'

'একটা ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন জয়দেববাবু?'

'নিশ্চয়ই। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি।'

'আপনার কথামতোই কেসটা সলভ করার জন্য সুশোভনবাবুকে আমাদের দরকার। আমাদের লোক ইতিমধ্যেই ভুবনেশ্বর রওনা হয়ে গেছে। এর মাঝে আপনার সঙ্গে যদি ফোনে ওর কোনও কথা হয়, তাহলে বলবেন, পুলিশ ওঁকে মদত করার জন্যই ওখানে গেছে। এই বিশ্বাসটা ওঁর মনে আনা জরুরি। ওর পিছনে যদি মিউজিয়ামের র‍্যাকেট লেগে থাকে, তাহলে ওঁর ক্ষতি হতে পারে। আমাদের কাস্টোডিতে একবার চলে এলে, সেই ক্ষতিটা ওঁর হবে না।'

জয়দেব বলল, 'ক্ষতি মানে? র‍্যাকেটের লোকজন তো খুনের হুমকিও দিয়েছে। প্লিজ, আপনারা ওকে বাঁচান। উনি খুন হয়ে গেলে, শিল্পজগতে বড়ো লস হয়ে যাবে।'

'আমি জানি। কলকাতার এক নামকরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অলরেডি ওর হয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে ফোনও করেছেন। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। তবে আপনার কাছে সব শোনার পর, আমার একটাই আশঙ্কা হচ্ছে, এই কেস-এ মিউজিয়াম অথরিটি আপনাকেও না জড়িয়ে দেয়। ছবিটা ছেপে আপনি কিন্তু ভুল করেছেন জয়দেববাবু। মিউজিয়ামের কোনও ছবি ছাপলে, আগাম অনুমতি নিতে হয় অথরিটির কাছ থেকে। আপনি তা নেননি। তারপর এমন একটা ছবি, যার দাম তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এবং যে ছবিটা নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে।'

কথাটা শুনে এবার সতর্ক হল জয়দেব। সুগতবাবু প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছেন। তাই

ও নির্লিপ্তভাবে বলল, 'আমি কিন্তু ক্যাপশনে মেনশন করে দিয়েছি, ছবিটা ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম সৌজন্যে পাওয়া। আইন বাঁচিয়ে ছেপেছি।'

'আইন মেনে করেছেন, না করেননি, সেটা তো কোর্টে গিয়ে আপনাকে প্রুফ করতে হবে। কি দরকার ছিল, এইসব রিস্ক নেওয়ার? মিউজিয়ামের ওই র‍্যাকেট সত্যিই ভয়ঙ্কর। নানা অভিযোগ আমাদের কানে আসছে। ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে যাচ্ছেন কেন?'

জয়দেব অবাক হয়ে বলল, 'আপনি পুলিশের লোক হয়ে....ভয় দেখাচ্ছেন?'

'ভয় দেখাচ্ছি না। আপনাকে শুধু সাবধান করে দিচ্ছি। দিনকাল খুব খারাপ। পুলিশ আর কতক্ষণ আপনাকে প্রোটেকশন দেবে?' কথাগুলো বলেই মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করলেন সুগতবাবু। তারপর বললেন, 'বাই দ্য বাই, আপনার একটা ছবি তুলে রাখতে চাই। আপত্তি নেই তো?' জয়দেব বলল, 'আপত্তি করব কেন?'

সুগতবাবু সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটা তুলে নিলেন। ক্লিক শব্দটা হওয়া মাত্রই জয়দেবের মাথায় আইডিয়াটা খেলে গেল। ও বলল, 'আপনার যদি একটা ছবি তুলি, তাহলে নিশ্চয় আপত্তি করবেন না।'

অনুমতি পাওয়ার আগেই জয়দেব ছবিটা তুলে নিল। সুগতবাবুর চোখমুখ দেখে ওর মনে হল, উনি খুশি হলেন না। হাত তুলে উনি মুখটা আড়াল করতে চাইছিলেন। কিন্তু পারলেন না। দরজার বাইরে পা দিয়ে উনি বললেন, 'আপনার কাছে হয়তো আবার আমায় আসতে হবে। একটা কথা আপনাকে বলে যাই। আমি যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য এসেছিলাম, এই কথাটা প্লিজ কাউকে বলবেন না।'

সুগত পাঠক চলে যাচ্ছেন। দরজা বন্ধ করতে গিয়েও জয়দেব দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ার ক্লাবের কাছে একটা মারুতি জেন দাঁড়িয়ে আছে। আড়াল থেকে ও দেখল, গাড়ির পিছনের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনি কথা বলতে লাগলেন সুগত পাঠকের সঙ্গে। দুজনে একবার পিছন ফিরে তাকালেনও। তারপর দুজনেই পিছনের সিটে গিয়ে বসলেন। জয়দেব স্বস্তিবোধ করল এই ভেবে যে, লালবাজার থেকে ওঁরা দুজন পুলিশের জিপ-এ আসেননি। এলে ক্লাবের ছেলেরা টের পেয়ে যেত। দূর থেকে জেন-এর নাম্বারটা জয়দেবের চোখে পড়ল। কেন জানে না, নাম্বারটা ও মুখস্থ করে নিল।

মিনিট খানেক পরই ফের ডোরবেলের শব্দ। সুগতবাবু কি ফিরে এলেন? উনি কি কিছু ফেলে গিয়েছেন? দরজা খুলে জয়দেব দেখল, ওরই সমবয়সি একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। বারবার সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই ছেলেটা বলল, 'আমি পর্ণব। মিউজিয়ামের সিনিয়ার টেকনিক্যাল অফিসার। ফোনে আপনার সঙ্গে আমারই কথা হয়েছিল।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ড্রয়িংরুমে পা দিয়েই পর্ণব বলল, 'চৌরাস্তায় আজ ভীষণ ট্রাফিক জ্যাম, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। জলের পাইপ বসাতে কর্পোরেশন এত সময় নিচ্ছে, জানি না, আর কতদিন আমাদের নরক যন্ত্রণা পোহাতে হবে।'

রাস্তার ধারে জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছে। গার্ডেনরিচ থেকে জল আসবে তাহলে। বছরখানেক আগে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করেছে কর্পোরেশন। এখনও শেষ হয়নি। সন্ধেবেলার পর থেকে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম হচ্ছে আজকাল। জয়দেবকে অবশ্য অতটা ভুগতে হয় না। কেননা, রাতের দিকে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় যখন ও বাড়ি ফেরে, তখন ট্রাফিক ফ্লো অত থাকে না। ঠাট্টা করে ও বলল, 'কষ্ট করলে, তবেই না কেষ্ট পাওয়া যায়?'

পর্ণব হেসে বলল, 'ভালো বলেছেন। বেহালার ইদানীং যেমনভাবে লোক বাড়ছে, তাতে দু'এক বছর পর না আবার ওই পাইপ তুলে ফেলতে হয় জয়দেবদা। তখন হয়তো দরকার হবে, আরও বড়ো পাইপ।'

জয়দেবদা সম্বোধন শুনে, আর ছেলেটাকে দেখে জয়দেবের ভালো লেগে গেল। ভাল স্বাস্থ্যের ছেলে। সম্ভবত ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। কিন্তু চোখমুখে অদ্ভুত একটা সারল্য আছে। সোফায় বসে ও বলল, 'বাড়ি চিনতে তোমার অসুবিধে হয়নি তো ভাই?'

পর্ণব বলল, 'বিন্দুমাত্র না। মিউজিয়ামের কথা শুরু করার আগে আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই। এইমাত্তর আপনার বাড়ি থেকে যে লোকটা বেরিয়ে গেল, সে কে?'

'লালবাজার থেকে এসেছিল। নাম বলল, সুগত পাঠক। কেন বলো তো?'

'আরে, এ লোকটা তো আমাদের মিউজিয়ামের সিকিউরিটি স্টাফ। রাতের দিকে ডিউটি করে। এ কী করে লালবাজারের লোক হয়ে গেল! কী কারণে এসেছিল, বলল?'

'আমার কাগজে শ্রীচৈতন্যদেবের যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, সেটি নাকি মিউজিয়াম থেকে চুরি গেছে। সে সম্পর্কে তদন্তে এসেছিল। আমাকে ইনডাইরেক্টলি ভয় দেখিয়েই গেল।'

শুনে পর্ণব রেগে উঠে বলল, 'বুলশিট। ছবিটা মোটেই চুরি হয়নি। আপনার কাগজে পাবলিশড হওয়ার পর, ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, ওটা যত্ন করে লকারে তুলে রাখতে। আরে, আপনার কাগজে সুশোভন স্যারের লেখা পড়েই তো আমরা জানতে পারলাম, ছবিটার গুরুত্ব কী। আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না জয়দেবদা। দরকার হলে আমি আপনাকে ডিরেক্টর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। ইস, আর পাঁচ মিনিট আগে যদি আস্‌তাম, তাহলে তিওয়ারিকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারতাম।'

'তিওয়ারি? মানে সেই লোকটা.....যার সম্পর্কে আমি নিজে একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম আমার কাগজে? তথ্যগুলো তখন অবশ্য আমাকে সুশোভনদা দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেই লোকটাই। আচ্ছা জয়দেবদা, লোকটা এসে বলল, লালবাজার থেকে এসেছে...অথচ তখন আপনার মনে একটুও সন্দেহ হল না? বেহালা অঞ্চলটা তো বেঙ্গল পুলিশের আন্ডারে। আপনার বিরুদ্ধে কোনও ইনভেস্টিগেশনে এলে কলকাতা পুলিশ আসবে কেন? পুলিশ তো আসবে ভবানীভবন থেকে।' জয়দেব বিব্রত হয়ে বলল, 'আসলে তখন অত ভাবিনি।'

পর্ণব বলল, 'তিওয়ারি খতরনাক লোক। সুশোভন স্যারের কাছে আপনি, মিউজিয়ামের

যে র‍্যাকেটের কথা শুনেছেন, তিওয়ারি তার একটা পিলার বলতে পারেন। অথচ ও ফোর্থ ক্লাস স্টাফ।'

'আমার লেখাটা বেরনোর পর অথরিটি কোনও অ্যাকশন নেয়নি?'

'ও বাবা, অ্যাকশন নিতে গেলে তো মিউজিয়ামই বন্ধ হয়ে যাবে। তিওয়ারি হচ্ছে ইউনিয়নের চাঁই। থাকে মিউজিয়ামের ভেতরে স্টাফ কোয়ার্টার্সে। মিউজিয়ামের ফোর্থ ক্লাস সব স্টাফ ওর হাতের মুঠোয়। সদর স্ট্রিট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সব অ্যান্টি সোসাল ওর কথায় ওঠে বসে। স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর ভেতর যা হয়, তা তো আপনি নিজে লিখেছেন। বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে। তবুও ওদের তোলা যাবে না। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে ওরা রয়েছে। বেশিরভাগই অবাঙালি। কাজ করতে করতে বাপ মারা গেছে। তার জায়গায় ছেলে চাকরি পেয়ে গেছে। ভাবুন, ওরা কাজ করে সিকিউরিটি স্টাফ হিসাবে। অথচ কারও ফর্মাল ট্রেনিং নেই। মিউজিয়ামে চুরি আটকাবে কী করে? রক্ষকই তো ভক্ষক ওখানে। জানেন জয়দেবদা, আমাদের ডিরেক্টর সাহেব সেনট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিওরিটি ফোর্স আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিওয়ারিরা বাধা দেওয়ায় কিছু করতে পারলেন না। বাই দ্য বাই, এই লোকটাকে সুশোভন স্যার সম্পর্কে আপনি কিছু ক্লু দেননি তো জয়দেবদা?

'তেমন কিছু না। তবে দেখলাম, ওরা জানে সুশোভনদা এখন কোথায় আছেন।'

'তার মানে....স্যারকে ওরা ফলো করে যাচ্ছে। এবং স্যারও সেটা জানেন। কাল রাতে উনি ফোন করে আমাকে কী বললেন, জানেন? বললেন, আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, বাবিনকে খবরটা দিয়ো। বাবিন হলেন স্যারের একমাত্র ছেলে। আমেরিকায় থাকেন। স্যার আরও বললেন, সল্টলেকের বাড়িটা উনি দান করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনকে। মৃত্যুর কথা ভাবছেন, শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। আসলে সেই কলেজের দিনগুলো থেকে স্যারের বাড়িতে যাতায়াত। উনি আমাকে ছেলের মতোই দেখেন। ওর কিছু হলে আফসোসের সীমা থাকবে না আমার। জয়দেবদা, কাল রাত থেকে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? স্যারের এই বিপদে ওঁর পাশে গিয়ে আমার দাঁড়ানো উচিত। আমি হয়তো দু'চার দিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরে যেতে পারি। আমার সঙ্গে আপনিও চলুন না, জয়দেবদা?'

এমনিতেই পুরী যাওয়া মনস্থ করেছিল জয়দেব। কিন্তু পর্ণব এমনভাবে অনুরোধটা করল, ও বুঝে উঠতে পারল না, দুজনে একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কি না।

ষোলো

রাত দশটা নাগাদ ইস্টার্ন বাইপাশে হোটেল মেনকার ঘরে পৌঁছে, পুরন্দর বড়ো বড়ো শ্বাস নিতে লাগল। দরজায় ডাবল লক করে ও একবার ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। এ সি রুম। জানলাগুলো বন্ধ করাই আছে। তবুও আতঙ্কে ওর হাত-পা ঠান্ডা

হয়ে এল। মনে মনে ও ঠিক করে নিল, রাতে ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। না হলে ঘুমোতে পারবে না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুইচ বোর্ড খুঁজে বের করল পুরন্দর। সব ক'টা সুইচ অন করে দিল। যাক, নিশ্চিন্ত। তৃষ্ণায় গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। তাই ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বের করে, ঢকঢক করে ও গলায় ঢালতে শুরু করল। ঠান্ডা জল ও খেতে পারে না। তবুও, আজ ঠান্ডা জলই অমৃতের মতো মনে হচ্ছে। তৃষ্ণা মিটিয়ে, পোশাক খুলে পুরো শরীরটা ও এলিয়ে দিল বিছানায়। তখনই ও লক্ষ করল, ভয়ে ওর লিঙ্গটা ছোট্ট হয়ে গেছে।

বুকের ভেতরটা তখনও ধকধক করছে। এ কী দেখল আজ ও? তাহলে কি ধ্বংসের দিন এগিয়ে এল? কথাটা মনে হতেই পুরন্দরের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও যখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তখন আধভাঙা চাঁদের গায়ে কাত্যায়ণীদের দেখতে পেয়েছিল। হ্যাঁ, কাত্যায়ণীই। এসব ক্ষেত্রে ওর ভুল হয় না। ছোটোবেলায় পূজ্যপাদদের কাছে ওদের সম্পর্কে পুরন্দর প্রচুর ভীতিপ্রদ কথা শুনেছে। তখন থেকেই একটা মারাত্মক ভয় ওর মনে বাসা বেঁধে আছে। কাত্যায়ণীরা হল বিধাতার সৃষ্ট এক অদ্ভুত জীব। যারা স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি কোথাও বসবাস করে। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার মুখে না কি এরা উদয় হয়। এই কাত্যায়ণীরা নাকি মৃত মানুষ ও পশুদের মাংস ভক্ষণ করে।

শেষবার নাকি এদের দেখা গিয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধের সময়। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে তখন অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে আছে। কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধে বলি কয়েক লাখ যোদ্ধার শবদেহ। খুব অল্প কয়েকজন বীরেরই সৎকার হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে অসংখ্য গজ এবং অশ্ব। পূজ্যপাদদের মুখে পুরন্দর শুনেছে, আঠারো দিন ধরে যুদ্ধ চলার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। পাণ্ডব পক্ষে বেঁচে ছিলেন সাতজন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি। কৌরব পক্ষে মাত্র তিনজন—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা আর অশ্বত্থামা। তখনও অষ্টাদশ দিনের আধবেলা বাকি। পাণ্ডবরা জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছেন। তখন আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কাত্যায়ণীতে। মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তাদের নাকি বারণ করেন শ্রীকৃষ্ণ। 'এখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি।' শ্রীকৃষ্ণ না কি ক্যত্যায়ণীদের বলেছিলেন, 'ওই আধবেলার যুদ্ধ ফের হবে। কলি যুগের শেষে মেদিনী ধ্বংস হওয়ার দিনে। সেদিন তোমরা প্রাণভরে মৃতদেহ ভক্ষণ কোরো।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে কাত্যায়ণীরা সেদিন চলে যায়।

দু'হাত ছড়িয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে থাকার সময় কথাগুলো পুরন্দরের মনে পড়ল। ওই আধবেলার যুদ্ধ কি আসন্ন? কলি যুগ কি শেষ হয়ে এল? না হলে আকাশে ফের কাত্যায়ণীরা দেখা দিল কেন? প্রশ্নটা কাঁপনি ধরিয়ে দিল পুরন্দরের। বন্ধ ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ও আপাতত নিরাপদ। আর তিন-চার ঘণ্টা পরেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। তখন আর আকাশে কাত্যায়ণীদের দেখা যাবে না। কিন্তু সূর্য অস্তে গেলে ওরা আবার বেরিয়ে আসবে। প্রতিদিনই সংখ্যায় ওরা বাড়তে থাকবে। পুরন্দর শুনেছে,

এমন একটা দিন আসবে, যখন আকাশে আর চাঁদ দেখা যাবে না। পুরো আকাশটা কাত্যায়ণীরা ঢেকে দেবে। তখন ভূমিকম্প হবে। ভেঙে পড়বে বড়ো বড়ো ইমারত, মানুষের তৈরি যাবতীয় সৌধ। সমুদ্রের জল ফুঁসে উঠবে। সেই মহাপ্লাবনে জল উঠে যাবে পুরীর মন্দিরের চুড়োয়। আর কী কী হবে, তৎক্ষণাৎ ওর মনে পড়ল না।

ছোটোবেলায় পূজ্যপাদরা ওদের বলতেন, মা কালিকা যখন পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করেছিল এই কাত্যায়ণীরা। মহাদেবের চালাকিতে মা কালিকা একটা সময় শান্ত হলেন। কিন্তু কপাল পুড়ল কাত্যায়ণীদের। মহাদেবের অভিশাপে এরা মা কালিকার সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারল না। স্থান পেল না মর্তেও। পূজ্যপাদরা বলতেন, এই কাত্যায়ণীরা দেখতে ভয়ঙ্কর। আসলে কিন্তু এরা নারী। এদের তিন তিনটি চোখ। মুখমণ্ডল কুৎসিত। শ্বদন্ত দুটি গ্রীবা পর্যন্ত নেমে আসা। এদের দুটি স্তন ঢাকা থাকে কালো লোমে। দুটি বিশাল ডানা লুকনো থাকে লোমের আড়ালে। মাটির সরায় আঁকা, এদের ছবিও একবার দেখিয়েছিলেন পূজ্যপাদ পদ্মনাভ।

পুরন্দরের ছোটোবেলাটা কেটেছে, জগন্নাথ মন্দিরের কাছাকাছি ভূগর্ভস্থ এক আশ্রমে। ওরা দিনের বেলায় সূর্যের আলো দেখতে পেত না। দিন আর রাতের পার্থক্যও বুঝতে পারত না। আশ্রমে অলিন্দের কোণে কোণে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো থাকত। অদ্ভুত ছায়াঘেরা শীতল ছিল সেই পরিবেশ। ওপরে উঠে আসার সিঁড়ি দিনের বেলায় বন্ধ রাখা হত। মন্দিরের কোনও পূজ্যপাদ কোনও কারণে নীচে নেমে এলে, দরজার শেকল খোলার ধাতব শব্দ ওরা শুনতে পেত। এ ছাড়া শব্দ বলতে, রোজ খুব সকালবেলায় ওদের কানে আসত নূপুরের শৃঞ্জন। একটু বড়ো হওয়ার পর...কাজ করানোর জন্য ওদের যখন ওপরে নিয়ে যাওয়া হত, তখন পুরন্দররা জানতে পেরেছিল, ওপরেই মাহেরি অর্থাৎ দেবদাসীদের বাসগৃহ। তারা নাকি সকালে নৃত্য অনুশীলন করে। আর সন্ধেবেলায় সেই নৃত্য পরিবেশন করে জগন্নাথ মন্দিরে। ওদের হাসিকান্নার রেশ...সবই টের পেত নিচে পুরন্দররা।

আরও বড়ো হয়ে পুরন্দর জানতে পেরেছিল, ওর মতো, যারা আশ্রমের বাসিন্দা, তাঁরা মাহেরিদের অবৈধ সন্তান। ওদের কোনও পরিচয় নেই। থাকলেও জানার অধিকার নেই। ওরা বেজন্মা, আর পাঁচটা ছেলের মতো সুস্থ সামাজিক জীবন অতিবাহিত করার অধিকার ওদের নেই। দিনে মাত্র দু'বেলা ওদের খাবার জুটত। দু'বেলাই মন্দিরের প্রসাদ। তবে খাবারটা ওরা পর্যাপ্ত পরিমাণেই পেত। সেসব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে পুরন্দর এখনও শিউরে ওঠে। আশ্রমটা আগে ছিল বিষ্ণুমন্দির। সাত-আটশো বছরের পুরনো। কালাপাহাড় যখন পুরী আক্রমণ করেন, তখন ওই মন্দিরটি তিনি ধূলিসাৎ করে দেন। পরে মন্দিরের ওপরের অংশটা সংস্কার করা হয়। কিন্তু নীচের অংশটা কোনও কারণে একই রকম থেকে যায়। আগে মন্দিরের রান্নাঘরের বর্জ্য পদার্থ নিচে ফেলা হত। সেগুলি ভক্ষণ করত ইঁদুর। বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সেই ইঁদুরের সংখ্যা তখন কয়েক হাজার। ইঁদুর কমানোর জন্য পূজ্যপাদরা আমদানি করেছিলেন বেড়াল। তাদের সংখ্যাও কম নয়।

....হোটেলের বন্ধ ঘরে শুয়ে পুরন্দরের প্রথমেই মনে হল, কাত্যায়ণীদের চোখে পড়ার

কথা পূজ্যপাদকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু নিজে থেকে ফোন করার স্বাধীনতা ওর নেই। সেটা অপরাধের সামিল। পুরন্দর নিজেকে নিবৃত্ত করল এই ভেবে, আকাশে কাত্যায়ণীদের উদয়, পুরী থেকে নিশ্চয়ই পূজ্যপাদরাও দেখেছেন। ওঁদের চোখ স্বর্গের দরজা পর্যন্ত। জগতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সবই ওঁদের নখদর্পণে। এমনকী, মহাজাগতিক রহস্যগুলো সম্পর্কেও ওঁরা ওয়াকিবহাল। কখন চন্দ্রগ্রহণ হবে, কখন সূর্যের, আগাম ওঁরা বলে দিতে পারেন। কখন সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হবে, তাও ওঁদের জানা। এই বছরকয়েক আগে পূজ্যপাদ পদ্মনাভ বলেছিলেন, মধ্য রাতে আকাশে লাল রঙের উজ্জ্বল একটা তারা দেখা যাবে। তার প্রকোপে মারা পড়বে বহু মানুষ। সত্যিই গুজরাতে মারাত্মক ভূমিকম্প হল। আরেক দিন উনি বললেন, আকাশ থেকে আগুন বৃষ্টি হবে। অসংখ্য তারা খসে খসে পড়বে এই ধরাধামে। সত্যি তাই হয়েছিল। পুরন্দর সেদিন মায়াপুরে গঙ্গার ধারে এক গেস্ট হাউসে। বিস্ফারিত চোখে ও দেখেছিল, আকাশ থেকে অগ্নিপিণ্ড নেমে আসছে এই পৃথিবীতে। ভয়ে ও জানলা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এটা অবশ্য ওর জীবনে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর আগে পুরন্দর আরও একবার অনুরূপ দৃশ্য দেখেছিল। মূল মন্দির থেকে তখন মাঝেমধ্যেই ওদের ডেকে পাঠানো হত ওপরে। তবে দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারে। পুজোয় লাগে, এমন সব সরঞ্জাম ধোয়ামোছার কাজে ওদের লাগানো হত। সেই কাজে ওপরে উঠে, তাজা বাতাস নিতে নিতে পুরন্দরের মনে হত, ও বেঁচে আছে। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। অসংখ্য তারার ঝিকমিক। কাজের ফাঁকে অবাক চোখে ও তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। ওর মনে প্রশ্ন জাগত, প্রভুর মন্দিরের চুড়োর কত ওপরে হতে পারে ওই তারাগুলো? চুড়োয় উঠলে কি তারাগুলো ছোঁয়া যেতে পারে? কাজের তদারকি করতেন অন্তেবাসী মহিলারা। ওর ভাবুকপনা দেখে তাঁরা মুচকি হাসতেন।

মন্দিরের কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ একদিন ওই আগুন-বৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল পুরন্দর। বিষ্ণুমন্দিরের সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন চাতালে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। মহাজাগতিক রহস্য দেখে সবাই বিহ্বল। মাথায় এসে পড়বে নাকি? দৌড়ে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পুরন্দর। ভয়ে সেদিন ঠকঠক করে কাঁপছিল। তখনই নরম একটা হাতের স্পর্শ পেয়েছিল ও । আশ্রমের এক অন্তেবাসী....তাঁর নাম বেলি নানী.....ওকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'ভয় পাস না বাছা। আয়, আমার আছে আয়।'

তবুও কাঁপুনি যায় না পুরন্দরের। ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বেলি নানী বলেছিলেন, 'প্রভুর নাম জপ কর বাছা। তাহলে ভয় লাগবে না।'

বলে পুরন্দরের মাথায় হাত দিয়ে নিজেই প্রভু জগন্নাথের নাম জপতে শুরু করেছিলেন বেলি নানী। সেই মাতৃস্নেহের উষ্ণতায় অনেকক্ষণ পর পুরন্দর পায়ের তলায় জমি খুঁজে পেয়েছিল। ওর বয়স তখন কত? দশ-এগারো, তার বেশি নয়। তবে দেখতে তারও তিন-চার বছর বেশি। বেলি নানী বুকে জড়িয়ে ধরে, ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গেছিলেন।

সেই ঘরের আসবাব, সাজসজ্জা, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র দেখে পুরন্দর অবাক হয়ে গেছিল। বেলি নানী কে, তা ও জানত না। তবে ওপরে বারকয়েক যাতায়াত সূত্রে ও বুঝতে পেরেছিল, পূজ্যপাদরা ওঁকে মান্য করেন। ঘরে বসিয়ে বেলি নানী ওকে প্রভুর প্রসাদ খাইয়েছিলেন। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা, রসে চোবানো গজা। তারপর মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, 'এত ডরপুক কেন তুই, পুরন্দর? তবে যে জানকীবল্লভ বলেন, তোর খুব সাহস? তোর গায়ে অসুরের মতো জোর?'

শুনে লজ্জায় মুখ নিচু করেছিল পুরন্দর। আশ্রমের প্রার্থনাসঙ্গীতের সময় রোজ, ওপর থেকে পাতালগৃহে নামতেন পূজ্যপাদ জানকীবল্লভ। প্রভু জগন্নাথদেব আর মন্দির সম্পর্কে নানা কথা ওদের শোনাতেন।

ওপরের জগৎটা কেমন, সেটা পূজ্যপাদ জানকীবল্লভের মাধ্যমেই চিনতে শুরু করেছে পুরন্দর তখন। সবে বুঝতে শিখেছে, ওপরের মানুষগুলো কতটা নিষ্ঠুর। পূজ্যপাদ ওর সম্পর্কে কী বলেছেন, তা নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাই চুপ করে থেকে, পুরন্দর খাওয়ায় মন দিয়েছিল।

থুঁতনি ধরে, ওর মুখটা তুলে, বেলি নানী বলেছিলেন, 'আকাশ থেকে আগুন বৃষ্টি হচ্ছে কেন জানিস? ওই ওপরে স্বর্গ বলে একটা সুন্দর জায়গা আছে। দেবতারা সেখানে থাকেন। স্বর্গে এখন যুদ্ধ হচ্ছে। কাদের মধ্যে জানিস? দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের। ওরা যেসব অস্ত্র ছুড়ছে, তারই কিছু এসে পড়ছে আমাদের এই ধরাধামে। তবে শ্রীক্ষেত্রে আমাদের কোনও ভয় নেই। প্রভু জগন্নাথ আছেন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।'

খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে বেলি নানীর দিকে তাকিয়েছিল পুরন্দর। তা হয় না কি? দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস আছে না কি কারও? তবে যে পূজ্যপাদ জানকীবল্লভ বলেন, দেবতারা হচ্ছেন সর্বশক্তিমান! তাঁদের ওপর আর কেউ নেই। প্রভু জগন্নাথই শেষ কথা। কৌতূহল মেটানোর জন্য, খাওয়া থামিয়ে ও প্রশ্ন করেছিল, 'অসুর কে? তারা কোথায় থাকে?'

বেলি নানী বলেছিলেন, 'প্রজাপতি ব্রহ্মা একবার জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। তখনই অসুরদের জন্ম হয়। অসুর হচ্ছে তারা, যারা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে যে সব অসুর মারা যায়, তারাই পৃথিবীতে এসে দৈত্য, দানব হয়ে জন্মায়। কেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা সম্পর্কে জানকীবল্লভ তোদের কিছু শেখাননি?'

ওই অল্প বয়সেই পুরন্দর শিখে গিয়েছিল, না বলাটা ঠিক হবে না। কথাটা যদি কোনও কারণে পূজ্যপাদর কানে যায়, তাহলে শাস্তি পেতে হবে। উত্তর না দিয়ে ও দরজার দিকে তাকিয়েছিল। ওরই বয়সি একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে এসেছে। বেলি নানীর হাত ধরে টানতে টানতে বলছে, 'নানী...নানী বাইরে চলো। দেখবে চলো, আকাশে কত বাজি পুড়ছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে।'

পুরন্দর অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখেছিল। ভয়ডর বলে কি ওর কিছু নেই? কী বোকা, জানেও না, আকাশে এখন যুদ্ধ চলছে। মন্দিরে আগুন লেগে যেতে পারে। পুড়ে সবাই

মারা যেতে পারে। আগে কখনও মেয়েটাকে ও দেখেনি। প্রথম দেখাতেই ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠেছিল। টানাটানি সত্ত্বেও বেলি নানী কিন্তু একচুলও নড়েননি। মৃদু ধমকের সুরেই বলেছিলেন, 'বিরক্ত করিস না অম্বা। তুই এখন যা বাছা। তোকে এ ঘরে দেখতে পেলে তোর মাহেরি মায়েরা রাগ করবে।'

যতটা উৎসাহ নিয়ে মেয়েটা ঘরে ঢুকেছিল, ঠিক ততটাই মুখ চুন করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পুরন্দর তখন বুঝতে পারেনি, মাহেরি কাদের বলে। খানিক পরেই অবশ্য জানতে পেরেছিল। বেলি নানীকে ও প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কে?'

'আমি? আমি মন্দিরের মাদেলি বাছা। মন্দিরে যখন মাহেরিরা নাচগান করে, তখন আমি মাদল বাজাই। আমার কথা জেনে তোর কাজ নেই। তুই এক কাজ কর বাছা। চুপটি করে এই ঘরে শুয়ে থাক। আমি আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি। ভোরবেলায় তোকে ঘুম থেকে তুলে দেব। তখন লুকিয়ে তুই পাতাল ঘরে চলে যাস। তোর কাজগুলো আমি সেরে রাখছি।'

বেলি নানী সেদিন কেন ওর ওপর এত সদয় হয়েছিলেন, সেটা পুরন্দর জানে না। এখনও উনি মায়ের মতো স্নেহ করেন। চোখ বুজে বেলি নানীর সেই ঘরটায় সুখনিদ্রার কথা পুরন্দর ভাবছিল, হঠাৎ চোখ খুলে দেখল অন্ধকার। লাফ দিয়ে বিছানায় ও উঠে বসল। এক মুহূর্তের জন্য ওর মতিভ্রম হল। ঠিক কোথায় আছে, ও মনে করতে পারল না। বেলি নানীর সেই ঘরে, নাকি পাতাল ঘরের অভ্যন্তরে? ওর বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি ঘা মারতে শুরু করল। অন্ধকারকে ও ভয় পায় না। অন্ধকারের মধ্যেই ও বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ কাত্যায়ণীদের দেখার পর থেকে ওর মনের ভেতর একটা ভয় বাসা বেঁধে বসেছে। অন্ধকার না কাটলে সেই ভয়টা দূর হবে না। কোনওরকমে নিজেকে সামলে, পুরন্দর মনে করতে পারল, ঘণ্টাখানেক আগে ও এই হোটেলে এসে উঠেছে।

রাত এখন ক'টা, সেটা জানার জন্য, বিছানা হাতড়ে ও নিজের মোবাইল সেটটা খুঁজে বের করল। সুইচ অন করে দেখল, প্রায় বারোটা। তখনই ওর মনে পড়ল, রাত তিনটের সময় পূজ্যপাদ পদ্মনাভর ফোন আসার কথা। উনি তখন জানতে চাইবেন, প্ল্যান বি-র কাজটা সম্পন্ন হল কি না? কী উত্তর দেবে, সেটাই দ্রুত ভাবতে লাগল পুরন্দর। প্রেস থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের ছবিটা উদ্ধার করার কথা ছিল ওর। সেটা করতে পারেনি। হেড কোয়ার্টার্সে সেটা জানাতেও পারেনি। পূজ্যপাদদের অভিধানে 'পারিনি' বলে কোনও কথা নেই। ব্যর্থতার দায় ওকেই নিতে হবে। অতএব শাস্তিও পেতে হবে। শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বরাবরই পূজ্যপাদরা নির্মম। তাই কাজটা করতে না-পারার কারণ, পুরন্দরকে এতটাই জোরালভাবে বলতে হবে, যাতে ওকে শাস্তি পেতে না হয়।

ছোটোবেলা থেকে নানা কারণে ও এত শাস্তিভোগ করেছে যে, এখনও পূজ্যপাদদের পুরন্দর ভয় পায়। সেই ইঁদুর ঘরটার কথা ও ভুলবে কী করে? অসংখ্য গর্ত সেই ঘরে। ছোটোবেলায় কোনও অপরাধ করলে ওদের ঢুকিয়ে দেওয়া হত সেই ঘরে। গর্ত থেকে

বেরিয়ে এসে ইঁদুররা ওদের আক্রমণ করত। আর ওরা চিৎকার করে লাফিয়ে বেরাত এদিক থেকে সেদিক। এক রাতে গোপীনাথ বলে একটা ছেলের পা থেকে মাংস খুবলে খেয়ে নিয়েছিল ইঁদুররা। কোনওরকমে তার দেহটা তুলে এনেছিল পুরন্দর। গোপীনাথ প্রবল জ্বরে পরদিনই মারা যায়। ইঁদুরদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এরপর বেড়ালদের পোষ মানিয়ে ফেলেছিল পুরন্দর। কখনও ইঁদুর-ঘরে ওকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলেই, শিস দিয়ে ও ডেকে নিত বেড়ালদের। ফলে গর্ত থেকে বেরনোর সাহস পেত না ইঁদুররা।

ফোন এলে পূজ্যপাদ পদ্মনাভকে ও কী বলবে, সেটাই ভাবছিল পুরন্দর। চোখ খুলে দেখল, আলো এসে গিয়েছে। সাহস করে ও জানলার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে বিরাট লন। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। রঙিন কাপড় আর ফুল দিয়ে সুন্দর সাজানো। পুরন্দর দেখেই বুঝল, বিয়ের পার্টি চলছে। লনে সুবেশা, সুন্দর নারী-পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারও কারও হাতে খাবারের প্লেট। দূরে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে গান গাইছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে পুরন্দরের চোখ আটকে গেল।

সতেরো

পরনে সাফারি স্যুট। হাতে চুরুট। চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে চিফ মিনিস্টার তথাগত ভট্টাচার্য প্রথমেই রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কী শুরু করেছেন আপনারা? এভাবে রাস্তাঘাট অবরোধ? আমি বরদাস্ত করব না।'

বুম হাতে চ্যানেলের রিপোর্টার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। উলটো দিক থেকে ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে শুরু করেছে। গোরা নির্ভয়ে বলল, 'এসব তো আপনাদের কাছ থেকেই শেখা তথাগতবাবু।'

উত্তরটা শুনে থমকে গেলেন চিফ মিনিস্টার। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এসেছেন আরও দুজন। গোরা তাঁদের চিনতে পারল না। পাশ থেকে একজন বললেন, 'কে আপনি? কাকে কী বলছেন, আপনি জানেন?'

বোধহয় পুলিশের কোনও অফিসার হবেন। অথবা পার্টির কোনও বড়ো লিডার। পক্বকেশ, স্যুট-টাই পরা। তাঁর চোখে চোখ রেখে গোরা বলল, 'জানি; অন্যায়ের প্রতিবাদে....এখানে যত লোক জমায়েত হয়েছেন, তাঁদের ভোটে নির্বাচিত....বাংলার চিফ মিনিস্টার উনি। আর আমার পরিচয় জানতে চাইলেন বলেই জানাচ্ছি, আমি অল ইন্ডিয়া দলিত পার্টির ইউথ উইংয়ের সেক্রেটারি।'

পক্বকেশ চড়া মেজাজে বললেন, 'দলিত পার্টি...মাই ফুট। দশ মিনিটের মধ্যে অবরোধ তুলে নিন। যদি না নেন, তাহলে কিন্তু....আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আমরা বাধ্য হব।'

গোরা মাথা ঠান্ডা রেখে বলল, 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমি নপরাজিত চক্রবর্তী।'

'আপনি যে-ই হোন....সরি, দাবি না-মেটা পর্যন্ত আমরা অবরোধ তুলব না। আর হ্যাঁ, আমাকে অ্যারেস্ট করলে তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের আরও লোক....মিছিল করে এখানে আসছে। খুব বেশি দেরি করলে অবস্থা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।'

পাশ থেকে তরুণ ফুঁসে উঠল, 'কী বললেন? ওকে অ্যারেস্ট করবেন? সাহস থাকে তো করুন। তারপর আমরাও দেখব, আপনারা এখান থেকে বেরোন কী করে?'

বলেই গোরার হাত থেকে মাইকটা কেড়ে নিল তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দিতে শুরু করল, 'দলিত পার্টি জিন্দাবাদ', 'জলশহিদ মাধবী সাউ অমর রহে'। হাজার কণ্ঠে সেই স্লোগান ছড়িয়ে গেল মিছিলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। চুরুট নিভে গিয়েছে। গোরা দেখল, কাঁপা হাতে সেই চুরুট জ্বালানোর চেষ্টা করছেন তথাগত ভট্টাচার্য। নপরাজিত চক্রবর্তী জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছেন ওর দিকে। উচ্চবর্ণের মানুষ, উদ্ধত একটা মুখ। কোথাও যেন দেখেছে। তখনই ওর মনে পড়ল, আরে, এই ভদ্রলোক তো চিফ সেক্রেটারি। টিভি-তে কয়েকদিন মুখটা চোখে পড়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন রিপোর্টাররা পিছু নিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন করছেন। দাঁড়িয়ে উত্তর দেওয়ার মিনিমাম সৌজন্যটুকুও ভদ্রলোক কোনওদিন দেখান না। এত ঔদ্ধত্য, হাঁটতে হাঁটতেই ইনি উত্তর দেন, কারও দিকে না তাকিয়ে। এঁকে সহজে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। ইচ্ছে করেই কয়েকটা মিনিট স্লোগান চলতে দিল গোরা। ও জানে, শব্দ হল ব্রহ্ম। শব্দের মহিমা এই লোকটাকে টের পাওয়ানো দরকার।

নপরাজিত চক্রবর্তী ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন, 'বন্ধ করুন আপনাদের স্লোগান।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তথাগত ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চান আপনারা?'

উনি প্রশ্নটা করতে না করতেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন দু'তিনজন পুলিশ অফিসার। তাঁদের একজন তথাগতবাবুর সামনে স্যালুট দিতে দাঁড়াতেই গোরা বুঝল, লোকাল থানার ও সি। পার্কসার্কাস থানার হবে নিশ্চয়ই। অবরোধের খবর পেয়ে এসেছে। এই লোকটাই কি ফোন করেছিল? ও-সি-র দিকে নজর বুলিয়ে গোরা বলল, 'কেন স্যার, পুলিশ আপনাকে কিছু জানায়নি?'

পালটা প্রশ্নে সামান্য চটলেন তথাগত ভট্টাচার্য, 'ওরা যা-ই বলুক, আমি আপনাদের ভার্সান শুনতে চাই। আমার হাতে সময় নেই। বলুন, কী বলার আছে।'

নপরাজিত চক্রবর্তী পাশ ফিরে বললেন, 'স্যার আমি আরও ফোর্স আনতে বলছি। র‍্যাফ নামলে দেখবেন, সুড়সুড় করে সব পালাবে।'

লোকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তথাগত ভট্টাচার্যকে গোরা বলল, 'স্যার, আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর প্লিজ আপনি দিয়ে যান। প্রশ্নটা শোনার কি সময় আপনার হবে?'

তথাগত ভট্টাচার্য ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি বলুন। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খবরটা পেয়েই দিল্লি থেকে আমি চলে এসেছি।'

'স্যার, এই ডেডবডিটা যার, তার নাম মাধবী সাউ। তিলজলার যে বস্তিতে এই মেয়েটা

থাকত, সেখানে পানীয় জলের খুবই অভাব। পাশেই....ভদ্রলোকদের পাড়া থেকে জল আনতে গিয়ে পরশু রাতে মেয়েটা মার্ডার হয়েছে। ওর অপরাধটা কী জানেন? দলিত মেয়ে, কেন ভদ্রলোকদের টিউবওয়েল অশুচি করে দিয়েছে। বস্তির লোকের কমপ্লেন পুলিশ নেয়নি। মার্ডারার আন্ডারগ্রাউন্ডে। আপনারা.....বামপন্থীরা তো বহু বছর ধরে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন। আপনাদের কাছে সব মানুষ সমান। তাহলে কেন পানীয় জলের কারণে একজন হরিজনকে মরতে হবে, বলুন?'

'এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে জলের কথাটা জানিয়েছিলেন?'

'বস্তির মানুষ জানিয়েছিল। টিভি-তে সম্ভবত একটা প্রোগ্রামও হয়েছিল এ নিয়ে। উনি জানেন না, এমনটা কিছুতেই হতে পারে না।'

'উনি ওদের পার্টির লোক। আমাদের নন। ওকে ধরুন।'

উত্তরটা শুনে গোরা কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেল। সেই ওরা-আমরা বিভাজন। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। উচ্চবর্ণের দম্ভ। দলিতদের মানুষ বলে মনে না-করা। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এই লোকটাকে স্যার বলে সম্মান করার কোনও মানে হয় না। তাই ও বলল, 'এই উত্তরটা আপনার কাছে আশা করিনি তথাগতবাবু। জানেন, এই মাধবী বলে মেয়েটা কেন সেদিন রাতে লুকিয়ে জল আনতে গিয়েছিল? ওর বাচ্চা ছেলেটার জন্য। আপনার মেয়ে অসুস্থ। তার শুশ্রূষা যাতে ঠিক সময়ে হয়, তারজন্য আপনি এখন যেমন ছটফট করছেন....ঠিক তেমনই মাধবী ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল, ওর বাচ্চাটার মুখে একফোঁটা জল দেওয়ার জন্য। যাক সে কথা, এসব বলে লাভ নেই। ইচ্ছে করলে আপনি যেতে পারেন তথাগতবাবু। আপনাকে আমরা আটকাব না।' বলেই তরুণের কাছ থেকে মাইকটা চেয়ে নিল গোরা। তারপর মুখের কাছে মাইকটা তুলে বলল, 'দলিত ভাই আর বন্ধুদের উদ্দেশে বলছি, অ্যাম্বুলেন্সটাকে যাওয়ার রাস্তা করে দিন। এমার্জেন্সি আছে। দয়া করে কেউ আটকানোর চেষ্টা করবেন না।'

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করেছে। কিন্তু তাতে ওঠার লক্ষণ দেখালেন না তথাগত ভট্টাচার্য। এক পা পিছনে গিয়ে, অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে আসা তৃতীয়জনকে ফিসফিস করে কী যেন বলতে শুরু করলেন। নপরাজিতবাবু সবই শুনতে পাচ্ছেন। তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ দেখে গোরার মনে হল, চিফ মিনিস্টার নিশ্চয়ই এমন কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন, যা নপরাজিতবাবুর মনঃপূত নয়। গোরা দেখল, বেশ কিছু টিভি রিপোর্টার এসে হাজির হয়েছে। ক্যামেরাগুলো তাক করা রয়েছে তথাগতবাবুর দিকে। তরুণরা ফের স্লোগান দিতে শুরু করেছে। মুখে মুখে সেই স্লোগান ছড়িয়ে যাচ্ছে মিছিলে। এখন তা গর্জনের মতো শোনাচ্ছে। সামনের দিকে নজর গেল গোরার। চার নম্বর ব্রিজের কাছটা লোকে লোকারণ্য। ডান দিকে বেকবাগানের ক্রসিং, বাঁ দিকে ডন বসকো স্কুল পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ। তারই মাঝে অটো রিকশা, মোটরগাড়ি আর বাস-ট্রামগুলোকে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎই গোরার দিকে তাকিয়ে তথাগতবাবু বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমি

আলাদা কথা বলতে চাই। আপনি কি একবার রাইটার্সে আসতে পারবেন ভাই?'

তথাগতবাবুর মুখে চিলতে হাসি, 'সব কথা কি সব জায়গায় বলা যায়? আপনি রাজনীতি করতে নেমেছেন, এটুকু আপনার জানা উচিত। অ্যাজ ইউ উইশ।' বলেই পার্ক সার্কাস থানার ও সি-র দিকে ঘুরে তথাগতবাবু বললেন, 'ডি সি হেড কোয়ার্টার্সকে কন্টাক্ট করুন তো। এখুনি করুন ওয়ারলেসে। বলবেন, আমি কথা বলতে চাইছি।'

ও সি বললেন, 'স্যর, উনি পার্ক সার্কাস ব্রিজের মাঝামাঝি আটকে রয়েছেন। এদিকেই আসছিলেন। কিন্তু ব্রিজে এখন মারাত্মক জ্যাম।'

'ঠিক আছে। ওঁকে বলবেন, তিলজলার ও সি-কে নিয়ে একবার রাইটার্সে আসতে।' কথাগুলো বলেই তথাগতবাবু অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলেন। তার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকে গেলেন নপরাজিতবাবু। গোরা দেখল, অ্যাম্বুলেন্সটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভিড় সরিয়ে লোকজন জায়গা করে দিচ্ছে। পার্ক সার্কাস ব্রিজের বাঁ দিক দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পর এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি চিফ মিনিস্টারের সি এ। পুলকেশ মাহাতো। আপনাদের ডিম্যান্ডগুলো কী, প্লিজ লিখে আমাকে দিন। স্যর রাইটার্সে গিয়েই ব্যবস্থা নেবেন, আমাকে বলে গেলেন।'

'আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন।'

পুলকেশবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি থাকব। গো অ্যাহেড।'

হাত তুলে তরুণ মাজিদের স্লোগান দিতে মানা করল গোরা। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, অসংখ্য মুখ। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, জীর্ণ-শীর্ণ সব মুখ। রাগে, দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাওয়া মানুষ। ঘুরে দাঁড়ানোর একটা প্রত্যাশায় ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গোরা মাইকে বলতে শুরু করল, 'আমার দলিত ভাই ও বন্ধুরা....।' মাধবী সাউয়ের ডেডবডি নিয়ে কেন ওদের অবরোধ করতে হল, প্রথমে ও সে কথা বলল। তারপর দাবি-দাওয়ার কথা। চিফ মিনিস্টারের আশ্বাস। দলিত শ্রেণির মানুষদের ওপর কোথায় কী ধরনের অকল্পনীয় অত্যাচার হচ্ছে, সে কথা। মাইকের আওয়াজ একেবারে পিছন দিক পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। তবুও ঘন ঘন হাত তালি পড়ছে। বক্তৃতা দিতে ভালোবাসে গোরা। ওর গলায় তখন আবেগের ঢেউ ওঠে। ঠিক সময়ে ঠিক শব্দগুলো ওর মুখে এসে যায়। একটা সময় নিয়মিত ও অভ্যাস করেছে। এক-দেড় ঘণ্টা টানা ও বক্তৃতা করে যেতে পারে। ক্লান্ত হয় না।

শীতের দুপুরে রোদ তেমন প্রখর নয়। তবুও অনেকক্ষণ রোদে আছে বলে, কপালের পাশটায় টিপটিপ করতে লাগল গোরার। হঠাৎ চোখের সামনে একটা লাল ঝিলিক। গোরা প্রমাদ গুণল। বক্তৃতার মাঝে যদি ওর পুরনো রোগটা চাগাড় দিয়ে ওঠে, তাহলে মুশকিল হবে। ও বক্তব্য গুটিয়ে আনতে শুরু করল। ফের লাল ঝিলিক। চোখের সামনে ঘূর্ণায়মান একটা লাল বৃত্ত। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুখগুলো সেই বৃত্তে পাক খেতে খেতে একেবারে কেন্দ্রে মিলিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে একটা অজানা জগতে গিয়ে হাজির

হল গোরা। রাতের দিকে কোনও একটা সময়। ওর সামনে প্রাচীন এক জনপদ। ছোটো ছোটো পর্ণকুঠির। তার দ্বারে পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষ। একদল মানুষ নগর সংকীর্তনে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের অনেকের হাতে মশাল। সামনের দিকে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ হাত তুলে নাচছেন। কিন্তু মিছিলের মধ্যমণি এক যুবক। তাঁকে দেখে গোরা চমকে উঠল। আরে, এই যুবকটি তো একেবারে ওরই মতো দেখতে! কে এই ছেলেটা? কেন সে বারবার দেখা দিচ্ছে?

এর আগে অনেকদিনইও এই রোগে পীড়িত হয়েছে। চোখের সামনে দৃশ্যগুলো হাজির হয়েছে। কিন্তু কোনওদিনই কোনওরকম আওয়াজ শুনতে পায়নি। আজ সংকীর্তনের কথাগুলো গোরা ক্ষীণ শুনতে পেল। 'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল'। উন্মত্তের মতো চারদিক ঘুরে ঘুরে নাচছে সেই যুবক। একটা সময় সংকীর্তনের মিছিল এসে দাঁড়াল একটা সুদৃশ্য উদ্যানবাটির সামনে। যুবকটি বাটির ভিতর ঢোকার চেষ্টা করছে, তাকে বাধা দিচ্ছে রক্ষীরা। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। চিৎকার করে ডাকছে, 'চাঁদ কাজি, চাঁদ কাজি...আপনি কোথায়? সাহস থাকে তো বাইরে বেরিয়ে আসুন।'

মিছিলের কয়েকজন উদ্যানের ভিতর ঢুকে ইতিমধ্যেই বাহারি ফুলের গাছ লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। রক্ষীদের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হচ্ছে। যুবকটি তার সঙ্গীসাথীদের গর্হিত কাজে নিবৃত্ত হতে বলল। গোরা দেখতে পেল, এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক সুদেহী যবন। তাঁর সঙ্গে একজন বলশালী প্রহরী। তাঁর কোমরে তরবারি। দুজনে এসে দাঁড়ালেন সেই যুবকটির সামনে। সুদেহী যবন মিষ্টস্বরে বললেন, 'হে মহোদয়, এই গভীর রাতে কেন আপনারা এত উত্তেজিত হয়ে শান্তি বিঘ্ন করছেন?' গোরা দেখল, ওরই মতো দেখতে যুবকটি উত্তর দিল, 'চাঁদ কাজি মহোদয়, দোষ আমাদিগের নহে। আপনি দিবাকালে নগর সংকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। সেই কারণেই আমরা রাত্রিবেলায় সংকীর্তনে বাধ্য হইয়াছি। আমাদিগের ধর্মাচরণে আপনি বাধা দিবার কে?'

সুদেহী যবন রাগ করলেন না। বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'মহোদয়, আমাকে অহেতুক দোষারোপ করিবেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণদের একাংশ দিবানিশি আমার নিকট আসিয়া আপনার সম্পর্কে নানা অভিযোগ করিতেছে। এই বলিয়া যে, আপনি নিম্নবর্গের মানুষদের লইয়া নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত। আপনি নিজে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মভ্রষ্ট, দুরাচারী, অশিষ্ট। নবদ্বীপের কাজি হওয়ার কারণে আমাকে কয়েকটি পদক্ষেপ লইতে হইয়াছে। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, আমি নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ভুল করিয়াছি।'

যুবকটি সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'আমি স্বয়ং আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। কিন্তু আমাকে অভ্যর্থনা না করিয়া আপনি গৃহে লুকাইয়া রহিলেন কেন?'

'আপনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আসিয়াছেন। সেই কারণেই সাক্ষাৎ করিতে চাহি নাই। আপনি শান্ত হইলে, অবশ্যই পরে একদিন আমন্ত্রণ জানাইতাম।'

'আপনি ভুল বুঝিতে পারিলেন, কী করিয়া?'

'আমার গোপন কিছু কথা আছে। নির্জন কোথাও চলুন। নিভৃতে তাহা বলা যাইতে পারে।'

'সম্ভব নহে। আমার সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সবাই আমার অন্তরঙ্গ মানুষ। আপনি নিঃসংকোচে গোপন কথা বলিতে পারেন।'

'তাহা হইলে শ্রবণ করুন। যে দিবসে এক হিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, আমি তাহার মৃদঙ্গ ভাঙিয়া, কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, সেই রাত্রিতেই নিদ্রাবস্থায় এক দুঃস্বপ্ন দেখি। এক সিংহ আমার বক্ষদেশে উঠিয়া বসিয়াছে। সে গর্জন করিয়া বলিল, মৃদঙ্গ ভাঙিয়া তুই যেমন আমার কীর্তন নিষেধ করিয়াছিস, আমি তেমনই এই নখ দ্বারা তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিব। এই অপকর্ম আর কখনও করিলে সংবশে সংহার করিব। মনে থাকে যেন। মহোদয়, ওই ঘটনায় আমি যারপরনাই অনুতপ্ত। স্বপ্নের কথা আর কাহাকে বলি নাই। আপনিই প্রথম জানিলেন। আমি আদেশ দিতেছি, অতঃপর কীর্তনে আপনাদিগে কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিতে পারেন।'

.....'গোরাদা, আমরা শ্মশানের দিকে রওনা হচ্ছি। আপনি কি কেওড়াতলায় যাবেন?'

তরুণ মাজির গলা শুনে বর্তমানে ফিরে এল গোরা। ওর চোখের সামনে থেকে প্রাচীন সেই জনপদ মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হতচকিত হয়ে ও প্রশ্ন করল, 'তুমি কি যেন জানতে চাইলে তরুণ?'

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে.....ক্রিমেশনের জন্য যাবেন?'

গোরা বলল, 'না বার্নিং ঘাটে যাব না। মায়ের বারণ আছে। তোমরা যাও। মাইকে বলে দাও, আমরা অবরোধ তুলে নিচ্ছি। ততক্ষণে পুলকেশবাবুকে আমি আমাদের ডিম্যান্ডগুলো লিখে দিচ্ছি।'

আধঘণ্টা পর পার্ক সার্কাস মোড় থেকে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল গোরা। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর দিকে রওনা হল। মারাত্মক খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পৌঁছনোর পরই ও লক্ষ করল, একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর ওর ট্যাক্সিটাকে ফলো করছে।

আঠারো

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল উপাসনা। বাড়ির সামনেই ছোটোখাটো একটা বাজার বসে। কাজের মেয়ে কমলিকে ও বাজারে পাঠিয়েছে মুগের ডাল কিনে আনার জন্য। আজ একটা মারোয়াড়ি খাবার তৈরি করে বাবাকে ও খাওয়াবে। মুগ ডালের ভাপিয়ে। ভাতের হাঁড়ির ভেতর, কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে মুগের ডাল ভাপিয়ে, সামান্য হলুদ, নুন দিয়ে, পিঠে টাইপের একটা খাবার। দক্ষিণ ভারতের উকমার মতো। কয়েকদিন আগে নির্মলা শেঠদের বাড়ি গিয়েছিল উপা। ওর স্কুলের বন্ধু নির্মলা সেদিন ওকে এই ভাপিয়া

বলে খাবারটা খাইয়েছে। ওরা আসলে মারোয়াড়ি। তবে দু'শো-আড়াইশো বছর ধরে ওদের পরিবার মুর্শিদাবাদে আছে। নির্মলার বাবা শ্রেণিক শেঠ ব্যবসা করেন নবদ্বীপে। ফলে নির্মলার সঙ্গে অনেকদিনের বন্ধুত্ব ওর। উপাসনা অবশ্য খাবারটার নতুন একটা নাম দিয়েছে। উকমার অনুকরণে মুগমা।

আজকাল কমলিকে একা কোথাও পাঠাতে ভরসা হয় না উপাসনার। বড়ো হয়ে গেছে। যুবতী হওয়ার লক্ষণগুলো ওর শরীরে ফুটে উঠেছে। ইদানীং নবদ্বীপের অবস্থা ভালো না। অসামাজিক কাজকর্ম খুব বেড়ে গেছে। মেয়ে পাচারের কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। কার কুনজর কমলির ওপর পড়বে, কে জানে? ওকে বাজারে পাঠিয়ে, তাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উপাসনা। কমলির ওপর নজরদারি করছে। মতির দোকানে ভালো সোনা মুগের ডাল পাওয়া যায়। মুগমা-র স্বাদ তাতে ভালো হবে। এর সঙ্গে পুদিনা পাতার চাটনি। বাবাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে চায় উপাসনা ব্রেক ফাস্টের টেবলে। দিন তিনেক হল, ও নবদ্বীপে এসেছে। আচার্য সুধীর মিশ্রের সঙ্গে কথা বলার জন্য। শেষ পর্যন্ত, রিসার্চের কাজটা চালিয়ে যাবে কী না, তা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু নবদ্বীপে আসার পর উপাসনা জেনেছে, আচার্যমশাই কলকাতায় গেছেন, তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বিয়েতে। দু'তিনদিনের মধ্যেই ফিরবেন।

মতির দোকান থেকে কমলি বেরিয়ে আসছে। বারান্দা থেকে উপা দেখল, পিছন থেকে একটা শিংওয়ালা ষাঁড় দৌড়তে দৌড়তে আসছে। বাজারে খুচরো আনাজ বিক্রি করে যারা, তারা হায় হায় করে উঠেছে। নবদ্বীপে ষাঁড় আর বাঁদরের মারাত্মক অত্যাচার। প্রতি পাড়ায় একটা করে ষাঁড় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। খাওয়া-দাওয়ার কোনও সমস্যা নেই। সকালে গো-সেবা করার লোকের অভাব নেই নবদ্বীপে। খেয়েদেয়ে একেকটা ষাঁড় বেশ গায়ে-গতরে হয়ে উঠেছে। প্রায় দিনই খেপে উঠে গুঁতিয়ে দেয় মানুষজনদের। কিন্তু শিবের বাহন, ষাঁড়কে কিছু বলা যাবে না। পিছন থেকে ষাঁড়টা দৌড়ে আসছে, অথচ কমলি তখনও টের পায়নি। দেখে উপাসনা রেগে গেল। কী ক্যাবলা টাইপের মেয়ে রে! রাস্তা দিয়ে হাঁটছিস, আশপাশ দেখবি না? ব্যাপারীদের চেল্লামেল্লি তুই শুনতে পাচ্ছিস না? বাধ্য হয়ে বারান্দা থেকেই উপা চিৎকার করে উঠল, 'এই কমলি, শিগগির তুই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকে পড়। তোর পেছনে ষাঁড়।'

কমলি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ দিদিভাই? মিষ্টি নিয়ে আসব?'

উপাসনা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই ষাঁড়ের ধাক্কায় 'বাবা গো' বলে ছিটকে পড়ল কমলি। ওর হাতে ধরা ঠোঙা থেকে মুগের ডাল ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ষাঁড়টা দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়েছে একটা খোলা জায়গায়। ওর মুখে বড়ো একটা ফুলকপি। তার মানে ফুলকপি ছিনতাই করতে গিয়েই ষাঁড়টা তাড়া খেয়েছে। চোখ সরিয়ে এনে উপাসনা দেখল, বাজারের লোক তুলে দাঁড় করাচ্ছে কমলিকে। ওকে অনেকেই চেনে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কাজ করে। দু'তিনজন ধরাধরি করে ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে এল। ওপর থেকে নেমে কমলিকে দেখে, উপাসনার হাসি পেয়ে গেল। একটু আগে শখ করে, ওর মতো

কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরা শিখে, কমলি মুগের ডাল কিনতে গেছিল। সেই শাড়ি লন্ডভন্ড। কমলির অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। হাতের কাছে সামান্য ছড়ে গেছে। বাবা ওষুধ দিয়ে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করলেন, 'থাক উপা, তোকে আর মুগমা করতে হবে না। তুই বরং লুচি তরকারি করে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ওপরে উঠছি।'

বাবার চেম্বার থেকে কমলিকে নিয়ে উপাসনা যখন বেরিয়ে আসছে, তখন হঠাৎ শুনতে পেল, 'এই উপা, আমাকে যে চিনতেই পারছিস না। তোর কী হল রে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে উপাসনা দেখে স্বাতী। ওর স্কুলের বন্ধু। কমলিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় উপাসনা অন্য কারও দিকে তাকানোর সুযোগ পায়নি। স্বাতীকে দেখে খুশিতে ও উচ্ছ্বল হয়ে উঠল। বছর তিনেক আগে স্বাতীর বিয়ে হয়ে গেছে। উপাসনা তখন কলকাতায় স্কুলে টিচারি করছে। ভালো করে তাকিয়ে ও দেখল, বেশ মুটিয়ে গেছে স্বাতী। ওর কোলে এক-দেড় বছরের একটা বাচ্চা। বোধহয় বাবাকে দেখাতে এনেছে। চেম্বারে ঢুকে এসে উপাসনা জিজ্ঞেস করল, 'আরে স্বাতী তুই? কবে এলি?'

'দিন তিনেক আগে। বিয়ের পর এই প্রথম এলাম। আর বলিস না, বর কিছুতেই ছাড়ে না। অফিসের কাজে কলকাতায় এসেছে। সুযোগটা তাই ছাড়লাম না। এখানে চলে এলাম। সপ্তাহখানেক থাকব। তারপর, তুই কেমন আছিস বল?'

'ভালো রে। আমি তো এখন নবদ্বীপে থাকি না। কলকাতায় কাকার বাড়িতে থাকি। দিন চার পাঁচেকের জন্য এসেছি। ভাগ্যিস এসেছিলাম। তাই তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'তুই তো আমার বিয়েতে এলিই না। বরকে কত গর্ব করে তোর কথা বলেছি। আমাদের ব্যাচে পড়াশুনোয় সবথেকে ভালো আর সুন্দরী মেয়ে। তুই একটা যাচ্ছেতাই....।'

শুনে উপাসনা হাসল। স্বাতীটা আগের মতোই রয়ে গেল। কথা ঘোরানোর জন্য ও বলল, 'কোলেরটা ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে। দ্যাখ না, জন্মানোর পর থেকে কোনওদিন আমায় ভোগায়নি। এখানে এসে দাদুর বাড়ির জল পেটে পড়তেই পাতলা পায়খানা শুরু করেছে।'

'জল ফুটিয়ে খাওয়াচ্ছিস না কেন?'

'কাল থেকে তাই খাওয়াচ্ছি। তোর বাবার ওষুধ পেটে পড়লে ঠিক হয়ে যাবে। যাক, তোর খবর কী বল? কী করছিস এখন?'

'রিসার্চ করছি।'

'জানতাম, তুই এরকম কিছুই করবি। আমাদের স্কুলের নাম উজ্জ্বল করবি। শিপ্রাদি তো তখনই বলত, তোমরা সবাই অ্যাভারেজ। উপাসনা এক্সেপশনাল। কী নিয়ে রিসার্চ করছিস রে?

শিপ্রাদি....মানে স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের কথা বলছে স্বাতী। উপাসনা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেম্বারে অনেকে বসে আছেন। তাদের মধ্যে কে শ্রীবৎসের লোক, ও জানে না। হয়তো এখুনি গিয়ে শ্রীবৎসকে খবর দিয়ে দেবে। তাই রিসার্চের কথা উল্লেখ না করে ও বলল, 'বাবার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে, তুই ওপরে উঠে আয়। তখন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

দোতলায় উঠে উপাসনা দেখল, মা বকাবকি করছে কমলিকে। পাশে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জনা। ওর মুখে মুচকি হাসি। ছোট বোনকে হাসতে দেখে উপাসনা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে সুরো?'

সুরঞ্জনা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলল। কমলি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দেখে উপাসনা একটু অবাকই হল। মা তো এত রাগে না কখনও। হঠাৎ কী হল? মাকে ঠান্ডা করার জন্যই ও বলল, 'ছেড়ে দাও মা। আর বকাবকি করো না।'

মা রেগে বলল, 'বকব না মানে? চড়িয়ে গাল লাল করে দেব। সক্কালবেলায় একশোটা টাকা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এল। কার সহ্য হয় বল দিকি?'

'ছাড়ো না মা? এটা অ্যাক্সিডেন্ট। হতেই পারে।'

'ছাড়ব মানে? তুই জানিস, কমলি আজকাল কী করে বেরাচ্ছে?'

শুনে আরও ফোঁপাতে লাগল কমলি। প্রতিবাদ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। মায়ের ধমকে কথা জড়িয়ে একশা। ওর মুখ দিয়ে ফ্যাসফ্যাসে শব্দ বেরল। সেটা শুনে আরও হাসতে লাগল সুরো। বাহ, হাসলে তো খুব সুন্দর লাগে বোনকে। উপাসনা ভাবল, লোকে ওকে সুন্দরী বলে। সুরো তো ওর এককাঠি ওপরে। কাল রাতে খাওয়ার সময় মা বলছিল, বহরমপুর থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে সুরোর। কিছু দিতে টিতে হবে না। পাত্রের মা ওকে কোথায় যেন দেখেছিল। পছন্দ করে ফেলেছে। ছেলেটা চাকরি করে মুম্বইয়ের এক নামী কোম্পানিতে। অত দূরে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাবার মত নেই। মা কথাটা শেষ করেছিল এইভাবে, 'ওদের বলেছি, আমার বড়ো মেয়ের বিয়ে আগে না দিয়ে, ছোটো মেয়ের বিয়ে দেব না। সুরোর বিয়ে আটকে থাকে, থাক।' কথাটা শোনা ইস্তক, উপাসনা ব্যাখ্যা করেছে অন্যভাবে। এটা আসলে ওর বিয়ের প্রস্তাবনা। চাপ দেওয়ার সূচনা। কিন্তু উপাসনা তৈরি হয়ে আছে, মাকে কী বলবে।

'মেয়ের আজকাল স্টাইল হয়েছে।' মা তখনও বলে যাচ্ছে, 'দেখছিস না, সাজগোজের বহর। আজকাল বিকেলের দিকে....কে একটা ছোঁড়া আছে....তার সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছে গঙ্গার ধারে। বদমাস কোথাকার। ময়নাকে বললাম, এখনই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দে। নাহলে পস্তাবি। তোর বড়টা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। ছোটটাও একই কাণ্ড করবে। মুখ পোড়াবে। কে শোনে কার কথা?'

ময়না মানে কমলির মা। একটা সময় ময়না মাসিই কাজ করত ওদের বাড়িতে। এখন শরীরে পারে না বলে কমলিকে ঢুকিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে যাতায়াত করে। মায়ের কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল উপাসনার। কমলিও প্রেম করছে! কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই মা বলল, 'কী বলছিস তুই, জানব না? ওর মা-ই তো মাইনে নেওয়ার দিন, আমার কাছে কমপ্লেন করে গেল। বলল, বিকেলের দিকে কমলিকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। আচ্ছা, আমার চোখকে ফাঁকি? আর বাইরে বেরুতে দিই না। আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম। একদিন দেখলাম, বিকেলের দিকে ছোঁড়া আমাদের বাড়ির আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে। নবুকে দিয়ে এমন কড়া ধমক দিয়েছি, এখন আর তার টিকি দেখা যায় না।'

উপাসনা বলল, 'কী রে কমলি, মা যা বলছে, ঠিক?'

এবার গলা অনেক পরিষ্কার কমলির, 'না গো দিদিভাই। আমার কোনও দোষ নেই। মায়ের দিব্যি। আমি ওর দিকে তাকাই না। ও-ই আমার পেছন পেছন ঘোরে।'

'কী করে ছোঁড়া?'

'ইউরেকা হোটেলের কাজ করে।'

সিঁড়ি দিয়ে স্বাতী ওপরে উঠে আসছে। সেটা দেখে উপাসনা বলল, 'ঠিক আছে, তুই এখন রান্নাঘরে গিয়ে ময়দা মেখে দে। বাবার জলখাবার তৈরি করবে সুরোদি। আর শোন, বিকেলের দিকে একবার ফের মনে করিয়ে দিস। তোকে সোনা মুগের ডাল কিনে আনতে হবে।'

স্বাতীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল উপাসনা। ওর কোলে বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দুজনে জমিয়ে বসল। বরের কথা জিজ্ঞেস করতেই স্বাতীর মুখটা কেমন যেন আহ্লাদে হয়ে গেল। কাগজে 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন দেখে ওর বিয়েটা হয়েছে। দেখে তো মনে হচ্ছে, স্বাতী সুখী। স্কুলে ওপরের ক্লাসে পড়ার সময় গোবিন্দ বলে একটা ছেলের সঙ্গে ওর প্রেম হয়েছিল। চিঠিপত্তর দেওয়া নেওয়া হত। নবদ্বীপে গোবিন্দর বাবার বিরাট কাপড়ের দোকান। কথায় কথায় উপাসনা গোবিন্দর প্রসঙ্গ তুলতেই স্বাতীর মুখটা তেতো হয়ে গেল। বলল, 'ওই কাওয়ার্ডটার আর কথা বলিস না। ভাগ্যিস বিয়ে হয়নি। হলে নবদ্বীপেই পচে মরতে হত। একটা জিনিস বুঝেছি, বাবা-মায়ের দেখে দেওয়া ছেলে অনেক ভালো রে। দুজন একটু অ্যাডজাস্ট করে চললে, কোনও অসুবিধে হয় না।'

'তোর শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'আমার বরের অ্যাকচুয়াল বাড়ি কৃষ্ণনগরে। ও চাকরি করে ভুবনেশ্বরে। অফিস থেকে চার কামরার ফ্ল্যাট দিয়েছে। সেইসঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য গাড়িও। বাচ্চা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা অনেক ঘুরেছি রে। অফিসের কনফারেন্সে নব্যেন্দু.....মানে আমার বর যেখানে যেখানে গেছে, আমায় সঙ্গে নিয়েছে। আমার কুয়ালালামপুর আর ব্যাঙ্কক ঘোরা হয়ে গেছে। মজার কথা শুনবি, আমি কনসিভ করেছি কোথায় জানিস? ব্যাঙ্ককে। অথচ এত শিগগির আমার বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। যাক আমার কথা। তোর খবর কী বল। প্রেম-ট্রেম করছিস? নাকি অমৃতদার জন্য এখনও বসে আছিস?'

স্বাতীর মুখে অমৃতদার নামটা হঠাৎ কানে এসে বাজল উপাসনার। বয়সে ওর থেকে অনেক বড়ো অমৃতদার প্রেমে পড়েছিল উপাসনা, ও যখন ক্লাস নাইনে পড়ে। পিসির কোন সম্পর্কের দেওর যেন? রাজপুত্রের মতো চেহারা ছিল অমৃতদার। থাকত কলকাতায়। বছরে চার পাঁচবার গোঁসাই বাড়িতে আসত। হাল ফ্যাশনের জামাকাপড় পরত। ওর জ্যাঠতুতো দুই দিদির সঙ্গে খুব ইয়ার্কি ফাজলামি মারত। অর্ধেক কথাই বুঝতে পারত না উপাসনা। কোনও কোনও সময় ওকে ভাগিয়ে দিত ওরা। তবুও, অমৃতদাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত উপাসনা। ওর এই পাগলামির কথা স্কুলের দু'তিনজন বন্ধু জানত। ইনফ্যাচুয়েশন, এ ছাড়া আর কী। অমৃতদার কথা শুনে স্বাতীকে ও বলল, 'তোর মাথা

খারাপ? ইউনির্ভাসিটি আর লাইব্রেরিতে এত সময় চলে গেল, প্রেম করার সময়ই পেলাম না। অমৃতদার কথা আমার মনেই ছিল না। হ্যাঁ রে, অমৃতদার কী খবর রে? বিয়ে টিয়ে করেছে? না কি ক্যাসানোভা টাইপের রয়ে গেল।'

স্বাতী বলল, 'তুই জানিস না? সে এক কেলেঙ্কারির একশেষ। বিয়ে করেছিল, বড়োলোকের এক মেয়েকে। সে বিয়ে টিকল না। রোজ দুজনের মধ্যে ঝামেলা। প্রায়ই থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়াত। শেষে ডিভোর্স হয়ে গেল। কলকাতায় মাঝে একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল অমৃতদার। কালো আর বুড়োটে হয়ে গিয়েছে। দেখলে চিনতে পারবি না। শুনলাম, এখন লিভ টুগেদার করে, কোন এক বিধবা মহিলার সঙ্গে। দ্যাখ, ভগবান যা করে, মঙ্গলের জন্য করে, বুঝলি।'

শুনে চাপা শ্বাস ফেলল উপাসনা। কার কপালে কী লেখা আছে, কে বলতে পারে? কথা ঘোরানোর জন্য উপা বলল, 'ভুবনেশ্বর থেকে পুরী কত দূরে রে?"

স্বাতী বলল, 'কাছেই। গাড়ি করে গেলে বড়ো জোর ঘণ্টাখানেক। আমরা তো শনি রবিবার সময় পেলেই গাড়ি নিয়ে পুরী চলে যাই। ওখানে নব্যেন্দুদের কোম্পানির গেস্ট হাউস আছে। কেন রে? তোর কি ওদিকে যাওয়ার কোনও প্ল্যান আছে?'

'তার আগে বল, আমি যদি জাজপুর বা কেন্দ্রপড়াতে যাই, তাহলে ও-দুটো জায়গায়....ভুবনেশ্বর থেকে যাওয়া যাবে? মানে.....গেলে একদিনের মধ্যেই ভুবনেশ্বরে ফিরে আসা যাবে?'

'আলবাত ফিরে আসা যাবে। জাজপুরের কথা আমি জানি। নব্যেন্দুদের একটা অফিস আছে ওখানে। তোর কোনও অসুবিধা হবে না। কেন্দ্রপড়া একটু দূর। কটক থেকে ওই জায়গাটা কাছে। খুলে বল তো, আসলে তুই কোথায় যেতে চাস?'

'আমি একটা পিকিউলিয়ার সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করছি। শ্রীচৈতন্যদেবের পুনর্জন্ম নিয়ে। আচার্য সুধীর মিশ্র মশাইকে তো চিনিস। ওঁর ধারণা হয় জাজপুর, না হয় কেন্দ্রপড়াতে মহাপ্রভু ফের জন্ম নিয়েছেন। ওই দুটো জায়গায় আমি যেতে চাই। না-গেলে রিসার্চ কমপ্লিট করতে পারব না।'

'বাপ রে, সাবজেক্টটা তো দারুণ। নবদ্বীপে হইহই পড়ে যাবে যে! তুই চল আমার ওখানে। আমার বরের অনেক জানাশোনা। তোকে হেল্প করতে পারবে। কবে যাবি, বল। আজই ফোন করে বরকে সব বলে রাখছি।'

'দাঁড়া, দাঁড়া। অত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। বাবা আর মাকে এখনও কিছু বলিনি। আমার বিয়ের জন্য ওঁরা উঠেপড়ে লেগেছেন। ওদের কনভিন্সড করতে হবে। ফিরে এসে তারপর আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসব। আচার্য মশাই একবার আমায় বলেছিলেন, এই কাজটায় বিপদ আছে। ওড়িয়া বৈষ্ণবরা কোনও গোপন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবকে লুকিয়ে রেখেছেন। পৃথিবীতে মাত্র তেরোজন জানেন, ওঁকে কোথায় রাখা হয়েছে। বিশেষ এক তিথিতে নাকি ওঁরা প্রকাশ্যে আনবেন ওঁকে।'

'ইন্টারেস্টিং তো। এই উপা, তুই ভয় পাস না। মাসিমা-মেসোমশাইকে যে করেই

হোক, তুই ম্যানেজ কর। আমার বর আছে। তোর জন্য যতটা সম্ভব, করবে। উফ, তুই ভাব তো, ছোটোবেলা থেকে যাঁর ছবি আমরা পুজো করে আসছি, সেই চৈতন্যদেব আবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন.....। ওঁকে যদি খুঁজে বের করতে পারিস, তা হলে তো ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাবি রে উপা। মায়াপুরের লোকেরা জানতে পারলে তো, তোকে মাথায় করে রাখবে।'

মায়াপুর? নামটা দড়াম করে এসে ধাক্কা মারল উপাসনার কানে।

(উনিশ)

বইমেলার ঝামেলায় দু'দিন মেল চেক করার সময় পায়নি জয়দেব। আজ রবিবার, ছুটির দিন। সকালের দিকে তেমন কোনও কাজ নেই। তাই ল্যাপটপটা খুলে লগ ইন করল জয়দেব। একগাদা মেসেজ এসে পড়ে রয়েছে। তাতে চোখ বোলাতে বোলাতে নরহরি মহাপাত্রের একটা মেসেজ দেখে ও ক্লিক করল। কয়েকদিন আগে ভদ্রলোককে ও ধরার চেষ্টা করেছিল ল্যান্ড লাইনে। তখন রেকর্ডেড একটা মেসেজ পায়, 'যা বলার ভয়েস মেল-এ বলুন।' জয়দেব নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, খণ্ডগিরিতে গিয়ে ও দেখা করতে চায়। কবে গেলে দেখা হতে পারে, দয়া করে তা জানান। সেই অনুযায়ী, ও ভুবনেশ্বর যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কাটবে।

সে দিনই সন্ধেবেলায় এক ভদ্রলোক ফোন করে জানতে চান, জয়দেব কেন দেখা করতে চাইছে। জয়দেব সবে শ্রীচৈতন্যদেবের ছবিটার কথা বলতে শুরু করেছে, সেই সময় ও প্রান্ত থেকে ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান, বলুন তো? মনে হয়, আপনার কোথাও ভুল হয়েছে। রঙ নাম্বারে ফোন করেছেন। আমার নাম কিন্তু নরহরি দাসমহাপাত্র।' কথাগুলো বলেই তাড়াহুড়ো করে ভদ্রলোক ও প্রান্তে রিসিভারটা রেখে দিয়েছিলেন। জয়দেব একটু অবাকই হয়েছিল। নরহরি মহাপাত্রর ল্যান্ড লাইনের নাম্বারটা ও জোগাড় করেছিল ওড়িশা সাহিত্য অ্যাকাডেমির অফিস থেকে। ওদের তো এত ভুল হওয়ার কথা নয়! তবে কি নরহরি মহাপাত্র ওকে অ্যাভয়েড করতে চান?

তারপর হঠাৎ এই মেল! আশ্চর্য, ভদ্রলোক ওর মেল অ্যাড্রেস পেলেন কী করে? জয়দেব তাড়াতাড়ি মেল খুলে দেখল, নরহরি মহাপাত্র লিখেছেন, 'ডিয়ার জয়দেব, আপনার মেল অ্যাড্রেসটা দিনকাল পত্রিকা থেকে পেয়েছি। আপনার শুভানুধ্যায়ী সুশোভনদা আমার কাছে এসেছিলেন। তিনিই আমাকে আপনার পত্রিকার লেটেস্ট ইস্যুটা দিয়ে যান। শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে আর্টিকেলটা পড়ে আমার মনে হল, বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি, ওই লেখাটা ছেপে। পরে সেটা টের পাবেন।'

'সে দিন আপনাকে আমিই ফোনটা করেছিলাম। তখনও আপনার সম্পর্কে কিছু জানতাম না। আপনি যখন ছবিটার কথা বলতে শুরু করলেন, তখন বাধ্য হয়েই আমি রঙ নাম্বার বলে লাইনটা কেটে দিয়েছিলাম। ফোনে এ সব কথা আলোচনা করা বিপজ্জনক।

ইন্টারনেট এখনও অনেক সেফ। যাক সে কথা। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, আমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। যৌবনে অনেক সামলেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, দিন শেষ হয়ে আসছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে একটা তথ্য গোপন রাখা যে কী যন্ত্রণার এবং কষ্টকর, তা আপনারা বুঝবেন না। এর জন্য অনেক....অনেক প্রলোভন আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।'

'আমি এখন থাকি খণ্ডগিরির এক কিলোমিটার দূরে জাগোমারা গ্রামে। ভুবনেশ্বর থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়। দশ বারো কিলোমিটারের মধ্যে। পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি করে এলে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। বছর পাঁচেক আগে একবার আমার জীবন সংশয় হয়েছিল। কোনওরকমে সে যাত্রায় বেঁচে যাই। তারপর শহরের কোলাহল থেকে দূরে চলে এসেছি। এখানে আমার কিছু খেতি জমি আছে। চাষবাস....দেখাশুনো করি। প্রোফেশনাল লাইফ থেকে এখন আমি অনেক দূরে। আমি চাই না, কোনও কারণে ফের আমার জীবনে শান্তি নষ্ট হোক। আপনি যা জানতে চান, সে ব্যাপারে অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও, আপনাকে আমি খুব বেশি সাহায্য করতে পারব না। দয়া করে এই বৃদ্ধ মানুষটাকে নতুন কোনও বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। সুশোভনবাবুকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তাঁকে আমি, একই জবাব দিয়েছি। আশা করি, আমার অবস্থাটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন।'

'জয়দেববাবু, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। সুশোভনবাবুর মুখে শুনেছি, আপনার বয়স তিরিশের কম। বয়োঃজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে পরামর্শ দিই, আপনি ওড়িশায় না-এলেই আমি খুশি হবো। ইতি নরহরি মহাপাত্র।

মেলটা বার দুয়েক পড়ে জয়দেব হতভম্ব হয়ে বসে রইল। নরহরিবাবু জাগোমারাতে যেতে মানা করছেন। বলছেন, ওঁর পক্ষে কোনও রকম সাহায্য করা সম্ভব না। এ কেমন কথা? সুশোভনদার ধারণা, একমাত্র নরহরিবাবুই জানেন, গোকুলানন্দ দাসের আঁকা শেষ দু'টি ছবি কোথায় আছে। ছবি দু'টো উদ্ধার করা জরুরি। কেন না, তাতে আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। ল্যাপটপের সামনে বসে জয়দেবের হঠাৎ মনে হল, ছবি দু'টো পাওয়া গেলে, সত্যিই কি প্রমাণ করা যাবে মহাপ্রভুর প্রয়াণ কীভাবে হয়েছিল? ছবির বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, পণ্ডিতরা প্রথমেই প্রশ্ন তুলবেন, ছবি দু'টো যে মহাপ্রভুর অন্তিমকাল দেখে আঁকা তার প্রমাণ কী? অনেক বছর পরেও তো আঁকা হতে পারে। শিল্পীর উদ্ভট মস্তিষ্কের কল্পনাও হতে পারে। না, বড্ড বেশি ওয়াইল্ড গুজ্ চেস করা হয়ে যাচ্ছে। জয়দেব বুঝে উঠতে পারল না, ওর খণ্ডগিরি যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে কী না।

ড্রয়িং রুম থেকে ফোন বাজার আওয়াজ আসছে। এই সময় কারও ফোন আসার তো কথা নয়? তবে কি সুশোভনদা? দু'তিনদিন সুশোভনদা কোনওরকম যোগাযোগ করেননি। একটু চিন্তার মধ্যেই রয়েছে জয়দেব। নিজে থেকে কন্টাক্ট করারও উপায় নেই। দ্রুত পা চালিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে ও ফোনটা ধরল। ও প্রান্তে কৌশিক। বলল, 'জয়দেবদা,

গিল্ড অফিস থেকে বলছি। এরা আমাদের চারশো স্কোয়ার ফুটের স্টল দিতে পারবে না বলছে। কী করব?'

ময়দান থেকে উঠে গিয়ে বইমেলা এখন বাইপাসের কাছে মিলন মেলার মাঠে হচ্ছে। সেখানে একটা চারশো স্কোয়ার ফিট-এর স্টল নেওয়ার জন্য, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর কাছে অ্যাপ্লাই করেছিল জয়দেব। বইমেলায় এ বার খুব সাজিয়ে গুছিয়ে বসার ইচ্ছে ছিল ওর। এখনও বইমেলার মাস দেড়েক বাকি। কিন্তু আজই স্টল-এর অ্যালটমেন্ট হওয়ার কথা ছিল। তাই কৌশিককে ও গিল্ডের অফিসে পাঠিয়েছিল। জয়দেব শুনে খুব হতাশ হল, গিল্ড জায়গাটা দেবে না বলেছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কত এরিয়া দেবে বলছে?'

'দু'শো স্কোয়ার ফিট। কী করে আমাদের হবে জয়দেবদা? কত প্ল্যান করলাম, সব যে ভেস্তে যাবে।'

'কী আর করবি, নিয়ে নে।'

'ত্রিদিবদার সঙ্গে আপনি নিজে একবার কথা বলুন না জয়দেবদা?'

ত্রিদিবদা হলেন গিল্ডের সেক্রেটারি। ওঁকে অনুরোধ করা যায়। কিন্তু কী ভেবে জয়দেব বলল, 'না থাক। ওরা যা দিচ্ছে, নিয়ে নে। মোট কত টাকা লাগবে রে তা হলে? সেটা কিন্তু জেনে আসিস?'

'জেনে নিয়েছি জয়দা। গিল্ডকে দিতে হবে হাজার পাঁচেক। আর ডেকোরেটর, ইলেকট্রিসিটির খরচা...সব মিলিয়ে মোট হাজার পঁচিশ।'

মনে মনে হিসেব করে নিল জয়দেব। ঠিক আছে, সাধ্যের মধ্যে। এ বছর স্টলটা না হয় ছোটই হোক। এক পা এক পা করেই তো ও এগোচ্ছে। প্রথম দু'বছর অ্যাপ্লাই করা সত্ত্বেও, গিল্ড ওকে স্টল দেয়নি। সেই সময় গোপাল জ্যাঠার স্টল থেকে ওদের বই বিক্রি করতে হত। তার পরের দু'বছর বইমেলায় ওরা জায়গা পেয়েছিল পঞ্চাশ স্কোয়ার ফুট করে। গত বছর থেকে পাচ্ছে দু'শো স্কোয়ার ফুট। এ বছর প্রথম দিকে, বড় স্টল করার ইচ্ছে জয়দেবের ছিল না। দোকানে আগুন লাগার পর ও দমে গেছিল। কিন্তু কৌশিকদের মুখ চেয়ে চুপ করে যায়। ভালই হল, কিছু টাকা ওর বেঁচে গেল। চারশো স্কোয়ার ফুটের স্টল সাজাতে, ওর আরও হাজার পনেরো টাকা বেশি খরচা হয়ে যেত। ও সব ভেবে কৌশিককে ও বলল, 'তুই হ্যাঁ করে দে। আর গিল্ডকে বল, পয়লা ফেব্রুয়ারি দুপুর দু'টোয় ইউবিআই অডিটোরিয়ামটা আমাদের জন্য যেন অ্যালট করে। ভাল লোকজন ডেকে সুশোভনদার বইটা রিলিজ করতে হবে। দু' ঘণ্টার জন্য কত লাগবে, সেটা কিন্তু জেনে নিস।'

'দশ হাজার টাকা। আমি অলরেডি এয়ার কন্ডিশনড রুমটা বুক করে দিয়েছি।'

'ভেরি গুড। কাগজপত্তর নিয়ে তুই বাড়ি চলে যাস। কাল কলেজ স্ট্রিটে এসে আমায় দিবি। আর হ্যাঁ, সুমিতার খবর কী রে?'

'ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে জয়দেবদা। ঠিক বইমেলার আগে। কী প্রবলেম, বলুন

তো। ওই ভাইটাল সময়টায় ওকে পাওয়া যাবে না। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি পৌলমী বা রঞ্জনাকে দিয়ে কাজ তুলে নেব। ওদের তো আপনি চেনেন। সেই লিটল ম্যাগাজিনের মেয়ে দু'টো।'

কে পৌলমী, তা মনে করতে পারল না জয়দেব। কত ছেলেমেয়েই তো আসে দিনকাল-এ লেখা দিতে। দেখে ভালও লাগে একেক সময়। বাঙালি ছেলেমেয়েদের সাহিত্যচর্চায় কত আগ্রহ! হবু সাহিত্যিকদের মহলে কৌশিক একটা গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছে। মেজেনাইন ফ্লোরে বসে কাজ করার সময় জয়দেব ওদের কথাবার্তা শুনে মাঝে মধ্যে মজাও পেত। লেখা দিতে এসে অনেকেই রাজা উজির মারে। সত্যি, কৌশিকের অদম্য উৎসাহ দেখে জয়দেব নিশ্চিন্ত। কৌশিকটা যদ্দিন আছে, দিনকাল অন্তত উঠে যাবে না। সুমিতা চলে গেলে, পৌলমী আসবে। পৌলমী চলে গেলে রঞ্জনা। কৌশিক কাউকে না কাউকে ঠিক জুটিয়ে ফেলবেই। মনে মনে খুশি হয়ে, আর কথা না বাড়িয়ে জয়দেব বলল, 'ঠিক আছে। আমার কয়েকটা মেল করার আছে। এখন ছাড়ি তা হলে!'

ফোন ছেড়ে দিয়ে জয়দেব সোফায় এসে বসল। মা এখনও ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরেনি। একা একা বাড়িতে এ বার কেন জানে না, ওর ভাল লাগছে না। দোকানে আগুন লাগার কথা মায়ের কাছে চেপে গেছিল ও। কিন্তু গোপালজ্যাঠা দেশের বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে এমনভাবে গল্প করেছে, যেন ওর ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলে গেছে। আর উঠে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নেই। অংশুমানবাবুর সম্পর্কেও একগাদা মনগড়া কথা লাগিয়েছে মায়ের কানে জ্যাঠা। শুনে মা কাঁদকাঁদ হয়ে ফোন করেছিল। পরদিনই ফিরে আসতে চেয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু জয়দেব অনেক কষ্টে সেদিন মাকে আটকেছে।

দোকানে আগুন লাগাটা অবশ্য ওর পক্ষে মন্দের ভাল হয়ে গিয়েছে। সেটা অবশ্য গোপালজ্যাঠারা জানেন না। ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছে জয়দেব দু'লাখ টাকা ক্লেম করেছিল। ইনসিওরেন্স কোম্পানি সেটা মেনেও নিয়েছে। টাকা বইমেলার আগে পাওয়া যাবে। এটা একটা কারণ। অন্যটা হল, আগুন লাগার সূত্রেই, প্রায় দশ বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে কিঙ্কর তালুকদারের। কলেজের বন্ধু, কিঙ্কর ব্যাটা যে পুলিশে জয়েন করেছে জয়দেব তা জানত না। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা থেকে ওসি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কৌশিকের সঙ্গে সেখানে গিয়ে, জয়দেব দেখে ওসি-র চেয়ারে বসে আছে কিঙ্কর। ব্যাটা সেদিন ছাড়েই না। ঘণ্টাখানেক গল্প করার পর কিঙ্কর বলল, 'নিশ্চিন্ত থাক জয়। যে লোকটা আগুন লাগিয়েছে, তাকে আমি ধরবই। শোন, পুলিশ পারে না, হেন কোনও কাজ নেই।'

কিঙ্করকে মাঝে তিন চারদিন ফোন করেছিল জয়দেব। বোধহয় ব্যস্ত ছিল। 'দেখছি', 'গুটিয়ে এনেছি'....এই ধরনের কথা বলে ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দিন যতটা আশ্বাস দিয়েছিল, পরে তার অর্ধেকও ওর গলা থেকে শোনা যায়নি। সত্যি বলতে কী, অপরাধী লোকটা কে, সেটা জানার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে জয়দেব। একটা থানা এলাকায় রোজ কত রকমের অপকর্ম হয়, তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়াটাই কিঙ্করের পক্ষে স্বাভাবিক। আজ কী মনে

হওয়ায়, জয়দেব মোবাইল থেকে ওকে ফোন করল। কিঙ্কর না কি সকাল আটটাতেই নীচে নেমে এসে ওসি-র ঘরে বসে। বাইরে কোনও ঝামেলা মেটাতে না-গেলে বেলা একটা পর্যন্ত ওই ঘরেই থাকে। কিন্তু বার কয়েক ফোন লাগিয়েও জয়দেব ওকে ধরতে পারল না। সুইচ অফ করা আছে। খবরের কাগজটা সেন্টার টেবলে পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে হেডিংগুলোতে জয়দেব চোখ বোলানোর সময়ই ডোর বেলটা বেজে উঠল। বোধহয় কাজের মাসি এল। উঠে গিয়ে জয়দেব দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। কিঙ্কর তালুকদার। এত সকালে বেহালায়? এই একটু আগেই তো ওর কথা ভাবছিল। কিঙ্করকে দেখে ও বলল, 'উফ্, তুই একশো বছর বাঁচবি। এই মাত্তর তোকে ফোন করেছিলাম।'

কিঙ্কর ঘরে ঢুকে বলল, 'যাক নিশ্চিন্ত। এখনও অনেক বছর হাতে আছে। আরে, কাল রাতে ঠাকুরপুকুরে এক আত্মীয়ের বিয়েতে এসেছিলাম। আর বাড়ি ফিরিনি। এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম, তোর সঙ্গে দেখা করে যাই। মাসিমাকে ডাক। জমিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যাই।'

'মা নেই। কাজের মাসি আসছে। চা করে দেবে। তুই বোস।'

সোফায় বসে কিঙ্কর বলল, 'তোকে আজ সকালেই আমি ফোন করতাম। এই দ্যাখ, ফোনের কথায় মনে পড়ল, এখনও মোবাইলটা বন্ধ করা আছে।' পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে, ফোনটা চালু করার পর কিঙ্কর বলল, 'তোর কেসটায় একটা ব্রেক থ্রু হয়েছে রে।'

শুনে জয়দেব প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'তাই নাকি! লোকটাকে পেয়ে গেছিস?'

'ট্র্যাক ডাউন করেছি। তার আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোর সঙ্গে শত্রুতা আছে, এমন কোনও লোক কি পুরী, ভুবনেশ্বর বা তার কাছাকাছি কোথাও থাকে? মানে....আমি জানতে চাইছি, এমন একটা লোক....যে আসলে ওড়িয়া।'

প্রশ্নটা শুনে জয়দেব ভেবেই পেল না, লোকটা কে হতে পারে? ও বলল, 'না, এ রকম কোনও লোককে তো আমি চিনি না।'

কিঙ্কর বলল, 'ভাল করে ভেবে বল, জয়। তুই কি রিসেন্টলি পুরীতে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, বার কয়েক গেছি। ভুবনেশ্বরেও। আমার রিসার্চের কাজে। কেন বল তো?'

'আই সি। তোর এই রিসার্চের কথা কি অনেকেই জানে?'

'জানতেই পারে। আমাকে লাইব্রেরিতে বসতে হয়েছে। পুরীর কয়েকটা মন্দিরেও ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। ওখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্চা করেন, এমন অনেক লোকের সঙ্গে কথাও বলেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার দোকানে আগুন লাগার সম্পর্কটা কী?'

'দ্যাট'স ইট! সম্পর্ক আছে। আমার মনে হচ্ছে, ওই লোকগুলোর মধ্যে কেউ চায় না, তুই এই সাবজেক্টটা নিয়ে রিসার্চ করিস। শোন, তদন্ত চলছে বলে, সব কথা তোকে এখন বলতে পারছি না। তবুও, আমাদের ফাইন্ডিংস তোকে জানিয়ে দিই। যে লোকটা তোর দোকানে আগুন লাগিয়েছে, তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। খুব ফরসা, মন্দিরের পাণ্ডা গোছের চেহারা। বেশ শক্তপোক্ত। আমার এসআই ওকে প্রথম দেখে শিয়ালদা অঞ্চলের

এক হোটেলে। ওর কথাবার্তায় তখনই আমাদের সন্দেহ হয়। পরে থানার এক ওয়াচারকে হিজড়ে সাজিয়ে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বাড়তি কিছু খবর দেয়। তখন আমরা ট্র্যাক রাখতে শুরু করি। জানতে পারি, শিয়ালদা হোটেলে ওঠার আগে লোকটা বাগমারির এক গেস্ট হাউসে ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ওর নেটওয়ার্ক। শিয়ালদা থেকে ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা যখন ওত পেতে আছি, সেই সময় লোকটা আগাম খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। গিয়ে ওঠে বাইপাসে হোটেল মেনকায়। তিনটে হোটেলেই অবশ্য ও নাম ভাঁড়িয়েছিল। তিন জায়গায় তিন রকম আইডেনটিটি কার্ড ও দেখিয়েছে। তার মানে বুঝছিস? এটা ওর একার কম্ম নয়। ওর পেছনে অর্গানাইজড একটা দলও আছে। এবং তারা ইন্টারস্টেট ক্রাইম করে।'

'তোরা জানলি কী করে, লোকটা হোটেল মেনকায় ছিল?'

'ওর হয়ে যারা শিয়ালদার হোটেলে রুম বুক করেছিল, সেই ট্রাভেল এজেন্সির দু'জনকে তুলে এনে বেদম মেরেছি। তখন ওরা স্বীকার করে, পুরী থেকে কেউ ফোন করে ওদের রিকোয়েস্ট করেছিল। রিকোয়েস্টটা তিনবারই আলাদা আলাদা নাম্বার থেকে এসেছিল। তবে একই লোকের জন্য কী না, বলতে পারেনি।

তখনই আমরা ঠিক করলাম, পুরীতে খোঁজ নিতে হবে। যাই হোক, ওই লোকটার স্কেচ আমরা আমাদের আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। মুশকিল হল, আমরা যে ওকে খুঁজছি, সেটা ও জানতে পেরে গেছে। আমার ওয়াচাররা কনস্টান্ট লেগে আছে। আমার ধারণা, লোকটা এখনও কলকাতাতেই আছে।'

'কিন্তু....আমি তো বুঝতেই পারছি না। আমার সঙ্গে ওর শত্রুতা কিসের?'

'কারণটা আমরাই খুঁজে বের করব। আমি পার্সোনালি এলাম, তোকে সাবধান করে দিতে। রাস্তা ঘাটে যখন বেরবি, তখন একা থাকিস না।....'

কিঙ্কর আরও কী বলে যাচ্ছে, জয়দেবের কানে তা ঢুকল না। ও বুঝতে পারল না, কিঙ্করকে সুশোভনদার কথা খুলে বলবে কী না। একটু আগে নরহরি মহাপাত্রও ওকে সাবধান করে দিয়েছেন। তা হলে মামলা সত্যিই সিরিয়াস। ভয়ের বদলে ওর রাগ হতে লাগল। জয়দেব ঠিক করে নিল, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। ওর কপালে যা-ই লেখা থাক না কেন, সুশোভনদাকে বাঁচানোর জন্য ভুবনেশ্বর ও যাবেই।

কুড়ি

মুকুন্দ এসে ইশারায় বলল, 'ফোন আছে। দেব, না বলে দেব, আপনি নেই?'

ওর হাতে মোবাইল ফোন। কম্বলের ওপর বসে তখন যোগ ব্যায়াম করছিল গোরা। এই সময়টায় কথা বলে না। পাল্টা ইশারায় ও জানতে চাইল, 'কে করেছে, জেনেছিস?'

দু'টো আঙুল ভি-এর মতো করে দেখাল মুকুন্দ। ওহ, তার মানে ভৈরব দাস। শুনেই

গোরার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। ভৈরব দাসের সঙ্গে ও কথা বলতে চায় না। ছেলেটা আগে অনেক হেনস্থা করেছে ওকে। সেই সময় ও ডান হাত ছিল অদ্বৈত চ্যাটার্জির। সেইসঙ্গে দলিত পার্টির ইউথ উইংয়ের সেক্রেটারি। কিন্তু পার্টির নামে টাকা পয়সা তুলে হাপিশ করার জন্য ওর ওপর মারাত্মক রেগে যান অদ্বৈতবাবু। ওর বদলে সেক্রেটারি করেন গোরাকে। মাসখানেক লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। অবরোধের পরদিন থেকে ভৈরব এখন মাঝে মাঝেই ফোনে যোগাযোগ করছে। প্রথম দিন ভুল করে ফোনটা ধরে ফেলেছিল গোরা। টুকটাক কথা বলে ছেড়ে দেয়। এখন ওর নাম্বারটা পর্দায় দেখলেই আর সুইচ অন করে না।

গোরার মোবাইল ফোনটা এখন আর গোরার কাছে থাকে না। বেশির ভাগ সময়ই থাকে মুকুন্দর কাছে। অবরোধের পরদিন থেকে ছেলেটা হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেল। অবরোধের দিন খুব ভাল পাবলিসিটি পেয়েছিল গোরা। টিভি চ্যানেলগুলো প্রাইম টাইম-এর খবরে ভাল কভারেজ দিয়েছিল। বারবার ওর মুখটা দেখিয়েছিল। চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথাবার্তার খানিকটা খানিকটা অংশও। গোরা খুব অবাক হয়ে গেছিল, পরদিন কলকাতার এক বড় কাগজে, খবরটা বড় করে বেরতে দেখে। জলসমস্যা নিয়ে পরদিন দু'তিনটে কাগজ এডিটোরিয়ালও লেখে। সব মিলিয়ে ভাল একটা ইমপ্যাক্ট হয়েছিল। এ সব দেখে মুকুন্দর চোখে ঘোর লেগে গেছে।

আগে পড়াশোনার বাইরে, বাকি সময়টা ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনত, অথবা টিভি দেখত। গোরার কাছাকাছি খুব একটা ভিড়ত না। ইদানীং কলেজ যাওয়া বাদে...সবসময় ও গোরার দেখভাল করে। সকালে দুধের গ্লাসটা সামনে এগিয়ে দেয়। নিজেই ব্রেকফাস্ট রেডি করে। গোরাকে যাতে কেউ ফালতু ডিসটার্ব না করে, তার জন্য মোবাইল ফোনটা সবসময় নিজের কাছে রাখে। কেউ দেখা করতে এলে, দশবার জিজ্ঞেস করে তবে চৌকাঠ পেরুতে দেয়। মাঝে একদিন অদ্বৈতবাবু মজা করে জানতে চেয়েছিলেন 'তোমার এই হনুমানটিকে কবে থেকে বহাল করলে গোরা? আমাকেও দশ রকম কোয়েশ্চেন করে, তবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেয়।' শুনে গোরা হেসে ফেলেছিল।

মুকুন্দ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র শুনে সেদিন অদ্বৈতবাবু বলেছিলেন, 'ওকেও পার্টিতে নিয়ে এসো। যত ইয়ং এডুকেটেড ছেলে পার্টিতে আসবে, ততই মঙ্গল।' গোরা হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি। জোর জবরদস্তির তো কিছু নেই। মুকুন্দর যদি পার্টি ভাল লাগে, তবে আসবে। এরই মধ্যে এন্টালির এক ওয়ার্কশপ-এ ওর সঙ্গে মুকুন্দ গেছিল। সারাক্ষণ আগ্রহ নিয়ে দলিতদের সমস্যার কথা শুনেছে। বাড়িতে পার্টি নিয়ে কথাবার্তা বিশেষ বলে না গোরা। কিন্তু সেদিনই রাতের দিকে ও লক্ষ করেছে, নেট খুলে দলিত পার্টির মুভমেন্ট নিয়ে মুকুন্দ পড়াশোনা করছে। আজকালকার ছেলেরা পারেও বটে, নেট খুলে তথ্য জোগাড় করতে। হয়তো এমন একটা দিন আসবে, যখন গোরা দেখবে, পার্টি সম্পর্কে মুকুন্দ ওর থেকেও বেশি জানে।

অবরোধের পর থেকে পার্টিতে গোরার ইমেজ অনেক বেড়ে গেছে। চিফ মিনিস্টার

কথা দিয়েছিলেন, ব্যবস্থা নেবেন। সত্যি, নিয়েছেন। পুলকেশ মাহাত পরে ফোন করে গোরাকে খবরগুলো দেন। কাগজে ও দেখেছে, তিলজলা থেকে টাকলা জগাই গ্রেফতার হয়েছে। থানার ওসি বদলি হয়ে চলে গেছেন বাঁকুড়ায়। সরকার থেকে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর নির্দেশ গেছে গফফর মোল্লা বস্তিতে। মাঝে তরুণ মাজি দেখা করে গেছিল রাসবিহারীতে এসে। বলল, জগাই অ্যারেস্ট হওয়ায়, তিলজলা অঞ্চলে ভদ্রলোকেরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ওঁরা বস্তিতে শান্তি মিছিলও করে গেছেন। খবরগুলো দেওয়ার পর তরুণ বলেছিল, 'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম গোরাদা, লিডারশিপটা আপনি হাতে নিন। আমার কথায় তখন আপনি পাত্তা দেননি।'

ব্যায়াম শেষ করে গোরা বাথরুমে ঢোকার কথা ভাবছিল। এমন সময় মুকুন্দ এসে বলল, 'চন্দন বলে একজন রিপোর্টার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কী বলব?'

চন্দন মানে আমাদের চ্যানেল-এর সেই রিপোর্টার। ওদের চ্যানেলে সেদিন অনেকটা কভারেজ দিয়েছিল। গোরা হয়তো দেখবার সুযোগ পেত না। কিন্তু রাতের দিকে ছেলেটা ফোন করে জানিয়ে দেয়, ওদের চ্যানেলে মিনিট দশেক পর অবরোধের খবরটা আলাদা করে দেখানো হবে। কেমন হল, প্লিজ ফোন করে জানাবেন। ফোন করার কথা গোরা ভুলে মেরে দিয়েছিল। ছেলেটার কাছে অ্যাপোলজি চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু ওর পরনে এখন পাজামা আর ফতুয়া। এই ড্রেসে বাইরের লোকেদের সঙ্গে দেখা করা উচিত না। মুকুন্দকে তাই ও বলল, 'ছেলেটাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে চা-ফা খাওয়া। আমি ড্রেসটা বদলে এখুনি ওদের কাছে যাচ্ছি।'

মিনিট পাঁচেক পর ড্রয়িং রুমে গিয়ে গোরা দেখল, চন্দন একা আসেনি। সঙ্গে ওরই বয়সি একটা মেয়েকেও নিয়ে এসেছে। ওকে দেখেই সোফা ছেড়ে দু'জনে উঠে দাঁড়াল। গোরা কিছু বলার আগে চন্দন বলল, 'কেমন আছেন গোরাদা? আমি কিন্তু আপনার ওপর একটু রেগে রয়েছি।'

গোরা বলল, 'রেগে থাকলে নিশ্চয়ই আমার বাড়িতে ছুটে আসতে না। যতদূর জানি, রিপোর্টাররা স্বার্থ ছাড়া একচুলও নড়ে না। ডেফিনিটলি কোনও কাজে এসেছ। যাক সে কথা, প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অবরোধের খবরটা খুব ভাল হয়েছিল। তোমায় জানানো হয়নি।'

চন্দন বলল, 'বড় নেতা হওয়ার জন্য যত গুণ দরকার, সবগুলোই আপনার মধ্যে আছে।'

'নিন্দে করছ, না প্রশংসা?'

জিভ কেটে, কানে আঙুল দিয়ে চন্দন বলল, 'আপনার নিন্দে করব, এমন দুর্মতি যেন আমার কোনওদিন না হয় গোরাদা। সেদিন চিফ মিনিস্টারকে আপনি যেভাবে ফেস করলেন, হ্যাটস অফ। ছয়-সাত বছর ধরে রিপোর্টারি করছি, কাউকে কোনওদিন ওই রকম ডিসেন্টলি, ওই রকম বোল্ডলি, ওই রকম ট্যাক্টফুলি, ওই রকম...কী বলব...।'

গোরার হাসি পাচ্ছিল। ও চন্দনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক থাক আর বাড়িও না।

ওই রকম পাবলিসিটি পাওয়ার পর থেকে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ফোনের পর ফোন। কেউ কেউ আবার ধমকেওছে। আমাকে দেখে নেবে। না ভাই, আর কিছু বলব না। হয়তো এখুনি ফিরে গিয়ে ব্রেকিং নিউজ দেখাতে শুরু করবে তুমি, দলিত নেতাকে খুনের হুমকি।'

শুনে সঙ্গী মেয়েটা হাসতে শুরু করল। দেখে চন্দনের যেন হুঁশ হল, 'আরে, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিইনি, তাই না। এ হচ্ছে মন্দিরা বিশ্বাস। আমার গার্লফ্রেন্ড। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল স্টাডিজ-এর স্টুডেন্ট। সেদিন অবরোধের খবরটার সময় আপনাকে দেখে ফিদা হয়ে গেছে। পরদিন থেকে রোজই আমাকে তাগাদা দিচ্ছে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আজ সকালে চেতলায় মিঠুন চক্রবর্তীর একটা প্রোগ্রাম ছিল। তাই ওকে বললাম, রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকিস। তোকে গোরাদার বাড়িতে নিয়ে যাব। ওর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার কাছে।'

মন্দিরা হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'আমি মতুয়া সম্প্রদায়ের মেয়ে। আমার বাড়ি মছলন্দপুরে। এখানে হস্টেলে থাকি। আমার বাবাও দলিত মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। সুধীরঞ্জন বিশ্বাস। হয়তো নাম শুনে থাকবেন।'

অদ্বৈতবাবুর মুখে নামটা শুনেছে গোরা। এই প্রথম মেয়েটার মুখের দিকে ও তাকাল। ভারি মিষ্টি দেখতে। মেয়েটার পরিচয় দেওয়ার ভঙ্গিও ওর ভাল লাগল। ও বলল, 'জানি। দলিত দুনিয়া বলে যিনি একটা লিটল ম্যাগাজিন চালান....তাঁর কথাই বলছ তো?'

'হ্যাঁ, উনিই। গত শনিবার বাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আপনাকে নিয়ে। বাবা বললেন, অদ্বৈতবাবু নাকি প্রমিস করেছেন, আপনাকে নিয়ে একবার ঠাকুরনগরে যাবেন। আপনি কি বড়মা-র কথা শুনেছেন?'

মতুয়ারা হলেন মূলত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। পূর্ব বাংলা থেকে আসা। বনগাঁর কাছে ঠাকুরনগরে তাঁদের বিরাট সংগঠন। এখন সেই সংগঠনের কর্ত্রী হলেন বড় মা। গোরা বলল, 'কেন শুনব না? ইন ফ্যাক্ট, আমারও খুব যাওয়ার ইচ্ছে ঠাকুরনগরে।'

মুকুন্দ একটা ট্রে-তে চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিয়ে চন্দন বলল, 'মন্দিরা একটা আর্জি নিয়ে এসেছে। কী রে তুই বল। চুপ করে আছিস কেন?'

গোরা কৌতূহল দেখিয়ে বলল, 'এত সংকোচ করছ কেন মন্দিরা? যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, তা হলে অনায়াসে বলতে পারো।'

মন্দিরা বলল, 'আমি দলিত পার্টির হয়ে কাজ করতে চাই। আমাকে কী করতে হবে, সেটা জানার জন্যই আপনার কাছে এসেছি।'

মনে মনে খুশি হলেও গোরা সেটা প্রকাশ হতে দিল না। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি পেতে আর কতদিন বাকি আছে?'

'পরীক্ষা দিয়েছি। আর দু'এক মাস পর রেজাল্ট বেরবে।'

'তা হলে তুমি একটা কাজ করো। অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। উনি তোমার ইন্টারভিউ নেবেন। যদি সন্তুষ্ট হন, তা হলে একটা ফরম্ দেবেন। সেটা ফিল আপ করলেই

তুমি মেম্বার হয়ে যাবে। দলিত পার্টির অফিস কসবার বোসপুকুরে। জিজ্ঞেস করলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। তুমি বেলা দশটার পর ওখানে যেও। অদ্বৈতবাবুকে পেয়ে যাবে।'

"আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

'সেটা পার্টি ডিসাইড করবে। তোমার এই ইচ্ছেটা দয়া করে কারও কাছে, এক্সপ্রেস কোরো না মন্দিরা। আমাদের পার্টি কিন্তু অন্য পার্টির মতো নয়। ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা আছে।' কথাগুলো বলেই দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, প্রায় দশটা বাজে। সকালে মুকুন্দ মনে করিয়ে দিয়েছে, এগারোটার সময় বোসপুকুরে যেতে হবে। অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে কী একটা আর্জেন্ট মিটিং আছে।

চন্দন চালাক ছেলে। ঘড়ির দিকে তাকাতেই, যা বোঝার ও বুঝেছে। ইশারায় মন্দিরাকে উঠতে বলে, ও বলল, 'গোরাদা, আপনাকে একটা কথা বলছি। চিফ সেক্রেটারি কিন্তু আপনার ওপর খুব খচে গেছেন। উনি খুব ভিন্ডিক্টিভ টাইপের। আপনাকে কোনও না কোনও একটা ঝামেলায় জড়িয়ে দেবেন। আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন। আজ চলি। কোনও খবর থাকলে, দেবেন।'

চন্দন আর মন্দিরা বেরিয়ে যাওয়ার পর গোরা স্নান করতে ঢুকল। মন্দিরার মিষ্টি মুখটা অনেকক্ষণ ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। মেয়েটার মধ্যে কিছু একটা আছে। চন্দন বলল, মেয়েটা ওর গার্ল ফ্রেন্ড। ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে গোরা। কিন্তু সে সম্পর্কটা কি বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে? চন্দনের পদবিটা কী, তা মনে করার চেষ্টা করল ও। সে দিন পরিচয় দেওয়ার সময় বলেছিল বটে! অনেক কষ্টে গোরা মনে করতে পারল। গাঙ্গুলি, তার মানে ব্রাহ্মণ। দলিত সম্প্রদায়ের মেয়ে মন্দিরাকে যদি চন্দন বিয়ে করে, তা হলে কি ওর পরিবার মেনে নেবে? কলকাতায় অবশ্য জাতপাত নিয়ে কেউ অতটা মাথা ঘামায় না। বামপন্থীরা তো নয়ই। কিন্তু ভুবনেশ্বরে বা জাজপুরে ব্রাহ্মণ-দলিত বিয়ে ভাবাই যায় না।

স্নান করার সময় চন্দনের কথা গোরা যত ভাবতে লাগল, ততই ছেলেটাকে ওর ভাল লাগতে লাগল। সমাজে এই সব ছেলের সংখ্যা আরও বাড়ুক। ঝুটা ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিক। একটা সময় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রুটি-বেটির সম্পর্ক ছিল না ব্রাহ্মণদের। তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের গৃহে রুটি স্পর্শ করতেন না। বেটি অর্থাৎ কন্যাদান করতেন না। এই সেদিন ভি টি রাজশেখরের লেখা একটা বইতে গোরা পড়ছিল, কাস্ট স্ট্রাগ্ল অর্থাৎ জাতপাতের লড়াই ভারতকে শেষ করে দিল। বামপন্থীরা শুধু ক্লাস স্ট্রাগ্ল অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে। মনে করে, শ্রেণি সংগ্রামে জিতলেই জাত পাতের লড়াই বলে আর কিছু থাকবে না। কিন্তু ধারণাটা ভুল। দু'টো লড়াই একসঙ্গে চালাতে হবে। না হলে নৈরাজ্যের অন্ধকারেই ডুবে থাকতে হবে।

পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব একটা পাঁচিল ভেঙে দিয়েছিলেন। রুটি-বেটির রুটির পাঁচিল। শূদ্র-অশূদ্র সবাই মিলে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন করো। তারপর একসঙ্গে

পঙ্ক্তি ভোজন। বিচি কলার তরকারি, ডাল-ভাত অথবা খিঁচুড়ি খাও। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা অবশ্যই এ সব পছন্দ করেননি। নানাভাবে বিরোধিতা করে গেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বলেই গোরা জানে, একটা সময় চৈতন্যদেবের এই দর্শন সামাজিক বুনিয়াদকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। রিনি মণ্ডল বা মন্দিরা বিশ্বাসের জন্য দুঃখবোধ করল গোরা। দলিত পরিবারে স্রেফ জন্ম নেওয়ার কারণেই এই মেয়েগুলোকে কত সামাজিক অন্যায়ের সামনে পড়তে হবে। এদের ব্যক্তিগত প্রতিভা তেমনভাবে স্বীকৃতি পাবে না।

গোরা স্নান সেরে বেরতেই মুকুন্দ বলল, 'অদ্বৈতবাবু এখুনি আপনাকে বোসপুকুরে যেতে বলেছেন। কী যেন একটা প্রবলেম হয়েছে।'

কী আবার প্রবলেম হল? গোরা একবার ভাবল, ফোন করে তা জেনে নেয়। কিন্তু সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়াই ভাল। লাঞ্চ সেরে ও যখন দলিত পার্টির অফিসে পৌঁছল, তখন এগারোটা ছুঁইছুঁই। কোনও লোকজন নেই দেখে গোরা একটু অবাকই হল। এই সময়টার পার্টি অফিস গমগম করে। নানা জেলা থেকে লোকজন আসে। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়াতে পারা যায় না। তাড়াতাড়ি অদ্বৈতবাবুর অ্যান্টি চেম্বারে ঢুকে ও দেখল, দু'জন প্রবীণ মানুষের সঙ্গে বসে অদ্বৈতবাবু শলাপরামর্শ করছেন। ওঁদের একজনকে গোরা চেনে। হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। ওকে দেখেই অদ্বৈতবাবু বললেন, 'এসে গেছ? তোমার জন্যই ওয়েট করছিলাম। আগে বলো, তোমার কাছে কি কসবা থানার পুলিশ গেছিল?'

গোরা বলল, 'কই না তো। পুলিশ কেন?'

'তোমার নামে ওদের কাছে একটা অভিযোগ গেছে। এ বছর এপ্রিলে ড. অম্বেদকরের জন্মদিনে পার্টির তরফে যে সুভ্যেনিরটা আমরা বের করেছিলাম, তাতে রাজ্যপালের একটা মেসেজ ছিল। পুলিশ বলছে, ওই মেসেজ না কি রাজ্যপাল পাঠাননি। ওটা পুরোপুরি ফেক। রাজ্যপালের লেটারহেড, সই সব জাল। আমাদের সুভ্যেনিরটা কেউ বোধহয় রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছে। সেটা দেখে উনি রাগারাগি করেছেন। চিফ সেক্রেটারির কাছে সুভ্যেনির পাঠিয়ে উনি বলেছেন, তদন্ত করতে।'

একটু আগে চন্দনের মুখে গোরা শুনেছে, চিফ সেক্রেটারি নপরাজিত চক্রবর্তী ওকে ঝামেলায় ফেলতে পারেন। তার পরই এই অভিযোগ! উচ্চবর্ণের মানুষদের পুরনো খেলা। গোরা বলল, 'কিন্তু সুভ্যেনিরের দায়িত্বে তো আমি ছিলাম না অদ্বৈতবাবু। সুভ্যেনির বের করেছে তো ভৈরব।'

'তুমি হয়তো অ্যাকটিভলি ছিলে না। কিন্তু সুভ্যেনির কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তোমার নামটা ছিল। সে জন্য পুলিশ তোমাকেই ফ্রেম করতে চাইছে। ভৈরবের কাছে ওরা গেছিল। ও বলেছে, সুভ্যেনিরের মেসেজ, আর্টিকেল সবই না কি তুমি সংগ্রহ করে, ওকে দিয়েছিলে।'

'কিন্তু এ তো মিথ্যে। আপনিও সেটা জানেন।'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই তা জানি। আর জানি বলেই অবাক হচ্ছি, সবাইকে ছেড়ে পুলিশ

তোমাকে নিয়ে পড়ল কেন? ভৈরব সম্পর্কে পুলিশকে যা বলার আমি বলে দিয়েছি। তোমাকে ডেকে আনার একটাই কারণ। এই মাত্র ব্যারিস্টার মণ্ডল পরামর্শ দিলেন, তোমাকে আগাম জামিন নিতে হবে।'

'আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। তা হলে কেন আমাকে অ্যান্টিসিপেটারি বেল্ নিতে হবে?'

ব্যারিস্টার মণ্ডল এ বার মুখ খুললেন, 'গোরা ভাই। এটা জালিয়াতির মামলা। ট্রাই টু আন্ডারস্টান্ড। এই কমপ্লেনটা করছেন কে? হেড অব দ্য স্টেট। পুলিশ বলবে, রাজ্যপালের নাম ভাঙিয়ে সুভ্যেনির থেকে প্রচুর টাকা তোলা হয়েছে। কেন যেচে বদনাম নেবেন? অবরোধের পর মিডিয়ার লোকজন আপনাকে চিনে রেখেছে। এ রকম একটা কেস পুলিশ ওপেন করলে, ওরা লুফে নেবে। সেটা আমাদের পার্টির পক্ষে খারাপ হবে। ইউ আর নাউ দ্য ফেস অব দ্য পার্টি। কী বলছি, সেটা বুঝুন।'

.....ঠিকই তো। ব্যারিস্টার মণ্ডলের কথা শুনে বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল গোরার।

একুশ

চোখ কচলে ফের মেয়েটার দিকে তাকাল পুরন্দর। চেনা.....খুব চেনা। ছিটকিনি খুলে জানলাটা অল্প ফাঁক করতেই ও স্পষ্ট দেখতে পেল। হ্যাঁ, মঞ্চের ওপর যে গাইছে, তাকে ও ভালমতো চেনে। কাঁকুড়গাছির সেই যজমানের মেয়ে। নামটা পুরন্দরের মনে পড়ছে না। কিন্তু এই মেয়েটাই সেদিন রাস্তায় হাত ধরে টেনেছিল, ওদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জানলা খুলে দেওয়ায় মেয়েটার গান শুনতে পাচ্ছে পুরন্দর। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার গান। মঞ্চের সামনের দিকে, কিছু অল্পবয়সি ছেলে মেয়ে নাচানাচি করছে, সেই গান শুনে। এত রাতে মেয়েটা এখানে? গান গেয়ে রোজগার করে, না কি ওর কোনও আত্মীয় স্বজনের বিয়ে? সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুরন্দর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কিট ব্যাগের ভেতর ওর বাইনোকুলারটা রয়েছে। সেটা বের করে, মঞ্চের দিকে তাকাল পুরন্দর। এ বার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটার পোশাকই বলে দিল, গাইতে এসেছে। মুখে চড়া মেক আপ। ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃতই। দু'কাঁধ বেয়ে নেমে আসা দুটো সরু স্ট্র্যাপওয়ালা, চুমকি দেওয়া টপ পরেছে। স্তন দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কাঁধ, বাহুসন্ধি দেখা যাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে মেয়েটা নাচছে, নাচাচ্ছে। আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে কেউ এ ভাবে মঞ্চে উঠে গায় না। বাইনোকুলার দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে পুরন্দর অনুভব করল, ওর লিঙ্গ দৃঢ় হয়ে উঠেছে। স্নান সেরে আসার পর, ও তখনও নিজের পোশাক পরেনি। বাইনোকুলারটা টেবলের ওপর রেখে, পুরন্দর কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিল।

না, মেয়েটার দিকে ও আর তাকাবে না। জানলা বন্ধ করে পুরন্দর বিছানায় গিয়ে বসল। কিন্তু মেয়েটার যৌন আবেদন ও মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। হঠাৎই ও অনুভব করল, মঞ্চে নৃত্যরতা তরুণী ওকে চুম্বকের মতো টানছে। পুরন্দরের খুব ইচ্ছে হল, বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। ওকে এই হোটেলে দেখলে মেয়েটা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। হয়তো সেদিনকার মতো বাড়িতেও নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব না। আর দু'আড়াই ঘণ্টার মধ্যে হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন আসার কথা। ওকে জেগে থাকতে হবে। দুর্নিবার আকর্ষণে ফের বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে, পুরন্দর জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দেখল, মেয়েটা মঞ্চে নেই। গান গেয়ে নেমে গেছে। ঘোষক বলছেন, 'এতক্ষণ গান শোনালেন, অম্বালিকা ভট্টাচার্য। আপনাদের সামনে এখন আসছেন শ্রুতি ঘোষাল।'

নাম শুনে হাত থেকে বাইনোকুলারটা কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। অম্বালিকা.....মেয়েটার নাম অম্বালিকা! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না পুরন্দর। অম্বালিকা নামটা ওর যৌন ইচ্ছা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। চোখের সামনে পাক দিয়ে উঠল, পুরীর পরিত্যক্ত মন্দিরে মাহেলিদের বাসস্থান। চাতাল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওর স্বপ্নের রানি অম্বালিকা। যাকে দেখেই চোখ সার্থক করতে হয়। যাকে স্পর্শ করাও পাপ। আকাশে কাত্যায়ণীদের কথা পুরন্দর ভুলে গেল। সেইসঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও। সহবাস নিয়ে পূজ্যপাদদের সাবধানবাণীও ওর আর মনে রইল না। ওর মাথায় ঘুরছে শুধুই অম্বালিকা। কাঁকুড়গাছির ওই মেয়েটাকে এখন ওর চাই। দ্রুত পোশাক পরার ফাঁকে নিজের মনকে পুরন্দর প্রবোধ দিল এই বলে, ধ্বংসের দিন তো এসেই গেছে। সেটা কেউ জানুক বা না জানুক, ও জেনে গেছে। তা হলে রোগ-শোক, পাপ-পুণ্যের হিসাব করে কী লাভ? বরং মনের ইচ্ছেটা পূরণ করে নেওয়া যাক।

হোটেলের রিসেপশনে ফোন করে পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ের পার্টিতে একটু আগে যে মেয়েটা গান গাইছিল, সে কি চলে গেছে?'

রিসেপশনিস্ট বলল, 'আমি খোঁজ নিচ্ছি স্যার।'

'মেয়েটা আমার খুব পরিচিত। ওকে বলবেন, পুরী থেকে পদ্মনাভ মহারাজের শিষ্য এসেছেন। তিনিই দেখা করতে চান।'

'আপনার নাম তো রামচন্দ্র দইতাপতি, তাই না সার?'

'হ্যাঁ। তবে আমার নাম শুনলে হয়তো মেয়েটা নাও চিনতে পারে। বলবেন, আমি পদ্মনাভ মহারাজের লোক। তা হলেই ও বুঝতে পারবে। ওরা আমাদের যজমান।'

'ঠিক আছে স্যার। একটু আগে, এখানেই দাঁড়িয়ে মিস অম্বালিকা কথা বলছিলেন....আমাদের হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় যদি ওকে পাওয়া না-যায়, তা হলে বুঝতে হবে, উনি বেরিয়ে গেছেন।'

'ওকে আপনি চেনেন।'

'কেন চিনব না? উনি তো আমাদের হোটেলেরই সিঙ্গার। আমাদের এখানে প্রায়

প্রতিদিনই কোনও না কোনও পার্টি থাকে। ফলে ওঁর প্রোগ্রামও থাকে। উনি খুব ভাল গান, স্যার। খুব নাম হয়ে গেছে। যদি কিছু মনে না করেন, তা'লে একটা কথা বলব সার।'

'মনে করব কেন, বলুন।'

'মিস অম্বালিকাকে যদি পাই, তা হলে কি আপনার রুমে পাঠিয়ে দেব? না কি ফোনে ধরিয়ে দেব।'

প্রশ্নটা শুনে বুক চলকে উঠল পুরন্দরের। কিন্তু ও পাশ কাটানো উত্তর দিল, 'ও যদি আসতে চায়, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে স্যার। আমি দেখছি।'

মিনিট তিন চারেক পর দরজায় নক করার শব্দ শুনে পুরন্দর নিজেকে আয়নায় একবার দেখে নিল। ভাগ্যিস, স্নানটা সেরে নিয়েছিল। নিজেকে তাই ভদ্রস্থ লাগছে। দরজা খোলার আগে ও ঠিক করে নিল, খুব বেশি সময় অম্বালিকাকে আটকে রাখবে না। একেই রাত হয়ে গেছে। ওর হয়তো বাড়ি ফেরার তাড়া থাকবে। নিজের রিপুটাকে শান্ত করার পরই অম্বালিকাকে ও ছেড়ে দেবে। না, না, মেয়েটাকে বুঝতে দিলে চলবে না, কেন ও ডেকে এনেছে। উত্তেজনা প্রশমন করে দরজা খুলল পুরন্দর। দেখল, সারা শরীরে যৌনসম্ভার নিয়ে অম্বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। পোশাক বদলে নিয়েছে। পরনে ঢিলে টপ আর ঘাঘরা। ওকে দেখেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, 'ও মা, আপনি? এই হোটেলে? কবে এলেন?'

অম্বালিকার পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্ট। কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য বলে উঠল, 'মিস অম্বালিকা গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন স্যার। আমি দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনলাম।'

অযাচিত উৎপাত বলে মনে হল পুরন্দরের। লোকটাকে কেউ আসতে বলেনি? তবুও বিরক্তি প্রকাশ না করে, মুখে হাসি ফুটিয়ে ও বলল, 'ধন্যবাদ।'

'আর কিছু দরকার লাগলে বলবেন সার। আমি ডিউটিতে আছি।'

আর কিছু মানে? পুরন্দর ঠিক বুঝতে পারল না। ছেলেটাকে উপেক্ষা করেই অম্বালিকাকে ও বলল, 'এসো ভেতরে এসো। তুমি যে এত ভাল গান গাও, আগে তো কখনও বলোনি?' বলতে বলতে অম্বালিকার ঠোঁটের দিকে তাকাল পুরন্দর। কমলা কোয়ার মতো ঠোঁটে যত্ন করে লাগানো ভিজে লিপস্টিক। মনে মনে ওই ঠোঁট দু'টোকে চুষে নিল পুরন্দর।

অম্বালিকা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল পুরন্দর। না, মেয়েটার চোখ মুখে ভয় পাওয়ার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না ও। এত রাতে একজন পরপুরুষের সঙ্গে বদ্ধ ঘরে ঢুকে পড়ল। তবুও কোনও জড়তা নেই ওর আচরণে। কলকাতার মেয়েরা অনেক স্মার্ট হয়। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা সোফায় রেখে অম্বালিকা আদুরে গলায় বলল, দাঁড়ান, আগে আপনার পায়ের ধুলো নিই। আপনাদের মতো লোকেদের কাছে আসাটাই পুণ্যের।'

হাঁটু ভাঁজ করে বসে, গড় হয়ে প্রণাম করল অম্বালিকা। পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়ার ভঙ্গি করে, উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রায় নিঃশ্বাসের দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, 'কই, আমাকে আশীর্বাদ করলেন না।'

মেয়েটার সুডৌল স্তন দু'টো ওর প্রায় বুকের কাছে। ইচ্ছে করলে পুরন্দর তার মাঝে মুখ ডুবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করল ও। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদটা ও সেরে ফেলতে পারত। কিন্তু ওকে স্পর্শ করার লোভ সামলাতে না পেরে, দু'হাতে মুখ টেনে এনে, কপালে চুমু খেয়ে পুরন্দর বলল, 'মনস্কামনা পূরণ হোক।'

অম্বালিকা বলল, 'সেদিন রাস্তায় অত করে বললাম, আমাদের বাড়িতে চলুন। তবুও আপনি গেলেন না। মা শুনে খুব আফসোস করতে লাগল। পদ্মনাভ মহারাজ কিন্তু আপনার মতোন না। উনি এলে প্রতিবার......দু'তিনটে দিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে যান। পুরীর মন্দিরের কত গল্প করেন। মাও কত সেবাযত্ন করার সুযোগ পায়।'

পুরন্দর বলল, ওঁরা পূজ্যপাদ, বড়ো পাণ্ডা। ওঁরা ইচ্ছেমতো যজমানদের ঘরে থাকতে পারেন। সবই প্রভু জগন্নাথের কৃপা। এই দেখো, প্রভু চান বলেই তো ফের তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' কথাগুলো বলেই পুরন্দর অবাক হয়ে গেল। বাঃ, দিব্যি গুছিয়ে বলতে পারছে তো। তবে কেন ও গুটিয়ে যায় পূজ্যপাদ বা মাহেলিদের সঙ্গে কথা বলার সময়?

গ্রীবা ঘুরিয়ে অম্বালিকা বলল, 'ইস, আজ এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। অথচ সেদিন রাস্তায় এমন ব্যবহার করলেন, যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচেন। খুব কষ্ট হয়েছিল, জানেন? যাক সে কথা। আজ চলুন, আজ তো আপনার কোনও কাজ নেই। দু'তিনটে দিন আমাদের বাড়িতে রেস্ট নেবেন। আমি আপনার সেবা করব। প্লিজ, না করবেন না।'

এলো চুলে খোপা করছে অম্বালিকা। হাত দু'টো মাথার ওপরে। টপ-এর একটা অংশ উঠে যাওয়ায়...ওর কোমরের খাঁজটা দেখা যাচ্ছে। মাখনের মতো কোমল সেই অংশটা। ওখানে চুমু খাওয়ার ইচ্ছে অতি কষ্টে দমন করল পুরন্দর। মেয়েটা মন্দ বলেনি। পুলিশ যে রকম পিছনে লেগেছে, তাতে হোটেলে থাকা খুব রিস্কি হয়ে গেছে। যজমানের বাড়িতে শেল্টার নেওয়াটা অনেক বেশি নিরাপদ। রাত তিনটের সময় ফোন এলে কায়দা করে প্রসঙ্গটা তোলা যেতে পারে। সোফায় বসে পুরন্দর ঠাট্টা করে বলল, 'সেবা করার ইচ্ছে থাকলে তো, এখানেই করতে পারো। বাড়িতে যাওয়ার দরকারটা কী?'

কথাটা সত্যি বলে ধরে নিল অম্বালিকা। উৎসাহে ধপ করে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল, 'ও মা, তাই! দিন তো, আপনার পা দুটো দিন। আগে পদসেবা করি। জানেন, মা পদসেবা না-করলে.....পদ্মনাভ মহারাজের ঘুমই আসে না। স্নান সেরে, শুদ্ধ হয়ে রোজ রাতে মা ওঁর ঘরে পদসেবা করতে ঢোকে। বলে, এতে নাকি পুণ্যি হয়। আপনি উঠুন তো। বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ুন। পদসেবা করে আমি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

কথাগুলো বলেই হাত ধরে টানতে লাগল অম্বালিকা। মেয়েটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু নেই? নিজেই নিজের সর্বনাশ করার জন্য কেন ওকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে? এরপর পুরন্দর তো নিজেকে আর সামলাতে পারবে না। মেয়েটা নাছোড়বান্দা দেখে, অগত্যা বিছানায় উঠে, আধশোয়া অবস্থায় পা দু'টো টানটান করে দিল পুরন্দর। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও বিছানায় উঠে বসেছে। পায়ের পাতায় ওর কোমল হাত দু'টো বুলিয়ে দিচ্ছে। সারা শরীর কেঁপে উঠল পুরন্দরের। সংযমের বাঁধ আর কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে, ও বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর মন বলল, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। মেয়েটা নিজে থেকেই ধরা দিয়েছে। তাই চোখ বুজে, সুখানুভূতিটা ও নিতে শুরু করল।

কথা বলতে বলতে পুরন্দরের ডান পা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়েছে অম্বালিকা। পদসেবা করছে। ওর দু'টো হাত পুরন্দরের উরুর কাছাকাছি পৌঁছে, ফের পায়ের পাতার দিকে নেমে যাচ্ছে। চোখ খুলে একবার অম্বালিকার দিকে তাকাল পুরন্দর। একজন পরপুরুষের কোন অঙ্গে হাত দিচ্ছে, মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না? না কি নরনারীর যৌনসম্পর্ক সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই? বা আগে কোনও অভিজ্ঞতাও হয়নি। মেয়েটাকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে, পদসেবা করে আনন্দ পাচ্ছে। বোধহয় পূজ্যপাদ পদ্মনাভর সঙ্গে ওকে একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলে দিয়েছে। ও জানবে কী করে, পুরীর মন্দিরের পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে পুরন্দরের কোনও যোগাযোগই নেই? প্রশ্নগুলো মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে, মেয়েটা ওর বাঁ পা-টাও কোলে তুলে নিল। তখনই ডান পা মেয়েটার জঙ্ঘার খাঁজে আটকে গেল। ঘাঘরার নীচে নরম অঙ্গের স্পর্শ পেতেই পুরন্দরের সারা শরীরে তীব্র শিহরণ। একটা হিংস্র প্রাণী শরীরে দাপাদাপি শুরু করেছে। এই সময় মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল পুরন্দর। ভাগ্যিস, অন্তর্বাস পরেছিল! না পড়লে, মেয়েটার কাছে ধরা পড়ে যেত।

অম্বালিকার মধ্যে কোনও বিকার নেই। পা টিপতে টিপতে বলল, 'পুরীর মন্দিরের মাহাত্ম্য বলুন না মহারাজ। শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।'

কথা বললে, মনটা অন্যদিকে সরানো যাবে। পুরন্দর উৎসাহ নিয়ে বলল, 'মন্দিরে গেছ কখনও?'

'হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে একবারই। তখন খুব ছোট ছিলাম। আবছা আবছা মনে আছে। অ্যাদ্দিন কেন যাওয়া হয়নি, জানেন? স্কুল-কলেজের জন্য। মা অবশ্য প্রতিবার পুরী যায়। রথযাত্রার সময়।'

'তোমার মা....কার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যান? বাবার সঙ্গে?'

'আগে বাবার সঙ্গে যেত। বাবা পাঁচ-ছ'বছর আগে আমাদের ছেড়ে মুম্বইয়ে চলে গেছে। মা এখন একাই পুরীতে যায়। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? একটা সত্যি কথা বলবেন?'

পুরন্দর বলল, 'কী কথা বলো।'

'পুরীর মন্দিরের ভেতর গরুড় স্তম্ভ বলে কি কোনও জায়গা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। নাটমন্দিরের ভেতরে। কেন বলো তো?'

'সেখানে দাঁড়িয়ে না কি শ্রীচৈতন্যদেব রোজ দর্শন করতেন জগন্নাথদেবকে?'

প্রশ্নটা পছন্দ হল না পুরন্দরের। মেয়েটা হঠাৎ ওই লোকটা সম্পর্কে প্রশ্ন করছে কেন? শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে কোনও কথা বলতে ও আগ্রহী নয়। একটু সতর্ক হয়ে ও বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তোমার এ বিষয়ে এত কৌতূহল কেন?'

'গরুড় স্তম্ভটা দেখার খুব ইচ্ছে আমার। স্তম্ভের বাঁ পাশে, একটা দেওয়ালে না কি শ্রীচৈতন্যদেবের আঙুলের ছাপ আছে? সেই ছাপ ছুঁলে শুনেছি, পুণ্য হয়? মা বলছিল, গরুড় স্তম্ভের কাছেই না কি শ্রীচৈতন্যদেবকে মেরে ফেলা হয়। মন্দিরের পাণ্ডারাই না কি ওকে মেরেছিলেন? কথাটা কি সত্যি?'

অম্বালিকার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল পুরন্দর। মেয়েটা জানে, কাকে কী প্রশ্ন করছে? মেয়েটার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করল ওর। হিমশীতল কণ্ঠে ও উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

শুনে অম্বালিকা হাসতে শুরু করল। তারপর বলল, 'পদ্মনাভ মহারাজ কিন্তু মাকে বলেছিলেন, সত্যি না। যাক, তবুও আপনি স্বীকার করলেন।'

শুনে পুরন্দর আর স্থির থাকতে পারল না। সহবাস করার ইচ্ছেটা উবে গিয়ে, এই প্রথম মেয়েটাকে ধর্ষণ করার কথা ও ভাবল। প্রথমে হাত দু'টো ধরে ও থামাল। তারপর এক হ্যাঁচকায় অম্বালিকাকে বুকের ওপর টেনে এনে বলল, 'থাক, আর পদসেবা করতে হবে না। এ বার লিঙ্গসেবা করো।'

কোনও প্রতিরোধ নেই। কোনও অনিচ্ছা প্রকাশের ইঙ্গিত। অম্বালিকা ওর শরীরটা বুকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ওর নরম স্তন দু'টো বুকের সঙ্গে মিশে আছে। ওর মুখটা দু'হাতে তুলে ধরে চুমু খেতে শুরু করল পুরন্দর। মায়াপুরের গেস্ট হাউসে এক বিদেশিনীকে ঠোঁট চুষতে দেখেছিল ও। সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, অম্বালিকার ঠোঁট দু'টো ও চুষতে লাগল। চোখ বুজে মেয়েটা এ বার ওর শরীরের ওপর উঠে এসেছে। এর গলাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে। উঠে বসে দ্রুত ধুতিটা খুলে ফেলল পুরন্দর। ওর নগ্ন দেহটা দেখে, অম্বালিকার কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা লক্ষ্য করার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মেয়েটা টপ খুলে সোফায় ছুঁড়ে দিয়েছে। ঘাঘরার ক্লিপ আলগা করে, পায়ের নীচে নামিয়েছে। তারপর বিস্ফারিত চোখে একবার ওর নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে, নিজেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

....মিনিট কুড়ি পর অম্বালিকার পাশে শুয়ে থাকার সময় বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে পেল পুরন্দর। এই গন্ধটার সঙ্গে ও খুব পরিচিত। দীর্ঘদিন সূর্যের আলো ঢোকেনি, পাতালের অভ্যন্তরে এমন একটা জায়গায়, ইতর প্রাণীর আস্তানায় মল-মূত্র, তাদের পচে যাওয়া শবের মিলিত গন্ধ। ক্রমেই ওর দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। গন্ধটা ক্রমেই বাড়ছে? ধড়মড় করে পুরন্দর উঠে বসল। ও কি পুরীর সেই পাতাল আশ্রমেই ফিরে গেছে? পাশ ফিরে ও দেখল, বিছানায় অম্বালিকা ভাবলেশহীন, নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে। সাদা

চাদরে সামান্য লাল দাগ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরন্দর আবিষ্কার করল, উৎকট গন্ধটা অম্বালিকার শরীর থেকেই উঠে আসছে। ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পূজ্যপাদ পদ্মনাভর সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। কোনও নারীর সঙ্গে সহবাস করলেই ওর ভয়ঙ্কর চর্মরোগ হবে।

লাফ মেরে পুরন্দর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে লাগল, চর্মরোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে কী না।

বাইশ

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে পৌঁছতেই কৌশিক বলল 'জয়দা এক ভদ্রলোক আপনার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছেন। আপনি কি এখন কথা বলতে পারবেন?

দোকানে কৌশিক ছাড়া আর কেউ নেই। জয়দেব অবাক হয়ে বলল, 'কার কথা বলছ তুমি?'

'ওই যে বসন্তর চায়ের দোকানে উনি বসে। আমাদের এখানে যা অবস্থা....'

উল্টো দিকেই বসন্তর চায়ের দোকান। সামনের দিকে তাকিয়ে জয়দেব দেখল, সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক, পায়ে সাদা কেডস। চুল কাশ ফুলের মতো সাদা। বয়স কম করেও সত্তর-পঁচাত্তর হবে। খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের বলে মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক ঋজু হয়ে বসে আছেন, বাহারি লাঠির ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে। কে ইনি? কোথাও দেখেছে বলে জয়দেব মনে করতে পারল না। কৌশিক গিয়ে ডেকে এনে, পরিচয় করিয়ে দিল।

দোকানে ঢুকে, চশমাটা খুলে ভদ্রলোক বললেন, 'মাফ করবেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি নবদ্বীপে থাকি। আমার নাম সুধীর মিশ্র।'

উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে জয়দেব বলল, 'প্লিজ। বসুন।'

'জানি, আপনারা খুব ব্যস্ত মানুষ। বেশি সময় নেব না।' বলতে বলতে চেয়ারে বসার আগে, একটা ছোট্ট আসন পেতে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে....দু'তিন দিন আগে ট্রেনে করে কলকাতায় আসার সময়, আপনার পত্রিকার লেটেস্ট ইস্যুটা কিনেছিলাম। শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কিত লেখাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। পরের সংখ্যায় কি এ সম্পর্কে আরও কিছু প্রকাশিত হবে? সেটা জানার জন্যই আপনার কাছে এলাম। আপনারা ফলো আপ করলে.....নেক্সট ইস্যুটা কিনব। লেখক সুশোভনবাবু তৃতীয় ছবিটা উদ্ধার করতে পারলেন কি না, সেটা জানার খুব কৌতূহল রইল।'

শুনে ভদ্রলোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জয়দেব। হঠাৎ তিওয়ারি বলে লোকটার কথা ওর মনে পড়ল। ওদের কোনও চাল নয়তো? হয়তো কথা বের করার জন্য বয়স্ক একটা লোককে পাঠিয়েছে। প্রশ্নটা শুনে সতর্ক হয়ে গেল ও। না, না, অচেনা লোকের কাছে চট করে ও মুখ খুলবে না। আগে বাজিয়ে নেওয়া দরকার, ভদ্রলোক কী উদ্দেশে

এসেছেন। তাই ও বলল, 'মহাপ্রভু সম্পর্কে আপনার খুব আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে?'

সুধীর মিশ্র বললেন, 'ওঁর ওপর আমি পিএইচডি করেছি। আমার সাবজেক্ট ছিল লর্ড চৈতন্য'জ ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য মাসেস। কৃষ্ণনগরের এক কলেজে আমি পড়াতাম। অবসর নেওয়ার আগে ওই কলেজের প্রিন্সিপালও হয়েছিলাম। লেখাপড়ার অভ্যাসটা এই বয়সেও ছাড়তে পারিনি। মহাপ্রভু সম্পর্কে কোথাও কিছু প্রকাশিত হলে, আমি সংগ্রহ করে রাখি। নবদ্বীপে আমরা কয়েকজন মিলে শ্রীচৈতন্য চর্চা কেন্দ্র খুলেছি। একটা লাইব্রেরিও করেছি। সেই কারণেই আরও আগ্রহ বলতে পারেন।'

শুনতে শুনতে জয়দেব অবাকই হচ্ছিল। ছিঃ ছিঃ, ড. সুধীর মিশ্রর লেখা তো ও পড়েছে। ওঁর বইটাও সম্ভবত ওর কাছে আছে। আসলে ভদ্রলোক নিজের নামের আগে আচার্য কথাটা জুড়ে দেওয়ায় জয়দেব বুঝতে পারেনি। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মাফ করবেন, আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। আমার সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। কলকাতায় কোথায় উঠেছেন?'

সুধীরবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন 'এক আত্মীয়ের বাড়িতে। এই কাছেই, ঠনঠনে কালীবাড়ির পাশে। বিয়ে উপলক্ষে এসেছিলাম। কালই চলে যাব। তাই ভাবলাম, হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটে একবার ঘুরেই যাই। পড়তাম প্রেসিডেন্সিতে। একটা সময় এ অঞ্চলটায় দাঁপিয়ে বেরাতাম।'

'ভাল করেছেন।' মনে মনে জয়দেব আফসোস করতে লাগল। দিনকাল-এর লেটেস্ট ইস্যু কেন বেশি করে নবদ্বীপে পাঠাল না? মহাপ্রভুর জন্মভূমি। নবদ্বীপ অঞ্চলে সুধীর মিশ্রের মতো মানুষ নিশ্চয়ই আরও অনেক আছেন। যাঁরা মহাপ্রভু সম্পর্কে পড়তে চান। ওঁদের সেন্টিমেন্টটা আগে বুঝতে পারলে, বেশ কিছু বাড়তি কপি ওখানকার এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। এখনও অবশ্য পাঠানো যেতে পারে। কৌশিককে বলে দিতে হবে।

'আপনার সহকর্মী ছেলেটি আমায় বলছিল, মহাপ্রভুকে নিয়ে আপনিও নাকি রিসার্চ করছেন? বিষয়টা কী, বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

জয়দেব বলল, 'আপত্তি থাকবে কেন? বিষয়টা হল, মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য।'

'তা হলে একবার নবদ্বীপে আসতে অনুরোধ করি। মনে হয়, আপনাকে আমরা সাহায্য করতে পারব। ওঁর মৃত্যু নিয়ে একেক জন একেক রকম লিখে গেছেন। বিষয়টাকে আপনি চারটে ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। প্রথমত, উনি কবে মারা যান। দ্বিতীয়ত, কোথায় মারা যান। তৃতীয়ত, কীভাবে মারা যান। চতুর্থত মারা যাওয়ার পর তাঁর নশ্বর দেহটার কী হয়েছিল। আমি কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন? না কি ভাবছেন, উপযাচক হয়ে কেন এ সব কথা বলছি?'

শুনে লজ্জাই পেল জয়দেব। বলল, 'কী যে বলেন। আসলে....ব্যবসা আর পত্রিকা চালাতে গিয়ে রিসার্চের জন্য আমি খুব বেশি সময় দিতে পারছি না। টুকটুক করে এগচ্ছে, বলতে পারেন।'

'আমিও সেইভাবেই এগিয়েছি। থিসিস জমা দিয়েছি, যখন আমার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে।'

'আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন ড. মিশ্র?'

'সত্যি কথা বলতে কী, পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে জীবনীকাররা খুব বেশি আলোকপাত করেননি। কবিকর্ণপুরা স্রেফ এককথায় সেরে দিয়েছেন, চৈতন্য বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, চৈতন্য অপ্রকট হন চোদ্দোশো পঞ্চান্ন শকাব্দে অর্থাৎ কি না, পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে। ভক্তরা মৃত্যু সম্পর্কে পরবর্তী একশো বছরে কিছুই জানতে পারেননি। ওড়িশায় তার পরে কিছু তালপাতার পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। যতদূর মনে পড়ছে, এ ব্যাপারে বিস্তৃত জানা যায়, বৈষ্ণব লীলামৃত নামে এক পুঁথিতে। লেখক মাধব পটনায়েক। মহাপ্রভুর মৃত্যুর দু'বছর পর না কি উনি লিখেছিলেন। তারপর অবশ্য আরও অনেক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সব তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

মাধব পটনায়েকের পুঁথি থেকে লেখা অনেক প্রবন্ধ জয়দেব সংগ্রহ করেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্য চরিতামৃত' বইটা অনেকবার পড়েছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'ও। এ সব বই কলেজ স্ট্রিটের ঘরে ঘরে কিনতে পাওয়া যায়। মোদ্দা কথা, ওড়িয়া লেখকরা সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, মহাপ্রভুর মৃত্যু নিয়ে কোনও রহস্য নেই। তবে অলৌকিকত্ব আছে বই কী! তিনি যে অবতার! জয়দেব নিজে অবশ্য তা মানে না। নিজের বিশ্বাসে ও অটুট। সেইভাবেই ওর গবেষণার সূত্র সংগ্রহ করছে। সুধীর মিশ্র বাড়তি কোনও তথ্য দিতেন পারেন কি না, সেটা বাজিয়ে দেখার জন্য আন্দাজে জয়দেব ঢিল ছুড়ল, 'বিমানবিহারী মজুমদারের চৈতন্যচরিতের উপাদান বইটা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন?'

'পড়েছি। মাধব পটনায়েকের চৈতন্যবিলাস নিয়ে ওর মতামত। এ সম্পর্কে আমার কিছু রিজার্ভেশন আছে। আমার সঙ্গে পুরীতে একবার আলাপ হয়েছিল এক গবেষকের সঙ্গে। আপনার নামেই নাম। তবে ওঁর পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়। মিড নাইন্টিজের কথা বলছি। জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটা বইও তখন প্রকাশিত হয়েছিল। কাঁহা গেলে তোমা পাই। সেই বইটা যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। সেই সময় উনি আমাকে বলেছিলেন, দ্বিতীয় বইটা লিখছেন। উনি প্রমাণ করে দেবেন, চৈতন্যদেবকে কারা মেরেছিলেন এবং কেন? কিন্তু বইটা আর কমপ্লিট করতে পারেননি। তার আগেই উনি মার্ডার হয়ে যান।'

জয়দেব সবই শুনেছে, তবুও জিজ্ঞেস করল, 'উনি কেন মার্ডার হয়েছিলেন জানেন?'

'আমাদের ওখানে....মানে নবদ্বীপে অনেকেই বিশ্বাস করেন, পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তাঁদের বংশধররাই জয়দেববাবুকে মার্ডার করেছিলেন। বিশদ বলতে পারব না। তবে আপনি যদি নবদ্বীপে আসেন, তা হলে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আপনাকে বসিয়ে দিতে পারি, যাঁরা এ নিয়ে চর্চা করেছেন।'

কী মনে হওয়ায় জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'ড. মিশ্র আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন কথাটা?'

'কোন কথাটা?'

'এই যে....মহাপ্রভুকে যারা হত্যা করেছিল, তাদের বংশধররা এখনও অ্যাকটিভ?'

কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুধীর মিশ্র। তারপর বললেন, 'ধর্মান্ধ এই দেশে কোনও কথাই অবিশ্বাস করবেন না। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। রিসার্চের কাজে আমি অনেকবার পুরীতে গেছি। আমার জীবনেও দু'একবার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে সব কথা পরে একদিন আলোচনা করা যাবে। একটা সাজেশন দিয়ে যাই। গবেষণা করতে যখন নেমেছেন, তখন ভয় পাবেন না। ভয় দেখায় কারা জানেন? যারা সত্যকে চাপা দিতে চান। আপনি কেন ভয় পাবেন? আপনি তো সত্য উদ্ঘাটন করতে চাইছেন।'

'ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।'

'দ্যাট'স ইট। যো ডর গয়া, সো মরা গয়া।' বলেই স্মিত হেসে সুধীর মিশ্র ফের বললেন,, 'যাক এ সব কথা। আপনি কিন্তু আমার কৌতূহলটা এখনও মেটাননি। পরের ইস্যুতে কি কিছু ছাপছেন?'

'সুশোভনবাবু ফলো আপ করছেন। উনি লেখা পাঠালে হয়তো ছাপতে পারি।'

এ বার উঠে দাঁড়ালেন সুধীর মিশ্র। পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে, সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। আমাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এই কার্ডে আমার ফোন নাম্বার লেখা আছে। আর কোনও লেখা বেরচ্ছে কি না, তা যদি জানিয়ে দেন, খুশি হব।'

দোকান থেকে নামার জন্য দু'ধাপ সিঁড়ি আছে। রাস্তায় নামতে গিয়ে একবার টলে গেলেন সুধীর মিশ্র। সেটা লক্ষ করে জয়দেব ইশারায় কৌশিককে বলল, ধরে ধরে নামিয়ে দিতে। কিন্তু তার আগেই লাঠিতে ভর দিয়ে উনি রাস্তায় নেমে পড়েছেন। গটগট করে বড় রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। সে দিকে তাকিয়ে জয়দেবের মন হল, ভদ্রলোক একটা সার কথা বলে গেলেন। ভয় দেখায় তারা, যারা সত্যকে চাপা দিতে চায়। আসলে তারা নিজেরাই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। যে গবেষকের কথা সুধীর মিশ্র বলে গেলেন, সেই জয়দেব মুখোপাধ্যায় কিন্তু ভয় পাননি। প্রকাশ্যেই উনি বলতেন, শ্রীচৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল। পুরীতে দীর্ঘদিন বসবাস করে, উনি সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ছিলেন। পুরীতে যে আশ্রমে উনি থাকতেন, সেখানে গিয়ে জয়দেব বার কয়েক খোঁজ নিয়েছিল। উনি খুন হয়েছিলেন, সেটা ঠিক। তবে জমিজমা বিবাদকে কেন্দ্র করে। আশ্রমের কিছু জমি দখল করে নিয়েছিল স্থানীয় লোকেরা। উনি প্রতিবাদ করেন। তার পরই খুন।

কলকাতার কাগজে সেইসময় খবরটা বেরিয়েওছিল। তার ক্লিপিংস জয়দেবের কাছে আছে। ওর মনে হয়, জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের খুন হওয়ার সঙ্গে, তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে জয়দেবের ধন্ধ কাটেনি। খুন হওয়ার কিছুদিন আগে জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশককে একটা চিঠি লিখে জানান, মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু ডাক মারফত পাঠাতে

উনি ভরসা পাচ্ছেন না। পুরীতে গিয়ে প্রকাশক যদি পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আসেন, তা হলে বাধিত হবেন। আশ্চর্য, জয়দেব মুখোপাধ্যায় খুন হওয়ার পর, আশ্রম থেকে সেই পাণ্ডুলিপি উধাও হয়ে যায়। অনেক পরে কয়েকটা ছেঁড়া পাতা পুলিশ উদ্ধার করেছিল স্বর্গদ্বার থেকে।

মা চিন্ময়ী আশ্রমের অবধূত গোস্বামীজির মুখে পরে আরও অনেক কথা জয়দেব শুনেছে। নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল জয়দেব মুখোপাধ্যায়কে। হত্যাকারীরা গভীর রাত্রে আশ্রমে ঢুকেছিল। পরদিন ওঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় উঠোনে, চৌবাচ্চার ওপর হুমড়ি খাওয়া অবস্থায়। আশ্রমে থাকতেন ওঁর বয়স্ক আত্মীয়া। তিনিও রেহাই পাননি। পুলিশ পরে হত্যাকারীদের ধরতে পারেনি। রহস্যের কোনও কিনারাও হয়নি। আপন বলতে জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের আর কেউ ছিলেন না। বাকি আশ্রমিকরা খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন। ফলে সেই কেস ধামাচাপা পড়ে। ওঁর বইয়ের প্রকাশককে জয়দেব চেনে। তিনি বারকয়েক তাগাদাও দিয়েছিলেন পুলিশকে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি।

জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের কথা ভাবতে ভাবতে জয়দেব বুঝতেই পায়নি, পকেটে ওর মোবাইল ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানের সামনে তুলে ও শুনল, পর্ণব বলছে, 'আপনি কি বাড়িতে, না দোকানে?'

জয়দেব বলল, 'দোকানে। কেন বল তো?

'পাঁচ মিনিট পর জি মেল-এ গিয়ে চ্যাট উইনডো-টা খুলুন। সুশোভনদা চ্যাট করতে চান।'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে সব ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল জয়দেবের। ও বলল, 'ঠিক আছে।' বলেই লাইনটা কেটে দিল।

ভুবনেশ্বর থেকে ফোনে কথা বলার ঝুঁকি সুশোভনদা আর নিচ্ছেন না। তাই পর্ণবের পরামর্শে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে খবর দেওয়া-নেওয়া করছে জয়দেব। সুশোভনদার সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ হয়েছিল দিন পাঁচেক আগে। তখন উনি বলেছিলেন, নরহরি মহাপাত্রকে অনেক কষ্টে উনি রাজি করিয়েছেন। ছবিগুলোর হদিশ এ বার পাওয়া যাবে। নতুন কোনও খবর হলে, উনি নিজেই ফের যোগাযোগ করবেন। সম্ভবত ছবিগুলোর খবর পেয়ে গেছেন সুশোভনদা। তাই চ্যাট করতে চান। তাড়াতাড়ি জি মেল খুলে বসল জয়দেব। সবুজ সিগন্যাল পেয়ে উৎফুল্ল। লাইন ওপেন করেছেন সুশোভনদা।

'কেমন আছেন?'

'ফার্স্ট ক্লাস। আমি এখন পুরীতে। সকাল-বিকাল সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ গুণছি। হাতে গিটার, পাশে তোমার বউদি থাকলে....সময়টা মন্দ কাটত না। কেন যে যৌবনে আসিনি! বাকি জীবনটা এখানে কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। গবেষণার অনেককিছু আছে।'

কথা শুনে মনে হচ্ছে, মস্তিতেই আছেন সুশোভনদা। তাড়া খাওয়ার টেনশনটা নেই। খুন হয়ে যাওয়ার ভয়টাও সম্ভবত কাটিয়ে উঠেছেন। জয়দেব লিখল, 'অপারেশন জামিল-এর কী হল?'

'এক সপ্তাহের জন্য বাতিল। হরি পাত্রবাবু নার্সিং হোমে। বুকে কফ জমেছে। ওড়িশা সরকার চিকিৎসার সব খরচ দিচ্ছে। তাই বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা যে কেন এই সুযোগটা পাই না!'

হরি পাত্রবাবু মানে নরহরি মহাপাত্র। জয়দেব পাল্টা লিখল, 'কফ জমা হওয়ার মতো জায়গা আপনার বুকে নেই। বিশ্রাম নেওয়ার মতো সময়ও। আপনার আর্টিকেল লোকের এত কৌতূহল বাড়িয়েছে যে, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে এসে জানতে চাইছে, ফলো আপ স্টোরি কবে বেরুচ্ছে।'

'তাই নাকি? বাঃ। দেখি অপারেশন জামিল সাকসেসফুল হলে, এখান থেকেই লেখাটা পাঠিয়ে দেব। তুমি কবে আসছ, জানাও।'

'কবে গেলে একসঙ্গে হরি পাত্রবাবুর কাছে যেতে পারব?'

'তা হলে আগামী সোমবার ভোরে পৌঁছে যেও। কোথায় মিট করতে হবে, এর মধ্যে জানিয়ে দেব।'

'থ্যাঙ্কস। ওইদিনই চলে যাব। আর কিছু বলবেন?'

'পর্ণব তোমার সঙ্গে আসতে চাইছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে। আমার মনে হয়, এই ঘোর বিপদের মধ্যে ওকে নিয়ে আসার কোনও দরকার নেই। তুমি কায়দা করে ওকে কাটিয়ে দিও।'

'যেমন আপনার ইচ্ছে। সাবধানে থাকবেন। বাই।'

....আধ ঘণ্টা পর কৌশিককে ট্রাভেল এজেন্টের কাছে পাঠানোর সময়, মায়ের মুখটা ভেসে উঠল জয়দেবের চোখের সামনে। কিছুদিন আগে মা আফসোস করেছিল, 'জগন্নাথদেব না টানলে পুরীতে কেউ যেতে পারে না রে। আমাকে টানছে না। সেই কবে তোর বাবার সঙ্গে একবার গেছিলাম।'

জয়দেব তখন বলেছিল, 'এর পরের বার যখন যাব, তখন তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব মা। পাক্কা।' কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভবই না। কখন কোন বিপদ এসে সামনে দাঁড়াবে......, তখন মাকে কে সামলাবে? ওখানে কদ্দিন থাকতে হবে, তাও জানা নেই জয়দেবের। না, না, ও যে ফের পুরীতে যাচ্ছে, মাকে তা বলা যাবে না। বললে খুব দুঃখ পাবে। অদ্ভুত দোটানার মধ্যে পড়ল জয়দেব। অনেক ভেবে ও ঠিক করল, মাকে কিছু জানাবেই না।

মায়ের কলকাতা ফিরতে এখনও দিন কুড়ি দেরি। মা কিছু টেরই পাবে না।

তেইশ

বাবার মুখেই খবরটা পেল উপাসনা। আচার্য সুধীর মিশ্র মশাই কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। তবে ওঁর শরীর ভাল নেই। বিয়ে বাড়িতে অনিয়ম হয়েছে। তার ওপর কলকাতায়

উনি নাকি অনেক ঘোরাঘুরিও করেছেন। শরীরের আর দোষ কী। বয়স যে বাড়ছে, সে হুঁশ নেই মানুষটার। ওঁর বাড়ির লোকজন সকালে বাবাকে খবর দিয়েছিল। শোনামাত্র বাবা ওঁর বাড়িতে গিয়ে ওষুধপত্তর যা দেওয়ার, দিয়ে এসেছেন। দুপুরে খেতে এসে বাবা বললেন, 'আজ আচার্যিমশাইকে দেখে ভাল লাগল না রে উপা। সামান্য জ্বর। কিন্তু হঠাৎ যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছেন। কলকাতায় এমন কিছু ঘটেছে, মানুষটাকে একদম বদলে দিয়েছে। কী হতে পারে বল তো?'

উপাসনা জানতে চেয়েছিল, 'হঠাৎ আপনার এ রকম মনে হল কেন বাবা?'

'অনেকদিন ধরে ডাক্তারি করছি রে মা। রোগী দেখে বুঝতে পারি, রোগটা আসলে কোথায়? দেহে না, মনে। আমার তো মনে হল, উনি অন্য জগতে বিচরণ করছেন। কথা বলার সময় দেখলাম, একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। ইরেলিভেন্ট কথা বলছেন। চোখটাও ঘোলাটে। তুই একবার দেখতে যাস তো! তোর সঙ্গে তো অনেক আলোচনাই করেন। হয়তো বলে ফেলতেও পারেন।'

'বিমলা বউদিকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন?'

বিমলা বউদি হলেন আচার্যমশাইয়ের নাতবউ। উনিই দেখাশোনা করেন আচার্যমশাইকে। ওঁর কথা তোলায় বাবা বললেন, 'জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু সে যা বলল, তাও বুঝতে পারলাম না। বিমলা বলল, ফিরে আসার পর থেকে আচার্যমশাই নাকি, দাঁতে কুটোটিও কাটেননি। খাওয়ার কথা তুললে, বলছেন, জীবন সার্থক হয়ে গেছে। খাওয়ার আর প্রয়োজন নেই।'

কাল দুপুরবেলায় আচার্যমশাই ফিরে এসেছেন। তার মানে চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে গেছে, তবুও উনি পেটে কিছু দেননি। কী এমন হল ওঁর? খবরটা শোনা মাত্র ছটফট করছে উপাসনা। ভর দুপুরে কারও বাড়ি গিয়ে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। তাই বিকেল হতেই ও বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। যখন শাড়ি বদলাচ্ছে, তখন মা এসে জানতে চাইল, 'কোথাও বেরচ্ছিস নাকি উপা?'

'হ্যাঁ মা, একবার আচার্যমশাইকে দেখে আসব। ওঁর সঙ্গে দরকারও আছে।'

'একা যাস না মা। কমলিকেও সঙ্গে নিয়ে যা। আচার্যমশাইয়ের বাড়িটা গঙ্গার ধারে। সন্ধের পর থেকে ওই জায়গাটা ছমছম করে। তুই গণেশের রিকশা নিয়ে যা। যতক্ষণ লাগুক, ওকে বসিয়ে রেখে দিবি। না হলে ফেরার সময় কিন্তু রিকশা পাবি না।'

উপাসনা বলল, 'উফ মা, তুমি আর বদলালে না। কলকাতার মতো শহরে একা চলাফেরা করছি। আর এখানে পারব না?'

মা বলল, 'নবদ্বীপ আর আগের মতো নেই মা। রোজ মারামারি, পার্টিবাজি। আমার ভয় শ্রীবৎস আর সনাতনকে নিয়ে। তোর ওপর ওদের ভয়ানক রাগ। সাবধানে যাস মা। নিজে যখন মা হবি, তখন বুঝতে পারবি, কেন এত বারণ করি।'

অগত্যা কমলিকে সঙ্গে নিতে হয়েছে। গণেশের রিকশাও। মা অবশ্য ঠিক বলেছে, আচার্যমশাইয়ের বাড়িটা বেশ দূরে। মণিপুরঘাটের দিকে। রাতে নিরাপদও নয়। প্রায় দেড়শো

বছরের পুরনো বাড়ি, পাঁচিল ঘেরা। সামনের দিকে বাগান মতো আছে। আচার্যমশাইয়ে মুখেই উপাসনা শুনেছে, পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে বাইরের ছেলে ছোকরারা বাগা বসে মদ খায়, নেশা করে। পুলিশে কমপ্লেন করে কোনও লাভ হয়নি। আচার্যমশাইদে পরিবারটা বেশ বড়। কিন্তু বিমলা বউদি আর কাজের লোক ছাড়া এখন আর কে থাকেন না। পরিবারের পুরুষরা সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাগত কারণে দেশ-বিদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁরা নবদ্বীপে আসেন শুধু রাসমেলার সময়। বাড়ির ভেতরে রাধাগোবিন্দর বেশ বড়মন্দির আছে। সেখানে রাসমেলায় ধুমধাম করে পুজো হয়।

আচার্যমশাইয়ের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে উপাসনা একটু অবাকই হয়ে গেল। যতটা নির্জন ভেবেছিল, ততটা কিন্তু নয়। বাগান থেকেই ও দেখতে পেল, বাড়ির দেওয়ালে একটা বড় বোর্ড টাঙানো রয়েছে 'চৈতন্যচর্চা কেন্দ্র, নবদ্বীপ'। ভেতরে বেশ কয়েকজন লোক, আপন কাজে ব্যস্ত। চৈতন্যচর্চার এই অফিসটা আগে ছিল বড়ালঘাটের পাশে। সেক্রেটারি উপেন চৌধুরীর বাড়িতে, ছোট একটা ঘরে। উপাসনা আগে বেশ কয়েকবার সেই অফিসে গেছে। কিন্তু ওই জায়গাটা হল মায়াপুর যাওয়ার মূল খেয়াঘাট। সারা দিন প্রচুর লোকজন, ব্যস্ততা, কোলাহল। সম্ভবত সেই কারণেই আচার্যমশাইরা অফিস তুলে এনেছেন নিরিবিলি জায়গায়। যাতে নির্বিঘ্নে পড়াশুনো করা যায়।

বাড়ির ভেতর ঢুকে বিমলা বউদিকে খুঁজতে লাগল উপাসনা। দু'একবার ডাকাডাকি করেও সাড়া পেল না। সন্ধেবেলায় নিশ্চয়ই নাটমন্দিরে থাকবেন ধরে নিয়ে, ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দিকে এগোতে লাগল। দূর থেকে ও দেখতে পেল, মন্দিরের ভেতর প্রদীপের সামনে চুপ করে বিমলা বউদি বসে রয়েছেন। একমনে কিছু প্রার্থনা করছেন বোধহয়। কোনও কথা না বলে ও মন্দিরের ওপর উঠে গেল। কাঁধে আঁচল দিয়ে, গড় হয়ে রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করলেন বউদি। দেখাদেখি উপাসনাও গড় হয়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়াতেই বউদি বললেন, 'আরে উপা, কখন এলে?'

'এই একটু আগে। আচার্যমশাই কেমন আছেন?'

'ভাল নেই ভাই। কলকাতায় যেতে আমি বারণ করেছিলাম। উনি শুনলেন না। কিছু কাজ আছে বলে, জোর করে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো। কী হয়েছে, জিজ্ঞেস করলেও বলতে চাইছেন না। চোখ বুজে শুয়ে আছেন, কখনও কখনও ছটফট করছেন। সারা শরীরে ব্যথা হলে, যে রকম হয় আর কী। দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। তাই তোমার বাবাকে আজ খবর দিয়েছিলাম।'

'কোন ঘরে আছেন উনি?'

'দোতলায় যে ঘরে থাকেন। তুমি যাও। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে উনি খানিকটা হাল্কা হবেন। আমি ঠাকুরের কাজ সেরে, পরে আসছি। এখুনি ঠাকুরমশাই আসবেন।'

টুকটাক কথা বলে উপাসনা মন্দির থেকে নেমে এল। দোতলা ওঠার সিঁড়িতে যখন পা দিয়েছে, তখন হঠাৎ আলো নিভে গেল। নবদ্বীপে প্রায়ই এটা হয়। যখন তখন কারেন্ট চলে যায়। অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যেস আছে এখানকার লোকেদের। কিন্তু উপাসনার

তা নেই। তাই ব্যাগ থেকে মোবাইল সেটটা ও বের করে নিল। সুইচ অন করলে সেট থেকে জ্যোৎস্নার মতো সাদা আলো বেরয়। সেই আলোয় সিঁড়ি দেখে সাবধানে ও ওপরে উঠতে লাগল। পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ি। বাঁক নেওয়ার জায়গাটা সরু। হোঁচট খেলে মুশকিল।

আচার্যমশাই যে ঘরে থাকেন, উপাসনা সেই ঘরটা চেনে। এর আগে দু'একবার ও এসেছে। আগেকার দিনের বিশাল উঁচু, কারুকার্যকরা খাট। চার পাঁচ জন মিলে স্বচ্ছন্দে শোয়া যায়। ঘরের দরজায় পা দিয়ে উপাসনা বিছানায় কাউকে দেখতে পেল না। তবে যে বিমলা বউদি বললেন, আচার্যমশাই নিজের ঘরে শুয়ে আছেন? একটু অবাক হয়েই ও চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ির ভেতর আর কাউকে ওর চোখে পড়েনি। আচার্যমশাই কোথায় গেলেন, তা জানতে ফের ওকে মন্দির পর্যন্ত যেতে হবে। বাধ্য হয়ে উপাসনা বলে উঠল, 'আচার্যমশাই, আপনি কোথায়?'

না, কোনও উত্তর নেই। কয়েক সেকেন্ড হতবুদ্ধি হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার পর উপাসনার মনে হল, উনি বাথরুমে যেতে পারেন। একটু অপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু অত বড় বাড়িতে লম্বা টানা বারান্দার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ওর গা ছমছম করতে লাগল। মোবাইল সেট-এর টর্চটা জ্বালানোই আছে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কারও উঠে আসার পায়ের শব্দ হচ্ছে। বাড়ির খিলানে একটা ছায়া ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে যে উঠে আসছে, তার হাতে সেজবাতি আছে। সেদিকে তাকিয়ে কাজের মেয়েটাকে দেখতে পেল উপাসনা। ওর নামটাও মনে পড়ল......রুমকি। বাঙাল দেশের মেয়ে। মেয়েটা ওর পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় বলল, 'কত্তা মা পাঠাইয়া দিলেন। আপনে ভেতরে আসেন।'

'আচার্যমশাই কোথায় গেলেন?'

শুনে অবাক হয়ে মেয়েটা বলল, 'ওই তো...উনি শুইয়া আছেন?'

বিছানার দিকে চোখ দিতেই আচার্যমশাইকে দেখতে পেল উপাসনা। গায়ের ওপর সাদা চাদর, দেওয়ালের দিকে মুখ, আচার্যমশাই শুয়ে আছেন। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! একটু আগে বিছানায় ও কাউকে দেখতে পায়নি। হ্যাঁ, খুব ভাল করে ও তাকিয়েছিল। চোখের ভুল হতেই পারে না। তখন কাউকে ও দেখতে পায়নি। হঠাৎ আচার্যমশাই উদয় হলেন কী করে? আচার্যমশাইয়ের এমন অলৌকিক ক্ষমতা নেই যে, সূক্ষ্ম শরীরে উনি উধাও হয়ে যাবেন অথবা হাজির হবেন। তা হলে কেন তখন আচার্যমশাইকে ও দেখতে পায়নি?

রুমকি ডাকছে, 'কত্তাবাবা, ও কত্তাবাবা, দেখো কে আইসে তোমার সনে দেখা করতে।' কিন্তু আচার্যমশাই কোনও সাড়া দিচ্ছেন না। মেয়েটা বলল, 'কাইল থেইক্যা কত্তাবাবা ক্যামন যেন করত্যাসে। ঘুমাইয়া নিজের সঙ্গে কথা কয়। ডাকলে তাকায় না।'

পাঁচ ছয়বার ডাকাডাকি করার পর আচার্যমশাই পাশ ফিরেই বললেন, 'আমি কিছু খাব না মা। কেন বিরক্ত করছিস? হ্যাঁরে, উপা-কে খবর দিয়েছিস? তোকে যে বললাম, উপা-কে একবার আসতে বল। তোরা কেউ আমার কথা শুনছিস না কেন?'

আচার্যমশাইয়ের মুখে নিজের নামটা শুনে উপাসনা চমকে উঠল। খাটের দিকে এগিয়ে

ও বলল, 'আমি এসেছি আচার্যমশাই। এই তো আমি।'

'ওহ, এসেছ। হ্যাঁ, গলাটা তো সে রকমই মনে হচ্ছে।' কথাগুলো বলে আচার্যমশাই উঠে বসার চেষ্টা করলেন। তারপর বালিশে মাথা হেলান দিয়ে বললেন, 'কাল বিকেল থেকে তোমার কথা খুব মনে হচ্ছে মা। আরে....তোমায় ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো?'

'লোডশেডিং আচার্যমশাই।'

'তাই বলো। আসলে আলো আর সহ্য হচ্ছে না মা। যা দেখে এলাম....। সেজবাতিটা তুমি....আমার মাথার পিছন দিকের টেবলে রাখবে? আমার কথা বলতে সুবিধে হবে।'

রুমকি সেজবাতিটা টেবলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল। উপাসনা জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতায় কী দেখে এলেন আচার্যমশাই?'

'তাঁকে দেখে এলাম মা। আমাদের সবার গৌরসুন্দরকে। এই তোমাকে যেমন দেখতে পাচ্ছি, তেমনই। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে উপা।'

কী বলছেন আচার্যমশাই? উপাসনা একবর্ণও বুঝতে পারল না। গৌরসুন্দর......মানে চৈতন্যদেব? আচার্য মশাই তাঁকে দেখবেন কী করে? মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, নাকি কেউ শেকড় বাকর ধরনের কিছু খাইয়ে দিয়েছে? বাণও মারতে পারে। প্রথমেই শ্রীবৎস আর সনাতনের নাম দু'টো মনে এল উপাসনার। ওঁরা কোনও কিছু করেনি তো? আচার্যমশাইকে ওঁরা পছন্দ করে না। ক্ষতি করার জন্য ওত্ পেতে ওরা বসে রয়েছে। কথা ঘোরানোর জন্য উপাসনা কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আচার্যমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, উনি কাঁদছেন। আর দু'হাত জোড়া করে ঘনঘন প্রণাম জানাচ্ছেন। চোখের কোণ দিয়ে জলের ধারা অনবরত নেমে আসছে। আশ্চর্য, একটু পরে চোখ মুছে আচার্যমশাই স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দেবে মা। তোমাকে কিছু বলার আছে।'

কয়েক পা পিছিয়ে উপাসনা দরজাটা বন্ধ করে দিল। ও টুলের ওপর এসে বসতেই আচার্যমশাই বললেন, 'তিনি ধরাধামে এসেছেন। হ্যাঁ মা, আমার অনুমানই সঠিক। গৌরসুন্দর পুনর্জন্ম নিয়েছেন। আমি তাঁকে দেখেছি। বিশ্বাস করো।'

আচার্যমশাইয়ের কথা অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু বিশ্বাস করতেও মন চায় না। উপাসনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তাঁকে দেখলেন কোথায়?'

'কলকাতায়। কালীঘাটের আদি গঙ্গার পাড়ে, প্রাচীন এক ভগ্ন মন্দিরের ভেতর।'

শুনে উপাসনার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী বলছেন আচার্যমশাই? চৈতন্যদেব যে পুনর্জন্ম নিয়েছেন, সেটা জানেন, এই ধরাধামে মাত্র তেরোজন। তাঁদের মধ্যে একজন কালীঘাটে থাকেন। তাঁর খোঁজে বেশ কয়েকবার উপাসনা কালীঘাটে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ওকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করেছে। মা তখন ঠিকই বলেছিল, পুণ্যাত্মা না হলে মহাত্মাদের দেখা পাওয়া কঠিন। কিন্তু আচার্যমশাই কথাগুলো এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলছেন যে, উপাসনা বাকরহিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

আচার্যমশাই বলতে শুরু করলেন, 'পরশু বিকেলে রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে গেছিলাম, ভাগবত মন্দিরের লাইব্রেরিতে তোমার রিসার্চের ব্যাপারে কথা বলতে। হঠাৎ প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। সেই সময় এক মোহান্ত এসে আমায় বললেন, চলুন আপনাকে একজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। বৃষ্টির মধ্যেই উনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ছাতা মাথায় হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম কালীঘাটের আদিগঙ্গার পাড়ে। চারদিক অন্ধকার করে এসেছে। এত বৃষ্টি, আমি দু'হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে এক দুর্যোগ বলতে পারো। বৃষ্টির ছাঁটে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। একটা বহু পুরনো, পরিত্যক্ত মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে মোহান্তজি বললেন, যান, এই মন্দিরের ভেতর ঢুকে যান। পর পর তিনটে দেউল আছে। তারও পরে গর্ভগৃহ। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, গর্ভগৃহের পাশ দিয়ে নীচে নামার একটা সিঁড়ি আছে। আপনি নীচে নেমে যাবেন। সেখানে এক মোহান্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'মন্দিরের ভেতর ঘন অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তবে পথ দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকব কী করে ভাবছি। সেটা বুঝে, হাতে একটা টর্চ ধরিয়ে দিলেন মোহান্তজি। তারপর কোনও কিছু না বলে, বৃষ্টির মধ্যেই উধাও হয়ে গেলেন। রাস্তায় একটা লোকও নেই। আশপাশের বাড়িগুলো সব ঝাপসা। কোনও বিপদ হলে এগিয়ে আসার মতো লোকও ধারে-কাছে নেই। অগত্যা টর্চ জ্বালিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেলাম। দেউল পেরিয়ে গর্ভগৃহের কাছে গিয়ে দেখি, সত্যিই নীচে নামার একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সিঁড়িতে পড়ছে। ভাবতে পারিনি, সিঁড়িটা অত পিছল হবে। দু'পা নামতেই পিছলে গেলাম। আছড়ে নীচে পড়তেই দেখি, পাতাল ঘরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। অনেকটা দূরে একটা মঞ্চের মতো রয়েছে। তাতে বসে আছেন এক পরম বৈষ্ণব। তাঁর সামনে তালপাতার পুঁথি। বোধহয় পুঁথি পড়ায় ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলে আমাকে দেখে স্মিত হেসে উনি বললেন, জয় রাধে। আসুন, মঞ্চে উঠে আসুন। আপনি যা জানতে চান, সেটা এই পুঁথিতে লেখা আছে।'

এ পর্যন্ত শুনে চমকে উঠল উপাসনা। তা হলে যে পুঁথির সন্ধানে একটা সময় আচার্যমশাই ভুবনেশ্বরে ঘুরে বেরিয়েছেন, সেটা কলকাতাতেই আছে! যাক, তা হলে ওকে আর ওড়িশায় যেতে হবে না। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তারপর কী হল আচার্যমশাই?'

'ওঁকে দেখেই মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। হাত জোড় করে বললাম, জয় রাধে, কৃপা করে বলুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি সত্যিই পুনর্জন্ম নিয়েছেন? উনি বললেন, আপনি কি তাঁকে দেখতে চান? আমি আপ্লুত হয়ে বললাম, হ্যাঁ দেখতে চাই। দেখে জীবন সার্থক করতে চাই। দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে উনি বললেন, ওই দেখুন। তাকিয়ে দেখি মা, দেওয়ালটা যেন হঠাৎ সিনেমার পর্দার মতো হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে এক অনিন্দসুন্দর যুবক। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন। গৌরসুন্দরের মতোই তিনি কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘকায়, দীর্ঘকেশ, আজানুলম্বিত বাহু। লক্ষণগুলো একই রকম।

তবে পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর চোস্ত। দেখে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগল। আনন্দে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। হাতজোড় করে প্রণাম জানাতে মাথা ঝুঁকিয়েছি। মুখ তুলে দেখি, উনি নেই। চোখের সামনে সেই পরম বৈষ্ণবও নেই। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমি একা পাতালে দাঁড়িয়ে আছি। ওপরে বিরাট শব্দ করে একটা বাজ পড়ল। তখনই মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। কোনও রকমে হাতড়ে পথ খুঁজে, ওপরে উঠে দেখি, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। মা, বিশ্বাস করো যা বললাম, সত্যি। হাল ছেড়ো না। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে তুমি যাও। তাঁর খোঁজ তুমি পাবেই।'

এমন বিশ্বাসের সঙ্গে আচার্যমশাই কথাগুলো বললেন, উপাসনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

চব্বিশ

গোরার মনটা আজ খুবই অস্থির। ভুবনেশ্বর থেকে হঠাৎ মা এসে হাজির। বোসপুকুরে দলিত পার্টির অফিসে অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে কথা বলে, সবে ও তখন বাড়িতে ফিরেছে। পার্টির সুভ্যেনির-এ ভৈরবের জালিয়াতির কথাই, তখন ওর মাথায় ঘুরছে। ফ্ল্যাটের তালা খোলার সময় উল্টোদিক থেকে মায়ের গলা শুনে উঁকি মেরে ও দেখে, রাসমোহনবাবুদের ঘরে বসে মা কথা বলছে। মায়ের কাছে ফ্ল্যাটের চাবি ছিল না। বাড়িতে না-ফিরে ও যদি সোজা ইউনিভার্সিটি চলে যেত, তা হলে কী হত, ভেবে গোরা চমকে উঠল। বিকেলের আগে ও ফিরত না। সারাটা দুপুর তা হলে মাকে রাসমোহনবাবুদের ফ্ল্যাটে কাটাতে হত। ওঁরা মাছ-মাংস খান বলে, মা পারতপক্ষে ওঁদের ফ্ল্যাটে যায় না। গেলেও জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। মাকে দেখে প্রথমেই যে কথাটা ওর মাথায় এল, সেটা হল, মা একা একা আসেনি। তা হলে কার সঙ্গে এল? কেন আগে বলেনি, আসবে? এ ভাবে না-জানিয়ে চলে আসার কারণটা কী? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন গোরার মাথায় ভিড় করে এল।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে মা বেরিয়ে এসেছিল। গোরা প্রণাম করতেই ফিসফিস করে বলে উঠল, 'চল, চল, আগে ঘরে চল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

ঘরে ঢুকে মা দু'তিনবার ওয়াক করে উঠল। বমি করার ভঙ্গিতে। তারপর বলল, 'সেই তখন থেকে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বসে আছি রাসমোহনবাবুর বাড়িতে। মাছের এমন আঁশটে গন্ধ, আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এরা মাছ-মাংস খায় কী করে বাবা?'

ঘরে ঢুকেই গোরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। মাছের আঁশটে গন্ধে ওরও বমি উঠে আসে। সেই কারণে মাঝে মধ্যে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রাখে। রাসমোহনবাবুর বাড়িতে যেদিন শুঁটকি মাছ রান্না হয়, সেদিন তো গোরা বাড়িতেই থাকে না। রাসমোহনবাবু কর্পোরেট জগতের মানুষ। প্রায়ই চাকরিসূত্রে বিদেশে যান। কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ওঁর কোনও বাছবিচার নেই। বিদেশে বিফও

খেয়েছেন। সে কথা তো আর মাকে বলা যাবে না। মায়ের কানে গেলে, হয়তো আর কোনওদিন রাসমোহনবাবুর ফ্ল্যাটের চৌকাঠই মাড়াবে না।

নিজেকে সামলে মা বলল, 'আর বলিস না বাবা, ট্রেন চার ঘণ্টা লেট। সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে স্টেশনে ঢোকার কথা, পৌঁছল বেলা সাড়ে এগারোটায়। ভাগ্যিস, টুবাই সঙ্গে ছিল।'

ওহ, মা তা হলে টুবাইয়ের সঙ্গে এসেছে। শুনে গোরা বলল, 'আমায় খবরটা দাওনি কেন মা? তা হলে হাওড়া স্টেশনে চলে যেতাম।'

'খবর দেব কী, টুবাই যে বারণ করল। আমায় বলল, তোকে চমকে দেবে। আসলে টুবাইয়ের মাও সঙ্গে এসেছে। নবদ্বীপে কোন এক ডাক্তার আছে। টুবাইয়ের বিয়ে দেবে বলে, ওর মা সেই ডাক্তারের মেয়েকে দেখতে এসেছে। কথাবার্তা সব পাকা করে যাবে। আমায় বলল, চলো না দিদি, মেয়েটাকে তুমিও দেখে আসবে। বারবার বলতে লাগল। তাই ভাবলাম, কলকাতায় অনেকদিন আসিনি। এলে তোর সঙ্গে একবার দেখাও হয়ে যাবে। তুই ক'দ্দিন ভুবনেশ্বরের যাসনি বল তো?'

'মা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটা দিয়ে, তবে বেশ কিছুদিনের জন্য যাব ভেবেছিলাম।' তোমরা ক'দিন থাকবে, প্রশ্নটা মুখে এলেও, করতে পারল না গোরা। মা তাতে দুঃখ পেতে পারে। টুবাই এলে কায়দা করে জেনে নেওয়া যাবে। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য ও বলল, 'তুমি স্নানটান করে তৈরি হয়ে নাও মা। আমি তোমার জন্য ফলাহারের ব্যবস্থা করি।'

'না রে, তোকে আর বেরুতে হবে না। আমি সেদ্ধভাতের ব্যবস্থা করছি। টুবাইরা এখুনি ফিরে আসবে। একসঙ্গে তখন খাওয়া যাবে।'

'ওরা কোথায় গেছে মা?'

'গড়িয়াহাটে। কী সব কেনাকেটা করবে। তিনটের সময় আমাদের যে ফের বেরুতে হবে।'

'কোথায় যাবে মা?'

'এই যে তোকে বললাম....নবদ্বীপ। টুবাই একটা গাড়িভাড়া করেছে। নবদ্বীপে মেয়ে দেখে, ওখান থেকেই সোজা আমরা চলে যাব হাওড়া স্টেশনে। রাত পৌনে এগারোটায় ফেরার ট্রেন। কাল ভোরের মধ্যেই পৌঁছে যাব ভুবনেশ্বরে।' ঘরের চারপাশে তাকিয়ে তারপর মা জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে মুকুন্দ কই? সে কি কলেজে গেছে?'

'হ্যাঁ মা, খেয়ে-দেয়ে আমরা একসঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। মুকুন্দ বিকেলে ফিরবে। কেন মা?'

'নাঃ, তা হলে আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না। মুকুন্দর মা.....ওর জন্য কিছু জিনিস পাঠিয়েছে বাবা। তোর কাছেই রেখে যেতে হবে।'

শুনে গোরা একটু নিশ্চিন্ত হল। যাক, মা তা হলে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি থাকবে না। মাকে দেখার পর থেকে ওর মনে একটা অস্বস্তিকর কাঁটা খচখচ করছিল। অদ্বৈতবাবুর

মুখে একটু আগে শুনে এসেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ বাড়ি আসতে পারে। কখন আসবে, কেউ জানে না। মা থাকার সময় যদি আসে, তা হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে। মা রাজনীতি-টিতি বোঝে না। মা এমন যুগে বাস করে, যখন পুলিশ দেখলে লোকে ভিরমি খেত। টুবাইয়ের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই? কেন এমন সময় মাকে নিয়ে এল, যখন ও একটা সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে? পরক্ষণেই গোরার মনে হল, আরে....টুবাই জানবে কী করে, ও প্রবলেমের মধ্যে আছে?

কিট ব্যাগ খুলে মা কী যেন বের করছে। এমন সময় বলল, 'টুবাইয়ের তো একটা ব্যবস্থা হল, এ বার তুই তৈরি হ বাবা। বৈশেখ মাসে তোর পালা। আমি মেয়ে পছন্দ করে রেখেছি। নাম প্রিয়া।'

গোরা বলল, 'তোমার মাথা খারাপ, মা? আমি রাজনীতি করি। বিয়ে করা আমার উচিত না। কখন কী হয়। আমাদের জীবনে কোনও নিশ্চয়তা নেই। টুবাইয়ের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলো না।'

মা চটে গিয়ে বলল, 'চুপ কর তো। যারা রাজনীতি করে, তারা কি কেউ সংসার করে না? এই....তোকে আমি শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি। তুই পার্টি পলিটিক্স ছাড় বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। আমারই ভুল হয়েছিল, তোর কাকার কথা শুনে, তোকে এখেনে পাঠানো। এখেনে এসে তুই আরও বেশি করে পার্টি পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিস। কী হবে পার্টি করে? দেখছিস না, রোজ রোজ কত খুন খারাপি হচ্ছে। তোদের ওই অদ্বৈত বুড়োটাই তোর মাথা খাচ্ছে?'

'পার্টি ছেড়ে আমি আর এখন বেরিয়ে আসতে পারব না মা।'

'কেন পারবি না? মায়ের চেয়ে তোর পার্টি বেশি বড় হল? দ্যাখ গোরা, ভুবনেশ্বরে থাকি বলে....তুই মনে করিস না....তোর সম্পর্কে খোঁজ খবর আমি রাখি না। ক'দিন আগে তুই একটা বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিস। ইটিভি-তে আমি তোর বক্তৃতাও শুনেছি। আমাকে অনেকেই বলছে, গোরাকে আর কলকাতায় রেখো না। এরপর ওর লাইফ ডেঞ্জার হয়ে যাবে। এই শোন, তোকে পরীক্ষা-টরিক্ষা কিছু দিতে হবে না। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল।'

মায়ের মেজাজ তাতছে দেখে গোরা সতর্ক হয়ে গেল। এরপর কী হবে, ও জানে। মা কান্নাকাটি শুরু করবে। তারপর অনুনয় বিনয় করবে। তাতেও কাজ না হলে, দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতীতে অনেকবার এ রকম হয়েছে। তাই মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে গোরা চায় না। গোড়াতেই জল ঢেলে দেয়। মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য তাই ও বলল, 'রাগ করছ কেন মা। পরেও তো, ধীরেসুস্থে এ নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। আপাতত তুমি বাথরুমে যাও। আমি গিজার চালিয়ে দিচ্ছি।'

মা শান্ত হল বটে, কিন্তু কিট ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে হঠাৎ বলল, 'তোর মুখটা এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন রে? ভাল করে খাওয়া দাওয়া করছিস না, না কি?'

শুনে ফের চমকে উঠল গোরা। মুখ শুকনো হওয়াটাই স্বাভাবিক। একটু আগে যা শুনে এসেছে, তার জের ওকে ক'দিন টানতে হবে, কে জানে? মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। ঠিক ধরে ফেলেছে। জোর করে মুখে হাসি টেনে ও বলল, 'সামনে পরীক্ষা....রাত জেগে পড়তে হচ্ছে মা। তুমি চিন্তা কোরো না। মুকুন্দ আছে, ও আমার খুব খেয়াল রাখে।'

'কে জানে, তুই ঠিক বলছিস কী না', বলে মা বাথরুমে ঢুকে গেল। দেখে গোরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মাকে ও কষ্ট দিতে চায় না। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মায়ের কথা ভাবলে ওর চলবে না। বৃহত্তর রাজনীতির আঙিনায় ঢোকার সময় হয়ে গেছে। বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বসেছে। এখন সেই পিঠ থেকে নামার কোনও উপায় ওর নেই। অদ্বৈতবাবু আজই বললেন, পার্টির হাইকমাণ্ড খোঁজ নিচ্ছে ওর সম্পর্কে। বিশেষ করে, দক্ষিণ ভারতের লিডাররা আগ্রহ দেখিয়েছেন। হয়তো ওকে আর কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। পার্টির প্রচার করতে হবে। ওয়ার্কশপে অংশ নিতে হবে। তার আগে পড়াশুনা করে নেওয়া দরকার। দেশের একেক অংশে দলিতদের সমস্যা একেক রকম। জাতপাতের তীব্রতার মিল নেই। আগে সে সব চর্চা না করে ওই সব জায়গায় যাওয়া উচিত না। এই সময়টায় মা যদি বিয়ের জন্য তাগাদা মারে, তা হলে গোরাকে ঘর ছাড়ার কথাও ভাবতে হতে পারে। কথাটা মনে হতেই ও সোফায় গিয়ে বসল।

দলিত পার্টির প্রতি গোরা কোনওদিনই আকর্ষণবোধ করত না, যদি না ভুবনেশ্বরে ইউনিট টু-র বাজারে সেদিন ওই ঘটনাটা ঘটত। তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। কী একটা কারণে ছুটি হয়ে যাওয়ায় দলবল নিয়ে সেদিন ও মস্তি করতে বেরিয়েছিল। বাজারের কাছে গিয়ে হঠাৎ ওরা দেখে, বিরাট একটা জটলা। একটা দুবলা পাতলা ছেলেকে কিছু ব্যাপারী নির্মমভাবে পেটাচ্ছে। ছেলেটার মাথা অর্ধেক কামিয়ে দেওয়া। গলায় জুতোর মালা ঝুলছে। নাক-মুখ দিয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে। মার খেতে খেতে ছেলেটা এক সময় উপুড় হয়ে পড়ে গেছিল। ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গোরারা শুনতে পেয়েছিল, ও না কি কার সাইকেল চুরির চেষ্টায় ছিল। ধরা পড়ে গিয়েছে। ছেলেটাকে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, সবাই ধরেই নিয়েছিল, মারা গেছে। ভিড় তখন পাতলা হতে শুরু করেছে। এমন সময় কোত্থেকে এক বুড়ি-মা দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ছেলেটার বুকে। ছেলের শোকে মরা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তার বিলাপ শুনে গোরার বুক ফেটে গেছিল।

টুবাই দৌড়ে গিয়ে কাছাকাছি এক দোকান থেকে এক জগ জল নিয়ে এসেছিল। জলের ঝাপটা দিতেই, বোঝা গেছিল, ছেলেটা মরেনি। সঙ্গে সঙ্গে গোরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছিল ওকে। একটা রিকশা ডেকে সবাই মিলে ওকে নিয়ে গেছিল হাসপাতালে। ছেলেটার নাম এখনও মনে আছে গোরার। অনাথ কাড়ার। দলিত সম্প্রদায়ের ছেলে। পরে ওর মুখে গোরারা শুনেছিল, কাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ছেলেটা

বাজারের দিকে গেছিল। এক পাইস হোটেলের মালিক ওকে বাসন মাজার কাজও দেয়। কিন্তু মজুরি হিসাবে এত কম পয়সা দিচ্ছিল যে, ছেলেটা নিতে চায়নি। তখনই রেগে গিয়ে হোটেলের মালিক....সাইকেল চোরের অপবাদ দিয়ে ওকে মারতে শুরু করে। শুনে গোরাদের মারাত্মক রাগ হয়েছিল। ওরা সেদিনই ঠিক করে, ছেলেটার মজুরি আদায় করে, তবে ছাড়বে।

ছেলেটাকে দলিত বস্তিতে পৌঁছে দিতে গিয়ে সেদিন করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল গোরার। বাড়িতে ফিরে সে সব কথা উগড়ে দিয়েছিল বাবার কাছে। একটাই প্রশ্ন শুধু করেছিল, মানুষ এ ভাবে বেঁচে থাকতে পারে? সন্ধের সময়, বাবা তখন নাটমন্দিরে বসে জপ করছিল। গোরার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, বাবা ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। গোরা ভেবেছিল, দলিত বস্তিতে যাওয়ার জন্য বাবা বকাবকি করবে। হয়তো বলবে, আর কখনও ও সব জায়গায় যাবি না। কিন্তু আশ্চর্য, বাবা এ দিক সেদিক তাকিয়ে তারপর বলেছিল, 'এত বিচলিত হচ্ছিস কেন? ওদের উদ্ধার করার জন্যই তো এই পৃথিবীতে এসেছিস। তুই বা তোরা যা করেছিস, ঠিক করেছিস।'

মনে আছে....বাবার সেই কথাগুলো গোরা এখনও ভোলেনি। বাবা আরও বলেছিল, 'এই ধরাধাম যখন পাপে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত কিছু লোককে এখানে পাঠিয়ে দেন। এঁরাই ন্যায়ধর্ম পালন করতে শেখান। ভেদাভেদ, বৈষম্য দূর করার জন্য, দরকার হলে হাতে অস্ত্রও তুলে নিতে এঁরা পিছপা হন না। আমি জানি, তোকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন এই কাজটাই করার জন্য। শুনে রাখ, পাঁচশো বছর পর তুই ফের মনুষ্যজন্ম নিয়েছিস। এই যে....এই কথাগুলো তোকে বললাম, কারও কাছে কোনওদিন তুই প্রকাশ করবি না। এমন কী, তোর মা জননীর কাছেও না। মনে থাকবে?'

গোরা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, মনে রাখবে। সত্যিই, কথাগুলো ও কাউকে বলেনি। আশ্চর্যের কথা হল, পরদিন ভোরে বাবার নিথর দেহ পাওয়া গেছিল মন্দিরে। মায়ের মুখে গোরা পরে শুনেছে, অনেক রাতে বাঁশির শব্দ শুনে বাবা না কি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে। মাকে বলে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনতে পেয়েছে। মন্দিরে যাবে জপ করার জন্য। মা তখন ভাবতেও পারেনি, কী হতে যাচ্ছে। আসলে যাঁরা পরমবৈষ্ণব, দেহত্যাগের আগে না কি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মধুর সুর শুনতে পান। সেই কথাটা মায়ের তখন মনে পড়েনি। পরে মা দীর্ঘকাল আক্ষেপ করেছে এই বলে যে, কথাটা মনে থাকলে বাবাকে কিছুতেই, একা মন্দিরে যেতে দিত না।

বাথরুমের দরজায় খট করে একটা শব্দ হল। গোরা তাকিয়ে দেখল, মা স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। পরনে গরদের শাড়ি। ওর দিকে একবার তাকিয়ে মা ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল। গোরা জানে, মা এখন মহাপ্রভুর ছবির সামনে বসে হরিনাম জপবে। তারপর গিয়ে ঢুকবে রান্নাঘরে। বিধবা হওয়ার পর স্বপাকে খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল মা। দিনে একবারের বেশি খেত না। কিন্তু স্নান করত তিনবার। একটা সময় অম্বলের ব্যথায় মা খুব কাতর

হয়ে পড়েছিল। গোরা জোর করে, মায়ের অভ্যাস বদলেছে। এখন মা দু'বেলা খায়। আর স্নান করে দু'বার। স্নান-পুজো-খাওয়া সব মিলিয়ে মায়ের লেগে যায় ঘণ্টা দেড়েক। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, প্রায় দেড়টা বাজে। টুবাইরা যদি তিনটের মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করে, তা হলে, মা রেডি হয়ে যাবে ততক্ষণে।

সোফায় বসে টিভি দেখছিল গোরা। ভেতর থেকে মায়ের গলা শুনতে পেল, 'গোরা, একবার এ দিকে আয় তো। তোর সঙ্গে কথা আছে।' মায়ের গলাটা ওর অদ্ভুত লাগল।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে গোরা দেখতে পেল, মহাপ্রভুর ছবির সামনে বসে মা হাপুস নয়নে কাঁদছে। গোরা অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে মা? কাঁদছ কেন? আমায় বলো।'

বেশ কয়েকবার প্রশ্নটা করার পরও মা চুপ। চোখ দিয়ে অনবরত জল বেরিয়েই আসছে। অবশেষে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে মা বলল, 'চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন তোকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে বাবা।'

গোরা মেঝেতে বসে বলল, 'বেশ যাব। ওই দিন কি তোমার কোনও ব্রত আছে?'

'না, বাবা। ওই দিন তোর চব্বিশ বছর পূর্ণ হবে।'

শুনে গোরা অবাকই হল। ছোটবেলা থেকে ও শুনে আসছে, ওর জন্ম হয়েছিল ফাল্গুন মাসে এক পূর্ণিমার দিন। তা হলে মা কেন বলছে, চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ওর চব্বিশ বছর পূর্ণ হবে? প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই মা বলল, 'যা বলছি, আগে মন দিয়ে তা শোন। এই সপ্তাহ খানেক আগে....একদিন ভোর বেলায় ঠাকুরের ফুল তুলতে গেছি, হঠাৎ দেখি, বাগানে দু'জন সাধু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। আমার দিতে তাকিয়ে ওঁরা মিটিমিটি হাসছেন। আমি গড় হয়ে প্রণাম করতেই, ওঁদের একজন বললেন, কী রে....চিনতে পারছিস? অনেক বছর আগে তোর এই বাড়িতে, আমরা একবার এসেছিলাম। মনে পড়ছে? তোর ছেলে তখন জ্বরে প্রায় মরমর। আমরা এসে ওকে ভাল করে দিলাম।'

সেইদিনকার অলৌকিক ঘটনাটার কথা গোরার খুব ভাল মনে আছে। দুই সাধু মিলে একশো বালতি জল ঢেলেছিলেন ওর শরীরে। শ্বাসরোধ করে ও বলল, 'সাধুরা কেন এসেছিলেন মা?'

মা বলল, 'সেই কথাটা জানাতেই তো....আরও তোর কাছে ছুটে এলাম। ওঁরা বললেন চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন তোর ছেলেকে এখানে থাকতে বলবি। ওকে আমাদের খুব দরকার। শুনে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। কোনও রকমে জানতে চাইলাম, ছেলেকে আপনাদের কী দরকার বাবা? একজন বললেন, ভয় পাস না। ওর কানে আমরা একটা মন্ত্র দিয়ে যাব। তার ঠিক এক বছর পর ফের আসব। তখন ওকে নিয়ে যাব আমাদের গোপন ডেরায়। কথাটা তুই আর কাউকে বলবি না। বললে ভস্ম হয়ে যাবি।'

মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনই ডোর বেলটা বেজে উঠল। তার মানে টুবাইরা এসে গেছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই গোরা দেখল, না, টুবাইরা নয়। সামনে দাঁড়িয়ে ভাগবত মন্দিরের মোহান্তজি।

বিষ খাইয়ে কাউকে মারতে চায় না পুরন্দর। কারণ, খুন করার রোমাঞ্চটাই তাতে পাওয়া যায় না।

দূর থেকে খুন করার দু'টো বিদ্যে পুরন্দর আয়ত্ত করেছে। এক, সরু নাইলনের দড়ির ফাঁস দিয়ে। দুই, মুখে ব্লো পাইপ দিয়ে, বিষমেশানো সূঁচ ছুড়ে। নিখুঁত নিশানায় ঘাড়ের কাছে বিশেষ একটা জায়গায় সেই সূঁচ ঢুকে যাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। মায়াপুরে এক বিদেশিকে ঠিক এই কৌশলেই পুরন্দর মেরেছে মাস দুয়েক আগে। বিদেশি লোকটা ছিল ছ'ফুট লম্বা আর বলশালী। শক্তিতে কবজা করতে পারবে না বলে, পুরন্দর কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। চোখের সামনে গঙ্গার ধারে ছটফট করতে করতে লোকটা মারা গেছিল। সন্ধের সময়, গঙ্গার ধারে তখন লোকজন কম। হাতে একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে লোকটা খেয়াঘাটের দিকে যাচ্ছিল। হেড কোয়াটার্স থেকে পুরন্দরকে বলা হয়েছিল, শুধু এই অ্যাটাচি কেসটা দরকার। ওটা পৌঁছে দিতে হবে, কলকাতায়......বড়বাজারের এক মন্দিরে।

ভ্যান রিকশায় পা গুটিয়ে পুরন্দর বসে আছে। হঠাৎ দেখল, কৌশিক বলে ছেলেটার সঙ্গে জয়দেব বেরিয়ে আসছে। রাত প্রায় ন'টা। ভ্যান রিকশা থেকে নেমে, পুরন্দর ওদের পিছু নিল। ও জানে, দু'জনে কথা বলতে বলতে সোজা যাবে মহাত্মা গাঁধী স্টেশনে। তারপর দক্ষিণগামী ট্রেনে উঠবে। জয়দেব নেমে পড়বে টালিগঞ্জে মহানায়ক স্টেশনে। অটো রিকশা ধরে চলে যাবে বেহালা চৌরাস্তা। এটাই ওদের রোজকার রুটিন। পুরন্দর মনস্থির করে নিল। আর দেরি নয়, কাজটা আজই সেরে ফেলতে হবে। পাতাল রেলে নেমে এদিক ওদিক লক্ষ রাখতে গিয়ে পুরন্দরের হঠাৎ মনে হল, শুধু ও নয়, আরও একজন জয়দেবকে ফলো করছে। কোথায় যেন এই লোকটাকে আরও দু'তিনবার ও দেখেছে।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন খুব কম। ট্রেন ঢোকার আলো এগিয়ে আসতে দেখে, জয়দেব আর কৌশিক প্ল্যাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা কথা বলায় মশগুল। এই সময় পুরন্দর দেখল, পিছু-নেওয়া লোকটা ঠিক জয়দেবের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রেনে ওঠার আগে ছুটোপাটির ভঙ্গি করে, সামান্য ধাক্কা দিলেই, জয়দেব পড়ে যাবে লাইনের ওপর। ওর ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাবে। সেটা বুঝতে পেরেই এক লাফে জয়দেবের কাছে পৌঁছে গেল পুরন্দর। না, ওর শিকার অন্যের হাতে ছাড়বে না। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পিছু-নেওয়া লোকটাকে এক হ্যাঁচকায় ও সরিয়ে আনল। লোকটা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর সঙ্গে মোকাবিলা করার আগে, ডানদিকে তাকিয়ে পুরন্দর দেখল, দরজা দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কামরায় ঢুকে জয়দেব আর কৌশিক তখনও কথা বলে যাচ্ছে।

পুরন্দর হাতাহাতি করার জন্য তৈরিই ছিল। কিন্তু দেখল, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে, লোকটা পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করল। তারপর সুইচ টিপে কথা বলতে লাগল কারও সঙ্গে। কথা বলতে বলতেই লোকটা ওর দিকে তাকাচ্ছে। এরই মধ্যে উত্তরমুখী একটা

ট্রেন এসে চলে গেল। প্ল্যাটফর্মে লোকজন নেই। দু'তিনজন সুইপার জল ঢেলে, ধোয়া-মোছার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার মানে পরের ট্রেনটাই শেষ ট্রেন। তাতে অবশ্য পুরন্দরের কিছু আসে-যায় না। সারাটা রাত পড়ে রয়েছে ওর জন্য। কাজটা তো ও সারবে রাত আড়াইটা-তিনটে নাগাদ। কিংবা তারও পরে। জয়দেবের মতো লেখাপড়া জানা লোকেরা তাড়াতাড়ি শোয় না। তেমনি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেও না। সবথেকে ভাল হয়, ওর চিলেকোঠার ঘরে দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে, ভোর রাতে খুন করে চলে আসা। কথাটা ভাবতেই পুরন্দরের হাসি পেল। এই রকম অভিনব খুন ও আগে কখনও করেনি। তখনই ও দেখল, জয়দেবের পিছু-নেওয়া লোকটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দেখে ও নিশ্চিন্ত হল।

রাত এগারোটা সময় জয়দেবের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই পুরন্দরের চোখে পড়ল, একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের জিপ কি না, ও বুঝতে পারল না। পুলিশ আসুক অথবা অন্য কেউ, নিশ্চয়ই সারা রাত্তির থাকবে না। নিজের প্ল্যানমাফিক ও রেনপাইপ দিয়ে ছাদে উঠে গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আশপাশ একেবারে নিঃঝুম। হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের দরজার কাছে গিয়ে পুরন্দর বুঝতে পারল, দরজা খোলাই আছে। পা টিপে টিপে ও সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে এল। জয়দেবের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ও কথা বলছে কারও সঙ্গে। কী বলছে, পুরন্দর তা শোনার চেষ্টা করল। দীর্ঘদিন পাতাল ঘরে থাকার জন্য দু'টো ইন্দ্রিয় ওর খুব সজাগ। অন্ধকারেও দেখতে পায়। দূরের কথা শুনতে পায়। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ও কান উৎকীর্ণ করে রইল, বোঝার জন্য, জয়দেব কার সঙ্গে কথা বলছে।

জয়দেব বলল, 'তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না কিঙ্কর। লোকটা যে আজ আমার পিছু নিয়েছে, কই আমি তো কিছু টের পাইনি?'

কিঙ্কর বলে লোকটা উত্তর দিল, 'তুই বুঝবি কী করে? আমার ওয়াচার তোর সঙ্গে ছিল। পাতাল রেলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল...যে লোকটা তোকে খুন করতে চায়। আমার ধারণা, ও আজ রাতেই চেষ্টা করবে। আশপাশে কোথাও আছে। আমি বেহালা থানাকে বলে দিয়েছি। ওরা রাতের দিকে লোক পাঠাবে।'

'কিঙ্কর, আমার মনে হয়, তুই অযথা উতলা হচ্ছিস।'

'না জয়, অযথা নয়। লোকটা কী জেঞ্জারাস টাইপের, তুই আন্দাজ করতে পারছিস না। গত দু'মাসের মধ্যে ও তিন তিনটে মার্ডার করেছে। বুঝতে পারছিস লোকটা কী ধরনের?'

ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে পুরন্দর সব কথাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। কিঙ্কর তা হলে পুলিশের লোক! তা হলে এই কিঙ্করই, জয়দেবকে সাবধান করে দিয়েছে। ওর কথামতো বেহালা থানা যদি ওয়াচার পাঠায়, তা হলে আজও চুপচাপ ফিরে যেতে হবে পুরন্দরকে। পুলিশ যে ওকে তাড়া করেছে, সেটা হেড কোয়ার্টার্সের কথায় বুঝতে পাচ্ছিল ও। এখন তো দেখছে, পুলিশ সবকিছুই জানে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও শুনতে লাগল কিঙ্করের কথাগুলো।

'লোকটার স্কেচ আঁকানোর কথা আমি সেদিন তোকে বলেছিলাম। আজ সেই স্কেচটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দ্যাখ তো, এই মুখ কোথাও দেখেছিস কি না?'

কয়েক সেকেন্ড পর জয়দেব চেঁচিয়ে উঠল, 'মাই গুডনেস, আরে....এই লোকটাকে তো দু'তিনদিন ধরে দেখছি! ভ্যান রিকশা চালায়। গোপাল জেঠুর দোকানের সামনে আজও বসেছিল। ইস্, আগে এই ছবিটা তুই দেখালে, শুয়ারের বাচ্চাটার গলা আজই টিপে ধরতাম।'

'তার মানেটা তুই বুঝছিস। তোর চোখের সামনে রয়েছে লোকটা। অথচ তোর চোখে ধুলো দিয়ে। আমি সিওর ভাই, তোর দোকানে আগুন লাগিয়েছিল এই লোকটাই। আমি একটা কাজ করছি। কালই টিভি চ্যানেলে এই ছবিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি সন্ধান দিতে পারে, তা হলে পুরস্কার দেব।'

কথাগুলো শুনে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াল না পুরন্দর। আর দেরি করা ঠিক হবে না। কিঙ্কর থাকতে থাকতেই এ পাড়া থেকে ওর বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এর পরই বেহালা থানা পুলিশ পাঠাবে। গলি থেকে বেরনো তখন মুশকিল হয়ে যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে ছাদে উঠে, রেনপাইপে দিয়ে পুরন্দর রাস্তায় নেমে এল। দূরে রাস্তার ধারে আলো জ্বালিয়ে ক্যারাম খেলছে ক্লাবের ছেলেরা। তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, মুখ আড়াল করল পুরন্দর। মুখটা কাউকেই আর চেনাবে না। খুব ভুল করেছে ও। হোটেল মেনকায় সেদিন অম্বালিকাকে ডেকে। ওর মুখ অনেকেই সেদিন দেখে ফেলেছিল।

রাত প্রায় একটা সময় কলুটোলার বস্তিতে ফিরে পুরন্দর শুনল, মোহান্তি নেই। রান্নার কাজ নিয়ে ব্যারাকপুরে কোন এক বিয়েবাড়িতে গেছিল। কাল সকালের আগে সে ফিরতে পারবে না। ওর বউ ফুলি দরজা খুলে দেওয়ার পর, ফিক করে হেসে খবরটা দিল। দু'দিন ফুলির দিকে পুরন্দর ভাল করে তাকায়নি। ওকে হাসতে দেখে পুরন্দরের শরীরটা শিরশির করতে লাগল। ফুলির পরনে কমদামি ছোপছোপ শাড়ি। ওড়িয়া মেয়েদের মতো কাছা মেরে পরা। মাংসল দুই উরুতে শাড়ি লেপ্টে রয়েছে। নাকে বড় বাসনি, কানে তাতঙ্কা। মুখে বোধহয় স্নোপাউডার জাতীয় কিছু মেখেছে। দেখতে মন্দ লাগছে না ওকে। পলকে মন্দিরের মাহেলিদের কথা মনে পড়ে গেল পুরন্দরের। দুই অম্বালিকার কথাও। ও দেখল, দরজা খোলা রেখেই, কোমর দুলিয়ে ফুলি ঘরে ঢুকে গেল। দেখে পুরন্দর আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

নিজের ঘরে না ঢুকে, মোহান্তির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পুরন্দর একবার আশপাশে তাকিয়ে নিল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। বস্তির কোনও ঘরে কেউ জেগে নেই। কেউ ওকে দেখেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে, পুরন্দর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মোহান্তির এই ঘরে আগে ও ঢোকেনি। কুলুঙ্গিতে ছোট্ট লম্ফ জ্বলছে। স্বল্প আলোয় প্রথমেই ও দেখতে পেল, চৌকির ওপর নিপাট বিছানা। সারা ঘরে অসংখ্য জিনিসপত্তর, আলোছায়ায় একাকার হয়ে গেছে। ফুলি চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দরকার?'

দরজায় খিল লাগিয়ে পুরন্দর বলল, 'তোমাকে।' কথাটা বলেই পাঁজাকোলা করে

ও তুলে নিল ফুলিকে। সময় নষ্ট না করে, ওর দুই স্তনের মাঝখানে মুখ ঘষতে লাগল। মিনিট খানেকের মধ্যেই, পুরন্দর টের পেল, ফুলির দেহটা গরম হয়ে গেছে। ঠোঁট দু'টো ফাঁক করে, ও চোখ বুজে রয়েছে। ঠোঁটে দীর্ঘচুম্বন দিয়ে, চৌকির ওপর ওকে শুইয়ে দিল পুরন্দর। তারপর নিজের পোশাক খুলতে লাগল। ওর ফর্সা নগ্নদেহটা দেখতে দেখতে ফুলি অবাক চোখে উঠে বসেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ফুলি, নিজেকে নগ্ন করে, আদুরে গলায় বলল, 'লম্ফটা নিভিয়ে দাও না গো।'

লম্ফ নেভানোর জন্য কুলুঙ্গির সামনে গিয়েই পুরন্দর চমকে উঠল। পুজোর আসনে শ্রীচৈতন্যদেবের বাঁধানো ছবি। ফুলের মালা ঝুলছে, ধূপদানিতে আধপোড়া ধূপ। মোহান্তিরা তা হলে এই লোকটাকে পুজো করে? উৎকলবাসী অসংখ্য মূর্খের মতো, ফুলিরাও এই ধাপ্পাবাজের শিকার? ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠল পুরন্দরের। তখনই ঠিক করে নিল, ফুলিকে নির্মমভাবে মারবে। পাশ ফিরে ও দেখল, নগ্ন পা দু'টো ছড়িয়ে ফুলি শুয়ে আছে। বিবাহিতা নারী, যৌন ছলাকলায় অভ্যস্ত। ওর ওপর পাশবিক অত্যাচারের প্রস্তুতি নিয়ে, লম্ফটা নিভিয়ে দিল পুরন্দর। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিছানার এক পাশে ফুলির কাঁচুলি পড়ে আছে। প্রথমেই সেটা ওর মুখের ভেতর গুঁজে দিল। যাতে চিৎকার করতে না পারে। তারপর থাবা বসাল দুই স্তনে। নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। ফুলির চোখমুখে আতঙ্ক দেখে খুশি হল পুরন্দর। ওকে আরও যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরে ওর জ্বালা মেটাতে লাগল। নাক কেটে বাসনি খুলে পড়েছে। নাক আর ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। বিছানা থেকে উঠে পড়ার জন্য ফুলি ছটফট করছে। দু'হাত দিয়ে ও প্রাণপণ ঠেলছে পুরন্দরকে। কিন্তু পারবে কেন? পুরন্দরের গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি। একটা সময় ফুলির গোঁগানি বন্ধ হয়ে গেল। আর তখনই পুরন্দর রতিক্রিয়া শুরু করল।

তৃপ্ত হওয়ার পর, ফুলির মৃতদেহ ফেলে রেখে পুরন্দর যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখন এক ছায়ামূর্তিকে দেখে ও চমকে উঠল। কদাকার এক বুড়ি, হাত পেতে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

ছাব্বিশ

হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোরা ফোন পেল তরুণ মাজির। হাওড়া ব্রিজের ওপর তখন বেশ জ্যাম। বাস-ট্যাক্সির হর্নের আওয়াজে ও তরুণের কথা ভাল করে শুনতে পাচ্ছিল না। ট্যাক্সির জানলার কাচ তুলে দেওয়ার পর ও বলল, 'হ্যাঁ এ বার বলো। শুনতে পাচ্ছি।'

তরুণ বেশ উত্তেজিত, 'গোরাদা, শুনলাম পুলিশ নাকি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে?'

পার্টির স্যুভেনিরে রাজ্যপালের মেসেজ জালিয়াতির সেই অভিযোগ। তা হলে নিচু তলার কর্মীদের কানেও গেছে? গোরা জিজ্ঞেস করল, 'কার কাছে শুনলে?'

'আমাদের বুধিরাম কাল বোসপুকুরে গেছিল। ওখানেই শুনে এসেছে। অদ্বৈতবাবু কিন্তু নোংরা খেলায় নেমেছেন গোরাদা। আমরা বরদাস্ত করব না।'

'তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে তরুণ। অদ্বৈতবাবুর দোষটা কোথায়? আসল কালপ্রিট তো ভৈরব।'

'খবরটা শোনার পর আমি ভৈরবকে ফোন করেছিলাম। ও বলল, কিছুই জানে না। রাজ্যপালের মেসেজটা এনে দিয়েছিলেন সনাতনবাবু। সেটা আসল কী নকল, ভাবনা-চিন্তা করার কথা ওর মাথাতেই আসেনি। ভৈরব বলল, দরকার হলে পুলিশের কাছে নিজে গিয়ে সনাতনবাবুর নাম করবে।'

মাস দুয়েক আগে সনাতনবাবু মারা গেছেন। গোরা বুঝতে পারল, ভৈরব ইচ্ছে করেই এমন একটা লোকের নাম তরুণের কাছে করেছে, যার কাছে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার উপায় নেই। তরুণ অহেতুক রাগ করছে অদ্বৈতবাবুর ওপর। উনি ব্রাহ্মণ বলে তরুণরা ওঁকে সহ্য করতে পারে না। ইদানীং প্রকাশ্যেই বলে, দলিতদের নেতৃত্ব দলিতদের হাতেই থাকা উচিত। ওকে ঠাণ্ডা করার জন্যই গোরা বলল, 'তোমরা মাথা গরম কোরো না। যা করার আমি করছি।'

'মাথা গরম হবে না কেন বলুন? অবরোধের সেই ঘটনার পর থেকেই, আপনার পেছনে লেগে রয়েছেন চিফ সেক্রেটারি নপরাজিত চক্রবর্তী। আমরা সব জানি। আর নপরাজিতবাবু কে জানেন? অদ্বৈতবাবুর রিলেটিভ। নপরাজিতবাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অদ্বৈতবাবুর এক ভাগ্নীর। ওদের রিলেশনশিপের কথা কি আপনি জানতেন?'

শুনে একটু অবাকই হল গোরা। দুপুরে নপরাজিতবাবুকে নিয়ে অতক্ষণ কথা হল পার্টি অফিসে। অথচ অদ্বৈতবাবু একবারও বললেন না, চিফ সেক্রেটারি ওর রিলেটিভ হন। উত্তরটা সরাসরি না-দিয়ে গোরা বলল, 'আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তরুণ। প্লিজ, এ নিয়ে জলঘোলা কোরো না।'

তরুণ বলল, 'পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে, তা হলে কাল এক লাখ লোক জড়ো করে আমি ভবানী ভবন ঘেরাও করব। মারদাঙ্গা হয়, হবে। আপনাকে বলে রাখলাম।'

কথা বলতে ভাল লাগছিল না। গোরা বাধ্য হয়ে বলল, 'আমার পারমিশন ছাড়া তোমরা কিচ্ছু করবে না। কেসটা কীভাবে ট্যাকল করা যায়, আমি ভেবে রাখছি। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'আপনি কিন্তু সফট স্ট্যান্ড নেবেন না।'

'প্লিজ তরুণ....আমি খুব টায়ার্ড। ভুবনেশ্বর থেকে আজ আমার মা এসেছিলেন। তাঁকে এইমাত্র ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। মন এমনিতেই ভাল নেই। পরে কথা বলা যাবে।

এখন ছাড়ি, কেমন?' বলেই গোরা ফোনটা কেটে দিল।

সারাটা দিন খুব ধকল গেছে। ট্যাক্সিতে সিটের পেছনে মাথা এলিয়ে দিল গোরা। মায়ের কথাই প্রথমে ওর মাথায় এল। দুপুরে খুব কান্নাকাটি করছিল মা। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর হাসিমুখেই গেছে। আসলে আজ ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ভাগবত মন্দিরের মোহান্তজি। মায়ের সামনে উনি এমন প্রশংসা করে গেছেন যে, ওর সম্পর্কে মায়ের ধারণা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে। ও যে রাজনীতি করে, সেটা তো আর মোহান্তজি জানেন না। মাঝে মাঝে ওর ভাগবত মন্দিরে গিয়ে বসে থাকার কথাই.....মোহান্তজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছেন। একটা সময় উনি এমন কথাও বললেন, 'আপনার ছেলে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর মা। মন্দিরে যখন উনি যান, তখন চারদিক আলো হয়ে যায়। আপনি মা সাক্ষাৎ শচী দেবী।'

মায়ের মুখটা তখন আনন্দে ভরে গেছিল। মা বলেছিল, 'ও যে ভাগবত মন্দিরে যাতায়াত করে, তা তো কখনও আমায় বলেনি?'

'আজ থেকে নাকি? চার-পাঁচ বছর হবে। ওঁকে আমি প্রথমদিন দেখেই চিনেছি মা। সে এক অলৌকিক কাণ্ড। আপনার জানা উচিত। আমাদের মন্দিরের বাইরে তখন প্রায়ই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত অসুস্থ এক বুড়ো। রাধাগোবিন্দর কাছে নিত্যি প্রার্থনা করত, দয়া করো। আপনার ছেলে প্রথম যেদিন মন্দিরে ঢুকলেন, সেদিন বসে আমি জপ করছি। আর দেখে ভাবছি, কে এলেন গৌরাঙ্গ? উনি তো প্রণাম সেরে চলে গেলেন। তারপরেই দেখি, সেই বুড়ো লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। বলে কি না, মোহান্তজি, আমি ভাল হয়ে গেছি। সাক্ষাৎ গোবিন্দ এসেছিলেন। বাইরে রোদ্দুরে শুয়েছিলাম। তাঁর ছায়া আমার গায়ে পড়তেই, আমি ভাল হয়ে গেলাম। হরে কৃষ্ণ। সেই দিন থেকেই আপনার ছেলেকে আমি মোহান্তজি বলে ডাকি।'

মোহান্তজির কথা শুনে গোরা হাসবে কী কাঁদবে, বুঝতে পারছিল না। স্রেফ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ও চুপ করে গেছিল। কী ধর্মান্ধ এই দেশ! মন্দির-মসজিদ থেকে যা কিছু প্রচার করা হয়, মানুষ তা নির্বিবাদে মেনে নেয়। ওর ছায়া লেগে একজন অসুস্থ লোক ভাল হয়ে গেছে, এটা কি বিশ্বাস করা যায়? এ তো ভাঁওতা। মন্দিরের মাহাত্ম্য প্রচারের একটা কৌশল মাত্র। যে মন্দির নিয়ে গল্পগাথা যত বেশি, লোকজনের ভিড়ও সেখানে তত বেশি। এ সব বুজরুকি গোরার সহ্য হয় না। মা কিন্তু মোহান্তজির সব কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। তখনও গোরা বুঝতে পারেনি, অনাহুত হয়ে মোহান্তজি কেন ওর বাড়িতে এসেছেন? পরে সেটা বুঝতে পেরেছিল।

কথায় কথায় একসময় মোহান্তজি বললেন, 'আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছিলাম।'

গোরা বলেছিল, 'কী বলুন?'

'কাল সকালে নগর সংকীর্তন আছে। আপনাকে আসতেই হবে। প্রতি বছর মন্দিরের

তরফে একবারই আমরা পথপরিক্রমা করি। এই অঞ্চলের অনেক বিশিষ্ট মানুষ আসবেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আপনি এলে সবাই খুব খুশি হবেন মোহান্ত।'

বাবা বেঁচে থাকতে, ছোটবেলায় বেশ কয়েকবার নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছে গোরা। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। এখন ও সক্রিয় রাজনীতিতে এসে গেছে। ওর পক্ষে এখন কি এ সব করা উচিত? গোরা না করে দিতে যাচ্ছিল। মা বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই যাবে। বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে যাবে না মানে? থাকলে আমিও ওর সঙ্গে যেতাম। ভুবনেশ্বরে প্রতি পালাপার্বণে আমরা নগর সংকীর্তনে বেরোই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মোহান্তজি, আমার ছেলে যাবে।'

শুনে মোহান্তজি উঠে পড়েছিলেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল। ভোর পাঁচটায় মন্দিরে পৌঁছতে হবে। এ বার পুলিশের পারমিশন নিয়ে রেখেছি। প্রচুর লোকজন হবে কি না। চলি মা। জয় রাধে।'

মায়ের কথা অগ্রাহ্য করা যাবে না। সংকীর্তনে ওকে যেতেই হবে। ভোর পাঁচটায় মন্দিরে পৌঁছতে হবে মানে, ঘুম থেকে ওকে উঠতে হবে ঘণ্টাখানেক আগে। তার মানে ঘণ্টা তিনেকের বেশি ঘুম হবে না। রাতে টানা ছ'ঘণ্টা ঘুম না হলে গোরার শরীর পরদিন ম্যাজম্যাজ করে। কিন্তু মায়ের আদেশ, কী আর করা যাবে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই ও দেখল, ট্যাক্সি বাড়ির কাছে এসে গেছে। ভাড়া মিটিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় ও শুনতে পেল, রাসবিহারীবাবুর ফ্ল্যাটে কথাকাটাকাটি হচ্ছে। রাতে মদ্যপান করে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করা রাসবিহারীবাবুর স্বভাব। পরদিন সকালে কিন্তু উনি একেবারে ভালমানুষ।

ঘরে ঢুকে গোরা কথাটা মুকুন্দকে বলে রাখল। 'ঘড়িতে তুই অ্যালার্ম দিয়ে রাখিস। কাল ভোর পাঁচটায় আমায় বেরোতে হবে।' কেন, কোথায়....সে প্রশ্ন নেই। মুকুন্দকে এই কারণেই এখন ভাল লাগে গোরার। পোশাক ছেড়ে ও যখন ডাইনিং টেবলে এসে বসল, তখন রাত প্রায় বারোটা। এত রাতে দুধ ছাড়া আর কিছু গোরা খাবে না। মুকুন্দ সেটা জানে। কিছু বলার আগেই আজকাল ও সবকিছু হাতের সামনে জোগান দিয়ে যায়। হাই তুলতে তুলতে ডাইনিং স্পেসে এল মুকুন্দ। ওর একহাতে দুধের গ্লাস, অন্য হাতে মিষ্টিভরা ডিশ। বলল, 'খাজা গজাগুলো আমার মা....করে পাঠিয়েছে। বলেছে, আগে গোরাচাঁদকে দিবি। তারপর তুই খাবি। আপনি মুখে দিন। তারপর প্রসাদ নেব।'

শুনে কৌতুক বোধ করল গোরা। বলল, 'প্রসাদ নিবি মানে? আমি কি ঠাকুর দেবতা নাকি?'

'আপনি তার থেকেও বেশি। আজ ভোরে সেটা বুঝতে পারলাম।'

বহুদিন ও খাজা গজা খায়নি। ডিশ থেকে তুলে জিভে গজা মুখে দিতেই গোরার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ল। তখন কাড়াকাড়ি করে গজা খেত। এই ধরনের গজা পুরীতে প্রসাদ হিসাবে বিক্রি হয়। আরও অনেক রকমের মিষ্টি আছে। ননী গজা, মুঠি গজা, ক্ষীরের গজা, আরসা পিঠে, পনির আর বুন্দিয়া লাড্ডু, জগন্নাথবল্লভ নোনতা। চুরি

করে প্রসাদ খাওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রচুর পিটুনি খেয়েছে গোরা। একটা সময় ওর পেটে কৃমি হয়ে গেছিল। কথাটা মনে পড়তেই ও মৃদু হাসল।

দেখে মুকুন্দ বলল, 'হাসলেন যে? কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি? শুনলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন।'

গোরা বলল, 'কী এমন কথা, শুনি।'

'ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। জল তেষ্টা পাচ্ছে। ফ্রিজ থেকে বোতল আনার জন্য আপনার ঘরে ঢুকছি। হঠাৎ বিছানার দিকে নজর পড়তেই দেখি, একটা সাধু আপনার মাথার কাছে বসে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে গোরাদা। সত্যি, দেখেছি। সাধুটা হাত নেড়ে আমাকে চলে যেতে বলল। আমি স্পষ্ট দেখলাম। ভয়ে......তখন দৌড়ে আমি পালিয়ে এলাম।'

শুনে গোরা হাসতে হাসতে বলল, 'কথাটা আর কাউকে বলিস না। বললে তোকে পাগল বলবে। নিশ্চয়ই তুই স্বপ্ন দেখেছিস?'

'না গোরাদা স্বপ্ন নয়। রাধাগোবিন্দের নামে শপথ করছি। সত্যি, সেই সাধুটা বসে বসে আপনাকে পাহারা দিচ্ছিল। তাঁর চোখ দু'টো খুব জ্বলজ্বল করছিল। একেবারে বাঘের চোখের মতো।'

'বাঘের চোখ তুই দেখেছিস?'

'কেন দেখব না? অ্যানিমেল প্ল্যানেট চ্যানেলে তো রোজই দেখায়। রাত্তিরে বাঘের চোখে চোখ পড়লে লোকে নাকি হিপনোটাইজড হয়ে যায়।'

'আমার সেই গার্ডের ড্রেসটা কী রকম ছিল রে?'

'গেরুয়া কালারের। ন্যাড়া মাথা, গলায় সাদা ফুলের মালা। হাতে একটা লাঠি।'

মুকুন্দর সঙ্গে মজা করতে করতেই খাওয়া শেষ করে গোরা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'যত সব বোগাস কথাবার্তা। যাক গে, কাল ভোরে তুই কিন্তু আমার সঙ্গে বেরোবি। উঠেই স্নান-টান সেরে ফেলিস। তোর জন্য আমার যেন দেরি না হয়।'

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বজ্রাসন করার অভ্যেস গোরার। পাঁচ-সাত মিনিট এই আসনটা করলে হজম ভাল হয়। ঘরে ঢুকে ও দেখল, মুকুন্দ মেঝেতে কম্বল পেতে রেখেছে। রোজ এই কম্বলের ওপর বজ্রাসনে বসে গোরা ঠিক করে ফেলে, পরের দিনে ওকে কী কী করতে হবে। আজও সেটা ভাবতে লাগল। কাল নগর সংকীর্তন থেকে ফিরে আসার পরই ওকে একবার ইউনিভার্সিটি যেতে হবে। দু'দিন ও ইচ্ছে করেই যায়নি। ইউনিভার্সিটিতে সেই ডিবেট ছিল বলে। বিপ্লবকে ও কথা দিয়েছিল, ডিবেটে অংশ নেবে না। বলেছিল, ওকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে। ডিবেটে কে জিতল, তা জানার কৌতূহল হল গোরার। নিশ্চয়ই বিপ্লব জিতেছে। এবং জেতার জন্য কিউবাতে যাওয়ারও সুযোগ পাবে। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। থাকলে ফোন করে, জেতার খবরটা জানাত।

বজ্রাসন শেষ করে গোরা প্রাণায়াম শুরু করে। অনুলোম-বিলোম। একেবারে শেষে

শবাসন। তার পরই কখন ওর ঘুম এসে যায়, টের পায় না। আজ শবাসন করার সময়ই ও টের পেল, বাইরে পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ধারে একতলায় ওদের ফ্ল্যাটে। ধুলোর জন্য দরজা জানালা সবসময় ওরা বন্ধ রাখে। তা সত্ত্বেও, রাস্তায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ভেতর থেকে। পুলিশ ভ্যানের ইঞ্জিন গমগম করছে। দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। চার পাঁচজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। হঠাৎই ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গোরা ধরেই নিল, পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করতে এসেছে। দুপুরে অদ্বৈতবাবু বলেছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ওকে থানায় ডাকতে পারে। অ্যারেস্ট করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু হ্যারাস করার যদি ইচ্ছে থাকে, তা হলে পুলিশ সবকিছুই করতে পারে। অদ্বৈতবাবুকে একবার ফোন করে জানিয়ে দিলে ভাল হত। কিন্তু দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, রাত প্রায় একটা। এত রাতে বয়স্ক ওই মানুষটাকে ডিসটার্ব করার কোনও মানে হয় না।

ডোর বেলের অপেক্ষায় গোরা শুয়ে রইল। মোহান্তজির নগর সংকীর্তনে ওর আর যাওয়া হবে না। উনি কী ভাববেন, কে জানে? ও যেতে পারেনি কেন, সেটা অবশ্য মোহান্তজি পরে জেনে যাবেন। খবরটা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখাবে। আজ পর্যন্ত কোনওদিন পুলিশের ঝামেলায় গোরাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু ও জানে, রাজনীতি করতে নেমেছে, একদিন না একদিন ওকে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে নামতেই হবে। পুলিশ সম্পর্কে এমনিতেই ওর ধারণা খুব খারাপ। দলিতদের সঙ্গে মেশে বলেই, গোরা জানে, সমাজটা আরও সুন্দর হত, পুলিশ প্রশাসন যদি দুর্নীতিগ্রস্ত না হত। দলিতদের দুর্দশার বড় কারণ, পুলিশের অত্যাচার। দলিতদের বিদ্রোহের সবথেকে বড় কারণও পুলিশ। দলিতরা ন্যায় বিচার পায় না। তরুণ মাজি ঠিকই বলে, পুলিশ কাজ করে উচ্চবর্ণের মানুষদের স্বার্থরক্ষার জন্য। ওদের নিরাপত্তার জন্য।

.....আধো ঘুম আর জাগরণের মাঝে একটা শব্দে গোরা বিছানায় উঠে বসল। না, ডোর বেলের শব্দ নয়। অ্যালার্ম বেল। দেওয়াল ঘড়িতে চারটে দশ। মুকুন্দকে বিছানা থেকে তুলে দিয়ে ও স্নান করতে ঢুকে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে, ও যখন দরজায় তালা দিচ্ছে, তখন পাশের ফ্ল্যাট থেকে খুট করে একটা শব্দ হল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাসবিহারীবাবু। উদভ্রান্তের মতো মুখ, রাসবিহারীবাবু বললেন, 'সাধুরা সব চলে গেছে গোরাভাই?'

বুঝতে না পেরে গোরা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। কোন সাধুদের কথা বলছেন?'

'আরে....রাত্তিরবেলায় আমাদের এই বাড়ির সামনে যে সাধুরা এসেছিল। আপনি তাঁদের দেখেননি? এক আধজন নয়। রাস্তায় সাধু গিজগিজ করছিল যে।'

'না, আমি তো তাঁদের দেখিনি।'

'সে কী? আপনার কাছে যে পুলিশ এসেছিল, সেটা জানেন? না কি তাদেরও দেখেননি?'

'পুলিশের একটা ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটা টের পেয়েছিলাম। তারপর আর জানি না।'

'আশ্চর্য, দরজার বাইরে এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ আপনি কিছুই জানতে পারেননি? পুলিশ আপনার ঘরে ঢুকতে চাইছিল। সাধুরা হঠাৎ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার দু'পাশে দুই সাধু দাঁড়িয়ে, মিনিমাম সাড়ে সাত ফুট লম্বা। কী তেজ তাঁদের! হাতে বিরাট বিরাট ত্রিশূল। উঁচিয়ে ধরতেই পুলিশের বীরত্ব শেষ। মিনিটে মিনিটে সাধুদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আমি তো ভাবলাম, এ বার দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ লেজ গুটিয়ে পালাল।'

শুনে মুকুন্দর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। কিন্তু মাতাল রাসবিহারীবাবুকে গোরা চেনে। ওর মন বলল, এ সব অত্যধিক মদ্যপানের কুফল। ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ঠিক দেখেছেন?'

'আমি পাপী তাপী মানুষ। মদ ফদ খাই। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করায় রাতে ঘুম আসছিল না। বারান্দায় বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি, সাধুরা একে একে জড়ো হচ্ছে। ভাবলাম, বোধহয় কোনও সিরিয়ালের শুটিং চলছে। পরে বুঝলাম, তা তো নয়। বউকে ডেকে তুললাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব দেখে বউকে বললাম, দেখো, আমরা কোন মহাপুরুষের প্রতিবেশী। কই গো বলো, কাল রাতে কী দেখেছ।'

দরজার গোড়ায় রাসবিহারীবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন। আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। গোরা বুঝতে পারল না ওর কী করা উচিত। হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের সামনে বসে পড়লেন রাসবিহারীবাবু। কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে বললেন, 'আমাদের উদ্ধার করো গোরা। তোমার চরণে ঠাঁই দাও।'

সাতাশ

জয়দেব যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় সোয়া দশটা। রবিবার, এই সময়টায় অন্যদিন লোকাল প্যাসেঞ্জারে প্ল্যাটফর্ম গিজগিজ করে। আজ ভিড় কম। চাকা লাগানো ব্যাগটা টানতে টানতে ও এসি থ্রি টায়ারের কামরা খুঁজতে লাগল। ট্রেন ছাড়তে তিরিশ মিনিট এখনও দেরি। এর মধ্যে জলের বোতল ওকে কিনে নিতে হবে। কৌশিককে ও বলল, 'আমাদের একটু ভুল হল। মনে ছিল না, প্ল্যাটফর্ম থেকে দোকান এখন তুলে দিয়েছে। ফের বাইরে গিয়ে মিনারেল ওয়াটার কিনে আনতে হবে।'

কৌশিক বলল, 'আমি যাচ্ছি। এখুনি নিয়ে আসছি।'

কৌশিক চলে যাওয়ার পর জয়দেব এসি থ্রি টায়ার কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। রিজার্ভেশন চার্ট কামরার গায়ে ঝোলানো আছে। সে দিকে, নজর বুলিয়ে ও দেখল, নাঃ

ওর নামটা আছে। পঁচিশ নম্বরে লোয়ার বার্থ দেখে ও খুশি হল। লোয়ার বার্থ ও পছন্দ করে। ট্রেনে সফর করার সময় জয়দেবের আরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে। আশপাশে অবাঙালি পেলে ও স্বচ্ছন্দবোধ করে। সহযাত্রী বাঙালি হলে যেচে আলাপ করে। বকবক শুরু করে। বিশেষ করে, পুরীতে যারা বেড়াতে যায়। সেই কারণে চার্টের দিকে ফের তাকাল জয়দেব। দেখার জন্য, আশপাশে কারা আছে। ঠিক উল্টো দিকে, অর্থাৎ আটাশ নম্বরে আছে বিশ্বম্ভর ভোই বলে একজন। ডান দিকে, মানে জানলার দিকে একত্রিশ নম্বরে ভীমচন্দ্র মহাপাত্র। যাক, পদবি দেখে মনে হচ্ছে, দু'জনই ওড়িয়া। জয়দেব নিশ্চিন্তে কামরায় উঠে এল।

ব্যাগটা বার্থের নীচে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর জয়দেব দেখল, ওদের খোপে একটা পুরো পরিবার আগে থেকে বসে আছে। ওরই বয়সি সুদর্শন একটা ছেলে। সঙ্গে দু'জন তেইশ চব্বিশ বছর বয়সি মেয়ে। একজনের কোলে আবার বাচ্চা। তার সিঁথিতে সিঁদুর। জয়দেব আন্দাজ করে নিল, ছেলেটা বউ এবং অবিবাহিত বোন অথবা শালীকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যাচ্ছে। অবিবাহিত মেয়েটাকে জয়দেব কোথাও দেখেছে বলে মনে হল। দিনকাল পত্রিকায় প্রচুর ছেলে-মেয়ে লেখা দিতে আসে। তাদেরই মধ্যে কেউ নাকি? যদি তাই হয়, তা হলে নিশ্চয় ওকে চিনতে পারবে। ব্যস, লেখা ছাপানোর জন্য তারপর এমন অনুরোধ শুরু করবে, নিশ্চিন্তে ওর পুরী যাওয়ার বারোটা বেজে যাবে। ইস, এদের নামগুলো চার্টে একবার দেখে রাখলে ভাল হত। জয়দেব মনে মনে প্রার্থনা করল, পরিবারটা যেন বাঙালি না হয়। ভোরবেলায় ট্রেন পুরীতে পৌঁছনোর কথা। রাতে এই কয়েকটা ঘণ্টায় যে, কেউ যেন ওকে ডিস্টার্ব না করে।

জানলার দিকে তাকিয়ে জয়দেব প্রতীক্ষা করতে লাগল কৌশিকের। সেই কখন মিনারেল ওয়াটারের বটল কিনতে গেছে। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়। কৌশিক ছেলেটা এত ভাল, সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লেগে রয়েছে। বিশেষ করে, কিঙ্করের সাবধানবাণী শোনার পর থেকে। নিজে বিপদে পড়তে পারে, তা সত্ত্বেও জয়দেবকে একা ছাড়ে না। কৌশিক থাকে সেই নাকতলার কাছে। বেচারা এত রাতে বাড়ি ফিরে যাবে কী করে, তা ভেবে জয়দেব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এত রাতে ও দিকের বাস হাওড়া থেকে পাওয়া যাবে কী না, ও জানে না। ইস, জলের কথা ওকে না বললেই ভালো হত। কিন্তু রাতের দিকে ট্রেনে যদি জল তেষ্টা পায়... পাওয়াটাই স্বাভাবিক... তখন ওকে তো মুশকিলে পড়তে হবে।

প্ল্যাটফর্মে নামবে কী না, জয়দেব যখন ভাবছে, ঠিক তখনই কৌশিকের মুখটা উঁকি দিল। জলের বোতল এগিয়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলল, 'এই নিন জয়দা, আর এক মিনিট দেরি হলে, আপনাকে আর ধরতে পারতাম না। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়েছে।'

মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা হাতে নিয়ে জয়দেব বলল, 'তোমার কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল।' শুনেও যেন শুনল না কৌশিক। বলল, 'পুরীতে পৌঁছেই আমায় কিন্তু খবর দেবেন। আর...একদম চিন্তা করবেন না। এখানকার সব কাজ আমি সামলে নেব।'

'ঠিক আছে। সাবধানে যেও। আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখব। গুড নাইট।'

ট্রেন সবে চলতে শুরু করেছে, জয়দেব দেখল, সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, ফতুয়া গায়ে, ফর্সা একটা লোক লাফিয়ে কামরায় উঠে এল। ওর সঙ্গে ধাক্কায় কৌশিক পড়ে যাচ্ছিল। কোনও রকমে নিজেকে কৌশিক সামলে নিল। ট্রেনে ওঠার পর, লোকটা কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না। সরিও বলল না। আশ্চর্য, লোকটা দ্রুত কামরার ভেতর ঢুকে এল। মুখে গোঁফ-দাঁড়ির জঙ্গল, কপালে চন্দনের ফোঁটা, ওর হাতে টিকিট। নম্বর মেলাতে মেলাতে, লোকটা কাছে এসে, হাতে ধরা কিট ব্যাগ তুলে দিল জানলার দিকে আপার বার্থে। তারপর আচমকা টয়লেটের দিকে চলে গেল। পুরীগামী ট্রেনে কয়েকবার যাতায়াত করার সময়, কিছু ওড়িয়া প্যাসেঞ্জারকে অসভ্যতা করতে দেখেছে জয়দেব। বিশেষ করে, ট্রেন ওড়িশা সীমান্তে ঢোকার পর থেকে। এই লোকটাও সম্ভবত সেই ধরনের। জয়দেবের ইচ্ছে হল, টয়লেটের কাছে গিয়ে ওকে চেপে ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছেটাকেও দমন করল।

'উপা, পুঁচকেটাকে একটু ধরবি? ঘুমে কী রকম ঢলে পড়ছে, দ্যাখ। আমি ততক্ষণে চাদরটা পেতে ফেলছি। এখনই শুইয়ে না দিলে, রাতে খুব জ্বালাবে।'

নিজের বার্থে বসে জয়দেব দেখল, বাচ্চাটা হাত বদল হল। অবিবাহিতা মেয়েটা বলল, 'ঠাণ্ডা কমিয়ে দিতে বলব, স্বাতী? ভয় হচ্ছে, পুঁচকের না আবার ঠাণ্ডা লেগে যায়।'

ওহ, একজনের নাম তা হলে উপা, অন্যজনের স্বাতী। চুপচাপ মেয়ে দু'টোর কথা শুনতে লাগল জয়দেব। উপা বলে মেয়েটার বার্থ জানলার দিকে। স্বাতীর মিডল বার্থে। বাচ্চাটাকে নিয়ে মাঝের বার্থে স্বাতী শোবে কী করে, তা নিয়ে ওরা কথা বলছে। উপা বলল, 'তুই ভাবিস না, লোয়ার বার্থে যে লোকটা আছে, তাকে পটিয়ে আমি জানলার দিকে পাঠিয়ে দেব।' দু'জনেই খিলখিল করে হেসে উঠল। শুনে জয়দেব মনে মনে হাসল। কী আত্মবিশ্বাস! লোয়ার বার্থের প্যাসেঞ্জার অবশ্য এখনও আসেননি। কী নাম যেন ভদ্রলোকের? বিশ্বম্ভর ভোই। ভদ্রলোক যদি না আসেন, তা হলে মেয়ে দু'টোর সুবিধেই হবে।

ট্রেন ভাল স্পিড নিয়েছে। সত্যি, জয়দেবের নিজেরও এ বার একটু শীত শীত করছে। রাতের দিকে ঠাণ্ডা আরও বাড়তে পারে। কম্বল, বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে অ্যাটেনডেন্টরা। এ বার পেতে নিলে হয়। কিন্তু এখন শুয়ে পড়লেও, ওর ঘুম আসবে না। রাত সাড়ে বারোটা-একটার আগে ওর ঘুমই আসে না। দীর্ঘ দিনের অভ্যেস। তবুও, চাদর পেতে টানটান হয়ে শুতেই, জয়দেব একটু আরাম পেল। সারাটা দিন ওর খুব ধকল গেছে। দিনকাল-এর পরের ইস্যুর সব মেটিরিয়াল ও আজই প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে আছে সুশোভনদার একটা লেখাও। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে ভাগীরথীর চড়ায় একটা মন্দির মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেটা কোন আমলের মন্দির... কেন নদীগর্ভে চলে গেছিল, সুশোভনদার লেখাটা সেই প্রসঙ্গে। ডেটলাইন আজিমগঞ্জ। জয়দেব লেখাটা এমনভাবে ছাপছে, যেন সুশোভনদা এখন আজিমগঞ্জে। আসলে ও সেই লোকগুলোকে ঘুলিয়ে দিতে চায়, যারা সুশোভনদার পিছনে লেগেছে।

আজ দুপুরে ও অনেকক্ষণ নেটে চ্যাট করেছে সুশোভনদার সঙ্গে। ল্যাপটপ সঙ্গে নিয়ে এসেছে জয়দেব, যাতে পরে কথাবার্তায় চোখ বুলিয়ে, বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে পারে। সাইডব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করল আনল ও। লগ ইন করে ও পেজ-টা খুলে ফেলল। ওরা চ্যাট করে রোমান হরফে। প্রথমে কুশল বিনিময়, তারপর সুশোভনদা লিখেছেন, 'হরি পাত্র সুস্থ হয়ে নার্সিং হোম থেকে ফিরেছেন। কাল দুপুরে খণ্ডগিরিতে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা। তুমি টাইমে পৌঁছলে, আমার সঙ্গে যেতে পারো।'

জয়দেব লিখেছিল, 'কেন উনি নিজের বাড়িতে দেখা করছেন না?'

'মনে হয়, ভয় পাচ্ছেন। আমি নার্সিং হোমে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। ওর এক কলিগ বলে পরিচয় দিয়ে। কথায় কথায় সেদিন উনি বললেন, জামিল ফেরদৌসের তৃতীয় ছবিটা উনি দেখেছেন। একটা অদ্ভুত জিনিস তখন লক্ষ করলাম। ওই ছবি সম্পর্কে কথা বলার সময়, হরি পাত্র খুব নার্ভাস হয়ে গেছিলেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অনেকক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করার পর বললেন, ছবিটা এখন কেওনঝড়ের এক মন্দিরে আছে। পাহাড় ঘেরা এক বিশাল জঙ্গলের মাঝে। সেখানে পৌঁছনো নাকি সহজ নয়। হরি পাত্র মাত্র একবারই ছবিটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।'

'কেওনঝড়ের সেই মন্দিরে উনি কি নিজেই গেছিলেন? নাকি ওঁকে কেউ নিয়ে গেছিলেন?'

'সেটা জিজ্ঞেস করিনি। খণ্ডগিরিতে দেখা হলে, জেনে নেব। আসলে সেদিন নার্সিং হোমে আরও দু'একজন ওকে দেখতে গেছিলেন। যতটুকু সময় ওঁকে একা পেয়েছি, তারই মধ্যে কিছুটা জেনে নিয়েছি। উনি বললেন, ছবিটা নাকি সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে সযত্নে রাখা আছে। সেখানে পাঁচ ফণাওয়ালা বিরাট এক শ্বেতসর্প সেই কুঠুরি পাহারা দেয়। মন্দিরের পূজারীরা ওকে চোখ বেঁধে সেখানে নিয়ে গেছিলেন। স্রেফ যাচাই করার জন্য, ছবিটার সঙ্গে যে মিথ জড়িয়ে আছে, সেটা সত্যি কী না।'

'কেওনঝড়ের ওই মন্দির সম্পর্কে হরি পাত্র কি কখনও কিছু লিখেছেন?'

'বললেন তো লিখে রেখেছেন। তবে সেটা কোথাও পাবলিশড হয়নি। মন্দিরের পূজারীরা নাকি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ছবিটার কথা কোথাও ডাইভালজ করা চলবে না। কাউকে বলে দিলে অপমৃত্যু হবে। সেই ভয়ে হরি পাত্রমশাই লেখাটা ছাপার কথা কখনও ভাবেননি। ভাব, কোন্ যুগ এখনও আমরা পড়ে আছি।'

'পাণ্ডুলিপিটা এখন কোথায় আছে?'

'প্রথমে উনি বলতে চাইছিলেন না। কিন্তু জোরাজুরি করার পর বললেন, ওর মেয়ে প্রমীলা পুরকায়স্থর কাছে আছে। তাঁর বিয়ে হয়েছে ভুবনেশ্বরে। তিনিই এক ব্যাঙ্কের লকারে সেই পাণ্ডুলিপিটা রেখে দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা ভুবনেশ্বরে কোনও এক কলেজের অধ্যাপিকা। উনি নিজে অচ্যুতানন্দের ওপর থিসিস করেছেন। কে এই অচ্যুতানন্দ তুমি তো জানো। শ্রীচৈতন্যের পঞ্চসখার একজন।'

'হরি পাত্র ছবিতে কী দেখেছিলেন, সে সম্পর্কে কি কিছু হিন্টস দিয়েছেন?'

'বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তখনই আরেকজন এসে গেল। তাই উনি চুপ করে গেলেন। কথায় কথায় উনি সেদিন আরও কী বললেন, জানো? একটা সময় ভেবেছিলাম, কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু বুঝতে পারছি, ডুম'স ডে এসে গেছে। এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস করার জন্য মহাপ্রভু এসে গেছেন। এই অন্যায়, অত্যাচার, তিনি সহ্য করতে পারছেন না। আর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ওড়িশার মাটিতে পা দেবেন। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে। তার এক বছর পরেই উনি ধ্বংসলীলা শুরু করে দেবেন। এই যুগে শ্রীচৈতন্য এসেছেন অবতার হয়ে। সারা পৃথিবীর মানুষকে উদ্ধার করার জন্য। ধ্বংসের পর ফের শুরু হবে সত্যযুগ। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি করি। তাই ইন্ডিকেশন আমি পেয়ে গেছি। তাই এখন আর আমি ভয় পাচ্ছি না। এ বার সত্যি কথাটা সবাইকে বলে যাব। তার জন্য যদি মরতে হয়, মরব।'

'এসব কথা বলার অর্থ?'

'জানি না ভাই। আসলে বয়স হয়েছে, রোগে ভুগছেন। তাই জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে গেছেন বোধহয়। তবে একটা কথা বলব জয়দেব। ভদ্রলোক খুব পণ্ডিত। মেমারি আমার থেকেও বেশি। শুনলে তুমি অবাকই হবে, অবতার তত্ত্ব নিয়ে ওঁর প্রচুর পড়াশোনা। সংস্কৃতে উনি একটা বইও লিখেছেন। এক জার্মান পাবলিশার সেই বই ছেপেছে। সব থেকে বড়ো কথা, প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে, গোকুলানন্দ ওরফে জামিল ফেরদৌস সম্পর্কে যে সব তথ্য উনি বের করেছেন, সিম্পলি অ্যামেজিং।'

'ওঁর লেখা পাণ্ডুলিপিটা কি পাওয়া যাবে সুশোভনদা?'

'কেন, তুমি ছাপবে নাকি? হা হা হা... সত্যি...ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানার কথা ভাবে। ওই পাণ্ডুলিপি পাওয়ার জন্য...হরি পাত্র বলছিলেন, এক ব্রিটিশ পাবলিশার্স নাকি কয়েক হাজার ডলার নিয়ে বসে আছে। তবুও উনি দেননি। কেননা, তখন ছাপতে দিলে ওর অবস্থা সলমন রুশদির মতো হত।'

'জামিল ফেরদৌসের চতুর্থ ছবিটার কথা কি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'সেটা নাকি আরও রহস্যময় জায়গায় আছে। আসলে ছবিগুলো প্রোটেক্ট করার দরকার হয়ে পড়েছিল। কলিঙ্গের সেইসময়কার প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিষনজর এড়ানোর জন্য। উনি নাকি হাজার হাজার গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যভক্তদের খুঁজে বের করার জন্য। তাদের সন্ধান পেলেই হত্যার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু এত দমননীতি সত্ত্বেও, জামিল ফেরদৌসের শেষ ছবি দুটো গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে পৌঁছয়নি। শ্রীচৈতন্য ভক্তরা গোপন জায়গায় ছবিগুলো লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ নিয়ে অবধূত গোস্বামীজির সঙ্গেও সম্প্রতি আমার আলোচনা হয়েছে। তুমি এসো, তখন ডিটেলে বলা যাবে।'

'আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'খণ্ডগিরিতে ঢোকার পরই তুমি দেখতে পাবে, বিরাট সিঁড়ি ওপরের দিকে উঠে গেছে। তার ঠিক বাঁ দিকে রেলিং দেওয়া চড়াই। আমি চড়াইয়ের ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে থাকব বিকেল চারটের সময়। গোঁফ দাঁড়ি রেখেছি বলে, হঠাৎ তুমি আমাকে নাও চিনতে পারো।

আমি পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে, মুখ মুছতে থাকব। কথা বলার দরকার নেই। আমাকে না-চেনার ভান করে, তুমি আমার পিছু নিও। খণ্ডগিরির ওপরের দিকে, পাথরের খাঁজে খাঁজে কিছু নির্জন জায়গা আছে। দুপুরে স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা সেখানে প্রেম করতে যায়। সেখানে কোথাও হরি পাত্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'এখনও কি আপনার পিছনে লোক লেগে রয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে সাবধানের মার নেই। যাক সে কথা। ওই কথাই রইল। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তুমি কি সরাসরি পুরীতে আসবে? না কি ভুবনেশ্বরে একদিন থাকবে?'

'পুরীর ডিউক হোটেলে আমার ঘর ঠিক করা আছে।'

'তা হলে তুমি ডিউক হোটেলেই উঠো। চক্রতীর্থের ওই দিকটায় বিদেশিদের ভিড় বেশি। বেড়াতে আসা বাঙালির সংখ্যা কম। তাই চেনা-জানা লোকের মুখ এড়াতে পারা যাবে। লাঞ্চ করেই কিন্তু তুমি বেরিয়ে পড়ো ভুবনেশ্বরের দিকে। আর প্ল্যান যদি কোনও কারণে বদলাতে হয়, তা হলে সন্ধেবেলায় সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এখন আর কথা নয়, সমুদ্র আমায় টানছে। বাই।'

পড়া শেষ করে, জয়দেব যখন ব্যাগের ভেতর ল্যাপটপ রেখে দিচ্ছে, সেই সময় টিকিট চেকার এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে তেইশ চব্বিশ বছরের লম্বা একটা ছেলে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেব খুব অবাক হয়ে গেল। ছেলেটাকে ও কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায়, সেটা চট করে মনে করতে পারল না। পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, আল্লাখাল্লার মতো প্রায় হাঁটুর কাছে নেমে আসা। ফর্সা, লম্বা মুখ, গালে পাতলা দাঁড়ি, চুল কাঁধের কাছে নেমে এসেছে। ছেলেটার হাত দু'টোও অস্বাভাবিক লম্বা। কামরা আলো করে ও দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে এই ছেলেটার নামই বিশ্বম্ভর ভোই! উল্টোদিকের লোয়ার বার্থটা যার! রিজার্ভেশন লিস্ট-এ নাম দেখে জয়দেব কিন্তু ভেবেছিল, বয়স্ক কেউ হবে।

ওর বার্থেই টিকিট চেকার বসে পড়েছেন। বুক পকেটে টিকিট রেখে দিয়েছিল জয়দেব। বের করে তা দেখাল। উল্টো দিকের লোয়ার বার্থে স্বাতী বাচ্চা নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ধড়মড় করে উঠে, ও বলল, 'এই উপা, আমার বরকে বল, চেকার সাহেব এসেছেন। টিকিট দেখাতে হবে।'

মিডল বার্থ থেকে উপা বলে উঠল, 'কাকে ডাকব বল তো? তিনি তো নাক ডাকতে শুরু করেছেন। দাঁড়া, আগে আমি নামি।'

উপা নেমে আসতেই চেকার বলে উঠল, 'উপাদি তুমি! আরে...কী টেলিপ্যাথি দেখো। লিস্ট-এ উপাসনা রায় নামটা দেখে তোমার কথা মনে পড়েছিল। তারপর মনে হল, আশপাশের নামগুলোতে তোমাদের ফ্যামিলির কেউ নেই। নবদ্বীপের পোড়ামাতলা ছেড়ে কী করতে তুমি পুরীর ট্রেনে উঠবে? আরে, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন? চিনতে পারছ না? আমি টোটা, আমার দিদি রঞ্জনা। মনে পড়ছে?'

উপাসনা রায়, নবদ্বীপ! শুনে জয়দেব চমকে উঠল। হ্যাঁ, বেহালার মিনি বাসে দেখা,

দু'বেণীওয়ালা সেই মেয়েটাই। এতক্ষণ চিনতে পারেনি। এর ফেলে যাওয়া ব্যাগটাই তো জয়দেব পৌঁছে দিয়েছিল ম্যানটনের বাড়িতে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ও কৌতুকবোধ করল। আজ কিন্তু দু'বেণী করে আসেনি। শ্যাম্পু করা চুল উল্টে আঁচড়েছে। মুখশ্রীটাই বদলে গেছে। চোখ সরাতে পারল না জয়দেব। তা হলে উপাসনা রায় হাল ছেড়ে দেয়নি। নিশ্চয়ই পুরী যাচ্ছে, রিসার্চের কাজ শেষ করার জন্য!

উপাসনার দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ই, জয়দেব দেখল, করিডোর দিয়ে একটা লোক হেঁটে টয়লেটের দিকে চলে গেল। এই লোকটাকেও ওর ভীষণ চেনা চেনা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল। আরে...এ তো মিউজিয়ামের সেই মাফিয়া... তেওয়ারি! পুলিশ সেজে ওর বাড়িতে এসেছিল। লোকটা কি ওকে ফলো করছে? ভাবতেই একটা ঠাণ্ডা স্রোত, জয়দেবের শরীরের ওপর থেকে নীচে নেমে গেল!

আঠাশ

জানলার দিকে ওপরের বার্থে শুয়ে পুরন্দর ছটফট করছে। কম্বল ঢাকা দিয়ে ও পা ভাঁজ করে শুয়েছিল। মুখটা আড়াল করে। যাতে নীচের বার্থ থেকে জয়দেব বলে লোকটা ওকে ভাল করে দেখতে না পায়। ওপর থেকে ও লক্ষ করে যাচ্ছিল নীচের প্যাসেঞ্জারদের। নাঃ, জয়দেবের সঙ্গে কামরায় কেউ ওঠেনি। ট্রেনে ওঠার সময় ইচ্ছে করেই কৌশিক বলে ছেলেটাকে ও ধাক্কা দিয়েছিল। তখন ভেবেছিল, কৌশিকও জয়দেবের সঙ্গে যাচ্ছে। পুরন্দর এখন নিশ্চিত, জয়দেব একাই পুরী যাচ্ছে। হেড কোয়ার্টার্সের খবর সঠিক। ট্রেন চলতে শুরু করার পর সাইড ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে, জয়দেব কী যেন পড়তে শুরু করল। সেই ল্যাপটপের মধ্যেই ডুবে গেল। এতদিন ধরে লোকটাকে ও ফলো করছে। দেখেছে, সবসময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই লোক কেন যে পূজ্যপাদদের বিরাগভাজন হল, পুরন্দরের মাথায় তা আসছে না। ওর তো মনে হচ্ছে না, লোকটা শ্রীচৈতন্যের ভক্ত।

খুনটা মাঝরাতে করবে বলে পুরন্দর ঠিক করে রেখেছে। জয়দেব যখন ঘুমোবে, তখন নিঃশব্দে নেমে গিয়ে মুখে বালিশ চাপা দেবে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই কাজটা হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল, লোকটা অনেক রাতে ঘুমোয়। ঘুম গভীর না হলে, বাধা দিতে পারে। তখন হুটোপাটিতে কেউ জেগে উঠলেই, মুশকিল। তখন চলন্ত ট্রেন থেকে পুরন্দর নেমে যেতে পারবে না। টাইম ক্যালকুলেশন করে ওর মনে হল, খুনটা কটক স্টেশন আসার মিনিট পাঁচেক আগে সেরে ফেলতে হবে। তারপর নেমে গিয়ে গা ঢাকা দিতে ওর সুবিধে হবে। ট্রেন পুরীতে পৌঁছনোর আগে কেউ বুঝতেও পারবে না, জয়দেব বলে লোকটা মরে গেছে। ভোরে প্যাসেঞ্জাররা সবাই নেমে যাবে। হয়তো অনেক পরে...কাল সকালে রেল পুলিশ ওর ডেডবডিটা আবিষ্কার করবে।

এ সি কামরায় কম্বলের তলায় এতক্ষণ পুরন্দর বেশ ছিল। হঠাৎ চেকার এসে টিকিট চাওয়ায় ওকে উঠে বসতে হল। ধুতির খুঁটে টিকিটটা রেখেছে। সেটা বের করার পর ও দেখল, চেকারের সঙ্গে হাজির হয়েছে এক প্যাসেঞ্জারও। বোধহয় অন্য কোনও কামরায় উঠে পড়েছিল। রিজার্ভ করে রাখা বার্থ, খুঁজতে খুঁজতে এসেছে। ছেলেটার বয়স খুব বেশি নয়। কিন্তু বেশ লম্বা। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না পুরন্দর। কিন্তু শরীরের তাপ অনুভব করতে পারছে। ছেলেটার গা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরচ্ছে। অদ্ভুত তো! একটা মানুষের শরীর থেকে এমন তাপ বিকিরণ সম্ভব? টিকিটটা চেকারকে দ্রুত দেখিয়েই, পুরন্দর ফের কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বেলি নানী একবার বলেছিল বটে। কথা হচ্ছিল ভূত-প্রেত নিয়ে। পাতাল গৃহে মন্দিরের আশ্রমে কোনও কোনও কুঠুরিতে, গভীর রাতে অশরীরীদের অস্তিত্ব টের পেত পুরন্দররা। তারা কোথা থেকে এল, সে কথাই বেলি নানীর কাছে জানতে চেয়েছিল ও। বেলি নানী বলেছিল, 'ওরা হল মৃত মানুষের আত্মা। পাতাল গৃহে যাদের অপমৃত্যু হয়েছে, তাদের আত্মা বেরতে পারেনি। ওরা পাতালের অভ্যন্তরে পাক খেয়ে বেড়ায়। ওদের দেখে তোরা ভয় পাস না। একটা কথা বলে রাখি, যার কাছে গিয়ে তুই হিমের স্পর্শ পাবি, সে হচ্ছে প্রেতাত্মা। আবার উল্টোটাও আছে। যার কাছে গিয়ে তোর মনে হবে, শরীরটা আগুনে ঝলসে যাচ্ছে, জানবি সে হচ্ছে মহাত্মা। দেবতার ঔরসে তার জন্ম। মানব জন্ম থেকে তোকে উদ্ধার করার জন্যই, সে তোকে দেখা দিয়েছে।'

লম্বা ছেলেটা কি তা হলে মহাত্মা? ওকে উদ্ধার করার জন্যই দেখা দিয়েছে? ছেলেটাকে ফের দেখার জন্য চোখ খুলে সামনের দিকে তাকাল পুরন্দর। দেখল, ছেলেটা নেই। চেকারও চলে গেছে। কামরার আলো নিভে গেছে। তবুও হালকা নীলাভ একটা আলো ছড়িয়ে আছে আশপাশে। যাত্রীরা সব শুয়ে পড়েছে। ট্রেনের চাকার শব্দ ছাপিয়ে, কারও কারও নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ট্রেন সফরের সময় পুরন্দর কখনও ঘুমোতে পারে না। আজও জেগে রইল। জয়দেবকে খুন না-করা পর্যন্ত ওর চোখে ঘুম আসবে না। সকালে হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন এসেছিল। পূজ্যপাদ পদ্মনাভ কড়া গলাতেই ওকে বলেছেন, 'তোর কোনও বাহানা শুনতে আমি রাজি নই। কাজটা যদি করতে না পারিস, তা হলে বল। আমি অন্য লোককে পাঠাচ্ছি।'

কাল রাতে মোহান্তির বউ ফুলিকে মেরে ফেলার পর থেকে, দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি পুরন্দর। মোহান্তির ঘর থেকে বেরিয়ে, ও যখন নিজের ঘরে ঢুকছিল, তখন অন্ধকার ফুঁড়ে এক বুড়ি ওর সামনে এসে হাজির হয়েছিল। কোমর বেঁকে গেছে, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ি হাত পেতেছিল, 'মেয়ের ঘর থেকে ফূর্তি করে বেরলি। আমায় কিছু দিবি না?'

বুড়িকে দেখে পুরন্দরের বুকের ভেতরটা ধকধক করে উঠেছিল। কদাকার ওই বুড়ি উদয় হল কোত্থেকে? আশপাশে কোনও দাওয়ায় শুয়েছিল? ফুলির ঘরে ওকে ঢুকতে দেখেছে। তারই ফায়দা নিচ্ছে। কথাটা ভাবতেই রাগ হয়ে গেল পুরন্দরের। কিন্তু পরক্ষণেই

ও নিজেকে সামলে নিল। ঘরের ভেতর ফুলি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওকে যদি ওই অবস্থায় দেখে, বুড়ি তা হলে চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। বস্তি থেকে তখন পুরন্দর আর বেরতে পারবে না। সুর নরম করে ও বলেছিল, 'ফুলি কি তোমার নিজের মেয়ে?'

'শুনে তোর কাজ কী মিনসে? বলি, তুই মোহান্তির কেমনতর দোস্ত রে? কাল এসে, আজই ওর বউটাকে নিয়ে শুয়ে পড়লি? শুয়েছিস, বেশ করেছিস। দে, আমায় একশো ট্যাকা দে। ফুলির ঘরে যে ঢোকে, আমায় বকশিস না দিয়ে, সে বেরুতে পারে না রে হতচ্ছাড়া।'

'একশো টাকা...একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না বুড়িমা?'

'ট্যাকাটা দিবি কি না আগে বল। না'লে কাল মোহান্তিকে সব বলে দেব।'

বুড়ির ফোকলা মুখে ধূর্ত হাসি। দেখে পুরন্দরের গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। আপদ বিদেয় করার জন্য, পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে, বুড়িকে দিয়ে ও বলেছিল, 'এই নাও বুড়ি মা। দেখো, আজ রাতে আর কেউ যেন ফুলির ঘরে না ঢোকে। আমাকে আরেকবার যেতে হবে।'

নোট দুটো হাতে নিয়ে বুড়ি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল, 'যা বাবা, যতবার খুশি যা। ফুলি আমার চনমনে মেয়ে। ওর ঘরে যে মিনসে একবার ঢোকে, বারবার সে ফিরে আসে।'

কথাগুলো বলে, লাঠির ভরসায় ঠুকঠুক করে এগিয়ে, বুড়ি অন্য একটা ঘরের দাওয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। পুরন্দরও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। বাকি রাত্তিরটা ও নিজের ঘরে কাটিয়ে দেয়। ভোরবেলায় বস্তি থেকে বেরিয়ে কলুটোলার মোড়ে আসার পর, হঠাৎ ওর মনে পড়েছিল, মোবাইল সেটটা ফুলির ঘরে পড়ে আছে। সেটা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে না পারলে সমূহ বিপদ। সেল ফোনটা পুলিশের হাতে পড়তে পারে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ পৌঁছে যেতে পারে হেড কোয়ার্টার্সে। পূজ্যপাদরা সবাই তখন জেনে যেত, পুরন্দর গর্হিত অপরাধ করেছে। একজন নারীকে ধর্ষণ করে, তাকে হত্যা করেছে। না, না, সেই পরিস্থিতি হতে দেওয়া যায় না। যে করেই হোক, মোবাইল সেট ওকে নিয়ে আসতেই হবে।

আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগে ফের পুরন্দর হাজির হয়েছিল ফুলির ঘরে। ওর সৌভাগ্য, বস্তির লোক তখনও জাগেনি। বেরনোর সময় দরজাটা ও বন্ধ করে দিয়েছিল। ফের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পুরন্দর দেখে, ফুলি বিছানার ওপর নগ্ন হয়েই শুয়ে আছে। ওর মাথার দিকের ছোট্ট জানলাটা খোলা। ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে আসছে। পুরন্দরের ঠিক মনে পড়ছিল না, ফুলিকে ধর্ষণ করার সময় জানলাটা খোলা ছিল, না বন্ধ? তবে বাঁ দিকে, কুলুঙ্গিতে চোখ যেতেই ওর লোম খাড়া হয়ে গেছিল। বিস্ফারিত চোখে ও দেখেছিল, লম্ফটা জ্বলছে। ফের কে জ্বালাল লম্ফটা? ফুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ও নিজে নিভিয়ে দিয়েছিল! তা হলে ওর অনুপস্থিতিতে, কি ঘরে কেউ ঢুকেছিল?

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পুরন্দরের চোখে পড়েছিল, ফুলির ছায়া, ফুলির

পাশে শুয়ে রয়েছে। কান্নার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। বেলি নানী তা হলে যা বলেছিল, তা ঠিক! বেলি নানী বলেছিল, মানুষ তৈরি করার সময় ঈশ্বর কখনও তাকে একা পাঠান না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়াটাও পাঠান। ঈশ্বর মানুষের দেহটা দেন মায়ের শরীরে। আর তার ছায়াটা থাকে বাবার কাছে। সারাজীবন সেই মানুষটার সঙ্গে তার ছায়াটাও ঘোরাফেরা করে। কেউ নিজে সেটা দেখতে পায় না। মানুষটা যখন মারা যায়, তখন সেই ছায়া তাকে নিয়ে যায় ঈশ্বরের কাছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দরের মনে হল, ফুলি বেঁচে নেই বলে ওর ছায়া ওকে ডাকতে এসেছে। এ বার ঈশ্বরের কাছে ওকে নিয়ে যাবে। ছায়া দেখে, ভয়ে পুরন্দর জপতে শুরু করেছিল, 'ওঁ ক্লীং, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভসহায় স্বাহা।'

এইসময় বাইরে কোথাও খুট করে একটা আওয়াজ হওয়ায়, পুরন্দরের ভয় কেটে গেছিল। ফুলির ছায়ার কথা ভুলে, সঙ্গে সঙ্গে ও গা ছাড়া দিয়ে উঠেছিল। দু'তিন মিনিটের মধ্যে ওকে বেরিয়ে যেতে হবে। ধরা পড়লে, মার খেয়ে মরে যাবে। প্রথমেই হাত বাড়িয়ে, মোবাইল সেটটা তুলে, পুরন্দর পকেটের ভেতরে ঢুকিয়েছিল। তারপর ফুলির শরীরটা... ওরই শাড়ি দিয়ে মুড়ে, চালান করে দিয়েছিল চৌকির নীচে। এ সবকাজে ও খুব পটু। সকালে ঘরে ফিরে আসার পর, মোহান্তি চট করে জানতেও পারবে না, ফুলির কী হয়েছে। সারা দিন ধরে হয়তো ও ফুলিকে খুঁজবে। ফুলির বুড়ি মা এমনও আন্দাজ দিতে পারে, ফুলি তোর দোস্তের সঙ্গে পালিয়েছে। চৌকির নীচে ফুলির দেহটা পচে গন্ধ ছড়াতে... অন্তত দিন দুয়েক লাগবে। তখনই মোহান্তি জানতে পারবে, ওর সর্বনাশটা কে করেছে? প্রণাম লোপের দ্রুত চেষ্টা করে, পুরন্দর বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর দরজায় শিকল দিয়ে নেমে গেছিল রাস্তায়।

ট্রেনের আপার বার্থে শুয়ে, ফুলির তপ্ত শরীরটার কথা মনে করতেই পুরন্দর উত্তেজনা অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে অম্বালিকার নগ্ন দেহটার কথাও ওর মনে হল। দিন তিনেকের ব্যবধানে দুই ভিন্ন নারীর সঙ্গে ও যৌনক্রিয়া করেছে। দীর্ঘদিনের সুপ্ত কামনা পূরণ করতে পেরেছে। পুরন্দরের মনে হল, কুমারী অম্বালিকা ওকে সেই তৃপ্তি দিতে পারেনি, যা ও ফুলির কাছে পেয়েছে। বিবাহিত নারীর সঙ্গে সঙ্গম করার অনুভূতিই আলাদা। অম্বালিকা ওকে বাধা দেয়নি। উল্টে, সঙ্গমের সময় নিজেও অংশ নিয়েছিল। ওর শীৎকার ধ্বনি শুনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরন্দরের বীর্যপাত হয়ে যায়। কিন্তু ফুলি প্রতিরোধ করায়, পুরন্দর পৌরুষ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। ফুলির মেদহীন শরীর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেছিল। ফলে দীর্ঘসময় ধরে পুরন্দর মৈথুন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

...ট্রেন সম্ভবত কোনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে। পুরন্দরের হঠাৎ খুব গরম লাগছে। এ সি কামরায় গরম লাগার তো কথা নয়। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে, নীচে উঁকি মেরে ও দেখল, লম্বা মতো ছেলেটা ওর ঠিক নীচের বার্থে বসে আছে। সেই কারণেই কী ওর এত গরম লাগছে? জয়দেব পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। ওর ঠিক উল্টো দিকের বার্থে, বিবাহিতা মেয়েটা এখনও পুরো ঘুমোয়নি। ওর কোলে বাচ্চাটা ছটফট করছে। আবছা

আলোয় পুরন্দর দেখল, আধো ঘুম-আধো জাগরণ অবস্থায় মেয়েটা ব্লাউজের ভেতর থেকে স্তন বের করে, বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিল। মন্দিরের পাতাল গৃহে বসবাস করার জন্য অন্ধকারেও পুরন্দর অনেক কিছু দেখতে পায়। মেয়েটার সুডৌল স্তন দেখে ওর মনে কামভাব জেগে উঠল। মেয়েটা জানেও না, এত রাতে গোপনে ওর স্তন দেখে, কেউ যৌনসুখ পেতে পারে। পুরন্দর একবার ভাবল, টয়লেটে গিয়ে হস্তমৈথুন করে আসে। কিন্তু নীচে নামার জন্য গা থেকে কম্বল সরাতেই ও দেখল, লম্বা মতো ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ে কে যেন গরম সিসের ছ্যাকা দিল। লম্বা ছেলেটা টয়লেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ও যত দূরে যাচ্ছে, গরমভাবটা তত কমছে। আগুনের ছ্যাকা খাওয়ার অভিজ্ঞতা ওর জীবনে অনেকবার হয়েছে। পূজ্যপাদদের সাধারণ শাস্তিই ছিল, গরম লোহা অথবা প্রদীপের ছ্যাকা দেওয়া। পুরন্দরের সারা গায়ে এ রকম অনেক কালো দাগ আছে। কিন্তু আজ যা হচ্ছে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা পুরন্দরের জীবনে কখনও হয়নি। ছেলেটার কাছাকাছি হলে গা জ্বলে যাচ্ছে কেন, ও বুঝতে পারল না। নাহ, সারা রাত্তির শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে ওর পক্ষে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। অন্য কোথাও বার্থ খালি আছে কী না, একবার দেখে নেওয়া দরকার। কী জন্য ও ট্রেনে উঠেছে, সেটা সাময়িক ভুলে গিয়ে পুরন্দর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর পা টিপে ও এগোতে লাগল, উল্টোদিকের টয়লেটের দিকে। আশ্চর্য, জানলার দিকে একটা লোয়ার বার্থ খালি আছে। ফের নিজের বার্থের কাছে গিয়ে, কম্বলটা নিয়ে এসে, পুরন্দর খালি বার্থটায় শুয়ে পড়ল। ও ঠিক করে রাখল, কটক স্টেশনে ট্রেন পৌঁছনোর আগে, ও ফের এ দিকে আসবে। জয়দেবকে খুন করে, ট্রেন থেকে নেমে যাবে।

ট্রেন ফের চলতে শুরু করেছে। জানলার পর্দা সরাতেই আকাশটা চোখে পড়ল পুরন্দরের। খোলা মাঠ দিয়ে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। বাঁকা চাঁদের মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে ঘুমন্ত জনপদ। কামরার ভেতরেও আবছা অন্ধকার। করিডোরে হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে পুরন্দর ফিরে তাকাল। কম্বলের ফাঁক দিয়ে ও দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ফিসফিস করে মোবাইলে একজন কথা বলছে। কান উৎকীর্ণ করে শুনতে লাগল পুরন্দর। আরে, এই লোকটাও তো জয়দেবের কথা বলছে! ওর গলায় অবাঙালি টান।

'মাল পঁচিশ নম্বর বার্থে আছে। বার দুয়েক করিডোর দিয়ে ঘুরে এসেছি। মনে হয়, আমায় চিনতে পারেনি।'

'ট্রেনেই শেষ করে দেব, না কি পুরী অবধি অপেক্ষা করব?'

'ঠিক আছে, আপনি যেমন বলছেন। একে এখানে মারলে, সুশোভনের কাছে পৌঁছতে পারব না। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক।'

লোকটা যার সঙ্গে কথা বলছে, তার কথা পুরন্দর শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু ও নিশ্চিত হয়ে গেল, জয়দেবকে মারার জন্য, এই লোকটাও ট্রেনে উঠেছে। সেই সুযোগ অবশ্য

লোকটাকে ও দেবে না। তার আগেই কাজ সেরে নেমে যাবে পুরন্দর। ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে ভালো করে দেখে রাখল ও। মাঝারি হাইট। তবে বেশ শক্তপোক্ত। সওদা করে খায়। সুপারি নেওয়ার লোক না। একে কাবু করা কঠিন হবে না। জয়দেবের সঙ্গে ওর শত্রুতা কী কারণে, সেটা জানতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কায়দা করে কথা বলতে পুরন্দর জানে না। তাই ও চুপ করে শুয়ে রইল।

কাচের দরজা ঠেলে লোকটা এসি কামরার ভেতরে ঢুকে এল। গরম বাতাস পুরন্দরের মুখে এসে লাগল।

লোকটা নীচু হয়ে বলল, 'এই বার্থটা আমার। তুমি কোত্থেকে জুটলে ভাই? উঠে পড়ো।'

কথা বলার ভঙ্গিটা ভালো লাগল না পুরন্দরের। তবুও উঠে বসে নরম গলায় ও বলল, 'আমি একত্রিশ নম্বরে ছিলাম ভাই। আপার বার্থ, আমার অসুবিধে হচ্ছে। বদলাবদলি করবেন?'

উত্তর না দিয়ে লোকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখের রং বদলে যাচ্ছে। চোখে কৌতুক, লোকটা তুমি থেকে তুইয়ে নেমে এল, 'তোকে দেখে তো সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না। গোঁফ-দাড়ি লাগিয়ে ট্রেনে উঠেছিলি। তোর নকল গোঁফটা কিন্তু খুলে গেছে। মতলবটা কি ডাকাতি ফাকাতি?'

'কী যে বলেন। আমি যাত্রা দলে অ্যাক্টিং করি। মেক আপ তোলার সময় পাইনি। নাকটা সুড়সুড় করছিল। তাই গোঁফ খুলে রেখেছিলাম।'

'ঢপ দিস না। তোর চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। দাড়ি খুললেই, তোকে অবশ্য চেনা যাবে।' বলতে বলতেই টান মেরে লোকটা দাড়ি উপড়ে নিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক চিনেছি। পুলিশ তোকে খুঁজছে। কাল থেকে তোর ছবি দিচ্ছে টিভিতে। আমার নাম তিওয়ারি, আমার চোখকে তুই ফাঁকি দিবি?'

দর কষাকষিতে পুরন্দরও কম যায় না। এ সব ব্যাপারে ওর স্নায়ু ইস্পাতের মতো। ঠাণ্ডা গলায় ও বলল, 'কাচের ঘরে ঢিল মারাটা কি ঠিক হচ্ছে? তুই কী কারণে ট্রেনে, সেটা কিন্তু আমি জানি।'

রাগে তিওয়ারির মুখ থমথমে হয়ে গেল। কড়া দৃষ্টিতে ওর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইল। তার পর জামা তুলে, কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তল দেখিয়ে বলল, 'কামরার বাইরে চল। এখানে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। মিনিট তিনেক পরেই একটা স্টেশন আসছে। চুপচাপ নেমে যাবি। তড়পালে তোকে মেরে... লাশ কিন্তু দরজার বাইরে ফেলে দেব। চল ওঠ।'

তিওয়ারির নির্দেশমতো বার্থ থেকে নেমে পুরন্দর, কাচের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সহজে হার মানার লোক ও নয়। পিস্তল দেখিয়ে ওকে ভয় পাওয়ানো যায় না। ওর গায়ে অসুরের মতো শক্তি। ইচ্ছে করলে গলা টিপে তিওয়ারিকে ও মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু কোনও রকম গা জোয়ারির মধ্যে পুরন্দর যাবে না। ও সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

লোকটা কাচের দরজার বাইরে এসেছে। প্ল্যাটফর্মে নামার লোহার দরজাটা খুলছে। চলন্ত ট্রেনে হু হু করে বাতাস ঢুকে এল। দরজা খোলা, উঁকি মেরে তিওয়ারি দেখছে, স্টেশন আর কত দূরে। সুযোগ নষ্ট করল না পুরন্দর। লাথি মেরে তিওয়ারিকে ও দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিল।

উনত্রিশ

শেষ রাতে সেই যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল, আর নড়ার কোনও লক্ষণ নেই। উপাসনার আর ঘুমই এল না। বার্থে এ পাশ ও পাশ করতে করতেই ভোর হয়ে এল। কামরায় হকার উঠেছে। 'চায়ে চায়ে' বলে বিরক্ত করে মারছে। উপাসনা টের পেল, ওপরের বার্থ থেকে নেমে এসেছে নবেন্দু। কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে, ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? নীচে স্বাতীর গলাও পেল, 'একবার বাইরে বেরিয়ে দেখো না, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?' শুনে চাওয়ালা বলল, 'টেরেন তিন ঘণ্টা লেট। ন'টার আগে পুরীতে পৌঁছবে না।'

নীচ থেকে স্বাতী ডাকল, 'উপা নেমে আয়। মাঝের বার্থটা নামিয়ে দিই। না হলে ভাল করে বসতে পারছি না। মাথা ঠেকে যাচ্ছে। কী অশান্তি বল তো? এখনও ভুবনেশ্বর দু'ঘণ্টা।'

উপাসনা বলল, 'কী আর করবি। তোর হাতে তো কিছু নেই। দাঁড়া নেমে আসছি।'

নীচে নেমে পায়ে জুতো গলিয়ে নিল উপাসনা। তারপর টয়লেটে গেল। ট্রেনের টয়লেটে যেতে ওর ভীষণ ঘেন্না করে। পারতপক্ষে ও যেতে চায় না। ট্রেন ঠিক টাইমে পুরীতে পৌঁছলে, হয়তো স্বাতীর বাড়ি গিয়ে টয়লেটের কাজ সারত। কিন্তু পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে শুনে, বাধ্য হয়ে টয়লেটে গেল। অবস্থা দেখে ওর বমি উঠে এসেছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে, বাইরে বেরিয়ে ভালো করে চোখ মুখে ও জল দিয়ে নিল। ফিরে এসে মিষ্টু সোনাকে কোলে নিয়ে স্বাতীকে ও বলল, 'যা, তুই এ বার চোখ মুখে জল দিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে দুষ্টুটাকে সামলাচ্ছি।'

নবেন্দু গল্প জুড়ে দিয়েছে উল্টো দিকের বার্থের ভদ্রলোকের সঙ্গে। ওদের কথাবার্তাতেই উপাসনা জানতে পারল, ইঞ্জিন খারাপ হয়েছিল। কটক থেকে ইঞ্জিন এসে গেছে। এখন জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই ট্রেন চলতে শুরু করবে। ছেলেরা কত সহজেই না আলাপ পরিচয় করে ফেলতে পারে। উপাসনা আরও জানতে পারল, ভদ্রলোকের নাম জয়দেব। একটা পাবলিকেশন কোম্পানির মালিক। সেইসঙ্গে রিসার্চারও। শুনে নবেন্দু উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর এই বান্ধবীও রিসার্চ করার জন্যই ভুবনেশ্বর যাচ্ছে।'

জয়দেব বললেন, 'ওঁকে আমি চিনি। উপাসনা রায় অব্ পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ। এখন থাকেন বেহালার ম্যানটনে।' বলেই হাসতে শুরু করল।

নবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই। কেসটা কী বলুন তো? আপনারা

পরস্পরকে চেনেন। অথচ কাল রাত থেকে না-চেনার ভান করে বসে আছেন! আমার তো অন্য সন্দেহ হচ্ছে।'

জয়দেব বললেন, 'আপনার সন্দেহের কোনও কারণ নেই। আমাদের মধ্যে মাত্র একবারই টেলিফোনে কথা হয়েছিল।'

এইবার উপাসনার মনে পড়ল। ও হ্যাঁ, ওর ব্যাগ ফেরত দেওয়ার সময় ভদ্রলোক বলেছিল, ওঁর নাম জয়। গলা শুনে ও তখন আন্দাজ করেছিল, চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সি কেউ হবেন। কিন্তু সামনে দেখে মনে হচ্ছে না, বছর তিরিশের বেশি। চশমার আড়ালে উজ্জ্বল দুটো চোখ। দেখেই মনে হয়, পড়াশুনো জগতের লোক। জয়দেব ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে দেখে, লজ্জা পেয়ে উপাসনা বলল, 'এ বার মনে পড়ছে। আপনি হেল্প না করলে আমি খুব বিপদে পড়তাম।'

জয়দেব বলল, 'আপনার রিসার্চের কাজ কতটা এগোল?'

উপাসনা বলল, 'খুব বেশি না। এ বার ডু অর ডাই। না পারলে বাই বাই করে দেব। কিন্তু আপনি তো সেদিন বলেননি, আপনিও রিসার্চ করছেন? আপনার সাবজেক্টটা কী?'

'প্রায় আপনার কাছাকাছি। আপনি যাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, আমিও তাঁকে নিয়ে পড়ে আছি। তবে তাঁর জীবনের শেষ তিন দিন নিয়ে আমার থিসিস।'

'বাঃ দারুণ, হিটলারের জীবনের শেষ সাতদিন নিয়ে একটা বই রিসেন্টলি পড়লাম। চমৎকার একটা উপন্যাসের মতো। কিন্তু গবেষণাধর্মী লেখা। প্রচুর খাটনি করে ভদ্রলোক লিখেছেন। শুনলাম, হলিউডে সিনেমাও হয়েছে, ওই বইটা নিয়ে।'

'বইটা আমিও পড়েছি। তারপরই আমার মাথায় আইডিয়াটা খেলে যায়। হিটলারকে নিয়ে ওরা লিখতে পারলে, আমরাই বা শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে লিখতে পারব না কেন? তবে আমি আগে থিসিস জমা দেব, তার পর উপন্যাস লিখব।'

'কোত্থেকে শুরু করবেন? রথযাত্রার সময় ওঁর পায়ে চোট পাওয়ার ঘটনাটা নিয়ে, নাকি উনি অসুস্থ হওয়ার শুরু থেকে? নবদ্বীপে আচার্য সুধীর মিশ্র মশাই কিন্তু আপনাকে এ ব্যাপারে হেল্প করতে পারবেন।'

'আপনি চেনেন নাকি তাঁকে। ভদ্রলোক তো মাঝে একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। ভাবছি, পুরী থেকে ফিরে এসে, তারপর একদিনের জন্য নবদ্বীপ যাব।'

'খুব ভাল হবে। আপনি নবদ্বীপ গেলে আমাদের বাড়িতে আসবেন। নেমন্তন্ন করে রাখলাম।'

ট্রেন চলতে শুরু করল। জয়দেব আর নবেন্দু একসঙ্গে উঠে টয়লেটের দিকে গেল। উপাসনা মিষ্টুসোনাকে তুলে দিল স্বাতীর কোলে। স্বাতী মিটিমিটি হাসছে। ফিসফিস করে বলল, 'জানলার ধারে ছেলেটাকে দেখেছিস? কী হ্যান্ডসাম, তাই না?'

উপাসনা বলল, 'দাঁড়া, নবেন্দুকে বলছি। তোর ছুকছুকানি এখনও যায়নি।'

স্বাতী বলল, 'আমি কি আমার জন্য বলছি না কি? তোর সঙ্গে ছেলেটাকে খুব মানাবে। একেবারে চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো দেখতে, তাই না?'

'তুই একটা যাচ্ছেতাই। ছেলেটা আমার থেকে অন্তত তিন-চার বছরের ছোটো।'

'বাব্বাঃ, তুই সেটাও লক্ষ করেছিস? হ্যাঁ রে, জয়দেবটাকে তোর কেমন লাগল?'

'দেখে তো ভালোমানুষ বলে মনে হল।'

'আমি বলি কী, জয়দেবটাকে তুই পটিয়ে ফ্যাল। পরোপকার করার অসুখ আছে ওর। দেখবি, তোর রিসার্চের আর্ধেক কাজ ও-ই করে দেবে। দাঁড়া, আগে ওকে একটু চর্চা করি। তারপর তোর জন্যই... বাড়িতে একদিন ওকে নেমন্তন্ন করব।'

উপাসনা বলল, 'তুই আগের মতোই রয়ে গেলি স্বাতী। এ কী তোর প্রেমিক গোবিন্দ টাইপের না কী, যে তোর কথা শেষ হতে না হতেই দৌড়বে! এ সিরিয়াস টাইপের।'

'তুই চুপ করে থাক উপা। খালি হেসে কথা বলে যা। বাকিটা যা করার আমি করছি।'

'বাকিটা যা করার...মানে?'

জয়দেব আর নবেন্দু ফিরে এল। স্বাতী কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, চুপ করে গেল। ট্রেন কটক স্টেশনে ঢুকে গেছে। বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার নেমে গেল। প্লাটফর্মে লোকের হুড়োহুড়ি দেখে, উপাসনার সামান্য ভয়ভয় করতে লাগল। আচার্য মশাই বলেছিলেন বটে, কিন্তু ও কিছুতেই একা আসতে পারত না। আসলে ছোটো বেলা থেকে সেভাবে মানুষ হয়নি যে! ভাগ্যিস, স্বাতীর মতো একজন বন্ধু পেয়েছিল। তাই বাইরে আসার ঝুঁকি নিয়েছে।

নবেন্দু বলেছিল, কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে আগে জাজপুর, তারপর কটক। তার মানে এতক্ষণ ট্রেন জাজপুরের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়েছিল। কথাটা মনেহতেই উপাসনার টেনশন শুরু হল। রিসার্চ শেষ করার জন্য ও দিন দশেক মাত্র হাতে পাচ্ছে। ভুবনেশ্বরে স্বাতীর বাড়িতে গিয়ে ও উঠছে বটে, কিন্তু জাজপুর, কটক আর কেন্দ্রাপড়া... এই তিনটে জায়গায় ওকে ঘুরতেই হবে। এই তিনটের মধ্যে কোনও একটা জায়গায়, তেইশ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব ফের জন্মগ্রহণ করেছেন। উপাসনা বাড়িতে বসে বসে ছকে রেখেছে, ওই তিনটে জায়গায় গিয়ে কী কী করবে। সময় নষ্ট করা চলবে না। খুব সামান্য তথ্য নিয়ে ও বেরিয়েছে। এই ক'দিনে যদি কাজ শেষ করতে না পারে, তা হলে রিসার্চের কথা ওকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। মা বলেই দিয়েছে, 'যাচ্ছ যাও। স্বাতীর কাছে থাকবে বলে, তোমায় পার্মিশন দিলাম। কিন্তু ফিরে আসার পর তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। তার পর তুমি যা ইচ্ছে, কোরো।'

নব্যেন্দু অবশ্য বলেছে, 'উপা, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি যতটা পারব, তোমায় সাহায্য করব। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।' নবেন্দু ছেলেটা খুব ভালো। আসলে ওকে দেখেই মা আর আপত্তি করেনি। সত্যি স্বাতীর ভাগ্যটা ভালো। নবেন্দুর মতো একটা বর পেয়েছে। কোনও কিছুতে ছেলেটার না নেই। অসম্ভব ধৈর্য। কিন্তু হই হুল্লোড়বাজ। ওকে দেখে মা একদিন স্বাতীকে বলেই ফেলল, 'তোর শ্বশুরবাড়ির তরফে কোনও ছেলে

টেলে থাকলে দ্যাখ না। উপার সঙ্গে বিয়ে দেব। ছেলে যদি কৃষ্ণনগরের হয়, তা হলেও আমার অসুবিধে নেই।'

জানলার ধারে বসে উপাসনা ঠিক করে নিল, ভুবনেশ্বরে পৌঁছে, দুপুরে একবার স্টেট লাইব্রেরিতে যাবে। নবেন্দুর কে এক চেনাশুনো আছেন লাইব্রেরিতে। তাঁকে ফোন করেছিল নবেন্দু নবদ্বীপ থেকে। তিনি না কি বলেছেন, সবথেকে ভাল হয় নরসিংহ পটনায়েকের সঙ্গে কথা বলতে পারলে। তিনি শ্রীচৈতন্য বিশেষজ্ঞ। ইংরেজিতে না কী অনেক বইও লিখেছেন শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে। তবে ভদ্রলোকের মারাত্মক ঘ্যাম! পছন্দ না হলে কথাই বলেন না। ওড়িশার চিফ মিনিস্টারকেও না কী একবার পাত্তা দেননি। উনি প্রায়ই দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে যান। ভুবনেশ্বরে ওঁকে পাওয়া মুশকিল। এ সব শোনার পর উপাসনা বেশ ঘাবড়ে আছে।

নবদ্বীপেও অনেক পণ্ডিত মানুষ আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে ওর কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু নরসিংহ পটনায়েকের সঙ্গে ওকে যদি ইংরাজিতে কথা বলতে হয়, তা হলে ও খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর কথা ওর মনে পড়ল। জয়দেবটাকে পটিয়ে ফ্যাল। আখেরে কাজ দেবে। সত্যি, এমন একটা লোক সঙ্গে থাকলে রিসার্চের কাজে কত সুবিধে। কথাটা ও স্বার্থপরের মতো ভাবছে ঠিকই, কিন্তু শিয়রে মায়ের শমন। না ভেবেও উপায় নেই। রিসার্চ শেষ করতে না পারলে, নবদ্বীপে শ্রীবৎসরা ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। বামন হয়ে চাঁদে পা দেওয়ার ইচ্ছে? দ্যাখ, আজও আমাদের অভিশাপ লাগে কি না! কথাটা মনে হতেই উপাসনার মনটা ভারী হয়ে গেল। নবদ্বীপ থেকে বেরিয়ে আসার দিন, ও শুনে এসেছে, আচায্যি মশাইয়ের শরীর খুব খারাপ। বাবার মুখও শুকিয়ে গেছে। অসুস্থতার পিছনে শ্রীবৎসদের শাপ আছে কি না, কে বলতে পারে? ভুবনেশ্বরে নেমে একবার বাবাকে ফোন করতে হবে। আচায্যিমশাই কেমন আছেন, তা জানার জন্য।

জয়দেবের সঙ্গে কথা বলছে স্বাতী। পারেও বটে। কায়দা করে হাঁড়ির খবর বের করছে। মিশুকে টাইপের মেয়ে। সব জায়গায় মানিয়ে নিতে পারে। অল্প পরিচিত লোককে ও এমন কথা জিজ্ঞেস করতে পারে, যা উপাসনা কোনওদিন করতে পারবে না। স্বাতীর প্রশ্ন শুনে হাসবে কী, উঠে যাবে, ও বুঝতে পারল না। মিষ্টু সোনাকে আদর করতে করতে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেমেয়ের কী নাম রেখেছেন জয়দেববাবু?'

জয়দেব বলল, 'না, আমার ছেলেমেয়ে নেই।'

'স্ত্রীকে সঙ্গে আনলেন না কেন? ভারী অন্যায়। আমার বর কিন্তু যেখানে যায়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়।'

'আমি ব্যাচেলর। এখনও বিয়ে করিনি।'

'আপনাকে দেখে তা কিন্তু মনে হয় না। মনে হয়, ঘোর সংসারী। কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই?'

'না, এখনও জোটেনি। আচ্ছা, এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো? ভুবনেশ্বরে আপনার কি ম্যারেজ ব্যুরো আছে?'

'খুলব ভাবছি। কী নাম দেওয়া যায়, ভাবুন তো? শুনলাম, আপনি না কি লেখক। আসলে কী জানেন, আমার এই বন্ধু উপাসনার জন্যই হয়তো আমার ম্যারেজ ব্যুরো খুলতে হবে। এই উপাই হবে আমার ফার্স্ট ক্লায়েন্ট। কী বলুন না, ক্লায়েন্ট হিসাবে খারাপ হবে জয়দেববাবু?'

'খারাপ হবে কেন? উনি সুন্দরী, বিদুষী। ওপেনিংটা ভালই হবে।'

'কথাটা মনে থাকে যেন! তখন ডাকলে আসবেন তো?'

জয়দেব কিছু বলার আগে, উপাসনা বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'কী আজেবাজে বলছিস স্বাতী? তোর চ্যাংড়ামি মারার স্বভাবটা আর গেল না।'

স্বাতী বলল, 'ঠিক আছে ভাই, তোমরা দুই রিসার্চার, উচ্চমার্গের আলোচনা করো। আমি আদার কারবারী, জাহাজের খবর নিয়ে আমার লাভ কী?'

জানলার পাশে বসে নবেন্দু হাসছিল। এ বার বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। স্বাতী, তুমি তো পরোটার কারবারী। টিফিন কেরিয়ারের কোনও খবর তোমার কাছে আছে?'

শুনে উপাসনা খিলখিল করে হেসে উঠল। তখন দেখল, জয়দেব ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হাসি থামিয়ে ও বলল, 'নবেন্দু, তুমি যে এত উইটি তা তো জানতাম না।'

'আমার ঠেক-এ চলো। তারপর তুমি টের পাবে, কেষ্টনগরের ছেলেরা কী?'

মিষ্টুসোনা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে বার্থের ওপর শুইয়ে দিয়ে স্বাতী টিফিন কেরিয়ার খুলে বসল। তার পর বলল, 'অল্পই আছে। আসুন জয়দেববাবু, আপনারা ভাগাভাগি করে খান। আমাদের দু'জনের...আবার ট্রেনে কিছু খাওয়ার অভ্যেস নেই।'

'মাফ করবেন, আমিও ট্রেনে কিছু খেতে পারি না।' জয়দেব বলল। তারপর উপাসনার দিকে তাকিয়ে ফের বলল, 'আবার দেখা হবে কি না জানি না। একটা পরামর্শ আপনাকে দিয়ে যাই। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা খুব স্পর্শকাতর। ওড়িশার জায়গা আর লোক বুঝে ওঁর প্রসঙ্গ তুলবেন, কেমন? না হলে বিপদে পড়তে পারেন।'

উপাসনা বলল, 'জানি। আচায্যিমশাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। কিন্তু কী করে বুঝব, কে পছন্দ করছে, কে করছে না?'

'সেটা বলা খুব মুশকিল। যাক গে, আপনাকে বলি, পাঁচশো বছর পর শ্রীচৈতন্যদেব ফের জন্মেছেন কী না, সেটা জানার একটা উপায় আছে। হায়দ্রাবাদে একটা অর্গানাইজেশন আছে, যার নাম জ্যোতি নারীধাম। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠা করা। ওদের ওখানে গেলে, জানতে পারা যায়, আগের জন্মে আপনি কী বা কে ছিলেন? ওরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।'

উপাসনা বলল, 'সত্যি? ওঁরা বলে দিতে পারবেন, চৈতন্যদেব কোথায় জন্মেছেন?'

'মনে হয়, পারবে। আমি একবার ওখানে গেছিলাম। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। সে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে চাকরি করে। হায়দ্রাবাদে পোস্টেড। ওখানে সাইনগর বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে এক পুরনো মন্দিরের মধ্যে এই জ্যোতি নারীধাম। বন্ধুটা অবশ্য জানতে গেছিল, আগের জন্মে ও কে ছিল?'

খাওয়া থামিয়ে নবেন্দু কথা শুনছিল। বলল, 'ওরা বলে দিল?'

জয়দেব বলল, 'হ্যাঁ। সকালে ওখানে যেতেই ওরা প্রথমে একটা কাগজে বুড়ো আঙুলের ছাপ নিল। তার পর নাম ধাম লিখে নিয়ে বলল, বেলা চারটের সময় ফের আসুন। বিকেলে আমরা যেতেই, একজন অনেকগুলো তালপাতার পুঁথি বের করে, নানারকম প্রশ্ন শুরু করল। ঘণ্টাখানেক পর ওরা আমাদের একটা সিডি হাতে দিয়ে বলল, আপনি আগের জন্মে কে ছিলেন, সেটা সিডি-তে লেখা আছে।'

উপাসনা জিজ্ঞেস করল,' 'আগের জন্মে উনি কে ছিলেন?'

'পুরীর কাছে এক গ্রামের অত্যাচারী জমিদার গোছের। তার নামধাম সব লেখা ছিল। আমরা পরে সেই গ্রামে গেছিলাম। গিয়ে দেখি, সত্যিই সেই নামে একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর দিনটাই আমার বন্ধুর জন্মদিন। আমার বন্ধু ওই বাড়িতে গিয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সবাইকে চিনেছিল। ওরাও বিশ্বাস করে নিয়েছিল। আসলে আমার বন্ধুটাকে কিছুদিন ধরে পুরী খুব টানছিল। সেই কারণে ওর মনে হয়, আগের জন্মে পুরীর সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ আছে। দেখা গেল, সত্যিই ছিল।'

উপাসনা বলল, 'আপনি নিজের কথা জানতে চাইলেন না কেন?'

'আমিও বুড়ো আঙুলের ছাপ আর নাম ধাম সব লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিকেলে যাওয়ার পর ওরা বললেন, আপনার আগের জন্মের হদিশ আমরা এখানে পাচ্ছি না। আপনাকে আমাদের হেড কোয়ার্টার্স কোচিতে যেতে হবে। ওখানে আরও প্রাচীন পুঁথি দেখতে হবে।'

'আমি জানি, আগের জন্মে আপনি কে ছিলেন? বলব?' গলাটা শুনে চমকে উপাসনা জানলার দিকে তাকাল। মহাপ্রভুর মতো দেখতে সেই ছেলেটা হাসিমুখে তাকিয়ে। কথাগুলো ও-ই বলল।

তিরিশ

চারটে মুখ হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দেখে গোরা বলল, 'মাফ করবেন, আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আপনাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?'

নবেন্দুই প্রথম বলে উঠল, 'বিন্দুমাত্র না। আপনার পরিচয়টা...'

গোরা বলল, 'আমার নাম বিশ্বম্ভর ভোই। তবে লোকে আমাকে গোরা বলেই চেনে। আমি ভুবনেশ্বরের ছেলে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। প্লাস রাজনীতি করি। দলিত পার্টির যুব সংগঠনটা দেখি।'

'আরে, আমরাও ভুবনেশ্বরে থাকি। আপনার বাড়ি কোন এরিয়ায়?'

'ইউনিক টু-তে। বাজারের ঢিল ছোড়া দূরত্বে।'

'আমরা থাকি ভীম ট্যাঙ্কি হাউসিংয়ে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে।'

গোরা বলল, 'আমি অবশ্য দিন তিনেকের বেশি ভুবনেশ্বরে থাকব না। পরশু পার্টির সম্মেলন আছে। সেটা হয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় ফিরব।'

জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ওড়িয়া হয়েও, এত সুন্দর বাংলা বলছেন কী করে?'

গোরা বলল, 'অভ্যেস হয়ে গেছে। কলেজ লাইফ থেকে কলকাতায় আছি। আমার সব বন্ধুবান্ধব বাঙালি। তাছাড়া, পলিটিকস করি বলে, মাঠ ঘাটে বক্তৃতা দিতে হয়। বুঝতেই পারছেন, চলতি বাংলাটা না শিখলে, কথাবার্তা লোকের মাথায় ঢোকানো যাবে না। বাধ্য হয়েই কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে নিতে হয়েছে। বাংলা ছাড়া আমি তেলুগুও বলতে পারি।'

স্বাতী বলে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জ্যোতিষচর্চাও করেন?'

গোরা গম্ভীর গলায় বলল, 'কেন জিজ্ঞেস করছেন কথাটা?'

'এই যে আপনি বললেন, আগের জন্মে জয়দেববাবু কে ছিলেন, সেটা বলে দিতে পারবেন?'

'জ্যোতিষীদের সেই ক্ষমতা [illegible] না কি? ওঁরা কি পূর্বজন্মের কথা বলতে পারেন? এ ধারণাটা আপনাকে [illegible] দিল?'

'তা হলে... [illegible]ন বলবেন কী করে?'

'অত [illegible]খ্যা দিতে পারব না। বসে বসে আপনাদের কথা শুনছিলাম, তখনই হঠাৎ চোখের সামনে কয়েকটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। এ রকম অদ্ভুত ঘটনা প্রায়ই আমার চোখের সামনে ঘটে। আবার মিলিয়ে যায়। আমি সত্যিই মেলাতে পারি না। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না, জানি না। যা দেখেছি, সেটা যদি শুনতে চান, তা হলে আমি বলতে পারি।'

জয়দেব বলল, 'এটা প্যারাসাইকোলজি। প্লিজ বলুন। হঠাৎ কী দেখলেন?'

'দাঁড়ান, চেষ্টা করছি।' বলেই চোখ বুজল গোরা। একটু আগে কী দেখেছে, মনে করার চেষ্টা করল। ইস, কথাটা ও দুম করে না-বললেই ভাল করত। কিন্তু ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কে যেন কথাগুলো বলিয়ে নিল। চোখের সামনে প্রায়ই ও এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। তবে প্রতিবার নিজেকে নিয়ে দেখেছে। আজই প্রথম দেখল অন্য একজনকে নিয়ে। এটা রোগ কি না, গোরা জানে না। কোনও ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যাবে, সেটাই গোরা বুঝতে পারছে না। কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট, না কি নিউরো সাইকিয়াট্রিস্ট? প্যারাসাইকোলজিস্টরা কি এই 'রোগ' সারাতে পারেন? কারও পরামর্শ পেলে ভালো হত।

মাত্র একজনকেই গোরা কথাটা বলেছে। তিনি ভাগবত মন্দিরের মোহান্তজি। সে দিন পথপরিক্রমার সময় নাচতে নাচতে ওর ঘোর লেগে গেছিল। ফের অচেনা একটা জগতে গোরা ঢুকে পড়েছিল। মন্দিরে ফিরে সে কথা মোহান্তজিকে বলে ফেলায়, উনি হরিধ্বনি দিয়ে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'জয় রাধে। আপনাকে চিনতে আমি ভুল করিনি। আপনি পুণ্যাত্মা। ত্রিকালদর্শী। আপনি অতীত ঘটনাবলী দেখবেন, এ আর নতুন কী কথা? জয় রাধাগোবিন্দ, কৃষ্ণমুরারি...।'

চোখ বুজে খানিক আগে দেখা সেই দৃশ্যগুলো ফের দেখতে পাচ্ছে গোরা। প্রাচীন এক মন্দির। তার বেড়া সরিয়ে ভেতরে ঢুকছেন এক পরম বৈষ্ণব। তাঁর চোখ মুখে খুশির ছটা। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন মন্দিরের দিকে। বৈষ্ণবের দিকে তাকিয়ে গোরা অবাক হয়ে গেল। এ কী! এ তো কামরার উল্টো দিকে বসে থাকা জয়দেব! একইরকম দেখতে। পরনে শুধু একটুকরো কাপড়। প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছেন। তাঁর কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। নামটা মনে পড়ল গোরার। হরিদাস। পাকশালার সামনে গিয়ে তিনি কাঁধ থেকে ভিক্ষার ঝুলি নামালেন। মাটির পাত্রে রান্না হচ্ছে। ভিক্ষার চাল পাচক-সাধুর হাতে তুলে দিয়ে, হরিদাস কী যেন বললেন। তারপর স্নান করতে চলে গেলেন পুষ্করিণীতে।

মন্দিরের ভেতর এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতে বসেছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে নিজেকে দেখে চমকে উঠল গোরা। মুণ্ডিতমস্তক, কৌপীন পরা। সবাই তাঁকে মহাপ্রভু বলে সম্বোধন করছেন। বৈষ্ণবরা করজোড়ে বসে আছেন। মহাপ্রভু আগে অন্নগ্রহণ করবেন। তারপর তাঁরা। অন্ন মুখে দিয়েই মহাপ্রভু কী যেন জানতে চাইলেন। তারপর ছুড়ে ফেলে দিলেন অন্নের পাত্র। মহাপ্রভু হাত তুলে বেড়ার বাইরে চলে যেতে বলছেন হরিদাসকে। গোরা দেখল, কাঁদতে কাঁদতে হরিদাস বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

...'তার মানে...আপনি বলতে চাইছেন, আমি আগের জন্মে হরিদাস ছিলাম?'

জয়দেবের প্রশ্নে চোখ খুলল গোরা। বলল, 'তাই তো দেখলাম।'

'আমি যতদূর জানি, হরিদাসকে আর কাছে ঘেঁষতে দেননি মহাপ্রভু। অথচ উনি প্রিয় শিষ্যদের একজন ছিলেন। এরপর থেকে সারাদিন বেড়ার বাইরে উনি বসে থাকতেন মহাপ্রভুকে একবার দেখার জন্য। তা সত্ত্বেও, মহাপ্রভুর কৃপা পাননি। দীর্ঘদিন লাঞ্ছনা সয়ে শেষ পর্যন্ত হরিদাস আত্মহত্যা করেন।'

নবেন্দু প্রশ্ন করল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। হরিদাস কী এমন অন্যায় করেছিলেন, যাতে মহাপ্রভু এত রেগে যান?'

জয়দেব বলল, 'আমি বুঝিয়ে বলছি। ওঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী। ভিক্ষা করে অন্নসংস্থান করতেন। ভিক্ষায় বেশিরভাগ দিনই খুঁদকুড়ো জুটত। মহাপ্রভুকে রোজ তা খেতে দেখে হরিদাস খুব কষ্ট পেতেন। ওঁর ইচ্ছে হত, উৎকৃষ্ট মানের চাল ভিক্ষা করে এনে মহাপ্রভুকে খাওয়াবেন। এক দিন তিনি মাধবী নামে এক নর্তকীর বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষা করে এনেছিলেন। তিনি জানতেন না, মাধবীকে মহাপ্রভু পছন্দ করেন না। সুগন্ধী অন্ন মুখে দিয়েই মহাপ্রভু বুঝতে পারেন, কোনও ধনী ব্যক্তির বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার নাম জানতে চান। মাধবীর নাম শুনে উনি মারাত্মক রেগে যান। সেইসঙ্গে হরিদাসকে সন্দেহ করে বসেন। সেই কারণেই উনি হরিদাসকে বের করে দিয়েছিলেন।'

শুনে স্বাতী হাসতে হাসতে বলল, 'জয়দেববাবু... যদি ধরে নিই আপনি আগের জন্মে হরিদাস ছিলেন, তা হলে তো এটাও ধরে নিতে হয়। আপনার চরিত্র ভাল ছিল না।'

স্বাতীর কথায় সবাই হেসে উঠল। জয়দেব নিশ্চিন্ত হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'যাক, ভাল হল। আপনার ম্যারেজ ব্যুরোতে আমাকে আর নাম লেখাতে হবে না।'

নবেন্দু কিন্তু সিরিয়াস, বলল, 'একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হল না গোরা। আপনার কথা যদি সত্যি বলে মেনে নিই, তা হলে এটাও মানতে হয়, গত পাঁচশো বছরে জয়দেব আর কোথাও জন্ম নেননি। সন্ন্যাসী হরিদাসের দেহ ছাড়ার পর উনি স্টেট জয়দেব হিসাবে জন্ম নিয়েছেন? এই পাঁচশোটা বছর তা হলে ওঁর আত্মা কোথায় ছিলেন?'

গোরা বলল, 'সেটা বলতে পারব না। হরিদাস আত্মহনন করেছিলেন। আত্মহনন করা মহাপাপ। সেই পাপস্খালন হয়তো তাঁকে করতে হয়েছে পাঁচ শতক ধরে। আসলে কী জানেন, আপনি ফের মানুষ হিসাবে জন্ম নেবেন কি না, সেটা নির্ভর করবে, এ জন্মে আপনার কর্মফলের ওপর। আপনি যদি খারাপ কাজ করে যান, তা হলে হয়তো আপনি ফের জন্মাতে পারেন। তবে ইতর প্রাণী হয়ে। সাপ-ব্যাং, ইঁদুর, শুয়োর। আর এ জন্মে যদি ভাল কাজ করে যান, পরবর্তী জন্মে আরও বেশি করে মোক্ষলাভের দিকে এগিয়ে যাবেন। অর্থাৎ কি না ঈশ্বরের আরও কাছাকাছি যেতে পারবেন। আমি যদ্দুর জানি, এ জন্মে মারা যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই, পরের জন্ম নিতে হবে, এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। শুনেছি, আপনি ফের কবে মানুষ হয়ে জন্মাবেন, সেটাও ডিপেন্ড করবে, আপনার কর্মফলের ওপর। যাক সে সব কথা। আমার কথা বোধহয় আপনারা বিশ্বাস করেননি। অন্তত, আপনাদের চোখমুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কেন যে আগ বাড়িয়ে কথাগুলো বলতে গেলাম, সেটা ভেবে এখন খারাপ লাগছে।'

জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'রিইনকারনেশনে আপনি বিশ্বাস করেন গোরা?'

'কখনও এ সব নিয়ে ভাবার সময় পাইনি। এ ব্যাপারে আমার যা ধারণা, তা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। আমি যে রাজ্যে জন্মেছি, সেখানে দু'হাত অন্তর মন্দির। অসংখ্য মিথ। মানুষজনও ধর্মভীরু। আপনাদের মতো এনলাইটেনড নয়। ছোটোবেলা থেকে এসব কথা শুনছি। ফলে অস্থিমজ্জায় ঢুকে রয়েছে। পরে কিন্তু আমায় নিয়ে হাসাহাসি করবেন না।'

'আরে ভাই, এত সংকোচ করছেন কেন? হয়তো আপনার কথাই ঠিক। এই দেখুন না, জগতে এত সাবজেক্ট থাকতে কেন আমি রিসার্চের বিষয়বস্তু হিসাবে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুরহস্যই বেছে নিলাম? নিশ্চয়ই এর পিছনে আগের জন্মের কোনও কানেকশন আছে। এই কথাটা অবশ্য আমার নয়। অনেকদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, পুরীর শ্রীচিন্ময়ী আশ্রমের অবধূত মোহান্তজি।'

নবেন্দু বলল, 'রিইনকার্নেশন নিয়ে রিসেন্টলি একটা বই পড়লাম। এক আমেরিকানের লেখা। তবে নামটা আমার মনে নেই। সেলিব্রিটিরা আগের জন্মে কে কী ছিলেন, তা নিয়ে উনি রিসার্চ করেছেন। তবে এত সায়েন্টিফিক টার্মস উনি ইউজ করেছেন যে, বইটার অর্ধেকই আমার মাথায় ঢোকেনি। তবে কথা উঠল বলেই... মনে পড়ল, উনি লিখেছেন, শাহরুখ খান না কি আগের জন্মে কলকাতার এক অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর নাম সাধনা বসু।'

কোনো এক ইংরেজি চ্যানেলে এই বইটা নিয়ে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিল জয়দেব।

ও বলল, 'হ্যাঁ, বইটার কথা আমি জানি। নেহরু না কি এ জন্মে বেনজির ভুট্টো হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।'

গোরা বলল, 'আমেরিকানরা পারে বটে! যা হোক একটা লিখে হই চই বাঁধিয়ে দিলেই হল।' কথাগুলো বলেই ও উঠে দাঁড়াল। একবার টয়লেটের দিকে যেতে হবে ওকে। চোখ মুখে জল দিতে হবে। রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। জানলার দিকে লোয়ার বার্থগুলো এত ছোট, ও টানটান হয়ে শুতে পারেনি। সারা রাত আধশোয়া হয়ে ও শুধু ভেবেছে। ওর চার পাশে যা কিছু ঘটছে, তাতে ফোকাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ও দেখতে পাচ্ছে। জীবনের ছন্দটা কেটে গেল, মা কলকাতায় আসার পর থেকে। রেলের দেওয়া চাদর আর কম্বল ভাঁজ করার ফাঁকে গোরা ঠিক করে নিল, মাকে সাফ বলে দেবে, বিয়ে করার ইচ্ছে ওর নেই। সাধু সন্তদের চক্করে পড়ারও। রাজনীতিটাই মন দিয়ে ও করবে।

'আপনার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে... ভাল হল গোরা। আপনার কনটাক্ট নাম্বার কি দেবেন? পরে যদি দরকার হয়, তা হলে যোগাযোগ করব। বাই দ্য বাই, কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?'

'রাসবিহারী মোড়ের কাছে। আমার নাম্বারটা আপনি লিখে নিন। ফোন করলে সকাল দশটার আগে করবেন। লিখুন, নাইন এইট থ্রি ডাবল জিরো সিক্স...।'

নাম্বারটা নিজের মোবাইলে তুলে নিয়ে জয়দেব বলল, 'একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাই বলছি। প্যারাসাইকোলজিতে ক্লেয়ারভয়েন্স বলে একটা সাবজেক্ট আছে। বিদেশের কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে এ নিয়ে রিসার্চও হয়েছে। কোনও কোনও মানুষ না কী অনেক দিন আগেকার কোনও ঘটনা অথবা হাজার হাজার মাইল দূরে ঘটে যাওয়া ঘটনা, ঘরে বসেই দেখতে পান। আপনার কেসটাও সেইরকম। আপনি স্বচ্ছন্দে রিসার্চের সাবজেক্ট হতে পারেন। প্যারাসাইকোলজিস্টরা আপনাকে পেলে লুফে নেবে। আমি জানি, আরিগোনা ইউনিভার্সিটিতে এ নিয়ে খুব গবেষণা হচ্ছে।'

শুনে নবেন্দু মাথা নাড়ল। বলে উঠল, 'একটু আগে একটা কথা আপনি ঠিক বলেছেন জয়দেব। আমারও মনে পড়ে গেল। এই রিসেন্টলি একটা হিন্দি চ্যানেলে জন্মান্তরবাদ নিয়ে রোজ একটা প্রোগ্রাম দেখতাম। রাজ পিছলে জনম কী। একদিন তাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখলাম। আগের জন্মের অনেক কিছু মানুষ ইনহেরিট করে আনে।'

জয়দেব অবাক হয়ে বলল, 'তাই না কী? এ রকম প্রোগ্রাম হত? কখন হত?'

'রাতের দিকে। এক একদিন একেকজন সেলিব্রিটিকে ওরা ডেকে আনত। আর তাঁকে হিপনোটাইজ করে সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়ে যেতেন আগের জন্মে। একদিন দেখলাম, এক সেলিব্রিটি বলছেন, কাক দেখে তিনি খুব ভয় পান। কেননা, রাস্তায় বেরলেই কোত্থেকে উড়ে এসে, কাক তাঁকে ঠুকরে দেয়। সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁকে হিপনোটাইজ করার পর আমরা জানতে পারলাম, এটা তাঁর পূর্বজন্মের পাপের ফল। আগের জন্মে তিনি কোনো এক মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সেখানে একটা কাককে বলি দেওয়া হয়েছিল। এইজন্য তাঁর ওপর কাক জাতির এত রাগ। জানি না, পুরো ব্যাপারটা চ্যানেলের সাজানো কি না।'

নবেন্দুর কথাগুলো শুনে গোরার হাসি পাচ্ছিল। মানুষ কত কী বিশ্বাস করে নেয়! সাধারণ মানুষ তো আর টিভি চ্যানেলের বাণিজ্যিক মতলব জানে না। রোজগারের জন্য ওরা যা কিছু ইচ্ছে, তাই বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারে। অল্প অভিজ্ঞতাতেই গোরা বুঝতে পেরে গেছে। টিভি চ্যানেল চালায়, উচ্চবর্ণের সব ধূর্ত মানুষ। গরিবের রক্ত চুষে খায়। যে দেশের অর্ধেক মানুষ ভালো করে খেতে পায় না, তারা জানতে চাইবে কোন খুশিতে, আগের জন্মে কী ছিল? তাদের কোনও মাথাব্যথাও নেই। জয়দেব-নবেন্দুরা অবশ্য ওই শ্রেণির মধ্যে পড়েন না। এঁরা হয় পেশাদার, না হয় বুদ্ধিজীবী। মধ্যবিত্ত। এঁদের বাড়িতে টিভি সেট আছে। টিভির প্ররোচনায় এঁরাই প্রভাবিত হন সবথেকে বেশি।

ট্রেনের স্পিড কমে এসেছে। বোধহয় খানিক পরেই ভুবনেশ্বরে ঢুকবে। মোবাইল ফোন বের করে গোরা দেখল, প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। বাড়িতে মা এতক্ষণে ছটফট করছে। হয়তো স্টেশনে পাঠিয়েও দিয়েছে মুকুন্দর বাবাকে। টয়লেটের দিকে পা বাড়িয়ে গোরা দেখল, চেকার ভদ্রলোক হনহন করে এ দিকেই আসছেন। বেশ উত্তেজিত। নবেন্দুকে সামনে পেয়ে উনি বললেন, 'আরে মশাই, এ কামরায় তো কাল রাতে একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেছে!'

এগোতে গিয়েও গোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। চেকার বললেন, 'কটক স্টেশনের আগে ট্র্যাকের পাশে একটা লাশ পাওয়া গেছে। সেই লোকটা না কি এই কামরারই পঞ্চান্ন নম্বর বার্থের প্যাসেঞ্জার ছিল। মানে ...ওর পকেট থেকে সেই টিকিটটা পাওয়া গেছে। এই মাত্র কটকের স্টেশন মাস্টার খবরটা আমায় দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, লোকটার কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা ছিল। লোকটা একা ট্রাভেল করছিল, না কি ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল, বুঝতে পারছি না মশাই।'

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'রাতে আপনি কামরায় ছিলেন না?'

'না, জাজপুরে নেমে, খানিকক্ষণের জন্য পাশের কামরায় কথা বলতে গিয়েছিলাম। কটকেই ফিরে এসেছি। তার মাঝেই বোধহয় ঘটনাটা ঘটে গেছে। টাকার লোভে কেউ লোকটাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

'আর পি এফ-কে খবর দেননি?'

'দিয়েছি। ভুবনেশ্বর থেকে ওরা উঠবে। খুনের পসিবিলিটি মনে হল, তার কারণ, বার্থ থেকে ওর একটা অ্যাটাচি কেস উদ্ধার করলাম, তাতে টাকা ভর্তি। একটা মোবাইল সেটও পেয়েছি। কাল মাঝ রাতে লোকটা মোবাইল থেকে একটা কল করেছিল। সেখানে ফোন করলাম। যে লোকটা ফোন ধরল, সে থাকে কলকাতা মিউজিয়ামের কোয়ার্টার্সে। ফোন ধরে লোকটা কিন্তু বলল, কাল রা[illegible]ওর কাছে একটা মিস্‌ড কল গিয়েছিল। রং নাম্বার বলে ও ছেড়ে দেয়। এ দিকে, এর ফোনে দেখছি, কল টাইমে লেখা আছে প্রায় পনেরো মিনিট। স্পষ্ট বুঝলাম, মিউজিয়ামের লোকটা আমাকে মিথ্যে বলল।'

'আচ্ছা, পঞ্চান্ন নম্বর বার্থের লোকটার নাম কি তিওয়ারি?' প্রশ্নটা করল জয়দেব। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকাল। গোরা লক্ষ করল, জয়দেবের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

চেকার চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, সুরজ তিওয়ারি। কিন্তু আপনি তার নাম জানলেন কী করে?'

'কাল রাতে তিওয়ারিকে আমি টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি। খতরনাক লোক। মিউজিয়ামের কোয়ার্টার্সে থাকে। বিরাট মাফিয়াচক্রের সঙ্গে জড়িত। আমি জানি। কলকাতার পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

একত্রিশ

খণ্ডগিরিতে ঢোকার জন্য টিকিট কাটতে হয়। সে কথা বলে দিয়েছিল গোরা। জয়দেব ভেবেছিল, লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ভাড়া করা মারুতি গাড়ি থেকে নেমে ও দেখল, তেমন কিছু ভিড় নেই। পৌনে চারটে বাজে। যারা দেখতে এসেছিল, তারা এখন ঘরমুখী। রাস্তার দুপাশে দুটো পাহাড়। ড্রাইভার দূর থেকে বলেছিল, একদিকের পাহাড়টা হল উদয়গিরি। অন্যদিকেরটা খণ্ডগিরি। দুদিকেই জৈনদের গুম্ফা আছে, কোনটাতে যেতে চান? জয়দেব বলেছিল, খণ্ডগিরিতে। কেননা, খণ্ডগিরিতেই দেখা করতে বলেছিলেন সুশোভনদা। মিনিট কুড়ি আগে ও হোটেল থেকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু খণ্ডগিরি যে ভুবনেশ্বরের আট কিলোমিটারের মধ্যে... এত কাছে, ও ভাবতেই পারেনি।

রাস্তার দুপাশে খাবারে দোকান। মাছি তাড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে নামতে দেখে একজন জয়দেবের হাত ধরে টানতে শুরু করল। তার দোকানে নিয়ে যেতে চায়। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে, হাত ছাড়িয়ে জয়দেব রাস্তা পার হল। গেটের মুখেই টিকিট ঘর। ও দেখল, লাইনে দু'তিন জনের আগে, একেবারে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সুশোভনদা। ও এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি এসে গেছি। একসঙ্গে দুটো টিকিট কেটে নিন।'

টিকিট কাটার পর সুশোভনদা বললেন, 'তুমি কি পুরী থেকে এলে?'

জয়দেব বলল, 'না, পুরী যাওয়ার সময় পেলাম না। ট্রেন সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। ভুবনেশ্বরেই পৌঁছল প্রায় পৌনে দশটায়। তার পর আর পুরী যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম না। তাহলে চারটের মধ্যে এখানে আর আসতে পারতাম না।'

'গুড ডিসিশন। নরহরি মহাপাত্র এখুনি এসে পড়বেন। উনি ওপরে হাতি গুম্ফার কাছাকাছি থাকবেন। আমরা সরাসরি কথা বলতে যাব না। উনি অল ক্লিয়ার সিগন্যাল দিলে, তবে কাছাকাছি যাব।' সুশোভনদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। জয়দেব লক্ষ করল, চুল উসকোখুসকো, মুখটা শুকিয়ে গেছে। একটু রোগা লাগছে সুশোভনদাকে। গায়ের রংও একটু কালোর দিকে। প্রায় মাসখানেক পর দেখল। একটু খারাপই লাগল জয়দেবের। নিজের বাড়িতে নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে, কীসের টানে সুশোভনদা এই বিপদসঙ্কুল জায়গায় এসেছেন? ওর চোখের ভাষা বোধহয় পড়তে পেরেছেন সুশোভনদা। মুখে হাসি এনে, কাঁধে হাত দিয়ে উনি বললেন, 'পেছনের দিকে আর তাকিয়ো না ব্রাদার। চলো,

এবার আমরা একটু গলা ভিজিয়ে নিই। ওপরে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে। বুড়ো বয়সে এখন খুব কষ্ট হয়। সঙ্গে সবসময় জলের বোতল রাখি।'

জলের বোতল কেনার জন্য রাস্তা পেরিয়ে দুজনে উদয়গিরির এনট্রান্সের কাছে এল। সার সার দোকান। বাইরে চেয়ার-টেবিল পাতা। সেখানে বসে জয়দেব দেখল, দোকানের ভেতর খুব উত্তেজনা। টিভি সেটের সামনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে জনা দশ-বারো ছেলে-মেয়ে। স্কুলকলেজ কেটে সময় কাটাতে এসেছে। হোটেলে শুয়ে এতক্ষণ জয়দেব খেলাই দেখছিল। ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট ম্যাচ চলছে ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে। আজ শেষ দিন। ভারত জেতার মতো জায়গায় আছে... দেখে ও বেরিয়ে এসেছে। মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটগুলো পটাপট পড়ছে। না হলে ছেলেমেয়েগুলো এত লাফালাফি করত না। দু'একজন তো পটকাও ফাটাচ্ছে। জলের বোতল কিনে, একজনের সঙ্গে কথা বলে খেলার স্কোর জেনে নিলেন সুশোভনদা।

কাছে এসে, ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্রিকেট খেলাটা কত গভীরে ঢুকে গেছে... বুঝতে পারছ জয়দেব?'

জয়দেব বলল, 'আপনি কি ক্রিকেট ভালোবাসেন?'

'ভালোবাসি মানে! স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ইডেনে যত টেস্ট ম্যাচ হয়েছে, সবগুলো দেখেছি আমি। এই প্রথম মিস করলাম। জানো, আমি প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখি, নাইটিন ফর্টি এইটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভার্সেস ইন্ডিয়া। বাবার হাত ধরে ইডেনে গেছিলাম। এভার্টন উইকস দুটো ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছিল। সেই ম্যাচে একজন বাঙালি খেলেছিল। কে জানো, মন্টু ব্যানার্জি।'

কথাগুলো বলতে বলতেই সুশোভনদা খণ্ডগিরির গেটের দিকে তাকালেন। একটা স্যান্ট্রো গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনের দরজা খুলে নেমে এলেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। মাঝারি হাইট। মাথার চুল কাশ ফুলের মতো সাদা। পরনে স্যুট টাই। গাড়ি থেকে নেমেই মেন গেট দিয়ে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে গেলেন। ওঁকে বোধহয় সিকিউরিটির লোকেরা চেনেন। তাই টিকিট কাটার দরকার নেই। ভদ্রলোক ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর সুশোভনদা বললন, 'ওই যে... নরহরি মহাপাত্র এসে গেছেন। চলো, আমরা গুটিগুটি করে এগোই। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে আমার সময় লাগবে।'

প্রায় মিনিট দশেক পর ওপরে উঠে জয়দেব দেখল, সুশোভনদা বেশ হাঁফাচ্ছেন। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ওরা একটা পাথরের ওপর বসল। দুদিকে দুটো পথ চলে গেছে। কোনদিকে গেলে হাতি গুম্ফা পড়বে, জানা নেই। অলস পায়ে কয়েকজন দর্শনার্থী পাহাড়ের গায়ে খোদাই দেখছে। সঙ্গে একজন গাইড জুটে গেছে। খণ্ডগিরির ইতিহাস সে বলে যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে জয়দেব দেখল, দূরে ভুবনেশ্বর শহরটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। বেশ কয়েক মাস আগে, জয়দেব একবার কলকাতার সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের ছাদে উঠেছিল। ছত্রিশ তলা ওপর থেকে কলকাতাকে দেখে ওর ধূসর মনে

হয়েছিল। খণ্ডগিরির উচ্চতাও ওই সাউথ সিটির মতো হবে। ও অবাক হয়ে দেখল, কলকাতার সঙ্গে ভুবনেশ্বরের কত তফাত। এখানকার চারদিকটা কী গাঢ় সবুজ!

সবুজের দিকে ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুশোভনদা বললেন, 'দশ বছর আগে একবার তোমার বউদিকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। উদয়গিরি থেকে সানরাইজ দেখেছিলাম। কী দারুণ সেই দৃশ্য, কল্পনাও করতে পারবে না। টাইগার হিলস থেকেও আমি সানরাইজ দেখেছি। কিন্তু ওই উলটোদিকের এই পাহাড়টার... তুলনা নেই। ভালো সানরাইজ দেখা যায় বলে, ওর নাম উদয়গিরি।'

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে জয়দেব ছবি তুলতে শুরু করল। সুশোভনদার কয়েকটা ছবি তোলার পর বলল, 'এই গুম্ফাগুলোতে না কি জৈন সন্ন্যাসীরা থাকতেন?'

সুশোভনদা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এই স্থাপত্য দু'হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। সম্রাট খারবেলের সময়কার। বলা হয়, একবার না কি জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর খণ্ডগিরিতে এসেছিলেন। এখানে বসেই তিনি ধর্মপ্রচার করেন। প্রচুর খরচা করে কলিঙ্গসম্রাট খারবেল এই সব গুহা তৈরি করে দেন। ওঁরা এখানে বসে তপস্যা করতেন। গুহাগুলোর আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। অনন্ত গুম্ফা, তেনতালি গুম্ফা, হাতি গুম্ফা। চলো, হাতি গুম্ফায় তো যাব, তখন তোমায় দেখাব, কিছু শিলালিপি আছে। পালিভাষায় লেখা। ওই লিপি থেকে গুম্ফার নাম উদ্ধার করা গেছে। উদয়গিরি আর খণ্ডগিরিতে না কি মোট একশো তেইশটা গুম্ফা ছিল। তার মধ্যে মাত্র চল্লিশটা এখনও আছে। বাকিগুলো ধস-এর কারণে নষ্ট হয়ে গেছে।'

নিচে দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে বাজি ফাটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। ঢোল বাজানোর শব্দও। জয়দেব বলল, 'সুশোভনদা, আপনার ইন্ডিয়া বোধহয় ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতল।' কিন্তু কথাটা সুশোভনদার মাথায় ঢুকল বলে মনে হল না। ডানদিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'ওই যে দূরে... ওইদিকে একটা পাহাড়ের মতো দেখছ... ওটা ধবলগিরি। ওর চুড়োয় বিরাট একটা বৌদ্ধমূর্তি আছে। ওই মন্দিরের ভাস্কর্য নিয়ে, অনেকদিন আগে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম।'

ডানদিকে তাকিয়ে জয়দেব পাহাড়ের চুড়োয় একটা সাদা মন্দিরের মতো দেখতে পেল। তাহলে ওখানেই ধবলগিরি! নেট-এ ও দেখেছে, পাহাড়ের নিচ দিয়ে দধিভদ্রা নামে একটা ছোটো নদী আছে। ওখানেই নাকি মহর্ষি দধিচীর আশ্রম ছিল। কথাটা সুশোভনদাকে বলতেই উনি বললেন, 'ওই নদীর আশপাশেই মহর্ষি দধিচীর আশ্রমে দেবরাজ ইন্দ্র একবার এসেছিলেন। কেন জানো? দধীচি মুনির অস্থি চাইতে। বৃত্র নামে এক অসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দেবতারা তখন জানতে পারলেন, মর্ত্যে দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে, অস্ত্র তৈরি করে, ইন্দ্র নিরানব্বই বার হত্যা করেন বৃত্রাসুরকে।'

কথাগুলো বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন সুশোভনদা। ধবলগিরির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে সাদা স্তূপটা দেখছ, ওটা তৈরি করে দিয়েছে জাপান সরকার। ওখানে সম্রাট অশোকের আমলের অনেক শিলালিপি রয়েছে। তবে ওই শিলালিপি আমার কাছে

ততটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়নি, যতটা মনে হয়েছে ধবলগিরি নিয়ে এক মিথ শুনে। তুমি শুনতে চাও না কি?'

জয়দেব বলল, 'মিথ মানে? হিস্টোরিকাল ট্রুথ নয়?'

'কে জানে? এই উদয়গিরি-খণ্ডগিরি থেকে ধবলগিরি যাওয়ার একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল আছে। সেই টানেলটাই রহস্যময়। প্রায় কুড়ি কিলোমিটার লম্বা তো হবেই। এই টানেলটা কেন করা হয়েছিল, কে তৈরি করেন, আমার সেটা জানার খুব ইচ্ছে। মিথ হল, সুড়ঙ্গে প্রচুর সাধু বসবাস করেন। তাঁরা ওখানে সংকীর্তন করেন। একদিন নাকি ভূমিকম্প হবে। তখন সুড়ঙ্গ মাটির ওপরে উঠে আসবে। বেরিয়ে আসবেন সাধুরাও। সুড়ঙ্গের দুদিকেই নাকি এখন শ্বেতসর্প পাহারা দেয়। ইংরেজ আমল আর্কিওলজিকাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার লোকজন না কি একবার খণ্ডগিরি থেকে ধবলগিরি যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যাঁরা ভেতরে ঢুকেছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ আর ফিরে আসেনি। বেরিয়ে আসা সেই লোকটা না কি পাগল হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের কথা আর মনে করতে পারছে না।'

'এ ব্যাপারে নরহরি মহাপাত্রকে কি কখনও জিজ্ঞেস করেছেন?'

'না। আজ একবার মনে করিয়ে দিয়ো তো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করব। এবার চলো, অনেকক্ষণ আগে কিন্তু চারটে বেজে গেছে। আমাদের হাতি গুম্ফার কাছে যেতে হবে।'

ব্যাগের ভেতর ক্যামেরা ঢুকিয়ে রেখে জয়দেব বলল, 'চলুন যাওয়া যাক।'

পাহাড়ের গা দিয়ে আরও ওপরে উঠতে গিয়ে জয়দেব টের পেল, এ পাতাল রেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা নয়। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। প্রাকৃতিক কারণেই একটার গায়ে আর একটা ভর দিয়ে আছে। স্ল্যাবগুলো কম-বেশি উচ্চতার। সাবধানে পা না ফেললে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুশোভনদার পিছন পিছন ওপরে উঠতে লাগল জয়দেব। সুশোভনদা যদি কোনও কারণে ব্যালান্স হারান, তাহলে ও ধরে ফেলবে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে দুজনে একটা গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়াল। দম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে সুশোভনদা বললেন, 'এই গুম্ফার মুখটা লক্ষ করো। একটা সাপ যেন হাঁ-মুখে দাঁড়িয়ে আছে! তাই না? দেখলেই কেমন যেন ভয়ভয় করে। আগেরবার ভেতরে ঢুকেছিলাম। গুম্ফার ভেতরটা সাপের দেহের মতো আঁকাবাঁকা। সারপেন্টাইন... বুঝলে?'

বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে নজর বোলালেন সুশোভনদা। বললেন, 'আরি ব্বাস! সাড়ে চারটে বেজে গেছে? আর তো দেরি করা যাবে না। সূর্য ডুবে গেলে এরা যে গেট বন্ধ করে দেবে।'

জয়দেব বলল, 'হোটেলের রিসেপশনিস্ট আমায় বলছিল, পারলে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসবেন। খণ্ডগিরি সন্ধের পর আর সেফ জায়গা নয়। এখানে নাকি ছিনতাই, খুন সব কিছু হয়।'

'ঠিক বলেছে। নরহরি মহাপাত্রও আমাকে সে কথা বলেছে। আগেরবার যখন এসেছিলাম, রাত দশটা অবধি এখানে কাটিয়েছিলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। বুঝতেই পারছ,

কী রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে খণ্ডগিরি চাঁদের আলোয়। তখন এইসব অসভ্যতা ছিল না ব্রাদার।'

কথা বলতে বলতে দুজনে পাথরের সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গাছ। মাথার ওপর যেন ছাতা ধরে আছে। এই রুক্ষ পাথরের মধ্যে বিরাট গাছগুলো জীবনের রস কোথা থেকে সংগ্রহ করছে, ভেবে জয়দেব অবাক হল। খণ্ডগিরি কথাটার মানে ভাঙা পাহাড়। হয়তো ভাঙা পাথরের খাঁজের ভেতর দিয়ে, গাছগুলো শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে। ওরাই সবাই মিলে আঁকড়ে ধরে আছে খণ্ডগিরিকে। এসব ভাবতে ভাবতেই জয়দেব একটা গুম্ফার সামনে এসে দাঁড়াল। আকৃতি দেখেই বুঝতে পারল, এটা হাতি গুম্ফা। কিন্তু তিনি কোথায়? নরহরি মহাপাত্র?

আশপাশ জরিপ করে নিয়ে সুশোভনদা বললেন, 'ওই যে মহাপাত্র... ঝোপের আড়ালে। বেঞ্চে বসে আছেন। চলো, সামনে দিয়ে যাই। উনি সিগন্যাল দিলে, তখন কথা বলা যাবে।'

চার-পাঁচজনের একটা পরিবারকে গাইড হাতি গুম্ফার ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছে। সুশোভনদা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মহাপাত্র ততক্ষণে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সুশোভনদাকে না-চেনার ভান করে উনি খানিকটা হেঁটে, পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আরও ওপরের দিকে উঠতে লাগলেন। খণ্ডগিরির একেবারে চুড়োয় পার্শ্বনাথের একটা মূর্তি আছে। জয়দেবের মনে হল, মহাপাত্র সম্ভবত হাতি গুম্ফায় কথা বলতে চান না। হয়তো কাছাকাছি এমন কাউকে দেখেছেন, যাকে অ্যাভয়েড করতে চান। তাই পার্শ্বনাথের মূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ওখানে অনেক লোক। ভিড়ে কথা বলার সুবিধে। বুঝতে পেরে সুশোভনদাও মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অনুচ্চস্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? তীরে এসে তরী ডুববে না কি?'

জয়দেব বলল, 'বোধহয় কেউ ওঁকে ফলো করছেন। সুশোভনদা সাবধান, কেউ যেন বুঝতে না পারেন, আমরা মহাপাত্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মহাপাত্র যে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেছিলেন, তার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়দেব। কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ও বলল, 'একটা প্রশ্ন মাঝে আমাকে খুব ডিসটার্ব করছিল সুশোভনদা। ধরুন, জামিল ফেরদৌসের আঁকা তৃতীয় ছবিটা দেখার সুযোগ যদি আমরা পাইও, তাহলে কী প্রমাণ হবে?'

বেঞ্চে বসে সুশোভনদা বললেন, 'ধরো, তুমি এখানে আসোনি। আমি অনন্ত গুম্ফার ছবিটা তুলে নিয়ে গিয়ে তোমাকে যদি দেখাতাম, তাহলে কী প্রমাণ হত? খণ্ডগিরিতে অনন্ত গুম্ফা আছে, না নেই?'

'কিন্তু... তুলনাটা কি ঠিক হল সুশোভনদা?'

'কেন নয়? জগতে অনেক উদাহরণ আছে ভাই। একটা ছবি, একটা ফ্রেসকো পেইন্টিং, কত ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে তুলে ধরেছে, ভাব তো? খাজুরাহো, অজন্তা ইলোরার কথা মনে করো। অথবা মায়া সভ্যতার কথা, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা। কত উদাহরণ দেব?

এসব প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ সময় নষ্ট কোরো না ব্রাদার। দেখাই যাক না, জামিল ফেরদৌসের ছবিতে কী আছে। তার পর না হয়, আমরা বিচার করতে বসব, শ্রীচৈতন্যদেবকে খুন করা হয়েছিল, না কি উনি জগন্নাথের অঙ্গে মিশে গেছিলেন!'

'কিন্তু ছবিটা যে পাঁচশো বছর আগেকার, সেটা কি প্রমাণ করা যাবে?'

'ওটা কোনও সমস্যাই নয়। ল্যাবরেটরিতে দিলেই জানতে পারা যাবে। এক্সপার্টরা আছেন। ওঁরাই বলে দিতে পারবেন। এই ছবিটা সম্পর্কে কেন আমি ইন্টারেস্টেড, সেটা জানো? স্রেফ তোমার জন্য। আমি চাই, মহাপাত্র এমন কোনও সূত্র দিন, যা তোমার রিসার্চের কাজ.... অনেকটাই এগিয়ে দেবে।'

কথাগুলো বলতে বলতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুশোভনদা। বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো, আমরা ওপরে যাই। এখানে ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসে।'

দুজনে ওপরের দিকে ওঠার সময় হঠাৎ একটা অল্পবয়সি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁধ ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে... জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মধ্যে সুশোভনবাবু বলে কেউ আছেন?'

সুশোভনদা বললেন, 'আমি। কেন বলো তো?'

'একটা বুড়ো লোক আমাকে বলল, আপনাকে এই চিঠিটা দশ মিনিট পর দিতে।' বলেই হাতে ধরা একটা সাদা খাম ছেলেটা এগিয়ে দিল।

খাম হাতে নিয়ে সুশোভনদা বললেন, 'বুড়ো লোকটা কোথায় গেল?'

'উনি ওই দিক দিয়ে নিচে নেমে গেছেন। ওই যে দেখুন, গাড়িতে উঠছেন।'

জয়দেব চমকে নিচের দিকে তাকাল। বিকেলের পড়ন্ত আলোয়, অত উঁচু থেকেও দেখতে পেল, গেটের বাইরে রাস্তায়... গাড়িতে উঠছেন স্যুটপরা এক ভদ্রলোক। সাদা চুল, হ্যাঁ, নরহরি মহাপাত্রই। কিন্তু এভাবে পালিয়ে যাওয়ার মানে? তাহলে ওরা যা আন্দাজ করেছিল, সেটাই ঠিক? এত কাছে এসেও ওরা মহাপাত্রর সঙ্গে কথা বলতে পারল না, কেউ ওঁকে ফলো করেছে বলে! কলকাতা থেকে এত দূরে জয়দেব কিন্তু অনেক আশা করে এসেছিল, একটা ক্লু পাবে বলে। সব পণ্ডশ্রম। শূন্যদৃষ্টিতে ও তাকাল সুশোভনদার দিকে। ভাঙা গলায় বলল, 'এখানে থাকা আর সেফ বলে মনে হচ্ছে না। চলুন, আমরা নিচে নেমে যাই।'

বত্রিশ

সন্ধেবেলায় পুরন্দর যখন আশ্রমে পৌঁছল, তখন মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে সবাই সেখানেই ব্যস্ত। ধীর পায়ে ও সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ভাগ্য ভালো, পূজ্যপাদদের কারও চোখে ও পড়েনি। ওকে কেউ দেখতে পেলে, সঙ্গেসঙ্গে খবর পাঠিয়ে দিতেন হেড কোয়ার্টার্সে। পাতাল গর্ভে নামার আগে, কী মনে হওয়ায় পুরন্দর পা বাড়াল

বেলি নানীর ঘরের দিকে। সারাটা দিন প্রায় কিছুই মুখে দেয়নি ও। অভুক্ত শরীর ভীষণ ক্লান্ত। বেলি নানীর ঘরে ফলমূল, মিষ্টি বা প্রসাদ... কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে। পেটে কিছু দিলে, ওর চিন্তাশক্তি ফিরে আসবে। শাস্তির ভয়টা ওর মনকে এমনভবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আপাতত ও অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

নানীর ঘরে ঢোকার সময় পুরন্দরের চোখে পড়ল, উলটোদিক থেকে কে যেন হেঁটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ও থামের আড়ালে চলে গেল। কাছে আসতেই ও দেখল, একটা যুবতী মেয়ে। খুব সুন্দর সেজেছে। পরনে দামি শাড়ি, প্রচুর অলঙ্কার। খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা। ফুলের গন্ধটা ওর নাকে লেগে রইল। এই সময় মন্দিরের রত্ন সিংহাসনের কাছে গেলে এই গন্ধটা ম ম করে। মনে হয়, সত্যিই দেবতা বুঝি ওখানে রয়েছেন। কিন্তু ওখানে ওর যাওয়ার উপায় নেই। পূজ্যপাদদের আদেশ ছাড়া পুরন্দরের পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। ওদের বলা হয়, দেবতাদের জন্য ওদের জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু দেবতাদের কাছে ওদের ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

যুবতী মেয়েটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পর থামের আড়াল থেকে পুরন্দর বেরিয়ে এল। তার পর বেলি নানীর ঘরে ঢুকে খুঁজতে লাগল, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কোথায় কী আছে। নানী এখন ঘরে নেই। এই সময়টায় নানী মন্দিরে গিয়ে বসে থাকে। নির্জন ঘরে শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছে। লম্বা শিখাটার দিকে তাকিয়ে পুরন্দরের হঠাৎ ফুলির ঘরের কথা মনে হল। ফুলির উলঙ্গ দেহটার কথাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে দৃশ্যটা ও মুছে ফেলল। কলকাতায় ও এমন অনেক কিছু করেছে, যা করা ওর বারণ ছিল। নারী সঙ্গমের কথা পূজ্যপাদরা জানতে পারলে, ভয়ানক শাস্তি দেবেন। তবে জানার সম্ভাবনা খুবই কম। একটাই কারণে ও শাস্তি পাবে। সেটা জয়দেবকে খুন করতে না-পারার জন্য।

প্রদীপের আলোয় খুঁজতে খুঁজতে পুরন্দর দেখতে পেল, পিতলের থালায় কিছু ফল রাখা আছে। আপেল, কলা, পেঁপে, আঙুর। থালাটা বিছানার ওপর নিয়ে গিয়ে, বসে বসে ও ফল খেতে লাগল। ইচ্ছে করলে আজ ও পালিয়ে যেতে পারত। ভুবনেশ্বরে একটা সময় কথাটা ওর মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু আজন্ম এক সংস্কার ওকে টেনে আনল আশ্রমে। ও জানে, পালিয়ে গেলে, একদিন-না-একদিন ধরা পড়বেই। কেননা, পূজ্যপাদদের হাত স্বর্গ পর্যন্ত লম্বা। এত চমৎকার ওদের নেটওয়ার্ক, পুরন্দরের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হত না। কে জানে, ওকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে, পূজ্যপাদরা ওর ওপরই নজরদারি করেন কি না? ওদের পক্ষে সবই সম্ভব।

পুরন্দরের এত খিদে পেয়েছিল, মিনিট দশেকের মধ্যেই ও থালা খালি করে ফেলল। তারপর প্রদীপটা যথাস্থানে রেখে ও বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে রইল। নানী ছাড়া এই ঘরে অন্য কারও ঢোকার সম্ভাবনা কম। মন্দিরে আরতি শেষ হতে এখনও ঘণ্টাখানেক। নানী ফিরে আসবেন তার পর। রাত্তিরটা ওর কীভাবে কাটবে, পুরন্দর জানে না। তবে নানীর কাছে ও খানিকটা আন্দাজ পেতে পারে। পূজ্যপাদ জগৎবল্লভের সঙ্গে বেলি নানীর একটা সম্পর্ক আছে। রোজ রাত্তিরে উনি নানীর ঘরে আসেন। সেই সূত্রে নানী হেড

কোয়ার্টার্সের অনেক কথা আগাম জেনে যান। পুরন্দর ঠিক করল, নানীর জন্য ও অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে যতটুকু বিশ্রাম পাওয়া যায়, ততটাই মঙ্গল।

শুয়ে শুয়ে পুরন্দর বিশ্লেষণ করতে লাগল, জয়দেব বলে লোকটাকে ও খুন করতে পারল না কেন? পূজ্যপাদরা যখনই যা করতে বলেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তখনই সেটা ও করে দিয়েছে। বেহালায় কিঙ্কর বলে পুলিশ অফিসার সামনে এসে দাঁড়াল। আর ট্রেনে ওই ছেলেটা। আসলে জয়দেবের আয়ু এখনও শেষ হয়নি। কাল ভোর রাতে জয়দেবকে ও খুন করতে গেছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে ওর নিচের বার্থের ছেলেটা... যার কাছাকাছি গেলে ওর অস্বস্তি হচ্ছিল... সে জেগে বসে আছে। দ্রুত পা চালিয়ে ও তখন টয়লেটের দিকে চলে যায়। ফিরে এসে তিওয়ারি বলে লোকটার বার্থে শুয়ে পড়ে। সকালে ওর ঘুম ভাঙে চেকারের ডাকে। চেকার ওর টিকিট দেখতে চান। তার পর জিজ্ঞেস করেন, নিজের বার্থ ছেড়ে কেন ও অন্যের বার্থে শুয়ে পড়েছে। চেকারের মুখ থেকে তখনই পুরন্দর জানতে পারে, রেল লাইনে তিওয়ারির লাশ পাওয়া গেছে। ভুবনেশ্বরে পুলিশ কামরার সব প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।

শুনে পুরন্দর আর কোনও ঝুঁকি নেয়নি। ট্রেন স্টেশনে ঢোকার আগে ও টয়লেটে ঢুকে পড়েছিল। আধ ঘণ্টা পর টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখে, কামরা খালি। প্ল্যাটফর্মে নেমে দূর থেকে ওর চোখে পড়ে, স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে জয়দেবরা দাঁড়িয়ে আছে। তখনই পুরন্দর বুঝতে পারে, পুলিশের চক্করে জয়দেব পুরী যেতে পারবে না। ভুবনেশ্বরে ও কোন হোটেলে ওঠে, সেটা লক্ষ রাখতে হবে। হোটেলে জয়দেবকে মেরে ফেলা কঠিন হবে না। নাঃ, আর দেরি করা যাবে না। ওর হাত নিসপিস করছিল তখন। বেহালা থেকে লোকটা ভুবনেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দু-দুবার হাত থেকে ফসকে গেছে। হয়তো এটাই শেষ সুযোগ। পুরন্দর দেখিয়ে দেবে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

চোখ বুজে কথাগুলো ভাবছিল পুরন্দর। হঠাৎ কে যেন বলল, 'পুরন্দর, কখন এলি? তোর কথা আজই আমি চিন্তা করছিলাম।'

চোখ খুলে পুরন্দর দেখল, ঘন অন্ধকার। প্রদীপটা নিভে গেছে। কথাটা কে বলল, ও তাকে দেখতে পেল না। ধড়মড়িয়ে ও উঠে বসল। বলল, 'কে তুমি?'

'আমায় চিনতে পারছিস না? আমার সঙ্গে তোর কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। তোর সঙ্গে ভগবান যে আমাকেও পাঠিয়েছেন।'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'এবার দ্যাখ, তোর সামনেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

কয়েক সেকেন্ড পর পুরন্দর টের পেল, ওর এক হাত দূরে ওর ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে। বেলি নানী তাহলে ঠিকই বলেছিল। ভগবান যখন কাউকে ধরাধামে পাঠান, তখন তার ছায়াটাকেও সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। ফুলির ঘরে সেদিন ছায়া দেখার অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে। মানুষ মারা যাওয়ার ঠিক আগেই কি তার ছায়া এসে দেখা দেয়? তাহলে কি ওরও মৃত্যু আসন্ন? পূজ্যপাদরা ওকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? একটা মারাত্মক ভয় পুরন্দরকে আচ্ছন্ন

করে ফেলল। আতঙ্কে ও চোখ বুজে ফেলল। অনেকক্ষণ পর .... ভয়ের ভাবটা কেটে যেতেই ও শুনতে পেল, 'ফুলের মতো মেয়েটাকে তুই খুন করলি কেন রে?'

শুনে চোখ খুলল পুরন্দর। নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, 'তুই জানলি কী করে?'

'আমি সব জানি। মোহান্তির বউটাকেও তুই মেরেছিস। তুই কি জানিস, নরহত্যা মহাপাপ? নরকেও যে তোর ঠাঁই হবে না পুরন্দর। ওরা তোর কী ক্ষতি করেছিল?'

'ওরা... ওরা শ্রীচৈতন্য বলে লোকটাকে পুজো করত কেন?'

'তাতে তোর কী? মানুষ পূজা করে ভক্তি থেকে। বিশ্বাস থেকে। এই ধর না... তোর যেমন বিশ্বাস, পুরীর জগন্নাথদেবই ভগবান, ওরাও তেমন মনে করে, শ্রীচৈতন্য ভগবানের অংশ... অবতার। ওরা তো তোর বিশ্বাসে আঘাত করেনি। তুই কেন করতে গেলি?'

'তবে যে পূজ্যপাদরা বলেন, শ্রীচৈতন্য লোকটা ওড়িয়া সমাজের শত্রু... আসলে এক বুজরুক। লোকটা না কি বলত, জগন্নাথদেব নন, ও-ই ভগবান। এই কথা বলে সবাইকে বশ করে ফেলেছিল। ছোটোবেলা থেকে তো এই কথাটাই আমরা জেনে এসেছি।'

'কী বোকা রে তুই। পূজ্যপাদদের কেন পালটা প্রশ্ন করিসনি, লোকটা কী এমন করেছিল, যাতে আমাদের সমাজের রাজা-মন্ত্রী, জ্ঞানীগুণীরাও ওর বশ হয়ে গেছিলেন। তাঁরা তো কেউ মূর্খ ছিলেন না। শোন আমি যদি বলি, শ্রীচৈতন্য আমাদের উদ্ধার করার জন্যই শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন, নীচু-উঁচু, অব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ সব জাতের লোকদের উনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন, ভক্তিরসে উনি আমাদের পবিত্র করে গেছেন, তাহলে কি তুই বিশ্বাস করবি? আসলে কী জানিস, তুই একটা আকাট মূর্খ। তোকে ভুল বুঝিয়েছে পূজ্যপাদরা। তুইও তেমন বুঝেছিস। অনেক পাপ করেছিস পুরন্দর। এবার প্রশ্ন করতে শেখ।'

'পূজ্যপাদদের কথা না শুনলে... ওরা কী শাস্তি দেন, তুই জানিস?'

'আরে, ওরা শাস্তি দেওয়ার কে? শাস্তি তো দেবে ভগবান। পাপ-পুণ্যের হিসেবনিকেশ উনিই করবেন। পাপের বোঝা আর ভারী করিস না। পরের জন্মে তাহলে দেখবি, ওঁরা যা বলেছেন, তার অর্ধেকই সত্যি নয়। কী রে, আমার কথা মনে থাকবে?'

পুরন্দর ঘাড় নাড়ল। মনে থাকবে। হঠাৎই ও দেখল, ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে কেউ নেই। চুপ করে ও শুয়ে রইল। নির্জন অন্ধকার ঘরে, ওর মাথায় একটা কথাই ঘুরতে লাগল। 'পূজ্যপাদদের কথা কি কখনও মিলিয়ে দেখেছিস?' সত্যিই তো, পূজ্যপাদদের কথা মিলিয়ে দেখার কথা পুরন্দর কখনো ভাবেনি। ওঁরা যা বলেছেন, সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে তা মেনে নিয়েছে। আশ্রমের সবাই বিশ্বাসও করেছে। শুয়ে শুয়ে পূজ্যপাদদের কথা ও মেলাতে শুরু করল। পূজ্যপাদরা বলেন, জগন্নাথদেব ভগবান। তাঁর শরীর নিমকাঠ দিয়ে তৈরি। বারো বছর অন্তর তাঁর শরীর বদলাতে হয়। সেই নব কলেবর হয়, কত রকম নিয়ম আচার মেনে। সারাদিন কত পুজো আচ্চা, ভোগ, ধনরত্ন উপহার পান ভগবান। তার বদলে মানুষ কী পায়? এই প্রশ্নটা তো উঠতেই পারে। পুরন্দররা তো কখনও জানতে চায়নি, ভগবান কাকে বলে? এই ব্যাখ্যাটাই তো কেউ ওদের দেয়নি।

সবসময় বোঝানো হয়েছে, ভগবান হলেন জুজু। তাঁকে তুষ্ট করতে হলে জপ করতে হবে। ছোটোবেলা থেকে ওদের শেখানো হয়েছে,

'তত্র পঙ্কজমধ্যস্থং শোভনং বনমালিনং
নবনীরদশ্যামং পীতবাসসসমতচ্যুতং
পূর্ণচন্দ্রাননং নাথং জগন্নাথং ভজাম্যহম্'।

মুখে শুধু জপই করে গেছে পুরন্দররা। কথাগুলোর মানে বোঝেনি। পূজ্যপাদরা বুঝিয়েও দেননি। ওরাও কোনওদিন জানতে চায়নি, যে মন্ত্র ওরা উচ্চারণ করছে, কেন করছে? পূজ্যপাদরা এতদিন বলে এসেছেন, ভগবান নাকি সর্বশক্তিমান। কোনও কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। এমন কিছু কোরো না, যাতে ভগবান রুষ্ট হন। কী কোরো না, তা কিন্তু ভগবানের নাম করে পূজ্যপাদরা বলেছেন। এত দিনে, এই প্রথম পুরন্দরের মনে প্রশ্ন জাগছে, ভগবানের নামে কেন এত অনুশাসন? কেন ওদের এত ভয় দেখানো হবে।

ঘরের বাইরে কয়েকজনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুনে উঠে বসল পুরন্দর। মৃদু কথাবার্তার আওয়াজও শুনতে পেল ও। বুঝতে পারল না, এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কি না? ঘরে ঢুকে ওকে দেখে আঁতকে উঠলেন বেলি নানী। মুখে আঁচল দিয়ে বললেন, 'তুই!! কীভাবে এলি?'

বিছানা থেকে নেমে পুরন্দর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কেন... অশ্বদ্বার দিয়ে।' মন্দিরের সামনের প্রবেশপথ হল সিংহদ্বার। পিছনেরটা অশ্বদ্বার।

'তোকে কেউ দেখেনি?' বলেই পিছন ফিরে তাকালেন বেলি নানী।

দোরগোড়ায় আরও কয়েকজন মহিলার মুখ। এমনভাবে তাকিয়ে, যেন জন্তু-জানোয়ার দেখছে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে পুরন্দর বলল, 'লক্ষ করিনি। কেন নানী?'

'পদ্মনাভ যে তোকে খুঁজছে। তোর ওপর মারাত্মক ক্ষেপে আছে। তুই পালিয়ে যা বাছা। তোকে দেখতে পেলে... ওরা যে তোকে মহাবলীর ঘরে পাঠিয়ে দেবে।'

মহাবলীর কথা পুরন্দর ছোটোবেলা থেকে শুনছে। তাকে কখনো চোখে দেখেনি। মহাবলী হল বৃহদাকার এক ষণ্ড। পুরাণযুগে কে এক বৃত্রাসুর ছিলেন। তারই বংশধর। পাতাল ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। হিংস্র, সর্বদাই ক্রুদ্ধ। সে না কি এমন ভয়ানক, শিঙের গুঁতোয় নিমেষে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিতে পারে মানুষকে। মহাবলীর ফোঁসফোঁসানির শব্দ না কি এক ক্রোশ দূর থেকে শোনা যায়। কেউ বিশ্বাসভঙ্গ করলে, চরম শাস্তি হিসাবে... পূজ্যপাদরা তাকে মহাবলীর ঘরে ছুঁড়ে দেন। তার হাত দুটো তখন পিছমোড়া করে বাঁধা থকে। প্রদীপের শিখায় হাত পোড়ানো, গরম শিক ছ্যাঁকা দেওয়া, বেত্রাঘাত, বুকে ভারী পাথর চাপা দিয়ে শীতল চাতালে শুইয়ে রাখা... এসব মামুলি শাস্তি। চরম শাস্তি হল মহাবলীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া। বছর কয়েক আগে বিমলা মন্দিরে চুরি হয়েছিল। বেলি নানীর মুখে পুরন্দর শুনেছে, চোর ধরা পড়ার পর পূজ্যপাদরা না কি

তাকে পুলিশের হাতে দেননি। শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে মহাবলীর ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। পরে তার ক্ষতবিক্ষত দেহটা পুঁতে ফেলা হয়।

বেলি নানী ওর হাত ধরে কাঁদছেন, 'বল বাছা, তুই কী এমন অপরাধ করেছিস যে, ওরা তোকে মহাবলীর ঘরে পাঠানোর কথা বলছে?'

পুরন্দর বলল, 'আমি জানি না নানী। সত্যিই জানি না।'

দোরগোড়া থেকে মহিলারা অদৃশ্য হয়ে গেছেন। পুরন্দর ভাবার চেষ্টা করল, ওর কোন অপরাধের কথা পূজ্যপাদরা জানতে পেরেছেন। কলকাতায় তিন তিনটে খুন ও করে এসেছে। অথচ যে খুনটা ওকে করে আসতে বলা হল, সেটাই করে আসতে পারেনি। উলটোডাঙায় বেশ্যা মেয়েটা অথবা ফুলিকে খুন করার কথা... পুরন্দর নিশ্চিত... পূজ্যপাদদের কানে পৌঁছবে না। কাঁকুড়গাছির মেয়েটার কথা এঁরা জানতে পারেন। অম্বালিকা বলে ওই মেয়েটার মা পূজ্যপাদ পদ্মনাভর কাছে আসেন। হ্যাঁ, তিনিই জানিয়ে দিতে পারেন পূজ্যপাদকে। প্রথমে ধর্ষণ তার পর খুন... এটা নিশ্চয়ই একটা বড়ো ধরনের অপরাধ।

ওকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করছেন নানী। 'তোর মা হতভাগীকে কী করে আমি মুখ দেখাব বাছা। তাকে যে আমি কথা দিয়েছিলাম, তোকে আমি চোখে চোখে রাখব।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল পুরন্দর। বেলি নানী কেন যে ওর প্রতি এত স্নেহপ্রবণ, এতদিনে সেটা বুঝতে পারল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ও জিজ্ঞেস করল, 'আমার মাকে, আপনি জানেন?'

'জানব না কেন বাছা? এই পোড়া চোখে কত কী অনাচারই না দেখলাম। তোর মা যখন তোকে পেটে ধরেছিল, তখন ও কুমারী। ও দেবদাসী হতে চেয়ে এই বিষ্ণু মন্দিরে এসেছিল। ওর ভরা যৌবন আর রূপের টানে পদ্মনাভর মাথা ঘুরে গেছিল। এই পদ্মনাভই তোর মায়ের সর্বনাশ করেছিল। তুই যখন জন্মালি, তখন পদ্মনাভ তোকে নিচের আশ্রমে নিয়ে গেল। আর তোর মাকে জোর করে বিয়ে দিল এক শবরের সঙ্গে।'

'আমার মা এখন কোথায় নানী?'

'ভুবনেশ্বরে। প্রতি সোমবার বেলা ঠিক দশটার সময় ও লিঙ্গরাজের মন্দিরে পুজো দিতে যায়। বাছা রে, বেঁচে যদি থাকিস, তাহলে একবার গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসিস।'

'তাঁর কী নাম নানী'?

'বিশাখা। দেখলেই চিনতে পারবি। তুই যে তোর মায়ের মতো মুখ নিয়ে জন্মেছিস বাছা।'

পুরন্দর ফের কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, পূজ্যপাদ পদ্মনাভ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পিছনেই কয়েকজন প্রতিহারী। জলদগম্ভীর স্বরে পূজ্যপাদ বললেন, 'তাহলে তুই এখানে? ঠিক খবরই পেয়েছি। এই... শুয়োরটাকে তোরা পিছমোড়া করে বেঁধে, হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে চল।'

...গভীর রাতে জ্ঞান ফিরে আসার পর পুরন্দর নিজেকে আবিষ্কার করল, পাতালপুরীর ঠান্ডা চাতালে। যাক, ও তাহলে বেঁচে আছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। বেত্রাঘাতের নমুনা। তখনই হেড কোয়ার্টার্সে নির্যাতনের কথা ওর মনে পড়ল। হাত আর পা দুটো শেকলে বাঁধা। বুকের ওপর ভারী পাথর। তবুও ও নিশ্বাস নিচ্ছে। শরীর বশে নেই। শুধু চোখ খুলতে পারছে। পুরন্দর দেখল, ওপরে অন্ধকার আকাশ। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। পূজ্যপাদরা ওকে মহাবলীর কাছে পাঠাননি। তার বদলে... ওকে শপথ নিতে হয়েছে, এক পক্ষকালের মধ্যে যে করেই হোক, জয়দেবকে হত্যা করতে হবে।

দেহের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে পুরন্দর আরও তিনটে শপথ নিল। এক, লিঙ্গরাজের মন্দিরে গিয়ে মাকে ও দূর থেকে দেখে আসবে। দুই, পদ্মনাভকে ও নির্মমভবে হত্যা করবে। তিন, যে সংস্থার হয়ে এত দিন ও এত পাপ করেছে, তাদের ধ্বংস করবে। শপথগুলো নেওয়ার পর, পুরন্দর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।

তেত্রিশ

ভীম ট্যাঙ্কি হাউসিংয়ে প্রথম সকালটা বেশ সুন্দর কাটল উপাসনার। ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। অনেক দিন পর ও পাখির কলতান শুনল। বেহালায় কাকার বাড়িতে এই মিষ্টি আওয়াজগুলো শোনা যায় না। তার বদলে ওর ঘুম ভাঙে সাইকেল রিকশার হর্নে। রাস্তার পাশে বাড়ি। সব সময় হই হট্টগোল। ভুবনেশ্বর শহরটা ওর ভালো লেগে গেল, পাখিদের জন্যই। হাউসিংয়ের ভেতর কত গাছ। কাছাকাছি বোধহয় কোনও মন্দির আছে। সেখান থেকে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ ভেসে আসছে। মুখ টুখ ধুয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করার সময় উপাসনা দেখল, স্বাতী আর নবেন্দু মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরছে। দুজনের পরনে ট্র্যাক স্যুট। কী স্মার্ট দেখাচ্ছে স্বাতীকে। ওকে দেখে কে বলবে, নবদ্বীপের মেয়ে?

দোতলায় উঠে এসে নবেন্দু বলল, 'কাল তো আড্ডা মেরে কেটে গেল। চলো, আজ কোথাও ঘুরে আসি। কী বলো উপা?'

স্বাতী বলল, 'উপা কী বলবে? প্রোগ্রাম তো করব আমি। আগে বলো, তুমি অফিস যাবে, না কি ডুব মারবে। তার পর ঠিক করব, আমরা কোথায় কোথায় যাব।'

নবেন্দু বলল, 'অফিস যাওয়ার কথা তুমি বললে কী করে স্বাতী? যদ্দিন উপা আছে, তদ্দিন নো অফিস। ওকে আমি প্রমিস করেছি।'

'ঠিক আছে, তাহলে সারাদিনের প্রোগ্রাম করা যাক। সকালে লিঙ্গরাজের মন্দির, দুপুরে নন্দন কানন চিড়িয়াখানা...।'

'আবার আমাকে লিঙ্গরাজের মন্দিরে নিয়ে যাবে?'

'যাব, কিন্তু একটা শর্তে। তুমি কোনও অসভ্য কথা বলবে না। ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না। এতে পাপ হয়।'

নবেন্দু হাসছে দেখে উপাসনা বলল, 'কী ব্যাপার রে? লিঙ্গরাজ মন্দিরে কী এমন আছে?'

'গেলেই দেখতে পাবি। শোনো নবেন্দু, মুনিয়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ও মিষ্টুসোনার খেয়াল রাখবে। ওর সামনে যেন ফাজলামো কোরো না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

মুনিয়া হল চোদ্দো-পনেরো বছরের আদিবাসী মেয়ে। গায়ের রং মিশকালো, কিন্তু সুন্দর গড়নের। স্বাতীর বাড়িতে কাজ করে। সকাল-বিকাল এ বাড়িতে থাকে, রাতে নিজেদের বস্তিতে চলে যায়। মেয়েটা খুব মিষ্টি স্বভাবের। ওকে দেখে ভালো লেগে গেছে উপাসনার। মেয়েটা এত সরল, কাল ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এত ফরসা কী করে হলে গো দিদিমণি? উপাসনা বলেছিল, রোজ ভাতের বদলে সাবান খাই। মেয়েটা সেটাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল। মুনিয়া ওদের সঙ্গে যাবে শুনে উপাসনা খুশি হল। বলল, 'সন্ধেবেলায় কী করব, সেটা কিন্তু বললি না।'

'রাতে আমার অন্য প্ল্যান আছে, এখন বলব না।'

'আমি কিন্তু স্নান টান করে, তবে মন্দিরে যাব।'

'বেশ, চা খেয়ে তুই তাহলে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে ঢুকে যা। আমি আর মুনিয়া ততক্ষণে মিষ্টুসোনাকে তৈরি করে নিই।' বলেই স্বাতী অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল।

কথাটা স্বাতীর মুখ থেকে খসতে-না-খসতেই মুনিয়া চায়ের ট্রে নিয়ে হাজির। চোখাচোখি হতেই ও বলল, 'গুড মর্নিং দিদিমণি।'

ওর মুখে গুড মর্নিং শুনে উপাসনা একটু অবাক হয়েই তাকাল। সেটা বুঝতে পেরে নবেন্দু বলল, 'অবাক হয়ো না উপা। ওড়িশার মোট জনসংখ্যার থার্টি নাইন পার্সেন্টি আদিবাসী। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়ে এদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এক অস্ট্রেলিয়ান ফাদার এখানে গরিবদের জন্য একটা স্কুল খুলেছে। মুনিয়া দুপুরে সেই মিশনারি স্কুলে পড়তে যায়। হু হু বাবা, সেই কারণে সাহেবি আদব-কায়দা ও শিখে ফেলেছে। জানো, আমি ওকে কী বলে ডাকি? ব্ল্যাক মেম।'

চায়ের ট্রে রেখে লজ্জায় মুনিয়া দৌড়ে পালাল। সেদিকে তাকিয়ে নবেন্দু বলল, 'মেয়েটা কী ট্যালেন্টেড জানো? ক্লাস এইটে পড়ে। প্রতিবার স্কুলে ফার্স্ট হয়। পড়াশুনোয় খুব আগ্রহ। রোজ সন্ধেবেলায় স্বাতীর কাছে টিউশন নেয়। আমি বলেছি, তুই কলেজে উঠলে, তোর পড়ার সব খরচ আমি দেব।'

উপাসনা বলল, 'কী পড়তে চায় ও?'

'ওর ইচ্ছে, অনেক বড়ো নার্স হবে। হাসপাতালে ডাক্তারদের হেল্প করবে। আমি ভেবে রেখেছি, ও যদি জয়েন্ট পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, তাহলে ডাক্তারি পড়াব। ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা করি, অফিস যেন আমাকে অন্য কোথাও ট্রান্সফার না করে।'

পাশের ঘর থেকে স্বাতী তাড়া লাগাল, 'এই উপা, আবার গ্যাঁজাতে বসে গেছিস। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। রোদ্দুর উঠে গেলে, মন্দিরে পা ফেলতে পারবি না। চাতাল এত তেতে থাকে!'

...বেলা দশটার সময় ওরা লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে যেতেই, উপাসনা বুঝতে পারল, স্বাতী ঠিকই বলেছিল। গাড়ি থেকে নেমে অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হয়। মন্দিরের কাছে পান্ডাদের দোকান। সেখানে জুতো, হ্যান্ডব্যাগ, মোবাইল সেট সব জমা দিয়ে, তার পর মন্দিরে ঢোকার নিয়ম। গাড়ি পার্ক করার সময় বিরাট একটা সরোবর দেখল উপাসনা। ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'ওটা কী রে?'

নবেন্দু বলল, 'বিন্দুসাগর। কীভাবে এই সরোবরের উৎপত্তি হল, শুনবে? সে এক বিশাল স্ক্যান্ডাল। সেক্স স্ক্যান্ডাল। না বাবা, তোমাকে আমি বলতে পারব না। তুমি স্বাতীর কাছ থেকে শুনে নিয়ো।'

উপাসনা কৌতূহলী হতেই স্বাতী বলল, 'আমি ওকে বলে দিচ্ছি।'

'তাই ভালো।' বলে ফের নবেন্দু দোকানে ঢুকল।

স্বাতী বলল, 'কৈলাসে একবার শিব পার্বতীকে বলেছিলেন, ওঁর সবথেকে প্রিয় জায়গা হল একম্রাক্ষেত্র। ভুবনেশ্বরের আগের নাম ছিল একম্রাক্ষেত্র। শিবের কথা শুনে অবাক হয়ে পার্বতী বললেন, তোমার কাছে এই জায়গাটা কাশীর থেকেও প্রিয়? শিব বললেন, হ্যাঁ, কাশীর থেকেও প্রিয়। কৌতূহল মেটাতে পার্বতী একাই দেখতে এলেন জায়গাটা। তবে গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে। একম্রাক্ষেত্রে তখন থাকত দুই অসুর। কৃত্তি আর ভারসা। পার্বতীকে দেখে ওদের চোখ লোভে চকচক করে উঠল। পার্বতীকে ওরা বলল, বিয়ে করতে চায়। পার্বতী বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের কথায় আমি রাজি হতে পারি, যদি তোমরা আমাকে কাঁধে করে ওই... ওই বটগাছের কাছে নিয়ে যেতে পারো। অসুররা ভাবল, পার্বতীকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া.. কী এমন কঠিন কাজ। ওরা কাঁধে নিতেই, পার্বতী এমন চাপ দিলেন যে, দুই অসুর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।'

উপাসনা বলল, 'তা নয় হল। কিন্তু এর সঙ্গে বিন্দুসাগরের সম্পর্ক কী?'

'পুরাণে আছে, পার্বতী... দুই অসুরকে দমন করলেন... এটা দেখে শিবের ইন্টারকোর্স করার ইচ্ছে হয়। উনি কৈলাস থেকে নেমে আসেন। এখানে ইন্টারকোর্স করার সময়, এই গর্তটা হয়ে যায়। গহ্বর থেকে সায়র বা সরোবর, বুঝলি। এখানে শিবের বীর্য পড়েছিল। শিবভক্তরা বিশ্বাস করে, বন্ধ্যা মেয়েরা বিন্দুসাগরে এসে স্নান করে পুজো দিলে, গর্ভবতী হতে পারে। তার ছেলে শিবের মতো হবে। তাই মেয়েরা এখানে আসে, সন্তান লাভের আশায়।'

খানিকটা কৌতুকের দৃষ্টিতেই উপাসনা বিন্দুসাগরের দিকে তাকাল। পুরো পুকুরটা সবুজ পানায় ভর্তি। ঠিক মধ্যিখানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে। এই নোংরা জলে মেয়েরা স্নান করে সন্তান লাভের আশায়? কথাটা মনে হতেই ও বলল, 'সত্যি কী ধর্মান্ধ আমাদের দেশ, তাই না?'

পুজোর ডালা নিয়ে নবেন্দু পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'ও কথা বোলো না। তোমার বন্ধু তাহলে খেপে যাবে। ওর ধারণা, ও নিজেও ফল পেয়েছে।'

উপাসনা বলল, 'তার মানে? তুইও এখানে এসে চান করেছিস না কি স্বাতী?'

নবেন্দু বলল, 'শুধু চানই করেনি। এখানে সাঁতারও কেটেছে, নবদ্বীপের গঙ্গা ভেবে।

আসলে কী জানো, প্রথম দুটো বছর আমরা চেষ্টা করলাম, বাচ্চা এল না। তখন স্বাতী জেদ ধরল...।'

'তুমি থামবে? এত বাজে বকছ কেন?' মৃদু ধমক দিল স্বাতী।

'এটা বাজে কথা হল? ঠিক আছে, তাহলে চুপ করছি। কিন্তু উপা... তুমি সাবধান। এখানে চান করার রিস্ক নিয়ো না। শিবের দয়ায় তুমি যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যাও, তাহলে কিছু না করেও, দোষের ভাগী হব কিন্তু আমি। নবদ্বীপে আর কোনওদিন ঢুকতে পারব না।'

স্বাতী এবার সত্যিই রেগে বলল, 'কী হচ্ছে নবেন্দু। এসব ঠাট্টা আমি মোটেই পছন্দ করি না।' বলে মন্দিরের দিকে ও গটগট করে এগিয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে উপাসনা বলল, 'বেচারা ভালো মুডে ছিল। কেন তুমি খেপালে?'

নবেন্দু বলল, 'মাঝে মাঝে চটাতে হয় ম্যাডাম। না হলে বোঝা যায় না, প্রেম কত গভীরে। চলো, এবার মন্দিরে যাই।'

দোকান থেকে নেমে পাথরের রাস্তায় পা দিয়েই উপাসনা আঁতকে উঠল। এত গরম, ওর ভয় হল, পায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে। ও তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল। মন্দিরে ঢোকার মুখে বিশাল একটা ষাঁড়ের মূর্তি। শিবের বাহন, লোকে সেখানেও ফুল দিচ্ছে। হাত জোড় করে প্রণাম করার সময় উপাসনার হাসি পেল। তখনই নবেন্দু পাশ থেকে বলল, 'এই মন্দিরটার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। রাজা যযাতিকেশরীর সময়কার। চলো, আগে দেউলে যাই। পুজো দেওয়ার পর ঘুরে ঘুরে সব তোমায় দেখাব।'

মন্দিরে শিবের মূর্তি বলে কিছু নেই। লোকে পুজো দিচ্ছে লিঙ্গে। পুণ্যার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁরা পুরোহিতের চারপাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে। উপাসনা দেখল, ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বাতীও। চোখ বুজে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। পুজো দেওয়ার পর অনেকে শিবলিঙ্গ ধুইয়ে দিচ্ছে জল, দুধ আর ভাঙ দিয়ে। দেউলে দাঁড়িয়ে উপাসনা একবার চারপাশে তাকাল। নবদ্বীপের আচায্যি মশাইয়ের কথা হঠাৎ ওর মনে পড়ল। 'মা বিশ্বাস করো, আমি গৌড়সুন্দরকে দেখেছি। লিঙ্গরাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন।' কথাটা মনে পড়তেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই সেই লিঙ্গরাজ মন্দির। ও কি পুনর্জন্ম নেওয়া শ্রীচৈতন্যকে দেখতে পাবে? এত ভাগ্য করে কি ও এসেছে?

মিনিট পাঁচেক পর দেউল থেকে বেরিয়ে স্বাতী বলল, 'চাতালে কত শিবলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিস। গুনে দেখা গেছে, এক লাখের ঠিক মাত্র একটা কম। এক লাখ হলে... কাশীকেও ছাপিয়ে যেত ভুবনেশ্বর। এটাই সবথেকে বড়ো তীর্থ হয়ে যেত শিবভক্তদের কাছে।'

বাইরে এসে ফের পায়ে ছ্যাঁকা লাগল উপাসনার। একে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই, তার ওপর তপ্ত চাতাল। মন্দির ঘুরে দেখার ইচ্ছেটাই ওর চলে গেল। লাফিয়ে ফের ও সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল। স্বাতী খানিকটা এগিয়ে গেছিল। ফিরে এসে বলল, 'এখানে বিষ্ণুমূর্তিও আছে। চল, আমরা পুজো দিয়ে আসি। এখানে বিষ্ণু আর শিব দুজনেরই পুজো হয়। হরিহর পুজো।'

উপাসনা বলল, 'না ভাই, তুই যা। আমি পা ফেলতে পারছি না।'

'দূর বোকা। মন্দিরে এসে শরীরের কষ্টের কথা ভাবলে চলে? আমি তো বিয়ের পর পর.. হেঁটে বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে উঠেছিলাম। পাহাড়ি রাস্তায় তেরো-চোদ্দো মাইল। নবেন্দু বলেছিল, তুমি বোধহয় পারবে না। ডোলিতে বসে, চলো। আমি কিন্তু পেরেছিলাম। মনের জোর চাই। আয়, নেমে আয়। ঠিক পারবি। এত লোক গরম চাতালে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তুই পারবি না কেন?'

বাধ্য হয়ে নেমে এল উপাসনা। এবার কিন্তু ততটা গরম লাগল না। কয়েক পা হেঁটে ফের ওরা দুজনে মন্দিরের আরেকটা অংশে ঢুকল। স্বাতী বলল, 'লিঙ্গরাজ মন্দিরে চারটে অংশ বুঝলি। দেউল, যজ্ঞশালা, ভোগমণ্ডপ আর নাটমন্দির। আগে নাটমন্দিরের দিকে চল। তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

বাঁদিকে নাটমন্দিরে উঠতেই স্বাতী দেওয়ালের গায়ে একটা মিথুন মূর্তি দেখাল। পাথরের গায়ে খোদাই করা একটা মূর্তি। এক নারী পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তার যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাচ্ছে এক পুরুষ। তার বাঁ হাত নারীর স্তন ধরে আছে। মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে উপাসনার শরীরটা শিরশির করে উঠল। তাড়াতাড়ি ও চোখ সরিয়ে নিল। সঙ্গমের অভিজ্ঞতা ওর হয়নি। কিন্তু নরনারীর যৌনসম্পর্ক নিয়ে বিবাহিতা বন্ধুদের কাছ থেকে ও অনেক কথা শুনেছে। স্বাতীর সঙ্গে অবশ্য এ নিয়ে কোনওদিন কোনও কথা ওর হয়নি। নিচু স্বরে ও জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে... এইভাবে করা যায় না কি?'

'সেটা এখন শুনবি, না বাড়ি গিয়ে বলব।'

'ছিঃ, এইসব মূর্তি মুনিয়াদের মতো বাচ্চা মেয়েদের চোখে পড়লে কী হবে বল তো?'

'এ আর কী দেখছিস। কোনারকের সূর্যমন্দিরে গেলে আরও ভয়ানক পোশ্চার দেখতে পাবি। ওসব বরের সঙ্গে গিয়ে দেখতে হয়। তাহলে হনিমুনটা জমে। আমার তো মনে হয়, হনিমুনে আর কোথাও যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকটা নতুন বর-বউয়ের উচিত কোনারকে যাওয়া। দুদিন ওখানে ঘোরাঘুরি করলেই সব খুল্লামখুল্লা জানা হয়ে যাবে। আলাদা করে সেক্স এডুকেশন দেওয়ার কোনও দরকার নেই।'

'কিন্তু মন্দিরের গায়ে এসব মূর্তি রাখা কি ঠিক?'

'এরা রেখেছে অন্য কারণে। মন্দিরের গায়ে মিথুন মূর্তি খোদাই করলে না কি ঝড়জলের সময় বাজ পড়ে না।'

মন্দিরের চারটে অংশ ঘুরে ওরা যখন পান্ডার দোকানে এল, তখন মিষ্টুসোনাকে কোলে নিয়ে নবেন্দু আদর করছে। উপাসনা আগে পায়ে চটি গলিয়ে নিল। তার পর হ্যান্ডব্যাগ আর মোবাইল সেটটা হাতে নিয়ে বলল, 'প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছে। মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যাবে?'

তখনই স্বাতী বলল, 'ওই দ্যাখ, মন্দির থেকে কে বেরিয়ে আসছে। আমাদের শ্রীচৈতন্যদেব।'

উপাসনা তাকিয়ে দেখল, দোকানের বাইরে মাত্র তিন-চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে

গোরা। ওর পরনে সাদা ধুতি। খালি গা, কাঁধের দু'পাশ দিয়ে ঝোলানো পট্টবস্ত্র। বোধহয় পাঞ্জাবিটা পান্ডাদের দোকানে খুলে রেখে, পুজো দিতে ঢুকেছে। সত্যিই ওকে শ্রীচৈতন্যর মতো লাগছে। গোরা কথা বলছে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে। সমবয়সি আরেকটা ছেলেও আছে ওদের সঙ্গে। উপাসনা দেখল, পুণ্যার্থীদের অনেকেই গোরার দিকে ঘুরে ঘুরে অবাক চোখে তাকাচ্ছে। গায়ে রোদ পড়েছে বলে, ওকে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উপাসনার নজরে এল, দুজন সাধু দু'পাশে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন পাহারা দিচ্ছেন গোরাকে। একজন প্রায় সাত ফুট লম্বা। উপাসনার হঠাৎ কী মনে হল, দ্রুত মোবাইল সেট অন করে, গোরার একটা ছবি তুলে রাখল। ছবিটা এসএমএস করে আজই ও আচাযি্যমশাইয়ের কাছে পাঠাবে। জানতে চাইবে, একেই আপনি সেদিন পর্দায় দেখেছিলেন কি না?

দোকানের ভেতর পান্ডাদের টাকাপয়সা মেটাচ্ছে নবেন্দু। ঘুরে এদিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কী হল, আরে তোমরা কাকে দেখছ? গোরাবাবু না? ডাকব না কি?'

স্বাতী গম্ভীর মুখে বলল, 'থাক... আগ বাড়িয়ে ওকে ডাকতে যেয়ো না। ওর সঙ্গে আরও লোকজন আছে। এখন বাড়ি চল। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

শুনে নবেন্দুর মুখ কালো হয়ে গেল। দেখে উপাসনার খুব খারাপ লাগল। বেচারা এত হাসিখুশি। ওর সামান্য ঠাট্টায় স্বাতীর এত রাগ করার কী আছে? এই তো একটু আগে ওর সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছিল। এর মধ্যে মাথা ধরে গেল? স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে ওর ঢোকার দরকার নেই। উপাসনা তাই চুপ করে গেল। নন্দনকাননে যাওয়া হবে না শুনে মুনিয়াও দমে গেছে। সাদা বাঘ ও কোনওদিন দেখেনি। শুনেছে নন্দনকাননে না কি বড়ো বড়ো সাদা বাঘ আছে। আসার সময় বাঘ সম্পর্কে মেয়েটা কতরকম প্রশ্ন করছিল। ফেরার সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল।

ভীম ট্যাঙ্কি হাউসিংয়ে ফিরে গেস্ট রুমের দরজা খুলে, বিছানায় হ্যান্ডব্যাগ ছুড়ে ফেলেছিল উপাসনা। তখনই ফোঁস করে একটা আওয়াজ শুনল। বিছানার দিকে তাকিয়ে ও দেখে, বিরাট একটা সাপ ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ও। এরকম নামজাদা আবাসনে দোতলার ঘরে সাপ! হ্যাঁ, সাপই তো... শ্বেতসর্প। কমপক্ষে পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা! মাত্তর চার-পাঁচ হাত দূরে। বোধহয় গায়ে লেগেছিল ব্যাগটা। তাই ফণা ধরেছে। কালচে জিভ বেরিয়ে এসেই মুখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আতঙ্কে উপাসনা তখনই চিৎকার করে উঠল, 'সাপ... সাপ... নবেন্দু, শিগগির এসো।'

চৌত্রিশ

মা এসে বলল, 'তোর চোখটা ছলছল করছে কেন রে?'

বিছানায় আধশোয়া হয়ে গোরা চ্যানেল সার্ফ করছিল। টিভির সুইচ অফ করে দিয়ে

বলল, 'কী জানি মা। বোধহয় জ্বর আসছে। টুবাই কি চলে গেছে? না গেলে ওকে দিয়ে কয়েকটা ক্যালপল আনিয়ে রাখো।'

'মুকুন্দ সেদিন বলছিল, তোর না কি প্রায়ই জ্বর হয়? ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

'এবার মনে হয় দেখাতে হবে। অদ্বৈতবাবুর অনেক চেনা জানা আছে ডাক্তার মহলে। আমাদের পার্টিরই ডা. সুবিমল মাইতি নামী এম ডি। ওর কাছেই চেক আপ করাব।'

'অদ্বৈতবাবুই তোর সর্বনাশটা করবে গোরা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই পার্টি করা ছাড়। শরীরের আর দোষ কী? এখানে আসা ইস্তক তুই ক'ঘণ্টা বাড়িতে ছিলি বল দিকি। রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কী দরকার দলিতদের নিয়ে তোর মাথা ঘামানোর? ওদের কোনও উন্নতি হবে? ওরা যেমন আছে, তেমনটাই থাকবে। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস।'

'মা, তোমার এসব কথা আমার ভালো লাগছে না।'

'ভালো তো লাগবেই না বাবা। সত্যি কথা বলছি যে। আমার কথা শোন। পাশ দিয়ে এখানে এসে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নে। পট্টনায়েক মশাইকে আমি বলে রেখেছি। উনি আমায় কথা দিয়েছেন। তুই যদি দলিত পার্টি করা ছাড়িস, তাহলে সরকারি চাকরি তোর বাঁধা।'

মা গোবর্ধন পট্টনায়েকের কথা বলছে। লোকাল এমএলএ। চারটে ভোটে জিতেছে। কোনও কাজ করেনি দলিতদের জন্য। করবেই বা কেন? উঁচু জাতের লোক, সবসময় উঁচু... আরও উঁচু জাতের লোকদের স্বার্থ দেখবে। পাঁচ বছরে মাত্তর একবার ওরা দলিতদের কাছে আসবে। ভোট চাইতে। এবার আসুক। ওর বিরুদ্ধে দলিত পার্টির একজনকে দাঁড় করিয়ে দেবে গোরা। টুবাইয়ের কথা ওর মাথায় ঘুরছে। টুবাই শিক্ষিত ছেলে। তা ছাড়া, অনেকেই বিশ্বাস করে, ওকে মহাপ্রভুর বংশধর বলে। ওর পক্ষে ভোট পাওয়া সহজ হবে। গোবর্ধন পট্টনায়েক সম্ভবত এটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তাই চাকরির আগাম টোপ দিয়ে রেখেছে মায়ের কাছে। কথাটা মনে হতেই চাদর টেনে গোরা বলল, 'চাকরি করব না মা। তোমাকে তো বলেই দিয়েছি আমি রাজনীতি করব।'

'তোর যা ইচ্ছে কর।' বলে রাগ দেখিয়ে মা চলে গেল।

চাদর মুড়ি দেওয়ার আগে গোরা পাখাটা বন্ধ করে দিল। শীত শীত লাগছে। জ্বর জ্বর লাগলে ইদানীং ওর ভয় হয়। আবার চোখের সামনে কীসব অদ্ভুত সব দৃশ্য ভেসে উঠবে, কে জানে? মনটাকে জোর করে ও সরিয়ে আনল। মায়ের কথা ভোলার জন্য। দিন তিনেক হল, ও ভুবনেশ্বরে এসেছে। পার্টির মিটিং দারুণ সাকসেসফুল। কতদূর থেকে লোক এসেছিল। সম্বলপুর, রৌরকেলা, কটক, কেওনঝড়, বেরহামপুর, পুরী। প্রচুর ইয়ং ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওর পরিচয়ও হল। লিয়েন্ডার টুডু বলে একটা ছেলে, মিটিংয়ের শেষে বলল, কিছুদিনের মধ্যেই পুরীতে ওরা একটা বড়ো র‍্যালি করবে। গোরাকে সেখানে যেতেই হবে। ওর উৎসাহ দেখে গোরার খুব ভালো লেগেছে। এমনিতেই ওকে চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভুবনেশ্বরে আসতেই হবে। মায়ের নির্দেশ। পুরীর র‍্যালিটা যদি গায়ে গায়ে

হয়, তাহলে কোনও অসুবিধা নেই। কেননা, এর মধ্যে ওর পরীক্ষাও হয়ে যাবে।

ওড়িশার রাজনীতিতে যে একটা বড়ো পরিবর্তন আসছে, সেটা গোরা বুঝতে পারছে। মোট জনসংখ্যার ছেষট্টি পার্সেন্ট হয় দলিত, না হয় তফসিলি জাতি। এদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারলে, উঁচুজাতের লোকদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু উঁচুজাতের লোকেরা এদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে রেখেছে। তফসিলি জাতির তকমা থাকলে এখন অনেক সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়। পড়াশুনা, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেশি করে। এদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনোয় বেশি এগিয়ে গেছে দলিত-আদিবাসীদের থেকে। দলিতদের জন্য বরাদ্দ সুযোগ তফসিলিরা ছলে-বলে আদায় করে নিচ্ছে। সেটাই দলিত আদিবাসীরা সহ্য করতে পারছে না। আগে এদের বিরোধ মেটাতে হবে। না হলে কিছুই করা যাবে না। বিরোধ মেটাতে হলে ওকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

রাজনীতি করতে নেমে গোরা একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝে গেছে, কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বাস করে দলিত মুভমেন্ট করা যাবে না। ওকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভুবনেশ্বরে কেশব রাম এসেছিলেন পার্টি মিটিংয়ের সময়। ওঁর বক্তৃতা শুনে একটু অবাকই হয়েছে গোরা। দলের সর্বভারতীয় নেতা, অথচ দলিত মানুষদের টানার জন্য যে ধরনের সহজ কথা বলা দরকার, তা উনি বলতে পারেন না। উনি বড্ড বেশি তাত্ত্বিক। তবে মানুষটা খারাপ নন। গোরার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ, কিন্তু অন্য কর্মীদের কাছে উনি বলে গেছেন, খুব শিগগির ওকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, অদ্বৈতবাবু এতদিন ধরে পার্টি করছেন, অথচ এখনও ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢুকতে পারেননি। কেশব রাম বলে গেছেন, 'তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। মাস তিনেকের জন্য তোমাকে আমি সাউথ ইন্ডিয়ায় পাঠাব। তোমার মতো ওয়ার্কার ওখানে আমার দরকার।'

কলকাতা থেকে গোরা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে আরও অনেকগুলো কারণে। নানাধরনের চাপ আসছে। ভুবনেশ্বর আসার আগের দিন হঠাৎ বিপ্লবের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। তখনই ও শোনে, ইউনিভার্সিটির ডিবেটে বিপ্লব না কি ফার্স্ট হতে পারেনি। তাই কিউবা যাওয়ার সুযোগ পায়নি। ওর মুখে শুনে গোরা অবাক হয়ে গেছিল, ডিবেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তরুণ মাজি বলে একজন দলিত ছাত্র। বিপ্লব ওকে ফের ডেকে নিয়ে গেছিল, সেই রেস্তোরাঁয়। ওর জন্য শরবতের অর্ডার দিয়ে বলেছিল, 'তুমি পেছন থেকে এমনভাবে ছুরি মারবে, আমি ভাবতেও পারিনি ভাই।'

গোরা বলেছিল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না বিপ্লব।'

'তরুণ মাজি বলে ছেলেটা শুনলাম, তোমার পার্টির কর্মী এবং তোমার খুব ক্লোজ?'

'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু তাতে... আমি ব্যাকস্ট্যাব করলাম কীভাবে?

'ডিবেটে ও যা বলল, সে তো তোমারই মুখের কথা। শুনতে শুনতে আমি ওর বদলে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজে না এসে তুমিই কি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিলে?'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে গোরা বলেছিল, 'তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তরুণ

যে ইউনিভার্সিটির ছাত্র, সেটাই আমি জানতাম না। ও আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত... বাবা মারা যাওয়ার পর কলকাতা কর্পোরেশনে বাবার চাকরিটা পেয়েছে, সেটা শুনেছি। কিন্তু তরুণ যে ফের পড়াশুনা শুরু করেছে, এটা তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম। আয়্যাম সরি বিপ্লব, বলতে বাধ্য হচ্ছি, হারটা তোমার মেনে নেওয়া উচিত। আমাকে দোষ দেওয়ার আগে, তোমার আরও খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।'

কথাগুলো বলেই গোরা উঠে পড়েছিল। হয়তো রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসত। কিন্তু বিপ্লব বলেছিল, 'আরে, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ভাই? আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। বসো, বসো।' কথাগুলো এত মার্জিতভাবে বলেছিল বিপ্লব, লজ্জার খাতিরে গোরা ফের বসে পড়েছিল। তখনই বিপ্লব বলেছিল, 'দিনকয়েক আগে তথাগতকাকার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল তোমাকে নিয়ে।'

গোরা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে তথাগতকাকা?'

'চিফ মিনিস্টার তথাগত ভট্টাচার্য। আমার বাবার বন্ধু। উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তোমার সঙ্গে নাকি ওঁর একদিন কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। তবে উনি সেটা মনে রাখেননি। তোমার প্রশংসাই করছিলেন। চলো না, ওঁর সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসবে। যাবে?'

টোপ... ফের টোপ। বুঝতে পেরে গোরা খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিল, 'এখন নয় ভাই। পরীক্ষার আগে এসব নিয়ে কিছু ভাবতে চাই না। পরে দেখা যাবে। আজ চলি। আমার কাজ আছে।'

সেদিন বিপ্লবের সঙ্গে গোরা খারাপ ব্যবহার করতে চায়নি। কিন্তু সম্পর্কটা খারাপের দিকে চলে গেছে। ব্যাকস্ট্যাব করার কথাও ও ভুলতে পারেনি। ইউনিভার্সিটিতে ফের কখনও দেখা হলে বিপ্লবের সঙ্গে ও কথা বলবে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। আসলে ওর মেজাজটাও সেদিন ভালো ছিল না। ক্লাস করার সময় অনেকেই ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ডিবেটে তোমায় দেখা গেল না কেন গোরা? বিপ্লবের ভয়ে কেটে পড়েছিলে?' অনেকবার ও হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিল। পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। তথাগত ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রশ্নই নেই। অদ্বৈতবাবুকে না-জানিয়ে ও কারও সঙ্গে দেখা করবে না।

অদ্বৈতবাবুর কথা মনে পড়তেই গোরার মাথা যন্ত্রণা শুরু হল। ওর চোখের সামনে একটা লাল বৃত্ত চক্কর দিতে লাগল। কী উজ্জ্বল লাল রং। গোরা একবার ভাবল, মাকে ডাকবে। কিন্তু একটু আগে রাজনীতির কথা শুনে মা রাগ করে উঠে চলে গেছে। তার ওপর এই রোগের কথা শুনলে, মা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। মাথার ব্যথাটা কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল গোরা। তার পরই চোখের সামনে অদ্বৈতবাবুকে দেখতে পেল ও। অদ্বৈতবাবুকে বরাবর ও সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিতে দেখেছে। পায়ে কালো চকচকে পাম শু। কিন্তু এখন যাঁকে ও দেখতে পাচ্ছে, তাঁর পরনে গেরুয়া ধুতি আর ফতুয়া। পায়ে খড়ম। কুটিরের দাওয়ায় বসে অদ্বৈতবাবু কথা বলছেন

আরেকজনের সঙ্গে। তাঁর চেহারাটাও চেনা চেনা লাগল গোরার। কিন্তু এ কী! অদ্বৈতবাবুকে অন্যজন আচার্য বলে সম্বোধন করছেন কেন? কথা প্রসঙ্গে আচার্য বললেন, 'যেভাবেই হোক, নিমাইকে একবার শান্তিপুরে নিয়ে আসতে হবে হরিদাস। তুমি কি শুনেছ, তাকে নিয়ে কী চর্চা হচ্ছে নবদ্বীপে?'

হরিদাস বললেন, 'না, তেমন কোনও সংবাদ তো আমি পাইনি।'

'অভক্তগণ তার বিরুদ্ধে প্রচার করছে, সে দাম্ভিক। দু'চারটে পুঁথি পড়েই নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করছে। রোজ নানা অভিযোগ তুলে তারা কাজির কান ভারী করছে।'

'এ আর নতুন কি কথা? এর আগেও তো ওর সম্পর্কে কত অপপ্রচার হয়েছে। চাঁদ কাজির কথা আপনার স্মরণে নেই? নিমাইয়ের কাছে সে কীভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল! আপনি তো জানেন, নিমাইয়ের মধ্যে আশ্চর্য মোহিনী শক্তি আছে। ওর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।'

'চাঁদ কাজির দিন আর নেই হরিদাস। নিমাইয়ের বিরুদ্ধে তখন অভিযোগটা ছিল, নগর সংকীর্তন করে ও নবদ্বীপবাসীর শান্তি বিঘ্ন করছে। এবারের অভিযোগগুলো কিন্তু গুরুতর।'

'সে কার পাকা ধানে মই দিয়েছে শুনি?'

'উত্তেজিত হচ্ছ কেন হরিদাস? আমার কথাটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো। রাজনীতির দৃশ্যপট এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে, আমি অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছি। কাজিকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে, শূদ্র-চাঁড়ালদের বুকে টেনে নিয়ে নিমাই রাজধর্মে আঘাত হানছে।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আচার্য। রাজধর্মে আঘাত... তার মানে?'

'আঃ, চারপাশে কী ঘটছে, তুমি কি কিছুই টের পাও না হরিদাস? দেখছ না, বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে কতশত শূদ্র ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে? তারা কেন রাজধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে, জানো? বাধ্য হয়ে... যাতে ব্রাহ্মণরা আর তাদের লাঞ্ছনা করতে না-পারে। তাদের এই তীব্র অভিমানের কারণে কে জানে, কোনওদিন হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে কি না।'

'আপনার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না, এর মধ্যে নিমাইয়ের ভূমিকাটা কী? কাজির রোষে ও পড়বে কেন?'

'অভক্তরা কাজির কাছে গিয়ে বলে আসছে, রাতের বেলায় সংকীর্তনের নামে নিমাই, সাধারণ লোককে মুসলমান হতে মানা করছে। সে না কি এমন অপরাধও করছে, মুসলমান হয়ে যাওয়া কিছু লোককে রাতের অন্ধকারে ফের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছে, হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে এনেছে।'

'কিন্তু নিমাই দীক্ষা দেবে কী করে? ও তো সন্ন্যাস গ্রহণও করেনি। না, না, এ মিথ্যে।'

'মিথ্যে তো বটেই। গৌড় থেকে এক ভক্ত কয়েকদিন আগে আমাদের নাটকাভিনয় দেখতে এসেছিল। তার মুখে খবর পেলাম, এই গুরুতর অভিযোগগুলো না কি সুলতান হুসেন শাহর কাছেও পৌঁছে গেছে। তিনি গুপ্তচর পাঠিয়েছেন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য।

সেই কারণেই নিমাইকে নিয়ে আমার ভয় হচ্ছে হরিদাস। ওকে এখান থেকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া দরকার। নবদ্বীপ...শুধু নবদ্বীপই বা কেন...সমস্ত গৌড় এখন ওর পক্ষে নিরাপদ স্থান নয়। এমন কোনও জায়গায় ওকে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে সুলতান হুসেন শাহর হাত পৌঁছবে না।'

'কী বলছেন আপনি আচার্য? ওকে যদি অন্যত্র পাঠিয়ে দেন, তাহলে ভক্তিমার্গ আন্দোলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ভক্তরা যে হতাশ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, নিমাইয়ের মা আর সদ্যপরিণীতা স্ত্রীর কী হবে? সর্বোপরি, ও-ই বা রাজি হবে কেন, চলে যেতে?'

'সে সব নিয়ে তোমার ভাবার কোনও কারণ নেই। আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। ওর মনে যাতে সন্ন্যাসগ্রহণের কথা উদয় হয়, সে চেষ্টা করতে হবে। না হলে ওকে ঘর থেকে বের করা যাবে না। হরিদাস, আমার প্রথম কর্তব্য হল, নিমাইকে বাঁচিয়ে রাখা। রাজরোষে যাতে ওকে জীবন দিতে না হয়, তার ব্যবস্থা করা। ওকে আমি উৎকলে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। ওখানে হিন্দু রাজত্ব। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র দেব অত্যন্ত বিক্রমশালী। তাঁর রাজত্ব হুগলি নদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁকে ঘাঁটানোর সাহস নেই সুলতান হুসেন শাহর।'

'তা না হয় মানলাম, এখানে বৈষ্ণবধর্মের কী হবে?'

'কেন নিত্যানন্দ আছে। এ দিকটা ও সামলাবে। আমি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিমাইকে পাঠাতে চাইছি অন্য কারণে। কারণটা তোমাকে বলা যাবে না।'

...মাথার ব্যথাটা উধাও হয়ে গেছে। চোখের সামনে দৃশ্যগুলো সিনেমার মতো ফুটে উঠছে। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গৌড়, উৎকল...নিমাই, হুসেন শাহ, গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র এসব কী বলছেন অদ্বৈতবাবু? গোরা কিছুই বুঝতে পারছে না। এসব ঘটনা কি অন্য কোনও জন্মে ওর জীবনে ঘটেছিল? জিজ্ঞেস করলে মা কি বলতে পারবে সে কথা? না, না, মা কী করে জানবে? এ ক'দিন আগেই পূর্বজন্মের কথা হচ্ছিল ট্রেনে ভুবনেশ্বর আসার সময়। জয়দেব আর নবেন্দু তখন জোরালো যুক্তি দিচ্ছিল পূর্বজন্ম আছে। আজকের অভিজ্ঞতা ওদের জানালে কেমন হয়! ওরা নিশ্চয় একটা পরামর্শ দিতে পারবে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই গোরা নিজেকে দেখতে পেল। সাঁতরে নদী পেরিয়ে ও ডাঙায় উঠছে। সিক্ত বসনে কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও হাজির হল অদ্বৈত আচার্যর কুটিরে। উঠোনে দাঁড়িয়েই ও উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করল, 'আপনি নাকি যোগবশিষ্ঠের জ্ঞানমার্গ প্রচার করছেন আজকাল? আপনি না কি ভক্তদের বলছেন, নিমাই ভক্তিমার্গের কথা বলছে বটে, কিন্তু সেটা ভুল পথ।'

কথাগুলো শুনে উগ্রভঙ্গিতে নেমে এলেন অদ্বৈত আচার্য। বললেন, 'বলেছি, বেশ করেছি। আমি কোন পথে এগোব, সেটা কি তুমি ঠিক করে দেবে নাকি?'

চিৎকার শুনে অন্দরমহল থেকে ছুটে এলেন অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী ও পুত্র। গোরা অবাক হয়ে দেখল, ও সমানে তর্ক করে যাচ্ছে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে। দুজন দুজনের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আচার্যকে ধরে রেখেছেন হরিদাস। আর ওকে আটকাচ্ছে ওর

সঙ্গীসাথিরা। তাদের হাত ছাড়িয়ে...একটা সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ও অদ্বৈত আচার্যকে মারতে শুরু করল। চোখের সামনে এসব কী হচ্ছে? গোরা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। ঘামে ওর শরীর ভিজে গেছে। বিছানায় বসে ও হাঁফাতে শুরু করল। অদ্বৈতবাবুর মতো পিতৃস্থানীয় একজনের গায়ে ও হাত তুলছিল, ভাবতেই ওর কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মার খাওয়ার সময় অদ্বৈতবাবুর মুখটা আনন্দে ভরে গেছিল কেন? উনি কি চাইছিলেন, গোরা ওঁর গায়ে হাত দিক? নাঃ, আজই দেখা করে জয়দেবকে ওসব কথা জানাবে।

মোবাইল ফোনটা বাজছে। গোরা বর্তমানে ফিরে এল। সুইচ অন করতেই আশ্চর্য, ও অদ্বৈতবাবুর গলা শুনতে পেল, 'গোরা, তুমি এখন কোথায়?'

'ভুবনেশ্বরে। কাল রাতে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। পরশু দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

ও প্রান্তে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর অদ্বৈতবাবু বললেন, 'তোমার এখন কলকাতায় আসার দরকার নেই গোরা। আপাতত তুমি ভুবনেশ্বরেই থাকো। তোমার পক্ষে কলকাতা আর নিরাপদ নয়। খুব শিগগির তোমার কাছে আমি লোক পাঠাচ্ছি। সে গিয়ে তোমায় সব খবর দেবে।'

পঁয়ত্রিশ

স্বাতীর মেসেজটা জয়দেব পেল খণ্ডগিরি থেকে ফেরার সময়। হাইওয়েতে তখন ভয়ানক জ্যাম। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আধ ঘণ্টা ধরে। উলটোদিকে যাওয়া গাড়ির চালকদের কাছ থেকে ড্রাইভার জেনে এল, আধ কিলোমিটার দূরে একটা স্যান্ট্রো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। হেড অন কলিশন। গাড়িটা না কি দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ড্রাইভার, গাড়ির মালিক কেউ বেঁচে নেই। শুনে জয়দেবের মনে হল, হয়তো ওভারটেক করতে গিয়েছিল স্যান্টো গাড়িটা। এটা তারই পরিণতি।

সুইচ অন করে জয়দেব মেসেজ পড়তে শুরু করল, 'আজ রাতে ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্লিজ আসবেন। খুব দরকার আছে। গোরাবাবুও আসবেন বলেছেন। ভীম ট্যাঙ্কি হাউসিংয়ে ঢুকে আমাকে একটা ফোন করবেন। নবেন্দু গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে।'

মজা করার জন্য জয়দেব মেসেজ পাঠাল, 'মেনু কী, আগে জানান।'

মুহূর্তের মধ্যে জয়দেব ঠিক করে নিল, নবেন্দুদের বাড়ি যাওয়া যেতেই পারে। সন্ধেবেলায় এমনিতে কোনও কাজ নেই। হোটেলে বসে টিভি দেখা ছাড়া। সুশোভনদাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। নরহরি মহাপাত্র হঠাৎ চলে যাওয়ার পর থেকে, উনি খুব আপসেট হয়ে রয়েছেন। খণ্ডগিরি থেকেই বাস ধরে উনি পুরী চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জয়দেব আটকে দিয়েছে। রাতে কিছু কথাবার্তা আছে। তাই সুশোভনদাকে ও ধরে নিয়ে

যাচ্ছে নিজের হোটেলে। বলেছে, কাল সকালে একসঙ্গে পুরী যাবে। সুশোভনদাকে চাঙ্গা করার জন্য সন্ধেবেলাটা একটু ঘরোয়া পরিবেশে কাটানো দরকার। তাই ও বলল, 'দাদা আমরা কিন্তু এখনই হোটেলে ফিরছি না। এখানে আমার এক বন্ধু থাকে। তার বাড়িতে ডিনার আছে।'

'আমাকে আবার টানছ কেন ব্রাদার। কাবাব মে হাড্ডি। তোমরা ইয়ংম্যানরা গল্পগুজব করবে, সেখানে আমাকে বেমানান বলে মনে হবে।'

'আপনি তো আমাদের থেকেও ইয়াং সুশোভনদা। চলুনই না, আপনার ভালো লাগবে। আমার এই বন্ধুটা খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছেলে। আমাদের কাজে আসতে পারে।'

মোবাইল সেট ফের সুরেলা জানান দিল, মেসেজ এসেছে। বোধহয় স্বাতীর। সুইচ অন করে জয়দেব দেখল, হ্যাঁ, স্বাতী। লিখেছে, 'মেনু আপাতত বলা যাবে না। সারপ্রাইজ রাখা হচ্ছে। তবে চিফ শ্যেফ-এর নাম বলতে পারি...উপাসনা রায়। শুনে কি খাওয়ার ইচ্ছেটা বাড়ল?'

জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'হোটেলে বলে এসেছিলাম, রাতে খাব। অর্ডার এখনই ক্যানসেল করছি না। আর হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এক বিশিষ্ট অতিথি গেলে কি অন্নপূর্ণার ভাঁড়ারে কম পড়বে?'

স্বাতী এক মিনিটের মধ্যে উত্তর দিল, 'মোটেই না। অন্নপূর্ণা জানেন, ভোলানাথের সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গী কেউ-না-কেউ থাকেনই।'

পড়ে জয়দেব মুচকি হাসল। সত্যি, স্বাতী মেয়েটা খুব উইটি। মফস্‌সলের মেয়ে, তবুও এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে, শুনলে অবাক হতে হয়। তুলনায় উপাসনা খুব রিজার্ভ টাইপের। শান্ত প্রকৃতির। এরকম মেয়েই ওর পছন্দ। মাই গড, কথাটা মায়ের কানে একবার গেলে হয়। মা উঠে পড়ে লাগবে, বিয়ে দেওয়ার জন্য। বলা যায় না, নবদ্বীপেও দৌড়তে পারে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে। ভাবতেই ফের হাসি পেল জয়দেবের। সেটা লক্ষ করে সুশোভনদা বললেন, 'মোবাইলে কী এমন মেসেজ আসে, যা দেখে তোমরা এত হাসো? আমি তো অবাক হই, এত তাড়াতাড়ি কী করেই বা তোমরা মোবাইলে টাইপ করতে পারো।'

হেসে জয়দেব উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় গাড়ি চলতে শুরু করল। দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি দিয়ে যাওয়ার সময় জয়দেব দেখল, পুলিশে পুলিশে জায়গাটা ছয়লাপ। সত্যি স্যান্ট্রো গাড়িটার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কী দরকার ছিল হুড়মুড় করে যাওয়ার? ও বলল, 'দেখেছেন সুশোভনদা, র‍্যাশ ড্রাইভিংয়ের পরিণাম?'

সুশোভনদা বললেন, 'দিনকাল বদলে গেছে ব্রাদার। গাড়ি তুমি কত ভালো চালাও, সেটার ওপর তোমার সেফটি আর এখন নির্ভর করে না। গাড়ি অপরে কতটা খারাপ চালায়, সেটার ওপর নির্ভর করে, অক্ষত অবস্থায় তুমি বাড়ি ফিরতে পারবে কি না।'

সুশোভনদা ঠিকই বলেছেন। জয়দেব মনে মনে তারিফ করল। দু'তিন বছর আগে, ওর একবার গাড়ি কেনার ইচ্ছে হয়েছিল। সহজ কিস্তিতে দাম শোধ দেওয়ার সুযোগ

ছিল। কিন্তু দোকানের কাছে গাড়ি রাখার জায়গা নেই, এই কারণে ও ইচ্ছেটা দমিয়ে ফেলে। মা কিন্তু তখন বারণ করেছিল। 'না বাবা, কিনিস না। আনমনা হয়ে গাড়ি চালাবি, কোথায় কাকে ধাক্কা মেরে দিবি, তখন হাতকড়ি পরতে হবে। গাড়ি চালানো তোর কর্ম নয়।' মায়ের কথা মনে হতেই জয়দেবের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। মাকে ও পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলে এসেছে। বলেছে, পুরুলিয়ায় বইমেলা হচ্ছে। সেখানে স্টল দিচ্ছে। মা ভাবছে, ও এখন পুরুলিয়ায়। কিন্তু এখানে যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়, তাহলে মা আর কোনওদিন ওকে বিশ্বাস করবে না। কী হত, মাকে সত্যি কথা বলে এখানে এলে?

ভুবনেশ্বরে একটা রেস্তোরাঁয় চা-টা খেয়ে ওরা যখন স্বাতীদের বাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধে সাতটা। ফ্ল্যাট বাড়ি, বোধহয় জানলা বন্ধ করে রেখেছে। ঘরে ঢুকতেই রান্নার সুগন্ধ জয়দেবের নাকে এল। স্বাতী সেজেগুজে রয়েছে। হাতজোড় করে ও আপ্যায়ন করল, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

জয়দেব ভুলে গেল সঙ্গে সুশোভনদা রয়েছেন। ও বলে ফেলল, 'আশীর্বাদ করি মা, সুখী হও। শতপুত্রের জননী হও।'

স্বাতী বলল, 'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার খুব ভয় ছিল, তাড়াতাড়ি মরে যাব। কিন্তু আপনার বর সত্যি হলে, এখনও মিনিমাম, নিরানব্বই বছর বেঁচে থাকব।'

'আরে, বরটা তো ভালো করে শুনলেই না। আটচল্লিশবার যমজ আর একবার একসঙ্গে তিনপুত্র...তার মানে, আর উনপঞ্চাশ বছর তোমার আয়ু। এর মধ্যে আমাদের যা খাওয়ানোর, খাইয়ে দাও।'

শুনে নবেন্দু হো হো করে হাসতে লাগল। স্বাতীকে বলল, 'এতদিনে একটা লোক পেলাম, যে তোমায় জব্দ করতে পারবে। বসুন জয়দেবদা। গোরা এখুনি এসে পড়বে।'

সুশোভনদার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'চিফ শ্যেফকে তো চোখে পড়ছে না। উনি কি এখনও রন্ধনে ব্যস্ত?'

স্বাতী বলল, 'উনি এখন পানীয় তৈরি করছেন। তরমুজের সঙ্গে আমের মিলন ঘটিয়ে অপূর্ব শরবত সৃষ্টির নেশায় মগ্ন। তেমন দরকার থাকলে কিচেনে যেতে পারেন।'

জয়দেব হেসে সুশোভনদার উলটোদিকের সোফায় বসল। নবেন্দুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন সুশোভনদা। ওরা কথা বলছে ওড়িশার সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে। ওড়িশার একদল বুদ্ধিজীবী কেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পছন্দ করেন না, নবেন্দু সে কথাই বলছে। বেশ কয়েক বছর ও ভুবনেশ্বরে আছে। মোটামুটি সব খবর রাখে। অন্য সময় হলে, জয়দেব কথাবার্তায় অংশ নিত। কিন্তু কেন যেন আজ উৎসাহ পাচ্ছে না। নরহরি মহাপাত্র যে চিঠিটা সুশোভনদাকে দিয়েছেন, তাতে কী লেখা আছে, সেটা জানার জন্য ও উদ্‌গ্রীব। গাড়ি যখন জ্যামে আটকে ছিল, তখন চিঠিটা খুলে একবার নজর বুলিয়েছেন সুশোভনদা। তার পর ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিয়েছেন। চিঠি সম্পর্কে নিজে থেকে কোনও কথা বলেননি। সেটাই বেশি কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে ওর। রাতে হোটেলে ফিরে জয়দেব

জানতে চাইবে, চিঠিতে কী লেখা আছে। সেন্টার টেবিলে সংবাদ বলে একটা ওড়িয়া কাগজ পড়ে আছে। জয়দেব হাতে তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। ওড়িয়া ভাষা ও সামান্যই পড়তে পারে। ওকে কাগজ পড়তে দেখে নবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি ওড়িয়া ভাষা শিখেছেন না কি?'

জয়দেব বলল, 'একটা সময় শিখতে শুরু করেছিলাম। তখন অনেকেই আমাকে বলতেন, চৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণা করতে হলে, তোমাকে অরিজিনাল ওড়িয়া সাহিত্য পড়তে হবে। এখন নিয়মিত চর্চা নেই। তাই অনেক কিছু ভুলে গেছি। অক্ষরগুলো কেমন যেন তামিল-তেলেগুদের মতো। সব মনে নেই। এই যেমন...শুধু হেডলাইনগুলো পড়তে পারছি।'

নবেন্দু বলল, 'এই কাগজে এক বুদ্ধিজীবী...ওড়িয়া জাতির ইতিহাস নিয়ে রোজ প্রবন্ধ লিখছেন। তাতে মজার মজার তথ্য পাচ্ছি।'

'তাই না কি? কী লিখছেন উনি?'

'ওড়িয়া সাহিত্য না কি বাংলার থেকেও পুরনো। উনি লিখেছেন, চর্যাপদ নাকি প্রথম ওড়িয়া ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছিল।'

সুশোভনদা বললেন, 'দূর...বাজে কথা। তাহলে তো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে মিথ্যেবাদী বলতে হয়। উনি লিখে গেছেন, বাংলা স্ক্রিপ্ট আরও পুরনো।'

'এঁরা কিন্তু স্পষ্টভাষায় এখন বলছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভুল লিখে গেছেন।' নবেন্দু বলল, 'আরও শুনবেন? এই কাগজে ভদ্রলোক কিছুদিন আগে লিখেছেন, কাশীরাম দাস বাংলায় মহাভারত লেখার...বহু বছর আগে সারলাদাস ওড়িয়া ভাষায় লিখে গেছেন মহাভারত।'

'ভদ্রলোক যা ইচ্ছে লিখতে পারেন, গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। বাই দ্য বাই, এই বুদ্ধিজীবীটি কে জানতে পারি?'

'নামটা আর বলছি না। ইনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন কাব্যগ্রন্থ লিখে। কাব্যে মহাভারত লিখেছেন...সেটা প্রায় তিনশো পাতার বই।'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পার? তাহলে ওঁকে জিজ্ঞেস করতাম, ওড়িয়া সাহিত্যে মহিমা উনি প্রচার করতেই পারেন, কিন্তু ইতিহাস বিকৃত করছেন কেন? সেই অধিকার ওঁকে কে দিয়েছে?'

'একটা সেমিনারে আমি নিজেই একবার ভদ্রলোককে চেপে ধরেছিলাম। রেগে গিয়ে উনি কী অদ্ভুত উত্তর দিলেন, জানেন? বাংলা সাহিত্য এগিয়ে গিয়েছে বাংলায় রেনেসাঁর জন্য। ইংরেজরা যদি কলকাতায় ঘাঁটি না গেড়ে, আগে বালেশ্বরে তাঁবু গাড়ত, তাহলে ওড়িয়া ভাষাও দু'শো বছর এগিয়ে যেত। বাংলা ভাষাকে তো জগৎসভায় নিয়ে গেছে ইংরেজরাই। আরও মজার কথা শুনবেন? রবীন্দ্রনাথ নাকি শান্তিনিকেতন করার আইডিয়াটা পেয়েছিলেন এখানে গোপবন্ধুর করা বকুলবাগান থেকে। সত্যি একেক সময় অবাক লাগে, সব ব্যাপারেই এই বুদ্ধিজীবীরা কেন তুলনাটা টানেন বাংলার সঙ্গে?'

সুশোভনদা বললেন, 'এদের কথা ছাড় তো। এরা তো বুদ্ধদেবকেও ওড়িয়া বলে ক্লেম করেছিল। বলেছিল, বুদ্ধদেব নেপালি হতেই পারেন না। তাঁর মুখশ্রী মোঙ্গলিয়ানদের মতো নয়। তা ছাড়া, মোঙ্গলিয়ানরা এত লম্বাও নয়। এখান থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কপিলাবস্তু বলে একটা গ্রাম আছে। এরা দাবি করেছিল, বুদ্ধদেব না কি সেখানেই জন্মেছিলেন।'

জয়দেব এতক্ষণ চুপচাপ নবেন্দুর কথা শুনছিল। এবার বলে উঠল, 'ওড়িশার কিছু বুদ্ধিজীবী আগে বলতেন, চৈতন্যদেব ওড়িয়া। ইদানীং বলতে শুরু করেছেন, না উনি বাঙালি। হঠাৎ ওঁরা কেন মত বদলে ফেললেন, সে সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে নবেন্দু?'

নবেন্দু বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। তবে যে বুদ্ধিজীবীর কথা এতক্ষণ বলছিলাম, তিনি প্রায়ই একটা কথা লেখেন...টিকা লাগা চৈতন্য। টিকা লাগা কথাটা ডাবল মিনিং। তিলক পরা ধরতে পারেন, আবার ঠকিয়ে যাওয়াও বলতে পারেন। টিকা লাগা কথাটা অনেক সময় ঠকিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। তার মানে চৈতন্যদেব ওড়িয়াদের বোকা বানিয়ে গেছেন। কেউ কেউ তো আরও এগিয়ে বলেন, উনি ওড়িশার সংস্কৃতিকে অনেক পিছিয়ে দিয়ে গেছেন।'

শুনে সুশোভনদা বিরক্ত হলেন, 'বাজে কথা। আমিও এসব শুনেছি। চৈতন্যদেব নাকি উৎকল রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন। ওঁর ভাবধারায় আবিষ্ট হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্র নাকি রাজকার্যে মন দিতেন না। তাই তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। এসব ফালতু যুক্তি। এ কথা ঠিক, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাঁর রাজত্বের সীমানা দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু তখন ওইসব রাজ্যে...বিদর, বিজয়নগর, গৌড়ের শাসকরা ততটা পরাক্রমী ছিলেন না। শোনো ভাই, আমি ইতিহাসবিদ প্রভাত মুখার্জির বইটা পড়েছি। তাতে দেখেছি, বিদর আর গৌড়ের সুলতান ও বিজয়নগরের রাজা পরে সংগঠিত হয়ে, পালটা যুদ্ধে নামেন। এবং নিজেদের রাজ্য দখল করে নেন। প্রতাপরুদ্র কখনোই আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন রাজা ছিলেন না। তাঁর আমলে কিছু অমাত্য ও সভাসদ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরাই পতনের মূলে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ঠিক ওই সময়টাতে চৈতন্যদেব পুরীতে গিয়ে হাজির হন। তাই তাঁকে দায়ী করাটা সোজা হয়েছিল। ফ্যাক্ট রিমেন্স, প্রতাপরুদ্রের পতনের পিছনে চৈতন্যদেবের কোনও হাত ছিল না। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর রাজত্বের পতন হত। বিশ্বের কোন ডাইনেস্টি চিরদিন রাজত্ব করতে পেরেছে, আমাকে দেখাও তো।'

নবেন্দু কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকে এল স্বাতী। 'উফ্ বাবা, এই ইস্যুটা বন্ধ করো তো! ঘণ্টাখানেক ধরে তোমরা বকেই চলেছ। আপাতত একটু গলা ভিজিয়ে নাও। নাউ...হিয়ার কামস আমমুজ...আ স্পেশাল ড্রিঙ্ক মেড বাই আওয়ার চিফ শ্যেফ উপাসনা রয়। তালিয়া, তালিয়া।'

পর্দা সরিয়ে ট্রে হাতে ধরে ঢুকল উপাসনা। ট্রে-তে পাঁচ গ্লাস শরবত। উপাসনার পরনে লেবু রংয়ের তাঁতের শাড়ি। মুখে মৃদু হাসি। ঘরে পা দিয়েই ও বলল, 'খেয়ে

কেউ নিন্দে করবেন না যেন। আজই প্রথম ট্রাই করলাম।'

জয়দেব হাঁ করে উপাসনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কী স্নিগ্ধ লাগছে মেয়েটাকে। ট্রে থেকে গ্লাসটা তুলে নেওয়ার সময় ওর হাত কেঁপে গেল। সুশোভনদার কাছে গিয়ে মেয়েটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে। জয়দেব তখনও চোখ ফেরাতে পারল না। গ্লাসে চুমুক দেওয়ার কথা ও ভুলে গেল। সুশোভনদা খুব রোমান্টিক টাইপের মানুষ। গ্লাসে চুমুক দিয়েই বললেন, 'জয়দেব, টেস্ট করে দেখো। অসাধারণ। প্যারিসে প্রথম যেদিন শঁপা খেয়েছিলাম, তার স্বাদকেও ভুলিয়ে দিল এই আমমুজ।'

নবেন্দুর পাশে গিয়ে বসেছে উপাসনা। লজ্জিত মুখে তাকিয়ে রয়েছে। স্বাদ না-নিয়েই জয়দেব বলল, 'স্বাতী, তোমার ফ্রিজে কোনও খালি বোতল আছে?

'কেন বলুন তো?'

'না, একটা আইডিয়া মাথায় খেলে গেল। এই ড্রিঙ্কসটা সঙ্গে নিয়ে যাব। ভাবছি, রিসার্চ ফিসার্চ আর করব না। এই আমমুজ ব্যাপকভাবে এক্সপার্ট করব...প্যারিস, বার্লিন আর টোকিয়োতে।'

স্বাতী খিলখিল করে হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আরে...আপনি তো আসল খাবারগুলো এখনও টেস্ট করেননি। বিট-এর কিমা। খেয়েছেন কখনও? সব এক্সক্লুসিভ ভেজ ডিশ। ডিনারের পর ঠিকই করতে পারবেন না, কোনটা এক্সপার্ট করবেন। এখন তো ও দেশে ভেজ ডিশ-এর খুব আদর শুনেছি। আমাদের চিফ শ্যেফ ভেজ ডিশ-এ বৈষ্ণব ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছে।'

'তাহলে দেরি করছ কেন? ডিনার সার্ভ করে দাও।'

'আপনি তো আচ্ছা বেরসিক লোক মশাই। বেচারী উপা এই এল একটু সুশোভনদার সঙ্গে কথা বলার জন্য। আর আপনি ডিনারের তাগাদা দিচ্ছেন?'

'তাহলে এক কাজ করো। টিভিটা চালিয়ে দাও। আমরুজ খেতে খেতে আমি না হয় খবরটা শুনি।'

স্বাতী উঠে গিয়ে টিভিটা চালু করে দিল। তারপর রিমোট কন্ট্রোল এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'চিফ শ্যেফকে যদি সারা জীবন সঙ্গে রাখতে চান, তাহলে এখনই জানিয়ে দিন। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু।'

কী মনে হল, জয়দেব বলল, 'ঘটকালি করতে নর্মালি তুমি কত চার্জ করো?'

'আপনার জন্য ফ্রি সার্ভিস।' বলেই স্বাতী হাসতে হাসতে বরের পাশে গিয়ে বসল।

চ্যানেল সার্ফ করতে করতে হঠাৎ জয়দেবের চোখ আটকে গেল। ওড়িয়া চ্যানেলে অ্যাক্সিডেন্টের খবর দেখাচ্ছে। ওপরে বড় বড় অক্ষরে ব্রেকিং নিউজ। পথ দুর্ঘটনায় মৃত ইতিহাসবিদ নরহরি মহাপাত্র। পর্দায় স্যান্ট্রো গাড়িটার ধ্বংসাবশেষ দেখাচ্ছে। সাদা চাদরে ঢাকা দুটো দেহ রাস্তায় শোয়ানো। পর্দায় কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছেন এক মহিলা। নিচে লেখা ফুটে উঠল, কন্যা প্রমীলা পুরকায়স্থ। শরবতটা তেতো বলে মনে হল জয়দেবের। কোনওরকমেও বলল, সুশোভনদা...কী হয়েছে, টিভিতে দেখুন!'

ছত্রিশ

রাতে শোয়ার আগে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রিম ঘসছিল উপাসনা। এমন সময় স্বাতী এসে বলল, 'কী রে এখনও শুসনি? এ ঘরে শুতে তোর ভয় করছে না কি?'

দুপুরে সেই সাপের কথা ভুলেই গেছিল উপাসনা। ও বলল, 'না না। নবদ্বীপেও কতদিন একতলার ঘরে সাপ এসে ঢুকেছে। তোর মনে নেই একবার সেই বন্যার মতো হল। সাপ তো আমাদের বাড়ি দোতলার ঘরে অবধি উঠে গেছিল। কিন্তু এই সাপটা একেবারে অন্য রকমের। কেউটে না রে? কাটলে আর দেখতে হত না। এতক্ষণে স্বর্গে চলে যেতাম।'

'এটা বাস্তুসাপ। ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় হাউসিং থেকে আমাদের বলেই দেওয়া হয়েছিল। কখনও দেখতে পেলে সাপ যেন না মারি। এই রকম দুটো সাপ নাকি হাউসিংয়ে আছে। জানিস, মহাভারতের ভীম নাকি একবার এই জায়গাটায় এসেছিলেন। তখন থেকে সাপ দুটো এখানে বাস করছে। ভীম নাকি কোনও একটা অস্ত্র এখানে লুকিয়ে রেখে গেছেন। সেই অস্ত্র পাহারা দিচ্ছে এখন দুই শ্বেতসর্প। কলিযুগ যেদিন শেষ হবে, কল্কি অবতারের সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য সেদিন হাজির হবেন ভীম। কৃষ্ণ আর বাকি চার পাণ্ডবের সঙ্গে। তখন এই সাপ দুটোর কাছ থেকে উনি অস্ত্রটা চেয়ে নেবেন। ওরা কারও ক্ষতি করে না। উলটে, কারও বাড়িতে ঢুকলে সেটা শুভ...ইচ্ছেপূরণ হয়।'

ক্রিম মাখা শেষ করে বিছানায় এসে বসল উপাসনা। ওর পরনে পাতলা ম্যাক্সি। খুড়তুতো বোন রিমিতা ওকে কিনে দিয়েছিল সাউথ সিটি শপিং মল থেকে। বেহালার বাড়িতে এই ম্যাক্সিটা ও খুব একটা বের করে না। তাই এখনও নতুনের মতো আছে। পা গুটিয়ে বিছানায় বসে উপাসনা বলল, 'তাহলে বলছিস, আমার ইচ্ছেপূরণ হবে।'

স্বাতীর মুখে দুষ্টু হাসি, 'কোন ইচ্ছেটাকে তুই প্রায়োরিটি দিবি, সেটা আগে দেখতে হবে।'

'তার মানে? অফ কোর্স রিসার্চের ইচ্ছেটাকে। এ ছাড়া আমার আর কী ইচ্ছে থাকতে পারে?'

'কেন জয়দেব? ছেলেটা দারুণ নারে?'

'উফ্, ঘুরে ফিরে তুই সেই লাইনেই আমাকে টানবি, তাই না? তিন তিনটে দিন চলে গেল। এক ইঞ্চিও এগোতে পারলাম না। বুঝতেই পারছি না, কোন দিকে এগোব। তার মধ্যে তুই এসব ফাজলামি শুরু করেছিস।'

শুনে স্বাতী সিরিয়াস হয়ে গেল, 'এগোতে পারলি না মানে? আমি তো বলব, আজকের দিনটা তোর খুব ভালো গেল। সুশোভনদার মতো লোকের সঙ্গে তোর আলাপ হল। কম কথা না কি? হ্যাঁরে, রিসার্চের কথায় উনি তোকে কী বলছিলেন রে?

'উনি বললেন, তোমাকে যদি থিসিস তৈরি করতে হয়, তাহলে রেফারেন্স দিতে হবে। অ্যাকাডেমিক রেফারেন্স। না হলে কেউ অ্যাকসেপ্টই করবে না। আগে ঠিক করো, অ্যাকাডেমিক রেফারেন্স তোমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব কি না। চৈতন্যদেবকে নিয়ে কত পুঁথি লেখা হয়েছে। সেখানে কি কেউ উল্লেখ করেছেন, উনি পুনর্জন্ম নেবেন?'

'তুই কী বললি?'

'আমি বললাম, আচার্য সুধীর মিশ্র মশাই একবার বলেছিলেন, মালিকা সাহিত্যে নাকি এর উল্লেখ আছে।'

'মালিকা সাহিত্যটা কী রে?'

'ওড়িয়া ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থে...ভবিষ্যদ্‌বাণী। প্রচুর আছে। আচার্য মশাই বলেছিলেন, চৈতন্যদেবের পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ নাকি তাঁর পুঁথিতে এই কথা লিখে রেখে গেছেন। সেই পুঁথিটা রাখা আছে নেমার বলে একটা জায়গায় এক মন্দিরে। ভুবনেশ্বর থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। সেখানে গেলে পুঁথিটা দেখা যেত। তবে ওই পুঁথিটা ইউনিভার্সিটি যদি মনে করে পপুলার লিটারেচার তাহলে ওখান থেকে নেওয়া রেফারেন্স গ্রাহ্যই করবে না। সুশোভনদা বললেন, ইউনিভার্সিটির নিয়মকানুন এখন অনেক পালটে গেছে। রিসার্চদেরও এখন ক্লাস করতে হয়। এসব নিয়মের কথা আগে শুনিনি। ভাবছি, একবার জয়দেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'এখনই হতাশ হয়ে যাচ্ছিস কেন ভাই। আমি বলি কী, জয়দেবকে তুই সব খুলে বল। দ্যাখই না, ও তোকে কতটা কী হেল্প করতে পারে?'

'উনি নিজেও তো হতাশ। দেখলি না, নরহরি মহাপাত্র বলে ভদ্রলোকের মারা যাওয়া নিয়ে কেমন মুষড়ে পড়েছে। জয়দেব কী বলছিল, শুনিসনি? ওটা একটা খুন। চৈতন্যদেবকে নিয়ে যারা চর্চা করে, একটা অর্গানাইজড গ্যাং তাদের ডিসটার্ব করে। আজ থেকে এটা হচ্ছে না। চৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার পর থেকেই এই গ্যাংটা তাদের অ্যাক্টিভিটি চালিয়ে যাচ্ছে। শুনলে অবাক হবি, চৈতন্যদেব মারা যাওয়ার পর... ওড়িশায় প্রায় পঞ্চাশ বছর বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে কথা বলার সাহস কেউ দেখাননি। নবদ্বীপে আচার্যমশাই আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন। এখন দেখছি, কথাটা ঠিক। নরহরি মহাপাত্রর মৃত্যুটা চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিল। অত পণ্ডিত মানুষ...বেঘোরে প্রাণটা দিলেন।'

'হ্যাঁ, সুশোভনদাও খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন টিভিতে খবরটা দেখে।'

'কী করব বল তো? চেষ্টাটা চালিয়ে যাব, না ছেড়ে দেব? ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু যখন গোঁসাই বাড়ির শ্রীবৎসের মুখটা চোখের সামনে ভাসে, তখনই মনে হয়, ছাড়ব কেন? রিসার্চ ছেড়ে দিলে ও সারা নবদ্বীপে রাষ্ট্র করে বেড়াবে, আমার কথায় ভয় পেয়ে উপা রিসার্চ ছাড়ল।'

'আমি কিন্তু তোকে ছাড়ার কথা বলব না। তুই যে সফল হবিই, তার ইন্ডিকেশন আমি পেয়ে গেছি। না হলে তোর ঘরে শ্বেতসর্প আসত না। দেখিস, তুই দু'একদিনের মধ্যেই এমন একটা ক্লু পেয়ে যাবি, তখন আনন্দে লাফাবি। মুনিয়াকে দেখলি না? ওরা

আদিবাসী তো, ওরা বুঝতে পারে। তুই যখন রান্না করছিলি তখন বারবার আমায় বলছিল, উপাদিদির কপাল খুলে গেল।'

'সত্যি মেয়েটার সাহস দেখে আমি আজ অবাক হয়ে গেছি রে। শুধু হাতে সাপটাকে ধরে বাগানে ছেড়ে দিয়ে এল। ওর হাত সাপটা কীভাবে পেঁচিয়ে ধরেছিল, তখন দেখেছিস? ওদের কী কোনও ভয়ডর নেই? ওইটুকু একটা মেয়ে...।'

'হ্যাঁ, ওইটুকু মেয়ে। তুইও যেমন। ওদের সমাজে এই বয়সে মেয়েরা দু'ছেলের মা হয়ে যায়। রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় মুনিয়া আমাকে কি জিজ্ঞেস করল জানিস? দিদি, উপাদিদির সঙ্গে ওই ফরসাবাবুর বিয়ে হবে, না গো? বোঝ, কী বুদ্ধি!'

'তুই বোধহয় কিছু বলেছিলি।'

'রাধাগোবিন্দর দিব্যি। মাইরি বলছি। কারও সঙ্গে এ কথা আমি আলোচনা করিনি। এমন কী আমার বরের সঙ্গেও না। তবে জয়দেব যখন আমায় ঘটকালি করার কথা বলছিল, তখন যদি মুনিয়া শুনে থাকে, তাহলে আলাদা কথা।'

'উনি তাই বলেছেন না কি? বাব্বা, এত কাণ্ড ঘটে গেছে। এই মাত্র এক দুদিনের আলাপ। তার মধ্যেই ঘটকালির কথা উঠে গেল?'

'অন্যায় তো কিছু বলেনি। তোকে পছন্দ হয়েছে, সেটাই জয়দেব জানিয়ে দিল। দ্যাখ উপা, পাত্র হিসাবে ছেলেটা খুব ভালো। তোর লাইনেরই ছেলে। অনেক প্লাস পয়েন্ট আছে। যাক গে, একটু ভেবে দেখিস। আর কী বলব?'

'নবেন্দু ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'না রে, ল্যাপটপে কী যেন করছে। অদ্ভুত ছেলে জানিস। অফিসে যখন ঢোকে, তখন বাড়ির কথা ভুলে যায়। আবার বাড়িতে এলে, অফিসের নামগন্ধ করে না। রোজ ডিনারের পর এই সময় নেট খুলে পড়াশুনো করা ওর অভ্যেস। আমার মনে হয়, আজ তোর রিসার্চের সাবজেক্ট ওর মাথায় ঢুকে গেছে। দেখবি, কাল চৈতন্যদেবের রিইনকারনেশন নিয়ে তোকে এমন সব নতুন ইনফরমেশন দেবে, শুনে তুই অবাক হয়ে যাবি। রাত এগারোটার আগে ও শুতেই যাবে না। তাই তোর সঙ্গে পাঁচ মিনিট আড্ডা মারতে এলাম। হ্যাঁ রে, লিঙ্গরাজের মন্দিরটা তোর কেমন লাগল রে?'

'ভালো। আসলে লিঙ্গরাজের মন্দিরে আমি যেতে চেয়েছিলাম অন্য কারণে। আচায্যিমশাই আমাকে একদিন বলেছিলেন, উনি চৈতন্যদেবকে...মানে পুনর্জন্ম নেওয়া চৈতন্যদেবকে লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। এটা হ্যালুসিনেশন কি না, বলতে পারব না। কিন্তু আজ ওখানে গিয়ে মনে হল, আমিও যেন তাঁকে দেখলাম।'

'কী বলছিস তুই! দেখলাম মানে?'

'দাঁড়া, মোবাইল সেটে আমি একটা ছবি তুলে রেখেছি। তোকে দেখাচ্ছি। দেখে তুই হয়তো হাসবি। কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, চৈতন্যদেব যেন স্বয়ং আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

কথাগুলো বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে উপাসনা মোবাইল সেটটা তুলে নিল টেবিল

থেকে। তারপর ইমেজ অপশনে গিয়ে গোরার ছবিটা খুঁজতে লাগল। ছবি বের করে, একবার দেখেই ও চমকে উঠল। মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে গোরা কথা বলছে। ওর মাথার ঠিক পেছনে আলোর একটা বলয়। দুই পাশে প্রায় গায়ের সঙ্গে লেপটে আছেন দুই সাধু। উপাসনার মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ ছিটকে বেরল, 'এ কী!' মোবাইল সেটটা ও বাড়িয়ে দিল স্বাতীর দিকে।

পর্দায় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে স্বাতী বলল, 'গোরাবাবুকে একদম শ্রীচৈতন্যের মতো লাগছে রে।'

উপাসনা বলল, 'তুই কি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না? ভালো করে দ্যাখ।'

'আর কিছু বলতে...' পর্দার দিকে ভালো করে তাকিয়ে স্বাতী বলল, 'আরে, এই আলোর ছটা আর এই দুটো সাধু তো তখন ওই সময় ছিল না। এরা কোত্থেকে এল? আশ্চর্যের ব্যাপার তো! এই ছবিটা তুই আমায় দুপুরের দিকে দেখাসনি কেন? গোরাবাবুকে তাহলে জিজ্ঞেস করতাম। এতক্ষণ আড্ডা মেরে গেলেন...। দাঁড়া, আমি এখনই ওকে ফোন করছি।'

উপাসনা বলল, 'তোর মাথা খারাপ। এত রাত্তিরে কাউকে ডিসটার্ব করার কোনও মানে হয়? ফোন করার দরকার নেই। ছবিটা তোলার পরই আমি আচায্যিমশাইকে এস এম এস করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, এঁকেই আপনি দেখেছেন কি না। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাইনি।'

'আমার মনে হয়, জয়দেব আর সুশোভনবাবুকে তোর এই ছবিটা দেখানো উচিত। ওরা কী বলেন দ্যাখ। কাল দুপুরে ওঁরা দুজন নবেন্দুর অফিসে যাবেন। ওঁদের কী দরকার আছে। নবেন্দুকে বলে দিচ্ছি, কাজ হয়ে যাওয়ার পর যেন, ওঁদের দুজনকে ও বাড়িতে নিয়ে আসে। সকালের দিকে তুইও সময় নষ্ট করিস না। মুনিয়াকে নিয়ে স্টেট লাইব্রেরিতে চলে যা। ওখানে গিয়ে দেবাশিস রথ বলে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে আয়। লাঞ্চের আগে ফিরে আসিস। ততক্ষণে জয়দেবরাও চলে আসবে।'

কথা বলতে বলতে হাই তুলল স্বাতী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তারপর বলল, 'আর কোনও কথা নয়। রাত দশটা বাজতে চলল। নে, এবার শুয়ে পড়।' বিছানা থেকে নেমে, হালকা লাল একটা আলো জ্বালিয়ে দিয়ে স্বাতী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শুয়ে পড়া সত্ত্বেও ঘুম এল না উপাসনার। সারা দিনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ওর মাথায় ভিড় করে এল। আচায্যিমশাইয়ের কথা মন থেকে ও সরিয়ে দিতে পারল না। ওর এস এম এস কি আচায্যিমশাই তাহলে পাননি? ইস, ভুল হল। বিকেলের দিকে আচায্যিমশাইকে একবার ফোন করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। শেষ যেদিন আচায্যিমশাইয়ের কথা হয়, সেদিন উনি শ্রীচৈতন্যের কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'মা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লিঙ্গরাজ মন্দিরে গেলে তুমি তাঁর দেখা পাবেই।' নির্দেশমতো লিঙ্গরাজ মন্দিরে গিয়ে উপাসনা আজ শ্রীচৈতন্যের মতো দেখতে গোরাবাবুকে দেখতে পেয়েছে। জগতে কত মানুষই তো একই রকম দেখতে হয়। তাই বলে গোরাবাবুকে কি শ্রীচৈতন্য বলে মেনে নেওয়া যায়? এ জন্মেও যে শ্রীচৈতন্য, আগের জন্মের মতো

চেহারা নিয়ে জন্মাবেন, তা নাও হতে পারে। থিসিসে এ কথা লিখলে লোকে হাসবে যে।

আজ গোরাবাবু প্রায় ঘণ্টাখানেক এ বাড়িতে ছিলেন। ওর সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ হয়নি উপার। ও তখন খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত ছিল। নিজে সব পদ রান্না করেছে বলে একটু উদ্বেগের মধ্যেও ছিল। কে কী বলে...নিরামিষ রান্না তো আবার সকলে পছন্দ করে না। খাবার টেবিলে জয়দেব আর গোরাবাবু তখন নিজেদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ নিয়ে কথা বলছিল। ওদের কথা টুকরো টুকরো উপাসনার কানে এসেছে। ওর কানে একবার এল, নবেন্দু বলছে, 'নেট খুলে আমি খোঁজ নিয়েছি, ভুবনেশ্বরে একজন লেডি ডক্টর আছেন, যিনি হিপনোটাইজ করে অতীত জন্মে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর নাম পদ্মিনী শতপথি। তবে তিনি আপাতত আছেন পুরীতে। এক বেসরকারি হাসপাতালে। গোরা তুমি চিন্তা করো না, আমি ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখছি। তোমার প্রবলেম সলভ্ হয়ে যাবে।'

জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'গোরা, আমিও কিন্তু সেদিন তোমার সঙ্গে থাকব।'

উত্তরে গোরাবাবু কী যেন বললেন, সেটা শোনার সুযোগ পায়নি তখন উপাসনা। কেননা, তখনই সুশোভনদা বলেছিলেন, 'বিট-এর কিমাটা আর একটু দাও তো মা। দারুণ হয়েছে।'

জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করেছিল, 'পুরীতে একটা নিরামিষ হোটেল খুললে কেমন হয় সুশোভনদা? আপনি ক্যাশ কাউন্টারে বসবেন। আমি ম্যানেজারি করব। স্বাতী ফ্লোর ম্যানেজ করবে। নবেন্দু মার্কেটিংটা দেখবে। মুনিয়াকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। আর চিফ শ্যেফ তো আছেনই...উপাসনা। একদিকে আমাদের রিসার্চ চলবে, অন্যদিকে মাল কামাই। আইডিয়াটা কেমন সুশোভনদা?'

সুশোভনদা বলেছিলেন, 'টিম থেকে গোরাকেই বা বাদ দেবে কেন?'

'কে বলল, বাদ দিয়েছি। আমাদের মূল কামাই তো হবে ওকে ঘিরেই। ওকে আমরা চৈতন্যদেব সাজাব।

হোটেলের সামনে বড় বড় করে লেখা থাকবে, শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদ নিতে হলে, আমাদের হোটেলে আসুন। ব্যস, আর দেখতে হবে না। গোরার জন্য একটা আলাদা ঘর থাকবে। রোজ মাথা কামিয়ে ও সেই ঘরে বসবে। দশ হাজার বিশ হাজার টাকা নিয়ে ও শুধু আশীর্বাদ করবে। উফ, ভাবতে পারছি না। রাতারাতি কীভাবে আমরা সবাই বড়োলোক হয়ে যাব।'

জয়দেবের কথা শুনে তখন ডিনার টেবিলে সবাই হাসছিল। অথচ ট্রেনে এই ছেলেটাকেই দেখে উপাসনার গোমড়ামুখো বলে মনে হয়েছিল। কোলে ল্যাপটপ নিয়ে কত কায়দা! এখন তো স্বাতীর বাড়িতে ওর ফরমা দেখে তাজ্জব লাগছে। বেশি স্মার্ট ছেলে উপাসনা পছন্দ করে না। কৈশোরের অভিজ্ঞতা ওকে অপছন্দ করতে শিখিয়েছে। জয়দেব সুপুরুষ,

শিক্ষিত, মার্জিত, খুবই প্রাণবন্ত টাইপের ছেলে। সত্যি, স্বাতী ঠিকই বলছিল, পাত্র হিসাবে মোটেই ফ্যালনা নয়। স্বাতী গিয়ে যদি বলে, মা একবাক্যে বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু মাত্র দু'দিনের আলাপেই একজন পুরুষ সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া বোধহয় ঠিক না। বিয়ে তো দূর অস্ত্। এমনিতে, প্রেমের ব্যাপারে উপাসনার নিজস্ব একটা ধারণা আছে। স্টেজ বাই স্টেজ এগোতে হয়। দেখাদেখি, ঘোরাঘুরি, বোঝাবুঝি—এই তিনটে হল প্রেমের কম্পালসারি স্টেজ। ওর মতে, দেখাদেখির স্টেজেই বিয়ের কথা ভাবাটা কিন্তু খুব ঝুঁকির হয়ে যাবে।

মোবাইল সেটটা সাইলেন্ট মোড-এ রেখেছিল। হঠাৎ সেটা কাঁপতে শুরু করল। কাঁপুনির শব্দ শুনে উপাসনা সেটটা হাতে তুলে নিল। এত রাতে কে আবার ফোন করল? সুইচ অন করে ও দেখল, বাবা। সারাদিন ও এত ব্যস্ত ছিল, নবদ্বীপে ফোন করার কথা ওর মনেই হয়নি। পর্দায় বাবা শব্দটা দেখে উপাসনা বিছানায় উঠে বসে বলল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'তুই কি শুয়ে পড়েছিলি মা?'

'হ্যাঁ বাবা। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। তাই টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। মা আর বোন কেমন আছে গো?'

'সবাই ভালো। হ্যাঁ রে স্বাতী কি তোর কাছাকাছি আছে?'

'না। এইমাত্র ও উঠে গেল। পাশের ঘরেই আছে। ওর সঙ্গে কি তুমি কথা বলবে?'

'না, না। তার দরকার নেই। শোন মা, একটা খুব খারাপ খবর আছে।'

উপাসনার বুক গুরগুর করে উঠল। তবে কি কাকা বা কাকিমার কিছু হয়েছে? অথবা শ্রীবৎস বাড়িতে গিয়ে কোনও অসভ্যতা করেছে? দম বন্ধ করে ও বলল, 'কী খবর বাবা?'

ও প্রান্তে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর বাবা বলল, 'আজ সন্ধেয় আচায্যিমশাই দেহ রেখেছেন।'

সাঁইত্রিশ

সকালে ড্রয়িং রুমে বসে গোরা টিভিতে খবর দেখছিল। একটা খবর শুনে ও সোজা হয়ে বসল। চিলিতে মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছে। বহু মানুষ মারা গেছেন। চিলি, কলম্বিয়া, ফ্রান্স আর জাপানে সুনামি হতে পারে, এমন সতর্কতা জারি করেছেন বিজ্ঞানীরা। খবরটা শুনতে শুনতে গোরা একটু অবাকই হল। ভূমিকম্পের সঙ্গে সুনামির যোগসূত্র থাকতেই পারে। কিন্তু পৃথিবীর দু'প্রান্ত জুড়ে এরকম রেড অ্যালার্ট...ভাবতে একটু অদ্ভুতই লাগল। ভূমিকম্প বা সুনামি সম্পর্কে ওর খুব একটা ধারণা নেই। ও শুনেছে, সমুদ্রগর্ভে বিভিন্ন প্লেট-এর নড়াচড়াতে না কি এসব হয়। টিভিতে ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখাচ্ছিল। গোরা দেখল, চিলিতে গরিব মানুষদের বাড়িঘরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি।

'কী দেখছিস গোরা? কলিযুগ শেষ হয়ে এল বলে।'

কথাগুলো শুনে গোরা পাশ ফিরে তাকাল। হেসে বলল, 'টুবাই তুই! এ ক'দিন কোথায় ছিলি?'

সোফায় বসে টুবাই বলল, 'অ্যাসাইনমেন্টে গেছিলাম। জাজপুর আর বালেশ্বর জেলার কয়েকটা জায়গায় গ্রাম থেকে হঠাৎ হঠাৎ কিছু মৃত মানুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কাগজের নিউজ এডিটর আমাকে বলল, ওই গ্রামগুলোতে গিয়ে খবর দাও। তাই দিন সাতেক ওইদিকে কাটিয়ে এলাম। কাল রাতে ফিরে এসেছি। তোর মিটিং কেমন হল?'

'খুব ভালো। তুই ছিলি না, তবুও তোদের কাগজ খবরটা ক্যারি করেছে। তোর এই খবর কবে বেরোবে?'

'আজকালের ভেতর লিখে ফেলব। দারুণ ইন্টারেস্টিং স্টোরি।'

'ওখানকার পুলিশ কী বলছে?'

'শুনলে তুই হাসবি। সত্যি, আমাদের রাজ্যটা এখনও অন্ধকারেই পড়ে রইল। গ্রামবাসীরা বলছে, রোজ রাতের দিকে কাত্যায়নীরা আকাশ থেকে নেমে আসছে। কোনও মানুষ মারা গেলে তাদের খেয়ে ফেলছে। নিজের চোখে দু'একজন না কি কাত্যায়নীদের দেখেওছে। ওখানকার লোকজনের অন্ধ বিশ্বাস, কলিযুগ শেষ হয়ে এল। এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মাঝে মাঝে কাত্যায়নীরা আকাশে দেখা দিচ্ছে। ওরা আসলে পিশাচী। মৃত মানুষদের খাওয়ার জন্য এর পর ওরা কাতারে কাতারে হাজির হবে।'

'ওরা জ্যান্ত মানুষদের কোনও ক্ষতি করছে না?'

'না। পুলিশও ধরে নিয়েছে, গ্রামবাসীদের কথাই ঠিক। ভয়ে রাতের দিকে তারা এখন বেরোয় না। গ্রামের দিকে কেউ মারা গেলে, এখন দিনের বেলায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা সৎকার করে ফেলছে। খবরটা বেরোলে দেখবি, হইচই পড়ে যাবে।'

'ওখানে ঘুরে এসে তোর কী মনে হল টুবাই?'

'হিউম্যান ডেড বডি নিয়ে ব্যবসা করে, এমন একটা চক্রের কাজ। জেনো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন-এর যুগে মানুষের দেহ কতভাবে বিক্রি করা যায়, জানি? হোক না সে মৃত। এখন এটা একটা ভালো রোজগার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তারি পড়াশুনোতেও কাজে লাগে। গ্রামগঞ্জের গরিব লোকজনদের এ সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। তাই কাত্যায়নীদের গুজব ছড়িয়ে দিয়ে গ্রাম থেকে ডেড বডি পাচার করা সহজ। পুলিশকে বললাম, কিন্তু ওরাও সেরকম। আমাকে পাত্তাই দিল না।'

'গ্রামের নিরীহ মানুষদের দোষ দিচ্ছিস কেন? আমেরিকার এনলাইটেনড সোসাইটি কী গুজব ছড়াচ্ছে সেটা দ্যাখ। কলকাতায় হলিউডের একটা ছবি দেখানো হচ্ছিল, টু থাউজেন্ড টুয়েলভ। দু'হাজার বারো সালের একুশে ডিসেম্বর না কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনও মানে হয়?'

'ছবিটা ভুবনেশ্বরেও রিলিজ করেছিল। আমি দেখেছি। কী ভয়ঙ্কর বল তো? সত্যি

সত্যিই যদি হয়, তাহলে কী হবে? হতেও পারে, তার লক্ষণ তো এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। এই যে চিলিতে ভূমিকম্প হয়ে গেল, ফ্রান্সে সুনামি...এসব ধ্বংসেরই সিম্পটম। তুই কি মালিকা সাহিত্য পড়েছিস গোরা? পড়লে দেখতে পাবি, তাতে পাঁচশো বছর আগে ওঁরা যা লিখে গেছেন, এখন তা ঘটছে।'

'যেমন...একটা দুটো উদাহরণ দে।'

'অচ্যুতানন্দ লিখে গেছেন, কলি যুগের শেষ দিকে পৃথিবীতে এক সহস্র সুন্দরী নারীর আবির্ভাব হবে, যাদের ছোঁয়া মাত্রই মারাত্মক বিস্ফোরণ হবে। মিলিয়ে দেখছি, উনি তো ঠিকই লিখেছেন।'

'এমন মহিলা পৃথিবীতে তুই কোথায় আবিষ্কার করলি টুবাই?'

'আমাদের কাগজেই কয়েকদিন আগে খবরটা বেরিয়েছে। তালিবানরা একশো সুন্দরী নারীকে এমনভাবে ট্রেনিং দিয়েছে, যাদের হিউম্যান বোম্ব হিসাবে ব্যবহার করা হবে। এরা শরীরের ভেতর এক্সপ্লোসিভস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাবে। এদের ধরতে গেলে, আত্মাহুতি দিয়ে এরা বিস্ফোরণ ঘটাবে। তাহলেই বল, অচ্যুতানন্দ ঠিক বলে গেছিলেন কি না?'

'মালিকা সাহিত্য আমি তেমন পড়িনি। তাই তোর কথা সত্যি কি না, বুঝতে পারছি না। তবে পৃথিবীটা যে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা ঠিক। এত অসাম্য, এত বৈষম্য...কদ্দিন সমাজ টিকতে পারবে। ধ্বংস হওয়া দরকার। আমারও তাই মনে হয়। ফের নতুন করে সমাজটাকে গড়ে তোল।'

'দ্বাপর যুগের শেষদিকে শ্রীকৃষ্ণও সেটাই করিয়েছিলেন। কায়দা করে যাদবদের মধ্যে উনি যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। উনিও বুঝতে পেরেছিলেন, ধ্বংস না হলে নতুন সৃষ্টি সম্ভব হবে না। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে একটা জনজাতি শেষ হয়ে গেছিল। আবার সেটাই রিপিট হতে যাচ্ছে। দলিতদের নিয়ে তোর এই আন্দোলন, যেদিকে যাচ্ছে আমার তো মনে হয়, একটা লড়াই অনিবার্য।'

টিভিতে শাহরুখ খানের ইন্টারভিউ দেখাচ্ছে। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে উঠল গোরার। সুইচ অফ করে দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। একটু পরেই জয়দেব আসবে। ওর সঙ্গেই ব্রেক ফাস্ট করার কথা ছিল গোরার। সেটা মনে পড়ায় ও বলল, 'তুই কি ব্রেকফাস্ট করে এসেছিস?'

'হ্যাঁ। মা তোর জন্য কিছু খাবার করে পাঠিয়েছে। কাকিমার কাছে তা রেখে গেলাম। আর হ্যাঁ, যে কারণে আমি এলাম, সেটা এখন বলি। বন্ধু হয়ে তুই আমায় এতবড়ো বাঁশ দিবি, ভাবতেও পারিনি।'

'তার মানে?'

'আরে...কলকাতা থেকে মাঝে মাঝেই একটা মেয়ে ফোন করছিল তোর নাম করে। কী নাম যেন...হ্যাঁ রিনি মণ্ডল। সে না কী কোন ফিল্ম ডিরেক্টরের অ্যাসিসট্যান্ট। বলে কি না, ওরা মহাপ্রভুকে নিয়ে কী একটা ছবি করছে, সেখানে আমাকে মহাপ্রভুর রোলে অ্যাক্টিং করতে

হবে। তুই না কি আমার নামটা রেকমেন্ড করেছিস? কী জ্বালাতন বল তো?'

শুনে গোরা হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে তারপর বলল, 'বাঁশ দিয়েছি বলছিস কেন? এ তো ভালো খবর। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবি। পেমেন্ট পাবি ডলারে। আপত্তি করার তো কিছু নেই। আমার মনে হয়, মহাপ্রভুর রোলে তোকে ভালো মানাবে।'

টুবাই বলল, 'দ্যাখ ভাই, স্কুল লাইফে তোর উসকানিতে, মহাপ্রভুর বংশধর সেজে প্রচুর লোককে আমি ঠকিয়েছি। আর পারব না ভাই। এখন একটা রেসপেক্টেবল চাকরি করি। তাতেই আমি সন্তুষ্ট। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, আবার অ্যাক্টিং! সর্বনাশের ব্যাপার, মেয়েটা ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। কাল রাতে তাজ হোটেল থেকে ফোন করে আমায় বলল, হলিউড থেকে কাস্টিংয়ের লোকজন এসেছে। আমায় একবার তাজ হোটেলে যেতে হবে। কী মুশকিল বল তো?'

'আমার তো মনে হয়, তাজ হোটেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে তোর দেখা করা উচিত। বি ব্রেভ মাই ফ্রেন্ড। যা ইনকাম করবি, তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমাকে দিস। সে টাকা আমি দলিত পার্টির ফান্ডে ডোনেট করব। এবার কেটে পড়। আমার এক বন্ধু এখুনি এসে পড়বে।' বলে দরজার দিকে তাকিয়ে গোরা ফের বলে উঠল, 'মাই গড... বলতে-না-বলতেই এসে হাজির হয়েছে। কী কাণ্ড। এসো এসো জয়দেব, তোমার কথাই একটু আগে টুবাইকে বলছিলাম।'

দরজার বাইরে জুতো খুলে, ঘরে পা দিয়ে জয়দেব বলল, 'সরি গোরা, লিঙ্গরাজ মন্দিরে গেছিলাম। তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।... এখানে তোমার যা পপুলারিটি দেখলাম, তাতে ভোটে দাঁড়ালে তুমি সিওর জিতে যাবে। দেখলাম, সবাই তোমার বাড়িটা চেনে।'

নিজের প্রশংসা শুনে গোরা একটু লজ্জাই পেল। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য তাড়াতাড়ি টুবাইকে দেখিয়ে ও বলল, 'দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দিই। এ আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড টুবাই। আর কয়েক মাস বাদে তুমি একে পোস্টারে, হোর্ডিংয়ে দেখতে পাবে। আর টুবাই, এ হচ্ছে জয়দেব, কলকাতা থেকে এসেছে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে রিসার্চ করতে। আমি ভাবছিলাম, তোদের বাড়িতে জয়দেবকে একদিন নিয়ে যাব। তোদের বাড়িতে তো অনেক পুঁথিটুথি আছে। জয়দেবের কাছে লেগে যেতে পারে। ভালোই হল, তোর সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেল।'

টুবাই নমস্কার জানিয়ে বলল, 'পরে একদিন ভালো করে কথা বলা যাবে জয়দেববাবু। আজ আসি। আমাকে এখুনি একবার অফিসে যেতে হবে।'

টুবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর সোফায় বসে জয়দেব বলল, 'তোমার এই বন্ধুটা কী করে গোরা?'

গোরা বলল, 'ও কলকাতার এক কাগজের ভুবনেশ্বর করেসপন্ডেন্ট। ওর আরও একটা পরিচয় আছে। ওদের ফ্যামিলি খুব বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা মনে করে, ওরা শ্রীচৈতন্যদেবের বংশধর।'

'আর ইউ সিরিয়াস? আমরা তো কখনও শুনিনি। তুমি কি এ ব্যাপারে ডিটেল কিছু জানো।'

'টুবাইয়ের এক জ্যাঠা সব জানতেন। তিনি এ নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ওদের আসল বাড়ি কেন্দ্রাপড়া বলে একটা জায়গায়। ওখানে গেলে লোকজনের সঙ্গে কথা বললে, তুমি সব জানতে পারবে।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই। চৈতন্যদেবকে নিয়ে আমি অনেক চর্চা করেছি। কোথাও শুনিনি, উনি বংশধর রেখে গেছেন। নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করার কিছুদিন পর উনি সন্ন্যাসগ্রহণ করে নীলাচলে চলে আসেন। ওদিকে ওঁর কোনও সন্তানাদি হয়নি। চৈতন্যদেব জীবনে মাত্র একবারই কেন্দ্রাপড়াতে গেছিলেন। মানছি, কিছুদিন ছিলেনও সেখানে। কিন্তু সেখানে তো সংসার করেননি। তাহলে বংশধর রেখে যাওয়ার কথা উঠছে কী করে? সন্ন্যাস নেওয়ার পর উনি রমণী সংসর্গ করছেন... আমার তো বিশ্বাস হয় না। উনি ছিলেন, লৌহকঠিন চরিত্রের মানুষ। দক্ষিণ ভারতে বেশ কয়েকবার ওঁর চরিত্রহননের চেষ্টা করা হয়েছিল। সত্যবাই বলে একজন প্রস্টিটিউটকে ওঁর পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা এই চেষ্টা করেন, তাঁরাই পরে ওঁর পায়ে শরণ নিয়েছিলেন।'

'কী জানি ভাই, যা শুনেছি, তাই তোমাকে বললাম। এখানকার সাধারণ লোক কিন্তু টুবাইদের পরিবারকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে।'

'শোনো গোরা, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র ছিলেন জাজপুরের লোক। ওঁরা বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। সেই সময় ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে মধুকর পালিয়ে যান শ্রীহট্টে মানে... বাংলাদেশের সিলেটে। মধুকর মিশ্রের চার ছেলে। উপেন্দ্র, রঙ্গদানাথ, কীর্তিদানাথ আর কৃত্তিবাস। উপেন্দ্রর সাত ছেলে—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন আর ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথ নবদ্বীপে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন। তিনি যখন তরুণ, সেই সময় শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ঘোর অরাজকতা চলছিল। তাই পড়াশুনো শেষ করে জগন্নাথ আর শ্রীহট্টে ফিরে যাননি। তিনি বিয়ে করেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর মেয়ে শচীদেবীকে। এই জগন্নাথ মিশ্রেরই কনিষ্ঠ ছেলে চৈতন্যদেব। উপেন্দ্রর বাকি পুত্ররা না কি চলে যান ঢাকা দক্ষিণে। সেখানে বংশপরম্পরায় এখনও তাঁরা বসবাস করছেন। শ্রীহট্টে না কি একটি পরিবার এখনও দাবি করে, তারা চৈতন্যদেবের উত্তরসুরি। এই যে... কেন্দ্রাপড়ায় যে পরিবারটির কথা গোরা তুমি বলছ, এমনও হতে পারে, উপেন্দ্র মিশ্র পরিবারেরই অন্য কেউ চৈতন্যদেবের সঙ্গে সেখানে গেছিলেন। টুবাই তাদের বংশধর। আমি খোঁজখবর নেব। বের করার চেষ্টা করব, টুবাইদের নিয়ে এই দীর্ঘদিনের জনশ্রুতির উৎসটা ঠিক কোথায়।'

গোরা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, 'তুমি নরসিংহ পটনায়েকের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারো। উনি পণ্ডিত মানুষ। টুবাইদের পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। আমি একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার গলায় অবিশ্বাসী সুর ছিল।

তা শুনে উনি কিন্তু আমাকে ধমকে উঠেছিলেন। তার মানে... উনিও বিশ্বাস করেন, জনশ্রুতিটা ঠিক।'

জয়দেব বলে উঠল, 'উনি কি তোমাদের এখানকার সেইসব বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পড়েন, যাঁরা চৈতন্যদেবকে সবসময় হেয় করে দেখান?'

'না না। উনি খুব রেসপেক্টেড। কাউকেই পাত্তা টাত্তা দেন না। কিন্তু প্রশ্নটা তুমি করলে কেন জয়দেব?'

'নবেন্দু সেদিন বলছিল, স্থানীয় কিছু বুদ্ধিজীবী নাকি অ্যান্টি চৈতন্যদেব?'

'থাকতে পারেন। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমাদের প্রজন্মের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব গ্রেট। ভাবতে পারো, একটা মানুষ পাঁচশো বছর আগে সাম্যের কথা বলছেন। পাঁচশো বছর আগে! আমি তো বলব, উনিই বিশ্বে প্রথম... যিনি সাম্যবাদের বীজ ছড়িয়ে ছিলেন। দেখ ভাই, আমি গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। নাম সংকীর্তন, ভক্তিরস, রাধাভাব... এসব ধর্মীয় কথাবার্তা প্রচুর শুনেছি ছোটোবেলা থেকে। আমাদের এই বাড়িতে এখনও বছরে একবার করে তিনদিন অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হয়। ফলে একটা সময় বিশ্বাস করতাম, আত্মীয়পরিজনরা যা বলছেন, সেটাই ঠিক। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে রাষ্ট্র আর সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো শুরু করার পর থেকে পারস্পেক্টিভটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি অন্য চোখে দেখি। আ গ্রেট লিডার।'

'শুনে খুব ভালো লাগল।'

'লাগবেই। কেননা, কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, উনিই প্রথম গণশোভাযাত্রা, গণবিক্ষোভ, গণনাট্য, গণসত্যাগ্রহ, গণসঙ্গীত আর গণসংকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। অশিক্ষিত হরিজনদের কোল পেতে দিয়েছিলেন। ভাব, সেই সময়... যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ দলিতদের মানুষ বলেই মনে করত না। অসীম সাহস না থাকলে কেউ এরকম স্রোতের উলটোদিকে যেতে পারেন? সত্যি বলতে কি, তোমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে চৈতন্যদেবকে নিয়ে আমি খুব ভাবতে শুরু করেছি। ওঁর ওই আন্দোলন আমি এ কালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করছি। তখনই মনে হচ্ছে, দলিতদের নিয়ে আমাদের মুভমেন্ট তুলনায় দিশাহীন। স্রেফ ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শেষপর্যন্ত না আবার কানা গলিতে গিয়ে থমকে যায়।'

'দলিতদের নিয়ে তোমরা সত্যি কী করতে চাও গোরা?'

'আপাতত গণসংগঠন গড়ে তুলতে চাই। দলিত্‌রা যাতে সমাজে সবদিক থেকে সমমর্যাদা পায়, সেটাও আমরা চাই। এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানো জয়দেব? সব মানুষের মধ্যে যে একই পরমাত্মা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করাই প্রকৃত সাম্যবাদ। ভাবো তাহলে, চৈতন্যদেব কত আগে এটা প্রচার করে গেছেন। আমার তো মনে হয়, সাহেবরা আসার পর উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রেনেসাঁ হয়নি। আসল রেনেসাঁ হয়ে গেছিল যোড়শ শতাব্দীতেই। চৈতন্যদেবের সময়ে।'

'এ প্রসঙ্গটা নিয়ে তুমি আমার কাগজে একটা আর্টিকেল লিখবে গোরা? তোমাকে বলা হয়নি, আমি একটা পত্রিকা সম্পাদনা করি। কাটতি খুব খারাপ না।'

'আরেব্বাস, লেখালেখি? সে আমার ধাতে নেই। এখন ভেতরে চল ভাই। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। অনেক ভারী ভারী কথা হয়ে গেছে সকাল থেকে।'

জয়দেবকে নিয়ে গোরা ভেতরে ঢুকে এল। ডাইনিং টেবিলে মা জলখাবার সাজাচ্ছে। ওর খাবার পেতলের বাসনে, জয়দেবেরটা কাচের প্লেটে। দেখে মায়ের সঙ্গে গোরার দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হল। জয়দেব মাছ-মাংস খায় বলে, ওর খাবার কাচের প্লেটে দিচ্ছে মা। জানতে পারলে জয়দেব কিছু মনে করতে পারে। তাই ইচ্ছেটা দমন করল গোরা। মায়ের সঙ্গে জয়দেবের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ও বলল, 'সুশোভনদাকেও নিয়ে এলে না কেন ভাই? ভদ্রলোক একা একা হোটেলে বসে কী করছেন?'

জয়দেব বলল, 'উনি তো হোটেলে নেই। এখানে প্রমীলা পুরকায়স্থ বলে একজনের সঙ্গে উনি দেখা করতে গেছেন। একটা গোপন নথি উদ্ধারের কাজে।'

গোরা বলল, 'প্রমীলাদি! ওকে তো আমি ভালো করে চিনি। আগে বললে না কেন? আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ভদ্রমহিলা কিন্তু অন্য ধরনের। সুশোভনদাকে না আবার ভাগিয়ে দেন!'

কথাটা বলার পর জয়দেবকে দেখে গোরার মনে হল, ভয়ানক হতাশ হয়ে গেছে।

আটত্রিশ

লিঙ্গরাজ মন্দিরের ভেতরে সকাল দশটা থেকে দাঁড়িয়ে আছে পুরন্দর। বেলি নানী বলেছিলেন, প্রতি সোমবার বেলা এগারোটার সময় ওর মা মন্দিরে আসে। তাই ভোরবেলায় পুরী থেকে বাসে করে পুরন্দর ভুবনেশ্বর চলে এসেছে। লিঙ্গরাজ মন্দির ওর অতি পরিচিত জায়গা। হেড কোয়ার্টার্সের আদেশে বহুবার ও এখানে এসেছে। রাস্তাঘাট সব ওর নখদর্পণে। মন্দির সংলগ্ন দোকানের অনেকেই ওকে চেনে। কিন্তু পুরন্দর চায় না, কারও মুখোমুখি হোক। যাতে কেউ চিনতে না পারে, সেজন্য ও পোশাক বদলে ফেলেছে। বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি দোকান থেকে সাদা হাফ হাতা শার্ট আর ফুল প্যান্ট কিনেছে। মুখ আড়াল করার জন্য একটা মাফলারও। নিশ্চিন্ত মনে ও ঘুরে বেরাচ্ছে মন্দিরে।

বেলি নানী বলেছিলেন, ওর মায়ের নাম বিশাখা। মন্দিরে প্রচুর মহিলা পুজো দিতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কার নাম বিশাখা, তা জানতে পারা কঠিন। কিন্তু পুরন্দরের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। পুজো যাঁরা করছেন, সেই পান্ডাদের কাছে গিয়ে ও দাঁড়াচ্ছে। তাঁদের ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। পুজো দেওয়ার সময় পান্ডারা সাধারণত পুণ্যার্থীদের নাম আর গোত্র জানতে চান। চিৎকার করে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ত্রের সঙ্গে নাম আর গোত্রও তখন বলেন। নাঃ, এখনও পর্যন্ত বিশাখা বলে কোনও নাম পুরন্দরের কানে আসেনি।

এতবড়ো মন্দির, এত দেবদেবী! কোন অংশে ওর মা পুজো দিচ্ছে, কে জানে? বারদশেক মন্দির চত্বর পুরন্দর চষে ফেলেছে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। অথচ বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। বেলি নানী বলেছিলেন, মা খুব সুন্দর দেখতে। আর কী বলেছিলেন, মনে করার চেষ্টা করল ও। মা এখন বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছে। বয়স নিশ্চয়ই পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই তিনটে জিনিস মাথায় রেখে পুরন্দর ফের মহিলাদের লক্ষ করতে লাগল। মন্দিরের বাইরে বিশাল ষাঁড়ের মূর্তির কাছে এসে ও দাঁড়াল। তাতে লক্ষ রাখতে সুবিধা হবে। ঠিক সেইসময় ওর চোখ পড়ল পুরীর মন্দিরের এক দইতাপতি সেবায়েতকে। হেড কোয়ার্টার্সে দু'একদিন মানুষটাকে দেখেছে। নামটা মনে করার চেষ্টা করল পুরন্দর। রাম... হ্যাঁ রামচন্দ্রই। দইতাপতিরা ব্রাহ্মণ নন। কিন্তু তাঁদের হাতে অসীম ক্ষমতা। প্রভু জগন্নাথদেবের মহাস্নান পূর্ণিমা থেকে রথযাত্রা...প্রায় একমাস এই দইতাপতি সেবায়েতরাই পুজো অর্চনা করেন। বেলি নানী একবার বলেছিলেন, দইতাপতিরা না কি শবররাজা বিশ্বাবসুর বংশধর। এবং প্রভু জগন্নাথদেবের আত্মীয়।

চোখাচোখি হয়ে যেতে পুরন্দর অচেনার ভান করতে পারল না। হাজার হোক, এঁরা প্রভুর নিকটজন। এঁদের সঙ্গে মিথ্যাচার... পাপ। দু'হাত জোর করে শরীরের ওপরের অংশ ঝুঁকিয়ে পুরন্দর বলল, 'প্রণাম পূজ্যপাদ।'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গি করে রামচন্দ্র বললেন, 'তুই এখানে?'

লিঙ্গরাজ মন্দিরে আসার আসল কারণ বলা যাবে না। পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলল পুরন্দর, 'পূজ্যপাদ পদ্মনাভ একটা কাজে পাঠিয়েছেন। আপনি এখানে?'

'কলকাতা থেকে আমার এক যজমান এসেছে। সিনেমা তৈরি করে। মালদার পার্টি। তাকে পুজো দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। তুই কি আজই পুরী ফিরে যাবি? যদি যাস, তাহলে আমার সঙ্গে ফিরতে পারিস। আমার সঙ্গে একটা সুমো আছে।'

যে কাজের জন্য পুরন্দর এসেছে, অর্থাৎ মাকে খুঁজে বের করা... সেটা সম্পূর্ণ না করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ওর মোটেই নেই। কিন্তু সুমোতে আরামে পুরী যাওয়ার সুযোগ, সহজে ছাড়তে চাইল না পুরন্দর। ও বলল, 'আপনি কতক্ষণ থাকবেন?'

'বুঝতে পারছি না। যজমানরা এখন বিন্দুসাগরের কাছে ছবি তুলছে। কতক্ষণে ওঁদের কাজ শেষ হবে, জানি না। এখানে আমার একটা গেস্ট হাউস আছে। ছবি তোলা শেষ করে ওঁরা ওখানেই যাবে। তোর যদি কোনও কাজ না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারিস।'

দইতাপতি সেবায়েতরা সারা বছর ভালোই কামান। সেই টাকায় ভুবনেশ্বরের মতো শহরে একটা গেস্ট হাউস তাঁরা বানাতেই পারেন। টাটা সুমোও চড়তে পারেন। শুনে আশ্চর্য হল না পুরন্দর। বেলা প্রায় বারোটা। মন্দিরে মায়ের আসার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। মন্দিরের চাতাল ক্রমেই গরম হয়ে যাচ্ছে। তাই ও বলল, 'চলুন তাহলে।'

খানিকটা হেঁটে ওঁরা দুজন সুমোর ভেতর ঢুকল। এসি-র ঠান্ডায় পুরন্দরের শরীর

জুড়িয়ে গেল। ভগ্ন মন্দিরের পাতাল ঘরে ওদের আশ্রমটা ঠান্ডা। তবে স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা। তার তুলনায় গাড়ির ভেতরটা ওঁর স্বর্গ বলে মনে হল। গাড়ি ছুটতেই পুরন্দরের ঘুমঘুম পেতে লাগল। সেই সময় ও শুনল, রামচন্দ্র বলছেন, 'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল পুরন্দর। তোকে দিয়ে একটা কাজ করাতে হবে। ফিরে গিয়ে পদ্মনাভকেই বলতাম, তোকে পাঠানোর জন্য।'

পূজ্যপাদ পদ্মনাভর নাম শুনে ঘুমভাবটা উবে গেল পুরন্দরের। রামচন্দ্র যদি পূজ্যপাদর সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে জেনে যাবেন, ও এখন হেড কোয়ার্টার্সের সুনজরে নেই। আর তা যদি শোনেন, তাহলে আর কোনওদিন আদর করে সুমোতে তুলবেন না। তাড়াতাড়ি ও বলল, 'কী কাজ পূজ্যপাদ? এই তো... আমাকেই বলুন না। পূজ্যপাদ পদ্মনাভকে বিরক্ত করার কী দরকার?'

'তুই তো চুনরা সেবকের কাজ করিস, তাই না? আমার যজমান মন্দিরের চুড়োয় ধ্বজা লাগাবে। তুই এই কাজটা করে দিতে পারবি? পয়সাকড়ি তেমন দিতে পারব না...আগেই বলে দিচ্ছি।'

মন্দিরের চুড়োয় উঠে পতাকা লাগানোর কাজটা কঠিন। পাথরের খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। প্রায় একশো আশি ফুট উঁচুতে। বাঁদরের অত্যাচার আছে। পাথরের গায়ে শ্যাওলা আছে। ঝড়, বৃষ্টি, বাজ পড়ার ভয় আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা পুরন্দরের কাজে জলভাতের মতো মনে হয়। বহুবার ও ওপরে উঠেছে। যত বড়ো পতাকা, তত বেশি টাকা। হাত প্রতি দশ টাকা। তবে চুনরা সেবকরা পায় পাঁচ টাকা। বাকি পাঁচ টাকা যায় মন্দির কমিটির কাছে। সেই টাকাও মেরে দেওয়ার তালে আছেন রামচন্দ্র। শোষণ, সর্বত্র শোষণ। পূজ্যপাদরা কেউ কম যান না। ঘেন্নায় ওর মুখটা কুঁচকে উঠল। তবুও পুরন্দর বলল, 'আপনাকে টাকা দিতে হবে না।'

'তা'লে তো খুবই ভালো। চল বাছা, গেস্ট হাউসে গিয়ে আগে প্রসাদ খেয়ে নিবি। তারপর যজমানরা ছবি তুলে ফিরে এলে আমরা পুরীর দিকে বেরিয়ে পড়ব।'

পতাকা লাগানোর কাজটা করতে হবে সূর্যাস্তের আগে। এখনও অনেক সময় আছে। পুরন্দর জানলার বাইরের দিকে তাকাল। ভুবনেশ্বর শহরটা পুরীর মতো নয়। লম্বা টানা রাস্তা। সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছোটে। মাঝে মাঝে আইল্যান্ডস। দোকান, বাজার। কিন্তু লোকজন খুব কম। এই গরমে রাস্তায় কে বেরোবে? কখনো কখনো একটা দুটো অটো রিকশা দেখা যাচ্ছে। অলস চোখে তাকিয়ে থাকার সময় পুরন্দর চমকে উঠল। আরে জয়দেব না? হ্যাঁ, জয়দেবই তো! একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অটো রিকশায় উঠল। জয়দেবকে দেখেই পুরন্দরের হাত নিসপিস করে উঠল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও নিশ্চিত হয়ে গেল, জয়দেবের সঙ্গে কেউ নেই। এই মওকা আর পাওয়া যাবে না। কোমরে হাত দিয়ে ও দেখে নিল, পিস্তল আছে কী না? ভাগ্যিস, পিস্তলটা ও সঙ্গে এনেছিল!

অটো রিকশাটা সুমোর পাশাপাশি যাচ্ছে। কয়েক হাতের ব্যবধান। পুরন্দর ইচ্ছে করলেই, জানলার কাচ নামিয়ে গুলি করতে পারে। কিন্তু গাড়িতে পিছনের সিটে বসে

আছেন পূজ্যপাদ রামচন্দ্র। এখানে পিস্তল বের করা ঝুঁকির হয়ে যাবে। পুরন্দর নিজেকে সামলাল এই বলে যে, এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। প্রভু জগন্নাথ একবার যখন দেখা পাইয়ে দিয়েছেন, তখন আজই জয়দেবের শেষদিন। সত্যি, অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার। জয়দেবের তো পুরীতে যাওয়ার কথা ছিল। মাঝে চার-পাঁচটা দিন কেটে গেছে। ও ভুবনেশ্বরে পড়ে আছে কী কারণে? জয়দেবের দিকে যতবার ওর চোখ পড়তে লাগল, ততবার দাঁত কিড়মিড় করে উঠল পুরন্দরের। এই লোকটা...এই লোকটার জন্যই ওকে শাস্তি পেতে হয়েছে। সে এক ভয়ানক শাস্তি! নাঃ, একে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই।

ঘামে ওর পিঠে জ্বলুনি শুরু হয়েছে। সেদিন হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে নিয়ে গিয়ে দশবার বেত্রাঘাত করেন পূজ্যপাদ পদ্মনাভ। পিঠের চামড়া কেটে গেছিল আঘাতে। বেলি নানী এই ক'দিন সকাল-বিকেল মলম লাগিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, সেই ঘা এখনও শুকোয়নি। বেলি নানীর ঘরে এই ক'দিন আত্মগোপন করার সময় পুরন্দর কামনা করেছে, পিঠের ঘা যেন বেশ কিছুদিন থাকে। পিঠের জ্বলুনি ওর প্রতিশোধ স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দেবে। পূজ্যপাদ পদ্মনাভকে যখন ও নৃশংসভাবে মারবে, তখন ওর হাত এতটুকুও কাঁপবে না। কিন্তু তার আগে জয়দেবকে খুন করা দরকার। একটা অজুহাত দেখিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগল পুরন্দর। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই দেখল, জয়দেবের অটো রিকশাটা বাঁদিকে নেমে গেল ইউনিক টু-র দিকে। নাঃ, এখন আর ওকে ধরা যাবে না।

পুরন্দর বিড়বিড় করে বলল, 'পালাবি কোথায়? আমার হাতেই তোর মরণ লেখা আছে জয়দেব। প্রভু চাইলে ফের দেখা হবে তোর সঙ্গে।'

'কিছু বললি পুরন্দর?' পিছন থেকে পূজ্যপাদ রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন।

'না না। আপনাকে কিছু বলিনি।'

'হ্যাঁ রে, বেলি মাহেলি সেদিন বলছিল, পদ্মনাভ না কি তোর ওপর খুব অত্যাচার করেছে।'

শুনে চমকে উঠল পুরন্দর। পূজ্যপাদ রামচন্দ্র কি সব জেনে গেছেন? জানা অসম্ভব কিছু না। বেলি নানী সন্ধ্যারতির সময় রোজ মন্দিরে গিয়ে বসে থাকেন। কথায় কথায় বলে দিতেও পারেন, আশ্রমের কথা। পূজ্যপাদ পদ্মনাভ সম্পর্কে ক্ষোভ উগরে দিলে, ভবিষ্যতে ওর ক্ষতি হতে পারে। তাই পাশ কাটানো উত্তর দিল পুরন্দর, 'বেলি নানীকে আপনি চেনেন না কি?'

'চিনব না কেন? মাহেরি, মাদেলিদের সবাইকে আমি চিনি। আমার কম বয়স হল না কি? শোন বাছা, পদ্মনাভর খপ্পর থেকে তুই বেরিয়ে আয়। ওরা তোদের ভুল পথে ঠেলে দিয়েছে। তোর সম্পর্কে বেলি আমায় সবকিছু বলেছে। তারপর থেকে তোকে আমি খুঁজছিলাম। যাতে আলাদা করে তোর সঙ্গে কথা বলা যায়। ভালোই হল, মহাপ্রভু এখানে তোর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। চল, গেস্ট হাউসে বসে কথা বলব তোর সঙ্গে।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গেস্ট হাউসে পৌঁছে গেল গাড়িটা। একতলা বাংলা প্যাটার্নের বাড়ি। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। মনে হয়, ভুবনেশ্বরের কোনও অভিজাত এলাকা। আশপাশের বাড়িগুলো প্রায় একই রকমের। গাড়ি থেকে পূজ্যপাদ রামচন্দ্র নামতেই দুজন কাজের লোক হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। পুরন্দরকে দেখিয়ে...তাদের একজনকে রামচন্দ্র বললেন, 'একে এক নম্বর কামরায় নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

একনম্বর কামরায় ঢুকে ঝটকা খেল পুরন্দর। দেওয়ালে চৈতন্যদেব আর প্রভু জগন্নাথের পাশাপাশি দুটো ছবি। এ কী! দইতাপতির বাড়িতে চৈতন্যদেবের ছবি কেন? না, পূজ্যপাদকে তো সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না! যে লোকটা ওড়িয়া সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছে, তার ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার মানেটা কী? পুরন্দরের ভয়ানক রাগ হতে লাগল। পূজ্যপাদ রামচন্দ্র একটু আগে বললেন, পদ্মনাভরা তোদের ভুল পথে ঠেলে দিয়েছে। তার মানেটা কী? চৈতন্যভক্তদের বিনাশ করাটা তাহলে ভুল? তা কী করে হয়? যে লোকটা প্রভু জগন্নাথের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলে মনে করত, তার ভক্তদের নিধন করা ভুল? কী বলার জন্য পূজ্যপাদ রামচন্দ্র ওকে এখানে ডেকে নিয়ে এলেন? পুরন্দর মনে মনে ঠিক করে নিল, পূজ্যপাদ যাই বলুন না কেন, ও বিশ্বাস করবে না।

'তোর পেছনে যে সিবিআই লেগেছে, তুই জানিস?'

পূজ্যপাদ রামচন্দ্রের গলা শুনে পুরন্দর চমকে উঠল। কখন ঘরে ঢুকেছেন, ও টের পায়নি। সিবিআই কথাটার মানে ও বুঝতে পারল না। রামচন্দ্র সোফায় বসেছেন। তা দেখে পুরন্দর মেঝেয় বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র ওকে বললেন, 'আরে, মেঝেতে বসতে হবে না। তুই ওই সোফায় বোস। তোকে আমার কিছু বলার আছে।'

পুরন্দর সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'সিবিআই কেন আমার পিছনে লেগেছে?'

'তোর বিরুদ্ধে অনেকগুলো মার্ডারের কমপ্লেন আছে। মায়াপুরে একজন ফরেনারকে তুই খুন করেছিলি। তারপর থেকেই সিবিআই তোর খোঁজ করছে।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'তোর খোঁজে সিবিআই-এর এক অফিসার কয়েকদিন আগে আমার কাছে এসেছিল। আমি যখন উৎকল ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তখন সে আমার ক্লাসেই পড়ত। আমার খুব বন্ধু ছিল। দেখলাম, সে তোদের গুপ্ত সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।'

পুরন্দর অবাক হয়ে গেল গুপ্ত সংগঠন কথাটা শুনে। বলল, 'আমাদের গুপ্ত সংগঠন...মানে?'

'তুই জানিস না? কাদের হয়ে তুই কাজ করিস?'

'না। আমাকে কেউ বলেনি।'

'সত্যি বলছিস?' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন পূজ্যপাদ রামচন্দ্র। তারপর বললেন, 'ওরে মূর্খ, তুই কোনওদিন কাউকে জিজ্ঞেসও করিসনি? দীনবন্ধু প্রতিহারের নাম শুনেছিস? পাঁচশো বছর আগে এই গুপ্ত সংগঠনটা তো সেই তৈরি করেছিল।

চৈতন্যদেবকে বধ করার পর তার মনে হয়েছিল, সে যা করেছে, ওড়িয়া সমাজ ও সংস্কৃতির ভালোর জন্যই করেছে। তখন তাকে মদত দিয়েছিলেন গজপতিরাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য...এক কুচক্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর। পরে প্রতাপরুদ্রের ছেলেকে খুন করে এই গোবিন্দ বিদ্যাধর ওড়িশার রাজা হন। তাঁর আমলেই এই গুপ্ত সংগঠনটা ফুলেফেঁপে ওঠে। চৈতন্যদেবের ভক্তদের মধ্যে এরা মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। দীনবন্ধু প্রতিহারের অনুচররা খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকে চৈতন্যভক্তদের। তাদের মেরে ফেলতে থাকে। চৈতন্যদেব মারা যাওয়ার পর... প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ওড়িশায় তাঁর নামকীর্তন করার, তাই সাহস পায়নি কেউ। এই সময়টায় ওরা ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। রাজপাট চলে গেছে, মোঘল আর ইংরেজরাও চলে গেছে। দেশে গণতন্ত্র এসেছে। তবুও দীনবন্ধু প্রতিহারের বংশধররা এখনও এই গুপ্ত সংগঠনটা টিকিয়ে রেখেছে। পদ্মনাভ কে, তুই জানিস?'

পুরন্দর ঘাড় নাড়ল, 'না, জানি না।'

'সে ওই দুষ্ট দীনবন্ধু প্রতিহারের উত্তরসূরি। ধর্মের মায়াকাজল পরিয়ে তোদের মতো কিছু মূর্খ মানুষকে দিয়ে সে এখনও কুকাজ করিয়ে যাচ্ছে। তবে আর বেশিদিন ও সংগঠনটা চালাতে পারবে না। সিবিআই-য়ের কুনজরে পড়েছে। কপাল পুড়বে তোর মতো কিছু মূর্খের। যারা ওর কথায় মানুষ খুন করিস। ধরা পড়লে বাকি জীবনটা হয়তো তোকে কাটাতে হবে ভুবনেশ্বরের জেলে।'

শুনতে শুনতে বুক কেঁপে উঠছিল পুরন্দরের। তবুও রামচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করতে ওর মন চাইছে না। প্রভু জগন্নাথ আছেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা। পূজ্যপাদ পদ্মনাভকে তিনিই অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দেবেন। আমতা আমতা করে ও বলল, 'কিন্তু আমরা এতদিন যা করেছি, তা তো প্রভু জগন্নাথের আদেশেই করেছি।'

'ওরে পাপিষ্ঠ, এ কথা দ্বিতীয়বার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিস না। প্রভু জগন্নাথ পরম করুণাময়। স্বয়ং ঈশ্বর। সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। চৈতন্যদেবের মতো এক অবতারকে তিনি নিধন করার আদেশ কেন দেবেন? চৈতন্যদেব যে তাঁর অঙ্গেই বিলীন হয়েছেন। পদ্মনাভের পূর্বপুরুষরা বহু বছর ধরে মহাপাপ করে গেছেন। কলি যুগে এবার ওদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ধ্বংসের দিন এসে গেছে। পালিয়ে যা... পুরন্দর পালিয়ে যা। পদ্মনাভর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যা।'

পূজ্যপাদ রামচন্দ্র কথাগুলো এমনভাবে বললেন, পুরন্দরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। হঠাৎই ওর কাত্যায়নীদের কথা মনে হল। মনে পড়ল... পাতাল গৃহে ওর নিজের ছায়া দেখার কথা। ও কি পূজ্যপাদর পা জড়িয়ে ধরবে? জিজ্ঞেস করবে, ওর এখন কী করা উচিত? পুরন্দর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

উনচল্লিশ

প্রমীলা পুরকায়স্থ বললেন, 'গোরাভাই, তুমি এসেছ... তোমাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। কিন্তু বাবার পরিণতিটা তো দেখলে... কীভাবে উনি খুন হলেন। আমি এই আশঙ্কাটাই করছিলাম। দু'একদিন আগে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বাবার একটা চিঠি নিয়ে। তবুও আমি কথা বলতে ভরসা পেলাম না।

যে কলেজে প্রমীলাদি পড়ান, তারই কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয় প্রমীলাদিকে ডেকে এনেছে গোরা। সঙ্গে জয়দেব। সুশোভনদাকেও ও সঙ্গে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। আসলে প্রমীলা পুরকায়স্থর আচরণে সেদিন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তাই রাগ করে পুরী চলে গেছেন। অস্বস্তিতে পড়ে... জয়দেবও পুরী যেতে চেয়েছিল। কিন্তু গোরাই যেতে দেয়নি। বলেছে, 'আমার সঙ্গে একবার প্রমীলাদির কাছে চলো। আমি সঙ্গে থাকলে উনি তোমাকে না করতে পারবেন না।'

কলেজ ক্যাম্পাস থেকে হাঁটতে হাঁটতে প্রমীলাদি এতটা এসেছেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে মোটা কাচের চশমা। ঈষৎ পৃথুলা, তাই ঘামছেন। চশমাটা খুলে উনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে গোরা বলল, 'তুমি সিওর, নরহরিবাবু খুন হয়েছেন?'

'ড্যাম সিওর। এমনভাবে ওঁকে খুন করা হয়েছে, যাতে মনে হয় ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। বাবা যে একা উদয়গিরি যাবেন, আমি জানতাম না। অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা শোনার পর প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল, মেরে ফেলার জন্যই... কেউ ওকে ফোনে ডেকে নিয়ে গেছিলেন। পরে কলকাতার ভদ্রলোক সেদিন আমাকে বললেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই বাবা উদয়গিরিতে গেছিলেন। আগে জানতে পারলে কখনোই আমি বাবাকে যেতে দিতাম না।'

'পুলিশ কী বলছে দিদি?'

'ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাচ্ছে। আই ও আমাকে বলেছিলেন, সারা দেশে মিউজিয়ামকে ঘিরে একটা চক্র আছে। ওদের কাজ হল অ্যান্টিক মূর্তি, পুঁথি, মুদ্রা... এসব বিদেশে পাচার করা। ওড়িশায় ওরা খুব অ্যাক্টিভ। এখানে যত মন্দির... মন্দিরকে ঘিরে এত মিথ... বুঝতেই পারছ। বাবাদের মতো পণ্ডিত মানুষদের ওপর ওদের খুব নজর। মাঝে মাঝে বাবার কাছে উড়ো ফোনও আসত। একবার তো মিথ্যে কথা বলে বাবাকে ওরা হোটেলে ডেকে নিয়ে গেছিল। সেখানে একটা প্রাচীন মূর্তি দেখিয়ে জানতে চেয়েছিল, কোন আমলের। বাবা তার পর থেকে এমন ভয় পেয়ে গেছিল, অচেনা লোকের ফোনই ধরত না। ওরা বাবার ফোনও ট্যাপ করত।'

জয়দেব এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার বলল, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? নরহরিবাবু যে চিঠিটা সুশোভনদা মারফত আপনার কাছে পাঠান, তাতে উনি কী লিখেছিলেন?'

'তাতে লিখেছিলেন, সুশোভনবাবুকে সাহায্য করতে। লিখেছিলেন ওড়িয়া ভাষায়। তাতেই আমার একটু সন্দেহ হয়। সামান্য কারণেও বাবা সবসময় ইংরেজিতে লেখেন। তিনি ওড়িয়ায় লিখবেন কেন? তা ছাড়া, সাহায্যটা কীভাবে করতে হবে, সেটাও পরিষ্কার লেখা ছিল না। চেনাজানা নেই ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন, চৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্য নিয়ে বাবা যেসব তথ্য আমার কাছে রেখে গেছেন, সেগুলো ওকে দিতে হবে। বাবা সে সব রেখে গেছেন একেবারে সিল করা খামে। আমি নিজেও জানি না, তাতে কী লেখা আছে। খামটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ভদ্রলোক যেদিন আমার কাছে এলেন, সেদিন মানসিকভাবে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। ওঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে ভয়ই হল আমার। দুর্জনের তো ছলের অভাব হয় না। উনিও ওই র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত কি না, কী করে বুঝব? গোরা, উনি যদি তোমার রেফারেন্স নিয়ে আসতেন, তাহলে ফিরিয়ে দিতাম না।'

গোরা বলল, 'সেটাই ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য নিয়ে তোমার বাবা তোমায় কিছু বলেননি কোনওদিন?'

'অনেকদিন আগে কথায় কথায় একবার বলেছিলেন। সেও এক অদ্ভুত ঘটনার জন্য। বছর দশেক আগে বাবার একবার সরকারি কাজে সীতাবিনজি বলে একটা শহরে যান। জায়গাটা কেওনঝড়ের তিরিশ কিলোমিটার দূরে। একেবারে সীতা নদীর ধারে। ওখানে পাহাড়ের গায়ে একটা ফ্রেসকো পেন্টিং রয়েছে। নাম রাবণ ছায়া। ভালো ট্যুরিস্ট স্পট হতে পারে ভেবে, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে বাবাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল... সেই পেন্টিংটা নিয়ে লেখালেখির জন্য। বাবা ছিলেন জঙ্গলের ভেতর এক সার্কিট হাউসে। সেখানে একটা রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলতে গিয়েই বাবা আমায় অনেক কথা বলে ফেলেন।'

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যজনক ঘটনা মানে?'

'আরে... একদিন রাতে হঠাৎ দুজন সাধু সার্কিট হাউসে এসে বাবাকে নাকি বলেন, চল তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। চোখ বেঁধে ওঁরা নাকি বাবাকে আরও গভীর জঙ্গলে নিয়ে যান। সেখানে মাটির তলায় কোনও এক মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বাবাকে ওঁরা দুটো ছবি দেখিয়েছিলেন। তার পর ওঁরা জানতে চান, ছবি দুটো কত বছরের পুরনো। বাবা নাকি ছবি দুটোর কথা জানতেন। দেখেই চিনতে পারেন, ও দুটো জামিল ফেরদৌসের আঁকা। সেই রাত্তিরেই বাবাকে ওঁরা সার্কিট হাউসে ফেরত দিয়ে যান। এবং হুমকি দিয়ে যান, ছবি দুটোর কথা কাউকে বললে ওঁরা মৃত্যুদণ্ড দেবেন। বাবা যখন আমাকে এসব কথা বলেন, তখন আমার বিশ্বাস হয়নি।'

'কেন বিশ্বাস হয়নি?'

'উনি রোজ ড্রিঙ্ক করতেন। একটু বেশি পরিমাণেই করতেন। সব শুনে আমার মনে হয়েছিল, জঙ্গলের ভেতর একা... সার্কিট হাউসে হয়তো বাবা হেভি ড্রিঙ্ক করেছিলেন, তাই আজগুবি সব ভেবেছেন। কিন্তু পরে ওঁর সেই রাত্তিরের অভিজ্ঞতার কথা উনি ডিটেলে

লিখে ফেলেন। সেই লেখাটাই খামে বন্ধ করে আমার কাছে দিয়ে গেছিলেন। সেই খামের ওপর যতদূর মনে পড়ছে লেখা ছিল, ডু নট ফোল্ড। এমনও হতে পারে, খামের ভেতর একটা ছবিও ছিল। এখন বাবা নেই... তো আর মৃত্যুদণ্ডেরও ভয় নেই। সেই কারণে খামটা এখন খুলতে পারি।'

'তোমার বাবা সেই মন্দিরের ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন দিদি?'

'কীভাবে সেই মন্দিরে গেছিলেন, সেটা তো বললামই। তখন ওঁর চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। ফলে উনি টেরও পাননি, কোন পথ দিয়ে মন্দিরে গেছিলেন। কিন্তু চোখের বাঁধন খোলার পর বাবা না কি মন্দিরে এক পঞ্চমুখী শ্বেতসর্প দেখতে পেয়েছিলেন। সে নাকি ওই ছবিটা পাহারা দেয়। ওই যে বললাম, বাবার কথা আমি তখন উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাই বেশি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু সীতাবিনজি থেকে ফিরে আসার পরই বাবার ভালো হয়েছিল। উনি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। বাবা বিশ্বাস করত, শ্বেতসর্প দেখার ফল শুভ হয়েছিল।'

'তার মানে উনি সত্যি ওই মন্দিরে গেছিলেন।'

'হবে হয়তো।' বলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রমীলা পুরকায়স্থ বললেন, 'গোরাভাই, বেলা বারোটার সময় আমার ক্লাস আছে। আমাকে উঠতে হবে। তুমি যদি রাতের দিকে ওই ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাড়িতে আস, তাহলে খামটা তোমায় দিতে পারব।'

'দিদি, সুশোভনবাবু তো এখানে নেই। উনি পুরীতে গেছেন। আসলে চৈতন্যদেবকে নিয়ে রিসার্চ করছে আমার এই বন্ধু জয়দেব। একে সঙ্গে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রমীলা। বললেন, 'জয়দেব, বাবার লেখাটা আমি তোমাকে দেব। কিন্তু দুটো শর্তে। এক, লেখাটা কোথাও ছাপানো চলবে না। দুই, কোত্থেকে পেয়েছ, তা কাউকে বলা যাবে না। আমার হাজবেন্ডকে ... গোরা তুমি তো জানো। ভয়ানক নার্ভাস টাইপের। ওঁর কানে এসব কথা গেলে বেঁকে বসবে। ঠিক আছে, সন্ধে সাতটার সময় এসো। ব্যাঙ্কের লকার থেকে খামটা আমি বাড়ি নিয়ে যাব। কিন্তু খামে বিশেষ কিছু পাবে বলে মনে হয় না।'

'এ কথা বলছ কেন?'

'দেখো, আমি নিজে অচ্যুতানন্দকে নিয়ে রিসার্চ করেছি। উনি কোথাও লিখে যাননি, চৈতন্যদেবকে খুন করা হয়েছিল। এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অপপ্রচার। আসলে চৈতন্যদেবের জীবনের শেষদিকে... তাঁকে ঘিরে ছিল ওড়িয়া শিষ্যরাই। সেটা নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা সহ্য করতে পারতেন না। ওঁরা সেই সময় মহাপ্রভুকে পরামর্শও দিয়েছিলেন, পুরী থেকে নবদ্বীপে ফিরে যেতে। মহাপ্রভু ওঁদের কথা শোনেননি। সম্ভবত সেই বিরাগ থেকেই অপপ্রচারের জন্ম। মজার কথা কী জানো, প্রথম দিকে আমার বাঙালি হাজবেন্ডেরও ধারণা ছিল, মহাপ্রভুকে খুন করা হয়েছে। আচ্ছা, কমন সেন্স কী বলে? ওঁর মতো এক পুণ্যাত্মাকে খুন করা হবে কেন? জয়দেব... আমার এই প্রশ্নটার উত্তর তুমি আমায় দেবে, রাতে যখন আমার বাড়িতে আসবে। এখন চলি, কেমন?'

প্রমীলাদি চলে যাওয়ার পরও গোরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরনোর তাগিদ দেখাল না। বাড়িতে পার্টি কর্মীরা ওঁর জন্য অপেক্ষা করছে। পুরীতে বড়ো র‍্যালি আছে। তার প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলার জন্য ওরা এসেছে। কিন্তু বাইরে এখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। বেরোলেই দরদর করে ঘামতে হবে। ও দেখল, কলেজের ছেলেমেয়েরা দলে দলে ঠান্ডা রেস্তোরাঁয় ঢুকছে। একটা সিটও খালি নেই। স্কুলকলেজের কাছাকাছি এই রেস্তোরাঁগুলোর ইদানীং সর্বত্র খুব রমরমা। বিপ্লবের জন্য কলকাতায় ওরও এই অভিজ্ঞতা দু'একবার হয়েছে। কলেজের ছেলেমেয়েদের হাতে এত পয়সা আসে কী করে? প্রশ্নটা মনে এসেই মিলিয়ে গেল। খানিকটা আলসেমি কাটানোর ভঙ্গিতেই গোরা বলল, 'মহিলাকে কেমন মনে হল জয়দেব?'

'বড্ড বেশি অ্যাকাডেমিক। দেখলাম, তোমায় খুব স্নেহ করেন।'

'করবেনই। প্রমীলাদির সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছে, সেই অমলদা কলকাতার ছেলে। আমার কাকার ছাত্র। বিয়েতে ঘটকালি করেছিলেন কাকা। সেই থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো। যদি অভয় দাও তো বলি। তোমাকে একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন করতে পারি?'

জয়দেব বলল, 'স্বচ্ছন্দে। তোমার মতো একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

'উপাসনা বলে মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে? প্লিজ, ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিয়ো না।'

'আরে না। তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। খুব ভালো লাগে। ইন ফ্যাক্ট, এরকম মেয়ে যদি আমার জীবনে আসে, তাহলে ধন্য হব।'

'থ্যাঙ্কস। এই কথাটাই জানতে চাইছিলাম। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। ট্রেনে আসার সময় তোমাকে হঠাৎ আমি বলেছিলাম, আগের জন্মে তুমি কী ছিলে, আমি তা বলতে পারি। তোমার মনে আছে সে কথা?'

'কেন মনে থাকবে না?'

'সেদিন চোখের সামনে আমি যা দেখেছিলাম, তার অর্ধেকটা আমি তোমাকে বলেছিলাম। যদি শুনতে চাও, বাকিটা এখন বলতে পারি।'

'এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন গোরা?'

'না... মানে কথাটা তুমি কীভাবে নেবে, জানি না। তবুও বলি। হরিদাস যে বাড়িতে ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, সেটা ছিল নর্তকী মাধবীর বাড়ি। মহাপ্রভু ঠিক সন্দেহই করেছিলেন, মাধবীর সঙ্গে সন্ন্যাসী হরিদাসের গভীর সম্পর্ক ছিল। মাধবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন শুনে আমারও মনে হয়েছিল, দুজনের মধ্যে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়। ভিক্ষার চাল দেওয়ার সময় মাধবীকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। হুবহু উপাসনার মুখ।'

'তার মানে... পূর্বজন্মে উপাসনা মাধবী ছিলেন? স্ট্রেঞ্জ।'

'হ্যাঁ জয়দেব। তুমি বিশ্বাস করতে পারো, অথবা নাও পারো। যা দেখেছি, তাই বললাম। এ জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। যত শিগগির পারো, বন্ধনটা ফের শক্ত করে নাও।'

জয়দেব বলল, 'এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করি? তোমার জীবনে কোনও মেয়ে আসেনি? ছি ছি, প্রশ্নটা বোধহয় এভাবে করা উচিত হল না। তুমি এত হ্যান্ডসাম... আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তোমার জীবনে আজ পর্যন্ত ক'জন মেয়ে এসেছে?'

হা হা করে হেসে উঠল গোরা। তারপর বলল, 'সত্যি কথা বলব... মাত্র একজন। তাও টিন্ এজ-এ। তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। মেয়েটা এইটে। ওর নাম ছিল লক্ষ্মী। মেয়েটা বাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এত কষ্ট পেয়েছিলাম, কী বলব। থাক, ওসব কথা। এবার চলো। বাড়িতে অনেক লোক বসে আছে। তোমার সঙ্গে ফের দেখা হবে সন্ধেবেলায়।'

রিকশা স্ট্যান্ডে একটাই মাত্র অটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। জয়দেবকে সেই অটো রিকশায় তুলে দিয়ে কলেজ চত্বরেই একটা গাছের নীচে দাঁড়াল গোরা। হঠাৎই ওর মনটা ভালো হয়ে গেল। পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ও লক্ষ করতে লাগল। কী স্মার্ট সব ছেলেমেয়ে। ইস, এদের সবাইকে ও যদি দলিত পার্টির কাজে পেত, ওড়িশায় সোনা ফলিয়ে দিত। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গোরা সিদ্ধান্ত নিল, এইসব কলেজ চত্বরে এসে মাঝে মাঝে ওদের মিটিং করতে হবে। ইয়ং ছেলেমেয়েদের বোঝাতে হবে, কেন ওরা নিউ ডেমোক্রেসি চায়। একটা সময় গোরা মনে করত, ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি করা উচিত না। অদ্বৈতবাবু ওর এই ভুল ধারণাটা ভেঙে দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। দেশ সম্পর্কে ওরা আগ্রহ না দেখালে চলবে কেমন করে? এইসব কথা মনে নাড়াচাড়া করতে করতে গোরা মিনিট দশেক অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েই রইল। তবু রিকশার দেখা নেই। কলেজ থেকে ওদের ইউনিক টু মিনিট পনেরোর রাস্তা। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ল তো!

রোদের হলকা ওর নাক দিয়ে গরম সিসের মতো ঢুকছে। সঙ্গে ছাতা নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। আসলে প্রমীলাদির কাছে আসার কথা ওর ছিল না। সকালবেলায় জয়দেবের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে ও নিজেই জোর করে প্রমীলাদির কাছে ওকে নিয়ে এসেছে। ব্রেক ফাস্ট করার সময় পর্যন্ত পায়নি। এখন খিদে পাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে নিলে ভালো করত। কিন্তু ওখানে বড্ড পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। ওখানে ও যে কী করে অতক্ষণ বসে রইল, সেটা ভেবেই অবাক হয়ে গেল গোরা।

হঠাৎই ও দেখতে পেল, দূর থেকে একটা অটো রিকশা আসছে। পেছনের সিটে একজন প্যাসেঞ্জার বসে। অটো গাছতলায় এসে পৌঁছতেই গোরা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জার নেমে দাঁড়িয়ে ভাড়া মেটাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে গোরা চমকে উঠল। কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে। কোথায় হতে পারে? কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে কী? হ্যাঁ, সেই লোকটাই... এ সি কামরায় যে লোকটা ওর ঠিক ওপরের বার্থেই ছিল। গোরা দেখতে পেল, লোকটা রেস্তোরাঁয় ঢুকছে।

... ঘণ্টা তিনেক পর, পার্টি কর্মীদের সঙ্গে মিটিং শেষ করে গোরা যখন অন্দর মহলের দিকে যাচ্ছে, সেই সময় প্রমীলাদির ফোন। 'গোরাভাই, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী হয়েছে দিদি?'

'এই একটু আগে ব্যাঙ্কে গেছিলাম। লকার খুলে দেখি, বাবার দেওয়া সেই খামটা লকারে নেই।'

'সে কী। খামটা নেই মানে? চুরি হয়ে গেছে?'

'বুঝতে পারছি না। লকারের ভেতর সবকিছু ইনট্যাক্ট আছে। সোনার গয়না, বাড়ির দলিল, আমার রিসার্চের পেপার... কোনওকিছু খোয়া যায়নি। শুধু ওই খামটাই নেই।'

'ব্যাঙ্কের লোকজন কী বলছে?'

'পুলিশে খবর দিয়েছিল। কোনও ফিঙ্গার প্রিন্টও পাওয়া যায়নি। লকার যেমন বন্ধ থাকার কথা, তেমনই ছিল। মাসখানেক আগে আমার এক আত্মীয়ের বিয়ে হল। তখন গয়না নেওয়ার জন্য শেষবার লকার খুলেছিলাম। মাঝে... কী করে ওই খামটা উধাও হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। গোরাভাই, এটা সেই মন্দিরের সাধুদের কাজ নয়তো? ওঁরা মন্ত্রবলে সবকিছু করতে পারেন।'

কথাটা শুনে গোরা উত্তর দিতে ভুলে গেল। কলেজের একজন প্রোফেসর, তিনিও কত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। জয়দেবের কথা মনে পড়ায় গোরা বিষণ্ণ বোধ করল। খবরটা শুনলে বেচারি খুব দুঃখ পাবে।

চল্লিশ

খবরটা শুনে সত্যিই জয়দেব মুষড়ে পড়েছে। সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনোর একটা আশা ছিল। সেটাও নষ্ট হল। প্রমীলাদি মিথ্যে কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই প্রথম ওর মনে হল, কিঙ্করের কথাই ঠিক। একটা অর্গানাইজড গ্যাং সত্যিই আছে, যারা চায় না চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্যের কেউ কিনারা করুক। এরা মানুষ খুন করতে পারে, ব্যাঙ্কের লকার থেকে ডকুমেন্ট হাপিশ করে দিতে পারে। দোকানে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। এদের হাত এত লম্বা। নাঃ, কলকাতায় ফোন করে একবার কিঙ্করকে সব জানিয়ে রাখতে হবে। হার মানলে চলবে না।

একটা জেদ চেপে গেল জয়দেবের মনে। কলকাতা থেকে আসার পর তিন তিনটে দিন কেটে গেল। অথচ কাজ কিছুই এগোল না। এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যে, ও পুরীতেই পৌঁছতে পারল না। এদিকে, বইমেলা এসে যাচ্ছে। তাই বেশিদিন রিসার্চের কাজে থাকাও সম্ভব না। হোটেলের ঘরে একা বসে খুব দুশ্চিন্তা হতে লাগল জয়দেবের। ওকে এই দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিল ফোনের রিং টোন। নিশ্চয়ই কৌশিক। ওর ফোন করার কথা ছিল। সুইচ অন করে জয়দেব বলল, 'সকালে এতবার ফোন করলাম, রেসপন্ড করছিলি না কেন?'

ও প্রান্তে খিলখিল হাসি। স্বাতী বলল, 'কার কাছ থেকে রেসপন্স পাচ্ছিলেন না মশাই? পুরুষ, না কোনও মহিলা?'

স্বাতী মেয়েটার মধ্যে আশ্চর্য একটা শক্তি আছে। মুহূর্তে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করতে পারে। ওর সঙ্গে কথা বললে, মনটা ভালো হয়ে যায়। রিসার্চ নিয়ে দুশ্চিন্তা পলকে দূর। জয়দেব বলল, 'আন্দাজ করে তুমি বলো তো?'

'আমার বয়ে গেছে আন্দাজ করতে। আপনার রেসপন্স না পেয়ে... এদিকে যে একজন কাতর হয়ে পড়েছে, তার কী হবে?'

'ভুল বললে। রেসপন্স তো আমিই পাচ্ছি না।'

'অত দূরে থাকলে কি পাওয়া যায়? কাছে আসতে হয়। যাক, যে কারণে আপনাকে ফোন করলাম। আমাদের চিফ শ্যেফ আপনাকে নতুন এক ধরনের শরবত খাওয়াতে চাইছিল। বেলের স্নিগ্ধতা আর আমের মিষ্টতা মিশিয়ে। যার নাম দিয়েছে বেলাম। কিন্তু আপনার পক্ষে আসা কি সম্ভব? গোরাবাবুর মুখে শুনলাম, কোন এক পাগলিনী প্রমীলাদির ডাকে না কি আপনি...'

'এক সেকেন্ড... এক সেকেন্ড', স্বাতীকে থামিয়ে জয়দেব বলল, 'সব অ্যাপো বাতিল। বেলাম খেতে ... এলাম বলে।'

'সত্যি আসবেন! তাহলে সুশোভনদাকেও সঙ্গে নিয়ে আসুন। আজ আমার বাড়িতে দশরথ দাস বলে একজন খুব পণ্ডিত মানুষ আসছেন। উনি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। আর হ্যাঁ জয়দা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে উপা বাজি ধরেছিল, ডাকলেও আপনি নাকি আসবেন না। বাজিতে ও কিন্তু হেরে গেল।'

জয়দেব বলল, 'এ হে, এ কথাটা আগে বললে না কেন? তোমাকে জেতানো কি ঠিক হল?'

স্বাতী বলল, 'ও আচ্ছা... যার জন্য চুরি করি, সে-ই বলে চোর? পুরুষজাতটাই এরকম।'

'নবেন্দুকেও কি পুরুষদের মধ্যে রাখছ?'

'হি হি হি,' হাসতে হাসতে বলল স্বাতী, 'বাজে কথা ছাড়ুন তো। কখন আসছেন, বলুন।' বলেই গলার স্বর বদলে ফেলল ও, 'একটা খবর শুনে উপা খুব মনমরা হয়ে রয়েছে। যার উৎসাহে ও রিসার্চে নেমেছিল, নবদ্বীপের সেই সুধীর আচার্যমশাই কাল মারা গেছেন। উপা নবদ্বীপ চলে যাবে, বলছে। প্লিজ, আপনি এসে ওকে চাঙ্গা করুন।'

জয়দেবের খুব খারাপ লাগল খবরটা শুনে। এই সুধীরবাবু একদিন ওর দোকানে এসেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পিছনে আবার সেই অর্গানাইজড গ্যাং-এর হাত নেই তো? গেলেই জানা যাবে। ও বলল, 'ঠিক আছে, মিনিট কুড়ির মধ্যে তোমার ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি।'

... ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনের কাছ রাস্তা সারাই হচ্ছে। স্বাতীর বাড়ি পৌঁছতে জয়দেবের প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। ড্রয়িং রুমে জোর আড্ডা শুরু হয়ে গেছে। নবেন্দুর উলটোদিকে বসে রয়েছেন মাঝবয়সি এক ভদ্রলোক। তার পাশেই এক সুন্দরী মহিলা। উপাসনা সিঙ্গল সোফায় বসে। ওর মুখটা ফোলা ফোলা। প্রসাধন করেনি। তা সত্ত্বেও খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। উপাসনাকে দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল জয়দেবের। মনে মনে ও বলল, 'দেখি, কেমন করে তুমি ফিরে যাও?'

ওকে দেখে উপাসনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসুন জয়দা। আমি আসছি।'

নবেন্দু পরিচয় করিয়ে দিল, 'জয়, ইনি দশরথ দাস। এখানকার এক ডেইলি কাগজের এডিটর। খুব পণ্ডিত মানুষ। এঁর একেকটা লেখায় মিনস্ট্রি কেঁপে যায়। জীবন পট্টনায়েকের আমলে ইনি একাধিকবার জেলের ভাতও খেয়েছেন। আর ইনি আশালতা। দশরথবাবুর স্ত্রী।'

শুনেই দশরথবাবু বললেন, 'নবেন্দুর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। আমি আসলে ছিলাম স্টেট লাইব্রেরির অ্যাসিসট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান। কপালগুণে একটা কাগজের সম্পাদক হয়ে গেছি। আপনাকে আমি চিনি জয়দেববাবু। বছরতিনেক আগে, পুরীর রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখাও হয়েছিল। আপনার হয়তো মনে নেই। যাক সে কথা, মহাপ্রভুকে নিয়ে আপনার সেই রিসার্চ কেমন চলছে, বলুন।'

জয়দেব বলল, 'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আপনার একটু সাহায্য দরকার। আপনার কাগজের অফিসে আমি একবার যাব ভাবছিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। কী সাহায্য করতে পারি।'

'বহু বছর আগে আপনাদের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল... পুরীর মন্দিরের ভেতর কোনও একটা জায়গা থেকে একটা স্কেলিটন পাওয়া গেছে। তখন হইচই হয়েছিল, সেই স্কেলিটনটা নাকি মহাপ্রভুর। খবরটার ফলো আপ তেমনভাবে হয়নি। খবরটা যিনি করেছিলেন, সেই রিপোর্টারের সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি?'

'অফকোর্স পারেন। তিনি আপনার সামনেই বসে আছেন। কী জানতে চান, বলুন?'

আশালতা বাধা দিলেন, 'থাক না, কী হবে ওসব পুরনো কথা তুলে?'

দশরথ পাত্তাই দিলেন না স্ত্রীর কথা। বললেন, 'আমি তখন সবে প্রোফেশনে ঢুকেছি। পুরীতে পোস্টেড। সে বার মন্দিরের বিগ্রহগুলোর নব কলেবর হবে। নব কলেবর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানেন?'

জয়দেব বলল, 'জানি। প্রতি বারো বছর অন্তর নবকলেবর হয়। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আর সুদর্শনের দারুবিগ্রহ নিমকাঠ দিয়ে নতুন করে তৈরি করা হয়।'

'হ্যাঁ, সেই নব কলেবরের খবর সংগ্রহ করার জন্য একদিন মন্দিরে গিয়েছি। সে বার অবশ্য উনিশ বছর পর নব কলেবর হয়েছিল। পুরনো বিগ্রহগুলো কৈবল্য বৈকুণ্ঠমে সমাধি দেওয়ার আগের দিন, ওখানে আমার পরিচিত একজন প্রতিহারী... মানে যাঁরা মন্দির পাহারা দেন... আমায় চুপিচুপি এই খবরটা দিয়েছিলেন। কাগজে ছাপা হওয়ার পর খুব সেনসেশন হয়েছিল।'

'সেই প্রতিহারী বেঁচে আছেন? তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'তিনি বেঁচে আছেন। স্টিল অ্যালাইভ। তাঁর নামও আপনাকে বলে দিচ্ছি। পদ্মনাভ প্রতিহারী। তবে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন কি না, সেটা আমি বলতে পারব না। খবরটা যে উনি আমায় দিয়েছিলেন, তা কিন্তু কেউ জানেন না।'

'কী নাম বললেন? পদ্মনাভ প্রতিহারী?'

'ইয়েস। আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। লোকটা কত বড় ধূর্ত, সেটা পরে আমি টের পেয়েছিলাম। দ্যাট ইজ অ্যানাদার স্টোরি। অনেক পরে বুঝেছি, কেন উনি আমাকে দিয়ে খবরটা করিয়েছিলেন। মহাপ্রভুকে খাটো করার জন্য। উনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, লোকে যাঁকে অবতার বলে ভাবে, তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষেরই মতো। তাঁর মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছু নেই। তাঁকেও মেরে ফেলা যায়।'

'ইন্টারেস্টিং। তার মানে... আপনি বলতে চাইছেন, ওঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল?'

প্রশ্নটা শুনে রেগে উঠলেন আশালতা। দশরথকে বললেন, 'কেন ফের পুরনো কাসুন্দি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ বলো তো? আমার ভালো লাগছে না তোমাদের এই আলোচনা শুনতে।'

জয়দেব লজ্জা পেয়ে বলল, 'আয়্যাম সরি মিসেস দাস।'

ঠিক এই সময় উপাসনা শরবতের ট্রে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। আগের দিন আমমুজ নামের শরবত খুব নাটকীয়ভাবে হাজির করেছিল স্বাতী। কিন্তু আজ ঘরের ভেতর পরিবেশটা গুমোট হয়ে রয়েছে। আশালতার জন্য। তাঁকে সহজ করার চেষ্টায় স্বাতী বলল, 'এই শরবতটা খান আশাদি। মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। একেবারে শাহরুখ খানের মতো। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল।'

শুনে হেসে ফেললেন আশালতা, 'মাথা গরম হবে না কেন বলো? আমার কর্তাটা যা মুখে আসে, বলে দেয়। এ নিয়ে কম ঝামেলায় পড়েছি?'

'আমার কর্তাটাও একই রকম। এই যাঃ, একটা কথা তো আপনাকে বলাই হয়নি আশাদি। কলকাতা থেকে এবার বালুচরি আর তাঁতের শাড়ি নিয়ে এসেছি। দেখবেন?'

'তাই নাকি? এতক্ষণ বলোনি কেন স্বাতী? চলো দেখি।'

আড়ালে জয়দেবের উদ্দেশে চোখ টিপল স্বাতী। দু'হাতে শরবতের দুটো গ্লাস তুলে নিল। তারপর উপাসনাকে বলল, 'তুই এখানে থাক। আশাদিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

আশালতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাতী বেরিয়ে যাওয়ার পর দশরথ বললেন, 'হ্যাঁ, কী যেন জানতে চাইছিলেন জয়দেববাবু? মহাপ্রভুকে মেরে ফেলা হয়েছিল কি না? আই হ্যাভ মাই ওন ওপিনিয়ন।'

জয়দেব বলল, 'সেটাইতো আপনার কাছে জানতে চাইছি।'

'সত্যি কথা বলতে, অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি। প্রথমটা হচ্ছে, মহাপ্রভু কী কারণে মারা গেলেন। ওঁর ঠিক কী হয়েছিল? একেকজন বায়োগ্রাফার কিন্তু কারণটা একেক রকম লিখে গেছেন। কোনও সন্দেহ নেই, পুরীতে আঠারো বছর কাটানোর পর... মহাপ্রভু যে সময়টায় মারা যান, তখন রাধাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। বায়োগ্রাফাররা সেটাকে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। উনি তখন হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াতেন। শিষ্যরা সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন। মাধব পট্টনায়েক লিখেছেন, রুক্মিণী অমাবস্যার সন্ধেবেলায় মহাপ্রভু যখন রাস্তা দিয়ে কীর্তন করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন ইটের টুকরোয় পায়ে চোট পান। রক্ত ঝরে এবং ব্যথায় উনি অজ্ঞান

হয়ে যান। কীর্তনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জগন্নাথ দাস, কাশীশ্বর মিশ্র, যশোবন্ত দাস, শ্রীবৎস আর অনন্ত দাস। ওঁরাই কাঁধে করে মহাপ্রভুকে জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর মণ্ডপে নিয়ে যান। মুখ-চোখে জল দেওয়ার পর মহাপ্রভুর জ্ঞান ফেরে। তা দেখে মন্দিরে হাজির সবাই হরিনাম করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর সবাই একে একে বাড়ি ফিরে যান, এই ধারণা নিয়ে যে, মহাপ্রভুর গুরুতর কিছু হয়নি। মাধব পট্টনায়েক খুব সুন্দর করে পুরো ঘটনাটা লিখে গেছেন। নিশ্চয় আপনিও জানেন।'

জয়দেব বলল, 'জানি। মহাপ্রভুর পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট লেগেছিল। পরে সেই ক্ষত থেকে গাংগ্রিন হয়ে যায়। সারা শরীর ফুলে ওঠে। সঙ্গে হাই টেম্পারেচার। শেষে অক্ষয় তৃতীয়ার ভোরে উনি মারা যান।'

'কারেক্ট। মাধব পট্টনায়েকের লেখাটা সত্যি বলে মানা উচিত। কেননা, বায়োগ্রাফারদের মধ্যে একমাত্র উনিই আই উইটনেস ছিলেন। এবং মহাপ্রভু মারা যাওয়ার দু'বছরের মধ্যে বৈষ্ণবলীলামৃত নামে ওই পুস্তকটি লেখেন। তার তেত্রিশ বছর পর বাঙালি বায়োগ্রাফার জয়ানন্দ লিখলেন, চৈতন্যমঙ্গল। তাতে মহাপ্রভুর মৃত্যু নিয়ে কী বললেন, সেটা বলি?'

'জানি দশরথবাবু। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ক্ষত, তার পর গ্যাংগ্রিন। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু জয়ানন্দ লিখেছেন, চোট পাওয়ার ছয়দিনের মাথায় মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং গদাধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন, এবার বিষ্ণুলোকে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে... তাঁর মরদেহ ফেলে রেখে মহাপ্রভু, বিষ্ণুর পাঠানো রথে বৈকুণ্ঠধামে চলে যান।'

'আমরা যদি ধরেও নিই, মৃত্যুর কারণটা ক্ষত... তাহলে দেখব প্লেস অব ডেথ নিয়ে চারটি মত আছে। জয়ানন্দ লিখেছেন, টোটা গোপীনাথের মন্দির। নরহরি দাস লিখেছেন, টোটা গোপীনাথ মন্দিরের কাছাকাছি এক বাড়িতে। ঈশান নাগর আবার লিখেছেন, মহাপ্রভু একদিন জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর ঢোকার পরই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তার পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওড়িয়া বায়োগ্রাফাররা সবাই লিখেছেন, মহাপ্রভুর মৃত্যু হয়েছিল, জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর। মাধব পট্টনায়েক ডিটেল বর্ণনা দিয়েছেন, অসুস্থতার সময় শিষ্য জগন্নাথ দাস দিবারাত্র কেমন করে প্রভুর সেবা করেছিলেন। এই সব পুঁথি পড়ে... আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি, কে ঠিক? আসলে ওড়িয়া বায়োগ্রাফাররা রাজরোষের ভয়ে সত্যি কথাটা লেখেননি। যা লিখেছেন, হাফ ট্রুথ।'

জয়দেবের ভালো লাগল কথাগুলো শুনে। ও বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত দাদা। মহাপ্রভুর মৃত্যুর তারিখটা নিয়েও কী ধোঁয়াশা লক্ষ করেছেন?'

দশরথ বললেন, 'বিস্তর। জয়ানন্দের কথাই ধরুন। উনি লিখলেন মহাপ্রভু মারা গেছেন আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে। মনে হয়, লেখার সময় ওঁর মাথায় শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের কথা ছিল। পায়ে বিষাক্ত তির লেগে শ্রীকৃষ্ণও আষাঢ় মাসে মারা যান। তার মানে জয়ানন্দ অবতারত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন মহাপ্রভুর উপর। ওই একই তারিখের কথা লিখেছেন লোচন দাসও। মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথের বিগ্রহ দেখতে পেলেন

না। পাবেন কী করে? সেই সময় রথযাত্রা। জগন্নাথদেব তখন গুন্ডিচা মন্দিরে। মনের দুঃখে মন্দির থেকে ফিরে এলেন মহাপ্রভু। রবিবার তৃতীয় প্রহরে তিনি জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেলেন।'

'কিন্তু ওড়িয়া বায়োগ্রাফাররা তো কেউ এই তারিখটা মানেন না। তাঁরা মনে করেন, মহাপ্রভু মারা যান, অক্ষয় তৃতীয়ার ভোরে।'

'এই দেখুন না, মহাপ্রভু মারা যাওয়ার বিরাশি দিন আগে ওঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বরূপ দামোদর উধাও হয়ে যান। কেউ তাঁর মৃত্যু নিয়ে কিছু লিখে যাননি। অনেকের ধারণা স্বরূপ দামোদর খুন হয়েছিলেন। মনে হয়, তখনই মহাপ্রভু বুঝে যান, ভবিষ্যতে কী বিপদ আসছে। তিনি গদাধর পণ্ডিতকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। স্বরূপের মৃত্যুর খবরটা প্রচার করার জন্য।'

জয়দেব বলল, 'আমার সন্দেহের বড়ো কারণ, বৈশাখ মাসে প্রভু মারা গেলেন। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র সেই খবরটা গৌড়ের তীর্থযাত্রীদের দিলেন, দু'মাস পর... রথযাত্রার সময়। কেন?'

'জানেন না, এটা তো উনি করেছিলেন রায় রামানন্দের পরামর্শে। পাছে গুমখুনের খবরটা নিয়ে গৌড়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়, সেই কারণে। জনরোষও আছড়ে পড়তে পারত। তাই রাজা নিজে রথযাত্রার সময় ঘোষণা করলেন, মহাপ্রভু অনন্তলোকে চলে গিয়েছেন। অল বুলশিট।'

জয়দেব আরও কী বলতে যাচ্ছিল, দরজার সামনে স্বাতী আর আশালতাকে দেখে চুপ করে গেল। কিন্তু দশরথ চুপ করে থাকার লোক নন। উনি বললেন, 'আমি আপনাকে একটা লোকের সন্ধান দিতে পারি। মন্দিরের ভেতর স্কেলিটনটা যখন পাওয়া যায়, তখন তিনি সেখানে হাজির ছিলেন। উনি পিডবলুডির অফিসার ছিলেন। বয়স এখন পঁচাত্তরের মতো। কিন্তু দিব্যি সুস্থ।'

আগ্রহ নিয়ে জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'উনি থাকেন কোথায়?'

'এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে। ওঁর কাছে গেলে অনেক ইন্টারেস্টিং খবর পাবেন। কালই চলে যান। আমি এখনই যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।' বলে দশরথবাবু মোবাইল ফোনে নম্বর টিপতে লাগলেন। হঠাৎই আশালতার দিকে চোখ গেল জয়দেবের। দেখে মনে হল উনি এত রেগে গেছেন, পারলে ভস্ম করে দেবেন।

একচল্লিশ

চোখ খুলে গেছে পুরন্দরের। ভাগ্যিস লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে সেদিন রামচন্দ্র দইতাপতির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল! না হলে পূজ্যপাদ পদ্মনাভ সম্পর্কে ও কিছুই জানতে পারত না। ভুবনেশ্বরের গেস্ট হাউসে বসে সারা দুপুর ওকে অনেক অজানা তথ্য দিয়েছিলেন

পূজ্যপাদ রামচন্দ্র। আজন্মলালিত ওর অনেক ভুল ধারণাও উনি ভেঙে দেন। পুরন্দর আপাতত পূজ্যপাদ রামচন্দ্রের পরামর্শেই চলছে। উনি বলেছেন, সিনেমা পার্টির লোকজনের সঙ্গে তুই কলকাতায় পালিয়ে যা। সুস্থ মানুষের মতো জীবনযাপন কর। দিন সাতেক পুরীতে থাকবে। এই সময়টায় তোকে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।

পুরন্দর ভুবনেশ্বরেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পূজ্যপাদ রামচন্দ্র সরাসরি না করে দেন। 'না, না। আমার এখানে তুই আছিস জানতে পারলে, পদ্মনাভ আমার পেছনে লোক লাগিয়ে দেবে। ওর হাতে অনেক ভাড়াটে গুন্ডা আছে। তোকে আমি একটা জায়গার কথা বলে দিচ্ছি। পুরীতে খুব কম লোকই সেই জায়গাটার কথা জানে। জানলেও... ভয়ে সেই জায়গাটা মাড়াবে না।

ভগ্ন বিষ্ণু মন্দিরের তলায় ওদের আশ্রম যেখানে, তারও তলায় যে লম্বা সুড়ঙ্গ আছে, তা জানতো না পুরন্দর। সেদিনই পূজ্যপাদ রামচন্দ্রের মুখে ও শুনেছিল। সুড়ঙ্গের একটা অংশ চলে গেছে পূর্বদিকে, জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। অন্যটা গেছে পশ্চিমদিকে বিমলা মন্দির পর্যন্ত। পূজ্যপাদ রামচন্দ্র বলেছিলেন, এই সুড়ঙ্গটা না কি তৈরি করিয়েছিলেন রাজা দিব্যসিংহদেব। একবার দিল্লির এক মুসলমান সম্রাট জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করার জন্য সৈন্য পাঠান। তখন চালাকি করে দিব্যসিংহদেব না কি ওদের বলেন, তোমাদের মন্দির ভাঙতে হবে না। সম্রাট যখন চান না, তখন আমাদের মন্দির আমরাই ভেঙে দেব। এই কথা বলে উনি... জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার তিনটে নতুন মূর্তি তৈরি করালেন চন্দন কাঠ দিয়ে। সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন দিল্লিতে সম্রাটের কাছে। আর আসল বিগ্রহগুলো সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গোপনে উনি নিয়ে যান বিমলা মন্দিরে। মাসকয়েক সেখানেই পুজো-অর্চনা চলেছিল। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তখন পূজারি এবং রাজবাড়ির লোকজনরা যাতায়াত করতেন। স্থানে স্থানে বিশ্রাম কক্ষও ছিল দেবদাসীদের জন্য। প্রায় একশো বছর আগে পুরীতে একবার ভূমিকম্প হয়। সেই সময় সুড়ঙ্গে কোনও একটা অংশ ধসে যায়।'

পূজ্যপাদ রামচন্দ্র আরও বলেছিলেন, 'সাহস করে যদি টানেলের ওই অংশটা ওপেন করতে পারিস, তাহলে তোর সামনে আশ্চর্য জগৎ খুলে যাবে রে। শুনেছি, প্রভু জগন্নাথদেবকে দেওয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ওখানে লুকনো রয়েছে। আমার এক পূর্বপুরুষ ওই সময়টায় পূজা-অর্চনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলে গেছেন। বংশপরম্পরায় কথাটা আমরা শুনে আসছি। তুই চেষ্টা করে দ্যাখ। গুপ্তধন যদি পেয়ে যাস, তাহলে সারা জীবন আরাম করে কাটাবি।'

ধনসম্পত্তির ওপর কোনও লোভ নেই পুরন্দরের। প্রভুর সম্পত্তি ও ভোগ করতে যাবে কেন? আপাতত ওর দরকার একটা আশ্রয়। পূজ্যপাদ রামচন্দ্রের সঙ্গে সে দিন পুরীতে ফিরে আসার পর দু'দিন ও লুকিয়ে থেকেছে পাতালঘরে। মনস্থির করার জন্য প্রচুর ভেবেছে। কোন কাজটা আগে করবে? শেষ পর্যন্ত ও স্থির করে, দু'একদিনের মধ্যেই সুড়ঙ্গপথটা ভালো করে খুঁজে দেখবে। যদি কোথায়ও বিশ্রাম কক্ষের সন্ধান পায়, তাহলে সেখানেই ডেরা বাঁধবে। আর রোজ ভোরবেলায় ভুবনেশ্বর চলে যাবে মায়ের খোঁজে।

খননকার্যের সুবিধের জন্য পুরন্দর একটা একটা করে সরঞ্জাম জোগাড় করেছে। মোটা ক্যানভাসের ব্যাগে পুরে নিয়েছে গাইতি, বেলচা, হেভি টর্চ, বড়ো মাপের ছুরি, মোটা দড়ি ও লাঠি। আর পিস্তল তো ওর সঙ্গেই থাকে। সুড়ঙ্গপথে বিচিত্র জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতেই পারে। আত্মরক্ষার জন্য ছুরি, বল্লম ও পিস্তল তখন ওর কাজে লাগবে।

ভগ্ন মন্দিরের আশ্রম যে তলায়, তাতে প্রচুর দরজা। বেশিরভাগই বন্ধ। দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়নি। কোন দরজা দিয়ে নেমে গেলে নিচের তলায় যাওয়া যাবে, সেটা খুঁজে বের করতেই পুরন্দরের একটা রাত্তির লেগে গেছিল। দরজা ভাঙার পর, ভেতরে টর্চের আলো ফেলে ও কাঠের সিঁড়ি দেখতে পায়। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেও পুরন্দর ফের উঠে আসে। নাঃ, রাত্তির শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। ভোরবেলায় আশ্রমের ছেলেরা প্রার্থনা সঙ্গীতের সময় যদি দরজাটা খোলা অবস্থা দেখতে পায়, তাহলে সুড়ঙ্গের কথা রটে যেতে সময় নেবে না। দরজাটা বন্ধ করে পুরন্দর চলে এল ইঁদুর ঘরে। দেওয়ালে খাঁজ কেটে.... ও খিলানে ওঠার পথ করে রেখেছে। খিলানে প্রশস্ত জায়গা আছে। মৃদু বাতাস আসে বাইরে থেকে। সেখানেই শতরঞ্জি পেতে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় পুরন্দর।

কতক্ষণ শুয়ে রয়েছে ও জানে না। হঠাৎ নূপুরের শব্দ শুনতে পেল পুরন্দর। ওপরে মাহেরিদের কেউ বোধহয় অনুশীলনের জন্য তৈরি হচ্ছেন। একটু পরেই মাদেলিরা উঠে পড়বেন। ওদের বাজনার সুর ভেসে আসবে নিচে। সেই সঙ্গে নূপুরের সমবেত শৃঞ্জিনীও। পুরন্দর আশৈশব শুনে আসছে। ছোটোবেলায় তালে তালে ওরাও হাত-পা নেড়ে নাচত। পূজ্যপাদদের চোখে পড়ে যাওয়ায় একদিন বেদম মার খায়। সেই মারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় পুরন্দরের চোখের কোণ জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। বদলা নেওয়ার জন্য ও তৈরি হচ্ছে। সব মারের শোধ ও তুলে নেবে।

ধপ করে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ। ওপর থেকে কেউ নেমে আসতে চাইছে। তাকে জোর করে আটকে রেখেছে দু'একজন। খিলান থেকে একটা কথা পুরন্দরের কানে ভেসে এল, 'এত নিষ্ঠুর হয়ো না নানী।' কান্নাজড়ানো কথাটা শুনেই ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল পুরন্দরের। খিলান থেকে উঁকি মেরে ও দেখার চেষ্টা করল, ধপ করে শব্দটা হল কেন? দেখল, চাতালের ওপর পড়ে আছে রক্তমাখানো ছোট্ট একটা শরীর। সম্ভবত সদ্যোজাত। গর্ত থেকে ইঁদুরের পাল খাবারের গন্ধ পেয়েছে। ওদের মুখগুলো উঁকিঝুঁকি মারছে। কিচকিচ শব্দ করতে করতে খাবারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকশো ইঁদুর। দেখে মুখ ঘৃণায় কুঁচকে উঠল পুরন্দরের।

ওপরের মাহেরিরা জানে না, নীচে অবাঞ্ছিত একজন লুকিয়ে রয়েছে। তাই নিশ্চিন্তে মৃত বাচ্চাটাকে ছুড়ে ফেলেছে। কোনও পূজ্যপাদের যৌনতৃপ্তির ফসল। দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে মেঝেতে নেমে এল পুরন্দর। সদ্যোজাতর উদ্দেশে ও মনে মনে বলল, 'যাঃ তুই বেঁচে গেলি। পাপে ভরা এই পৃথিবীর আলো তোকে দেখতে হল না.... আমাদের মতো।'

কান্নার শব্দটা ক্রমেই দুরে সরে যাচ্ছে। উলটোদিকের সিঁড়ি দিয়ে পুরন্দর ওপরে উঠে

এল। পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে বেলি নানীর সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। সিনেমা পার্টির সঙ্গে কলকাতায় চলে গেলে আর কোনওদিন হয়তো নানীর সঙ্গে দেখা হবে না। হঠাৎই নানীর জন্য ওর মনটা কেমন করে উঠল। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে একমাত্র নানীই ওকে সামান্য যা ভালোবাসা দিয়েছে। সেটা কী করে পুরন্দর অস্বীকার করবে? ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে ওর ধারণাই যে বদলে দিয়েছেন পূজ্যপাদ রামচন্দ্র।

ওকে দেখেই চমকে উঠলেন বেলি নানী, 'কোথায় ছিলি তুই পুরন্দর? প্যান্ট জামা পরেছিস কেন?'

সত্যি কথা বলল পুরন্দর, 'ভুবনেশ্বর গেছিলাম। মায়ের খোঁজে।'

'আয় আয়। ভেতরে আয়।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন বেলি নানী। তারপর বললেন, 'দেখা পেলি বিশাখার?'

'না নানী। লিঙ্গরাজ মন্দিরে অনেক খুঁজেছি। পাইনি।'

'ওর বাড়ি গেলি না কেন বোকা? তোকে সেদিন বলিনি বুঝি? ইউনিক টু। বাজারের কাছে একটা স্টেশনারি দোকান আছে ভোই স্টোর। সবাই চেনে। তার ঠিক উলটোদিকে খুব সুন্দর বাড়ি। তোর সৎবাবার নাম সনাতন ভোই। ওরা খুব নামকরা ওখানে। আমি একবার ওর বাড়িতে গেছি। ভেতরে কতবড়ো নাটমন্দির। সনাতন খুব সুখে রেখেছিল রে তোর মাকে।'

মন দিয়ে শুনছে পুরন্দর... মাথা নিচু করে। কী পরিচয় নিয়ে ও যাবে? পরিচয় দিয়ে... ওর এই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে মাকে জড়িয়ে ফেলা কি উচিত হবে? না, ও সেটা করতে পারবে না। ও শুধু দূর থেকে মাকে দেখে পালিয়ে আসবে।

বেলি নানী বলেই যাচ্ছেন, 'তোর এক সৎভাই আছে বাছা। তোর থেকে দু'এক বছরের ছোটো হবে। কী সুন্দর দেখতে। আমি বলি কী, তুই বিশাখার কাছেই চলে যা। ওখানে বরং ভালো থাকবি। এখানে যে, তোকে ভালো থাকতে দেবে না বাছা।'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল পুরন্দর। ভোর হয়ে আসছে। একটু পরেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে। না হলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেলি নানীর কাছ থেকে ওকে... যা জানার, জেনে নিতে হবে। মায়ের হদিশ পাওয়া গেছে। এবার রামচন্দ্র দইতাপতি। ও তাই জিজ্ঞেস করল, 'রামচন্দ্র দইতাপতি কেমন মানুষ নানী?'

'তোর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, না? আমায় বলছিল। সাত্ত্বিক প্রকৃতির, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। হবেই বা না কেন? প্রভু জগন্নাথের আত্মীয় যে উনি! কী বললেন রে তোকে উনি?'

'দূরে কোথাও চলে যেতে বললেন।'

'ঠিকই বলেছে। আমার যে কোনও উপায় নেই বাছা। তা হলে আমিও কোথাও চলে যেতাম। পদ্মনাভর অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না রে। এই দ্যাখ না, ওর মেয়ে এসে এখানে রোজ ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ওইটুকু পুঁচকে একটা মেয়ে। বয়স কত হবে...

পঁচিশ ছাব্বিশ। আমাদের সঙ্গে তুই তোকারি করে। গাল দিয়ে কথা বলে। সেদিন তো অম্বালিকার পেটে একটা লাথি মেরে বসল। কী, না ... সম্বলপুরের কোন এক মন্দিরে গিয়ে অম্বি নাচতে রাজি হয়নি। পিশাচি ... বুঝলি, পিশাচি।'

'অম্বালিকা রাজি হয়নি কেন?'

'রাজি হবেই বা কেন বল তো? শুধুই কি নাচতে নিয়ে যায়? নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় কামুক পশুদের হাতে। মাহেরিদের ওরা ছিড়ে খুড়ে খায়। সব পেট বাঁধিয়ে আসে। সব কথা তোকে বলা যাবে না। শুনেই বা তুই কী করবি?'

'মেয়েটাকে তুমি দেখাতে পারবে?'

'এই একটু পরেই আমার ঘরে আসবে। তুই এখন যা। তোকে এখানে দেখতে পেলে, মন্দাকিনী কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়বে। তা বাছা, তুই এখন যাবিই বা কোথায়?'

'ভুবনেশ্বরে।'

'তাহলে দাঁড়া। তোকে একটা জিনিস দিয়ে দিই। এই জিনিসটা বিশাখাকে তুই দেখাবি। তাহলেই ও তোকে চিনতে পারবে।'

কাঠের আলমারি খুলে কাপড়ের একটা পুঁটলি বের করে আনলেন বেলি নানী। পুরন্দরের হাতে দিয়ে তার পর বললেন, 'তুই জন্মানোর পর এই চন্দ্রহারটা তোর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল পোড়ারমুখী। ওর কোল থেকে পদ্মনাভ যেদিন তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেদিন ওই হারটা ও ছিড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছি। হারটা যদি দেখাস, নিশ্চয়ই বিশাখা চিনতে পারবে।'

দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ। শুনে লাফ মেরে পর্দার আড়ালে চলে গেল পুরন্দর। বেলি নানী দরজা খুলে দিতেই কর্কশ গলা শুনতে পেল ও, 'দরজা বন্ধ করে রেখেছিলি কেন রে বুড়ি? কাল কোন নাগরকে নিয়ে শুয়েছিলি?'

এই মেয়েটাই তাহলে মন্দাকিনী? পর্দা সামান্য ফাঁক করে পুরন্দর দেখল, ভরা যৌবনবতী। দেখেই ওর ফুলির কথা মনে পড়ল। এবং ও সিদ্ধান্ত নিল, এই মেয়েটাকে আরও নির্মমভাবে মারতে হবে। বেলি নানীর গালে ঠাস করে চড় মারল মেয়েটা। তারপর বলল, 'তোকে দিয়ে আমার চলবে না। কালকের মধ্যে ঘরটা তুই ফাঁকা করে দিবি। পিপলির মন্দির থেকে আমি একজন মাদেলিকে নিয়ে আসব। সে তোর এই ঘরে থাকবে। বুঝতে পারলি? না কি আরেকটা ঝাপড় দেব?'

বেলি নানী হাউ হাউ করে কাঁদছেন। দেখে গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল পুরন্দরের। কথা বলতে বলতে মন্দাকিনী ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ওর হাতের নাগালে এসে গেছে। আর সময় নষ্ট করল না পুরন্দর। মানুষের শরীরের দুর্বল জায়গাগুলো সম্পর্কে ওর ভালো ধারণা আছে। আত্মরক্ষার জন্য ও এসব শিখেছে। পর্দার আড়াল থেকেই হাত বাড়িয়ে মন্দাকিনীর কাঁধের কাছে পুরন্দর সজোরে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে। কান্না বন্ধ করে... আঁতকে উঠে বেলি নানী বললেন, 'এ তুই কী করলি পুরন্দর? মেয়েটাকে মেরে ফেললি?'

'চুপ।' মুখে আঙুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করল পুরন্দর। তার পর ফিসফিস করে বলল, 'মরেনি। একে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বাইরে গিয়ে দেখুন, কেউ আছেন কি না?'

মিনিট্ পাঁচেকের মধ্যেই মাহেরিদের মহল থেকে চুপিসাড়ে নিচে নেমে এল পুরন্দর। ওর কাঁধে মন্দাকিনীর অচেতন দেহ। মেয়েটার শরীর থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। সুডৌল স্তনের স্পর্শ কাঁধে। পুরন্দর অনুভব করল, ওর শরীরটা গরম হচ্ছে। চাতালে নেমে ও একবার বাঁদিকে তাকাল। না, মৃত বাচ্চাটার দেহ কোথাও দেখতে পেল না। তার মানে ভোজ সম্পন্ন করে ইঁদুর ও বিড়ালরা ফিরে গেছে। প্রচণ্ড রাগে ওর শরীর জ্বলতে লাগল। ও ঠিক করল, কাজ শেষ হয়ে গেলে মন্দাকিনীর দেহটাও ও ইঁদুর-বিড়ালদের মহাভোজে উৎসর্গ করবে।

একটা পূর্ণবয়স্কা মেয়েকে কাঁধে নিয়ে... দেওয়ালের খাঁজ বেয়ে খিলানে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু পুরন্দরের অমানুষিক ক্ষমতা। খিলানে উঠেই ও মন্দাকিনীকে নগ্ন করল। ওরই কাঁচুলি... ওর মুখে গুঁজে দিল। তার পর শাড়ি ছিঁড়ে, হাত দুটো মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে ... দু'পাশে বাঁধল লোহার গরাদের সঙ্গে। খোঁপা খুলে গেছে। সযত্নেলালিত চুল এলিয়ে... খিলানের ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এতক্ষণে পুরন্দরের নজরে পড়ল মেয়েটার সিঁথিতে সিঁদুর। পাপী পদ্মনাভর আদরের দুলালীকে এই অবস্থায় দেখে বেশ তৃপ্তিবোধ করল পুরন্দর। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। গোলাকার স্তন দুটো সাদা পদ্মের মতো। সরু কটি, ভারী জঙ্ঘা। এই নারীকে ওর স্বামী একা ভোগ করবে কেন?

রোদ উঠছে, বাইরে থেকে আলো আসছে। মৃদু বাতাসও। অপরিসর খিলানে পুরন্দর পা ভাঁজ করে বসে রইল মন্দাকিনীর চেতনা ফিরে আসার অপেক্ষায়। ইচ্ছে করলে ও মেয়েটাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু তাহলে গায়ের জ্বালা মিটবে না। মন্দাকিনীর নগ্ন দেহটার দিকে তাকিয়ে পূ-জ-নী-য় পদ্মনাভর একটা সাবধানবাণী হঠাৎই ওর মনে পড়ল। কোনও নারীর সঙ্গে সহবাস নয়। সহবাস করলে নাকি ওর দেহে দুরারোগ্য চর্মরোগ হবে। কথাটা মনে পড়ায় পুরন্দরের হাসি পেয়ে গেল।

কাঁকুড়গাছির মেয়েটার সঙ্গে পুরন্দর সহবাস করেছে। ফুলির সঙ্গে ওর সহবাস হয়নি। ও যা করেছে, তাকে ধর্ষণ বলাই উচিত। নারীসঙ্গমের পর তো বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কই, ওর তো চর্মরোগ হয়নি? নিজের যৌনাঙ্গের আশপাশ ভালো করে দেখেছে পুরন্দর। নাঃ, কোনও লক্ষণ নেই চর্মরোগের। পদ্মনাভ তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলেন! কেন বলেছিলেন? চিন্তা করে পুরন্দর এবার নিশ্চিত হল। ওপরতলার মাহেরিদের দিকে ওরা যাতে নজর না দেয়, সেই কারণে ভয় দেখাতেন পদ্মনাভরা। যাতে মাহেরিদের নিজেরাই ভোগ করতে পারেন। হা হা হা। কী বোকাই না ছিল পুরন্দর। এমন আরও কত শত মিথ্যে কথা বলেছেন পূ-জ্য-পা-দ-রা! আর কোনও প্রশ্ন না করে, ওরাও সব... সবকিছু বিশ্বাস করে নিয়েছে।

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল পুরন্দর। হঠাৎ লক্ষ করল, মেয়েটার পা নড়ে উঠেছে।

মুখের দিকে তাকাতেই ও দেখল, ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর জ্ঞান ফিরে আসছে। আস্তে আস্তে চোখ খুলছে মন্দাকিনী। প্রথমে বোঝার চেষ্টা করল, কোথায় আছে? নীচের দিকে তাকাতেই ওর চোখ গোল গোল হয়ে গেল। আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ দিয়ে একটা গোঁগানির শব্দও করল মন্দাকিনী। হাত দুটো বাঁধা আছে বুঝতে পেরে, মাথাটা প্রবলভাবে এদিক ওদিক নাড়াতে লাগল। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওর জীবনে এমন দিনও আসতে পারে। ঠিক এই দৃশ্যটাই দেখতে চাইছিল পুরন্দর। সঙ্গে সঙ্গে মন্দাকিনীর দুটো পা ধরে ও বাঁধতে লাগল।

নাঃ, পুরন্দর এখন ধর্ষণ করবে না। মায়ের কাছে যাওয়ার আগে অপবিত্র হবে না। বাস ধরে ও যাবে ভুবনেশ্বর। মাকে খুঁজে বের করবে। নানীর দেওয়া পুঁটলিটা পকেটে ঢুকিয়ে পুরন্দর নেমে এল।

বিয়াল্লিশ

মস্কোতে মেট্রো স্টেশনে বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রায় একশো জন মারা গেছে। কাগজে এরকম বিস্ফোরণের খবর রোজই কিছু-না-কিছু বেরোয়। আজকাল এ নিয়ে কেউ বিচলিতও হয় না। কিন্তু খবরের ভেতরে ঢুকে গোরা সোজা হয়ে বসল। বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছে চেচনিয়ার উগ্রপন্থীরা। মানববোমা দিয়ে। খবরের এই অংশটাই ওকে উত্তেজিত করল। উগ্রপন্থীরা দুজন সুন্দরী নারীকে মানববোমা হিসাবে ব্যবহার করেছে। এঁরা না কি ব্ল্যাক উইডো নামে এক সংস্থার সদস্যা। চেচানদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য রুশরা একটা সময় প্রচুর নিরীহ মানুষকে মেরেছিল। তাদেরই বিধবারা এই সংস্থা গড়েছে বদলা নেওয়ার জন্য। এরা নাকি আল কায়দার কাজে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

কাগজের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তোলার পর, গোরার মনে হল, আরে... মালিকা সাহিত্যে তো অচ্যুতানন্দ তাহলে ঠিকই লিখে গেছেন। কলিযুগের শেষে সারা পৃথিবীতে সহস্র সুন্দরী নারীর আবির্ভাব হবে, যাদের স্পর্শ করলে ধ্বংস অনিবার্য। উনি কি এইসব নারীর কথাই বলে গেছেন? যারা পেটে বোমা বেঁধে নিজে আত্মঘাতী হচ্ছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে? আশ্চর্য, এই ভবিষ্যদ্বাণীটা অচ্যুতানন্দ করে গেছেন পাঁচশো বছর আগে। কীভাবে করলেন? উনি তো তাহলে দিব্যদর্শী ছিলেন। এই সেদিনই কথায় কথায় কে যেন নারী বোমার কথা বলছিল। তখন বিশ্বাস হয়নি গোরার। অচ্যুতানন্দ আর কী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেটা জানার তীব্র আগ্রহ অনুভব করল ও। টুবাইকে বলতে হবে। মালিকা সাহিত্যে ওর খুব দখল। ও যেন অচ্যুতানন্দের বই পড়তে দিয়ে যায়।

'আপনার দুধ। মা পাঠিয়ে দিলেন।'

পাশ ফিরে গোরা দেখল, সেই মেয়েটা। এবার বাড়িতে আসার পর থেকে প্রায়ই যাকে মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করতে দেখছে। বয়স সতেরো আঠারো বছরের হবে। লাজুক

ও খুব মিষ্টি স্বভাবের। যাতায়াতের পথে কখনও ওর মুখোমুখি হলে কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে যায়। ওড়িয়া মেয়েরা আজকাল স্কুলকলেজে গিয়ে অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে। সেদিনই কলেজে গিয়ে গোরা দেখেছে, প্রচুর মেয়ে জিনস্ পরে ঘুরে বেরাচ্ছে। এই মেয়েটা তাদের থেকে আলাদা। দেখে তো মনে হয়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের। আশপাশে কোনও বাড়িতে থাকে। মায়ের চেনাজানার পরিধি প্রায় লিঙ্গরাজ মন্দির পর্যন্ত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেক পরিবারেরই এ বাড়িতে যাতায়াত আছে। গোরা মাকে ডাকতে শুনেছে, মেয়েটার নাম .... প্রিয়া। একে আগে কখনও দেখেছে কি না, ও মনে করতে পারল না।

দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে প্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে, গোরা বলল, 'গ্লাসটা টেবলে রেখে যাও। মা কোথায় আছে বলতে পারো?'

'নাটমন্দিরে। আজ মকর সংক্রান্তি। প্রভু জগন্নাথের মকর বেশ। মা তুলসী পাতার মুকুট তৈরি করছেন। প্রভু জগন্নাথকে পরাতে হবে।'

মাথা নিচু করে প্রিয়া কথা বলছে। ওর বিনয় দেখে হাসি পেয়ে গেল গোরার। এত কথা ও শুনতে চায়নি। ও বলল, 'মাকে বোলো, একটু পরেই আমাকে পুরীতে যেতে হবে।'

মাথা নিচু করা অবস্থাতেই ঘাড় নাড়ল প্রিয়া। তারপর যে প্রশ্নটা করল, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না গোরা। 'কখন ফিরবেন?'

অনধিকার চর্চা। উত্তর দেবে না ভেবেও, ভদ্রতার খাতিরে গোরা বলল, 'ফিরতে ফিরতে আমার রাত হয়ে যাবে।'

কথাটা বলেই গোরা ফের কাগজের পাতার দিকে চোখ দিল। কিন্তু প্রিয়া তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দেখে, ও একটু কড়া গলাতেই বলল, 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'আন্দামানে ভূমিকম্প হয়েছে', 'মেলবোর্নে বিধ্বংসী আগুন দু'মাসেও নেভেনি', 'ভূমধ্যসাগরে সুমালি জলদস্যুরা ভারতীয় জাহাজ অপহরণ করেছে, সেই জাহাজে একশো কুড়িজন ভারতীয় আছেন', 'টোকিওতে মারাত্মক ঝড়ঝঞ্ঝা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস'। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর অরাজকতার খবর। পড়তে পড়তে গোরার মনে হল, আগে বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে, মানুষ জানতে পারত না। এখন সফটওয়্যারের কল্যাণে প্রতি মুহূর্তে মানুষ জেনে যাচ্ছে, কোন পৃথিবীতে তারা কীভাবে বাস করছে। এগুলো কি সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা? না কি কারও অঙ্গুলিহেলনে একের পর এক ঘটে যাচ্ছে? কী বলে গেছেন অচ্যুতানন্দ? টুবাইকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়।

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে টুবাইকে ফোন করতে যাবে, এমন সময় গোরা দেখল বাড়ির সামনে একটা অটো রিকশা এসে দাঁড়াল। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে চন্দন। আমাদের চ্যানেলের রিপোর্টার। ওর পাশে মন্দিরা। ওর কাঁধে একটা বড় কিট ব্যাগ। মতুয়া সম্প্রদায়ের এই মেয়েটাকে নিয়ে চন্দন বহুদিন আগে একবার ওর রাসবিহারীর বাড়িতে এসেছিল। সেদিন সালোয়ার কামিজ পরে এসেছিল। আজ তাঁতের শাড়িতে। বেশ সুন্দর লাগছে মন্দিরাকে। কিন্তু ওরা ভুবনেশ্বরে কী মনে করে? ওদের ঠিকানাই

বা কে দিল? পরক্ষণেই গোরার মনে হল, একজন রিপোর্টারের পক্ষে ঠিকানা জোগাড় করা কী এমন শক্ত কাজ? তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে গোরা বলল, 'হোয়াট আ সারপ্রাইজ, তোমরা এখানে?'

চন্দন বলল, 'হনিমুন সারতে বেরিয়েছি।'

গোরা বলল, 'আরে ... এসো এসো। বিয়েটা করলে কবে?'

'দিন পাঁচেক আগে। তারপরই বেরিয়ে পড়েছি মন্দিরাকে নিয়ে। পুরী যাচ্ছিলাম। কটক স্টেশনে হঠাৎ পোস্টার দেখলাম, পুরীতে জনসমাবেশ আছে দলিতদের। আপনি প্রধান বক্তা। তখনই মনে পড়ল, আপনি এখন ভুবনেশ্বরে। চিন্তাভাবনা না করেই নেমে পড়লাম। আপনার প্রথম সমাবেশের ছবি হ্যান্ড ক্যাম-এ তুলে রাখব। কে বলতে পারে... দলিতরা পাওয়ারে এলে... একদিন আপনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন না? তখন চড়া দামে এই সমাবেশের ছবি বিক্রি করব।'

চন্দন আর মন্দিরা দুজনে হাসছে। ওদের দেখে খুব ভালো লাগল গোরার। ঘরে ঢুকে ও বলল, 'বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না... গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল... তোমার সেই অবস্থাই হয়েছে। কোনও দলিত কোনওদিন প্রাইম মিনিস্টার হবেন না। হলে বাবু জগজীবন রাম অনেক আগেই হয়ে যেতেন।'

'কেন গোরাদা, মায়াবতী তো চিফ মিনিস্টার হয়েছেন।'

'ওটা ব্যতিক্রম। উত্তরপ্রদেশ বলেই সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় কোনওদিন হবে না। ছোটো বড়ো সব পার্টির নেতাদের .... নামগুলো লক্ষ করো। তাহলে বুঝবে। সব উচ্চবর্ণের পদবি। কোনও জানা, মাইতি, মান্নাকে ... বাঙালি কোনওদিন চিফ মিনিস্টার হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করবে না। এটা আজকের ঘটনা নয়। তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁর নামে টালিগঞ্জে একটা রাস্তাও আছে।'

'ওঁর একবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একজন ক্যাওট ... কর্পোরেশনের মেয়র হবেন? অনেকেই তা মেনে নিতে পারেননি। ক্যাওট কথাটার মানে ... নিশ্চয়ই জানো। এখন যাঁরা মাহিষ্য বলে পরিচিত। সে যাক, বীরেন শাসমলকে যাঁরা মেয়র হিসাবে চাননি, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও। আমি অদ্বৈতবাবুর মুখে শুনেছি, বীরেন শাসমলের ছেলে বিমলানন্দ একটা বই লিখেছিলেন ... স্বাধীনতার ফাঁকি! তাতে এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেছেন।'

মন্দিরা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, 'গোরাদা, আপনারা বড্ড বেশি সিরিয়াস আলোচনা করছেন। বাদ দিন। পুরীতে কখন রওনা হবেন, বলুন। আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে যেতে চাই। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তির কি আছে। তোমরা এখানে খাওয়া-দাওয়া করে নাও। তারপর বেরিয়ে পড়ব।'

সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে চন্দন। বলল, 'খাওয়া-দাওয়ার কোনও দরকার নেই গোরাদা। আমরা স্টেশনের ক্যাফেটোরিয়ায় ভালোরকম সাঁটিয়ে এসেছি।'

'তা কি হয়? আমার বাড়িতে প্রথম এসেছ, মা কি তোমাদের না খাইয়ে ছাড়বে? দাঁড়াও, ভেতরে গিয়ে একবার মাকে বলে আসি।'

'আরে... ব্যস্ত হবেন না গোরাদা। বসুন। সত্যি কথাটা বলব? আমাদের এমন একটা পরিস্থিতিতে বিয়ে করতে হল... হঠাৎ দুজনেই টের পেলাম, আমাদের পাশে কেউ নেই। তখনই আপনার কথা মনে পড়ল। বলতে পারেন ... আপনার আশীর্বাদ নিতেও এসেছি।'

কথাগুলো এমনভাবে চন্দন বলল, গোরার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। ও বলল, 'কেউ নেই মানে? তোমাদের বাবামায়েরা এ বিয়ে মানেননি?'

চন্দন বলল, 'জাতপাতের কারণে আমার বাড়িতে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। কিন্তু মন্দিরার বাবা-মাও চাননি, আমার মতো একটা ভ্যাগাবন্ড রিপোর্টারের সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে হোক। ওরা বিরাট বড়োলোক। ওর বাবা অনেক ভালো পাত্র চাইছিলেন। বিপদ বুঝে আমরা রেজেস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেললাম। মন্দিরার বাবা পুলিশে কমপ্লেন করেছিলেন আমার এগেনস্টে। সে সব সামলে আমরা বেরিয়ে পড়েছি।'

'ভালো করেছ। কয়েকটা দিন আমার বাড়িতেই কাটিয়ে যাও।'

শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল চন্দন আর মন্দিরা। চোখে চোখে কী আদানপ্রদান হল গোরা বুঝতে পারল না। একটু পরে চন্দন বলল, 'বেশ ... কাল পর্যন্ত থাকতে পারি। পরশু আমাদের দিল্লি যাওয়ার কথা। ওখানে একটা বাংলা চ্যানেল চালু হওয়ার কথা হচ্ছে। আপনাদের পার্টির নেতা কেশব রাম ওই চ্যানেলের পেছনে আছেন। উনি আমাকে কার সঙ্গে যেন পরিচয় করিয়ে দেবেন। হয়তো আমার চাকরি হয়েও যেতে পারে।'

'কেশবজির সঙ্গে তোমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ গোরাদা। উনি দু'একদিন অন্তরই আমাকে ফোন করেন। আপনার সম্পর্কে নানা কথা হয়। আমাকে একদিন বলছিলেন, উনি আপনাকে নষ্ট হতে দেবেন না। দিল্লিতে নিয়ে যেতে চান। তার আগে একবার আপনাকে সাউথ ইন্ডিয়া ঘুরিয়ে আনবেন। যাতে দক্ষিণ ভারতের নেতারাও আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেন। মে মাসে ওখানে ইলেকশন। আপনাকে তখন ওখানে থাকতে হবে।'

'ঠিকই বলেছ। উনি আমাকে তৈরি থাকতে বলেছেন। কলকাতার খবর কি বলো তো?'

'এই একটু আগে বললেন না... গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল... গোঁফে সত্যিই কে তেল দিচ্ছে, সেটা জানেন?'

'কে বলো তো? হেঁয়ালি কোরো না।'

সোজা হয়ে বসল চন্দন। একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'কলকাতার খবর ভালো না গোরাদা। ওখানে গেলেই আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন। পুলিশ অনেক ফালতু কেস দিয়ে রেখেছে আপনার নামে। আজগুবিও বটে। আপনি না কি সাধু-সন্ন্যাসী লেলিয়ে দিয়ে ... পুলিশের ওসি-কে মারধর করেছেন। আপনার জন্য অদ্বৈতদা অ্যান্টিসিপেটরি বেল-এর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পাননি। পার্টিতে চূড়ান্ত খেয়োখেয়ি চলছে। তরুণ মাজিরা

একটা দল হয়ে গেছে। ওরা অদ্বৈতদাকে মানতে চাইছে না। ওদিকে, ভৈরব দাসও তরুণকে মানতে চাইছে না। সব মিলিয়ে একটা ক্যাওস হয়ে আছে।'

'কিন্তু এসব কথা অদ্বৈতবাবু তো আমাকে বলেননি। প্রায়ই ফোনে আমার সঙ্গে কথা হয়। ইন ফ্যাক্ট, আজকের সমাবেশের জন্য ওকে আমি নেমতন্নও করেছিলাম।'

চন্দন বলল, 'এসব কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। আজকের সমাবেশটা যাতে ভালো হয়, তার কথা আপনি ভাবুন। আমাকে আজই ফুটেজ পাঠাতে হবে কেশবজির কাছে। পুরী সমাবেশের সিডি উনি চেয়ে পাঠিয়েছেন।'

গোরা হেসে বলল, 'একযাত্রায় কত ফল পেতে চাও, তুমি চন্দন? প্রথমে বললে হনিমুন, তারপর আমার আশীর্বাদ চাইলে, তারও পর শুনলাম তোমার চাকরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। এখন দেখছি, এর সঙ্গে বাণিজ্যও আছে। বাপ রে... মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

মন্দিরা খিলখিল করে হেসে উঠল। পরিবেশটা লঘু করে দিয়ে গোরা বলল, 'দাঁড়াও, আমি একবার ভেতর থেকে ঘুরে আসি। মা বোধহয় জানেন না, তোমরা এসেছ।'

ঘরের বাইরে বেরিয়েই গোরার নাটমন্দিরের দিকে চোখ গেল। বিরাট চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। চারদিকে রঙিন পতাকা, কলাগাছ আর আমের শাখা। অনেক মহিলা এসেছেন। মেঝেতে আলপনা দিচ্ছেন। পুজোর কাজে সবাই ব্যস্ত। তাঁদের মধ্যে মাকে খুঁজতে লাগল গোরা। মন্দিরে পুরোহিত এসে গেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন মা। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়া বলে সেই মেয়েটা। পুরোহিত কী যেন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। দৃশ্যটা দেখে মাথার ভেতর কেমন যেন করে উঠল গোরার। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ও দেওয়ালটা ধরল। চোখের সামনে একটা লাল বৃত্ত ক্রমেই বড়ো হচ্ছে। সেটা দ্রুত ঘুরতে শুরু করল।

... চোখের সামনেটা পরিষ্কার হতেই গোরা দেখল, এক অচেনা বাড়ির বাইরে একটা দোলার সামনে ওরই মতো দেখতে এক যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বাড়িটাও সাজানো হয়েছে চাঁদোয়া, রঙিন নিশান, কলাগাছ আর আমের শাখা দিয়ে। এয়ো স্ত্রীরা উলু দিচ্ছেন। যুবকের দিকে তাকিয়ে গোরা চমকে উঠল। ওর কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোঁটা। সমস্ত মুখমণ্ডলে চন্দনের বিন্দু। চোখে কাজল। গলায় ফুল আর মোতির মালা। বাহুতে রত্নবাজু, আর কানে কুণ্ডল। পরনে পীত ও পট্টবস্ত্র। গায়ে পট্ট চাদর। মাথায় মুকুট। কী অনিন্দ্যসুন্দর লাগছে যুবকটিকে। যেন স্বয়ং মদনদেব। মাতৃস্থানীয়া এক মহিলা ধানদূর্বা দিয়ে ওকে বরণ করছেন। ওর সঙ্গে অনেক লোক। কেউ নাচছে, কেউ কৌতুকে মত্ত।

বাড়ির ভেতর গোরা ঢোকা মাত্রই পুষ্প আর খই বৃষ্টি হতে লাগল। সামনেই একটা মণ্ডপ। সেখানে খুব সুন্দর কনের সাজে... সেজে বসে আছে একটা চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ে। গোরা বুঝতে পারল, যুবকটি বিয়ে করতে এসেছে। মেয়েটাকে দেখার জন্য ও খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। বিয়ের ক্রিয়াকর্ম চলছে। মাথার ওপর একখণ্ড বস্ত্রের আচ্ছাদন। মেয়েটাকে সবাই বলছে, চোখ মেলে এবার বরকে দ্যাখ। মেয়েটা লজ্জায় চোখ মেলতে পারছে না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে। তা দেখে যুবকটি মিটিমিটি হাসছে। হঠাৎ মেয়েটা

দু'চোখ মেলে তাকাল। তাকে দেখে চমকে উঠল গোরা। আরে ... এ তো মায়ের পিছু পিছু ঘোরা ... প্রিয়া।

গোরা অবাক হয়ে দেখছে। বর ও কনে মালা বদল করল। এবার বাসর ঘরের দিকে যাত্রা। মেয়েটা লজ্জায় .... যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারছে না। হঠাৎ সে বসে পড়ল। তার পায়ে উছট লেগেছে। পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। শুভদিনে রক্তপাত হতে দেখে সবাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেছে। এ যে অমঙ্গলের চিহ্ন। গোরা দেখল, যুবকটি তার পায়ের আঙুল দিয়ে মেয়েটার ক্ষতস্থান চেপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ বন্ধ। মেয়েটার মুখ থেকে যন্ত্রণার চিহ্ন উধাও। আঙুলের স্পর্শেই দুজনের মধ্যে নীরবে কী যেন কথা হয়ে গেল। দুজনে হাসিমুখে বাসর ঘরে ঢুকল।

'হ্যারে গোরা .... আমায় ডাকছিলি কেন রে?'

মায়ের ডাকে গোরা অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল। ও দেখল, কখন যে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। চোখের সামনে থেকে বিয়ের পরিবেশ উধাও। মাকে দেখে ও বলল, 'মা, কলকাতা থেকে আমার চেনা দুজন এসেছে। ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা আমার সঙ্গেই আজ পুরীতে যাবে।'

মা কী বলতে যাচ্ছিল। সেই সময় বাধা দিয়ে,.. পাশে দাঁড়ানো প্রিয়া কী যেন ফিসফিস করে বলল। তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল রসুই ঘরের দিকে। প্রিয়ার গমনপথের দিকে তাকিয়ে মা খুশি হয়ে বলল, 'তোকে সে ভাবনা করতে হবে না। প্রিয়া আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

গোরা হালকা চালেই বলল, 'মেয়েটা কে মা?'

'স্বদেশবাবুর মেয়ে। ওই যে পার্কের পাশেই চারতলা বাড়িটা যাঁর। মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ রে। খুব ইচ্ছে, বউ করে আনি। এই ক'দিন তো দেখছিস, তোর কেমন লাগল বাবা?'

মহিলারা সবাই ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কী উত্তর দেবে, গোরা ভেবে পেল না।

তেতাল্লিশ

ভদ্রলোকের নাম বিরাজ মাহান্তি। থাকেন পাটাপুরা গ্রামে। দশরথ দাস বলেছিলেন, 'পাটাপুরা গিয়ে আপনি খোঁজ করলেই ওঁকে পেয়ে যাবেন। গ্রামের দিকের লোক... সবাই সবাইকে চেনেন। এ ভদ্রলোককে আরও বেশি করে চেনেন, তার কারণ উনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। কারও কাছে একটা পয়সাও নেন না। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন। ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে। মাঝেমধ্যে উনি ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে থাকেন বটে, তবে আমার মনে হয়, এখন উনি পাটাপুরাতেই আছেন। গত মাসে ওকে নিয়ে একটা ফিচার বেরিয়েছিল আমাদের কাগজে।'

বিরাজ মোহান্তিকে ফোনে ধরার অনেক চেষ্টা করেছিলেন দশরথ। যোগাযোগ করতে

পারেননি। শেষে উনি ফোন নাম্বারটা জয়দেবকে দিয়ে বলেন, 'আপনি কন্টাক্ট করে চলে যান। মনে হয়, ওর কাছে কিছু তথ্য পাবেন।'

সকালবেলায় ফোন করেছিল জয়দেব। বিরাজ মোহান্তি বললেন, 'চলে আসুন।'

তাই পাটাপুরা গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়েছে জয়দেব। ওর সঙ্গে রয়েছে উপাসনা। হোটেল থেকে একটা এ সি গাড়ি ভাড়া করে... নবেন্দু আর উপাসনাকে তোলার জন্য ও ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনে গেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নবেন্দু আসতে পারেনি। ওদের কলকাতা অফিস থেকে কে একজন অফিসার আসছেন। তাঁর জন্য নবেন্দুকে ভুবনেশ্বরে থেকে যেতে হয়েছে। উপাসনাকে তোলার সময় স্বাতী ঠাট্টা করেছিল, 'আপনার হাতে উপাকে একা ছেড়ে দিলাম মশাই। ইলোপ করবেন না।'

জয়দেব বলেছিল, 'ফিরে এসে তোমার কথার জবাব দেব।'

হলুদ রংয়ের সিন্থেটিক শাড়ি পরেছে উপাসনা। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। চোখে সানগ্লাস। চুল হাওয়ায় উড়ছে। ফিল্ম আর্টিস্টের মতো লাগছে ওকে। ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে গাড়ি মোরামের রাস্তায় নেমে যেতেই জয়দেব জানলার দিকে চোখ ফেরাল। দু'পাশে সবুজ ধানখেত। আকাশটা নীল। লাল মোরামের রাস্তাটাকে ওর সিঁথির সিঁদুরের মতো মনে হতে লাগল। আড়চোখে ডানদিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কী সুন্দর জায়গাটা, তাই না? সারাটা জীবন থেকে যেতে পারলে ভালো হত।'

উপাসনা বলল, 'বারণ করেছে কে? কোনও ওড়িয়া সুন্দরীকে বিয়ে করলেই তো থাকা যায়।'

'গ্রামের দিকে একটু লক্ষ রেখো তো। তোমার থেকে সুন্দরী কোনও মেয়েকে যদি চোখে পড়ে, তাহলে আমাকে দেখিয়ো। আজই ফাইনাল করে যাব।'

ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা ওর মুখের দিকে তাকাল উপাসনা। তারপর বলল, 'আপনি কোন সাবজেক্টে পিএইচডি করছেন বলুন তো? চৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য, না কি মেয়েদের ফ্ল্যাটারিতে?'

'একটা সত্যি কথা বললাম। সেটা ফ্ল্যাটারি হয়ে গেল?'

'আমি মরছি আমার জ্বালায়। এখন এসব কথা ভালো লাগে?'

'কেন, তোমার আবার কী হল? দিব্যি তো নিজে জ্বলজ্বল করছ।'

'কাল রাতে আপনারা চলে যাওয়ার পর মা ফোন করেছিল। বলল, রিসার্চ-ফিসার্চের দরকার নেই। তোকে যারা দেখতে এসেছিল, তারা তোকে পছন্দ করেছে। বৈশাখ মাসেই ওরা বিয়েটা সেরে ফেলতে চায়। তুই যত শিগগির পারিস, চলে আয়।'

'পাত্রটি কে? থাকেন কোথায়? ঠিকানাটা দাও তো। এমন ভয় দেখাব, ওরা নবদ্বীপে যাওয়ারই সাহস পাবে না।'

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল উপাসনা। বলল, 'আপনি এত বীরপুরুষ... তা তো জানতাম না। ঠিক আছে পাত্রের হদিশ দিয়ে দিচ্ছি। নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। থাকে এই ভুবনেশ্বরেই। পাত্র আর তাঁর মা এবং মাসিমা আমাকে নবদ্বীপে দেখতে গেছিলেন। পাত্র

খবরের কাগজের রিপোর্টার। পাত্র সম্পর্কে আর কী জানতে চান বলুন, বলে দিচ্ছি।'

মজা করেই জয়দেব বলল, 'উপা, সাবধান। নিশ্চয়ই গোলমেলে ব্যাপার। একজন ওড়িয়া ছেলে ... তুমি বলছ, একটা কাগজের রিপোর্টার ... সে কেন বঙ্গদেশে বিয়ে করতে যাবে? তাও খুঁজে খুঁজে আবার নবদ্বীপে? ওড়িশায় তাঁর মেয়ে জুটল না? দাঁড়াও, গোরাকে বলে পাত্রের বায়োডেটা বের করছি। তার পর এমন চমকাব...'

হাসি থামিয়ে উপাসনা বলল, 'পদবি মিশ্র হলে কী হবে, আসলে ওরা বাঙালি। পাঁচশো বছর ধরে ওরা ওড়িশাতেই আছেন। গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবার। তাই বৈষ্ণব পরিবার থেকেই ওরা মেয়ে চান। পাত্রের মা বললেন, ওদের বিরাট পরিবার। সব বউকেই ওঁরা বাংলা থেকে নিয়ে গেছেন।'

'তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, এখানকার ছেলেরা খুব গুণ্ডিপান খান। দাঁতে লাল ছোপছোপ।'

শুনে হি হি করে হাসতে লাগল উপাসনা। তার পর বলল, 'বাব্বা, আপনি পারেনও বটে, খুঁত ধরতে। সত্যি জয়দেবদা, স্যুটটাই পরা লোকগুলো কচরমচর করে পান চিবোচ্ছে, থুক করে পানের পিক ফেলছে, দেখতে কেমন লাগে।'

জয়দেব কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'তার থেকে তুমি এমন পাত্তর বেছে নাও, যার পরিবারে মা ছাড়া আর কেউ নেই। নিজের বাড়ি আছে। নিজের ব্যবসাও। লেখাপড়ার জগৎ নিয়ে আছে। যে তোমাকে সময় দেবে। জীবনে অন্য কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েনি। পাত্র মাঝারি ধরনের স্মার্ট এবং হ্যান্ডসাম। যে তোমার রিসার্চে উৎসাহই দেবে না, দরকার হলে তোমার জন্য জান দিয়ে দেবে...'

'থামুন থামুন জয়দেবদা। উফ্ আমি আর নিতে পারছি না। প্লিজ, চুপ করুন। নিজের ঢাক যে কেউ এত ভালো বাজাতে পারে, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।'

'ওহ্, তাহলে আমার সম্পর্কে সব জানা হয়ে গেছে?'

উপাসনা কী বলতে যাচ্ছিল, অমন সময় ড্রাইভার বলল, 'স্যার, এই কাছেই বিমলা দেবীর মন্দির। মাকে দর্শন করবেন না কি? এখান দিয়ে যারা পুরীতে যায়, তারা গাড়ি থেকে নেমে বিমলা মাকে প্রণাম করে যায়। গাড়ি থামাব?'

উপাসনা বলল, 'থামাও। স্বাতী আমায় কাল বলছিল, ইনি খুব জাগ্রত। পুরী যাওয়ার সময় যে যা মানত করে যায়, তা ফলে যায়।'

ওড়িশায় দু'পা অন্তর একটা করে মন্দির। সব বিগ্রহই জাগ্রত। শুনে জয়দেব মনে মনে হাসল। এঁরা এমন ধর্মপ্রাণ যে, ধর্মের নামে এখানে, যা ইচ্ছে তাই চলতে পারে। ধর্ম একটা ভালো পেশাও বটে। কত হাজার লোক ঠাকুর দেবতা ভাঙিয়ে করে খাচ্ছে, কে জানে? একটু পরেই ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ পেল জয়দেব। একটা ছোট্ট মন্দিরের সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পার্কিং স্পেসে। দু'পাশে সার সার দোকান। পুজোর ফুল, উপাচার বিক্রি হচ্ছে। মন্দিরের গেটে বেশ ভিড়। উপাসনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই পাভারা দৌড়ে এল। ওকে যে রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখাচ্ছে।

সবাই ওর দিকেই তাকাবে। একজন পান্ডা ওর কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে... হাতে পুজোর ডালা ধরিয়ে বলল, 'চলো মা, খুব ভালো সময়ে এসেছ। মন্দিরে এখন আরতি শুরু হবে। তার আগে তোমায় গর্ভগৃহে নিয়ে গিয়ে পুজো দেওয়াব।'

ঠাকুর দেবতায় জয়দেবের খুব একটা বিশ্বাস নেই। মন্দিরের ভেতর জুতো খুলে যেতে হবে। জলকাদা মাড়িয়ে যেতে ... ওর ইচ্ছে করল না। উপাসনা পান্ডার সঙ্গে দু'পা এগিয়ে গেছে। ঘুরে তাকিয়ে ও বলল, 'কী হল? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?'

জয়দেব ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি যাও। সতীর পুণ্যেই পতির পুণ্য।'

উপাসনা বলল, 'জয়দেবদা ... প্লিজ। মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করতে নেই।'

উপাসনার কথায় কী জাদু মাখানো ছিল, শুনে ... গাড়ি ভেতর জুতো-মোজা খুলে ওর পিছন পিছন মন্দিরের ভেতর ঢুকল জয়দেব। মূল মন্দিরে যেতে হলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ওপরে উঠে ওরা দেখল, জনা পঞ্চাশ পুণ্যার্থী জমা হয়ে গেছে। দেওয়ালের পাশ দিয়ে জায়গা করে নিয়ে পান্ডাই ওদের দুজনকে গর্ভগৃহের কাছে নিয়ে গেল। লোহার খাঁচার মধ্যে ভবতারিণী মূর্তি। কয়েকশো বছরের পুরনো বলে মনে হল জয়দেবের। ডালা থেকে ফুল তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করল পান্ডা। উপাসনার দেখাদেখি, বিগ্রহের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল জয়দেব। মন্ত্র পড়া শেষ করে পান্ডা বলল, 'এবার আপনাদের গোত্রটা বলুন।' জয়দেব বলতেই পান্ডা বিড়বিড় করে বলল, 'দুজনে হাতের ওপর হাত রেখে ... আপনারা স্বামী-স্ত্রী ... মায়ের কাছে যা মানত করার করে নিন।'

উপাসনার ডান হাতটা ওর হাতে। জয়দেব টের পেল, হাতটা কাঁপছে। চোখ বন্ধ করে ও মনে মনে বলল, 'ঠাকুর দেবতায় আমি বিশ্বাস করি না। তবুও মা, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, উপাসনা যদি আমার জীবনে আসে, তাহলে ওকে সুখে রাখব। ঠিক এক বছর পর এখানে এসে ফের তোমার পুজো দিয়ে যাব।' চোখ খুলে জয়দেব দেখল, উপাসনা হাত সরিয়ে নিচ্ছে। মন্দিরের ভেতর গুমোটে, কপালের সিঁদুর গলে নাকের কাছে এসে পড়েছে। সিঁদুর পরলে ওকে কেমন দেখাবে, সেটা আন্দাজ করার ফাঁকেই আরতি শুরু হয়ে গেল।

পার্কিং স্পেসে আসার পর, পকেট থেকে রুমাল বের করে জয়দেব বলল, 'কপালটা মুছে নাও উপা। বিশ্রী ঘামছ।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উপাসনা বলল, 'ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে।'

'গাড়িতে মিনারেল ওয়াটারের বোতল আছে। শিগগির চলো, এ সি-তে গিয়ে বসি।'

মিনিট কয়েক পর গাড়ি পাটাপুরার দিকে ছুটতেই জয়দেব ঠাট্টা করল, 'পান্ডাটা কী বুদ্ধিমান দেখো, কত আগে আমাদের স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে দিল?'

উপাসনা বলল, 'চোখ বন্ধ করে... তুমি তো সেই মানতটাই মায়ের কাছে করছিলে?'

'জানলে কী করে? তুমি কী মানত করলে আগে বলো। তারপর আমি বলব, কী চেয়েছি।'

'তাহলে তোমাকে একটা বছর ওয়েট করতে হবে।'

'বুঝে গেছি। একটা বছর পর আমরা তাহলে ফের আসছি।'

এভাবে খুনসুটি করতে করতে জয়দেবরা পাটাপুরা পৌঁছে গেল। বেলা তখন দশটা সোয়া দশটা বাজে। স্কুলের পোশাক পরা কয়েকটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বিরাজ মাহান্তির বাড়ি কোথায় জানতে চাওয়ায় একটা ছেলে বলল, 'হুই যে মন্দিরটা দেখছেন, তার ঠিক বাঁ পাশেই।'

মন্দিরের পাশে ছোট্ট একতলা বাড়ি। সামনে বড়ো বাগান। লোহার গেট সরিয়ে জয়দেব ভেতরে ঢুকতেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। পরনে সাদা ফতুয়া, সাদা ধুতি। একসময় বেশ সুপুরুষ ছিলেন। হাতজোড় করে উনি বললেন, 'আসুন, ভেতরে আসুন। আপনাদের জন্যই আমি আজ ডিসপেনসারিতে যাইনি।'

ড্রয়িং রুমে ঢুকে জয়দেবের চোখে পড়ল, চৈতন্যদেবের বেশ বড়ো একটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো আছে। সর্বত্র রুচির ছাপ। বিরাজ মাহান্তি নিজেই ট্রে-তে করে ডাবের জল নিয়ে এলেন। গ্লাস দুটো এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'জীবনে এই সেকেন্ড টাইম ব্যাচেলার্স লাইফ লিড করছি ভাই। সবকিছু নিজেকেই করতে হয়। বহুদিন পর আমার বাড়িতে একজন মহিলা পা দিলেন।'

সরকারি অফিসাররা এমন রসিক টাইপের হন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জয়দেব গুছিয়ে বসল।

বিরাজ মাহান্তি প্রথমেই বললেন, 'দশরথকে আমি খুব পছন্দ করি। ও পাঠিয়েছে। তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। কয়েক বছর আগে পুরী থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে। দাঁড়ান, নামটা এখনও আমার মনে আছে। জয়দেব মুখার্জি। জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর থেকে পাওয়া কঙ্কাল সম্পর্কে উনিও আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কোনও কথা বলিনি।'

জয়দেব বলল, 'সত্যিই কি কোনও কঙ্কাল পেয়েছিলেন?'

'আলবাত পেয়েছিলাম। নিরানব্বই সালের শেষ দিকে। তখন খুরদা রোড থেকে বদলি হয়ে সবে আমি পুরীতে পোস্টেড হয়েছি। মন্দিরের একটা দিকের পাঁচিল প্রায় ধসে পড়েছিল। রাজা দিব্যাদিদেব সিংহের আমলে দেওয়া পাঁচিল। কালের নিয়মেই ভঙ্গুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচিল সংস্কারের সময় হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, দেওয়ালের গায়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। শুনে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লাম। খবর পেয়ে মন্দির কমিটির লোকজনও এসে হাজির হলেন। যেদিকের পাঁচিল মেরামত করা হচ্ছিল, সেখানে তীর্থযাত্রীদের যাওয়ার কথা নয়। তাই বাইরের লোকজন কিছু জানার আগেই আমরা কঙ্কালটা একটা বাক্সের ভেতর পুরে ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দিই। ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে।'

জয়দেব জিজ্ঞেস করল,'কঙ্কালটা কার, সে সম্পর্কে পরে আর কিছু জানতে পারেননি?'

'আসলে আমাদের মাথাতেই তখন আসেনি। ছয়মাস পর কৈবল্য বৈকুণ্ঠমে যখন আরেকটা কঙ্কাল পাওয়া গেল, তখন দশরথবাবু হইচই বাধিয়ে দিয়েছিলেন। উনিই প্রথম

কাগজে সন্দেহ প্রকাশ করেন, ওটা চৈতন্যদেবের।'

'পরে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি থেকে জানার চেষ্টা করেননি, ওটা কার কঙ্কাল ছিল?'

'প্রথম যে কঙ্কালটা পাওয়া গেছিল, তার হাইট ছিল পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির মতো। পুরুষ। দেওয়ালে দাঁড়ানো অবস্থায় তার দেহটা পাওয়া গেছিল। আমি নিজে তার হাইট মেপেছিলাম। তাই মনে আছে। দেহের তুলনায় তার করোটি ছিল বেশ বড়ো। বেশ মনে আছে, পাঁচ ফুট গাঁথনির দেওয়াল ভেঙে কঙ্কাল বের করে আনার পর, সেই হতভাগ্যের কথা ভেবে আমি কয়েকটা রাত ঘুমোতে পারিনি। চুনাপাথরের দেওয়াল বলে কঙ্কালটি ক্ষয়ে যায়নি...।'

হাইট পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ... শুনেই জয়দেব হতাশ হয়ে গেল। চৈতন্যদেবের হাইট ছিল তার অনেক বেশি। উনি দীর্ঘদেহী ছিলেন। তার মানে... দেওয়ালের ভেতর পুঁতে দেওয়া কঙ্কালটা, অন্য কারও। কে হতে পারেন? অবশ্যই পুণ্যাত্মা কেউ। না হলে যাঁরা তাকে মেরেছিলেন, তাঁরা পুরীর সমুদ্র সৈকতের যে-কোনও জায়গায় মৃতদেহটা পুঁতে ফেলতে পারতেন। বিরাজ মাহান্তি কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর কোনও কথা ঢুকছে না জয়দেবের। ইতিহাসের পাতায় ঝাঁপ দিল ও। বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো একজনের নাম ওর মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। স্বরূপ দামোদর? হতেও পারে। গৌড় থেকে আসা চৈতন্যদেবের এই শিষ্য পুরীতে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকেছিলেন, তার পর থেকে আর স্বরূপ দামোদরের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাটা ঘটেছিল, চৈতন্যদেব মারা যাওয়ার ঠিক বিরাশি দিন আগে। হ্যাঁ, উনি গুমখুন হতেই পারেন।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে বাস্তবে ফিরে এল জয়দেব। উপাসনা প্রশ্ন করেছে, 'কৈবল্য বৈকুণ্ঠমে যে কঙ্কালটা পাওয়া গেছিল, সেটা কি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

বিরাজ মাহান্তি বললেন, 'না, মা। আমি শুনেছি। সেটা নাকি প্রায় সাত ফুটের মতো লম্বা ছিল। সেই সময় কাগজে লেখালেখি হওয়ায় .... চিফ মিনিস্টারের নির্দেশে ... কঙ্কালটা খুব গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে। মাত্র দশ-বারোজন সেই কঙ্কাল চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে শুনেছি, ল্যাবরেটরি থেকে সেই কঙ্কালটা চুরি গেছিল।'

জয়দেব বলল, 'চুরি গেছিল মানে?'

'খুব রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছিল। সে সময় ফরেনসিক অফিসার ছিলেন আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় নরেশ জেনা। তিনি এখন থাকেন ভুবনেশ্বরের ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনের ফ্ল্যাটে। তাঁর মুখেই পরে শুনেছিলাম, রাতে ল্যাবরেটরির তালা ভেঙে কারা যেন সেই কঙ্কাল নিয়ে চলে গেছিল। খবরটা কেউ জানেন না। এই প্রথম আমি আপনাদের কাছে বললাম। দশরথের কাগজে কিন্তু তখন বেরিয়েছিল, অবিশ্বাস্য হাইটের ওই কঙ্কালটা না কি বিশেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে। কোন এক মিউজিয়ামে। আসলে তা নয়। সরকার থেকে খবরটা চেপে দেওয়া হয়েছিল।'

'নরেশ জেনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি কি কিছু বলতে পারবেন?'

'কেন পারবেন না? কঙ্কালটা কতদিনের পুরনো, বয়স কত, সবই বলতে পারবেন। ওর কাছেই আমি শুনেছি, আর্টিস্ট দিয়ে পরে আঁকানো হয়েছিল, কঙ্কালটা যার, তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। আপনারা ওঁর কাছে যান। গিয়ে কথা বলুন। এমন কিছু তথ্য পাবেন, অবাক হয়ে যাবেন।'

চুয়াল্লিশ

গাড়ি পিপলিতে পৌঁছনোর ঠিক আগে সামনের সিট থেকে চন্দন বলল, 'গোরাদা, বোধহয় কোনও ঝামেলা হয়েছে। দেখুন, রাস্তা অবরোধ চলছে।'

পিছনের সিটে বসেছে গোরা ও মন্দিরা। গাড়ি চলার সময় ওর ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, পিপলি বাজারের কাছে প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে। এই জায়গাটা বিখ্যাত হস্তশিল্পের জন্য। রাস্তার দু'পাশে সার সার দোকান। ওড়িশার এই হস্তশিল্পীদের খুব কদর। বেশিরভাগই তারা মুসলমান। কাপড়ের চাঁদোয়া, রঙিন ঝুলন্ত ল্যাম্পশেড, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি .... ঘর সাজানোর নানা ধরনের জিনিস এই পিপলিতে পাওয়া যায়। হস্তশিল্পের সম্ভার বিদেশে রপ্তানি হয় বলে, এখানে বিদেশি ব্যাপারিরাও আসেন। এমনিতেই সারাবছর এখানে ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু আজকের এই ভিড় ব্যাপারিদের ভিড় নয়। সম্ভবত দলিত সমাবেশের জন্য। এরা বোধহয় পুরীর দিকে যাচ্ছে।

সামনে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। পুরী যাওয়ার এটাই প্রধান পথ। যানজটে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর গোরা নেমে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ভাই?'

একটা অল্পবয়সি ছেলে বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আরে, আমরা মিছিল করে পুরীর দিকে যাচ্ছিলাম। পুলিশ আমাদের আটকে দিয়েছে।'

'কেন পুলিশ আটকে দিয়েছে?'

'কে জানে? পুলিশ বলছে, পুরীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে। ওখানে মিটিং মিছিল করা যাবে না। আপনারা বাড়ি ফিরে যান।'

পুরীতে দলিত সমাবেশের উদ্যোগ নিয়েছে যে ছেলেটি, তার নাম লক্ষ্মণ পণ্ডা। পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে গোরা ... তাঁকে ধরার চেষ্টা করল। ও দিক থেকে বারবারই বলছে, দ্য পার্সন ইউ আর ট্রায়িং টু রিচ, ইজ নট অ্যাভেলেবল।' কয়েকবার চেষ্টা করে, হাল ছেড়ে দিল গোরা। চন্দনকে বলল, 'চলো তো দেখি, পুলিশ কেন আটকাচ্ছে?'

ভিড়ের মাঝখান দিয়ে হাঁটার সময় কয়েকজন চিনতে পারল গোরাকে। দলিতদের অনেকেই তখন এদিক ওদিক ... গাছের ছায়ায়, দোকানের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এতক্ষণ তারা যেন প্রাণ ফিরে পেল। কে একজন স্লোগান দিয়ে উঠতেই পুরো দলটা গোরার পিছু নিল। পরনে লম্বা হলুদ পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা। রাস্তা দিয়ে গোরা হাঁটছে। দলিত, আদিবাসী আর বিত্তহীনদের সামনে ওকে যেন অন্য গ্রহের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন অনেকেই। যানবাহনের ফাঁক দিয়ে প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটার পর গোরা দেখতে পেল, রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ভ্যান। আর ঢাল বাগিয়ে রাখা অ্যাকশন ফোর্সের পুলিশ। মাছি গলার উপায় নেই।

সামনে পুলিশের জিপের সামনে দাঁড়িয়ে এক অফিসার। গোরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার অফিসার? আমাদের পার্টির লোকজনকে আটকে দিয়েছেন কেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনার পরিচয়টা আগে দিন। তার পর কথা বলব।'

গোরা বলল, 'আমি পার্টির যুব দলের সম্পাদক ... গোরা।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো বের করে... তাতে চোখ বুলিয়ে অফিসার বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ করেছে?'

'বলতে পারব না। আমার অফিসাররা বলতে পারবেন।'

'আমার বিরুদ্ধে কি ওয়ারেন্ট আছে?'

'না নেই। কেন ঝামেলা করছেন গোরাবাবু? প্লিজ, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আধ ঘণ্টার তো ব্যাপার। থানা এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। আমার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেই আপনি ফিরে আসতে পারবেন। ততক্ষণ আপনার লোকজনকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলুন।'

ওদের চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। পুলিশ অফিসারের কথা সবাই শুনতে পেয়েছে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, 'পুলিশের সঙ্গে আপনি যাবেন না গোরাদা। আমরা আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে যদি নিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' শুনে অনেকেই সমর্থন জানাল।

গোরা বলল, 'অফিসার, আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, সেটা না জানা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না। তেমন হলে আপনার ওপরওয়ালাদের এখানে আসতে বলুন।'

ধরনা দেওয়ার মতো করে রাস্তায় বসে পড়ল গোরা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার লোক রাস্তায় বসে পড়ল। চন্দন ক্যামেরা অন করে দিয়েছে। রাস্তা অবরোধের ছবি তুলছে। এমন সময় গোরার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। পর্দায় লক্ষ্মণ পন্ডার নামটা দেখে ও সুইচ অন করে বলল, 'পিপলির কাছে পুলিশ আমায় আটকে দিয়েছে। তুমি কোথায়?'

লক্ষ্মণ বলল, 'আর মিনিট দশেকের মধ্যে আমি পিপলি পৌঁছাচ্ছি। এদিকে লোকজন জড়ো করতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমার সঙ্গে হাজার পনেরো লোক আছে। নর্থ থেকে বিধু মুর্মু নিয়ে আসছে হাজার দশেক আদিবাসী। দেখি পুলিশ কী করে আমাদের রোখে?'

মাথার ওপর চৈত্রের সূর্য। ধরনায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাথাটা ঘুরে উঠল গোরার। ঢাল-পুলিশের ব্যারিকেড ঝাপসা হতে হতে চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। প্রখর আলোয় ওর চোখ ঝলসে উঠল।

গোরা দেখল, দু'পাশের দোকানঘরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। পিচের রাস্তাটাও আর নেই। ওর ডানদিকে বিশাল এক দিঘি। সবুজ, শান্ত, নিথর। দিঘির গায়েই একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের নিচে কয়েকটি মানুষ স্নান করে উঠে পোশাক বদলাচ্ছে। গোরা আরও দেখল, দিঘিতে স্নান সেরে উঠে আসছে... ওরই মতো দেখতে এক যুবক। অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে সে কী যে চাইল অন্য একজনের কাছে। সেটা না পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তার পরই দৌড়তে শুরু করল সামনের দিকে।

ওর মতো দেখতে যুবকটি তো দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই। পিছনে পিছনে ওর সঙ্গীরাও দৌড়চ্ছে। বন বাদাড়, জনপদ পেরিয়ে যুবকটি অবশেষে দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়া দেখে উল্লসিত। হরিণের গতিতে সে ছুটতে শুরু করল। তাঁর মধ্যে ক্লান্তির ছাপ নেই। মন্দিরের কাছে গিয়ে সে গতি আরও বাড়িয়ে দিল। প্রহরীরা ঢুকতে দিতে চায়নি। যুবকটিকে ধরার জন্য লাঠি বাগিয়ে তারা পিছন পিছন দৌড়ল। যুবকটির কোনও হুঁশ নেই। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে... সে সোজা দৌড়চ্ছে বিগ্রহের দিকে। বিগ্রহ দেখে গোরা বুঝতে পারল, জগন্নাথের মন্দির। যুবকটি কি উন্মাদ? কেন সে লাফিয়ে উঠল রত্ন সিংহাসনে? কেন সে জগন্নাথের মূর্তিটি জড়িয়ে ধরে মূর্ছিত হল বেদির ওপরই?

প্রহরীরা এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। তারা পিটিয়ে মারতে চায় যুবকটিকে। প্রভু জগন্নাথের দ্বিপ্রাহরিক ভোগের সময় হয়ে গেছে। এই সময় তাঁকে স্পর্শ করে অশুচি করেছে যুবক। তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। যুবকটিতে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রহরীদের সঙ্গে মারাত্মক ক্রুদ্ধ মন্দিরের পান্ডারাও। যুবকের অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে তারা বাইরে নিয়ে আসছে। এমন সময় মন্দিরের উদয় হলেন এক প্রবীণ মানুষ। যুবকটির মুখ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। প্রহরীদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি ধমকে উঠলেন। যুবকটির সঙ্গে কেন দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে?

চোখের সামনে দৃশ্যগুলো সরে সরে যাচ্ছে। কোনও কথা গোরা শুনতে পাচ্ছে না। ও বুঝতে পারছে না, এই যুবকটিকেই ও বারবার দেখতে পায় কেন? এসব ঘটনা কোন কালে ঘটেছে? পুরীর মন্দিরে ও বহুবার গেছে মা আর বাবার সঙ্গে। কিন্তু এখন চোখের সামনে যে মন্দিরটিকে ও দেখতে পাচ্ছে, তার সঙ্গে এখনকার মন্দিরের অনেক তফাত। গোরা দেখল, যুবকের সঙ্গীরা এতক্ষণে মন্দিরের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা দরদর করে ঘামছেন... হাঁফাচ্ছেন। যুবকের অচেতন দেহটা দেখে তারা কাঁদতে শুরু করলেন। প্রবীণ মানুষটি তাদের সঙ্গে কথা বলছেন... অভয় দিচ্ছেন। সবাই মিলে যুবকটিকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছেন রাজপথ দিয়ে।

'গোরাদা... ও গোরাদা।'

কাঁধ ধরে কে ঝাঁকাচ্ছে। বাস্তবের জগতে ফিরে এল গোরা। ওর চোখের সামনে এখন ফের পুলিশের ক্রুদ্ধ মুখ। গোরা পাশ ফিরে দেখল, লক্ষ্মণ পন্ডা। এই ছেলেটার ডাকেই ও জমায়েতে বক্তৃতা দিতে এসেছে। লক্ষ্মণ বলল, 'পুরীর কালেক্টর সাহেব এসেছেন। উনি কথা বলতে চান।'

উঠে দাঁড়াতেই গোরার মাথাটা টলে গেল। চন্দন ওকে ধরে না ফেললে হয়তো পড়ে যেত। সামনে সাদা একটা অ্যাম্বাসাডরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কালেক্টর সাহেবকে দেখে ও চমকে উঠল। আরে... একটু আগেই ঘোরের মধ্যে এই মানুষটাকেই তো ও দেখেছে। পুরীর মন্দিরের সেই প্রবীণ মানুষটি। একেবারে একই রকম দেখতে। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি বাসুদেব পট্টনায়েক। পুরী জেলার কালেক্টর। গোরাবাবু নমস্কার।'

গোরা বলল, 'নমস্কার।'

'আমরা কি একটু আলাদা কথা বলতে পারি। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনার লোকজনকে প্লিজ একটু পিছনে সরে যেতে বলুন।'

বাসুদেব পট্টনায়েক খুব বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। গোরা ইঙ্গিত করল, সবাইকে সরে যেতে। তার পর জিজ্ঞেস করল, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, বলুন তো?'

'অ্যাকচুয়ালি ... অভিযোগটা এসেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের তরফ থেকে। আপনার সঙ্গে না কি একটা মাওবাদী সংগঠনের গোপন সম্পর্ক আছে।'

গোরার হাসি পেল অভিযোগটা শুনে। ও বলল, 'মিথ্যে কথা।'

'আমাদেরও তাই মনে হয়। আমরা আপনার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছি। তাই ওদের অভিযোগের কোনও গুরুত্ব দিইনি। তবুও আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি গোরাবাবু, আপনি তরুণ মাঝি বলে কাউকে চেনেন?'

'চিনি। আমাদের পার্টির কর্মী। কেন বলুন তো?'

'রিসেন্টলি উনি অ্যারেস্ট হয়েছেন ঝাড়গ্রাম বর্ডার থেকে। আপনি তো জানেন, ওইসব অঞ্চলে মাওবাদীদের অ্যাকটিভিটি প্রবল। তরুণ মাঝির কাছে না কি আর্মসও পাওয়া গেছে। ইন ফ্যাক্ট, উনিই আপনার নামটা করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কাছে।'

খবরটা শুনে বিশ্বাস করল না গোরা। ভুবনেশ্বরে আসার পর থেকে তরুণের সঙ্গে ওর আর যোগাযোগ হয়নি। কতটা সত্যি, সেটা বোঝার জন্য, ও চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন আজই ওকে কলকাতার খবর দিচ্ছিল। কই, তরুণের অ্যারেস্ট হওয়া নিয়ে তো একটা কথাও বলেনি? খবর চন্দনও তাহলে জানে না। তরুণ এমনিতে মাথা গরম টাইপের ছেলে। কিন্তু ওর সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ থাকতে পারে না। ও জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেছে তরুণ আমার নামে?'

'এই যেমন... উনি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে নেতা বলে মানেন না। কেননা, আপনাদের অল ইন্ডিয়া লিডাররা মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন না। ওঁরা মুখে বলেন, দলিতদের বন্ধু, কিন্তু নিজেরা বিলাসের মধ্যে থাকেন। এই যে কিছুদিন আগে কেশবজি বলে আপনাদের এক লিডার ভুবনেশ্বরে মিটিং করে গেলেন, গোরা আপনিও সেদিন মঞ্চে ওর সঙ্গে ছিলেন। জানেন, গুরগাঁওয়ে তাঁর কতবড়ো ফার্ম হাউস আছে? বোধহয় আপনি সেটা জানেন না। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বলছে, উনি কোটি কোটি টাকার মালিক। রিসেন্টলি হরিয়ানায় ওঁকে একটা টাকার মালা দেওয়া হয়েছে, যার দাম এক কোটি। এই

টাকা কিন্তু পার্টি ফান্ডে যায়নি। ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার হবে। আপনি শিক্ষিত ছেলে। কেন এসব দুর্নীতির মধ্যে জড়াচ্ছেন?'

প্রশাসনের লোকজনকে ভালমতো চেনে গোরা। মিষ্টি কথায় ওরা অনেক কিছু ভোলাতে পারেন। বিশেষ করে, আইএএস, আইপিএস-রা। কথা যাতে না বাড়ে, তার জন্য ও বলল, 'থ্যাঙ্কস মি. পট্টনায়েক। আপনার পরামর্শ নিয়ে পরে ভাবব। আপাতত, পুলিশকে কর্ডন তুলে নিতে বলুন। না হলে আমি কিন্তু মব্ কন্ট্রোল করতে পারব না। দলিত মানুষ খেপলে... পুলিশ মুশকিলে পড়বে।'

'কাদের আপনি দলিল বলছেন গোরাবাবু? কেন দলিত শব্দটার ভুল ব্যাখ্যা করছেন? দৌলতের চুড়োয় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা দলিত আন্দোলন করবেন বলে আপনার মনে হচ্ছে। এ তো শোষণ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি কি জানেন, আপনাদের লক্ষ্মণ পন্ডা এই মানুষগুলোকে কী টোপ দিয়ে মাঠঘাট থেকে তুলে এনেছে? জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে যাবে বলে। একসঙ্গে এত মানুষ মন্দিরে গিয়ে ঢুকলে কী ক্যাওস হবে, আপনি আন্দাজ করতে পারছেন? পুরীতে আজ প্রভু জগন্নাথের মকরবেশ। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছেন মন্দিরে। একই দিনে দলিতদের সমাবেশ নিয়ে তাই আপত্তি জানিয়েছেন পুরীর মানুষ। আপনারা গেলে একটা সংঘর্ষ হত। সেই কারণেই ওখানে ওয়ান ফর্টিফোর জারি করেছি। ইন ফ্যাক্ট, আপনাদের আটকেছি, আপনার সেফটির কথা ভেবে। প্লিজ, আপনারা ফিরে যান।'

গোরা চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু নিজের জেদে অনড় রইল। 'সরি মি. পট্টনায়েক। আজকের সমাবেশ ক্যানসেল করা সম্ভব না। আমার দলিতবন্ধুরা একদিনের রুটি রোজগার স্যাক্রিফাইস করে আজ সমাবেশে এসেছে। তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।'

বাসুদেব পট্টনায়েক বললেন, 'তাহলে তো আমাকে অ্যাকশন নিতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। জনসমুদ্রের প্রবল ঢেউ পিছন থেকে আছড়ে পড়ল। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ছত্রাকার। পার্টি কর্মীরা স্লোগান দিতে দিতে সামনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করেছে। কার ধাক্কায় গোরা ছিটকে রাস্তা থেকে নেমে গেল। পার্টি কর্মীরা বেধড়ক মার খাচ্ছে। আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছে। ওই গন্ডগোলের মাঝেও চন্দন কিন্তু ছবি তুলে যাচ্ছে। পাঁচ-দশ মিনিটের একটা ঝড়। তার মধ্যেই সমবেত স্লোগান বদলে গেল আহত মানুষের আর্ত চিৎকারে। এক আদিবাসী মহিলার মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে দেখে, গোরা আর স্থির থাকতে পারল না। ওই এলোপাথাড়ি লাঠিচালনার মাঝেই ও ঢুকে পড়ল। তখনই ওর পায়ের সামনে এসে ফাটল, পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের একটা সেল।

গ্যাসের ধোঁয়ায় ওর চোখ জ্বলছে। প্রবল কাশতে শুরু করল গোরা। দম আটকে আসছে। কারা যেন ধরাধরি করে ওকে নিয়ে এল রাস্তা থেকে। চোখের সামনেটা ফের ঝাপসা। কপালের দু'পাশ টিপটিপ করছে দেখে, গোরা আঙুল দিয়ে টিপে ধরল। ধরনায়

বসে থাকার সময় ও যে দৃশ্যগুলো দেখেছিল, এ যেন তারই দ্বিতীয় পর্ব। ও দেখল, মন্দিরের সেই প্রবীণ মানুষটির বাড়িতে ... ওর মতো দেখতে সেই যুবকটি বসে আছে। দুজনে একান্তে কথা বলছেন। প্রবীণ মানুষটি বললেন, 'রাজা চান না, আপনি পুরীতে বসবাস করুন।'

যুবকটি প্রশ্ন করল, 'কেন পণ্ডিত সার্বভৌম?'

'আপনি গৌড় থেকে এসেছেন। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহর সঙ্গে এখানকার রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্পর্কে ভালো নয়। রাজার অমাত্যরা আপনার সম্পর্কে ভুল বার্তা দিচ্ছেন। রাজাকে ওঁরা বুঝিয়েছেন, আপনি গৌড় সুলতানের গুপ্তচর। তাই উনি নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যেন পুরী থেকে চলে যেতে বলা হয়। ধৈর্য হারাবেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে এলে আমি কথা বলব। আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণাটা ভেঙে দেব। দয়া করে আপনি কিছুদিন কেন্দ্রাপড়াতে গিয়ে থাকুন।'

যুবকটি বলল, 'আমি যে প্রভু জগন্নাথের টানেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এসেছি সার্বভৌম।'

'জানি। আপনার মতো বিজ্ঞ, মহান মানুষ পুরীতে থাকুন, এটাই আমরা চাই। রাজপণ্ডিত কাশীশ্বর মিশ্রও তাই চান।... এখন বিশ্রাম নিন পণ্ডিতপ্রবর। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।'

কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে প্রবীণ মানুষটি বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে প্রদীপের আলো নিভিয়ে যুবক শয্যাগ্রহণ করল। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে গোরার চোখেও রাজ্যের ঘুম নেমে এল।

পঁয়তাল্লিশ

সমাবেশের খবর কোন কাগজে কীরকম বেরিয়েছে, সেটা খুঁটিয়ে দেখছিল গোরা। মা এসে জিজ্ঞেস করল, 'শরীরটা এখন কেমন লাগছে বাবা?'

মুখ তুলে তাকিয়ে গোরা দেখল, হাতে গরম দুধের গ্লাস। মা এসে দাঁড়িয়েছে বিছানার সামনে। মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিয়া। মা আর প্রিয়া... দুজনেরই চোখমুখ ফোলা। কান্নাকাটি করেছে না কি? এক পলক তাকিয়ে গোরা ঠিক বুঝতে পারল না। কাল রাতে পার্টির ছেলেরা যখন পিপলি থেকে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়, তখন ওর মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। তখন কি প্রিয়া মায়ের সঙ্গে ছিল? না, গোরা মনে করতে পারল না। ধাক্কাধাক্কিতে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সময় ওর কপালটা ঠুকে গেছিল। খানিকটা রক্তপাত হয়। পুলিশের লোকেরাই ওকে সরিয়ে নার্সিং হোমে নিয়ে গেছিল। সামান্য চোটে ডাক্তার এমন ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে যে, মনে হচ্ছে, ওর মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে। ডাক্তার এক্সরে করতেও বলে দিয়েছে।

সত্যি বলতে কী, ব্যান্ডেজের কথা গোরার মনেও ছিল না। মা এসে মনে করিয়ে দিল। ও হেসে বলল, 'আমার কিচ্ছু হয়নি মা। শরীর ঠিক আছে।'

মা গম্ভীর গলায় বলল, 'টুবাইকে আসতে বলেছি। তোকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবে। আজ এক্সরে-টা করে আসবি। আমি কোনও রিস্ক নিতে চাই না।'

'দরকার হবে না মা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, রাতের দিকে যদি বমি টমি হয়, তাহলে একটা এক্সরে করিয়ে নেবেন। বমি তো হয়নি।'

মা রেগে উঠে বলে, 'এই শোন, যা বলছি, তা-ই কর। তোর পার্টি করা... আমি বার করছি। ভেবেছিস বড়ো হয়ে গেছিস... যা ইচ্ছে করবি, তাই না? কাল টিভি-তে খবরটা শোনা ইস্তক আমার শরীরটা ধড়ফড় করছে। প্রিয়া কাছে না থাকলে হয়তো হার্টফেল করতাম। ফের যদি তুই পার্টির নাম করিস, তাহলে আমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব। রাধাগোবিন্দর মন্দিরে মাথা ঠুকে মরব। তোর পার্টির ছেলেরা এ বাড়িতে আসুক... আজই আমি দূরদূর করে তাড়িয়ে দেব। দেখি, তোর কাছে মা বড়ো, না পার্টি? কাকে তুই চাস?'

'মা, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? এটা অ্যাক্সিডেন্ট। তেমন ফ্যাটাল তো কিছু হয়নি। পার্টি না করলেও আমার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত। পার্টির দোষ দিচ্ছ কেন?'

'ও সব... কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। বিশাখা দাসীর স্নেহটাই তুই অ্যাদ্দিন দেখেছিস। জেদটা তো কখনও দেখিসনি। তোর বাবা দেখেছে। আজই তোর পার্টির ফাইল, কাগজপত্তর আমি পুড়িয়ে ফেলব। ... উফ্, কাল সন্ধে থেকে বাড়িতে কী অবস্থা! সন্ধে প্রদীপ পর্যন্ত জ্বালাতে ভুলে গেছি তোর খবর শুনে। যত বড়ো হচ্ছিস, মাকে তত জ্বালাচ্ছিস।'

মায়ের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। সত্যি সত্যিই হয়তো মা রাধাগোবিন্দর মন্দিরে গিয়ে মাথা ঠুকতে বসবে। মা বলল বটে, মায়ের জেদ ও দেখেনি। কিন্তু একবার গোরা দেখেছে। বাবার সঙ্গে কী কারণে ঝগড়া হয়েছিল ও জানে না। মা চার চারটে দিন মুখে কুটোটিও তোলেনি। শেষে বাবা হাতজোড় করে হার স্বীকার করে নেয়। মাকে ঠান্ডা করার জন্যই গোরা বলল, 'মা, পরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। এখন দুধের গ্লাসটা দাও। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দুধের গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মায়ের পিছু পিছু চলে যাওয়ার কথা প্রিয়ার। কিন্তু ও মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে দেখে মনটা নরম হয়ে গেল গোরার। প্রিয়া কি কিছু বলতে চায়? গোরা ঠিকই করে রেখেছে, প্রিয়ার সঙ্গে যেচে কথা বলবে না। এমন মনোভাব দেখাবে না, যাতে মেয়েটার ধারণা হয়, বিয়েতে ওর সম্মতি আছে। সংসারধর্ম পালন করার অনেক লোক আছে জগতে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে... গোরা ফের কাগজের পাতায় নজর দিল। বেশিরভাগ ওড়িয়া কাগজই পিপলির সমাবেশে পুলিশের লাঠিচালানোর খবর ভেতরের পাতায় নিয়েছে। আহত পঁচিশ, হাসপাতালে ভর্তি দশজন। তাঁদের মধ্যে একজন আদিবাসী মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। নেতা হিসাবে আজই একবার ওর পিপলির হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

গুরুতর আহত মহিলাকে দেখে আসা জরুরি। গোরা দেখল, কয়েকটা কাগজে ওর নাম বেরিয়েছে। পুরীর কালেক্টরের সঙ্গে ও কথা বলছে...এরকম একটা ছবি একটা কাগজ ছেপেওছে।

'দুধটা খেয়ে নিন। না হলে শরীরে জোর পাবেন না।'

কথাটা শুনে গোরা মুখ তুলে দেখল, প্রিয়া তখনও দাঁড়িয়ে। দুধ না-খাওয়া পর্যন্ত বোধহয় নড়বে না। টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে ও দুধে চুমুক দিতে লাগল। দুধের সঙ্গে মা বাদাম মিশিয়েছে। ছোটোবেলায় ও দুধ-বাদাম খেতে ভালোবাসত। কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে এসব খাওয়ার পাট ওর উঠে গেছে। দুধে চুমুক দিতে দিতেই জানলা দিয়ে গোরা দেখল, অটো রিকশা থেকে জয়দেব নামছে। ওর সঙ্গে রয়েছে উপাসনাও। ওদের দেখে গোরা দুধের গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে দিল।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নেওয়ার সময় প্রিয়া মৃদু স্বরে বলল, 'মা তো ঠিকই বলছেন। পার্টি না করলেই নয়? বাবা বলছিলেন, গোরার মতো একটা ভালো ছেলে কেন পার্টি পলিটিকস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? ওকে তুই বারণ করিস মা।'

'তুমি বোধহয় চাও না, আমি পলিটিকস্ করি?'

'একদম না। কলেজে দেখেছি, আপনাদের মতো কত ভালো ছেলে, পলিটিক্স করতে গিয়ে কেরিয়ার নষ্ট করে ফেলল।'

প্রিয়াকে এত কথা বলতে গোরা কখনও শোনেনি। মজা করার জন্যই ও বলল, 'আমি যে ভালো ছেলে, তোমায় কে বলল?'

প্রিয়া কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় হইহই করে ঘরে ঢুকে পড়ল জয়দেব আর উপাসনা। গোরাকে বসে কথা বলতে দেখে জয়দেব বলল, 'কাল সন্ধেবেলায় টিভি-তে খবর দেখে আমি ভাবলাম, তোমার মারাত্মক কিছু হয়েছে। তাই উপাসনাকে ফোন করে বললাম, তোমরা কেউ যাবে না কি গোরাকে দেখতে? ওরা রাজি হওয়ায় সক্কালবেলাতেই চলে এলাম।'

'ভালো করেছ। তবু তোমাদের মুখগুলো দেখা গেল। প্রিয়া... তুমি উপাসনাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ততক্ষণ আমি আর জয়দেব কথা বলে নিই।'

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল জয়দেব। তার পর বলল, 'আজকের ইংরেজি কাগজটা দেখেছ?'

গোরা বলল, 'এখনও চোখ বোলানোর টাইম পাইনি ভাই। কেন, স্পেশাল কিছু আছে?'

'আছে। ফ্রন্টপেজ-এ একটা ছবি। তোমাদর পার্টির অল ইন্ডিয়া লিডার কেশবজির ছবি। হরিয়ানায় ওর গলায় এক কোটি টাকার একটা মালা পরিয়ে দিচ্ছে তোমাদের পার্টির কর্মীরা। এসব কী গোরা? তোমরা প্রতিবাদ করবে না? কোনও সুসভ্য দেশে এসব হয়?'

গোরা বলল, 'কালই পুরীর কালেক্টর ভদ্রলোক আমাকে টাকার মালার গল্প করছিলেন। আমার তখন বিশ্বাস হয়নি। সত্যিই ঘটেছে না কি এ ঘটনা? তুমি নিজের চোখে ছবিটা দেখেছ?'

'আলবাত দেখেছি। কাগজ তো তোমাদের পার্টিকে ধুইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তবুও লিডারদের কোনও লজ্জাবোধ নেই। কেশবজি স্টেটমেন্ট দিয়েছে, পার্টির কর্মীরা আমার জন্মদিনে ভালোবেসে টাকার মালা দিয়েছে... সেটা উচ্চবর্ণের মানুষদের সহ্য হচ্ছে না। আমি তো বুঝতে পারি না, এখানে বর্ণ, জাতি আসে কোত্থেকে?'

গৌরা বলল, 'আসল কী জানো, বহু বছরের অবহেলা, অবিচার, অসাম্য দলিতদের এসব ভাবতে শিখিয়েছে। বাজপেয়ীজিকে যখন টাকা দিয়ে মাপা হয়েছিল, তখন কাগজ তো নিন্দে করেনি? কেশবজি দলিত বলেই কি এত সমালোচনা?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি ভাই। তুমি কেশবজিকে কেন সমর্থন করছ, সেটা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাক গে, তুমি অসুস্থ। এখন এসব কথা থাক।'

'আরে ... তুমি এত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন জয়দেব? আমাদের পার্টি সম্পর্কে যদি কারও বিরূপ মনোভাব থাকে, তাহলে সেই ধারণাটা তার কেন হয়েছে, সেটা জানতে চাওয়া কি অন্যায়? আমি তো তোমার কাছে জানতেই চাইছি।'

'বেশ। জানতে চাইছ যখন বলি। দলিত আন্দোলনটা করছ কেন, এককথায় বলো তো?'

'এটা এককথায় বলে বোঝানো যাবে না। তবুও বলছি, দলিতরাও যাতে সমাজের অন্যদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে উঠে আসতে পারে, তার জন্য।'

'তাই যদি হয়, তাহলে প্রথমে তাদের অশিক্ষা দূর করার কথাই... কি তোমাদের ভাবা উচিত নয়? আমার তো মনে হয়, একমাত্র লেখাপড়া শিখেই তারা এক পঙ্‌ক্তিতে উঠে আসতে পারে। কে বারণ করেছে?'

'সুযোগটা কোথায় বলো। ওরা সব দিক থেকে এত পিছিয়ে পড়েছে যে, শিক্ষা কখনও ওদের কাছে প্রায়োরিটি হতে পারে না। আরে... নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়, মাথার ওপর যাদের ছাদ নেই, পানীয় জল আনার জন্য যাদের রোজ তিন মাইল হাঁটাহাঁটি করতে হয়, অসুস্থ হলে যারা চিকিৎসার সুযোগ পায় না, তাদের আগে লেখাপড়া শিখতে বলা হাস্যকর।'

'কিন্তু গোরা, দেশে এমন একটা বিরাট অংশের মানুষও আছেন, যারা দলিত বা পিছড়ে বর্গ নন, অথচ তারাও বিলো পোভার্টি লেভেল-এ বসবাস করেন। তাঁরাও তো দলিতদের পঙ্‌ক্তিতে বিলং করেন। আমার মনে হয়, প্রশ্নটা দলিত বা অদলিত নয়, পিছিয়ে পড়া সব মানুষের জন্য ভাবা দরকার। আলাদা করে দলিতদের নিয়ে আন্দোলনের পিছনে কোনও সারবত্তা আছে বলে আমার মনে হয় না। এর ফলে কী হচ্ছে জানো, কিছু মতলবী লোক করে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।'

'মতলবী মানুষ কোন পার্টিতে নেই বলো তো? ক্ষমতায় থাকলে সব পার্টির লোকই মাথায় চড়ে। এই যে এত স্ক্যাম হচ্ছে... দেখতে পাচ্ছ না?'

'কিছু মনে কোরো না গোরা, দলিতরা যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলেও স্ক্যাম হবে। দুর্নীতি আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে গেছে। এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। মায়াবতীকে

দেখছ না। চক্ষুলজ্জার কোনও বালাই নেই। দেখো ভাই, আমি স্বামী বিবেকানন্দের শহরের ছেলে। কোনও ইজ্‌ম্‌-এ বিশ্বাস করি না। স্বামীজির পথকে আমি সঠিক বলে মনে করি। জীবে প্রেম করে যে-ই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। প্রতিবেশীকে ভালোবাস, তাহলেই হবে। এই যে উপাসনাদের বাড়িতে একটা আদিবাসী মেয়ে থাকে, তাকে তুমি দেখেছ... লেখাপড়া শেখার জন্য সে যে কত এনলাইটেনড... তুমি ভাবতেও পারবে না। নবেন্দু ওকে ডাক্তারি পড়ানোর কথা ভাবছে। নবেন্দু কিন্তু কোনও ক্ষমতা অর্জনের লোভে ওই মেয়েটার উন্নতির কথা ভাবছে না। অথচ দেখো, ওকে উন্নতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।'

'নবেন্দু যা করছে, সত্যিই প্রশংসার করার মতো। কিন্তু এক বা দুজনকে ঠেলে দিলেই তো হবে না। সার্বিকভাবে দলিতদের উন্নতি করা... একা নবেন্দুর পক্ষে সম্ভব না। সেজন্য পলিটিক্যাল পার্টির দরকার। সরকারের মধ্যে থাকা দরকার।'

'তোমার কবে মোহভঙ্গ হবে, জানি না। মনে হচ্ছে, তোমাকে একবার পুরীতে... অবধূত গোস্বামীজির কাছে নিয়ে যেতে হবে। গোস্বামীজি এত সুন্দর কথা বলেন, দেখবে তোমার ভুল ভেঙে যাবে।'

'কবে নিয়ে যাবে বলো। আমি রাজি। ভালো কথা, পুরীতে তুমি যাচ্ছ কবে?'

'আরে আমার তো আজই যাওয়ার কথা ছিল। সুশোভনদা কাল আমায় ফোন করেছিলেন। আর্জেন্ট তলব করেছেন। কিন্তু আজ যেতে পারলাম না, তোমার খবরটা টিভিতে দেখে। তুমি কি কাল আমার সঙ্গে পুরীতে যেতে পারবে? নবেন্দু ওর গাড়িতে নিয়ে যাবে।'

'আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু মা আমায় যেতে দেবে কি না, সন্দেহ। এই... তুমি আসার আগে আমার পার্টি করা নিয়ে... আমার সঙ্গে মা একপ্রস্থ রাগারাগি করে গেছে। এখন পুরীর কথা বললে ভাববে, ছলছুতো করে আমি পার্টির কাজেই যেতে চাইছি।'

'না না, আমি তোমাকে শুধু শুধু যেতে বলছি না। আসলে... নবেন্দু সেই সাইকিয়াটিস্ট ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছে। আগামীকাল বিকেল চারটের সময়। তোমার কেসটা শুনে উনি ভীষণ এক্সাইটেড। উনি নাকি এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। তুমি যদি পুরীতে যেতে না পারো, তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করতে হবে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো আমাকে যেতে হয়। আমাকে জানতেই হবে.. এই যে মাঝে মাঝে অজানা জগতে চলে যাচ্ছি, অতীত ঘটনা দেখতে পাচ্ছি, সেটা কোনও রোগ কিনা। ইদানীং ঘন ঘন হচ্ছে, জানো? ইন ফ্যাক্ট, কাল মাথায় চোট পেতাম না, যদি না ঘোরের মধ্যে চলে যেতাম। কাল চোখের সামনে কী দেখলাম, শুনবে? আমার বয়সি, আমার মতোই দেখতে একটা ছেলে। পুরী থেকে তাকে চলে যেতে বলছেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। কারণ পুরীতে থাকলে সে না কি রাজরোষে পড়বে। আর এই দৃশ্যটা দেখলাম কখন, জানো? পুরীর কালেক্টর ভদ্রলোক যখন পিপলিতে আমাকে আটকালেন, তার মিনিট কয়েক পর। দুটো ঘটনার মধ্যে কী আশ্চর্য মিল, দেখো। বুঝতে পারছি না, এই ছেলেটাকেই

বারবার আমি দেখছি কেন? আমি কি তাহলে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখি? ডাক্তারের কাছে আমি সেটাই জানতে চাইব।'

জয়দেব বলল, 'আমি এক্সপার্ট নই। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, এই অতীত ঘটনাগুলোর সঙ্গে তোমার পূর্বজন্মের কোনও সম্পর্ক আছে। এক কাজ করো না, তোমার মাকে বলো, জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য তোমার মন ছটফট করছে। জগন্নাথ তোমায় টানছেন। উনি না টানলে না কি শ্রীক্ষেত্রে কারও যাওয়া হয় না। দেখো, এভাবে যদি বলো, তোমার মা না তো করতে পারবেনই না।'

শুনে গোরা হাসতে শুরু করল। তার পর বলল, 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু একটাই প্রবলেম, মা তাহলে সঙ্গে যেতে চাইবে।'

'নিয়ে চলো না। দু'একটা দিন মাকে নিয়ে পুরীতে থেকে আসবে। কতদিন যাওনি ওদিকে?'

'বছর তিনেক তো বটেই। কী ভেবেছিলাম জানো, পুরীতে পার্টির সমাবেশ সাকসেসফুল হলে... একটা দিন ওখানে কাটিয়ে আসব। ওখানে থাকার অসুবিধে নেই। আমাদের পার্টির এক কর্মীর বিরাট হোটেল আছে ওখানে। মাকে নিয়ে গেলে... সে মাথায় করে রাখবে। চলো, তাহলে একটা অ্যাটেম্পট নেওয়া যাক। মা বোধহয় রসুই ঘরে আছে।'

কথাগুলো বলেই গোরা বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। শরীরটা বেশ চনমন করছে। জয়দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য ওর চোখে পড়ল। নাটমন্দিরের সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে মা চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। বাড়ির কাজের লোকেরা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বকুনি শুনছে। সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে একটা লোক কাত হয়ে শুয়ে। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। বোধহয় মারধর খেয়েছে। লোকটা ওর থেকে দু'তিন বছরের বড়ো হবে। মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। মায়ের কথা শুনে গোরা বুঝতে পারল, কাল জগন্নাথের মকরবেশের জন্য নাটমন্দিরের ভেতরটা খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। সকালে সে সব খুলে নেওয়ার জন্য এই লোকটা বাড়িতে ঢোকে। তখন বলেছিল, ও ডেকরেটরের লোক। কিন্তু হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। শেষে মা ওকে আবিষ্কার করে মায়ের ঘরে। সবাই নিশ্চিত, লোকটা বাড়ি ঢুকেছিল, চুরি করার মতলব নিয়ে।

চোর... কথাটা শুনেই দশ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল গোরার। দলিত সম্প্রদায়ের একটা ছেলেকে চোর অপবাদ দিয়ে সেদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল বাজারের ব্যাপারিরা। পরে জানা যায়, ছেলেটা চুরি করেনি। সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই গোরা দ্রুত পায়ে নাটমন্দিরের দিকে নেমে গেল। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। কাছে গিয়ে গোরা প্রথমেই হাতের বাঁধন খুলে দিল। তার পর লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ও চমকে উঠল। এ সেই ট্রেনের লোকটা না? এ লোকটা তো ট্রেনে ওর ঠিক ওপরের বার্থেই ছিল!

ছেচল্লিশ

চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটু আগে পুরন্দর অপলক দৃষ্টিতে ওর মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। ওর গর্ভধারিণী মা....যিনি এই পৃথিবীতে ওকে এনেছেন। মাকে দেখেই ওর চোখের কোণে জল এসে গেছিল। বাড়ির কাজের লোকগুলো যখন ওকে মারছিল, তখন বাধা দেওয়ার কথা মনেই হয়নি পুরন্দরের। এমনিতে ওর গায়ে অমানুষিক শক্তি। ইচ্ছে করলে কাজের লোকগুলোকে একাই ও ছুঁড়ে ফেলতে পারত। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে ওর মা জননী। তাঁর সামনে ও পেশি শক্তি দেখাবে কী করে? মা তো তাহলে মারাত্মক ভয় পেয়ে যাবে!

সকালবেলায় পুরী থেকে যখন পুরন্দর ভুবনেশ্বরে পৌঁছয়, তখন ভাবতেও পারেনি এত সহজে মায়ের দেখা ও পেয়ে যাবে। বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা অটো রিকশা নিয়ে ও ইউনিক টু-তে আসে। বাজারের সামনে ভোই স্টেশনারি দোকানটা খুঁজে পেতেও ওর অসুবিধে হয়নি। দোকানে দাঁড়িয়ে সময় কাটানোর জন্য ও সফট ড্রিঙ্কসের বোতল কিনে, দোকানের মালিকের সঙ্গে আলাপ জমাতে থাকে। লোকটাকে সহজ সরল বলেই মনে হওয়ার পর পুরন্দর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, বিশাখা দাসী বলে কাউকে ও চেনে কি না? দোকানদার লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলে, বিলক্ষণ চেনে। উলটোদিকের বাড়িতেই মা থাকেন। পুরন্দর তখন বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। একতলা বাড়ি, বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে। সামনে বাগানের মতো আছে। বাড়ি ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে আছে মন্দিরের চুড়ো।

দোকানদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছিল, মা খুব ভালো। পুজো-আচ্চা, দান-ধ্যান করেন। কেউ কোনও প্রার্থনা করলে, কখনও ফিরিয়ে দেন না। মায়ের এক ছেলে। সেও দেবতুল্য মানুষ। কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করে। খদ্দের সামলানোর ফাঁকে দোকানদার লোকটা কথা বলেই যাচ্ছিল। পুরন্দর যতটুকু খবর আশা করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি পেয়ে যায়। লোকটা শেষে পরামর্শ দিয়েছিল এই বলে.....মায়ের কাছে যদি কিছু চাওয়ার জন্য এসে থাকো, তাহলে এটাই সেরা সময়। সকালে মা কাউকে বিমুখ করেন না। বাড়ির মেন গেট দিয়ে ঢোকার দরকার নেই। ওই দেখ, মন্দিরে যাওয়ার একটা আলাদা গেট আছে। সোজা ভেতরে চলে যাও। মাকে এখন মন্দিরেই পাবে।

পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পুরন্দর অবাক হয়ে গেছিল। ভেতরে অনেকটা জায়গা জুড়ে নাটমন্দির। তার মানে মাঝে মাঝেই প্রচুর লোকসমাগম হয় মন্দিরে। দু'একদিনের মধ্যে বোধহয় মন্দিরে কোনও অনুষ্ঠান ছিল। চাঁদোয়া টাঙানো রয়েছে। চৌকির ওপর হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ আর কিছু করতাল পড়ে রয়েছে। আশপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে পুরন্দর চৌকির ওপর বসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, জন্ম দেওয়ার পর মা যদি ওকে পুরী থেকে নিয়ে আসত, তাহলে হয়তো ও এই বাড়িতেই মানুষ হত। ভাগ্যের কী পরিহাস, তার বদলে সারাটা জীবন ওকে কাটাতে হল পূতিগন্ধময় এক নারকীয় পরিবেশে! একের পর এক পাপ করতে হল পূজ্যপাদদের আদেশে।

'তুমি ডেকরেটরের লোক না কি বাছা?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠেছিল পুরন্দর। সামনেই মাতৃময়ী এক নারী। পরনে গরদের শাড়ি। হাতে পুজোর ডালা। মন্দিরের সিঁড়িতে ওঠার মুখে উনি থমকে দাঁড়িয়েছেন। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। ইনি ওর মা নাকি? বেলি নানী বলেছিলেন, ওর মাহেরি মা ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী। সামনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর দিক থেকেও চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। সাক্ষাৎ প্রতিমার মতো। দেখে আনন্দে চোখে জল এসে গেছিল পুরন্দরের। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা মা বলে ডেকে উঠতে চাইছিল। কিন্তু সেই সময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন আরও দু'তিনজন মহিলা। পুরন্দর তখন ধন্ধে পড়ে গেছিল। না, তাড়াহুড়ো করে কাউকে মা বলে ডাকা ঠিক হবে না।

'এই দেখো, কথা কয় না। বাছা, তোমায় কি নবীন ডেকরেটর পাঠিয়েছে? তাহলে চাঁদোয়াটা এখনই খুলে নাও। আর শোনো, যাওয়ার আগে নাটমন্দিরটা পরিষ্কার করে দিয়ো।'

পুরন্দর সত্যি কথাটাই বলতে চেয়েছিল, না ডেকরেটর ওকে পাঠায়নি। কিন্তু কথা বলতে গিয়েই তখন বুঝতে পারে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ বললে, আরও কিছু সময় এ বাড়িতে কাটানো যাবে। তাই ও সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়েছিল। ওকে ঘাড় নাড়তে দেখে মন্দিরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন মহিলারা। দেখে পুরন্দরও সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেছিল। নাটমন্দিরের উঠোন ও দ্রুত ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। তখনই ওর চোখে পড়ে, বারান্দার এক পাশে একটা মই শোয়ানো রয়েছে। সেটা দেখতে পেয়ে ও বারান্দায় উঠেছিল। মই বেয়ে না-উঠলে চাঁদোয়াটা খোলা যাবে না। মই আনতে গিয়েই....ডানদিকের ঘরের দিকে তাকিয়ে....হঠাৎ পুরন্দরের চোখ আটকে গেছিল।

দেওয়াল জুড়ে একটা ছবি। নর্তকীর বেশে সেই নারী, একটু আগে যিনি কথা বলছিলেন ওর সঙ্গে। ছবিটা দেখেই পুরন্দর নিশ্চিত হয়ে গেছিল, ইনিই ওর বিশাখা মা। ছবিটা ও খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। হ্যাঁ, এই তো জগন্নাথ মন্দিরের নাটমন্দির। লম্বা লম্বা পঞ্চপ্রদীপ। শিবমন্দিরের খিলান। ছবিটা রাতের বেলায় তোলা। মায়ের মুখে প্রদীপের নরম আলো, স্মিত হাসি। মাকে দেখে মনে হচ্ছে, স্বর্গ থেকে নেমে আসার কোনও পরী। ছবিটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার। তবুও ফিকে হয়ে যায়নি। ছবি দেখে, পুরন্দর নিশ্চিত হয়ে গেছিল, এটা ওর মায়েরই ঘর।

'কী হল বাছা, তুমি এখানে? তোমার মতলব তো ভালো নয়।'

পুরন্দর জবাব দেওয়ার আগেই একজন কাজের লোক ছুটে এসেছিল, 'কী হয়েছে মা? কে এই লোকটা? কেন আপনার ঘরে ঢুকেছে?'

'জানি না বাছা। এসে বলল, ডেকরেটরের লোক। তাই কাজে নামিয়ে দিলাম। হঠাৎ দেখি, নবীন ডেকরেটর অন্য একজনকে পাঠিয়েছে।'

'মতলব তো একটাই মা। চুরি। এই ব্যাটা চল, দেখি পকেটে কী পুরেছিস।'

কাজের লোকটা হিড়হিড় করে পুরন্দরকে টেনে নিয়ে গেছিল নাটমন্দিরের উঠোনে।

অন্য মহিলারাও ওকে দেখে.....এসে দাঁড়িয়েছেন মন্দিরের সিঁড়িতে। পুরন্দরের তখনই খেয়াল হয়েছিল, ওর পকেটে কাপড়ের পুঁটলিতে রয়েছে, বেলি নানীর দেওয়া চন্দ্রহার। মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। না, ওই চন্দ্রহার ও কাউকে দেখাবে না। কথাটা মনে হতেই পকেট আঁকড়ে ধরেছিল ও। মার খাওয়ার অভ্যেস পুরন্দরের আছে। ছোটোবেলা থেকে সামান্য কারণে ও মার খেয়েই যাচ্ছে। অত মার সত্ত্বেও, ওকে বিচলিত হতে না দেখে কাজের লোকটা বেদম হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'মা, এ দাগী চোর। এত মারলাম, তবুও দেখুন, কেমন সহ্য করে যাচ্ছে!'

মা বলেছিল, 'থাক, আর মারিস না বাছা। গোরাকে খবর দে। ও এসে যা করার, করুক।'

কাত হয়ে উঠোনেই পড়েছিল পুরন্দর। ওর হাত দু'টো দড়ি দিয়ে বাঁধা। সাদা জামায় রক্তের লাল দাগ। চেতনা হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে ও উঠোনের নিচে....ধরিত্রীর অভ্যন্তর থেকে ধুপ ধুপ শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা কীসের, সেটা বোঝার জন্য ও মেঝেতে কান ঠেসে ধরল। কোদাল চালানোর শব্দ, না কি গাঁইতি? চোখের সামনে ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না পুরন্দর। কিন্তু অন্ধকারকে ও অনেক দিন আগেই জয় করেছে। অন্ধকারের মধ্যেও সবকিছু দেখতে পায়। একটু পরেই পুরন্দর দেখল, গভীর এক সুড়ঙ্গের মাঝে ও দাঁড়িয়ে আছে। গরমে দরদর করে ঘামছে। ওর হাতে একটা বড়ো সাইজের গাঁইতি। সুড়ঙ্গের দেওয়ালে ও ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে। লুকিয়ে থাকার জন্য এখনই ওর একটা আস্তানা চাই। সেই আস্তানাটাই ও খুঁজছে।

.....কতক্ষণ পর কে জানে, পুরন্দর টের পেল, কে যেন ওর হাতের বাঁধনটা খুলে দিচ্ছে। কে যেন নরম গলায় বলছে, 'ইস, এভাবে কেউ কাউকে মারে?'

চোখ খুলে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল পুরন্দর। কে এই করুণাময়? কার গলায় এমন দরদ? কে এত অনুতপ্ত, ওর মতো তুচ্ছ একটা লোকের জন্য? চোখের পাতা ভারী হয়ে গিয়েছে। চোখ খোলার চেষ্টা করেও খুলতে পারেনি তখন পুরন্দর। তবে অনুভব করেছিল, কার লম্বা দু'টো হাত যেন ওকে উঠোন থেকে.....অবলীলায় তুলে নিচ্ছে। কার হাতের জাদু স্পর্শে পাঁজরের কাছে ব্যথাটা উবে যাচ্ছে। লম্বা ওই দু'টো হাতের ওপরই নিজেকে সমর্পণ করল পুরন্দর। হঠাৎই ওর প্রবল তেষ্টা পেল। কোনওরকমে ও বলতে পারল, 'জল। জল।'

একটু পরেই নরম গদীতে কে যেন ওকে শুইয়ে দিল। চোখ মুখে জলের ঝাপটাও। কে একজন বলল, 'জল খাও, জল।' কয়েক ঢোঁক জল পেটে যাওয়ার পর পুরন্দরের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। ওর মুখের সামনে ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। খুব চেনা....আরে এ তো ট্রেনের সেই ছেলেটা! যার কাছাকাছি গেলে ওর শরীরে আগুনের ছ্যাঁকার মতো গরম লাগছিল সেদিন। কই, এখন তো সেই অনুভূতিটা হচ্ছে না? কিন্তু ছেলেটাই বা এ বাড়িতে কেন? ভোই স্টেশনারির মালিক একটু আগে বলছিল, বিশাখা দাসীর ছেলে কলকাতায় পড়াশুনো করে। দেবতুল্য মানুষ। দেবতুল্যই বটে! সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের

মতো একটা কথা....পুরন্দরের মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। তাহলে এই ছেলেটাই কি বিশাখা দাসীর সেই ছেলে? মানে....ওর সৎভাই?

চোখ সরিয়ে পুরন্দর দেখল, মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। ধড়মড় করে ও উঠে বসল। ট্রেনে দেখা হওয়া ছেলেটা বলল, 'এই.....তুমি শুয়ে থাকো। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

ডাক্তারবাবু! কথাটা কানে যাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে মন চাইল না পুরন্দরের। ওর এই পঁচিশ বছরের জীবনে কেউ ওর জন্য ডাক্তার ডেকে আনেনি। এ তো অদ্ভুত বাড়ি। চোর বদনাম দিয়ে অত মারধর করার পর ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা করাচ্ছে! তাতে অবশ্য পুরন্দরের কোনও অসুবিধে নেই। মায়ের বাড়িতে যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণই মঙ্গল। শুধু মা নন, এ বাড়ির ছেলেটাও ভালো মনের। ওর নাম জানার ভীষণ কৌতূহল হল পুরন্দরের। এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে.....ভোই স্টেশনারির মালিককে ও নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে। অসুস্থতার ভান করার আগে পুরন্দর ওর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ঘরে জয়দেবকে দেখে ও চমকে উঠল। জয়দেবের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেনে দেখা অবিবাহিত সেই মেয়েটা। ওদের উলটো দিকে সোফায় বসে বিশাখা মা এবং আরেকটা মেয়ে।

'তুমি কে ভাই, কোত্থেকে এসেছ?'

পুরন্দর সত্যি কথাই বলল, 'পুরী থেকে।' সুদর্শন ছেলেটার মধ্যে কিছু একটা আছে। একে বিশ্বাস করা যায়। এর সামনে মিথ্যে কথা বলা যায় না।

'তোমাকে দেখে তো চোর বলে মনে হয় না। মায়ের ঘরে ঢুকেছিলে কেন?'

'ছবি দেখতে। ওই ঘরে একজন মাহেরির ছবি আছে....'

'হ্যাঁ, আমার মা। ওই যে উনি সোফায় বসে। উনিও কিন্তু পুরীর মেয়ে। মায়ের ওই ছবিটা কি তুমি আগে অন্য কোথাও দেখেছ?'

পুরন্দর ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, না, আগে কখনো দেখেনি। উত্তরটা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এই সময় জয়দেব বলল, 'গোরা, ওকে জিজ্ঞেস করো তো, দিন দশেক আগে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিল কি না? ওকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

কথাটা শুনেই পুরন্দর দ্বিতীয়বার চমকে উঠল। আরে....জয়দেব ওকে চিনে ফেলল না কি? মুশকিল, গোরা বলে ছেলেটার সামনে...ওর মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরোবে না। তাই উত্তর না দিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ পাঁজর টিপে ধরে....পুরন্দর উঃ আঃ করতে লাগল। আগে যে ক'বার ও জয়দেবকে দেখেছে, রাগে ওর শরীর চিড়বিড় করে উঠেছে। আশ্চর্যের কথা, আজ কিন্তু ওর সেই অনুভূতিটা হল না। বুকটা গুরগুর করে উঠল পুরন্দরের। ও কি মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? পাতাল ঘরের চাতালে শুয়ে সেই রাত্তিরে ও তিনটে শপথ নিয়েছিল। তার একটা আজ পূরণ করেছে। বাকি রয়েছে জয়দেব আর পাপী পদ্মনাভকে খুন করা। দুর্বল হয়ে পড়লে ও খুন করবে কী করে? ওর যে হাত কেঁপে যাবে। এই কথাটা ভাবতেই ভয় হল পুরন্দরের।

দ্রুত এসব চিন্তা করার ফাঁকেই পুরন্দর শুনতে পেল, বিশাখা মা বলছে, 'থাক গোরা, ওর সঙ্গে আর কথা বলিস না। প্রিয়াকে দিয়ে গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুক।'

কথাটা শুনে চোখ বন্ধ করল পুরন্দর। সকালে বাসে করে আসার সময় ও অনেক ভেবেছে। মায়ের দেখা হলে নিজের পরিচয়টা দেবে কি না। দিলে কীভাবেই বা দেবে? ও যে মায়ের জারজ সন্তান। মায়ের পক্ষে কি এই সম্পর্কটা এখন স্বীকার করা সম্ভব? পুরন্দর একবার ভেবেছিল, চন্দ্রহারটা দেখিয়েই ও মায়ের পা দু'টো জড়িয়ে ধরবে। পরক্ষণেই মন থেকে ও উড়িয়ে দিয়েছে সেই চিন্তা। না না, মাকে ও শুধু একবার ও নিজের চোখে দেখবে। তারপর পালিয়ে আসবে। এ বাড়িতে কী কুক্ষণেই যে পুরন্দর মায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিল! না-ঢুকলে ও ধরাই পড়ত না।

ক'টা বাজে এখন কে জানে? শুয়ে শুয়ে পুরন্দর আন্দাজ করার চেষ্টা করল। এ বাড়িতে ও ঢুকেছিল সকাল প্রায় ন'টার সময়। মাঝে ঘণ্টা দুয়েক নিশ্চয়ই কেটে গেছে। তার মানে এখন বেলা এগারোটা। এতক্ষণে বিষ্ণু মন্দিরে মাহেরি আর মাদেলিদের অন্দর মহলে হইচই হয়ে গেছে। পুরন্দর জানে, মন্দাকিনীর উধাও হয়ে যাওয়াটা পূজ্যপাদ পদ্মনাভ সহজভাবে নেবেন না। হেড কোয়ার্টার্স থেকে ওঁর সব অনুচরকে উনি নামিয়ে দেবেন। এর মধ্যে বেলি নানী যদি ভয়ের চোটে ওর নামটা করে ফেলে....তাহলে তো কথাই নেই। কেউ-না-কেউ ওকে খুঁজে বের করবেন। পূজ্যপাদ পদ্মনাভ তখন ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবেন।

পুরন্দর নিশ্চিত, অচেতন মন্দাকিনীকে পাতাল ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কেউ দেখে ফেলেনি। মন্দাকিনীকে ও যেভাবে খিলানের ওপর রেখে এসেছে, সেখান থেকে ওর উদ্ধার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাতাল ঘরের ওই দুর্গম জায়গায় যেতে কেউ সাহসই পাবে না। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওপর থেকে......বাঁচার আশায় যদি মন্দাকিনী নিচে গড়িয়েও পড়ে, তাহলেও ও বাঁচবে না। গর্ত থেকে বেরিয়ে ধেড়ে ইঁদুরগুলো ওকে খুবলে খাবে। একটা কথা ভেবে, পুরন্দরের আফসোস হতে লাগল। খিলানের বাইরে দিকের দেওয়ালে বড়ো বড়ো দুটো ভীমরুলের চাক আছে। ভুবনেশ্বরে আসার আগে, সেই চাক দুটো খুঁচিয়ে দিয়ে এলে ও ভালো করত। কয়েক হাজার ভীমরুল বাস করে ওই দুটো চাকে। মন্দাকিনীর মাখনের মতো দেহটাকে কামড়ে.....ওরা তাহলে এতক্ষণে দ্বিগুণ করে দিত।

কাল সারা রাত ওর ঘুম হয়নি। পাখার হাওয়া, পেটে গরম দুধ, বিধ্বস্ত শরীর। সত্যি সত্যিই একটা সময় পুরন্দরের চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও স্বপ্ন দেখল। বেলি নানীর ঘরে মন্দাকিনীর সঙ্গে ও সহবাস করছে। একবার, দু'বার, তিনবার.....ওর বীর্যপাত হয়ে গেল। তবুও মন্দাকিনীর আশ মেটে না। নেতিয়ে পড়া ওর লিঙ্গটা নিয়ে মন্দাকিনী খেলা করছে। ওর যৌনক্ষমতা নিয়ে বিদ্রুপ করছে। সহ্য করতে না পেরে

পুরন্দর একটা সময় মন্দাকিনীর গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে ও দেখল, ঘরে কেউ নেই।

পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এল পুরন্দর। কড়া রোদে ওর চোখ ঝলসে যাচ্ছে। বাইরে দালানটা নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বোধহয় সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। আন্দাজ করে মায়ের ঘরের দিকে এগোতে লাগল পুরন্দর। যা ভেবেছিল, তাই। পালঙ্কে শুয়ে আছেন বিশাখা মা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃশব্দে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ল ও। পকেট থেকে কাপড়ের পুঁটলিটা বের করে এনে....ও মায়ের পায়ের কাছে রেখে দিল। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পুরন্দর যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন শুনল, 'এই দাঁড়া, প্যালিয়ে যাচ্ছিস কোথায়? দেখি, তুই কী রেখে গেলি?'

পুরন্দরের পা দুটো কে যেন স্ক্রু দিয়ে আটকে দিল। মা পুঁটলি খুলে চন্দ্রহার বের করেছেন। বিস্ফারিত চোখে হারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মায়ের মুখের রং ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। যেন চোখ ফেটে এখুনি জল বেরিয়ে আসবে। উদ্‌গত কান্না রোধ করে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে দিল তোকে এই হার?'

পুরন্দর বলল, 'বেলি নানী।'

'বেলি....বেলি দিয়েছে তোকে এই চন্দ্রহার!' বিছানা থেকে দ্রুত নেমে এলেন মা। তারপর সামনে এসে দাঁড়িয়ে অমোঘ প্রশ্নটি করলেন, 'সত্যি করে বল তো বাছা, তুই কে?'

সাতচল্লিশ

নরেশ জেনা বলে ভদ্রলোক যে নবেন্দুদের বাড়ির একতলায় থাকেন, সেটা জেনে খুব অবাক হয়েছিল উপাসনা। ভদ্রলোকের বয়স নাকি সত্তরের কাছাকাছি। আবাসনের লোকজনের সঙ্গে খুব কম মেশামেশি করেন। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দু বলেছিল, 'আরে, এ তো একতলার সেই খ্যাপাটে বুড়ো। যাঁর সঙ্গে আমার একবার ঝামেলা হয়েছিল।'

ভদ্রলোক খ্যাপাটে শুনেই উৎসাহ কমে গেছিল উপাসনার, তার ওপর আবার নবেন্দুর সঙ্গে ঝগড়া! ওঁর সঙ্গে গেলে হয়তো নরেশ জেনা পাত্তাই দেবেন না। উপাসনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কেন?'

নবেন্দু কিছু বলার আগেই স্বাতী বলল, 'আর বলিস না। নেড়ি কুকুর নিয়ে ঝামেলা। একটা সময় ভদ্রলোক হঠাৎ কোত্থেকে যেন একগাদা নেড়ি কুকুর জোগাড় করে নিয়ে এলেন। সকাল-বিকেল রোজ ওদের খেতে দেন। খাবারের ভলিউম শুনবি? এবেলা ওবেলা এক কিলো করে চাল-ডালের খিঁচুড়ি। নিজের বাচ্চাকে লোকে যেভাবে খাওয়ায়, ভদ্রলোক সেইভাবে খিঁচুড়ি দলা করে....কুকুরের মুখে তুলে দিতেন। খেতে পেয়ে দশ-বারোটা কুকুর রোজ গেটের সামনে, সিঁড়িতে শুয়ে থাকতে শুরু করল। আমাদের কী অসুবিধে ভাব।

যদি কামড়ে দেয়? একদিন তো ভোরবেলায় এক কাগজের হকারকে কামড়েই দিয়েছিল।'

নবেন্দু বলল, 'একদিন বলতে গেলাম, আপনি এসব কী করছেন? কুকুরদের যদি খাওয়াতেই হয়, পার্কে নিয়ে গিয়ে খাওয়ান। বাড়ির সামনে কেন? উনি বললেন, আহা....ওরাও তো কৃষ্ণের জীব। না খেতে পেয়ে ওদের চেহারাগুলো কী হয়েছে, দেখেছেন? তখনই বুঝলাম, মাথায় গন্ডগোল হয়েছে। একদিন একটা এনজিও-কে খবর দিলাম....কুকুরগুলোকে ধরে নিয়ে যান। ওরা যেদিন ধরতে আসবে, সেদিন সকালে ভদ্রলোক কীভাবে যেন খবরটা পেয়ে গেছিলেন। নিজের গাড়িতে কুকুরগুলোকে তুলে নিয়ে.....কোথায় যেন রেখে এলেন। ফিরে এসেই চেঁচামেচি। সেই সঙ্গে বাঙালিদের গালাগাল। শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। আমিও হাউসিংয়ের লোকজন ডেকে....ওঁকে টেনে বের করেছিলাম। শেষে থানা পুলিশ। পরে অবশ্য ওঁর স্ত্রী আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে যান।'

উপাসনা মজা পেল কথাগুলো শুনে, 'বাব্বা, সামান্য কুকুর নিয়ে এত ঘটনা?'

নবেন্দু বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলেকে তোমার কি দরকার বলো তো?'

উপাসনা জিজ্ঞেস করল, 'তার আগে বলো, নরেশ জেনা কি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন?'

'মনে হয়। তবে আমি কনফার্মড নই। জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি হাউসিংয়ের সেক্রেটারিকে।'

'আমি আর জয় সেদিন যে ভদ্রলোকের কাছে গেছিলাম, মানে....তোমার দশরথবাবু আমাদের যাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন....সেই বিরাজ মাহান্তির আত্মীয় এই নরেশ জেনা। মাহান্তি বললেন, জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর থেকে যে কঙ্কালটা পাওয়া গেছিল, উনি না কি তার ফরেন্সিক পরীক্ষা করেছিলেন। একমাত্র নরেশ জেনাই বলতে পারবেন, ওই কঙ্কাল সম্পর্কে ডিটেল....।'

'তাহলে এক কাজ করো উপা। বিরাজ মাহান্তির রেফারেন্সেই তুমি ওর কাছে যাও। লোকটার আলুর দোষ আছে। তোমার মতো সুন্দরীর প্রশ্রয় পেলে, প্রাণের কথা বলে দেবে। খবরদার, তোমার জয় সোনামণিকে আবার সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না যেন। কেস কেচে যাবে।'

শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল উপাসনা। নবেন্দুর সেন্স অব হিউমার অসাধারণ। সত্যি, খুব ভালো আছে স্বাতী আর নবেন্দু। যেমন দেবা, তেমনই দেবী। মুখে কোনও রাখঢাক নেই। সব সময় আনন্দের মধ্যে আছে। একটা সময় হাসি থামিয়ে উপাসনা বলল, 'তোমাকে কে বলেছে, জয়দেব আমার সোনামণি?'

'আরে....ওসব বলতে হয় না কি। দেখেই বোঝা যায়। আমাদের সামনে কি আর তুমি জয়কে সোনামণি বলবে? বা ও তোমাকে উপা সোনামণি? প্রেমের এই স্টেজে সবাই সোনামণি। এই স্টেজে স্বাতী তো আমায় নবুসোনামণি বলে ডাকত।'

'ঠাট্টা রাখো, নরেশ জেনাকে কীভাবে পটানো যায় বলো তো?'

স্বাতী বলল, 'লোকটা এমনি কিন্তু খারাপ না। ওঁর স্ত্রী যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, সেদিন দুঃখ করে বললেন, ভদ্রলোক না কি আগে এমন ছিলেন না। একদিন অফিস

থেকে এসে ধুম জ্বরে পড়েন। ডাক্তার-পথ্যি করে সেই জ্বর যখন সারল, তারপর থেকেই না কি উনি অমনধারা হয়ে গেছেন। শুনলে তোর হাসি পাবে। উনি না কি, বাড়িতে কখনো কখনো হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলে....নিজের মনেই নাচেন। রোজ ঠাকুরঘরেই না কি দু'আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। দিনে তিন-চার বার চান করেন। ডাক্তার না কি বলেছে, এ রোগ সারবে না।'

'তাহলে তো ওঁর কাছে গিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'দাঁড়া, এক কাজ করি। আগে ভদ্রমহিলাকে পটাই। ওকে ধরে পরে ভদ্রলোকের কাছে যাব।' প্ল্যান অনুযায়ী, স্বাতী দুপুরেই ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনল। কলকাতা থেকে আনা...কাঁথা স্টিচ শাড়ি দেখানোর নাম করে। পটানোর জন্য স্বাতী দেড় হাজার টাকার শাড়ির দাম আটশো টাকা বলল। পাঁচ হাজার টাকা দামের শাড়ি দু'হাজার টাকা। উপাসনার ভয় করতে লাগল। ভদ্রমহিলা যদি কোনও শাড়ি কিনতে চান, তাহলে স্বাতীকে অনেক কম দামে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তেমনটা হল না। উলটে, ভদ্রমহিলাই বললেন, 'এসব শাড়ি তোমাদের মানায়। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।'

হাউসওয়াইফ না হয়ে স্বাতীর রিপোর্টার হওয়া উচিত ছিল। কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মি. জেনা কি এখানে নেই? অনেকদিন দেখি না কেন গো নানী?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'দেখবে কী করে? ওঁর মাথায় ঠাকুর ভর করেছে যে! কয়েকদিন আগে হঠাৎ আমায় বলে কি না, পুরী যেতে হবে। মহাপ্রভু আমায় যেতে বলেছেন। আমরা ভাবলাম, জগন্নাথ না টানলে তো পুরী যাওয়া হয় না। ইচ্ছে হয়েছে যখন, যাক। ছেলে গাড়িভাড়া করে দিল। সকালবেলায় যাবেন, পুজো দিয়ে বিকেলবেলায় ফিরে আসবেন। ও বাব্বা, পরে বলেন কি না, আর ফিরবেনই না। বাকি জীবনটা মন্দিরের আশপাশে কোথাও পড়ে থাকবেন।'

'আপনি যেতে দিলেন নানী?'

'পাগল না কি? শুনে আমি তো খুব রাগারাগি করলাম। কিন্তু উনি কারও কথা শুনবেন না। কয়েকটা দিন খুব গুম মেরে গেলেন। তারপর একদিন সন্ধেবেলায় আমায় কী বললেন, জানো? এই দেখো, আমার গায়ের লোম কীরকম খাড়া হয়ে উঠছে৷ উনি বললেন, মহাপ্রভুর অঙ্গ আমি স্পর্শ করেছি প্রভা। তোমাকেই শুধু বলে গেলাম। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।'

ভদ্রমহিলার নাম তাহলে প্রভা। উপাসনা চুপ করে ওদের আলোচনা শুনছিল। শেষ কথাটা শোনার পর ও চমকে...ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। কী বলছেন উনি? মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করেছেন নরেশ জেনা? কীভাবে, কোথায়? মহাপ্রভু বলতে উনি কাকেই বা বোঝাচ্ছেন? পুরীর লোকেরা জগন্নাথদেবকে বলেন, প্রভু জগন্নাথ। মহাপ্রভু মানে তো শ্রীচৈতন্যদেব। ওঁর দেহ নরেশ জেনা স্পর্শ করলেন কী করে? তাহলে উনি যে কঙ্কালটা পরীক্ষা করেছিলেন, সেটাই চৈতন্যদেবের? উনি কি তাহলে তখন বুঝতে পেরেছিলেন?

ইস, এই নরেশ জেনার সঙ্গে অবশ্যই জয়দেবের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া দরকার।

রিসার্চের ব্যাপারে জয়দেবকে তাহলে উনি অনেকটাই এগিয়ে দিতে পারবেন। গতকাল গোরাদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর জয়দেব আর ফোন করেনি। তবে কথা আছে, আজ বিকেলবেলায় ও লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ বাড়ি থেকে উপাসনা একাই মন্দিরে চলে যাবে। দুজনে মিলে পুজো দেবে। রিসার্চের কাজ কিছুতেই এগোচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার, কোনও-না-কোনও কারণে, তথ্যগুলো হাতের কাছে এসেও....দূরে সরে যাচ্ছে। তখন স্বাতীই পরামর্শটা দেয়, লিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে সারেন্ডার কর। দেখবি, উনি ঠিক গেরো...কাটিয়ে দেবেন। সেই কারণেই উপাসনা আর জয়দেব তখন সিদ্ধান্ত নেয়, মন্দিরে গিয়ে একসঙ্গে পুজো দেবে।

জয়দেবের কথা মন থেকে সরিয়ে দিল উপাসনা। প্রভা নানীর কথাগুলো শোনা দরকার। স্বাতী হাল ছাড়েনি। রিপোর্টারি চালিয়ে যাচ্ছে। আগের কথার সূত্র ধরে.....অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে স্বাতী বলল, 'ভাগ্য করে আপনি এমন স্বামী পেয়েছেন নানী। এই দেখুন, শুনে....আমার গায়েও কেমন কাঁটা দিচ্ছে। তারপর কী হল নানী? উনি আর কিছু বললেন?'

'সে অনেক কথা। স্বাতী প্লিজ, কাউকে যেন গল্প কোরো না। উনি আমায় বারণ করে দিয়েছেন কাউকে বলতে। তোমাকে বলছি....কারণ জানি, তুমি কাউকে বলবে না।'

'মাথা খারাপ? এসব কথা কাউকে বলতে আছে? উফ্, শুনে আমার কী যে ভালো লাগছে, কী বলব নানী। একটা সত্যি কথা বলব? মি. জেনাকে কিন্তু বরাবরই আমার রিলিজিয়াস টাইপের মনে হত। দেখে ভক্তি হয়।'

শুনে প্রভা জেনা খুশিতে গদগদ। উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'তারপর শোনো। আসল কথাটা তো তোমায় বলাই হয়নি। হাসবেন্ডকে আমি বললাম, মহাপ্রভুকে স্পর্শ করেছেন মানে? তাঁকে পেলেন কোথায়? উনি বললেন, বেশ কয়েক বছর আগে পুরীর মন্দির থেকে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেছিল। সেটা পরীক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। প্রভা, আমি নিশ্চিত...ওই কঙ্কালটা চৈতন্যদেবের। ওটা ছোঁয়ার পর থেকেই....মনের ভেতরটা কেমন যেন আকুলি-বিকুলি করে উঠল। ওরে সারাটা জীবন মরা মানুষদের ঘাঁটাঘাটি করে গেলি। এবার একটু কৃষ্ণনাম কর। প্রভা, আমার মন আর সংসারে নেই। সে দিন থেকেই মন বলছে, কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। এই মায়ার সংসারে তুমি আমায় আটকে রেখো না। কথাগুলো বলেই উনি হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন।'

'কী করে ওঁকে সামলালেন নানী?'

'চোখে চোখে রাখতাম। মাঝে বাই উঠল, পশুসেবা করবেন। সেটা করতে গিয়ে কুকুরদের নিয়ে সেই ঝামেলা....সবই তো জানো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, টাকাপয়সা গরিব-দুখিদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ এসে চাইলেই হল। ইদানীং উনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করছিলেন। সেই চাল নিয়ে এসে স্বপাক করে খাবেন। কী, লজ্জার কথা বলো তো? না কি মহাপ্রভু ওঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ভিক্ষা করে খেতে। আমার বউমাই তখন বলল, বাবাকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। পুরীতে গিয়ে থাকতে চাইছেন যখন,

তখন ওখানে মা চিন্ময়ীর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। ছেলের কে একজন চেনাশুনো সন্ন্যাসী আছেন ওই আশ্রমে। মাসখানেক হল, উনি ওখানেই আছেন।'

শুনে উপাসনা দমে গেল। আরও কিছুক্ষণ বকবক করে প্রভা নানী চলে গেলেন। আসল কাজের কিছুই হল না। উপাসনা হতাশ গলায় স্বাতীকে বলল, 'আমার কপালে নেই। দূর ছাই...রিসার্চ-ফিসার্চ আমার দ্বারা হবে না। নবেন্দুকে ট্রেনের টিকিট কাটতে বল। বাড়ি ফিরে যাই।'

স্বাতী বলল, 'এত সহজে হাল ছেড়ে দিবি উপা? কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে? তোর মতো এত লেখাপড়া আমি করিনি। কিন্তু একটা কথা বল তো, কেন তোর রিসার্চ এগোচ্ছে না, ডিপ্‌লি ভেবেছিস? কমন সেন্স দিয়ে সেটা আগে ভাব। দেখবি, একটা রাস্তা ঠিক পেয়ে যাবি।'

কথাটা শুনে উপাসনা তখন চমকে উঠেছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর, স্বাতী যখন বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে, নিজে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন উপাসনা গেস্ট রুমে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। ওর রিসার্চের বিষয় হল, চৈতন্যদেবের পুনর্জন্ম। কোথাও-না-কোথাও উনি জন্মগ্রহণ করেছেন। খবরের কাগজের সূত্র অনুযায়ী, হয় জাজপুর, না হয় কেন্দ্রাপড়া। সেখানে গিয়ে খোঁজ করা আর খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা....একই ব্যাপার। উনি কোনও বৈষ্ণব পরিবারে মানুষ হতে পারেন, অথবা কোনও গোপন আশ্রমে। আচার্যমশাই একবার বলেছিলেন, ওর জন্ম নেওয়ার কথা সারা পৃথিবীতে মাত্র চৌষট্টি জন জানেন। তাঁদের কাউকে কি খুঁজে বের করা সম্ভব?

ঘেঁটে যাচ্ছে....সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কান্না পেয়ে যাচ্ছিল উপাসনার। আচার্যমশাই এই কাজে ওকে নামিয়ে দিয়ে....নিজে টুক করে চলে গেলেন। স্বাতী বলল বটে, রাস্তা বের করার জন্য কমন সেন্স দিয়ে ভাব। ভাবতে গিয়ে ও নিজেই গোলকধাঁধায় ঢুকে যাচ্ছে। আচার্যমশাই একবার একটা প্রাচীন পুঁথির কথা একবার বলেছিলেন। সেই পুঁথির খোঁজে ইদানীং দালাল লাগিয়েছে নবেন্দু। ওড়িশায় এই দালালদের খুব রমরমা। টাকার বিনিময়ে ওরাই সন্ধান দেয়, কোন গ্রামের কোন পরিবারে কত প্রাচীন পুঁথি পড়ে রয়েছে। নবেন্দুর মুখে উপাসনা শুনেছে, বিদেশিরাও এইসব প্রাচীন পুঁথি কিনে নিয়ে যায়। এইভাবে একটা বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার নাকি পাচার হয়ে গেছে বিদেশে....বিশেষ করে জার্মানিতে। উপাসনা খুব আশা করে আছে, ওর রিসার্চের কাজে লাগবে, এমন কোনও পুঁথির সন্ধান এনে দেবে কোনও দালাল। দিলে নিজের গয়না বিক্রি করেও সেই পুঁথি ও কিনে নেবে।

এইসব উলটোপালটা ভাবতে ভাবতে উপাসনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলেই দেখল, বিকেল চারটে বেজে গেছে। এই রে...পাঁচটার সময় জয়দেব গিয়ে লিঙ্গরাজ মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকবে। মন্দির অবশ্য ভীম ট্যাঙ্কি আবাসন থেকে এমন কিছু দূরে নয়। ও নিজেই একটা অটো রিকশা করে চলে যেতে পারে। ধড়মড় করে ডিভান থেকে নেমে উপাসনা চোখ মুখে জল দিয়ে এল। চট করে হালকা প্রসাধনও সেরে নিল। সেদিন কথায় কথায় জয়দেব

বলেছিল, পিঙ্ক কালার ওর সবথেকে প্রিয়। সুটকেশ থেকে ওই রংয়ের একটা শাড়ি বের করে...উপাসনা পরে নিল। না, এই হালকা সাজেও ওকে মন্দ দেখাচ্ছে না। মন্দিরে যাচ্ছে, অন্য কোথাও তো নয়। বেশি সাজগোজ করে গেলে আবার লোকের চোখ টাটাতে পারে। আবাসন থেকে বেরোনোর সময় নবেন্দুর কথাটা মনে পড়ায় ও মুচকি হাসল। জয়দেব সোনামণি। ইস, কী করে লোকে বলতে পারে! ও অন্তত কোনওদিন বলতে পারবে না।

সোয়া পাঁচটা নাগাদ মন্দিরে পৌঁছে উপাসনা দেখল, দোকানের একটা শেড-এর তলায় জয়দেব দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখা মাত্তর বলল, 'উপা, তোমার জন্য একটা ইন্টারেস্টিং খবর আছে।'

উপাসনা বলল, 'তোমার জন্যও একটা দারুণ খবর আছে।'

'আগে আমারটা বলি। আমার সেই রাইভালকে খুঁজে পাওয়া গেছে। যে ছেলেটা তোমাকে নবদ্বীপে পছন্দ করে এসেছিল, সে কে জানো? গোরার বন্ধু টুবাই। ওকে আমি খুব ভালো করে চিনি। না, ওর সঙ্গে ঢিসুম ঢিসুম করা যাবে না। ম্যাচটা আমাকে ওয়াক ওভার দিতে হবে।'

শুনে উপাসনা হাসতে হাসতে বলল, 'কেমন, জব্দ তো?'

'খবরটা জানার পর থেকেই নিজেকে কেমন যেন দেবদাস দেবদাস বলে মনে হচ্ছে। মনের এফ এম-এ ক্রমাগত স্যাড সং বেজে যাচ্ছে। কী করা যায়, বলো তো?'

'লিঙ্গরাজ বাবার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ো। দ্যাখো, উনি কিছু করে দেন কি না!'

কথাটা শুনে ওর ডান হাতটা খপ করে ধরেই জয়দেব বলল, 'চলো, দুজনে মিলে একসঙ্গে হত্যে দিই। তোমাকে না পেলে আমি যে বাঁচব না সোনামণি।'

সোনামণি ডাকটা শুনে উপাসনা হি হি করে হাসতে লাগল। ওর হাসির শব্দ শুনে লোকজন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। সন্ধের মুখে মন্দিরে বেশ ভিড়। লোকজনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জয়দেবের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল উপাসনা। জয়দেব নাটক করছে, কিন্তু ওর সান্নিধ্য বেশ ভালো লাগছে উপাসনার। এই প্রথম কোনও পুরুষ ওর হাত ধরেছে। হাতটা ও ছাড়িয়ে নিল না। মূল মন্দিরে ঢোকার সময়, পাশ থেকে ও শুনল, কে যেন বলছে, 'উপা না? তুই এখানে?'

প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে উপাসনার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। গোঁসাইবাড়ির শ্রীবৎস! ও এখানে কী করছে? হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ও ভুলে গেল। শ্রীবৎস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জয়দেবকে। ওর মুখে ব্যঙ্গের হাসি। উপাসনা কোনও কথা বলার আগেই শ্রীবৎস বলল, 'ভালোই হল, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভক্তদের নিয়ে পুরীতে যাচ্ছি। নবদ্বীপের অনেকেই এসেছে। ওই যে বাসের ভেতর ওরা সবাই বসে আছে। তোর সঙ্গে এই ছেলেটা কে রে? বয়ফ্রেন্ড নাকি? তোরা কোন হোটেলে উঠেছিস?' কথাগুলো শুনতে শুনতে উপাসনার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মনে মনে ও বলল, ধরণী দ্বিধা হও।

আটচল্লিশ

সকালবেলায় মুকুন্দর বাবার দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনতে গেছিল গোরা। বাড়ি ফেরার পথে এক বামন সাধুর পাল্লায় পড়ল। মাথায় বিরাট জটা, কপালে ছাই। পরনে কৌপিন, হাতে তার কমণ্ডলু আর দণ্ড। গায়ের রং মিশমিশে কালো। সাধুর হাইট মাত্র চার ফুটের কাছাকাছি। সামনে হাতজোড় করে উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর কী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, গোরা তার একবর্ণও বুঝতে পারল না। সাধু আকাশের দিকে হাত দেখাচ্ছেন। পায়ের সামনে বসে পড়ছেন। পাগলামি দেখে গোরা লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। কলকাতায় প্রায় দিন ওকে এই সমস্যাটায় পড়তে হত। ওখানে ওকে পাতাল রেলে অথবা বাসে চলাফেরা করতে হত বলে। কিন্তু ভুবনেশ্বরে আসা অবধি বাড়ির গাড়িটা ও ব্যবহার করছে। কোনওদিন রাস্তায় হাঁটাহাটি করেনি। তাই কোনওদিন সাধুর মুখোমুখি হয়নি।

গোরা জানে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলে, সাধু চলে যাবেন। কিন্তু পাছে কারও চোখে পড়ে এবং কৌতূহল বাড়ে, সেজন্য দ্রুত পায়ে ও বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। কিন্তু বামন সাধু পিছু হটার পাত্র নন। দৌড়ে বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে....সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার ভঙ্গিতে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুটা বিব্রত হয়েই গোরা তাঁর হাত ধরে তুলল। তারপর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। সাধু খুব খুশি। দুর্বোধ্য ভাষা কী যেন বলছেন। তাঁকে থামানোর জন্য গোরা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি এখন যান।'

বলেই বাড়ির দিকে পা বাড়াল গোরা। কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ শুনল, কে যেন বলছেন, 'সাধুবাবা তোমাকে কী বলছেন, তুমি কি বুঝতে পারছ গোরা?'

পিছন দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল রেড্ডি কাকা। ভাস্কর রেড্ডি। ওদের প্রতিবেশী। মুকুন্দর বাবার দোকান থেকে জিনিস কিনে গোরার পিছন পিছনই আসছিলেন রেড্ডি কাকা। দীর্ঘদিন ভুবনেশ্বরে আছেন বলে ওড়িয়া ভাষা বলতে পারেন। গোরা আগে তাঁকে লক্ষ করেনি। ও দেখল, বামন সাধুবাবা চোখ বুজে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে সবে প্রণাম করে উঠলেন রেড্ডি কাকা। পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্ছেন। রেড্ডি কাকার প্রশ্নটা শুনে ও বলল, 'না, বুঝতে পারছি না।'

রেড্ডি কাকা বললেন, 'বুঝবে কী করে? সাধুবাবা যে মালয়ালমে কথা বলছেন। আমি তেলুগু। কিন্তু একটু-আধটু মালয়ালম জানি। সাধুবাবা তোমায় কী বলছেন, জানো? বলছেন, উনি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারেঙ্গল বলে একটা জায়গা থেকে এসেছেন। উনি কয়েকদিন আগে দৈববাণী শুনেছেন, ভুবনেশ্বরে যাও। সেখানে একজন অবতারের সাক্ষাৎ পাবে। আকাশের তারা দেখে পথ চিনে সাধুবাবা আজ ভোরে এখানে এসেছেন। ওঁর ধারণা, তুমিই সেই অবতার।'

গোরা বলল, 'পাগলামির একটা সীমা আছে। সারা রাত বোধহয় গাঁজা খেয়ে এসেছেন।'

রেড্ডি কাকার চোখ মুখে বিস্ময়, 'না, বাবা। এটা পাগলামি নয়। ইনি যে সম্প্রদায়ের

সাধু, আমি তাঁদের জানি। এঁরা থাকেন ওয়ারেঙ্গলের দুর্গম জঙ্গলে। লোকালয়ে এঁদের দেখাই যায় না। এঁদের উচ্চতা বেশি হয় না। শুনেছি, এঁরা বামন অবতারের বংশধর। এঁকে গ্যাঁজাখোর বলে তুমি উড়িয়ে দিয়ো না। বরং বাড়িতে নিয়ে যাও। সেবা-র ব্যবস্থা করো।'

গোরা বলল, 'আমার কথা কি উনি বুঝতে পারবেন?'

রেড্ডি কাকা বললেন, 'ঠিক আছে, আমিই ধীরে ধীরে মালয়ালমে বলছি। তার আগে বলি, এই ধরনের সাধুকে অবিশ্বাস কোরো না বাবা। এঁদের ভয়ানক তেজ। রাগলে তোমাকে ভস্ম করে দিতে পারেন। রামায়ণ-মহাভারতে পড়নি? এঁরা দুর্বাসার জাত।'

রেড্ডি কাকা সাধুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। গোরা লক্ষ্য করল, বামন সাধুর মুখটা খুবই প্রসন্ন। বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর হাতজোড় করে উত্তর দিচ্ছেন। দু'তিন মিনিট কথা বলার পর রেড্ডি কাকা বললেন, 'ইনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না গোরা। ইনি তোমার বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। বলছেন, আজই কেওনঝড়ের জঙ্গলে চলে যাবেন। ওখানে ওঁর মতো আরও তেষট্টিজন সাধু জড়ো হবেন, নানা জায়গা থেকে। তারপর...ঠিক এক বছর বাদে....তোমাকেই নাকি ওঁরা সেই জঙ্গলে নিয়ে যাবেন। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না কাকা।' কথাটা বলেই গোরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়িতে ঢুকেই গোরা দেখল, পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মা। মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ওকে জড়িয়ে ধরে মা জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, বেঁটে মতোন সাধুটা তোকে কী বলছিল রে?'

পর্দার আড়াল থেকে মা তাহলে পুরো ঘটনাটাই দেখেছে। মায়ের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। মা এত ভয় পেয়ে গেল কেন, গোরা বুঝতে পারল না। মাকে ঠান্ডা করার জন্যই ও বলল, 'তেমন কিছু না মা। আমার আশীর্বাদ নিতে এসেছিল।'

'সত্যি বলছিস?' মায়ের চোখে অবিশ্বাস, 'আর কিছুই বলল না? তবে যে আমি দেখলাম, তোর রেড্ডি কাকার কাছে কী যেন বলছিল।'

'রেড্ডি কাকা আমাকে বলছিল, সাধুকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। কিন্তু সাধু রাজি হলেন না। উনি কেওনঝড়ে চলে গেলেন।'

'তুই জোর করে নিয়ে এলি না কেন বোকা?' মা ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছে কথাগুলো শুনে। বলল, 'সাধু সেবার সুযোগ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? আমি তো ভাবলাম, উনি তোকে নিয়ে যেতে এসেছেন। উফ, ভয়ে আমার গা ঠান্ডা হয়ে গেছিল।'

গোরা অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল মানে?'

প্রশ্নটা শুনে মা একটু থমকে গেল। নিজেকে সামলে তারপর বলল, 'সে অনেক কথা। এখন শোনার দরকার নেই। যাক গে শোন, তোর জন্য টুবাই অনেকক্ষণ বসে আছে। এখন কথা বলছে প্রিয়ার সঙ্গে। সোজা তোর ঘরে চলে যা।'

বলেই মা খর পায়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেল।

টুবাই এসেছে শুনে গোরা লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের দিকে এগোতে লাগল। টানা বারান্দা দিয়ে খানিকটা গেলে ওর ঘর। দক্ষিণ খোলা। আগে বাবা ওই ঘরে থাকত। বাবা মারা যাওয়ায় মা জোর করে ওই ঘরটা ওর জন্য বরাদ্দ করেছে। জানলার পিছনেই একটা বড়ো পুকুর। হু হু করে বাতাস আসে জানলা দিয়ে। পাশেই একটা কাঠালি চাঁপার গাছ আছে। গরমকালে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ঘরে ভেসে বেরায়। অনেক দিন পর গোরা এই ঘরটা ব্যবহার করছে। রাতে বিছানায় শোয়ামাত্তর রাজ্যের ঘুম নেমে আসে ওর চোখে।

ঘরে ঢোকার আগে বাঁদিকে তাকিয়ে গোরার নজরে পড়ল, নাটমন্দিরের বারান্দায় চুপ করে বসে আছে পুরন্দরদা। দিন তিনেক এখানেই আছে। মা ওকে পুরীতে যেতে দেয়নি। মা সেদিন বলেছিল, 'একে পুরন্দরদা বলে ডাকবি। বেলি নানীকে তোর মনে আছে? সেই যে, তুই যখন ক্লাস এইটে পড়তিস, তখন একবার আমাদের এখানে এসেছিল! তোকে মাদল বাজানো শিখিয়েছিল? মনে পড়ছে? পুরন্দরকে সেই বেলি নানীই আমার কাছে পাঠিয়েছে। বেচারা এমন এমন হাবাগোবা, প্রথম দিনই মারধর খেল।' সত্যি পরে গোরার খুব কষ্ট লেগেছে, পুরন্দরদার জন্য। আদ্যন্ত একটা নিরীহ মানুষ। বোকা না হলে ছবি দেখার জন্য ওইভাবে কেউ মায়ের ঘরে ঢোকে? এই ক'দিন নাটমন্দিরেই পড়ে থাকছে। কেমন যেন মনমরা। মা সেদিন ডাইনিং টেবলে খেতে ডেকেছিল। কিছুতেই পুরন্দরদা ওর সঙ্গে খেতে বসল না। ওকে দেখলেই লোকটা কেমন যেন গুটিয়ে যায়।

নিজের ঘরে ঢুকেই গোরা দেখল, কী একটা কথা নিয়ে প্রিয়া আর টুবাই খুব হাসাহাসি করছে। প্রিয়াকে কোনওদিন হাসতে দেখেনি গোরা। সবসময় ওকে দেখে লজ্জাবনত অবস্থায়। ওর হাসি হাসি মুখটা দেখে গোরার খুব ভালো লাগল। টুবাইকে ও জিজ্ঞেস করল, 'হাসছিস যে?'

টুবাই বলল, 'হাসব না তো কী। প্রিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ডুমস ডে নিয়ে। আমি বললাম, দু'হাজার বারো সালের বিশে ডিসেম্বর তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মাত্তর একটা বছর। তার আগে যা ভোগ করার করে নিই। মরার আগে কী কী ইচ্ছে পূরণ করতে হবে, সেই লিস্টটা ও আর আমি তৈরি করছিলাম। এমন সময় তুই এসে গেলি, এমন বেরসিক।'

গোরা বলল, 'কী করে তুই জানলি, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে?'

'লক্ষণগুলো টের পাচ্ছিস না? মালিকা সাহিত্যেই তো লেখা আছে সে সব। দাঁড়া, তোকে বলি।

উত্তরে সাজিব, দক্ষিণে গাজিব।
পূবে ন রহিবে কেহি।
ঝাড় ঝাড় ধরি যেতক রহিবে।
বিহন হইবে সেহি।

উত্তরে সাজিব.....দেখছিসই তো উত্তরে কী হচ্ছে? আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির তাণ্ডব। আকাশ ধুলোর ঝড়ে ঢাকা পড়েছে। পৃথিবীর অর্ধেকটাই অচল হয়ে গেছে। দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার আকাশ পঙ্গপালে ছেয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকার শস্য নষ্ট করছে। মানুষের হাহাকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখবি, পুবেও কেউ বেঁচে থাকবে না। পৃথিবীটা তখন জনশূন্য হয়ে যাবে।'

গোরা বলল, 'তোর তো দেখছি, সব মুখস্থ। তুই বিশ্বাস করিস নাকি এসব আজগুবি কথা?'

'করব না কেন? পাঁচশো বছর আগে ওঁরা যা বলে গেছেন, আজ তো সবই মিলে যাচ্ছে রে। উদাহরণ দেব? শোন, অচ্যুতানন্দ কী বলে গেছেন....যেতে বেড়ে দৃশ্য, দিব্যবেশ নারী নাশ করিবে সে মহি,

অপূর্ব সুন্দরী সেই দিব্য নারী
দেখিলে লোভ করিবে,
ছুইলা মাত্রকে কুড় কুড় হই
ভূমিরে ঢলি পড়িবে॥

বুঝলি কিছু? সোজা কথায়, ধরাধামে এমন কিছু সুন্দরী নারীর আবির্ভাব হবে, যাদের দেখলে লোভ হবে। কিন্তু তাদের ছুঁলে সব চুরমার হয়ে যাবে। মিলিয়ে দ্যাখ, এই ক'দিন আগে মস্কোতে যা হল, সে তো একই ব্যাপার। সুন্দরী মেয়েরা হিউম্যান বোম্ব সেজে ধ্বংস করল মেট্রো স্টেশন। কত লোক তাতে মারা গেল। সাধুদের কথা বিশ্বাস না করে উপায় আছে?'

'তোকে বলেছিলাম না, অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমায় পড়াবি। বইটা দিয়ে যাস তো।'

'আজ আনতে ভুলে গেলাম। ইস, র‍্যাক থেকে বের করেও, টেবিলের ওপর ফেলে রেখে এলাম। তোর জন্যই কাল রাতে বইটা পড়ছিলাম। উনি অত আগে কী করে সব প্রেডিক্ট করে গেছেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়। সেদিন টিভিতে ডবলিউ ডবলিউ রেস্টলিং দেখছিলাম। খালি বলে একজন ইন্ডিয়ান রেস্টলার দেখলাম, খুব পপুলার। খালির কথা অচুত্যানন্দ কিন্তু বলে গেছেন। শোন তাহলে....উনি লিখেছেন,

সেহি জন্মাবে পঞ্জাব দেশরে,
খালি নামে বহিথিব
নানা ক্রীড়া কৌতুক দিখায়ি
দেশে দেশে ভ্রমথিব॥'

প্রিয়া চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, 'টুবাইদা, আপনার মুখে যা শুনছি, তাতে তো মনে হয়, গ্রামে গঞ্জে কাত্যায়নীদের দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি।'

টুবাই বলল, 'হতে পারে। তোমায় বলছি, কাগজের হয়ে ফার্স্ট টাইম আমি যখন এই রহস্যের রিপোর্ট করতে গেলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল, এটা হিউম্যান অর্গান যারা

বিক্রি করে, তাদের কাজ। কিন্তু পরের বার গিয়ে যেসব সিম্পটম দেখলাম, তাতে মনে হল, সামথিং মিস্টিরিয়াস। একজন ছবি তুলেছিল। কাত্যায়নীর সেই চেহারা কী বীভৎস, তুমি ভাবতে পারবে না। পুলিশ ছবিটা আমায় দেখিয়েছিল। না মানুষ, না পাখি....সে এক অদ্ভুত জন্তু। প্রথমে ভাবলাম, ছবিটা ফেক। পরে দেখলাম, না তা নয়। তখনই আমার মনে পড়ল অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী। কত আগে উনি লিখে গেছেন...

কান্তানি গুপ্তে ভ্রমণ করিবে।
মারুত রূপে রহিবে
যোগিনী যোগীগণ সব একাঠে বুলিনো
দ্বারে দ্বারে মিলিবে।।'

গোরা শুনে হেসে বলল, 'তোর কথা শুনে তো আমার ভয় করছে রে টুবাই। আমার দলিত পার্টি তাহলে কোনওদিনই ক্ষমতায় আসবে না। ভেবেছিলাম, দু'হাজার চোদ্দো সালের ইলেকশনে দাঁড়াব। তোর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তার আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।'

টুবাই বলল, 'কিছু মনে করিস না গোরা। একটা কথা বলি। দলিত বলতে তুই কাদের বোঝাচ্ছিস? তুই নিজে কি দলিত? হ্যাঁ, মানছি, তোর বাবা দলিত পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করেই হোক বা অন্য কোনওভাবে, উনি নিজের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়েছিলেন। তোর সঙ্গে আমার....মিশ্র পরিবারে জন্মানো আমার.....কোনও তফাত আছে, বল? আমরা একই স্কুলে পড়শুনো করেছি। তুই আমার থেকে উচ্চশিক্ষিত। তুই থাকিস আমার থেকেও বেশি অভিজাত পাড়ায়। দলিত কথাটা শুনলেই দারিদ্র শব্দটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তোকে দলিত বলে মানব কোন দুঃখে? তবে কী জানিস, কলি যুগে সবই সম্ভব। উনি তো লিখেই গেছেন...সন্ন্যাসী যে ভেকধারী নামকু হইবে/ব্রাহ্মণ যে সন্ধ্যায় তপো গায়ত্রী ছাড়িবে।।'

গোরা বলল, 'তুই এত বদলে গেলি কী করে টুবাই। মনে আছে, কলকাতায় তুই-ই কিন্তু আমায় একদিন বলেছিলি, দলিত আন্দোলনে তোকে চাইলে....নেমে পড়বি।'

টুবাই বলল, 'বদলেছি কী সাধে? দলিত নামের ভেকধারীদের দেখে। পিপলির ইন্সিডেন্টটার কথাই ধর না। সমাবেশের আয়োজন যে ছেলেটা করেছিল, সেই লক্ষ্মণ পন্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড তুই জানিস? কাগজে কাজ করি তো, তাই আমরা সব জানতে পারি। লক্ষ্মণ একেবারে লোচ্চা টাইপের ছেলে। আগে সমাজবাদী পার্টি করত। দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায়, এখন দলিত পার্টিতে ভিড়েছে। পুরীর কালেক্টরের সঙ্গে সেদিন কথা বলছিলাম। পুরীতে লক্ষ্মণের না কি তিনটে হোটেল আছে। তবে কোনওটাই নিজের নামে নয়। জানিস, এবার সমাবেশের নাম করে নাকি লক্ষ্মণ কত লাখ টাকা তুলেছে? সব জায়গায় ও কিন্তু তোর নামটা ড্রপ করেছে। তুই একটা নিখাদ ভালো ছেলে। তোকে ভাঙিয়ে অন্যরা....করে খাবে, তুই সে সুযোগ দিবি কেন?'

'পার্টিতে এসব এলিমেন্ট দু'চারটে থাকবেই টুবাই। কোন পার্টিতে নেই বল তো?'

'সেই লিডারদের মতন কথা বলছিস। এমনিতে কলকাতায় একটা ঝামেলা পাকিয়ে এসেছিস তুই। এখানেও যদি সেরকম কোনও ঝামেলায় পড়িস, তাহলে যাবি কোথায় গোরা? কী দরকার তোর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর? আমি তো ঠিক করেছি, অচ্যুতানন্দের প্রেডিকশন অনুযায়ী চলব। সত্যযুগ তপ, ত্রেতা যুগে জপ, দ্বাপর যুগে দান আর কলি যুগে কীর্তন। তাতে মানুষ ভালো থাকবে। ভাই, কীর্তনে যে কী আনন্দ, তুই ভাবতে পারবি না। হ্যাঁ রে, কাল সন্ধেবেলায় তোদের এই মন্দিরে, আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ো, একজন কীর্তন করছিল, সে কে রে?'

'পুরন্দরদা। পুরী থেকে বেলি নানী ওকে মায়ের কাছে পাঠিয়েছে।'

'আরে, আমি তো ভাবলাম তোর নিজের দাদা। তোর মায়ের মুখটা যেন কেটে বসানো।'

প্রিয়া এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিল। এবার বলল, 'ঠিক বলেছেন টুবাইদা। প্রথম দিন পুরন্দরদাকে দেখে আমারও সে কথা মনে হয়েছিল। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিলে....মায়ের বড়ো ছেলে বলে পুরন্দরদাকে চালিয়ে দেওয়া যাবে।'

প্রিয়ার কথা শেষ হতে-না-হতেই দরজার বাইরে কী যেন ভেঙে পড়ার শব্দ হল। গোরা জানলা দিয়ে দেখল, বারান্দায় ফুলের টব ভেঙে পড়েছে। আর পুরন্দরদা প্রাণপণ দৌড়চ্ছে মেন গেটের দিকে।

উনপঞ্চাশ

মন্দাকিনীর মৃতদেহটা নিয়ে কী করবে পুরন্দর সেটাই ভাবছিল। দিন চারেকের বাসি মড়া। মন্দাকিনীকে আর চেনাই যাচ্ছে না। রাত দশটায় ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর বিষ্ণু মন্দিরে পৌঁছে পুরন্দর প্রথমেই পাতাল গৃহে ঢুকেছিল। ঢোকার সময়ই ও পচে যাওয়া লাশের দুর্গন্ধটা পায়। তখনই ও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, মন্দাকিনীর খবর কেউ পায়নি। পাতাল গৃহে সচরাচর কেউ নামে না। ওখানকার শব পচে যাওয়ার গন্ধ নিয়ে ওপরের কারও মাথাব্যথা নেই। খিলানের উপর উঠে পুরন্দর ভাবতে বসল, মৃত মন্দাকিনীকে নিয়ে কী করা যায়। মেঝেতে গর্ত করে দেহটাকে ও চাপা দিতে পারে। কেউ কোনওদিন টেরও পাবে না তাহলে। কিন্তু পদ্মনাভর অত্যাচারী মেয়েকে এত সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না। বেলি নানীর গায়ে হাত তোলার দৃশ্যটা ওর মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করে নিল কী করবে।

মন্দাকিনীর দেহটাকে পুরন্দর উৎসর্গ করবে ইঁদুরদের উদ্দেশে। দেহটা মেঝে নামিয়ে রাখলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কয়েক হাজার ইঁদুর ওর লাশের কোনও চিহ্নই রাখবে না। একেবারে কঙ্কাল করে দেবে। এরকম বহু কঙ্কাল পাতাল গৃহের অভ্যন্তরে পুরন্দর দেখেওছে। খিলান থেকে মন্দাকিনীর দেহটা নামানোর আগে ওর শরীরের অলঙ্কারগুলো খুলে....পুরন্দর একটা পুঁটলি করে ফেলল। এমনিতে সোনার অলঙ্কারের ওপর ওর কোনও

লোভ নেই। কিন্তু অলঙ্কারগুলো এখন ওর দরকার। অলঙ্কার বিক্রি করে, সেই টাকায় পুরন্দর বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করতে পারবে ভুবনেশ্বর বা অন্য কোনও জায়গায়। তার আগে ওকে জানতে হবে, মন্দাকিনীর অন্তর্ধানের পর পুরীতে ঠিক কী হয়েছে। কতটা তোলপাড় করেছেন পূজ্যপাদ পদ্মনাভ? একমাত্র বেলি নানীই সেটা বলতে পারবেন। পদ্মনাভ কি ওকে সন্দেহ করেছেন? এই ক'দিন ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই হেড কোয়ার্টার্সের। ইচ্ছে করেই পুরন্দর মোবাইল ফোনের সিমকার্ড খুলে রেখেছে। মোবাইল চালু রাখলে পূজ্যপাদ পদ্মনাভরা ঠিক জেনে যেতেন, ও কোথায় রয়েছে। ওঁদের অসম্ভব ভালো নেটওয়ার্ক।

খিলান থেকে মন্দাকিনীর দেহটা নামানোর সময় খুট করে একটা শব্দ শুনতে পেল পুরন্দর। খিলান থেকে কী যেন একটা নীচে পড়ল। মেঝের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, মোবাইল সেট। ইস, সেটটার কথা ওর মনেই ছিল না। আর একটু হলে ও এখানেই ফেলে যাচ্ছিল? মোবাইল সেটটা তুলে ও জামার পকেটে রেখে দিল। ফোন নিয়ে ভাবার সময় এখন ওর হাতে নেই। একটা অসমাপ্ত কাজ করার জন্য ও পাতাল গৃহে ফিরে এসেছে। ভোর হওয়ার আগেই ওকে সেটা শেষ করে ফেলতে হবে। ঘন অন্ধকারে মিনিট কয়েক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পুরন্দর। অন্ধকারেও পরিষ্কার সব দেখতে পায়। তবুও সঙ্গে একটা টর্চ রাখার কথা ওর মনে হল।

মন্দাকিনীকে খুন করার দিনই পুরন্দর পাতাল গৃহের এক কোণে একটা গাইতি, বেলচা আর দড়ি রেখে গিয়েছিল। টর্চটা সম্ভবত রেখেছিল খিলানে। সেটা মনে পড়তেই খিলানে উঠে হাত বাড়িয়ে টর্চটা টেনে নিয়ে ও নীচে আলো ফেলল। তখনই দেখতে পেল, খাবারের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। মন্দাকিনীর দেহের কোনও অংশ আর দেখা যাচ্ছে না। মহা উল্লাসে ভোজে মেতেছে ইঁদুররা। দৃশ্যটা দেখে পুরন্দর তৃপ্তি অনুভব করল। মনে মনে ও বলল, পদ্মনাভর দেহটাকেও ও এইভাবেই ইঁদুরদের খাওয়াবে। এবং সেটা দু'একদিনের মধ্যে। তার আগে বেলি নানীর সঙ্গে একবার ওর দেখা করা দরকার। ও এখান থেকে চলে যাওয়ার পর যা ঘটেছে, সেটা একমাত্র বেলি নানীই বলতে পারবেন।

ধরাধামে একমাত্র এই বেলি নানী মানুষটার কাছেই ও ঋণী। এই একটা মানুষকেই ও চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র পুরন্দর সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিষ্ণু মন্দির এখন শুনশান। দেওয়ালের খাঁজে বড়ো বড়ো প্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। সেই আলো স্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু থামের আড়ালে ঘন অন্ধকার। আত্মগোপন করলে কেউ টেরও পাবে না। সাবধানে পুরন্দর বেলি নানীর ঘরের দিকে এগোতে লাগল। ডানদিকে সার সার ঘর। বিশাল কাঠের দরজাগুলো এখন ভেজানো। রাতের মাহেরিদের ঘরের দরজা বন্ধ করার নিয়ম নেই। যাতে পূজ্যপাদরা যখন ইচ্ছা তখন মাহেরিদের ঘরে ঢুকতে পারেন। উঠোনের দিকে সরে গিয়ে পুরন্দর একবার আকাশের দিকে তাকাল। আন্দাজের চেষ্টা করতে লাগল, রাত কত গভীর।

বেলি নানীর ঘরের সামনে যাওয়ার আগেই ক্যাচ করে একটা শব্দ শুনতে পেল পুরন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ও থামের আড়াল সরে গেল। খড়মের শব্দ তুলে মাহেরিদের ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছেন। ওই স্বল্পালোকে দীর্ঘদেহটা দেখেই পুরন্দর চিনতে পারল পূজ্যপাদ পদ্মনাভ। পূজ্যপাদকে দেখেই ওর হাত দু'টো নিশপিশ করে উঠল। পিস্তল বের করে এই মুহূর্তে পূজ্যপাদকে ও খুন করতে পারে। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করে পুরন্দর দেওয়ালের সঙ্গে আরও মিশে গেল। নাহ, এই মুহূর্তে নয়। আগে ওর জানা দরকার, মন্দাকিনী নিখোঁজ হওয়ার পর কী কী ঘটেছে। সন্দেহটা ওর ওপর পড়েছে কি না। পুরন্দর দম বন্ধ করে রইল। পূজ্যপাদ ওর গা ঘেঁষেই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। খড়মের আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে পুরন্দর এক লাফে বেলি নানীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করে ও দেখল, ঘরের ভেতর প্রদীপ জ্বলছে। জগন্নাথের বিগ্রহের সামনে হাতজোড় করে বসে আছেন বেলি নানী। যাক, এখনও ঘুমোননি তাহলে। দু'দণ্ড কথা বলা যাবে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর পা দিতেই পুরন্দর চমকে উঠল। বিছানায় শুয়ে আছে একটা মেয়ে! সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধক করে উঠল ওর। কে এই মেয়েটা? বেলি নানীর আশ্রয় নিয়েছে কেন? মেয়েটা জেগে আছে বলে মনে হল না। ভালো করে তাকাতেই ও বুঝতে পারল, মেয়েটা আর কেউ নয়, অম্বা....অম্বালিকা। পুরন্দর অ্যাদ্দিন যাঁকে মনে মনে কামনা করে এসেছে। অম্বালিকা ওর কোনও ক্ষতি করবে না। এই কথাটা মনে হওয়া মাত্র ও বেলি নানীর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'নানী, আমি পুরন্দর। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

পুরন্দর জানত, ওকে দেখে নানী ভয়ানক চমকে উঠবেন। হলও তাই। সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দর নানীর মুখ চেপে ধরে বলল, 'চুপ, আওয়াজ করবেন না।'

নিজেকে সামলাতে সময় নিলেন নানী। তারপর বললেন, 'তুই ফিরে এলি কেন বাছা? জানিস তোর নামে ঢ্যাড়া পড়ে গেছে? তোকে দেখতে পেলে পদ্মনাভর লোকেরা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ওরা তোর খোঁজ চারদিক তোলপাড় করে বেরাচ্ছে যে।'

নানীর শরীরটা ওর বুকের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। পুরন্দর টের পেল, নানী থরথর করে কাঁপছেন। চোখ মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তার মানে পূজ্যপাদর লোকেরা নানীকে মারাত্মক ভয় দেখিয়েছেন। ওঁকে সাহস দেওয়া দরকার। পুরন্দর তাই ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ওঁরা আমার কিচ্ছু করতে পারবেন না। আমি চলে যাওয়ার পর এখানে কী হয়েছে, আমায় বলুন।'

নানী পিছন ফিরে একবার বিছানার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'মেয়ের শোকে পদ্মনাভ পাগল হয়ে গেছে রে। সন্দেহটা আমার ওপর পড়েছিল। কেননা, সুমতি মাহেরি ওকে বলে দিয়েছিল, সেদিন রাতে মন্দাকিনীকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখেছে। কিন্তু আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে অম্বি। ও বলেছে, মন্দাকিনীকে শেষবার ও দেখেছে, বাড়ির দিকে রিকশা

করে যেতে। পরদিন শুনলাম পুরীর সব রিকশাওয়ালাকে ডেকে খুব অত্যাচার করেছে পদ্মনাভর লোকেরা। সে এক হুলুসথুলুস কাণ্ড। নিরীহ লোকগুলো শুধুমুধু মার খেল তোর জন্য। এবার বল তো বাছা, মন্দাকিনীকে কি তুই মেরে ফেলেছিস?'

পুরন্দর কোনও উত্তর না দিয়ে প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে বোধহয় ইঁদুরদের মহাভোজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মন্দাকিনীর কঙ্কালটা পড়ে আছে পাতাল গৃহে। বললে বেলি নানী আঁতকে উঠবেন। তাই ও জিজ্ঞেস করল, 'পূজ্যপাদ পুলিশে যাননি?'

'গিয়েছে। পুলিশও খোঁজাখুজি করছে। তোর খোঁজে পুলিশ এসেছিল ভুবনেশ্বর থেকেও। তুই পালিয়ে যা বাছা। পুরীতে থাকলে তুই কিন্তু ধরা পড়ে যাবি। পদ্মনাভর লোকেরাই তোকে ধরে ফেলবে। কাল মন্দিরে পদ্মনাভর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোর কথা। আমি বললাম, তোর সঙ্গে বহুদিন আমার দেখা হয়নি। তুই এ ক'দিন কোথায় ছিলি বাছা?'

পুরন্দর ছোট্ট করে বলল, 'মায়ের কাছে।'

শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নানীর মুখ। পূজ্যপাদর কথা ভুলে গিয়ে বলল, 'বিশাখার কাছে ছিলি! পরিচয় দিয়েছিস? কী বলল সে? কেমন আছে?'

খুব অল্প কথায় ভুবনেশ্বরের খবরগুলো নানীকে দিল পুরন্দর। তারপর বলল, 'মা বিশাখা আমাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আমার পরিচয় কাউকে দেননি।'

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নানী বললেন, 'মায়ের কাছেই তুই চলে যা বাছা। বাকি জীবনটা মহাপ্রভুর কীর্তন করেই কাটিয়ে দে। শান্তি পাবি। অনেক পাপ করেছিস। পাপের বোঝা আর বাড়াস না বাছা। আমার যদি উপায় থাকত, তাহলে অম্বি মেয়েটাকে নিয়ে আমিও কোথাও চলে যেতাম।'

ধক্ করে কথাটা এসে কানে বাজল পুরন্দরের। কয়েকদিন আগে এই কথাটাই তো ওকে বলেছেন রামচন্দ্র দইতাপতি। পাপের বোঝা আর বাড়াস না। মাথা নিচু করে ও বসে রইল। ভুবনেশ্বরে মায়ের বাড়ির মন্দিরটার কথা ওর মনে পড়ল। আহ্, সত্যিই কী শান্তি ওই বাড়িটাতে। যে ক'দিন ও মায়ের কাছে ছিল, রোজ সন্ধেবেলায় মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে বসে থাকত পুরন্দর। রাধা গোবিন্দের বিগ্রহর দিকে অপলক ও তাকিয়ে থাকত। মনের ভেতরটায় তখন প্রশান্তিতে ভরে যেত। কীর্তনের সময় ও দেখত, গাইতে গাইতে কীর্তনীয়াদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মায়ের চোখ দিয়েও টসটস করে জল পড়ছে। যে মেয়েটাকে মা ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে রেখেছেন, সেই মেয়েটাও কাঁদছে। দূরে অন্ধকারের আড়ালে বসে পুরন্দর কীর্তন শুনত। কখনো কখনো টের পেত, ওর মনের ভেতর থেকে সব.....সব রাগ জল হয়ে যাচ্ছে। কারোর উপর ওর কোনও ক্ষোভ নেই। রাতে শোয়ার পর আবার সব বদলে যেত। ওর মনে হত, বুকের ভেতর কঠিন একটা পাথর যেন জমাট হয়ে আছে। আবেগের কুঠার দিয়ে সেটা ভাঙা যাবে না। শত চেষ্টা করলেও...না।

ভুবনেশ্বরে সারাটা দিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত পুরন্দর। কিন্তু সন্ধে হলেই প্রবল

একটা আকর্ষণ অনুভব করত মন্দিরে গিয়ে বসার। ওই সময়টায় আশপাশের লোকজন জড়ো হত। খোল করতাল বাজানো শব্দ আর পূজারতির ঘণ্টাধ্বনিতে সে এক অন্য পরিবেশ। রাধা গোবিন্দর বিগ্রহের পাশে শ্রীচৈতন্যের একটা ছোট্ট মূর্তি পুরন্দরের চোখে পড়েছিল তৃতীয় দিন। তখনই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল। ওর ইচ্ছে হয়েছিল, মূর্তিটা তুলে এক আছাড় মারে। মন্দিরে তখন লোকজন কেউ নেই। কীর্তন সেরে দলবল নিয়ে চলে গিয়েছেন প্রহ্লাদ মোহান্ত। মা বিশাখা বাড়ির ভেতরে কথা বলছেন গোরাভাইয়ের সঙ্গে। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে তা দেখতে পাচ্ছিল পুরন্দর।

বাড়ির কাজের লোকেরা রসুই ঘরে। এই সুযোগ। কিন্তু সেই সময় মন্দিরের দিকে তাকাতেই পুরন্দর চমকে উঠেছিল। ও দেখেছিল, ওর ছায়া দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছে। পিছনে প্রহ্লাদ মোহান্ত ও তাঁর দলবল। ওদের মুখে 'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল'। বিস্ফারিত চোখে পুরন্দর সেদিন দেখেছিল, ওর ছায়া দ্রুত পাক দিয়ে আসছে মন্দিরের চারপাশে। ওর চোখে জল। একটা ঘোরের মাঝে ও হরিধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছেন না মোহান্তরা। খোল করতাল নিয়ে ওরা টলতে টলতে দৌড়চ্ছেন।

'নে কিছু খেয়ে নে।' ঠক করে একটা পেতলের থালা মেঝেতে রেখে বেলি নানী বললেন, 'তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে, সারা দিন কিছু খাসনি।'

চোখের সামনে থেকে এক ঝটকায় মন্দির উধাও। থালার দিকে তাকিয়ে পুরন্দর দেখল, সামান্য কিছু ফল, খাজা-গজা আর এক বাটি পায়েস। সত্যিই সারাটা দিন ওর পেটে কিছু পড়েনি। মায়ের জাত, বেলি নানী ঠিক বুঝতে পেরেছেন। নানীর মুখের দিকে ও তাকিয়ে রইল। মায়ের স্নেহ কাকে বলে সে তো পুরন্দর ভুবনেশ্বরে নিজের চোখেই দেখে এসেছে। গোরাভাই যেদিন পিপলি থেকে মাথায় চোট নিয়ে ফিরে এল, সেদিন মা বিশাখা মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন। 'ঠাকুর, আমার গোরার যেন খারাপ কিছু না হয়।' মায়ের স্নেহ পুরন্দর নিজেও খানিকটা অনুভব করেছে, 'যতদিন ভুবনেশ্বরে ছিল। তবুও ভুবনেশ্বর থেকে ও পালিয়ে এসেছে, পাছে ধরা পড়ে যায়। গোরাভাইয়ের সামনে ছেলে-মেয়ে দুটো তো সকালে বলেই ফেলল, 'পুরন্দরদার মুখটা একেবারে তোর মায়ের মতো।' শুনেই পুরন্দর ঠিক করেছিল, এবার পালানো দরকার। রাতেই ও পুরীতে চলে এসেছে।

থালা থেকে বাটিটা তুলে, ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বেলি নানী বললেন, 'হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন বাছা? পায়েসটা খেয়ে নে। অম্বির আজ জন্মদিন ছিল। ওর জন্য তাই পায়েস করেছিলাম। আমার হয়েছে যত জ্বালা। মেয়েটাকে যত দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, ততই কাছে চলে আসে। এই দ্যাখ না, মন্দাকিনীর ভয়ে রোজ রাতে মেয়েটা আমার ঘরে চলে আসে। আমি না থাকলে মেয়েটার যে কী হবে....।'

বাটি থেকে পায়েস মুখে দেওয়ার আগে পুরন্দর নির্লিপ্তভাবে বলল, 'নানী, ওকে বলবেন, মন্দাকিনী আর কোনওদিন ওকে ভয় দেখাতে আসবে না।'

শুনে শিউরে উঠে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নানী বললেন, 'কী করেছিস তুই!

মন্দাকিনীকে কি সত্যিই মেরে ফেলেছিস? জানিস, মানুষ হত্যা পাপ। নরকেও যে তোর ঠাঁই হবে না বাছা?'

উত্তর না দিয়ে পুরন্দর পায়েস খেতে লাগল। নরকের গল্প ও অনেক শুনেছে। এখন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ধীরেসুস্থে ও খেতে লাগল। বেলি নানী যা বোঝার বুঝে নিক। মন্দাকিনীর মতো জানোয়ারদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। খুব শিগগির পদ্মনাভকেও মেরে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে ওর গুপ্ত সংগঠন না যেন কী...সেটাও ধ্বংস করবে পুরন্দর। পূজ্যপাদর গতিবিধি জানার জন্য খেতে খেতেই নানীকে ও প্রশ্ন করল, 'পদ্মনাভ কি রোজ রাতে আপনাদের এখানে আসেন?'

'রোজ আসে। কলকাতার কাঁকুড়গাছি থেকে কোন এক গেরস্থ রেন্ডিকে তুলে এনেছে। রোজ রাতে এসে পদ্মনাভ ওই রেন্ডিটার ঘরে ঢোকে। কিন্তু তুই এসব কথা জানতে চাইছিস কেন বাছা? তুই কি পদ্মনাভকেও মেরে ফেলবি নাকি?'

পুরন্দর বলল, 'মারলে কি খুব পাপ করব নানী?' খাওয়া শেষ করে ও উঠে দাঁড়াল। নানীর ঘরে আর থাকা উচিত হচ্ছে না। কী বলতে কী বলে ফেলবে। ওর হাতে এখন অনেক কাজ। পেতলের গ্লাস থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে পুরন্দর বলল, 'আমি যাই নানী। কাল এই সময় ফের আসব।'

'তোর কি হয়েছে বল তো? তুই যাবি কোথায় বাছা?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে পুরন্দর সাবধানে দরজাটা খুলল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওর চোখে পড়ল, বিছানার উপর অম্বালিকা উঠে বসেছে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

......পাতাল গৃহে নেমে এসে পুরন্দর দেখল, মন্দাকিনীর কঙ্কালটা পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, মেঝের নীচে চালান করে দেওয়া দরকার। কথাটা মনে হতেই ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে ও গাইতি আর বেলচা বের করে আনল। মেঝেটা খুঁড়ে ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব, রাতের অন্ধকারে। পুরন্দর জানে, নিঃশব্দে এই কাজটা ও করতে পারবে না। দিনের বেলায় প্রচুর লোকের আনাগোনা মাহেলি মাদেলিদের কাছে। গাইতি চালানোর শব্দ কারও কানে গেলে, কৌতূহলবশত কেউ হয়তো নিচে নেমেও আসতে পারে। গাইতি দিয়ে মেঝেতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল পুরন্দর। কিছু ইঁদুর এতে উদ্বাস্তু হবে বটে, কিন্তু মন্দাকিনীর কোনও চিহ্ন আর ধরাধামে থাকবে না। ওর গায়ে অমানুষিক শক্তি, সজোরে গাইতি চালাতে লাগল পুরন্দর। খানিক পরে ও হঠাৎই অনুভব করল মেঝেটা ঝুরঝুরে হয়ে যাচ্ছে। ওর পা পিছলে যাচ্ছে। নীচের দিকে কে যেন ওকে টানছে। গাইতি হাতেই ও নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ওর সঙ্গে সঙ্গে মেঝের আশপাশের অংশও নামছে। কী হচ্ছে, তা বুঝে ওঠার আগেই পুরন্দর আছাড় খেল। এবং জ্ঞান হারাল।

পঞ্চাশ

সোফায় বসে টিভিতে সিনেমা দেখছিল উপাসনা। ওড়িয়া ছবি। গল্পটা বেশ ভালো। দেখতে দেখতে পর্দা থেকে ও চোখ সরাতে পারছিল না। হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল। নবেন্দু আর স্বাতী বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যেন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে। বাড়িতে কেউ নেই, উপাসনা একা। এই সময়টায় আবার কে এল? স্বাতী বলে গিয়েছে, রাত দশটার আগে ওরা ফিরবে না। অচেনা কেউ এলে দরজা খুলতে মানা করেছে। দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে আই হোলে উপাসনা চোখ রাখল। দেখল, বাইরে জয়দেব। দেখেই ওর বুকটা চমকে উঠল। এই রে, ও এখন ম্যাক্সি পরে আছে। জয়দেবের সামনে এই পোশাকে কোনওদিন আসেনি। এখন কী করবে? ম্যাক্সির উপর শাড়ি জড়িয়ে নিতেও তো ওর কয়েকটা মিনিট সময় লাগবে।

উপাসনা একবার ভাবল, দরজাই খুলবে না। বারকয়েক বেল টিপে, জয়দেব মনে করবে, ফ্ল্যাটে কেউ নেই। তারপর ফিরে যাবে। কিন্তু ঘরে বেশ জোর ভলিউমে টিভি চলছে। বাইরে থেকে নিশ্চয়ই তা শোনা যাচ্ছে। দরজা না খুললে, জয়দেব মাইন্ড করতে পারে। স্বাতীটা এমন ফাজিল, পরে ওকে বলেও দিতে পারে, সে কী, উপা দরজা খোলেনি? তখন কি অন্য কেউ ঘরে ছিল। আমরা তো ঘর খালি করে সেই সন্ধেবেলায় বেরিয়ে গেছিলাম।' স্বাতীকে বিশ্বাস নেই। জয়দেবকে জড়িয়ে, ও এমন এমন কথা বলে, শুনে কান লাল হয়ে যায় উপাসনার।

দরজা খুলে দিয়ে উপাসনা বলল, 'কী আশ্চর্য! তুমি?'

জয়দেব হাসিমুখে বলল, 'কেন আমি যে আসব, তুমি জানতে না? স্বাতীই তো ফোন করে আমাকে আসতে বলল। সে কোথায়?'

ওহ্, তাহলে স্বাতীর প্ল্যান। ফিক করে উপাসনা হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'তুমি বোসো। আমি ম্যাক্সিটা বদলে আসি।'

জয়দেব কাছে এসে বলল, 'কোনও দরকার নেই। শাড়িতে তোমাকে যেমন দেখতে লাগে, তার চেয়ে ম্যাক্সিতে আরও বেশি ভালো লাগছে। নবেন্দু কোথায়? অফিস থেকে ফেরেনি?'

উপাসনা বলল, 'না, ওরা কেউ নেই?'

'ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে তুমি আর আমি একা। ওয়ান্ডারফুল। আজ তাহলে রাসলীলা হবে। .....না, না, ওটা বড়ো সেকেলে হয়ে গেছে। তার চেয়ে এসো, আমরা বরং সালসা ড্যান্স করি। টিভিতে সেদিন দেখছিলাম, এক্সিলেন্ট।'

জয়দেব খুব সুন্দর নীল রঙের একটা শার্ট পরে এসেছে। ওড়িয়া ফিল্মের হিরোর থেকেও ওকে দেখতে ভালো লাগছে। একটু আগে নীল রঙের শার্ট পরা ওই হিরোর বুকে মুখ ঘসে হিরোইন প্রেম নিবেদন করছিল। হিরোও পালটা মুখ ঘসেছিল হিরোইনের বুকে। সেই দৃশ্যটা চকিতে উপাসনার চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ও বলল,

'হ্যাঁ, ড্যান্সটাই বাকি আছে। আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর তুমি ড্যান্স করার কথা ভাবছ।'

'আবার কী হল?' জয়দেব মুহূর্তের মধ্যে সিরিয়াস। সোফায় ধপ করে বসে ও বলল, 'নবদ্বীপ থেকে কেউ ফোন করেছিল না কি? আমায় তো কিছু বলোনি?'

যে উৎসাহ নিয়ে ঘরে পা দিয়েছিল জয়দেব, ফুৎকারে তা নিভে গিয়েছে। উত্তরের আশায় মলিন মুখে ও তাকিয়ে রয়েছে। বেচারা! এত ভালো মানুষ হলে চলে? ওর ফিউজ হয়ে যাওয়ার কারণ আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে শ্রীবৎসর সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ার দিন থেকেই উপাসনা টেনশনে ভুগছে। শ্রীবৎসর সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক, তাতে নবদ্বীপে ফিরে গিয়েই শ্রীবৎস ওর নামে নানারকম কুৎসা রটাবে। একজন পুরুষের সঙ্গে ওকে লিঙ্গরাজের মন্দিরে দেখা গেছে। চরিত্রহননের জন্য এটা যথেষ্ট। ফোন বাজলেই উপাসনা তাই আতঙ্কে থাকে। এই বুঝি বাড়ি থেকে মা ফোন করে বলবে, 'আমাদের মুখ পোড়ালি কেন উপা?' এই দুশ্চিন্তায় এই ক'দিন ও ভুলেই গিয়েছে, কী কারণে ভুবনেশ্বরে এসেছে। জয়দেব, স্বাতীরাও ওর আশঙ্কার কথা জানে। স্বাতী অবশ্য পাত্তাই দিচ্ছে না শ্রীবৎসকে। 'লোকটা কে, যে ওকে ভয় করতে হবে?'

জয়দেব আর ও, দুজনেই মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছিল। দুজনেরই রিসার্চের কাজ ডকে। কিন্তু স্বাতী মেয়েটার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে। দুজনকেই চাঙা করে তুলেছে। উপাসনা নিজের মনকে তৈরি করে ফেলেছে। বাড়িতে ফোন করে গোটা ঘটনাটা জানিয়ে রেখেছে বোনকে। জয়দেবের কথাও বলেছে। শুনে বোন লাফাচ্ছিল, 'কবে আলাপ করিয়ে দিবি দিদিভাই? জয়দেবদাকে তুই নবদ্বীপে নিয়ে আয়। এদিকে আমি হালকা করে বাবার কাছে ওঁর কথা বলে রাখব।' আজ দুপুরে বোন নবদ্বীপ থেকে ফোন করেছিল। বলল, 'বাবা নাকি জয়দেবকে দেখতে চায়। মায়ের কানে কথাটা এখনও যায়নি। গেলে কী হবে, সেটাই ভাবনার।

জয়দেব নবদ্বীপের কথা তোলায়, উপাসনা বলল, 'বোন ফোন করেছিল। পরে সব বলছি। তুমি একটু বোসো। আমি শাড়িটা জড়িয়ে আসি।'

দ্রুত পায়ে গেস্ট রুমে চলে এল উপাসনা। অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে আগে চোখ মুখে জল দিল। জয়দেবকে নীল শার্টে দেখার পর থেকেই ওর কানের পাশ থেকে হঠাৎ একটা গরম ভাপ বেরোচ্ছে। বুকের ভেতরে গুরগুর করছে। পা দুটো যেন দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আগে তো কখনও এরকম হয়নি? তাহলে হঠাৎ এরকম হচ্ছে কেন? তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার সময় উপাসনা সিদ্ধান্তে পৌঁছল, স্বাতী....এই স্বাতীর জন্যই ওর এই অবস্থা হয়েছে। কথায় কথায় একদিন ও বলেছিল, 'প্ল্যান করে তোদের দুজনকে এই ফ্ল্যাটে একদিন রেখে যাব। জয়দেব আদর টাদরে ওস্তাদ কি না, সেদিন টেস্ট করে নিস।' ওই কথাগুলোই ওর শরীরে তিরতির করছে।

উপাসনা কড়া চোখে তাকিয়েছিল সেদিন স্বাতীর দিকে। বলেছিল, 'এইসব ইয়ার্কি আমার ভাল্লাগে না স্বাতী। প্লিজ, তুই এসব প্ল্যান করিস না।'

স্বাতী মুখ ভেঙচেছিল, 'ইইই, ভাল্লাগে না। ভাল্লাগবে। তখন এই শর্মার কাছেই টোটকা নিতে ছুটে আসবি। কী করে আরও বেশি ভালো লাগবে, তার ওষুধ নিতে।'

শাড়ি বদলানোর সময় স্বাতীর এসব কথা মনে পড়তেই উপাসনার শরীরটা ফের কীরকম যেন করে উঠল। ও অবাক হয়ে লক্ষ করল, স্তন বৃন্ত দুটো থেকে থেকে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। কী মুশকিল, এই সময় ফ্ল্যাটে ও একা, কী দরকার ছিল জয়দেবের আসার? আর সময় পেল না? না, না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জয়দেবকে ও কাটিয়ে দেবে। ফাঁকা ঘরে ওড়িয়া সিনেমার হিরোটার মতো জয়দেব যদি চুমু টুমু খেতে চায়, তাহলে ওকে আটকাবে কী করে উপাসনা? নবদ্বীপে গোবিন্দ বলে যে ছেলেটার সঙ্গে স্বাতী প্রেম করত, সে না কি গঙ্গার ধারে একবার স্বাতীর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। পরদিন স্কুলে এসে স্বাতী সেই গল্প করেছিল। ওরা তিন-চার বন্ধু হাঁ করে শুনেছিল সেই গল্প। উপাসনার জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। হলে বোধহয় ও অজ্ঞানই হয়ে যাবে।

শাড়ি পরতে পরতে উপাসনার মনে হল, না, না জয়দেবকে ও চুমু খাওয়ার সুযোগই দেবে না। ওসব বিয়ের পরে হবে। আজ ও দূরে দূরে থাকবে। জয়দেবের নাগালের বাইরে। মনে হয় না, জয়দেব জোরজার করবে। ছেলে হিসাবে ও খুবই ভালো। উপাসনা ছকে নিল, ড্রয়িং রুমে গিয়ে টিভির দিকেই ও বেশি মনোযোগ দেবে। ওড়িয়া সিনেমার শেষটা ওকে দেখতেই হবে। হিরোইনের বাড়ির লোকজন খুব চটে আছে হিরোর উপর। ব্যতিক্রম হিরোইনের বোন। হিরোই সে খবর দিচ্ছে। উপাসনার মনে হল, আরে.....ওর অবস্থাও তো সিনেমার হিরোইনের মতন। নবদ্বীপ থেকে ফোন করে বোন বাড়ির খবর দিচ্ছে। কথাটা মনে হতেই উপাসনা তীব্র তাগিদ অনুভব করল, সিনেমাটা দেখার। জয়দেব ঘরে বসে থাকে থাকুক। ও টিভির পর্দায় চোখ রাখবে।

শাড়ি পরা শেষ হতেই পাউডারের পাফ হালকা করে মুখে বুলিয়ে নিল উপাসনা। লাল রঙের একটা টিপও পরে নিল। হালকা প্রসাধন সেরেই ওর মনে হল, ধ্যাৎ কেন এসব করতে গেলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে একবার দেখে, ও লঘু পায়ে বেরিয়ে এল গেস্ট রুম থেকে। তারপর ড্রয়িং রুমে এসে বলল, 'চা করে দেবো, না শরবত?'

জয়দেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। এই রে, সোফা থেকে উঠে আসবে না কি? উলটোদিকে, নিরাপদ দূরত্বে সোফায় বসার আগে ফিরে তাকাল উপাসনা। চোখে চোখ রাখতেই ও ফের টের পেল, ওর স্তনবৃন্ত শক্ত হয়ে গিয়েছে। আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে উপাসনা বলল, 'কী হল, জবাব দিলে না যে। হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?'

'মান্না দে-র একটা গানের কথা মনে পড়ল, তাই। সেই গানটা......ও কেন এত সুন্দরী হল, এমনি করে ফিরে তাকালে, দেখে তো আমি মুগ্ধ হবোই। আমি তো মানুষ।'

লজ্জা পেয়ে উপাসনা বলল, 'তুমি বোসো, আমি শরবত নিয়ে আসছি।'

'থাক দরকার নেই। আমি উঠব। আমাকে একবার গোরাদের বাড়ি যেতে হবে। তার আগে শুনে যাই, নবদ্বীপ থেকে তোমার বোন কী দুঃসংবাদ দিল।'

'শ্রীবৎস এখনও নবদ্বীপে ফেরেনি। ফলে আমাদের কথা এখনও ওখানে কেউ জানে না। আমি সিওর, নবদ্বীপে ফিরে ও প্রথমেই পিসিকে ফলাও করে সব বলবে। পিসি আমাদের বাড়িতে গিয়ে হাউমাউ করে সব জানাবে। মা তারপরই আমাকে ফোন করে ফিরে যেতে বলবে। আমার রিসার্চের এখানে ইতি। কী হবে, পর পর আমি ভেবে রেখেছি।'

'না তুমি হাল ছেড়ে দেবে না।' গলার স্বর বদলে গিয়েছে জয়দেবের। গম্ভীর গলায় ও বলল, 'কাল তুমি আমাদের সঙ্গে পুরীতে যাবে। গোরাকে নিয়ে আমি কাল ওখানে যাচ্ছি।'

উপাসনা বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ? তুমি জানো না, শ্রীবৎস এখন ট্রুপ নিয়ে পুরীতে আছে? ওখানে যদি ফের তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে, তাহলে আরও স্ক্যান্ডাল ছড়াবে। ওর সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই।'

'দেখে, দেখুক। আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। আমি কথা দিয়েছিলাম, রিসার্চের কাজে তোমাকে আমি সাহায্য করব। কাল অবধূতজিকে আমি এ ব্যাপারে ফোন করে ছিলাম। উনি বললেন, পুরীর দশ কিলোমিটার দূরে ত্রিকালদর্শী এক সাধু আছেন। তাঁর নাম পানিবাবা। তিনি নাকি জল ছাড়া আর কিছু খান না। শুধু জল খেয়ে বহু বছর বেঁচে আছেন। লোকে বলে এক হাজার বছর। ওই পানিবাবাই নাকি জানেন, শ্রীচৈতন্যদেব ফের কোথায় জন্মেছেন। চৈতন্যদেবকে উনি শুধু দেখেনইনি, একসঙ্গে নাকি ওরা দাক্ষিণাত্যেও গেছিলেন। অবধূতজি তো আমায় বললেন, আগে উনি পানিবাবার কাছে প্রায়ই যেতেন। ওঁর কাছে পানিবাবা নাকি একবার স্বীকারও করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে ফিরে এসেছেন। কোথায় জন্মেছেন, সেটা তিনি জানেন।'

শুনতে শুনতে উপাসনা অবাক হচ্ছিল। আচার্যমশাই একবার বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে মাত্র চৌষট্টি জন জানেন, পুনর্জন্ম নেওয়ার পর চৈতন্যদেব এখন কোথায় আছেন। পানিবাবা কি সেই চৌষট্টি জনের একজন? হতে পারে। একটু আশার আলো দেখতে পেল উপাসনা। আগ্রহ নিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'আমরা গেলে উনি কি কিছু বলবেন?'

'চেষ্টা করে দেখাই যাক না। অবধূতজি বলেছেন, আমাদের পানিবাবার কাছে নিয়ে যাবেন। উনি খুব পণ্ডিত। উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক মানুষ। প্রায় তিরিশ বছর ধরে পুরীতে রয়েছেন। চৈতন্যদেব সম্পর্কে এমন অনেক কিছু জানেন, যা কোনও বইতে তুমি পাবে না। আমার তো মনে হয়, অবধূতজির কাছে তোমার একবার যাওয়া উচিত। ইন ফ্যাক্ট, তোমার কথা আমি ওঁকে বলেছি। উনি তোমাকে দেখতেও চেয়েছেন।'

'কাল কখন তোমরা যাবে পুরীতে?'

'দুপুরের দিকে। লাঞ্চ করার পর। আমি সকালের দিকে যেতে চেয়েছিলাম। গোরা রাজি হল না। ওর মা-ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। পুজো-টুজো না সেরে উনি বেরোতে পারবেন না। এদিকে শুনলাম, সুশোভনদার শরীর নাকি খুব খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছেন না। মাঝে খোঁজ নিতে পারিনি। খুব খারাপ লাগছে খবরটা শুনে। কী আশ্চর্য লোক দেখো, আমায় কিন্তু উনি কিছু জানাননি। পাছে ওঁর জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। খবরটা আমাকে দিলেন হোটেলের ম্যানেজার।'

গোরাদার মা সঙ্গে যাবেন শুনে উপাসনা একটু নিশ্চিন্ত হল। নবেন্দু আর স্বাতীর সঙ্গে আগে ওকে কথা বলতে হবে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার, পুরীতে গেলে কবে ও ভুবনেশ্বরে ফিরতে পারবে? প্রশ্নটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কবে নাগাদ ফিরে আসা যাবে?'

'বলতে পারছি না। আসলে গোরাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। নবেন্দুই ঠিক করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা পুরী হাসপাতালে রিসার্চ করছেন প্যারাসাইকোলজি নিয়ে। একেক সময় গোরা কেন যে চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পায়, সে সব নিয়ে উনি পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন। একদিনে হয়ে যেতে পারে, আবার দু'তিনদিনও লাগাতে পারে। গোরার মা কিন্তু এসব কিছু জানেন না। ওঁকে বলা হয়েছে, প্রভু জগন্নাথ টেনেছেন। তাই গোরার পুরী যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। বুঝেছ ব্যাপারটা?'

'পুরীতে আমি গেলে কি কোনও কাজ হবে? আচায্যিমশাই কিন্তু আমাকে বলেছিলেন, রিসার্চ কমপ্লিট করার জন্য জাজপুর অথবা কটকে গিয়ে খোঁজ করতে।'

'আমাকে কিন্তু অবধূতজি বললেন, অন্য কথা। শ্রীচৈতন্যদেব জন্মেছেন গো-বলয়ের কোনও একটা জায়গায়। মানে কথায় কথায়, এটাই নাকি পানিবাবা বলেছিলেন ওঁকে। জায়গাটার নামও অবধূতজি আমায় তখন বললেন। কিন্তু সেই সময়কার নাম। মনে পড়ছে না। মানে পাঁচশো বছর আগে জায়গাটার নাম তো এখনকার মতো ছিল না। এখনকার নাম আজমগড়। এটা উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত একটা শহর।'

'কুখ্যাত কেন?'

'কাগজে পড়োনি? ওটা তো মাফিয়াদের ডেন। দুবাইয়ের যেসব মাফিয়ার নাম প্রায়ই কাগজে দেখা যায়, তাদের অনেকের বাড়ি ওই আজমগড়ে। তা ছাড়া, আর্মস কেনাবেচারও জায়গা। মহাত্মারা তো এইসব জায়গাতেই জন্ম নেন। পাপীদের উদ্ধার করতে।'

'আচ্ছা, ওখানে গিয়ে মহাপ্রভুর খোঁজ করা যায় না?'

'না, আজমগড়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই। অবধূতজি আমায় বললেন, মহাপ্রভু জন্ম নেওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। যখন তাঁর দিন সাতেক বয়স, তখন তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন কেউ। কিন্তু মহাপ্রভু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান। তখন পুণ্যাত্মারা ওঁর বাবা আর মাকে নির্দেশ দেন, মহাপ্রভুকে গোপন কোথাও রাখতে হবে। কয়েকজন সাধু মিলে গোপনে মহাপ্রভুকে কোথাও রেখে আসেন। মহাপ্রভুর যখন চব্বিশ বছর বয়স হবে, তখন সেই সাধুরাই গিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবেন।'

'মহাপ্রভুর বাবা আর মায়ের নাম কি পানিবাবু বলেছেন?'

'হ্যাঁ বলেছেন। বাবার নাম বিষ্ণুশর্মা আর মায়ের নাম সুমতি। কিন্তু তাঁরাও এখন আর আজমগড়ে নেই। ওই সাধুরা ওড়িশার গোপন কোনও জঙ্গলের মধ্যে এক ভগ্ন মন্দিরে তাঁদেরও রেখে দিয়েছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিন তাঁরাও নাকি বেরিয়ে আসবেন।

আমার মনে হয়, অবধূতজিও এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। তুমি যদি ওঁর কাছে যাও, খুঁটিনাটি আরও কিছু জানতে পারবে।'

'তোমার কি মনে হয়, অবধূতজি যা বলছেন, অথেনটিক?'

'ওঁকে অবিশ্বাস করা ধৃষ্টতা।' বলেই জয়দেব সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর বলল, 'তুমি যদি যেতে চাও, ফোনে জানিয়ে দিয়ো। আমি চললাম।'

এ কী, জয়দেব চলে যাচ্ছ যে? মনে মনে এত কল্পনা করে রেখেছিল, কিছুই তো হল না। কী হল, উপাসনা বোকার মতো বলে বসল, 'প্লিজ, যেয়ো না। একা থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

একান্ন

পুরী যাওয়ার পথেই দিদির ফোন পেল জয়দেব। এই ক'দিন বাড়ির কথা ও ভুলেই গেছিল। নানা ঘটনার টানাপোড়েনে ওর মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল। বিশেষ করে, উপাসনার জন্য। বইমেলা যে ঘাড়ের কাছে, সেটাও ওর মনে ছিল না। মোবাইলে সেটে দিদির নামটা দেখে ও সতর্ক হয়ে গেল। কোনও খারাপ খবর নেই তো? কালেভদ্রে দিদি ফোন করে। গল্প করার থাকলে মিস্‌ড কল দেয়। যাতে খরচাটা ভাইয়ের উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আর্জেন্ট কিছু বলার থাকলে দিদি কখনো ফোন কাটে না। দিদি ফোন ধরে আছে। তার মানে, ইম্পর্ট্যান্ট কিছু বলার আছে। জয়দেবের বুকটা গুরগুর করে উঠল। ও যে পুরীতে এসেছে, সেটা মাকে বলেনি। বলে এসেছিল, পুরুলিয়ায় বইমেলাতে যাচ্ছে। এখন মুখ দিয়ে যেন সত্যি কথাটা না বেরিয়ে যায়। তাহলে মা খুব দুঃখ পাবে।

বেলা বারোটার সময় টাটা সুমোতে ওরা বেরিয়েছে। প্রথমে দলটা ছিল চারজনের। কিন্তু মাসিমা জোর করে প্রিয়াকেও টানলেন। ড্রাইভারের পাশে বসেছে জয়দেব। ওর ঠিক পিছনের সিটেই উপাসনা, মাঝে মাসিমা আর ডানদিকে প্রিয়া। একেবারে পিছনের সিটে গোরা। হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছে সুমো আশি-নব্বই কিলোমিটার স্পিডে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ। পিছন থেকে একটা বাস ক্রমাগত হর্ন দিয়ে যাচ্ছে ওভারটেক করার জন্য। দিদির সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার জন্য জানলার কাচটা তুলে দিল জয়দেব। সেটের সুইচ অন করে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, বল। কোত্থেকে করছিস?'

ও প্রান্ত থেকে দিদি বলল, 'বেহালায়। বাবাইয়ের ছুটি। তাই মায়ের কাছে চলে এলাম। তুই এখন কোথায়?'

পিছনে উপাসনা যাতে শুনতে না পায়, তার জন্য জয়দেব নিচু গলায় বলল, 'পুরুলিয়ায়। ঝাড়গ্রাম থেকে মা কবে ফিরেছে?'

'সে খবরটা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছিস? তুই কী এমন বিরাট ব্যবসা করছিস জয় যে, মায়ের খবরটাও নিতে পারিস না?'

কথা চলতে দিলে দিদি গাঁক গাঁক করে চেল্লাবে। দিদিগিরি ফলাবে। তাই গোড়াতেই জল ঢেলে দিল জয়দেব। বলল, 'এ হে, একদম ভুল হয়ে গেছে রে দিদি। মাকে দে, কথা বলি।'

'না, মা এখন পুজোর ঘরে। তোর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোন। তোর জন্য একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। বেহালার মেয়ে। খুব সুন্দর দেখতে। মেয়েটার কাকিমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে রিসেন্টলি। আমায় ফোটো দিয়েছিল। মায়ের খুব পছন্দ হয়েছে ফোটো দেখে। লেখাপড়া জানা মেয়ে। খুব শান্ত স্বভাবের। তোর সঙ্গে মানাবে। আমরা অবশ্যি মেয়েটাকে চোখে দেখিনি। ওর কাকিমা বলল, কোথায় যেন গেছে। তুই ফিরলে ওকে ডেকে পাঠাবে। আমি বলছি ভাই, এই মেয়েটাকে রিজেক্ট করিস না। আমার মন বলছে, পারফেক্ট ম্যাচ হবে।'

দিদি এ নিয়ে গোটা পাঁচেক সম্বন্ধ এনেছে। একইভাবে পাঁচটা মেয়ের গুণগান করেছে। জয়দেব মনে মনে হাসল। ওকে সংসারী করার জন্য দিদির এখন এমন অবস্থা হয়েছে, কারোর সঙ্গে পরিচয় হলেই বলে, আমার ভাইয়ের জন্য একটা মেয়ে দেখে দিন না। প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য ও বলল, 'দিদি, এখন মেলা শুরু হয়ে গেছে। পরে তোর সঙ্গে কথা বলব।'

'ভাই শোন, লাইনটা কেটে দিস না। মেয়েটার ছবি বাবাই তোকে মেল করে দিচ্ছে। রাতের দিকে আমায় জানিয়ে দিস, তোর কেমন লাগল। মা বলল, তুই ফিরে এলেই পাকা কথা বলতে যাবে। কবে ফিরছিস রে ভাই?'

'দিন সাতেক তো লাগবেই। মাকে জানিয়ে দেবো। ছাড়ি তাহলে। লোকজন এসে পড়েছে।' বলে জয়দেব নিজেই ফোনটা কেটে দিল। দিদি পারেও বটে। শ্বশুরবাড়িতে কাজকর্ম কিছু করতে হয় না। ক্রমশ মুটিয়ে যাচ্ছে। ওর যত উৎসাহ অন্যদের নিয়ে। তবে দিদির মনটা খুব ভালো। ছোটোবেলা থেকেই তো দেখছে। দিদি খুব ভালোবাসে ওকে। দিদির পছন্দের এই মেয়েটাকে দেখে অবশ্য জয়দেবের কোনও লাভ নেই। কাল রাতে হোটেলে ফিরে ও ঠিকই করে ফেলেছে, উপাসনাকেই বিয়ে করবে। এ ছাড়া ওর কোনও উপায়ও নেই। স্বাতীদের বাড়িতে কাল রাতে ওদের মধ্যে যা হয়ে গিয়েছে, তাতে জয়দেব এখন আর পিছিয়ে আসার কথা ভাবতেই পারে না।

মোবাইল সেট ড্যাশ বোর্ডের উপর রেখে জানলার কাচটা নামিয়ে দিল জয়দেব। ওর মনটা অস্থির। ইচ্ছে করেই ও সামনের সিটে বসেছে। যাতে উপাসনার সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। গোরারা উঠবে ওর পার্টির এক নেতার হোটেলে। সেটা স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি। সেখানে চারটে ঘরের কথা বলে রেখেছিল গোরা। কিন্তু গাড়িতে ওঠার পরই জয়দেব ঠিক করে নিয়েছে, ও পুরনো ডিউক হোটেলেই উঠবে। ওর ঘর বুক করা আছে। তা ছাড়া সুশোভনদাও ওই হোটেলে। গোরা গাইগুই করছিল দেখে জয়দেব যুক্তি দিয়েছে, 'সুশোভনদার শরীর ভালো নেই গোরা। ওর কাছাকাছি আমার থাকা উচিত।' কথাটা শুনে গোরা আর আপত্তি করেনি।

মাসিমা কী যেন কথা বলছেন প্রিয়ার সঙ্গে। হঠাৎ বললেন, 'জয়দেব, আশপাশে কোথাও ডাবওয়ালা দেখতে পেলে একবার গাড়ি থামিয়ো তো বাবা। প্রিয়ার খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

উপাসনা বলল, 'আমার কাছে জলের বোতল আছে। দেবো মাসিমা?'

মাসিমা বললেন, 'না মা। প্রিয়া আমার খুব সাত্ত্বিক টাইপের মেয়ে। খুব ছোঁয়াছুঁয়ি বাতিক। এক্কেবারে আমার মতন। আমি তো মা বাইরে বেরোলে নির্জলা উপোষ করি।'

উপাসনা বলল, 'আমার বাবা-মাও ঠিক আপনার মতো। আমাদের নবদ্বীপের বাড়িতে রাধারমণ জিউর বিগ্রহ আছে। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো। জানেন মাসিমা, মাছ-মাংস খান বলে সেখানে আমার কাকিমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

পিছন থেকে গোরা বলল, 'যত্তসব বাজে নিয়ম। এসব পালটানো দরকার।'

মাসিমা বললেন, 'তুই থাম তো গোরা। কলকাতায় ম্লেচ্ছদের সঙ্গে থেকে থেকে তুইও ম্লেচ্ছদের মতো কথা বলছিস। কী জানি, লুকিয়ে লুকিয়ে তুইও আদা-রসুন চেখেছিস কি না? তোর পাশের ঘরে থাকে যে রে....সেই রাসবিহারীবাবুর ঘরে একবার ঢুকেছিলুম। বাব্বা, পেঁয়াজ রসুনের গন্ধে তো আমার বমি উঠে আসার মতো অবস্থা সেবার। ম্যাগো....।'

জয়দেব মজা পাচ্ছে, মা-ছেলের কথাবার্তা শুনে। মাসিমা যদি জানতেন, ম্যাকডোনাল্ডে গিয়ে ও হ্যামবার্গার খেয়েছে, তাহলে তো ঘরে ঢুকতেই দিতেন না। পিছন থেকে উপাসনার হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার ওর হাসিমুখটা দেখার খুব ইচ্ছে হল জয়দেবের। কিন্তু ইচ্ছেটা ও দমন করল। কিছুতেই উপাসনার সামনে ও স্বাভাবিক হতে পারছে না। কাল রাতে ওর কী যে হল। স্বাতীদের বাড়ি থেকে ও তো চলেই আসছিল। কিন্তু উপাসনা বসতে বলে যেন চুম্বকের মতো ওকে টেনে রাখল। কেন বলল, একা থাকতে ভালো লাগছে না? না বললে জয়দেব কি সাহস পেত?

উপাসনাকে জড়িয়ে ধরে প্রথম চুমুটা জয়দেব দিয়েছিল ওর কপালে। 'এ কি করছ?' বলে সোফার অন্য প্রান্তে সরে গিয়েছিল উপাসনা। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ধরে টেনেছিল জয়দেব। একেবারে কোলের কাছে নিয়ে এসেছিল। এবং অবাক হয়ে লক্ষ করেছিল, উপাসনা বাধা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করল না। এই প্রথম একজন যুবতীর দেহ ওর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। শাড়ির আঁচল সরে গিয়ে তার ফরসা স্তনের উপরিভাগ স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে। উপাসনার শরীর দিয়ে জুঁই ফুলের সুবাস পাচ্ছিল জয়দেব। শরীরে হঠাৎই উত্তেজনা। দু'হাত অঞ্জলির মতো করে উপাসনার মুখটা ও তুলে ধরেছিল তখন। 'এই না না। প্লিজ, ছাড়ো আমাকে।' দুর্বল গলায় বলেছিল উপাসনা। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছিল জয়দেব।

জীবনে কখনও কোনও মেয়েকে চুমু খায়নি। কিন্তু উপাসনার নরম ভিজে ঠোঁট স্পর্শ করা মাত্র জয়দেবের শরীরের ভেতর একটা কিছু দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল। ঝড়ের গতিতে ও তখন চুমু খেতে শুরু করে। উপাসনার সারা মুখমণ্ডলে, গলায়, ঘাড়ের পিছনে। বুকে মুখ ঘষার সময় জয়দেব লক্ষ করেছিল, উপাসনা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়েছে। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। পুরো শরীরটা ও ছেড়ে দিয়েছে জয়দেবের হাতে। ঠোঁটে ফের একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে উপাসনাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলও। ফের অবাক হয়ে গেছিল এটা লক্ষ করে যে, উপাসনা ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

'মা, এই তো ডাবওয়ালা।' পিছন থেকে প্রিয়া হঠাৎ বলে উঠল। 'এই ভাইনা....টিকে রুহ।'

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাচ করে গাড়িটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে জয়দেব দেখল, রাস্তার বাঁ পাশে কয়েকটা ডাবওয়ালা বসে রয়েছে। আশপাশে বেশ কিছু দোকানঘর। কাছেই একটা বাস স্ট্যান্ড। জায়গাটা ওর চেনা চেনা লাগল। কিন্তু কিছুতেই নামটা মনে করতে পারল না। চট করে ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ওর নিজেরও তেষ্টা পেয়েছে। অন্য সময় হলে জলের বোতল চেয়ে নিত উপাসনার কাছ থেকে। কিন্তু আজ অস্বস্তি হচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওরা কাছাকাছি রয়েছে। তবুও উপাসনা ওর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। জয়দেব বুঝতে পারছে না, উপাসনা এত গম্ভীর কেন? কাল রাতে কি স্বাতীর কাছে ও ধরা পড়ে গেছে? চলে আসার সময় জয়দেব লক্ষ করেছিল, উপাসনার ঠোঁট দুটো বেশ ফুলে রয়েছে। ঠোঁটের আর দোষ কী?

ডাবওয়ালাকে কয়েকটা ডাব কাটতে বলে জয়দেব গাড়ির দিকে তাকাল। ওর দু'হাত দূরেই বসে আছে উপাসনা। রোদ আড়াল করার জন্য মাথায় ঘোমটার মতো আঁচল জড়িয়েছে। ওর মুখটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। ওর ঠোঁটের দিকে তাকাল জয়দেব। না, ফুলে থাকার কোনও চিহ্ন নেই। দেখে নিশ্চিন্ত হল ও। এক পলক উপাসনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা আনন্দে ভরে গেল। ফুলের মতো এই মেয়েটা কাল রাতে ওর বুকে মাথা দিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজেছিল। ওকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। গোরা ঠিকই বলেছিল, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। না হলে এভাবে কেউ আত্মসমর্পণ করে? না, অন্য কোনও মেয়ের কথা জয়দেব আর ভাবতেই পারবে না। রাতে ফোন করে দিদিকে ও বলে দেবে, মেয়ে ফেয়ে দেখার কোনও দরকার নেই। ও কাকে বিয়ে করবে, ঠিক করে ফেলেছে।

গাড়ি থেকে গোরাও নেমে এসেছে। ওর পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। সত্যি খুব হ্যান্ডসাম লাগছে ওকে দেখে। আশপাশের লোক ওর দিকে তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই গোরা বলল, 'এই জায়গাটার নাম সাক্ষীগোপাল না? ওহ্, তাহলে মেরে এনেছি। পুরী আর পনেরো-ষোলো কিলোমিটার দূরে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব।'

ডাব কেটে এগিয়ে দিচ্ছে ডাবওয়ালা। সেই ডাব গাড়ির ভেতর চালান করে দিতে লাগল জয়দেব। ওর হাত থেকে একটা ডাব নিয়ে গোরা বলল, 'সাক্ষীগোপালের মন্দির মাকে দর্শন করালে কেমন হয় জয়দেব? যাবে নাকি?'

জয়দেব নিচু স্বরে বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। ডাক্তারের অ্যাপোয়েন্টমেন্ট সেই সন্ধে ছ'টায়। হাতে অনেক সময় আছে। মাসিমাকে একবার জিজ্ঞেস করো না।'

মাসিমা বোধহয় শুনতে পেয়েছেন গোরার কথা। ভেতর থেকে বললেন, 'এখন নয়

বাছা। কাল ফেরার সময় ঘুরে যাব। জগন্নাথ দর্শন করার মন নিয়ে বেরিয়েছি। এখন অন্য কোথাও যাব না। তাছাড়া বেলা এখন দেড়টা। মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে।'

মিনিট পাঁচ-সাতেক পর ডাবওয়ালার পাওনা মিটিয়ে জয়দেব আর গোরা ফের গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি পুরীর দিকে চলতে শুরু করার পর মাসিমা বললেন, 'এই সাক্ষীগোপাল মন্দিরে তুই একবার কীরকম ভুগিয়েছিলি, মনে আছে গোরা? বাপ রে, আমি তো কেঁদে-কেটে একশা হয়েছিলাম সেবার। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।'

কী হয়েছিল, তা শোনার জন্য প্রিয়ার আগ্রহ বেশি। ও জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা? উনি কী করেছিলেন মন্দিরে?'

'আর বলিস না। সাক্ষীগোপাল মন্দিরে একটা উৎসব হয়। অউরা ব্রত। দশ লাখ লোক হয় সেই সময়। সে বার গোরাকে নিয়ে আমি আর ওর বাবা মন্দিরে এসেছি। তখন কত আর বয়স ওর। সাত-আট হবে। ও মা, ছেলে হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে উধাও। মন্দিরে ঢোকার সময় আমি টের পেলাম, ও নেই। আমি ভেবেছি, গোরা ওর বাবার হাত ধরে আছে। আর ওর বাবা ভেবেছে, আমার সঙ্গে আছে। অত লোক, তার মধ্যিখানে খুঁজব কোথায়? চারদিকে কত দুষ্টু লোক ঘুরে বেরাচ্ছে। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, নির্ঘাত কোনও ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছি। কে যেন তখন বলল, চন্দনপুকুরে ডুবে যায়নি তো? শুনে আমার জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। মন্দিরের কাছে বড়ো তিনটে পুকুর আছে। চন্দন পুকুর ছাড়াও উত্তরদিকে শ্রীরাধা কুণ্ড আর দক্ষিণদিকে শ্রীশ্যাম কুণ্ড। জয়দেব, সাক্ষীগোপাল মন্দিরে গেছো কখনও?'

জয়দেব মন দিয়ে গোরার ছেলেবেলাকার কথা শুনছিল। পিছন ফিরে ও বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা, বার দুয়েক এসেছি। মন্দিরটা কী সুন্দর তাই না?'

'ঠিক বলেছ। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্য কোনও মন্দিরে পাবে না। পুরীতে থাকার সময় প্রায়ই সাক্ষীগোপালে আসতাম। অউরা উৎসবের সময় পূজ্যপাদ পদ্মনাভ আমাকে নিয়ে আসতেন মন্দিরের কাজকর্ম করানোর জন্য। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এখানে আটকা পড়ে আছেন। ঘটনাটা বোধহয় তোমরা কেউ জানো না। আমি বলছি, শোনো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে এখানে এসেছিলেন দামোদরের হয়ে সাক্ষী দিতে। আর ফিরে যেতে পারেননি। এই কারণেই এই জায়গাটার নাম হয়ে যায় সাক্ষীগোপাল।'

জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'অউরা উৎসবটা কী মাসিমা?'

'এই মন্দিরে শ্রীরাধার একটা বিগ্রহ আছে। সারা বছর শ্রীরাধার পা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু এই উৎসবের দিন তুমি এখানে এলে শ্রীরাধার পা দেখতে পাবে। সেই পা দেখার জন্য লোকের এত ভিড়। তাতে নাকি পুণ্যি হয় এয়ো স্ত্রীদের। একটা জিনিস লক্ষ করে দেখো, সারা ওড়িশায় যেখানে যত মন্দিরে শ্রীরাধার মূর্তি আছে, কোথাও শ্রীরাধার পা তুমি দেখতে পাবে না। বছরের ওই বিশেষ দিনটা ছাড়া।'

শুনতে শুনতে প্রিয়ার যেন আর তর সইছে না। ও জিজ্ঞেস করল, 'মা, তারপর কী হল? আপনার ছেলেকে খুঁজে পেলেন কী করে?'

মাসিমা বললেন, 'সে এক কাণ্ড মা। হাতছুট হয়ে ছেলে চলে গিয়েছে ভোগ মন্দিরে। পুজোর ভোগ খেতে শুরু করেছে। সেবাইতরা তো ওকে এই মারে সেই মারে। ছেলেটা কার সঙ্গে এসেছে? খুঁজতে খুঁজতে আমরাও সেই সময় ভোগমন্দিরে পৌঁছেছি। ভয়ে আমাদের মুখ চুন। গিয়ে দেখি, ছেলেকে থামের সঙ্গে সেবাইতরা বেঁধে রেখেছে। বড়ো সেবাইতকে সবাই ডাকতে গেছে। উনি কিন্তু এসে গোরাকে দেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। আদর করে ভোগ খাওয়ালেন। তারপর হাতজোড় করে আমাকে বললেন, 'মা জননী, অপরাধ নেবেন না। বালগোপালকে আপনি নিয়ে যান।'

কথায় কথায় একটা সময় গাড়ি পৌঁছে গেল পুরীতে। হোটেলের সামনে গাড়ি থামতেই তিন-চারটে ছেলে গোরাকে দেখে দৌড়ে এল। ঢিপঢিপ করে ওকে প্রণাম করতে শুরু করল। জয়দেব বুঝতে পারল, এরা দলিত পার্টির ছেলে। সত্যি রাজনীতি করার কত সুবিধে। গোরার খিদমত খাটার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা এরা এঁটুলির মতো লেগে থাকবে। ছেলেগুলোই পটাপট সব ব্যাগ নামিয়ে নিল। গাড়ি থেকে সবাই নেমে গিয়েছে। এই গাড়িতেই জয়দেব চলে যাবে, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের কাছে ডিউক হোটেলে। সেই সময় উপাসনা কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'কখন আসবে?'

জয়দেবের বুকটা শিরশির করে উঠল। ও ফিসফিস করে বলল, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। সুশোভনদাকেও নিয়ে আসবে। আর শোনো, তোমাকে না খুব সেক্সি দেখাচ্ছে।'

.....মিনিট দশেক পর ডিউক হোটেলে ঢুকেই জয়দেব ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, 'সুশোভনদা কি রুমে আছেন?'

ম্যানেজার বললে, 'না। আজ খুব ভোরে হঠাৎ উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর থেকে পাত্তাই নেই।'

বাহান্ন

ডাক্তার পদ্মিনী সতপথির চেম্বারে ঢোকার মুখে গোরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এই অঞ্চলটা ওর খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কখনও এসেছে কি? ছোটোবেলায়? হবে হয়তো। আগে বোধহয় বিরাট কোনও মন্দির ছিল। দেওয়ালের খসে পড়া ইট দেখে ওর মনে হচ্ছিল, প্রাচীন মন্দির। বহু ঝড়ঝাপটা গিয়েছে এর ওপর দিয়ে। বাইরের প্রাচীরের গায়ে নানারকম দোকানঘর। একেবারে রাস্তার ধারে জায়গা দখল করে। চওড়া রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে জগন্নাথের মন্দিরের দিকে। গোরা একবার উলটো দিকে তাকাল। ওখানে গাড়ি পার্কিং করার বিশাল জায়গা। বাইরে থেকে গাড়ি করে যাঁরা জগন্নাথ দর্শনে আসেন, তাঁদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ওখান থেকে অটো রিকশা করে অথবা হেঁটে মন্দিরে যেতে হয় তীর্থযাত্রীদের।

প্রাচীরের বাইরে রাস্তার ডানদিকে একটা ছোট্ট মন্দির। সেখানে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। গোরার

চোখ চলে গেল মন্দিরের দিকে। পুরীতে এই ধরনের মন্দির সর্বত্র। ধর্মপ্রবণ মানুষের সংখ্যা তো কম নয়। ধর্মের মায়া কাজল পরিয়ে উচ্চবর্ণের একদল মানুষ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। আরতি দেখার জন্য মন্দিরের সিঁড়িতে বেশ কিছু লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। রাস্তা থেকে বিগ্রহটা দেখতে পেল গোরা। কালো পাথরের কৃষ্ণমূর্তি, বংশীবদন। ফুল দিয়ে সাজানো। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ চমকে উঠল গোরা। এ কী, মূর্তিটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে কেন? হ্যাঁ, প্রথমবার যখন মূর্তিটা গোরা দেখে, তখন এক হাত সমান মনে হয়েছিল। আস্তে আস্তে মানুষ সমান হয়ে উঠল। অন্যরা কেউ এই পরিবর্তন লক্ষ করেছে কি না, তা দেখার জন্য গোরা আশপাশ তাকাল। কিন্তু দেখল, না, কেউ বুঝতেই পারেনি। অবাক হয়ে গোরা মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ও ভুলেই গেল, কীজন্য ওই জায়গাটায় হাজির হয়েছে।

মানুষজনের ভিড়, অটো রিকশার ধোঁয়া আর সাইকেল রিকশার হর্নের আওয়াজে গোরার কপালটা হঠাৎ টিপটিপ করতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ও ভয় পেল, এই রে আবার বোধহয় অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পাবে। ঘাড় ঘুরিয়ে ও জয়দেবকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও ওকে দেখতে পেল না। দুজনে একসঙ্গেই হোটেল থেকে বেরিয়েছিল। জয়দেব গেল কোথায়? কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফের চমক। গোরার মনে হল, বিগ্রহের শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার চোখ মেলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কিছু বলতে চাইছেন। জীবনে বহু মন্দিরে গিয়েছে ও। কোথাও এই ধরনের অনুভূতি হয়নি। পাথরের মূর্তি কি কখনও সজীব হতে পারে? মাকে বললে, হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

বিগ্রহের দিকে ফের তাকাল গোরা। মূর্তিটার মুখে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি। দেখে ওর শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। বুকের ভেতর থেকে যেন আনন্দধারা উৎসারিত হচ্ছে। সেই প্রবাহ সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তখনই ওর তুচ্ছ মনে হতে লাগল, আশপাশের মানুষজন, যানবাহন, দোকানপাটের ব্যস্ততা। গোরা টের পেল, ওর সামনে থেকে লোকজন সব উধাও। প্রাচীন জনপদের কোনও এক টোলে ও হাজির হয়েছে। অধ্যয়নরত একদল ছাত্র ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। ওর সঙ্গী কয়েকজন ছাত্রদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। সেই সময় ঘরের ভেতর থেকে একজন বয়স্ক মানুষ বেরিয়ে এসে বকাবকি শুরু করলেন ছাত্রদের....।

অন্যান্যবার দৃশ্যগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোরার ঘোর কাটে না। এবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা কেটে গেল। কেউ বোধহয় ওকে ধাক্কা দিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বর্তমানে ফিরে এল গোরা। কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরক্তভরা চোখে একবার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, ও ডাক্তার পদ্মিনীর ক্লিনিকের দিকে এগোল। সিঁড়িতে পা দেওয়ার পরও জয়দেবকে ও দেখতে পেল না। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে গোরা ক্লিনিকের ভেতর ঢুকে পড়ল। এয়ার কন্ডিশনড ঘরে ঢোকামাত্র ওর বিরক্তি উধাও। অ্যাপয়েন্টমেন্ট সন্ধে ছ'টায়। হাতে এখনও মিনিট দশেক সময় আছে। রিসেপশনের মেয়েটার কাছে হাজিরা দিয়ে ও সোফায় বসে পড়ল।

একটু পরে জয়দেব ঢুকতেই গোরা জিজ্ঞেস করল, 'আরে, তুমি কোথায় উধাও হয়ে গেলে? ঢোকার সময় তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। দেখতে পেলাম না কেন?'

জয়দেব বলল, 'আর বোলো না। হোটেলের রুমে মোবাইলটা ফেলে এসেছি। তাই পাবলিক বুথে ঢুকেছিলাম। হোটেলে ফোন করার জন্য। সুশোভনদা ফিরেছেন কি না, তা জানতে।'

'কী বলল, ফিরেছে?'

'না। এখনও ফেরেনি। গেল কোথায় মানুষটা? হোটেলের ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর লোকটা বলল, কাল সন্ধেবেলায় সুশোভনদা না কি খোঁজ করেছিলেন, কেওনঝড় যাওয়ার বাস কোথা থেকে ছাড়ে? লোকটা তখন বলেছিল, টিকিট কেটে দেবো? উনি বলেছিলেন, না। বুঝতে পারছি না, উনি একাই কেওনঝড়ে চলে গেলেন কি না। এখন সত্যি সত্যি আমার টেনশন হচ্ছে।'

'তুমি চিন্তা কোরো না জয়দেব। কেওনঝড়ে আমার পার্টির ছেলেরা আছে। ওদের বলছি, খোঁজখবর নিতে। ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে না হয় ফোন করব।'

জয়দেব কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় রিসেপশনের মেয়েটা উঠে এসে বলল, 'গোরাবাবু কে আছেন, তাঁকে ডাক্তার ম্যাডাম চেম্বারে যেতে বলছেন।'

গোরা আর জয়দেব দুজনেই মেয়েটার পিছু পিছু চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। ডাক্তার পদ্মিনীকে দেখে গোরা একটু অবাকই হল। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়। চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা বলে আরও কম দেখাচ্ছে। পরনে সাধারণ কটকি শাড়ি। চোখে ফ্যান্সি চশমা। কিন্তু চোখ দুটো খুব বুদ্ধিদীপ্ত। পরিষ্কার বাংলায় ডাক্তার পদ্মিনী হেসে ওকেই বললেন, 'আপনিই তো গোরাবাবু, তাই না? বসুন। আর আপনি জয়দেব। আপনাদের দুজনের কথাই আমাকে নবেন্দু বিশদভাবে বলেছে।'

চেম্বারটা খুব সুন্দর করে সাজানো। দেওয়ালের রঙ বেগুনি। ডাক্তারের চেম্বারের রঙ বেগুনি হয় না কি? তখনই গোরার মনে পড়ল, ইন্টারনেটে ও একটা প্রবন্ধ পড়েছিল, ক্রমোথেরাপি সম্পর্কে। শরীর আর মনের চিকিৎসার জন্য রঙের প্রভাব প্রয়োগ করেন ডাক্তাররা অনেক সময়। যেমন চর্মরোগের জন্য লাল রঙ, অনিদ্রার জন্য নীল, থাইরয়েডের জন্য সবুজ। তেমনই মানসিক সমস্যা আর স্মৃতিবিভ্রমের জন্য বেগুনি। চেম্বারের পর্দাগুলোও হালকা বেগুনি। চেম্বারে ঢুকেই কিন্তু গোরা খুব স্বস্তি পেল। ডাক্তার পদ্মিনী ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। সেটা বুঝতে পেরে ও আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার প্রবলেমটা কি নবেন্দু আপনাকে বলেছে?'

পদ্মিনী বললেন, 'বলেছে। তবে আপনার মুখ থেকেও আমি শুনব। দাঁড়ান, আগে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের রেডি হতে বলি।' ইন্টারকম-এর সুইচ টিপে নিচু গলায় কী নির্দেশ দিয়ে পদ্মিনী বললেন, 'কথা শুরু করার আগে আপনি বলুন, পুরীতে কতদিন থাকবেন?'

গোরা বলল, 'আপনার কতদিন লাগতে পারে, ম্যাডাম?'

'বলতে পারছি না। তবে আপনার কেসটা খুব রেয়ার। আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। প্লিজ, আমাকে আধ রাস্তায় ফেলে আপনি পালিয়ে যাবেন না। আমি যাঁর কাছে রিসার্চ

করছি, তিনি থাকেন আমেরিকায়। তাঁর নাম ড. টমাস গিবসন। আপনার কেসটা তাঁকে মেল করেছিলাম। উনি ভীষণ ইন্টারেস্ট নিয়েছেন। পুরোটা-অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে পাঠাতে বলেছেন।'

জয়দেব বলল, 'ম্যাডাম, আপনি দিন তারিখ নিয়ে ভাববেন না। আমরা আপাতত দিনসাতেক পুরীতে আছি। আপনি নিশ্চিন্তে রিসার্চ চালিয়ে যান।'

চেম্বারের আলো বোধহয় কমে বাড়ে রেগুলেটরে। আলোর ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে কমতে লাগল। ঘরের এক কোণে গিয়ে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নিজের ডেস্কের সামনে বসে পড়লেন ডাক্তার পদ্মিনী। তারপর বললেন 'এবার বলুন গোরা, আপনার সমস্যাটা ঠিক কী। যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে ইংরেজিতে বলুন। কেননা, ড. গিবসনের তাতে সুবিধে হবে।'

গোরা বলল, 'এটা সমস্যা কি না বলতে পারব না। বেশ কয়েক মাস ধরে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমার চারপাশে এখন যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এখনকার ঘটনা নয়। আমি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি। মানে আমার মতো দেখতে একজনকে। মনে হচ্ছে, ঘটনাগুলো আমাকে নিয়েই ঘটছে। কিন্তু সময়কাল অনেক পুরনো। ঘটনা যেখানে ঘটছে, সেখানে আমি কখনো যাইনি।'

পদ্মিনী বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। যে-কোনও একটা ঘটনার কথা বলুন তো?'

'এই তো একটু আগেই দেখলাম। মানে আপনার এই চেম্বারে ঢোকার আগে আমি যখন বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন। হঠাৎ আমার মনে হল, এই জায়গাটা আমার ভীষণ চেনা। আগেও আমি এসেছি। আমার সঙ্গে তখন আরও অনেক লোক। কারও সঙ্গে আমার বচসা হচ্ছিল। তাঁকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন বয়স্ক একজন। অন্যবারের মতো দৃশ্যটা আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখিনি। কিন্তু এবার মনে হল, দেখতে দেখতে খুব আনন্দ পাচ্ছি। কেন এমন হচ্ছে ম্যাডাম?'

'সব না শুনে আমি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারব না গোরাবাবু। বলুন তো, এই সব দৃশ্যগুলো দেখার আগে কোনও সিম্পটম টের পান?'

'হ্যাঁ হয়। প্রথমে কপালের দু'পাশটা টিপটিপ করতে থাকে। একটু পরে আর চোখ খুলে রাখতে পারি না। চোখের সামনে একটা লাল বিন্দু ফুটে ওঠে। সেটাই ঘুরতে ঘুরতে বড়ো হয়ে যায়। একটা সময় সেই বৃত্তটা আমাকে সোঁ সোঁ করে কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে। মনে হয় যেন, আমাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরই অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পাই।'

'তখন কি কোনও ধরনের ফিজিক্যাল পেন হয়? মানে ধরুন, মুখ দিয়ে গ্যাজলা ওঠা, হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরা....এপিলেপ্সি ধরনের আর কী।'

'না, না। সেরকম কিছু হয় না। বরং আমার খুব ভালো লাগে। যেন সুখের সাগরে ভাসতে থাকি। প্রেমরসে শরীর সিক্ত হয়ে যায়।'

ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ডাক্তার পদ্মিনী বললেন, 'আই সি। আচ্ছা গোরাবাবু, এই যে আপনি বলছিলেন, চেম্বারে ঢোকার আগে....রিমোট ভিউইং করছিলেন, সে সম্পর্কে ডিটেল বলবেন?'

'বলছি। দেখলাম, সামনে প্রাচীন এক বিষ্ণু মন্দির। বহুকাল আগে হয়তো মন্দিরটা খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু কোনও একটা সময় বোধহয় কেউ তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। প্রাচীর ধসে পড়েছে। কালের ঝড়ঝাপটার চিহ্ন সর্বত্র। মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ওখান থেকে জগন্নাথ মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। সামনে বিশাল বিশাল গাছের তলায় বেদি। প্রত্যুষে সেই বেদিতে বসে অধ্যয়ন করছে একদল ছাত্র। তাদের সমবেত পাঠের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর আমারই মতো দেখতে একজন নবীন সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন....।'

'আর কী দেখলেন, একটু চিন্তা করে বলুন গোরাবাবু।'

'দেখলাম, এক প্রবীণ মানুষ মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। পক্বকেশ, শুভ্র বেশ। আগেও তাঁকে দেখেছি বলে আমার মনে হল। প্রবীণ মানুষটি প্রণাম করায় নবীন সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, কৃষ্ণে মতিরস্তু। সেটা শুনে ছাত্ররা সবাই বিদ্রুপ করতে লাগল। দেখে লজ্জা পেলেন প্রবীণ মানুষটি। ছাত্রদের বকাবকি করে, নবীন সন্ন্যাসীকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন দূরে এক বটগাছের আড়ালে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তখনই জানতে পারলাম, প্রবীণ মানুষটির নাম বাসুদেব সার্বভৌম। নবীন সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, আপনি হাজির না হলে এরা আমায় পাগল অথবা মূর্খ প্রতিপন্ন করে ছাড়ত। মনে সন্দেহ ছিল, আপনার দেখা বোধহয় পাব না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঠিক মিলিয়ে দিলেন। উত্তরে সার্বভৌম বললেন, অপরাধ নিয়ো না। আমি তোমার পিতৃদেব শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের সমধ্যায়ী। আমিও নবদ্বীপেরই সন্তান। তোমার সঙ্গে আমার খানিকটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। সেই সূত্রে বলি, এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তুমি ঠিক করোনি। এই বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধও নয়। সংসারের সব সুখভোগ করে যখন ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, তখন সন্ন্যাস নেওয়া কর্তব্য। এই যে তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ, গুরুজন ভেবে কত লোকে তোমাকে প্রণাম করছে। এতে তোমার অহংকার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

ডাক্তার পদ্মিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনে নবীন সন্ন্যাসী কী বললেন?'

'দাঁড়ান ম্যাডাম, মনে করে বলি।' কয়েক সেকেন্ড পর গোরা বলল, 'নবীন সন্ন্যাসী বললেন, আপনি আমার শুভানুধ্যায়ী। যা বলছেন, ঠিক। কিন্তু যে সময়ে আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম, তখন কৃষ্ণের জন্য আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আমাকে দোষ দেবেন না। শুনে সার্বভৌম বললেন, তোমার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম দেখে আমার শ্রদ্ধাই হচ্ছে। কিন্তু একটা অনুরোধ করি। তুমি আর জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর যেয়ো না। কেন এ কথা বলছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার মধ্যে যে ভাবরস দেখলাম, তাতে আমার মনে হয়, মন্দিরের সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন, তার আড়ালে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করাই তোমার পক্ষে শুভ। তোমার সঙ্গে গোপীনাথ বলে যে এসেছে, তাকে তুমি রোজ সঙ্গে

নিয়ে যেয়ো। কখনও একা জগন্নাথ মন্দিরে যেয়ো না। কথাটা মনে থাকে যেন।'

'তারপর আর কী দেখলেন গোরাবাবু?'

'আর মনে করতে পারছি না।'

'একটু চেষ্টা করুন না প্লিজ। আপনার প্রতিটা আমার বর্ণনা কাছে ইম্পর্ট্যান্ট।'

চোখ বুজে গোরা ফের মনের গহনে ঝাঁপ দিল। নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সার্বভৌমের অনেক কথাই হয়েছিল। সে সব ওর মনে পড়ছে না এখন। চিন্তা করার সময় ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠতে লাগল। হঠাৎ চোখের সামনে নবীন সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। মাটির দাওয়ায় শুয়ে আছেন। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত আলো। অদূরে তুলসীমঞ্চের কাছে আলাপরত বাসুদেব সার্বভৌম আর গোপীনাথ। বাসুদেব জানতে চাইছেন, মিশ্রপুত্র কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছে। গোপীনাথ বলছেন, ভারতী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। শুনে অসন্তোষ সার্বভৌমের কণ্ঠে। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী—এত সম্প্রদায় থাকতে, নিকৃষ্ট ভারতী সম্প্রদায়ের কাছে সন্ন্যাস নিতে গেলেন কেন মিশ্রপুত্র?

ক্লিক করে একটা শব্দ হল। ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে উঠে এলেন ডাক্তার পদ্মিনী। তারপর বললেন, 'থাক, আজ আর কিছু মনে করতে হবে না। আপনাকে খুব টায়ার্ড বলে মনে হচ্ছে।'

কানের পাশ দিয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গোরা মুখ মুছে নিল। তারপর বলল, 'তা লাগছে। দুপুরে এই গরমে এতটা ট্রাভেল করে এসেছি....।'

পদ্মিনী হেসে বললেন, 'কিন্তু আপনার তো ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়। যারা পলিটিকস করেন, তাদের তো প্রচুর ট্রাভেল করতে হয়। নবেন্দুর মুখে শুনেছি, আপনি নাকি দলিত পার্টির নেতা?'

গোরা বলল, 'ঠিক শুনেছেন। যাক সে কথা, আগে বলুন তো আমার ঠিক কী হয়েছে?'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনি একজন ক্লেয়ারভয়েন্ট। তবে আমি সিওর নই। কিছু লক্ষণ মিলছে। এই যে একটু আগে এক ভগ্ন মন্দিরের কথা আপনি বললেন, তার সঙ্গে অতীতের ইতিহাস মিলে যাচ্ছে। এখানে একটা বিষ্ণু মন্দির ছিল। ইন ফ্যাক্ট, আমার চেম্বারের পিছন দিকে গেলেই তার বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। ওখানে এখন একটা অনাথ আশ্রম চালান পূজ্যপাদ পদ্মনাভ বলে একজন। বয়স্ক দেবদাসীরাও ওই ভগ্ন মন্দিরের অতিথিশালায় বাস করেন। অতীতে এর কাছেই থাকতেন বাসুদেব সার্বভৌম। আপনি শনিবার সন্ধেবেলায় ফের এই সময়টায় আসুন। আপনাকে হিপনোটাইজ করে জানার চেষ্টা করব, কেন ওই দৃশ্যগুলো দেখেছেন।'

একটু পরে জয়দেবের সঙ্গে গোরা ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। রাস্তায় লোকজনও কমে এসেছে। রাস্তায় নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোরার চোখ চলে গেল ছোট্ট মন্দিরটার দিকে। চেম্বারে ঢোকার সময় ও যেখানে সন্ধ্যারতি

হতে দেখেছিল। মন্দিরের দরজা এখন বন্ধ। সিঁড়িতে বসে আছে একটা লোক। ভালো করে তাকাতেই গোরা চিনতে পারল লোকটাকে। আরে সুশোভনদা না? হ্যাঁ, উনিই তো! এই গরমে গায়ে মাথায় কম্বল জড়িয়ে উনি বসে আছেন কেন?

তিপ্পান্ন

অচৈতন্য অবস্থায় কতক্ষণ পুরন্দর মেঝেতে পড়েছিল, ও বুঝতে পারল না। চোখ মেলার পরে আবছা আলোয় ও দেখল, ওপরের ছাদটা হাঁ হয়ে আছে। আলো আসছে কোথা থেকে? আলোর রেখাপথ ধরে ঘাড় ঘোরাতেই পুরন্দরের চোখে পড়ল, জ্বলা অবস্থায় টর্চটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল, একটু আগে মন্দাকিনীর কঙ্কালকে কবর দেওয়ার জন্য ওপর তলায় ও মেঝে খুঁড়ছিল। ইস, কঙ্কালটা তাহলে ওপরেই রয়ে গিয়েছে। গায়ের ওপর ইট, চুন-বালির স্তূপ। সেগুলো সরাতে গিয়ে ও টের পেল, ডান পায়ের গোড়ালির কাছটায় চিনচিন করছে।

কোনওরকমে উঠে বসে টর্চটাকে হাতে তুলে নিল পুরন্দর। আশপাশটায় একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। ওদের অনাথ আশ্রমের নীচে পাতাল ঘর আছে, একথা ও ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছে। পাতাল ঘরে শেকল দিয়ে সেখানে দৈত্য দানোদের বেঁধে রেখেছেন পূজ্যপাদরা, এসব ভয়ও ওদের তখন দেখানো হত। বেগড়বাই করলে, ওপর থেকে নিচে ছুড়ে ফেলা হবে। আর দৈত্য দানোরা তখন ওদের জ্যান্ত গিলে খাবে। ছোটোবেলায় পূজ্যপাদদের এসব কথা ধ্রুবসত্য বলে মনে হত। এখন আর মনে হয় না পুরন্দরের। পূজ্যপাদরা নিজেদের স্বার্থে অ্যাদ্দিন এসব বুঝিয়েছেন। ওঁদের কথা সত্যি হলে, অ্যাদ্দিনে পুরন্দরের শরীর চর্মরোগে ছেয়ে যাওয়ার কথা।

ধীরে ধীরে উঠে বসার পর পুরন্দর বুঝতে চেষ্টা করল, শরীরের কোনও অংশে চোট লেগেছে কী না। গোড়ালির দিকে টর্চের আলো ফেলতেই ও দেখল, কয়েকটা ছিনে জোঁক কামড়ে ধরেছে। ফুলে ঢোল হয়ে আছে। তার মানে অনেকক্ষণ ধরে রক্ত খাচ্ছিল। গোড়ালির কাছটায় চিনচিনানির কারণ তাহলে জোঁক? তখনই ও টের পেল, থকথকে কাদার ওপর বসে আছে। ওহ্, এই কারণেই তাহলে ও গুরুতর চোট পায়নি। কিন্তু পাতাল ঘরে কাদা এল কোত্থেকে? জোঁকগুলোকে তুলে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে পুরন্দর পাতাল ঘরটা ভালো করে দেখতে লাগল। চারপাশের দেওয়ালগুলো স্যাঁতস্যাঁতে। বোধহয় উপর থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে পড়ে। মেঝে ক্ষয়ে গিয়েছে। তলার মাটি উঠে এসেছে।

প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় এল পুরন্দরের, সেটা হল, উপরের তলায় ফিরে যাবে কী করে। কয়েকদিন আগে বন্ধ দরজা খুলে ও পাতাল ঘরে নেমে আসার একটা সিঁড়ি খুঁজে পেয়েছিল। সেই সিঁড়িটা ওকে খুঁজে বের করতে হবে। দরজাটা ভেতর থেকে খোলা যাবে না। দরকার হলে ভেঙে ফেলতে হবে। মনস্থির করে পুরন্দর টর্চের আলো চারদিকে ঘোরাতে লাগল। নাহ্, কোথাও সিঁড়ি দেখতে পেল না ও।

দেওয়ালের চারধারে এক চক্কর দিয়ে এসে পুরন্দর ফের পড়া মেঝের নিচে এসে দাঁড়াল। দশ-বারো ফুট নীচেই ও দাঁড়িয়ে আছে। দড়ি বেয়ে ও উঠে যেতে পারে। নিচে আছাড় খাওয়ার সময় দড়িটা ওর সঙ্গেই ছিল। নিশ্চয় পাতাল ঘরের কাদার মধ্যে কোথাও পড়ে আছে। দড়ি খোঁজার সময় পুরন্দর গাইতি, বেলচা আর শাবলটাও দেখতে পেল। সেইসঙ্গে মন্দাকিনীর দুমড়ে যাওয়া কঙ্কালটাও। দেখে ও নিশ্চিন্ত হল।

অন্য কেউ হলে আতঙ্কে বিবশ হয়ে যেত। কিন্তু পুরন্দর অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। ফের দেওয়ালগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ ও একটা সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করল। দু'পাশে বট, অশত্থের ঝুড়ি নেমে এসেছে। পায়ের তলায় কাদা। সংকীর্ণ পথ ধরে খানিকটা এগোতেই ভ্যাপসা গন্ধে পুরন্দরের দম বন্ধ হয়ে এল। জীবনের বহু বছর ও পাতাল ঘরে কাটিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে গুমঘরের কতটা তফাত, ও তা জানে। সুড়ঙ্গপথের বদ্ধ আবহাওয়ায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পুরন্দর থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, ভুবনেশ্বরে রামচন্দ্র দইতাপতি বলেছিলেন, বিষ্ণু মন্দিরের নিচে একটা বিশাল সুড়ঙ্গপথ আছে। তার একটা প্রান্ত চলে গিয়েছে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে, অন্য প্রান্ত বিমলা মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওহ্, এটাই তাহলে সেই সুড়ঙ্গপথ! এখানেই তাহলে নতুন মন্দির তৈরি করে আসল মন্দিরের প্রভু জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার বিগ্রহকে কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন রাজা দিব্যসিংহদেব।

কথাগুলো মনে পড়ামাত্র দ্বিগুণ উৎসাহে পুরন্দর এগোতে শুরু করল। টর্চের আলোয় তখনই ও দেখতে পেল, বিরাট একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাথরের চাতাল। এক প্রান্তে একটা পালঙ্ক রয়েছে। এক নজরেই পুরন্দরের মনে হল, এটা কোনও বিশ্রাম কক্ষ। পায়ের তলা থেকে কাদা উধাও। পাথরের রাস্তা দিয়ে খুব সাবধানে, কোনওরকম শব্দ না করে পুরন্দর হাঁটতে লাগল। ওর পিঠে ক্যানভাসের ব্যাগে শাবল, গাইতি, মোটা দড়ি আর ছুরি। বাঁ হাতে টর্চ। প্যান্টের পকেট থেকে ও পিস্তলটা বের করে আনল। পূজ্যপাদরা কতরকম ভয় দেখাতেন পাতাল নিয়ে। বলা যায় না, কতরকম আজব জীবের মুখোমুখি হতে পারে পুরন্দর। তখন পিস্তল দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে।

কিন্তু একটু পরেই ওর মন থেকে যাবতীয় শঙ্কা দূর হয়ে গেল। টর্চের আলোয় পুরন্দর দেখতে পেল, দেওয়ালের দু'পাশে খোদাই করা রয়েছে নানা দেবদেবীর মূর্তি। টর্চের আলো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘোরাতেই ওর চোখে পড়ল, সমুদ্র মন্থনের কাহিনি খোদাই করা আছে দেওয়ালে। তার মানে খুব কাছাকাছি দেবালয় রয়েছে। দ্রুত পায়ে খানিকটা এগোতেই দেওয়ালের উলটোদিক থেকে কারও কথা ওর কানে ভেসে এল। দেওয়ালের ওপাশে কারা যেন কথা বলছে। এই পাতালপুরীতে এত রাতে কারা আসতে পারে? পুরন্দরের স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল পাতাল ঘরে কাটানোর জন্য ওর শ্রবণশক্তি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। দেওয়ালে কান রেখে পুরন্দর শোনার চেষ্টা করল, ও প্রান্তে কী কথা হচ্ছে।

না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ফলে সংলাপগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। পুরন্দর একবার ভাবল, শাবল দিয়ে দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে ফেলবে কী না। পর মুহূর্তেই সিদ্ধান্তটা ও বদলে ফেলল। দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করলে শব্দ হবে। উলটো দিকে যারা আছে, তারা সতর্ক হয়ে যাবে। তার থেকে বরং দেখা যাক, প্রাকৃতিক কারণেই দেওয়ালের কোথাও ভাঙা আছে কি না। টর্চের আলো ফেলে পুরন্দর দেখতে লাগল। কয়েক মিনিট পর হঠাৎই ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, ওর আন্দাজই ঠিক। ছাদের একটা অংশে চিড়, বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে দেওয়ালে গায়ে। ওই অংশে হালকা আলোর আভা। পুরন্দর নিশ্চিত হয়ে গেল, দেওয়ালের ও প্রান্তের সংলাপগুলো ও শুনতে পাচ্ছিল, ওই অংশটা ফাঁকা আছে বলেই। মেঝে থেকে ফাঁকা অংশটার উচ্চতা পুরন্দর চোখ দিয়ে মেপে নিল। বারো-চোদ্দো ফুটের বেশি হবে না। দেওয়ালের খোদাই করার মূর্তিগুলোর ভাঁজে পা রেখে ও তরতরিয়ে উঠে গেল ওই ফাঁকা অংশে।

চোখ ধাতস্থ হতেই পুরন্দর যা দেখল, তাতে চমকে উঠল। বিশাল একটা হলঘর। দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় প্রথমেই ওর চোখে পড়ল, হলঘরের মাঝে উঁচু বেদিতে কাচের বাক্সে একটা নরকঙ্কাল শোয়ানো আছে। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা। সাত ফুটও হতে পারে। একনজরেই পুরন্দরের মনে হল, এই কঙ্কাল সাধারণ মানুষের নয়। কার হতে পারে, এই প্রশ্নটা ওর মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো প্রশ্ন ওর মাথায় এল, পাতাল ঘরে কারা এই কঙ্কলটা গোপনে রেখে দিয়েছে? কেনই বা রেখেছে? কাচের বাক্স থেকে একটা অদ্ভুত রশ্মি ঠিকরে বেরোচ্ছে। মশালের আলোর মতো হলদেটে নয়। একেবারে সাদা, জুঁই ফুলের মতো সাদা সেই রশ্মি।

কাচের বাক্সর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না পুরন্দর। ডানপাশে চোখ সরাতেই ও দেখতে পেল, আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুজন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। একজনকে ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ভালো করে দেখতেই চমকে উঠল পুরন্দর। আরে, পূজ্যপাদ পদ্মনাভ না? হ্যাঁ, উনিই তো। এখানে....এত রাতে? পরনে সাদা ধুতি, খালি গায়ে জড়ানো সাদা উত্তরীয়। প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে যেতেই ক্রোধ সঞ্চারিত হতে লাগল পুরন্দরের মনে। ভোগী একটা মানুষ, ধর্মের খোলসে সমাজের মাথা হয়ে বসে আছেন। ভাবতেই ওর হাত নিসপিস করে উঠল। ইচ্ছে করলে পিস্তলটা বের করে, অভ্রান্ত নিশানায় ও শেষ করে দিতে পারে ওই দুরাচারী পাপীটাকে। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু অত সহজে পদ্মনাভকে মারবে না পুরন্দর। এর আগেও একবার সুযোগ পেয়েছিল। তখন নিজেকে নিবৃত্ত করেছিল যে যুক্তিতে, সেটাই ওকে দমিয়ে দিল। না, আগে শোনা দরকার, কী কারণে পদ্মনাভ এখানে? সঙ্গী লোকটাই বা কে? ও কান পেতে রইল।

পদ্মনাভ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই ঠিক জানিস, ছেলেটা বিশাখা মাহেরির ছেলে?'

নিজের মায়ের নামটা শুনে পুরন্দর ফের চমকে উঠল। এঁরা গোরাভাইয়ের কথা বলছে না কি?

পরক্ষণেই ওর মনে হল, তা নাও হতে পারে। পুরীতে বিশাখা নামের মহিলার অভাব নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ মাহেরিও হতে পারেন। পদ্মনাভর সঙ্গী লোকটা কী বলে, সেটা শোনার জন্য ও উৎকীর্ণ হয়ে উঠল। লোকটা দু'হাত পিছনে রেখে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ পূজ্যপাদ, আমার খবরে ভুল নেই। ছেলেটা বিশাখা মাহেরিকে সঙ্গে নিয়েই পুরীতে এসেছে। স্বর্গদ্বারের কাছে ওর পার্টির একটা ছেলের হোটেলে আছে। মাকে নিয়ে ছেলেটা সেখানেই উঠেছে। কাল বিকেলে ও বিষ্ণু মন্দিরের সামনে ডাক্তারখানায় গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ই সুশোভন বলে বুড়ো লোকটাকে ওরা দেখে ফেলে। সুশোভনকে ওরা হোটেলে নিয়ে গেছে। এবার আপনার কী আদেশ, সেটা বলুন। সেজন্যই ভোরবেলায় ছুটে এলাম।'

'সুশোভন লোকটাকে ভয় দেখিয়েছিলি বিম্বিসার?'

'মারাত্মক ভয় দেখিয়েছি। পাতাল ঘরে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে দু'দিন ধরে এমন অত্যাচার করেছি, এমন শেকড় বাকড় খাইয়েছি, লোকটার মাথার গন্ডগোল হয়ে গেছে। এখন আর কারোর কথা মনে করতে পারছে না। সব ভুলে গেছে। দিনের আলোয় বাইরে বেরোতে চাইছিল না। আমিই ওকে টানতে টানতে রাস্তায় বের করে দিয়েছি। লেখাপড়া জগতের মানুষ। ভেতো বাঙালি। কেন যে এদের মাথায় রিসার্চের ভূত চাপে....'

'ভালো করেছিস। সুশোভন একটু বেশিই জেনে ফেলেছিল। তুই ওকে ফলো না করলে হয়তো অ্যাদ্দিনে ও কেওনঝড়ের মন্দিরে পৌঁছে যেত। আর.....ওখানে একবার সাধুসন্তদের সুনজরে পড়ে গেলে আমাদের খুব মুশকিল হয়ে যেত।'

'পূজ্যপাদ, জয়দেবটাকে কি খতম করে দেবো?'

'এখন না। হ্যাঁরে, ওর সঙ্গে একটা মেয়েও না কি শুনলাম, জুটেছে?'

'হ্যাঁ পূজ্যপাদ। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মেয়েটা নবদ্বীপের। জয়দেবের সঙ্গে ওর ভাবভালোবাসা চলছে।'

'তাই না কি? মেয়েটাকে আজ রাতে তুলে আনতে পারবি?'

'স্বচ্ছন্দে। গত দু'দিন ধরে দেখলাম, সন্ধেবেলার দিকে জয়দেবের সঙ্গে সী বিচে যাচ্ছে। অন্ধকারে অনেক রাত্তির অবধি বসে থাকে। ওখান থেকে তুলে আনা অসম্ভব না। আদেশ করুন, কোথায় নিয়ে তুলব।'

'বেলি মাদেলির ঘরটা ফাঁকা আছে। মেয়েটাকে ওখানে তুলতে পারিস। আজ রাতটা ওই ঘরেই আমি কাটাব।'

'আরেকটা নিবেদন আছে।'

'চটপট বল। আমাকে এখন মন্দিরে যেতে হবে। দ্বার খোলার সময় হয়ে গেল।'

'পুরন্দর এখন পুরীতে আছে।'

'তোকে কে বলল?'

'সিবিআই অফিসার বিমল রাউত। ওদের কাছে খবর আছে। আমি লোক লাগিয়ে রেখেছি। যদি ওকে পাই, তাহলে কি খতম করে দেবো?'

'একদম না। ওকে জ্যান্ত অবস্থায় আমার সামনে হাজির করবি। হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে ও গদ্দারি করেছে। ওকে আমি এমন শাস্তি দেবো, নরকেও কেউ সেই শাস্তি পায় না। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি বিম্বিসার, পুরন্দর ছেলেটা ডেঞ্জারাস টাইপের। ওর গায়ে অমানুষিক শক্তি। তোকে মেরে ফেলতে ওর এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। সাবধান, খুব সাবধান।' কথাগুলো বলেই অন্ধকারে দিকে হাঁটতে শুরু করলেন পদ্মনাভ। বিম্বিসার বলে লোকটাও পিছু পিছু চলে গেল।

দেওয়ালের খাঁজে দু'হাতে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল পুরন্দর। বিম্বিসার তাহলে ওরই মতো। পদ্মনাভর গোপন সংগঠনের কর্মী। পদ্মনাভ এখন ওকে দিয়ে কুকর্মগুলো করাচ্ছেন। বিম্বিসারের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল পুরন্দরের। কত বয়স হবে ছেলেটার? তেইশ-চব্বিশ, তার বেশি নয়। বিম্বিসারও হয়তো কোনও মাহেরির জারজ সন্তান। বেচারা জানেও না, ধর্মরক্ষার নামে পদ্মনাভের মতো লোকেরা ওকে দিয়ে কত পাপ করাচ্ছে। পদ্মনাভ আর বিম্বিসারের কথাগুলো ফের ও মনে করার চেষ্টা করল। সুশোভন বলে লোকটা কে, পুরন্দর তা জানে না। কিন্তু কথাবার্তায় এটুকু ও বুঝতে পেরেছে, একটা ভালো মানুষকে বিম্বিসার মানসিকভাবে অসুস্থ করে দিয়েছে। জটিবড়ি খাইয়ে। এটা করা যায়।

বেলি নানীর মুখে ও শুনেছে। উনি এই লোকগুলোকে জানেন। ওরা কোনও সময় এক জায়গায় থাকে না। ঘুরে ফিরে বছরে একবার করে পুরীর আশপাশে আসে।

একটু আগে ক্রোধে পুরন্দরের শরীর জ্বলছিল। কিন্তু হঠাৎই, কেন জানে না, গোরাভাইয়ের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। পদ্মনাভ খোঁজ নিচ্ছিল গোরাভাইয়ের। কিন্তু কেন? নিশ্চয় কোনও খারাপ মতলব আছে। দীর্ঘদিন হেড কোয়ার্টার্স-এর হয়ে কাজ করেছে পুরন্দর। নেট ওয়ার্ক কত ভালো, সে সম্পর্কে ওর একটা আন্দাজ আছে। সারা দেশ জুড়ে ওদের নেট ওয়ার্ক। মুহূর্তে খবর পৌঁছে যায় হেড কোয়ার্টার্সে। কিন্তু গোরাভাই সম্পর্কে এদের আগ্রহের কারণটা কী? ভুবনেশ্বরে পুরন্দর যে ক'দিন মায়ের বাড়িতে ছিল, সেই ক'দিন লক্ষ করেছে, গোরাভাই দলিত পার্টির হয়ে কাজকর্ম করে। ওর কাছে প্রচুর লোকজনও আসে। মা পছন্দ করেন না, ওর পার্টি করা। একদিন মন্দিরে বসে কার কাছে যেন দুঃখ করছিলেন। ছেলেটার ধর্মে মতি নেই, সমাজের নিচু তলার লোকজন নিয়ে সারাদিন মাতামাতি করে। যজ্ঞ করে ছেলের মতি ফেরাতে হবে।

একটু আগে বিম্বিসার বলে ছেলেটা জয়দেবের খবর দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটা মেয়েরও। পুরন্দর নিশ্চিত, মেয়েটাকে ও ট্রেনে পুরী আসার সময় দেখেছে। সেই অবিবাহিত মেয়েটাই হবে। ফুলের মতো মেয়েটাকে পদ্মনাভ তুলে নিয়ে গিয়ে বেলি নানীর ঘরে ঢোকাতে বলল। তার মানে বেলি নানীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন পদ্মনাভ। কথাটা ভাবতেই সারা শরীর ফের জ্বলে উঠল পুরন্দরের। বেলি নানী যাবেন কোথায়? ওঁর উপর পদ্মনাভর হঠাৎ ক্রোধের কারণটাই বা কী? তবে কি উনি জেনে গেছেন, বেলি নানীর

ঘর থেকেই মন্দাকিনীকে ও তুলে এনেছিল? না না, তা কী করে সম্ভব? ও বিপদে পড়বে, এমন কথা বেলি নানী কাউকে বলবেন না। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, বেলি নানী স্বেচ্ছায় মাদেরিদের আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন? অসম্ভব কিছু নয়।

অনেকগুলো প্রশ্ন পুরন্দরের মাথায় এসে ভিড় করল। বেলি নানী কোথায় আছেন, সেটা পরে খুঁজে ও বের করবে। তার আগে নবদ্বীপের ওই মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার। মেয়েটার নাম মনে করার চেষ্টা করল পুরন্দর। উপা.....উপাসনা বলেই ডাকাডাকি করছিল অন্যরা সেদিন। উপাসনাকে কিছুতেই পুরন্দর ভোগের সামগ্রী হতে দেবে না পদ্মনাভর। পুরীতে কি মেয়েটা জয়দেবের সঙ্গে এসেছে? যদি এসে থাকে, তাহলে সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরের কাছে একটা হোটেলে আছে। কেননা, ট্রেনে জয়দেব কথায় কথায় ডিউক হোটেলের নাম বলেছিল। হ্যাঁ, হোটেলের নামটা পুরন্দরের স্পষ্ট মনে আছে। ওর স্মৃতিশক্তি এতটা খারাপ নয়।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে পুরন্দর মুখ তুলে নিচের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ চলে গেল কাচের বাক্সটার দিকে। আরে এ কী! কাচের বাক্সের ভেতর নরকঙ্কালটা গেল কই? পুরন্দর স্পষ্ট দেখল, কাচের বাক্সের ভেতর টান টান শুয়ে আছে গোরাভাই। নিথর, পরনে একটুকরো কাপড়ও নেই। ওর কাঞ্চন বর্ণের শরীরটা থেকে অদ্ভুত একটা আভা বেরুচ্ছে। এক পলক মাত্র। তারপরই চোখের সামনে থেকে গোরাভাইয়ের দেহটা মিলিয়ে গেল। দেখে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল পুরন্দর। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল!

চুয়ান্ন

মাকে ভুবনেশ্বর রওনা করিয়ে দিয়ে হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে এল গোরা। মায়ের সঙ্গে চলে গেলেন বেলি নানীও। বলে গেলেন, আর কোনওদিন পুরীতে ফিরবেন না। বেলি নানীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল গোরা। দু'দিন আগে মাকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিল ও। সেখানেই হঠাৎ ওদের সঙ্গে বেলি নানীর দেখা হয়। দীর্ঘদিন পর মাকে দেখতে পেয়ে বেলি নানীর সে কী কান্না! মন্দির দর্শন করার পর বেলি নানীকে ওরা হোটেলে নিয়ে আসে। দু'তিন দিন ধরে নানী হোটেলে যাতায়াতও করছে সকাল-সন্ধ্যা। মায়ের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, গোরা জানে না। কাল রাতে মন্দির থেকে ফিরে আসার পর মা হঠাৎ বলল, 'এখানে বোধহয় বেলির মন টিকছে না রে গোরা। আমার কাছে গিয়ে থাকবে বলছে। কী করি, বল তো বাছা।'

গোরা বলেছিল, 'বেশ তো, নিয়ে চলো। তুমি কথা বলার একটা লোক পাবে।'

শুনে মা খুব খুশি হয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ওর কে

এক পুষ্যি মেয়ে আছে। কী নাম বলল যেন...অম্বা.....না কি অম্বালিকা। বলছে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। এখানে তাকে ফেলে গেলে, না কি তার মহা বিপদ। আমি ভাবছি, একটা সোমত্থ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? মন্দিরের লোকজন তো সবাই ভালো নয়, বাছা। কার কী ইন্টারেস্ট আছে মেয়েটাকে নিয়ে, কী করে জানব। পরে না আবার ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাই।'

গোরা বলেছিল, 'তোমার মন কী বলছে মা?'

শুনে হেসে ফেলেছিল মা, 'শয়তান ছেলে, ডিসিশনটা ফের আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস।'

গোরা বলেছিল, 'আমাকে পরখ করছ কেন মা? আমি তো জানি, ডিসিশন তুমি নিয়ে ফেলেছ। মেয়েটাকে ফেলে তুমি যাবে না।'

'তাহলে কাল সকালেই চল ফিরে যাই। প্রিয়ার বাবা আজ ফোন করেছিল। মেয়ের জন্য না কি তাঁর মন খারাপ করছে। ফিরে গিয়ে তোদের চার হাত করে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্দি। প্রভু জগন্নাথের কাছে সেটাই বলে এলাম আজ।'

মা ধরেই নিয়েছে, প্রিয়াকে বিয়ে করার ব্যাপারে ও অমত করবে না। মেয়েটা এমনিতে খারাপ না। দেখতে সুন্দর, নম্র স্বভাবের। হাউসওয়াইফ হিসাবে যে-কোনও ওড়িয়া পরিবারে মানিয়ে নেবে। কিন্তু ওর জীবন তো সরল পথে বইবে না। গোরা সেটা জানে। পার্টির লিডার হিসাবে প্রচুর ঝড়ঝঞ্ঝা ওকে ফেস করতে হবে। কখন কোথায় থাকবে, ও নিজেই জানে না। একটা জিনিস গোরা বুঝতে পেরে গিয়েছে, কলকাতায় ফিরে যাওয়া ওর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। ওকে যা কিছু করতে হবে, ভুবনেশ্বরেই। পার্টির সংগঠন ওখানে খুব এলোমেলো অবস্থায় আছে। গুছিয়ে তোলার জন্য ওকে প্রচুর সময় দিতে হবে। ঠিক এই সময়টায় বিয়ে করার ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ওর কোনও অধিকার নেই, প্রিয়ার জীবনটাকে নষ্ট করার। কথাটা মুখ ফুটে মাকে বলতে পারছে না গোরা। বললেই মা হাউমাউ করে উঠবে। কিন্তু একদিন-না-একদিন ওকে যে বলতেই হবে। ভালো হল, মায়ের সঙ্গে থাকার জন্য বেলি নানী ভুবনেশ্বরে গেলেন। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

বেলি নানী সঙ্গে ছিলেন বলেই গোরা মাকে পাঠিয়ে দিতে পারল। মা জেদ ধরে বসেছিল, ওকে না নিয়ে পুরী থেকে নড়বে না। এদিকে, আজ বিকেলেই সেই সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি হিপনোটাইজড করে কীসব এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলেছেন। তাতে সময় লাগবে। মাকে বোঝায়, সুশোভনদা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। ওঁর শরীরের যা অবস্থা, তাতে খুব তাড়াতাড়ি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। জয়দেব একা সামলাতে পারবে না। গোরারও পুরীতে থাকা দরকার। অসুস্থ একটা লোককে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যায় না কি? মা এসব গল্পে চট করে কাতর হয়ে পড়ে। বেলি নানীও তখন সায় দিয়েছিল। একটা অসুস্থ লোককে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। তাই মা আর গাঁইগুঁই করেনি। মাকে কথা দিতে হয়েছে,

সুশোভনবাবুকে নিয়ে জয়দেব আর উপাসনা যে ট্রেনে কলকাতায় যাবে, সেই ট্রেনেই গোরাকে ভুবনেশ্বরে যেতে হবে। ও যেন কোনও সময় একা পুরীতে না থাকে। রাস্তায় একা একা চলাফেরা না করে। অদ্ভুত, কী একটা ভয় যেন মাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। গোরা বুঝতে পারছে, সেই ভয়টা ওকে ঘিরেই।

মায়ের দিকে থেকে মন সরিয়ে সুশোভনবাবুকে নিয়ে ভাবতে লাগল গোরা। সেদিন রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সিঁড়িতে ভাগ্যিস ও সুশোভনবাবুকে দেখতে পেয়েছিল। ওঁকে নিয়ে আসার পর থেকে ভদ্রলোক একটা কথাও বলেননি। ও বা জয়দেব নানাভাবে প্রশ্ন করেছে। ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখ দুটো গোলগোল। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মারাত্মক ভয় পেয়ে মানুষের যেমনটা হয়। সুশোভনবাবুর ওই অবস্থা দেখে অপরাধবোধে ভুগছে জয়দেব। বারবার বলছে, বয়স্ক মানুষটাকে এর মধ্যে না জড়ালেই বোধহয় ভালো করতাম গোরা। আমারই দোষ। গোরা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে, তোমার দোষ কোথায়? সুশোভনবাবু গবেষক মানুষ, তুমি মানা করলেও উনি শুনতেন কি না, সন্দেহ। কালে রাতে হাসপাতালে গিয়েছিল জয়দেব। পরে ফোন করে জানাল, সুশোভনদার শারীরিক অবস্থা একটু ভালো। দু'তিন দিন ধরে মুখে কিছু দিচ্ছিলেন না। কাল রাতে না কি হালকা খেয়েছেন। শুনে গোরা বলেছে, সুশোভনদাকে একবার পদ্মিনী ম্যাডামের কাছে নিয়ে গেলে বোধহয় ভালো হবে। ওঁর রোগটা যত না শারীরিক, তার থেকেও বেশি মানসিক।

পুরীতে আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে। স্নান করার জন্য পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলতেই গোরা সেটা টের পেল। আগে স্নান করে নেওয়া দরকার। বেলা দশটার সময় জয়দেবের আসার কথা। ঠিক হয়ে আছে, ওরা যাবে, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে অবধূত গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। পুরীতে আসার দিন পাঁচেক হয়ে গেল, জয়দেব বারবার বলছে, তবুও গোস্বামীজির কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জয়দেবের কাছে ওঁর পাণ্ডিত্যের কথা এত শুনেছে যে, ওঁকে দেখার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে গোরার। মাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য ও সময় বের করতে পারেনি। আজ সকালে ও যাবেই। সেই কারণে পার্টির ছেলেদের আসতে বারণ করে দিয়েছে।

টয়লেটে ঢোকার আগেই ডোর বেলের শব্দ শুনতে পেল গোরা। সঙ্গে সঙ্গে ও পাঞ্জাবিটা ফের গলিয়ে নিল। বোধহয় জয়দেব এসে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে, টুবাইকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল।

বলল, 'তুই পুরীতে কবে এলি?'

'এই এখনই। তুই এত অবাক হচ্ছিস কেন আমায় দেখে? আমরা খবরের কাগজের লোক, যখন তখন যে-কোনও জায়গায় হাজির হতে পারি।'

গোরা বলল, 'তা তো বটেই। আয় ভেতরে আয়। নিশ্চয়ই কোনও খবরের গন্ধে হাজির হয়েছিস। খবরটা কী?'

ঘরের ভেতর ঢুকে এল টুবাই। কাঁধের কিট ব্যাগটা মেঝেয় রেখে সোফায় বসে বলল, 'খবর একটা নয়, একাধিক। জগন্নাথ মন্দিরের এক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কর্তার একমাত্র মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে। অতীব সুন্দরী মেয়েটার নাম মন্দাকিনী, বিবাহিতা। উনি পুলিশকে কিছু জানাননি। উলটে, ঘটনাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মন্দাকিনীর হাসবেন্ড পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেছে, ওর স্ত্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পিছনে বিরাট রহস্য আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, কমপ্লেন করার পরদিনই মন্দাকিনীর হাসবেন্ডের ডেড বডি পাওয়া যায়, এক প্রস্টিটিউটের ঘর থেকে। কাগজ থেকে আমাকে তাই পাঠিয়েছে, খবরটা করার জন্য। মন্দাকিনীর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার রহস্যটা কী?'

'এ তো গেল একটা খবর। অন্যগুলো কী?'

'কাত্যায়নী। তোর মনে আছে, ভুবনেশ্বরে তোকে গল্প করেছিলাম, বিকট দর্শন এক ধরনের প্রাণীকে নিয়ে গাঁয়ে গঞ্জে নানারকম কথা রটেছে। রাতের বেলায় আকাশ থেকে নেমে এসে, কাত্যায়নীরা মৃত মানুষ খেয়ে ফেলছে। পুরীতেও ইদানীং কয়েকটা কেস পাওয়া গেছে। আমাদের করেসপন্ডেন্ট খবরটা করেছিল। তার ফলো আর করতে হবে। আমাদের চারদিকে কীসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, বল তো। যাক সে কথা, আগে বল, মাসিমারা কোন ঘরে আছেন?'

'মা নেই। আজই চলে গেলেন ভুবনেশ্বরে।'

'কাল রাতে প্রিয়াকে ফোন করেছিলাম। কই বলল না তো, আজ চলে যাবে?'

'হঠাৎ ঠিক হল। ব্যাপার কী রে? প্রিয়ার সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে না কি? জানি না তো?'

'দলিত পার্টি ছাড়া আর কোনও খবর তুই রাখিস? আমার তো মনে হয় না।'

শুনে গোরা হো হো করে হাসতে লাগল। হাসি থামতেই ও বলল, 'আমার দলিত পার্টির ওপর তোর এত রাগ কেন বল তো?'

'তোকে স্পয়েল করছে বলে। কাল বিকেলে একটা খবরের জন্য আমি ফোন করেছিলাম পুরীর কালেক্টর বাসুদেব পট্টনায়েককে। তুই যে আমার খুব ক্লোজ উনি জানেন। পিপলির সেই ঘটনার পর আমিই ওকে সে কথা বলেছিলাম। কাল উনি কি বললেন শুনবি? গোরাবাবু যত তাড়াতাড়ি পুরী ছাড়বেন, ততই ওর পক্ষে মঙ্গল। আমাদের কাছে খবর আছে, একটা দুষ্ট চক্র ওর পিছনে লেগেছে। তারা খুব ডেঞ্জারাস। আমরাও কিন্তু গোরাবাবুকে প্রোটেক্ট করতে পারবে না।'

শুনে গোরা হাসতে লাগল। 'তোর কি মাথা খারাপ? কী বলছিস, আমি বুঝতে পারছি না টুবাই। দুষ্ট চক্র আমার পিছনে লাগবে কেন?'

'তা জানি না। হয়তো বাসুদেব পট্টনায়েক জানেন। খুলে বলতে পারছেন না। ওঁদের কাছে আগাম খবর থাকে। আমি যে কাজে এসেছি, সেটা যদি হয়ে যায়, তাহলে আজই আমি ভুবনেশ্বরে ফিরে যাব। তুইও আমার সঙ্গে যাবি। প্লিজ, হালকাভাবে নিস না।'

ওহ্, টুবাই তাহলে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। কালেক্টর সাহেবের কথায় ভয় পেয়ে। আসলে উনি চাইছেন না, দলিত পার্টির সমাবেশ ঘিরে পুরীতে অশান্তি হোক। পিপলির কথা মনে আছে বলে হয়তো কালেক্টর সাহেব ভয় দেখিয়েছেন টুবাইকে। কিন্তু যেতে চাইলেও গোরা এখন যাবে কী করে? এক, বিকেলে পদ্মিনী ম্যাডামের কাছে ওকে যেতেই হবে। দুই, সুশোভনবাবুর অসুস্থতা। তিন, পুরীতে দলিতদের সমাবেশের আয়োজন। এই তিনটে কথা ওর মাথায় পাক দিতেই গোরা বলল, 'না রে, আজ আমার যাওয়া হবে না। এখানে কিছু কাজ বাকি আছে। তার থেকে বরং দুই-একটা দিন তুই থেকে যা। তারপর একসঙ্গে ফিরে যাব। তুই ছিলি কোথায় বল তো অ্যাদ্দিন?'

'দেশের বাড়িতে গেছিলাম। কেন্দ্রাপড়ায়। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। ওখানে গিয়ে আটকে গেলাম। তুই তো জানিস, আমার জ্যাঠামশাই খুব বিদ্বান ছিলেন, গবেষকও। উনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিলেন প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য। উনি একটা লাইব্রেরির মতো করেছিলেন কেন্দ্রাপড়ায়। আমাদের বাড়ির লাগোয়া একটা হলঘরে। প্রচুর বই আর পুঁথি আছে লাইব্রেরির আলমারিতে। জ্যাঠামশাই বেঁচে থাকার সময় আমরা কেউ ওই লাইব্রেরিতে ঢোকার সাহস পেতাম না। উনি মারা যাওয়ার পর থেকে জেঠিমা লাইব্রেরিতে তালা দিয়ে রেখেছিলেন। আমার একটাই জ্যাঠতুতো ভাই। সে দিল্লিতে থাকে, ফাইনান্স মিনিস্ট্রির অফিসার। তার কোনও আগ্রহ নেই বইপত্তর নিয়ে। এবার জ্যাঠামশাইয়ের কাজে গিয়ে হঠাৎই ওই লাইব্রেরিতে ঢুকেছিলাম। আলমারিগুলো খুলে দেখি, জ্ঞানের ভাণ্ডার সাজানো রয়েছে।'

'কী নিয়ে উনি গবেষণা করেছেন।'

'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে। জ্যাঠামশাই প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলো কোথাও পাবলিশড হয়নি। তার মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ পড়ে আমার চোখ খুলে গেল। ভাবছি, রিপোর্টারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, আসল জ্ঞানের চর্চা করব। লোকে বলে, আমরা না কি মহাপ্রভুর বংশধর। জ্যাঠামশাই আমাদের বংশপঞ্জি নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। ওঁর কাজটা আমাকে শেষ করতে হবে। মনস্থির করার জন্য দেশের বাড়িতে কয়েকটা দিন রয়ে গেলাম, বুঝলি। ফিরে এসেছি বটে। তবে সত্যি বলছি ভাই, মনের ভেতর একটা অদ্ভুত তাগিদ দিচ্ছে। মহাপ্রভু সম্পর্কে আরও আরও অনেক কিছু জানার জন্য। আমার মনে হয়, এটাই আমার লাস্ট অ্যাসাইমেন্ট। রিপোর্টারের চাকরিতে অনেক মিথ্যাচারণ করতে হচ্ছে। আর পারব না। এখান থেকে ফিরে গিয়ে অফিসে রেজিগনেশন দিয়ে দেব।'

গোরা একটু অবাকই হল টুবাইয়ের কথা শুনে। এই তো কিছুদিন আগে রিপোর্টারের চাকরিটা নিল। তখন কত উৎসাহ। আর এর মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে? কিন্তু এটা ওর ডিসিশন। কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। ও তাই বলল, 'জয়দেবের সঙ্গে তুই একবার কথা বলতে পারিস। ও এই একই সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করছে। তোদের দুজনেরই উপকার হবে।'

টুবাই জিজ্ঞেস করল, 'জয়দেব কি পুরীতে আছে, না কলকাতায় চলে গেছে?'

'পুরীতেই আছে। ইন ফ্যাক্ট একটু পরে ও আমার এখানেই আসছে। কিন্তু তোর হঠাৎ এই পরিবর্তনটার কথা শুনে ভাই আমার একটু অবাকই লাগছে।'

টুবাই একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'মনের পরিবর্তনটা এমনি এমনি হয়নি ভাই। এটা বিধিনির্দিষ্টই ছিল। জানবি, আমাদের যা কিছু হয়, তা আগে থেকেই লেখা থাকে। বললে তুই বিশ্বাস করবি না, দেশের বাড়িতে যাওয়ার আগে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টে কেওনঝড়ের জঙ্গলে গেছিলাম। সেখানে হঠাৎ দেখা পেলাম এক সাধুর। প্রায় সাত ফুট লম্বা। দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ওঁর ভেতর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। মানে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি, বুঝলি। একটা গাছতলায় বসে উনি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। গাঁয়ের কিছু দেহাতি মানুষ, সভয়ে দূরে বসে। শুনলাম, গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় এই লম্বাবাবা থাকেন। সেখানে কেউ যেতে পারে না। বছরে একটা মাত্র দিন উনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন। আমার কপাল ভালো, সেদিনই আমি ওখানে হাজির...।'

'সাধু কী বললেন তোকে?'

'আশ্চর্য ভাই, দূরে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, সাধু আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। তারপর শুনতে পেলাম, কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলছেন, তুই যে কাজের জন্য এখানে এসেছিস, সেটা তোর কাজ নয়। ছোটোবেলা থেকে তুই এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আছিস। তাঁকে চিনতে পারিসনি। খুব শিগগিরই বুঝতে পারবি। তার পা দু'টো জড়িয়ে ধরিস। শেষের দিন যে এগিয়ে এল রে। কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে যা। শুনে আমি চমকে উঠলাম। কে, কে বলল, এ কথা? সাধুর দিকে তাকাতেই দেখি, উনি কিন্তু চোখ বুজে রয়েছেন। মহাপুরুষ বলতে সাধুবাবা কাকে মিন করেছেন, বল তো গোরা? ছোটোবেলা থেকে.....আমি তো অনেক ভেবেও তোকে ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবতে পারছি না। তোর শরীরে মহাপুরুষের লক্ষণ কিন্তু রয়েছে।'

শুনে গোরার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। ওর জীবনের সঙ্গেও যে সাধুসন্তরা জড়িয়ে রয়েছেন! টুবাই সে সব জানে না। বহুদিন আগে মুকুন্দ একবার বলেছিল, ও যখন ঘুমোয়, তখন না কি মাথার কাছে সাধুরা পাহারা দেন। চেতলার রাসবিহারীবাবু পুলিশ রেইড-এর রাতে একবার সাত ফুট লম্বা এক সাধুর কথা বলেছিলেন। ইনিই কি সেই সাধু? না, না, তা কী করে হবে? ইনি তো থাকেন কেওনঝড়ের গভীর জঙ্গলে। চেতলায় হাজির হবেন কী করে? মায়ের মুখে অবশ্য গোরা শুনেছে, উচ্চমার্গের সাধুরা সূক্ষ্মদেহে সর্বত্র বিচরণ করেন। ও জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কী হল?'

'কিছুক্ষণ পর লম্বাবাবা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন জঙ্গলের দিকে। খানিকটা দূর গিয়ে, একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কী মধুর হাসি। আনন্দরসে আমার বুকটা জুড়িয়ে গেছিল। কেন এমন হল বল তো?'

টুবাই কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় গোরার ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা অন

করতেই গোরা উলটোদিকে জয়দেবের উত্তেজিত গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো, গোরা....হাসপাতাল থেকে বলছি। সুশোভনদার কন্ডিশন খুব খারাপ। হঠাৎ ডিটোরিয়েট করেছে। ডাক্তার বললেন, বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তুমি এখনই একবার আসতে পারবে?'

•

পঞ্চান্ন

সুশোভনদার মৃত্যুসংবাদটা কলকাতার সব কাগজে বেরিয়েছে। এই খবরটা সকালেই দিয়েছিল কৌশিক। ফোনে তখন অনেকক্ষণ ধরে ও কথা বলল। কৌশিকের কাছেই কলকাতার অনেক খবর পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত জয়দেব। সেদিন দিদির ফোন পাওয়ার পর কলকাতায় ফেরার একটা তাগিদ অনুভব করছিল জয়দেব। খুব চিন্তা হচ্ছিল বইমেলা নিয়েও। ব্যবসাটা ভালো হয় ওই সময়। কিন্তু পুরীতে আসার পর সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস কৌশিক ছিল। বইমেলার জন্য নতুন বই বের করা, ম্যাগাজিনের কাজকর্ম দেখা—একাই সব ও সামলে নিচ্ছে। কৌশিক বলল, মিলনমেলায় খুব ভালো জায়গায় ওদের স্টল দিয়েছে গিল্ডের সেক্রেটারি ত্রিদিব। সংবাদ প্রতিদিন কাগজের স্টল-এর ঠিক উলটোদিকে। স্টল কীরকম হবে, তার একটা নকশাও নাকি ও মেল করে দিয়েছে। জয়দেব সেটা অ্যাপ্রুভ করলে ও কাজ শুরু করে দেবে।

কথায় কথায় কৌশিক সকালে বলেছিল, 'সুশোভনদার মৃত্যুর খবরটা নিয়ে কলকাতায় অনেকের আগ্রহ আছে। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ম্যাগাজিনের জন্য একটা লেখা পাঠান না জয়দা। নেক্সট ইস্যু তাহলে হট কেক-এর মতো বিক্রি হবে।'

আইডিয়াটা মন্দ না। শুনে ভালো লেগেছিল জয়দেবের। ছেলেটা সব সময় ম্যাগাজিন কমার্সিয়ালি চালানোর কথা ভাবছে। সুশোভনদার মৃত্যু রহস্যজনক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নামী আর্ট ক্রিটিক, কলকাতায় ওঁকে অনেকেই চেনেন। ওঁর সম্পর্কে কোনও লেখা বেরোলে লোকে উৎসাহ নিয়ে পড়বে। কিন্তু খুব বেশি মেটিরিয়াল যে জয়দেবের হাতে নেই! সুশোভনদার সম্পর্কে কোনও কিছু ও নিজে লিখতে বসলেই, মুশকিলে পড়বে। কেউ জানেন না, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন করার জন্যই সুশোভনদা পুরীতে এসেছিলেন। তাও আবার পালিয়ে। কলকাতায় কে বা কারা নাকি ওঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। পুরীতে বসে সে সব কথা লিখতে পারবে না জয়দেব। তাতে ওর নিজেরই সমূহ বিপদ। পুরীতে আসার জন্য ট্রেনে ওঠার পর থেকে একের পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একটার সঙ্গে আর একটার সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে সব লেখা যাবে না। তবুও সারাদিন ধরে ল্যাপটপে জয়দেব অনেক চেষ্টা করল, সব দিক বাঁচিয়ে লেখাটা তৈরি করে ফেলার।

সন্ধে ছ'টার আগে কোনও কাজ নেই। গোরার সঙ্গে আজ ওর ডাক্তার পদ্মিনী সতপথির

কাছে যাওয়ার কথা। গোরাকে হিপনোটাইজ করে উনি গোরার পূর্বজন্মের কথা জানার চেষ্টা করবেন। পদ্মিনী বলেছেন, এতে যদি উনি সাকসেসফুল হন, তাহলে বলে দিতে পারবেন, কেন গোরা হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে দেখে। হাতে আধ ঘণ্টার মতো সময় আছে। সময়টা কাজে লাগানোর জন্য নিজের মেল চেক করতে বসল জয়দেব। কৌশিকের পাঠানো, বইমেলায় ওদের স্টলের নকশাটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও জয়দেব মেল ওপেন করতে পারল না। টাটা ফোটন মাঝেমধ্যে এত স্লো হয়ে যায়, তখন খুব বিরক্তি লাগে। বারকয়েক চেষ্টা করে জয়দেব হাল ছেড়ে দিল। ঠিক সেই সময় মুখ তুলেই ও দেখল, হোটেলের ম্যানেজার সুশান্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু ইতস্তত করে সুশান্ত বলল, 'সুশোভনবাবুর ঘরটা যে ফাঁকা করে দিতে হবে স্যার। ঘরে কিছু জিনিসপত্তর পড়ে আছে। সেগুলো কি আপনি নিয়ে আসবেন?'

হ্যাঁ, ঘরটা খালি করে দেওয়া দরকার। জয়দেব বলল, 'কী আছে বলো তো?'

'তেমন কিছু নেই। কয়েকটা জামাকাপড়, বই আর ফাইলপত্তর।'

কলকাতা থেকে আচমকাই চলে এসেছিলেন সুশোভনদা। ফলে সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসতে পারেননি। উঠে দাঁড়িয়ে জয়দেব বলল, 'চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

সুশোভনদার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি জয়দেব। আত্মীয়স্বজনের কাউকেই চেনে না। হাসপাতাল থেকে ডেডবডি বের করতে গিয়ে মারাত্মক অসুবিধের মধ্যে পড়ে ছিল ও আর গোরা। ডেথ সার্টিফিকেটে হাসপাতাল বলেছে, বিষক্রিয়ায় সুশোভনদার মৃত্যু হয়েছে। স্লো পয়েজনিং। তার উপর শরীরের কোনও কোনও জায়গায় আঘাতের চিহ্নও ছিল। সুশোভনদার বডিটা কাটাছেঁড়ার জন্য ওরা মর্গে রেখে দিয়েছিল। ভাগ্যিস, গোরার রিপোর্টার বন্ধু টুবাই পুরীতে আছে। ও-ই পুরীর কালেক্টর মি. পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বলে ডেড বডিটা বের করে দিয়েছে। টুবাই ওদের কাগজে খবরটা করেছে। কী লিখল, তা দেখার জন্য প্রবল আগ্রহ অনুভব করল জয়দেব। ঘর থেকে বেরিয়েই বলল, 'কলকাতার ইংরেজি কাগজটা কি আজ এসেছে সুশান্ত?'

'এসেছে। সাহেবরা দেখছে। ওরা ফেরত দিলেই আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ডিউক হোটেলটা খুব বড়ো নয়। কটেজ টাইপের বারো-চোদ্দোটা মাত্র ঘর। কিন্তু সমুদ্র খুব কাছে। আর এখানে একটা ওপেন এয়ার রেস্তোরাঁ আছে। খুব সুন্দর সাজানো। রেস্তোরাঁয় বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখা যায়। এই হোটেলে যতবার জয়দেব এসেছে, প্রতিবারই দেখেছে সাহেবসুবোদের খুব ভিড়। এদিকটা নির্জন বলে বোধহয় সাহেবরা খুব পছন্দ করে। তার উপর রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটা সাইবার কাফে আছে। যাতায়াতের পথে জয়দেব দেখেছে, সাইবার কাফেতে সাহেবরা সারাক্ষণ বসে আছে। হোটেলে দিল্লির দুটো আর কলকাতার একটা ইংরেজি কাগজ আসে। সাহেবরা কাড়াকাড়ি করে পড়বার জন্য। দুপুরবেলার দিকে তাই কাগজ পাওয়া যায় না। রাতে কোনও একটা সময়ে দেখে নিলেই হবে, ভেবে, জয়দেব পা দিল সুশোভনদার ঘরে। সুশান্ত আলোটা জ্বালাতেই জয়দেবের বুক ধক করে উঠল। বিছানার ওপর সুশোভনদার জামাকাপড় পড়ে আছে। অথচ মানুষটাই নেই।

ড্রয়ার থেকে সুশান্ত কিছু কাগজপত্তর আগেই বের করে রেখেছিল। সেগুলো সাইড ব্যাগে ভরে জয়দেব বলল, 'আর কিছু নেই?'

'না স্যার, আমার চোখে আর কিছু পড়েনি। আপনি নিজে চেক করে নিন।'

ঘরের চারপাশে একবার চোখ বোলাল জয়দেব। দেওয়ালে একটা ছাতা ঝোলানো আছে। খুব রঙচঙে, সাইজে বেশ বড়োই, বোধহয় পিপলির বাজার থেকে কেনা। বৃষ্টির জন্য নয়, রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কাপড়ের এই ছাতা লোকে ব্যবহার করে। সুশোভনদা বোধহয় শখ করে কিনেছিলেন। জয়দেব হাত বাড়িয়ে ছাতাটা নামিয়ে আনল। তারপর বলল, 'বিছানা বদলের সময় একবার গদিটাকে উলটে দেখে নিয়ো সুশান্ত। তলায় যদি কিছু উনি রেখে গিয়ে থাকেন....'

কথাগুলো বলেই জয়দেব ফের নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ও যে ঘরে আছে, সেখানকার জানলা দিয়ে রিসেপশনটা দেখা যায়। ল্যাপটপে ফের মেল খোলার চেষ্টা করার ফাঁকে জয়দেব লক্ষ করল, রিসেপশনে দাঁড়িয়ে সুশান্তর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে আইয়াম্মা বলে একটা মেয়ে। সী বিচে এই মেয়েটার একটা চালা মতো আছে। সেখানে বসে ও সকালবেলায় চা আর দুপুরে ডাব বিক্রি করে। যুবতী, স্বাস্থ্যবতী। কথায় কথায় মেয়েটা একদিন বলেছিল, ও ওড়িয়া নয়, তেলুগু। হোটেলের ম্যানেজার সুশান্ত অবশ্য মেয়েটাকে পছন্দ করে না। একদিন জয়দেবকে ও সাবধান করে দিয়েছিল, 'স্যার, মেয়েটা রেন্ডি। ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। রাতের দিকে সী বিচে সাহেবদের কাছে ও দিশি মদ বেচে। রেন্ডিটা আমার বোর্ডারদের খারাপ করে দিচ্ছে। দেখবেন, শালীকে আমি কোনও একটা দিন পুলিশের হাতে তুলে দেবো।'

সেই মেয়ের সঙ্গে সুশান্ত ফিসফিস করে কথা বলছে! রিসেপশনের টেবিলের উপর ঝুঁকে আইয়াম্মা। ওর সুডৌল বুকের খাঁজ জয়দেব নিজের ঘর থেকে দেখতে পাচ্ছিল। বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছিল বেলের মতো ওই স্তন দুটোর দিকে। মেয়েদের শরীরের দিকে আগে কখনও তাকাত না জয়দেব। কিন্তু উপাসনার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হওয়ার পর থেকে, কী যে হয়েছে....ওর চোখ চলে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে সী বিচে স্নান করছিল কয়েকটা মেয়ে। মাথার উপর চড়া রোদ। আইয়াম্মার চালার নিচে জয়দেব তখন বসে চা খাচ্ছিল। উথাল-পাথাল ঢেউয়ে মেয়েগুলো তখন বেআব্রু। সেদিকে তাকিয়ে জয়দেবের গা শিরশির করছিল। হঠাৎ ওর কানে এল, একটা মেয়ে বলছে, 'দ্যাখ দিদি, লোকটা কী অসভ্য। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।' লজ্জা পেয়ে জয়দেব সেদিন পালিয়ে এসেছিল।

সেই কথা মনে পড়ায় নিজেকে সামলে, জয়দেব ল্যাপটপের পর্দায় চোখ রাখল। টাটা ফোটন এখন কাজ করছে। মেল খুলে ও দেখল, ফেস বুকে অনেকগুলো নাম জমা হয়ে আছে। বন্ধু হতে চায়। এই এক সমস্যা। এই অনুরোধগুলো ডিলিট করতে করতে শেষ পর্যন্ত ও কৌশিকের মেলটা আবিষ্কার করল। অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করতেই বইমেলা স্টল-এর নকশাটা পর্দায় ভেসে উঠল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে, জয়দেব সন্তুষ্ট। গতবার কাউন্টার থেকে কিছু বই চুরি হয়েছিল। এবার কৌশিক কাউন্টারটা এমন জায়গায় করেছে,

বই চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। সামনের দিকেও অনেকটা স্পেস রেখেছে কৌশিক। লোকে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বই খুঁজতে পারবে র‍্যাক থেকে। নকশাটা দেখে খুশি হয়ে জয়দেব রিপ্লাই দিল, 'গো অ্যাহেড।'

তিন-চার দিন মেল খোলা হয়নি। তলার দিকে আরও মেল এসে জমা হয়েছে। জয়দেবের চোখ আটকে গেল বাবাইয়ের পাঠানো মেলে। পুরীতে আসার দিন দিদি ফোন করে বলেছিল, বেহালার ওর জন্য যে মেয়েটাকে মা পছন্দ করেছে, তার ছবি বাবাই পাঠিয়ে দেবে। কথাটা জয়দেবের মনেই ছিল না। বাবাইয়ের মেল ওপেন করার সময় ও ঠিক করে নিল, কথাবার্তা আর এগোতে দেবে না। এখুনি দিদিকে জানিয়ে দেবে, ও মনস্থির করে ফেলেছে। মেয়ে পছন্দ করে রেখেছে। তাকেই বিয়ে করবে। কিন্তু পরক্ষণেই পর্দায় ছবিটা দেখে জয়দেব চমকে উঠল। আরে এ কার ছবি? এ তো উপাসনা!! আশ্চর্য, মা আর দিদি উপাসনার সন্ধান পেল কোত্থেকে? আনন্দে জয়দেবের লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। জগতে এ ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনাও তাহলে ঘটে! সঙ্গে সঙ্গে গোরার একটা কথা ওর মনে পড়ল, 'উপাসনার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা, জেনো, আজকের নয়। হয়তো জন্মজন্মান্তরের।'

খুঁটিয়ে ছবিটা লক্ষ করতে লাগল জয়দেব। কোথায় তোলা হয়েছে? জায়গাটা চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি হতে পারে। হ্যাঁ, সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তোলা। উপাসনার পরনে খুব সুন্দর তাঁতের শাড়ি। ও অবশ্য যা পরে, তাতেই মানিয়ে যায়। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত টান অনুভব করল জয়দেব। হ্যাঁ, এই মেয়েটার সঙ্গেই ও সারাজীবন কাটাবে। ছবিটার সঙ্গে ও কথা বলতে শুরু করল। 'কী আশ্চর্য দেখো সোনা। মা আর দিদিও তোমায় পছন্দ করেছে। কলকাতায় ফিরেই তোমার কাকামণির সঙ্গে আমি কথা বলতে যাব। তোমায় খুব ভালোবাসব উপা। তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টা করব, দেখো।'

দিদির ছবি পাঠানোর ব্যাপারটা কি এখনই উপাকে জানানো ঠিক হবে? না কি সারপ্রাইজ দেবে? সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে জয়দেব মনে মনে ভাবল, আগে একবার দিদির সঙ্গে কথা বলে, জেনে নেওয়া দরকার, উপার খোঁজ ওরা পেল কী করে? সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে ও ফোন করল। ও প্রান্ত থেকে দিদিগিরি শুরু হয়ে গেল, 'তোর আক্কেলটা কী রে জয়। কী ভেবেছিস তুই নিজেকে? বাবাই তোকে মেল করল, তার একটা উত্তর দিতে পারলি না। কী এমন রাজকার্য করছিস তুই?'

বাধা না দিলে দিদি বলেই যাবে। জয়দেব বলল, 'তুই এখন কোথায় দিদি?'

'যেখানেই থাকি না কেন, তোর তাতে কী? আগে বল, যে মেয়েটার ছবি তোকে পাঠালাম, তাকে তোর পছন্দ কি না। দ্যাখ ভাই, মাকে আমি বলে দিয়েছি, এই মেয়ে যদি জয়ের ভালো না লাগে, তাহলে আর আমাকে মেয়ে খুঁজতে বোলো না। হাতের লক্ষ্মী যারা পায়ে ঠেলে, তাদের জন্য আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। ভাই থাক তুই, সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে। কাজের লোকের হাতে রান্না খাওয়া তোর কপালে লেখা

আছে যে! বিধির লিখন, আমি খণ্ডাব কী করে?'

জয়দেবের খুব হাসি পাচ্ছে। দিদিকে চটিয়ে দেওয়ার জন্য ও বলল, 'তোর এই মেয়েটা কি ভালো রান্না করতে পারে?'

'রান্নার কী বুঝিস, অ্যা? বাঁদর ছেলে। আবার ঠাট্টা করছিস? জানিস তোর থেকে আমি পাঁচ বছরের বড়ো। ঠাট্টা করার সাহস তুই পাস কোত্থেকে? শোন ভাই, বিয়েটা সিরিয়াস ব্যাপার। মেয়ের কাকি কাল আমাদের বাড়ি এসেছিল। জানতে চাইছিল, ছবি দেখে তোর পছন্দ হয়েছে কি না। কী লজ্জার কথা। মা আর আমি কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। কী বলব? তিনদিন আগে ছবি পাঠিয়েছি, সেই ছবি দেখে ছেলে উত্তর দেওয়ার সময় পায়নি? আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা হল, ভাব তো। ছেলের ওপর তাহলে ফ্যামিলির কোনও কন্ট্রোল নেই। তুই বাবা হ্যাঁ কি না, এখনই বলে দে। ল্যাটা চুকে যায় তাহলে। মেয়ের কাকি বলে গেল, ভুবনেশ্বর থেকেও না কি কারা মেয়েকে দেখে গেছে। তুই রাজি না হলে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'মেয়ের কাকিমার সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে দিদি?'

'তাতে তোর কী দরকার? মেয়ে যখন তোর পছন্দই হয়নি, তখন তোকে এত কৈফিয়ত দিতেই বা যাব কেন, ভাই?'

জয়দেবের খুব হাসি পাচ্ছিল। নিজেকে সামলে ও বলল, 'কে বলল, মেয়ে আমার পছন্দ হয়নি? আমি শুধু জানতে চাইছিলাম, তুই কি ওদের ম্যানটনের বাড়িতে গেছিলি?'

ও প্রান্তে দিদি কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ। তারপর বলল, 'ভাই, মেয়েটা যে ম্যানটনে থাকে, তুই জানলি কী করে? তোকে তো আমরা কেউ বলিনি।'

জয়দেব বলল, 'খোঁজ নিয়েছি। শোন, তোকে আর একটা খবরও দিচ্ছি। ভুবনেশ্বরের সেই ছেলেটার সঙ্গে উপাসনার কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।'

দিদি আরও কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ। তারপর বলল, 'মেয়ের নাম যে উপাসনা, তুই জানলি কী করে?'

ফোনে গ্যাঁ গ্যাঁ শব্দ হচ্ছে। কেউ বোধহয় ফোন করেছে। মনে হয়, গোরা। দিদির ফোন ছেড়ে দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল জয়দেব। ইস, দেরি হয়ে গিয়েছে। গোরা বোধহয় পৌঁছে গিয়েছে ডাক্তার পদ্মিনী সতপথীর চেম্বারে। ওকে দেখতে না পেয়ে তাই বোধহয় ফোন করেছে। জয়দেব তাড়াতাড়ি বলল, 'ফিরে গিয়ে সব বলব রে দিদি। মেয়ে পক্ষকে তোরা হ্যাঁ বলে দে। আমার একটা আর্জেন্ট ফোন আসার কথা আছে। এখন ছাড়ি। রাতে তোকে ফোন করব।'

কানেকশনটা কেটে দিতে-না-দিতেই ফের রিং হল। হ্যাঁ, ও প্রান্তে গোরাই। গলায় উদ্বেগ, 'জয়দেব, এদিকে তো ভয়ানক এক কাণ্ড ঘটে গেছে, তুমি কি কিছু শুনেছ?'

জয়দেব বলল, 'না। কি হয়েছে গোরা?'

'আরে, ডাক্তার পদ্মিনীর কাছে এসেছিলাম। তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি সরাসরি ওঁর চেম্বারে ঢুকে গেলাম। গিয়ে দেখি, উনি ভয়ে জবুথুবু হয়ে বসে আছেন। আমাকে

দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, গোরাবাবু আপনি প্লিজ চলে যান। আপনার ট্রিটমেন্ট আমি করতে পারব না। শুনে আমি তো অবাক।'

জয়দেব বলল, 'কেন? তুমি সেটা জিজ্ঞেস করলে না?'

'করলাম। প্রথমে উনি কিছুই বলতে চাইলেন না। অনেক চাপাচাপির পর যা বললেন, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী বললেন, জানো? আজ বিকেলে না কি তিন-চারজন সাধু জোর করে ওঁর চেম্বারে ঢোকেন। সাধুরা না কি ওঁকে শাসিয়ে গেছেন। আমার পূর্বজন্মের কথা জানার চেষ্টা করলে....ফল ভালো হবে না। সপরিবারে উনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।'

'কী বলছ তুমি, গোরা? এইসব সাধু কারা? কার কাছ থেকেই বা ওঁরা খবর পেলেন, তোমার ট্রিটমেন্টের কথা?'

'সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে নিয়ে সাধুদেরই বা কেন এত ইন্টারেস্ট? কী মুশকিল বলো তো ভাই। যে কারণে আমি পুরীতে থেকে গেলাম, সেটাই যে ভেস্তে গেল!'

'তুমি এখন কোথায়?'

'চেম্বারের বাইরে একা দাঁড়িয়ে আছি। কী করব বুঝতে পারছি না। তুমি কি এখন আসতে পারবে ভাই? এখানে সব শুনশান। দোকানপাট বন্ধ। শুনলাম, সাধুদের তেজ দেখে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে।'

ছাপ্পান্ন

দেওয়ালের মূর্তিগুলোর খাঁজে পা দিয়ে নীচে নেমে এল পুরন্দর। মনে মনে ও ঠিক করে নিল, সুড়ঙ্গপথ থেকে আগে ওকে উপরে উঠে যেতে হবে। আবছা অন্ধকারের জন্য ও ঠিক বুঝতে পারছে না, এখন ক'টা বাজে। একটু আগে পূজ্যপাদ পদ্মনাভর মুখে ও শুনেছে, মন্দিরের দ্বার খোলার সময় হয়ে গিয়েছে। তার মানে, বাইরে এখন ভোর হয়ে এসেছে। কেননা, শেষ প্রহরে মন্দিরের দরজা খুলে দেন প্রতিহারীরাই। টর্চ শাবলটা হাতে তুলে নেওয়ার সময় পুরন্দর আন্দাজ করে নিল, ওর হাতে এখনও এগারো-বারো ঘণ্টার মতো সময় আছে। বিম্বিসার বলল, জয়দেব আর উপাসনা বলে মেয়েটা সন্ধেবেলার দিকে সী বিচে ঘুরতে যায়। তাই সন্ধেবেলার মধ্যেই ওকে সী বিচে পৌঁছতে হবে। যাতে মেয়েটাকে ও বাঁচাতে পারে।

ক্যানভাসের ব্যাগটা কাঁধে ফেলে পুরন্দর হাঁটতে শুরু করল। দীর্ঘকাল ধরে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে পড়েছে। প্রাকৃতিক কারণেই দেওয়ালের নানা জায়গায় আগাছা জন্মে গিয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ওকে এগোতে হচ্ছে। হঠাৎ হোঁচট খেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল পুরন্দর। সামনে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি। টর্চের আলো ফেলে

ও দেখল, ওড়িয়া ভাষায় লেখা আছে, দেবালয়। উলটোদিকের দেওয়ালে লেখা, ভোগ মন্দির। পুরন্দর বুঝতে পারল, রাজা দিব্যদেবাদিদেব তাহলে ঠিক এই জায়গায় মন্দির স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের কোনও চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে সিঁড়িটা রয়ে গিয়েছে। উলটোদিকে নাটমন্দিরটা অক্ষত। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সিঁড়ির উপর বসে পুরন্দর নিশ্চিত হয়ে গেল, বাইরে বেরোনোর পথের নির্দেশও তাহলে দেওয়ালে কোথাও লেখা থাকবে। ওকে খুঁজে বের করতে হবে।

ক্ষুধার্ত, অবসন্ন দেহ। সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসামাত্রই চোখে ঘোর লেগে এল পুরন্দরের। ঘুম পেয়ে গেল না কি? না, না, ঘুমোলে চলবে না। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ওকে আবিষ্কার করতেই হবে। চোখটা বুজে আসছিল, হঠাৎ ওর কানে এল শৃঞ্জিনীর শব্দ। নূপুর পায়ে কারা যেন হেঁটে আসছে। চোখ খুলেই পুরন্দর দেখল, সামনের নাটমন্দির আলোয় ভরে গিয়েছে। তার চারপাশে প্রচুর মানুষ ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছেন। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা সুখী, অভিজাত সব মানুষ। তাঁদের কানে কুন্দল, হাতে তাড়া ও বিড়া। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কিন্তু কী বলছেন, তা ভালো করে শুনতে পাচ্ছিল না পুরন্দর। হঠাৎ তূর্যধ্বনি শুনে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকজন রাজপুরুষ নাটমন্দিরে প্রবেশ করলেন। পুরন্দর বুঝতে পারছিল না, এঁরা কারা? একটু পরেই ঘোষকের কণ্ঠস্বর ও স্পষ্ট শুনতে পেল। গজপতিরাজ শ্রীশ্রী প্রতাপরুদ্রদেব নাটমন্দিরে এসেছেন। রাজার নাম শোনার পরই পুরন্দরের ঘুম চটকে গেল। সিংহাসনে বসলেন গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্র। সূর্যবংশী রাজা, মাথায় মুকুট, কানে বীরবাউলি। পূজ্যপাদ জগতবল্লভের কাছে এই রাজা সম্পর্কে পুরন্দর অনেক কথা শুনেছে। চোখের সামনে তাঁকে দেখেও অবাক হয়ে গেল।

গজপতিরাজকে দেখে ওর ক্রোধ হওয়ার কথা। কেননা, পুরন্দর শুনেছে, এই সেই রাজা, যাঁর আমলে ওড়িশার পতন শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই নাকি রাজকার্যে মন ছিল না প্রতাপরুদ্রের। রাজধানী ছেড়ে বেশিরভাগ সময়ই তিনি পুরীতে কাটাতে শুরু করেন। তাঁর অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর, নাকি রাজাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। চৈতন্য লোকটা ভণ্ড। আসলে বাংলার নবাব হোসেন শাহ-র পাঠানো চর। ওড়িশার সর্বনাশ করার জন্য পুরীতে এসেছেন। কিন্তু রাজা প্রধান অমাত্যের কোনও পরামর্শই শোনেননি। নাটমন্দিরের দিকে ভালো করে তাকাল পুরন্দর। প্রধান অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজার আশপাশে আছেন কি? হ্যাঁ, কয়েকজন অমাত্য সঙ্গে আছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কে গোবিন্দ বিদ্যাধর, পুরন্দরের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। ও ফের রাজার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, রাজার মুখ খুবই অপ্রসন্ন। মনে হচ্ছে, কোনও কারণে তিনি চিন্তাচ্ছন্ন।

নাটমন্দিরের একপাশে বাদকরা বসে পড়েছেন। এখনই দেবদাসীদের নৃত্যগীত শুরু হবে। রাজার দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ই পুরন্দর টের পেল, সিঁড়িতে ও এখন আর একা নয়। ওর পাশে আরও দু'জন মানুষ এসে বসেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে

চাপা স্বরে। কী বলছে, সেটা শোনার জন্য কান উৎকীর্ণ করে রাখল পুরন্দর। দু'চার কথা শোনার পরই ও জানতে পারল, একজনের নাম শীলভদ্র, অন্যজন কন্দর্প। শীলভদ্র হল গুপ্তচর। সে কৃষ্ণকোটা বলে একটা জায়গা থেকে ফিরেছে। কন্দর্প হল রাজকর্মচারী। সে খোঁজখবর নিচ্ছে। কন্দর্প জিজ্ঞেস করল, 'কৃষ্ণকোটার খবর কি রাজার কানে পৌছেছে?'

শীলভদ্র বলল, 'না, এখনও উনি শোনেননি। রাত্তির তৃতীয় প্রহরে আমি পুরীতে পৌছেছি। এত ক্লান্ত ছিলাম যে, রাজার কাছে যেতে পারিনি।'

কন্দর্প বলল, 'ভালো করেছিস। আগে রাজদরবারে যাসনি। প্রধান অমাত্য চান না, তাঁকে ডিঙিয়ে আগে কোনও খবর রাজার কানে যাক। গেলে তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন। ভালো করে বল তো, বাহুবলেন্দ্রর এত সাহস হল কী করে?'

শীলভদ্র বলল, 'তাঁর মাথার উপর কেউ নেই বলে। কৃষ্ণকোটার রাজা নিজের বিশ্বস্ত কোনও লোক বসিয়ে রাখেননি। তার আগেই উনি খবর পান, বাংলার নবাব কলিঙ্গ আক্রমণে তৈরি হচ্ছেন। রাজধানী বাঁচানোর তাগিদে উনি দাক্ষিণাত্য ছেড়ে চলে এলেন। বাহুবলেন্দ্রর মতো দুরাচারীর সাহস তো বাড়বেই।'

'কী বলছেন বাহুবলেন্দ্র? রাজার কোষাগারে অর্থ দেবেন না? এ তো বিদ্রোহ।'

'বিদ্রোহ তো বটেই। সুযোগটা তিনি পেয়ে গেছেন। ইসমাইল গাজীকে আটকানোর জন্য আমাদের রাজা যেদিন গড় মান্দারণের দিকে রওনা হলেন, সেদিন থেকেই হাতির পাঁচ পা দেখেছেন বাহুবলেন্দ্র। উনি কোত্থেকে মদত পাচ্ছেন, সেই খবরটা দেওয়ার জন্যই আমি রাজার কাছে যাচ্ছি।'

'কার কাছ থেকে মদত পাচ্ছেন, তুই জানিস?'

'কার আবার? প্রধান অমাত্যের কাছ থেকে। কৃষ্ণকোটায় সবাই জানেন, কে রয়েছেন বাহুবলেন্দ্রর পিছনে। আমাদের রাজা এত বিশ্বাস করেন যাঁকে, তিনিই রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। এই খবরটা রাজার কানে পৌছে দেওয়া দরকার। মাহেরিদের নাচ শেষ হলেই আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব। বলব, গড় মান্দারণের দিকে না গিয়ে আপনি সৈন্য নিয়ে ফের দাক্ষিণাত্যে ফিরে চলুন।'

'কেন মূর্খের মতো কথা বলছিস শীলভদ্র। তুই কি জানিস, রাজাকে তুই সত্যি খবরটা দিয়েছিস, এটা যদি প্রধান অমাত্যের কানে যায়....একদিন-না-একদিন কানে যাবেই....তখন কি হবে? তার চেয়ে বলি, তুই এখান থেকেই গঞ্জামে তোর বাড়িতে ফিরে যা। সারাজীবন তুই যাতে আরামে কাটাতে পারিস, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।'

'কিন্তু এ তো রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মহাপ্রভু তাহলে আমাকে কোনওদিন ক্ষমা করবেন না। না, না আপনি এই অনুরোধ আমায় করবেন না। আমি ছাড়াও রাজার অন্য গুপ্তচর রয়েছে। কৃষ্ণকোটা থেকে আমি রওনা হওয়ার তিনদিন পরই আরও একজনের শ্রীক্ষেত্রে আসার কথা। তার কাছ থেকে তো রাজা খবর পেয়ে যাবেনই। মাঝখান থেকে আমি বিপদে পড়ে যাব।'

'তোর পর যে আসছে, সে কি রাজার কাছে পৌঁছতে পারবে? মনে হয় না। তার পিছনেও প্রধান অমাত্যের লোক লেগে থাকবে। এখন বল, তুই কী করবি? খবরটা রাজাকে দিবি, না এখান থেকেই ফিরে যাবি গঞ্জামে। শোন শীলভদ্র, আমাদের রাজা খুব দুর্বলচিত্ত হয়ে গিয়েছেন। দাক্ষিণাত্য জয় করে ফেরার পর থেকে তিনি গৌড়ের এক ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়েছেন। রাজকার্যে রাজার মন নেই। ওই ভণ্ড সাধুর ব্যবস্থা প্রধান অমাত্য খুব শিগগির করবেন। তার আগে রাজাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা দরকার। উনি যুদ্ধে গেলে আমাদের পক্ষে এই কাজটা করা সহজ হয়ে যাবে।'

'কাকে আপনি ভণ্ড বলছেন কন্দর্প? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু? আমার তো মনে হয়, উনি প্রভু জগন্নাথের অঙ্গ। স্বয়ং ঈশ্বর। উনি যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন গঞ্জামে আমরা তাঁকে দেখেছি। গঞ্জামে লোকে ওঁকে পুজো করেন। আমি তো ভাবছি, রাজদর্শন সেরেই আমি একবার মহাপ্রভুর দর্শনে যাব। রাজগুরু কাশী মিশ্রের বাড়িতে। গিয়ে জীবন ধন্য করব।'

শীলভদ্র আর কন্দর্পের কথা খুব মন দিয়ে শুনছে পুরন্দর। শীলভদ্র বলে লোকটাকে ওর ভালো লেগে গেল। ঠিক কথাই তো বলছে লোকটা। রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। একজন রাজকর্মচারীর তো সেটাই করা উচিত। কিন্তু চৈতন্যদেব সম্পর্কে এত আবেগতাড়িত কেন শীলভদ্র? নাটমন্দিরে বাদন শুরু হয়ে যাওয়ায় দুই রাজকর্মচারীর কথা শুনতে ওর অসুবিধা হচ্ছে। তবুও পুরন্দর কান খাড়া করে রাখল, ওরা কী আলোচনা করছে তা শোনার জন্য। কন্দর্পর গলার সুর পালটে গিয়েছে। ও শীলভদ্রকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শীলভদ্র কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। শীলভদ্র বাঁকা সুরে বলল, 'তোর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, তোর মহাপ্রভু আমাদের প্রভু জগন্নাথের থেকেও বড়ো। জানিস, তুই কতবড়ো পাপ করছিস?'

ও বলল, 'আপনার কথা মানতে পারছি না কন্দর্প। বললামই তো, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন প্রভু জগন্নাথের অংশ। গঞ্জামে ওঁর ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন করতে করতে আমি গোদাবরীর ওপার অবধি গিয়েছিলাম। ওঁর সম্মোহন শক্তি আমি নিজের চোখে দেখেছি। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের মতো রাজপুরুষ যেভাবে ওঁর পায়ে আছড়ে পড়েছিলেন, নিজের চোখে না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতাম না।'

কন্দর্প উড়িয়ে দিল শীলভদ্রের কথা, 'আরে, এর পিছনে একটা রাজনীতি ছিল। আর বাসুদেব সার্বভৌমের স্বার্থ। তুই এসব জানবি কী করে?'

'কিন্তু গঞ্জামে যে একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটা উড়িয়ে দিই কী করে? মহাপ্রভু আমাদের ওখানে এক বিপ্রের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিলেন। সেই সন্ধ্যায় নামসংকীর্তনে আমরাও যোগ দিয়েছিলাম। মহাপ্রভুর কথা লোকমুখে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগী...বিপ্রের বাড়িতে সেও গিয়ে হাজির। নাম-সংকীর্তনে যোগ দিতে চায়। মহাপ্রভু নিজে উঠে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বসালেন। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর থেকে কুষ্ঠের ক্ষত উধাও। মহাপ্রভুর স্পর্শে সে ভালো

হয়ে গিয়েছিল। ওঁর কাছে কোনও ভেদাভেদ নেই। উনি সবার পাপ গ্রহণ করতে পারেন।'

কথাগুলো কন্দর্প বিশ্বাস করল বলে মনে হল না পুরন্দরের। ও বলল, 'ভালো, ভালো। তোর যদি ওই ভণ্ড লোকটার উপর এত বিশ্বাস হয়ে থাকে, আমার কিছু বলার নেই। তবে আমি যে কথাটা তোকে বললাম, সেটা যদি তুই না শুনিস, তাহলে কিন্তু ঘোর বিপদ তোর সামনে।'

'ভয় দেখাবেন না কন্দর্প। গুপ্তচরবৃত্তি আমার পেশা। জানেনই তো, সেটা কত ঝুঁকির। যে-কোনও মুহূর্তে আমার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু আমি যে অমৃতের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি শীলভদ্র! মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসে বুঝতে পেরেছি, ভক্তির মাহাত্ম্য। আপনাকে আর একটা ঘটনার কথা বলি। মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গে নামসংকীর্তন করতে করতে বৃদ্ধকাশীতে গিয়েছিলাম। সেই অঞ্চলটা বৌদ্ধদের। শাস্ত্রীয় তর্কে ওঁরা মহাপ্রভুর কাছে হেরে গিয়ে কুমন্ত্রণা করলেন। এক পাত্র অপবিত্র অন্ন ওঁরা বিষ্ণুপ্রসাদ বলে পাঠিয়ে দিলেন মহাপ্রভুর কাছে। অলৌকিক কাণ্ড, মহাপ্রভু যখন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বসবেন, তখন আকাশ থেকে এক বিরাট পক্ষী পাত্রটা তুলে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল সেই বৌদ্ধভিক্ষুর মাথায়। রক্তারক্তি কাণ্ড। তখন বৌদ্ধরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁরা এসে মহাপ্রভুর পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করলেন। মহাপ্রভু তাঁদের কী বললেন, জানেন? বললেন, কানের কাছে হরিনাম করো। তাহলেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এসব ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের মহাপ্রভুকে ভণ্ড বলে মানি কী করে?'

কথাগুলো শুনে পুরন্দর হাঁ করে শীলভদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। কী বিশ্বাসের সঙ্গেই না কথা বলছে লোকটা। জানে, কন্দর্প ওর কথাগুলো ভালোভাবে নিচ্ছে না। ক্রোধে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তবুও শীলভদ্রের চোখমুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। ঠিক এই সময় শৃঞ্জিনীর শব্দ শুনে পুরন্দর নাটমন্দিরের দিকে ফিরে তাকাল। একজন মাহেরি উঠে এসেছে। দেববন্দনার জন্য সে মন্দিরের দিকে মুখ ফেরাতেই, পুরন্দর চমকে উঠল। এ কী! এ যে অম্বালিকা.....অম্বা! দু'দিন আগেই যাকে ও বেলি নানীর ঘরে শুয়ে থাকতে দেখেছে। মাহেরির পোশাকে অম্বাকে রাজকন্যার মতো দেখতে লাগছে। ওকে দেখে পুরন্দর মোহিত হয়ে গেল। মানুষ হয়েও ও এতদিন পূতিগন্ধময় এক নরকে ঘৃণ্য জীবন কাটিয়েছে। তারই মাঝে এই অম্বালিকা ছিল যেন একমুঠো টাটকা ফুল। যৌবনের স্বাভাবিক নিয়মেই যাকে ও চেয়েছে, কিন্তু জেনেই রেখেছে, কোনওদিনই অম্বালিকার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। নৃত্যের ভঙ্গিতে দেববন্দনা করেই অম্বা রাজার দিকে ঘুরে গেল। ওর নৃত্য দেখতে দেখতে পুরন্দর ভুলে গেল জগৎসংসারের কথা।

...ওর ঘোর যখন ভাঙল, তখন দেখল, আশপাশের লোকজন উঠে পড়েছে। নাটমন্দিরের বাঁ পাশ দিয়ে রাজা তাঁর অমাত্যদের নিয়ে নেমে যাচ্ছেন। ভিড়ের মাঝে পুরন্দর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লোকজন চলতে শুরু করার পর ও হাঁটতে লাগল। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, লোকজনের সঙ্গে হাঁটতে থাকলে ও নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পথ পাবে। তখনই ওর মনে পড়ল, রামচন্দ্র দইতাপতি ভুবনেশ্বরে ওকে বলেছিলেন, রাজা

দিব্যদেবাদিদের এই পাতাল মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা রেখেছিলেন দুদিকে। একদিকে বিমলা মন্দির, অন্যদিকে প্রভু জগন্নাথের মন্দির। দেখা যাক, ভাগ্য ওকে কোন দিকে নিয়ে যায়?

এই কথাগুলো ভাবার সময়ই পুরন্দরের চোখে পড়ল, ওর আগে আগে কন্দর্প নামে সেই রাজকর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছেন পদ্মনাভ। হ্যাঁ পদ্মনাভই! যাঁকে পূজ্যপাদ ভাবতে এখন ঘেন্না হয় পুরন্দরের। কিন্তু উনি এখানে? এই তো একটু আগেই বিম্বিসার নামে একটা ছেলেকে উনি বললেন, মন্দিরের দ্বার খুলতে যাচ্ছেন। পা চালিয়ে একটু বেপরোয়া ভঙ্গিতেই ঠিক কন্দর্পের পিছন পিছন ও হাঁটতে লাগল। খানিকটা হাঁটার পর পুরন্দর শুনতে পেল, কন্দর্প বলছে, 'তারপর.....তোমার সেই কাজটার কী হল? প্রধান অমাত্য যে তোমার খোঁজ করছিলেন দীনবন্ধু ভাইনা।'

পদ্মনাভ বললেন, 'গোবিন্দ বিদ্যাধরকে বোলো, দীনবন্ধু খুব শিগগির কাজটা সেরে ফেলবে। এখনও সময় আসেনি।'

'এই কথাটা তো তুমি গত এক বছর ধরে বলে আসছ দীনবন্ধু।'

'উপায় নেই। লোকটাকে একা পাওয়াই যাচ্ছে না। সর্বক্ষণ ভক্তরা তাকে ঘিরে রেখেছে। শুনছি, গম্ভীরা থেকে নাকি এখন বেরোতেই চায় না। আমার অনুচররা রোজই আমায় খবর দিচ্ছে। প্রধান অমাত্যকে বলো, উনি যা চান, আমরাও তাই চাই। মন্দিরের রোজগার কমে গেছে। শ্রীক্ষেত্রে এলে তীর্থযাত্রীরা আগে ওর দর্শনে যাচ্ছে। তারপর আসছে মন্দিরে। লোকটাকে তো আমরাও খতম করে দিতে চাই। সেটা রথযাত্রার আগে সম্ভব না।'

'তাহলে ওঁকে এই কথাগুলোই না হয় গিয়ে বলি। চলি, দীনবন্ধু, পরে দেখা হবে।' কথাগুলো বলেই ডানদিকে সরে ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে গেল কন্দর্প বলে লোকটা।

পুরন্দর দাঁড়িয়ে পড়ল। আরে, কন্দর্প কাকে দীনবন্ধু বলে সম্বোধন করল? আগে আগে হাঁটতে থাকা মানুষটার নাম তো পদ্মনাভ! পুরন্দর ছোটোবেলা থেকে মানুষটাকে দেখে এসেছে। একটা সময় যাঁর কথায় ও প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। তাহলে এই মানুষটাকে কন্দর্প ডাকল কেন দীনবন্ধু বলে? পুরন্দরের সবকিছু গুলিয়ে গেল। পিছনের জনস্রোত ওকে ধাক্কা মারতে মারতে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খানিক পরেই পুরন্দর নিজেকে আবিষ্কার করল বিমলা মন্দিরের কাছে। ওর চেনা পৃথিবীতে এসে পা দিয়েছে। চারদিক ফরসা হতে শুরু করেছে। দোকানপাটও খুলছে। জায়গাটা চিনে রাখার জন্য পুরন্দর একবার পিছনের দিকে তাকাল। দেখল, একটা ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়ি আড়াল করে আছে, বিরাট অশ্বত্থ গাছ। তখনই ওর মনে হল, আরে....এত লোকজন যে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল, তারা গেল কোথায়? আশপাশে তাকিয়ে পুরন্দর কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওর গা ছমছম করে উঠল!

সাতান্ন

দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল উপাসনা। কাকিমাকে নিয়ে কী একটা স্বপ্ন দেখছিল। চোখ খুলতেই ওর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল, পুরীতে একা একা ও কী করছে? রিসার্চের কাজ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই পড়ে আছে। জয়দেবের সঙ্গে এত আশা নিয়ে ও পুরীতে এল। কাজ কিন্তু একটুও এগোয়নি। মাঝে একদিন জয়দেব ওকে অবধূতজির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন হলিউড থেকে কয়েকজন এসেছিলেন অবধূতজির সঙ্গে দেখা করতে। ওখানকার কোনও সিনেমা প্রোডাকশন কোম্পানির লোকজন। ওঁরা মহাপ্রভুকে নিয়ে একটা ছবি তৈরি করছেন। সে সম্পর্কে রিসার্চের কারণেই অবধূতজির ইন্টারভিউ নিতে চান। এক বছর পরে শুটিং শুরু হবে। তবুও এত আগে রেকি করতে এসেছেন। ওঁদের কাজের ধরনই আলাদা। ফলে অবধূতজি সেদিন এমন ব্যস্ত হয়ে রইলেন, উপাসনার সঙ্গে আলাদা করে কথাই বলতে পারলেন না। তবে উনি যখন মহাপ্রভুকে নিয়ে আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনই উপাসনা বুঝতে পেরেছিল, মহাপ্রভুর ভক্তিতত্ত্ব অবধূতজি গুলে খেয়েছেন। উনি এমন অনেক তথ্য জানেন, যা কোনও বইতে পাওয়া যাবে না।

জয়দেব ঠিকই বলেছিল। অবধূতজি পণ্ডিত মানুষ। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে না-পারায় সেদিন জয়দেব খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে উপাসনাই বলেছে, 'তোমার কী দোষ? তুমি তো জানতে না হলিউড থেকে লোকজন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।' আসলে অবধূতজির সঙ্গে কথা না হলে ওরা দু'জন পানিবাবার কাছে যেতে পারছে না। সব আটকে রয়েছে। একে অবধূতজির সঙ্গে দেখা হল না, তারপর সুশোভনদা হঠাৎ করে মারা গেলেন। দু'তিনদিন তো জয়দেবের সঙ্গে ভালো করে কথাই হল না উপাসনার। কাল রাতে একবার কথা হয়েছে। জয়দেব বলল, দিনক্ষণ পত্রিকার জন্য ওকে কী একটা লেখা পাঠাতে হবে। তাই আজ সারাটা দিন ওই লেখা নিয়ে ও ব্যস্ত থাকবে। বিকেলের দিকে কখন ও ফ্রি হবে, সেটা ও-ই ফোন করে জানিয়ে দেবে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না উপাসনার। এই ক'দিন আগেও এই সময়টায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে ও বেহালার মিনি বাসে চাপত। বাসটা যখন বাজারের কাছে জ্যামে আটকে থাকত, তখন ও খুব বিরক্তি বোধ করত। টিভিতে রান্না শেখানোর শো যেদিন মিস হয়ে যেত, সেদিন মনে হত, কী একটা কাজ যেন করা হল না। রান্না শেখার কি আগ্রহই না ছিল ওর একদিন। সব বোধহয় ভুলে গেছে। হাতে মরচে পড়ে গেল মনে হয়। স্বাতীর বাড়িতে থাকার সময় তাও মাঝেমধ্যে প্র্যাকটিস হত। কিন্তু পুরীর হোটেলে আসা ইস্তক উপাসনা কিচেনের দিকে যায়নি। বিরক্ত লাগছে। এক এক সময় খুব রাগ হচ্ছে জয়দেবের উপর। কেন ও পুরীতে টেনে আনল?

মাসিমা চলে যাওয়ার পর থেকে একটা কথা বলার পর্যন্ত লোক নেই। গোরাভাই সব সময় ওর পার্টির লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। জয়দেব যদি ওর হোটেলে থাকার একটা

ব্যবস্থা করত, তাহলে হয়তো উপাসনাকে এতটা বোর হতে হত না। কিন্তু মেয়ে হয়ে উপাসনা কী করে বলবে, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এমনিতেই তো লাজলজ্জা বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে জয়দেবের কাছে। এখন যদি নিজে মুখ ফুটে বলে, আমাকে তোমার হোটেলে নিয়ে যাও, তাহলে ও হয়তো মনে মনে হাসবে। একটা কথা ঠিক, জয়দেব কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনওদিন ওর হোটেলে উপাসনাকে ডাকেনি। ওর মনে যদি কোনওরকম দুরভিসন্ধি থাকত, তাহলে ডাকতেই পারত। এই কারণেই জয়দেবকে এত ভালো লাগে।

স্বাতী অবশ্য মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছে ভুবনেশ্বর থেকে। কতদূর এগোলি রে? তোদের মধ্যে কি সবকিছু হয়ে গেছে? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্বাতী এমন সব প্রশ্ন করে, লজ্জায় উপাসনার মুখ লাল হয়ে যায়। কানের ভেতর থেকে গরম ভাপ বেরোতে থাকে। যেন জয়দেবের সঙ্গে ও হনিমুন করতে এসেছে। মাঝে তো একদিন স্বাতীর ফোন ও রাগ করে কেটেই দিয়েছিল। স্বাতী এমন সব মুখ-আলগা কথা বলছিল। শুয়ে শুয়ে স্বাতীর সেই সব কথা মনে পড়ায় উপাসনা ফিক করে হেসে ফেলল। ঠিক সেই সময়ে ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই জয়দেবের ফোন। নাম্বারটা না দেখে, সুইচ অন করেই উপাসনা বলল, 'এতক্ষণ পর তোমার ফোন করার সময় হল? সেই কতক্ষণ ধরে তোমার ফোনের আশায় আমি বসে আছি।'

উলটোদিকে কাকিমার গলা, 'কার ফোন তুই এক্সপেক্ট করছিলি রে উপা?'

সর্বনাশ! কাকিমার ফোন! মুহূর্তে গলার স্বর পালটে ফেলল উপাসনা। বলল, 'আর বোলো না কাকিমা, নবদ্বীপ থেকে মা ফোন করবে বলেছিল। এখনও করল না।'

'তাই বল। আমি ভাবলাম, বোধহয় কোনও বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছিস বুঝি। যাক গে, যে কথা জানার জন্য তোর কাকা আমায় ফোন করতে বললেন, সেটা বলি। তোর রিসার্চের কাজ কদ্দুর এগোল?'

সত্যি কথা বললে, কাকিমা এখুনি ফিরে যেতে বলবেন, তাই উপাসনা বলল, 'অনেকটাই। এখানে না এলে অনেক কিছু জানতে পারতাম না কাকিমা।'

'এখনও কতদিন লাগবে রে?'

'কেন কাকিমা? দিন দশ-বারো তো বটেই।'

'তাহলে এক কাজ কর। কাল-পরশুর মধ্যে তুই চলে আয়। তোর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি রে আমরা। খুব ভালো ছেলে। তোর মতোই রিসার্চ স্কলার। নিজের পাবলিকেশন আছে। আমার খুব জানাশোনার মধ্যে। ছেলে তোর ছবি দেখে পছন্দ করেছে। তোর রিসার্চে কোনও আপত্তি নেই না কি ছেলের। বিয়ের পরও তুই রিসার্চ চালিয়ে যেতে পারবি। এখন ছেলের মা আর দিদি তোকে একবার দেখতে চাইছে। কবে ওদের আসতে বলব, তুই বল।'

কাকিমার কথাগুলো শুনে উপাসনা ঢোঁক গিলল। এই দিনটাকেই এতদিন ও ভয় পাচ্ছিল। এই দিনটা যে আসবে, তা জানতই। তাই আমতা আমতা করে ও বলল, 'আমাকে

না দেখেই ছেলেটা আমায় পছন্দ করে ফেলল? অদ্ভুত তো।'

'কেন করবে না? তোর একটা ছবি মেল করে ওর দিদি পাঠিয়ে দিয়েছিল ওর কাছে। ইন্টারনেটের যুগে এ আর কী এমন কঠিন? আরে হ্যাঁ, তোকে বলতেই আমি ভুলে গেছি। পাত্র এখন ব্যবসার কাজে পুরুলিয়ায় গেছে। ওখানে বইমেলা চলছে। তুই কবে ফিরে আসবি বল, সেটা জানলে ওরা ছেলেকে সেই সময় ফিরে আসতে বলবে। পাত্রের মা এই মাসেই বিয়ের দিন দেখতে বলেছে তোর কাকাকে। তোর মা আর বাবার সঙ্গেও আমাদের কথা হয়ে গেছে। ওদের কোনও আপত্তি নেই। তুই এলে, নবদ্বীপ থেকে তোর মা আর বাবা দু'তিন দিনের জন্য কলকাতায় আসবে।'

উপাসনা আমতা আমতা করে বলল, 'হুট করে কি যেতে পারব...কাকিমা। টিকিট কাটার ব্যাপার আছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কি না।'

'নবেন্দুকে বল, কাল বা পরশুর...রাতের ট্রেনের টিকিট কাটতে। সকালে হাওড়া থেকে তোকে নিয়ে আসবে তোর কাকা। ফোনটা স্বাতীকে দে তো মা। ওর সঙ্গে একবার কথা বলি। আর্জেন্সিটা ও বুঝতে পারবে তাহলে।'

শুনে বিপদে পড়ল উপাসনা। ও যে স্বাতীর বাড়িতে নেই, জয়দেবের সঙ্গে পুরীতে এসেছে, কাকিমারা সেটা জানে না। জানলে কী ভাববে কে জানে? তাই না জানানোই ভালো। ওর মাথায় যা এল, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'স্বাতী আর নবেন্দুর সঙ্গে আজ আমি পুরীতে এসেছি। ওরা দুজন টুকটাক কেনাকেটা করতে বেরিয়েছে। ফিরলে, তোমায় ধরিয়ে দেবো।'

'মন্দিরে গেছিলি ... কি? জগন্নাথ দর্শন করেছিস? দ্যাখ, তাই হয়তো তোর কপাল খুলে গেল। ইস, কদ্দিন ধরে তোর কাকাকে বলছি, জগন্নাথধামে নিয়ে যেতে। সময়ই পাচ্ছে না। শোন না, কলকাতায় আসার সময় প্রসাদ নিয়ে আসতে ভুলিস না। ওখানে মন্দিরের কাছে, কাকাতুয়া বলে একটা দোকান আছে। সেখান থেকে গজা কিনে পুজো দিবি। ওখানে তোর কাকার খুব চেনা এক পান্ডা আছে....সতীশ পান্ডা। তাঁকে যদি খুঁজে বের করতে পারিস, তাহলে খুব সুন্দরভাবে পুজো দিতে পারবি। কোন হোটেলে উঠেছিস তোরা বল। আমিই না হয় ফোন করে সতীশ পান্ডাকে বলে দিচ্ছি। তোদের সঙ্গে ও-ই যোগাযোগ করে নেবে।'

কী বিপদ! উপাসনা তাড়াতাড়ি বলল, 'দরকার নেই কাকিমা। নবেন্দুর অনেক চেনাজানা লোক আছে এখানে।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাল কাকিমা, 'হ্যাঁ রে, পাত্র সম্পর্কে তুই কিছু জানতে চাইলি না তো মা?'

উপাসনা ফোন ছাড়তে পারলে বাঁচে। অনেক মিথ্যে কথা বলে ফেলেছে। পাছে ধরা পড়ে যায়, সেই কারণে ও বলল, 'গিয়ে শুনব কাকিমা। স্বাতী আসুক, তারপর ফোন করছি।'

'না রে মা, শোন। পাত্র বেহালাতেই থাকে। নাম জয়দেব। নিজেদের বাড়ি। মা ছাড়া আর আছে এক বিয়ে হওয়া দিদি। মা বেশিরভাগ সময়েই থাকেন ঝাড়গ্রামে দেশের

বাড়িতে....'

এ পর্যন্ত শুনেই উপাসনা বলল, 'কী নাম বললে কাকিমা....জয়দেব?'

'হ্যাঁ, জয়দেব। পাড়ার ছেলেদের কাছে আমি খবর নিয়েছি। ভারি ভালো ছেলে। দেখতে শুনতেও বেশ ভালো। তোর অপছন্দ হবে না। ওর মা তো বলল, কোনও ডিমান্ড নেই....'

আরে.....কাকিমা কার কথা বলছে? শুনে মনটা আনন্দে কুলকুল করে উঠল উপাসনার? মিলে যাচ্ছে...এই জয়দেবের সঙ্গে সবই মিলে যাচ্ছে। শুধু মিলছে না, এখন ওর পুরুলিয়ায় থাকার কথা। তার মানে জয়দেব বাড়িতে জানায়নি, ও এখন পুরীতে রয়েছে। কী আশ্চর্য যোগাযোগ, তাই না? মা ঠিকই বলত, জন্ম-মৃত্যু আর বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। ওপরওয়ালাই সব ঠিক করে রেখেছেন। না হলে ওর রিসার্চের নোট মিনি বাসে হারিয়ে গেল। সেটা কেন খুঁজে পেল জয়দেব? রাধাগোবিন্দর যদি ইচ্ছে না থাকত, তাহলে কেনই বা ট্রেনে সেই মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হবে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে?

কাকিমা কী বলছে, তাতে কান দিল উপাসনা, '.....কী রে চুপ করে আছিস কেন? শোন মা, ট্রেনেই আসার চেষ্টা করিস। তাড়াহুড়োয় নবেন্দু যেন তোকে বাসে করে না পাঠায়। আজকাল হাইওয়েতে খুব অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। নবদ্বীপের গোঁসাই বাড়ির শ্রীবৎসর কী হয়েছে, জানিস?'

শুনে দমবন্ধ হয়ে এল উপাসনার। এই রে....শ্রীবৎস বোধহয় ওর কথা সারা নবদ্বীপে রাষ্ট্র করে দিয়েছে। ও বলল, 'কী হয়েছে কাকিমা?'

'নবদ্বীপ থেকে কিছু ভক্ত নিয়ে ও পুরীতে গিয়েছিল। ফেরার পথে কটকের কাছে সেই বাস এমন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে যে, ছ'জন স্পট ডেড। শ্রীবৎসর মাথায় মারাত্মক চোট। শুনলাম, কটকের এক হাসপাতালে.....এখন কোমায় চলে গেছে। তোর পিসি তো খবরটা পেয়েই কটকে চলে গেছে। শ্রীবৎস একদিন তোর কাকাকে কী অপমানই না করেছিল। দ্যাখ, তার কীরকম শাস্তি পেল।'

খবরটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল উপাসনা। ওর বুকের ভেতর থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। উফ, কী দুশ্চিন্তাতেই না এই ক'টা দিন ও কাটিয়েছে। শ্রীবৎস হাসপাতালে। সেই কারণেই এখনও ওকে নিয়ে স্ক্যান্ডাল নবদ্বীপে ছড়ায়নি। মনটা ফের খুশিতে ভরে উঠল উপাসনার। বুকের ভেতর অনুভূতিটা চেপে রেখে ও বলল, 'আমাকেও তো হুমকি দিয়েছিল কাকিমা। ওর অনুমতি ছাড়া না কি চৈতন্যদেবকে নিয়ে রিসার্চ করা যাবে না।'

'ছাড় ওই পাষণ্ডটার কথা। রাধাগোবিন্দ ওকে উচিত শাস্তি দিয়েছেন। তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় মা। কত দিন তোকে দেখিনি, বল তো? তোর কাকাও হাঁফিয়ে উঠেছে, তোর হাতের রান্না খেতে পাচ্ছে না বলে। যাক গে, এখন ছাড়ি তাহলে?'

'হ্যাঁ কাকিমা।' বলে উপাসনা লাইনটা কেটে দিয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আহ্ কী আনন্দ! কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছে? এতগুলো ভালো ভালো

খবর! জয়দেবের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ, শ্রীবৎসের অ্যাক্সিডেন্ট। না, খবরগুলো জয়দেবকে এখুনি জানানো দরকার। কালক্ষেপ না করে ও শুয়ে শুয়েই জয়দেবকে মেসেজ পাঠাল। কখন দেখা হবে? উপাসনা জানে, যত ব্যস্তই থাকুক না কেন, জয়দেব এখুনি রিপ্লাই দেবে। এমনিতেই দিনে চার-পাঁচবার ও মেসেজ পাঠায়। বড়ো বড়ো দু'তিন পাতার মেসেজ। উত্তরের প্রত্যাশা করে। কিন্তু উপাসনার ধাতে নেই রিপ্লাই দেওয়া। এখনকার টিনএজারদের মতো ও সাইবার-প্রেমে অভ্যস্ত নয়। প্রয়োজন না পড়লে রিপ্লাই দেয় না। এক লাইনের ওই মেসেজটা পাঠিয়ে, মোবাইল সেট টেবলের উপর রেখে উপাসনা অ্যাটাচড বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মিনিট দশেকের মধ্যে শাড়ি বদলে, উপাসনা যখন হালকা সাজগোজ করছে, তখনই জয়দেবের রিপ্লাইটা এল। মেসেজ বাটন টিপে ও দেখল, জয়দেব লিখেছে, 'কাম অ্যাট মিলনী রেস্টুরেন্ট অ্যাট সিক্স থার্টি। আই উইল ওয়েট ফর ইউ দেয়ার। আই উইল গিভ ইউ আ ভেরি ভেরি গুড নিউজ উইথ আ সুইট কিস অন ইয়োর লিপস।' উপাসনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'ডোন্ট এভার ট্রাই দ্যাট। কামিং।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, হাতে মিনিট চল্লিশের মতো সময় আছে। ওর হোটেল থেকে মিলনী রেস্তোরাঁ খুব বেশি দূরে নয়। মিনিট তিনেক লাগবে। তার আগে এককাপ চা খেয়ে নিলে ভালো হয়। রোজ এই সময়টায় চা নিয়ে আসে বিন্তি বলে একটা মেয়ে। আজ কেন এল না?

তখনই ডোর বেলটা বেজে উঠল। আই হোল-এ চোখ দিয়ে উপাসনা দেখল, বিন্তি। ওর জন্য চা নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই বিন্তি বলল, 'তোমার জন্য একটা লোক নিচে বসে আছে দিদি। চা খেয়ে তুমি একবার নিচে এসো।'

কয়েকদিন আগে জয়দেব কথা বলেছিল হোটেলের ম্যানেজার প্রকাশের সঙ্গে। ছেলেটা দলিত পার্টি করে। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। জয়দেব বলেছিল, চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা কোনও পুরনো পুঁথির সন্ধান পেলে যেন ও খবর দেয়। পুঁথিটা যেন জাল না হয়। প্রকাশ কাল বলছিল, এমন একটা দালালের সন্ধান ও পেয়েছে। দশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে সে থাকে। দিন দুয়েকের মধ্যেই এসে সে দেখা করবে। বোধহয় সেই লোকটাই নিচে এসেছে। ইস, যদি তেমন কোনও পুঁথির সন্ধান নিয়ে আসে, তাহলে ওর রিসার্চে একটা মেজর ব্রেক থ্রু হবে। বিন্তি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চায়ে কয়েকবার চুমুক দিয়েই উপাসনা দ্রুত পায়ে বিন্তির সঙ্গে নিচে নেমে এল।

রিসেপশনে এসে উপাসনা দেখল, সিটে প্রকাশ নেই। সোফায় একটা লোক বসে আছে। বিন্তিই দেখিয়ে দিল, 'এই যে.....এই লোকটা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

সাদা ধুতি আর ফতুয়া পরা। গলায় বেগুনি পট্টবস্ত্র। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটা হাতজোড় করে বলল, 'ম্যাডাম, আমার নাম বিম্বিসার। শুনলাম, আপনি না কি পুরনো পুঁথি খুঁজছেন। আমার কাছে বেশ কয়েকটা পুঁথির সন্ধান আছে। আপনি কী নিয়ে রিসার্চ করছেন, যদি বলেন, তাহলে আমার সুবিধা হয়।'

সোফায় বসে উপাসনা বলল, 'মহাপ্রভুর পুনর্জন্ম নিয়ে।'

শুনে চোখ বন্ধ করে বিম্বিসার বলে লোকটা কী যেন ভাবল। তারপর আক্ষেপের সুরে বলল, 'ইস ম্যাডাম, আপনি যদি আর দিন সাতেক আগেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, তাহলে একটা ভালো পুঁথি আপনাকে দিতে পারতাম। অচ্যুতানন্দের লেখা। এক জার্মান রিসার্চার পুঁথিটা কিনে নিয়ে গেলেন কার্লসরুহে ইউনিভার্সিটির জন্য। তবে অন্য একটা পুঁথি মনে হয় আপনাকে দিতে পারব। যাঁর কাছে আছে, তিনি যদি বিক্রি করতে রাজি থাকেন, তাহলেই পাবেন। দাম একটু বেশি লাগবে।'

'এই পুঁথিটা কার লেখা?'

'বলরাম দাস। পুঁথিটা এখানকারই এক বিষ্ণু মন্দিরে রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে আপনি নিজে কথা বলে দেখতে পারেন, আপনার কাজে লাগবে কি না।'

উপাসনা বলল, 'কত দাম পড়তে পারে বিম্বিসারবাবু?'

'হাজার দশেক তো লাগবেই। তবে আপনি নিজে দরদাম করে কমাতে পারেন। যে দামেই বিক্রি হোক না কেন ম্যাডাম, আমাকে কিন্তু টেন পার্সেন্ট দিতে হবে।'

এত কম দাম? উপাসনার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে যে নবেন্দু একদিন বলছিল, পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হতে পারে! হাজার সাতেকের মধ্যে হলে পুঁথিটা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে উপাসনা। টাকাটা না হয় নবেন্দুর কাছ থেকে ধার নেবে। তাই ও বলল, 'পুঁথিটা কবে পাওয়া যেতে পারে?'

বিম্বিসার বলল, 'ইচ্ছে করলে আজই নিতে পারেন। আপনার যদি প্রবলেম না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে চলুন। একবার কথা বলে আসবেন। এই তো কাছেই। মিনিট তিনেকের রাস্তা।'

'এখনই?' উপাসনা একটু দ্বিধাগ্রস্ত। বিম্বিসার লোকটাকে ও চেনে না। তার সঙ্গে একা যাওয়া কি ঠিক হবে? আধ ঘণ্টা পরেই জয়দেব এসে দাঁড়িয়ে থাকবে মিলনী রেস্তোরাঁর কাছে। তার মাঝে অবশ্য লোকটার সঙ্গে ঘুরে আসা যায়। এই ক'দিনে পুরীর রাস্তাঘাট সব ওর চেনা হয়ে গিয়েছে। এত ভয়ের কি আছে? নিজের মনকে সাহস দিল উপাসনা। রাজি হয়ে বলল, 'চলুন তাহলে।'

আটান্ন

জয়দেব মিলনী রেস্তোরাঁর দিকে চলে যাওয়ার পর গোরা ওর হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর সারা মন জুড়ে এখন সাধুদের কথা। এঁরা কারা? কেনই বা এঁরা হঠাৎ চড়াও হয়েছিলেন ডাক্তার পদ্মিনী মহাপাত্রের চেম্বারে, অনেক ভেবেও গোরা তা আন্দাজ করতে পারছে না। একটু আগে ও আর জয়দেব চেম্বারের ভেতর ঢুকেছিল। ভাঙচুরের চিহ্ন দেখে ওরা দুজন অবাক হয়ে যায়। রিসেপশনিস্ট মেয়েটার অল্প বয়স। তখনও সে থরথর করে কাঁপছে। ডাক্তার পদ্মিনী কোথায় জানতে চাওয়ায়,

মেয়েটা বলল, অসুস্থ হয়ে পড়ায় উনি বাড়ি চলে গেছেন।

মেয়েটা বলল, বেলা তিনটের সময় না কি তালগাছের মতো লম্বা এক সাধু হঠাৎ চেম্বারে ঢুকে আসেন। ডাক্তার দিদির সঙ্গে দেখা করতে চান। সাধুর ওই চেহারা দেখে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। উনি সোজা ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন। মেয়েটা তবুও দরজা আগলে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে ডাক্তার দিদিকে ও জানিয়েছিল। তখন দিদি বলে, সাধু কী কারণে দেখা করতে চান, সেটা জিজ্ঞেস কর। বল, দিদি এখন খুব ব্যস্ত। যদি কোনও রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন থেকে এসে থাকেন, তাহলে কিছু চাঁদা দিয়ে বিদেয় করে দে। দিদির কথাগুলো বলা সত্ত্বেও সাধু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে কোনও কথা নেই। সেই সময় আরও দু'তিনজন পেসেন্ট এসে পড়ায়, ও সাধুর দিকে তেমন নজর দিতে পারেনি। হঠাৎ চেম্বারের ভেতর থেকে ডাক্তার দিদির চিৎকার। চেম্বারে ঢুকে ও তখন দেখে....একা লম্বা সাধুই নন, তিন-চারজন সাধু মিলে সব যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করছেন। এত সাধু এলেন কোত্থেকে, ঢুকলেনই বা কখন, ভেবে ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। ও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দিদির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

জয়দেব জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাধুরা কী বলছিলেন, শুনেছ কিছু?'

মেয়েটা বলল, 'ওরা খুব অভিশাপ দিচ্ছিলেন ডাক্তার দিদিকে। বলেছিলেন, আপনার এই পেসেন্টকে টেস্ট করলে ডাক্তার দিদি না কি মাথা ফেটে মারা যাবে। শুনে দিদি খুব জোরে কাঁদতে লাগল। সাধুরা বলছিলেন, আপনার পেসেন্ট না কি ভগবান। তাঁর আবার পূর্বজন্ম কী? এইসব পাগলের মতো কথা। ভয়ে দিদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তখনই ওঁরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।'

ওই মেয়েটার কথাগুলোই মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল গোরার। ও একটা সাধারণ ছেলে। এই ক'দিন আগেও কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে নিয়মিত ক্লাস করত। ওর মধ্যে সাধুরা ভগবানত্ব দেখলেন কী করে, সেটাই গোরা বুঝতে পারল না। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই অতীতের নানা কথা ওর মনে ভিড় করে এল। এই সেদিন টুবাই বলছিল, তোর মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ আছে রে গোরা। তোকে আমি ছাড়ছি না। কেওনঝড়ে কোন সাধু না কি ওর মাথায় এসব কথা ঢুকিয়েছে। টুবাইকেও বলিহারি লেখাপড়া জানা একটা ছেলে, বিশ্বাস করে নিল সে কথা! আর সেই বামন সাধু? ভুবনেশ্বরে রেড্ডি কাকাকে যে বলেছিল, মহাপ্রলয়ের আগে ঈশ্বরের এক অবতার আবির্ভূত হবেন। সে কথা জানেন, চৌষট্টি জন জ্ঞানী পুরুষ। সত্যি, দেশটা আর বদলাল না। হাজার হাজার বছর ধরে কুসংস্কারাচ্ছন্নই রয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দর কথা মনে পড়ল গোরার। কলকাতায় একদিন মুকুন্দই প্রথম বলেছিল, রাতে যখন গোরা ঘুমোয়, তখন না কি একজন সাধু......বিছানায় মাথার দিকে বসে ওকে পাহারা দেন। মুকুন্দ নাকি নিজের চোখে সেই সাধুকে দেখেছে। কথাটা শুনে গোরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বোকা ছেলে, বোধহয় স্বপ্ন টপ্ন দেখেছিল। আজই সকালে ফোনে মা বলছিল, মুকুন্দ দিন দুয়েক আগে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বরে এসেছে। একটা

সেমিস্টার শেষ হয়ে গেছে, ওর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিন কয়েক ছুটি। গোরার সঙ্গে দেখা করার জন্য মুকুন্দ না কি পুরীতে আসতে চায়। ও পুরীতে এলে ভালো হত। কলকাতার সব খবর গোরা ওর কাছ থেকে পেত। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগটা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। অচিন্ত্যবাবুও এখন আর ফোন-টোন করছেন না। গোরা অবশ্য ঠিক করে রেখেছে, পুরীতে যেদিন দলিতদের সমাবেশ করবে, সেদিন অচিন্ত্যবাবুকে ও আমন্ত্রণ জানাবে।

রাস্তায় কতক্ষণ হেঁটেছে, গোরা জানে না। হঠাৎ ও নিজেকে আবিষ্কার করল, জগন্নাথ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ কী! ও তো হোটেলের দিকে হাঁটছিল। মন্দিরের দিকে চলে এল কী করে? মা শুনলে নির্ঘাত বলত, প্রভু জগন্নাথ তাকে টেনেছিলেন। কথাটা মনে হতেই গোরা মুচকি হাসল। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, মন্দিরের রাস্তায় বিশাল এক মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে। চেয়ারে প্রচুর লোকজন বসে আছেন। বোধহয় কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর রাসবিহারীর মোড়ে সেই ভাগবত মন্দিরের কথা মনে হল। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার সময় অনেক দিন ও ভাগবত মন্দিরে গিয়ে ঢুকত। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে গিয়ে দু'দণ্ড বসত। তাতে মনটা খুব শান্ত হয়ে যেত। সে কথা মনে পড়ায়, খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্যই গোরা একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

মঞ্চে একজন ঘোষক উঠে এলেন। মাইকে তিনি বললেন, এখুনি কীর্তন শুরু হবে। কটকের এক বিখ্যাত কীর্তনীয়ার দল গাইবে। গায়কের নামটা শুনে গোরা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। স্নানযাত্রার সময় মা একবার এই দলটাকে ভুবনেশ্বরের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সেদিন নাটমন্দিরে তিল ধারণের স্থান ছিল না। গোরা অবশ্য কীর্তনের পুরো সময়টা ছিল না। পার্টির কাজের জন্য মাঝপথে ওকে উঠে যেতে হয়েছিল। কিন্তু যতটুকু সময় ও নাটমন্দিরে ছিল, তাতে বুঝেছে, দলটা কীর্তনের বিবর্তন নিয়ে সুন্দর সাজিয়ে প্রোগ্রামটা করে। পাঁচশো বছর আগে যেভাবে কীর্তন হত, এখন তা পালটে গিয়েছে। গোরার মনে পড়ল, কীর্তনীয়া বলেছিলেন, আগে শুধু হরির নামেই সংকীর্তন হত। এখন তাঁর লীলা নিয়ে কত কীর্তন।

মঞ্চে একে একে বাদকরা উঠে আসছেন। একটা সময় মৃদঙ্গের বোল শুনতে পেল গোরা। আশপাশে তাকিয়ে ও দেখল, চেয়ারগুলো সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে। ডানদিকে পুরুষদের, বাঁ দিকে মহিলাদের বসার জায়গা। লোকজনে গিজগিজ করছে। মাঝে লম্বা ফাঁকা রাস্তা মঞ্চ অবধি। গোরার আফসোস হতে লাগল, ইস, মা পুরীতে আর দু'টো দিন থেকে গেলে কীর্তন শুনতে পেত। মা কীর্তন শুনতে খুব ভালোবাসে। ছোটোবেলা থেকে গোরা দেখছে, কীর্তনের সময় মা চোখ বুজে থাকে। তখন মায়ের চোখ দিয়ে অনবরত জল বেরিয়ে আসতে থাকে। গোড়া বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে হয়েও, একটা সময় পর্যন্ত গোরার মনে হত, দেবতাকে পাওয়ার জন্য চোখের জল না ফেলে মানুষ যদি মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে কাঁদত, তাহলে জগতের অনেক মঙ্গল হত। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, কীর্তনের একটা অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সবাই মিলে কোনও একটা কিছুর জন্য

আকুল হওয়া, এটাও কম কথা নয়। কিছু মানুষকে তো কিছুক্ষণের জন্য একটা আসরে টেনে আনা যায়।

বিকেলের ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে গোরা কীর্তন শোনায় মন দিল। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে। মঞ্চের দু'পাশের বড়ো বড়ো হ্যালোজেন লাইট জ্বলছে। তীব্র আলো চোখে লাগছে। হঠাৎই ওর কপালের কাছটা টিপটিপ করতে লাগল। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ। হিম লেগে গেল না কি? না, তা তো হওয়ায় নয়? মিনিট দশেক হল, ও এখানে এসে বসেছে। এত ঠান্ডা পড়েনি যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ওর মাথায় হিম লেগে যেতে পারে। তখনই ওর অন্য একটা দুশ্চিন্তা মাথায় এসে ঢুকল। অতীত দেখার ওর সেই রোগটা আবার ফিরে এল না কি? সর্বনাশ, মাথার যন্ত্রণা শুরু হলে ও খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। আসর ছেড়ে চট করে বেরিয়ে যেতে পারবে না। কেননা, আশপাশের চেয়ারে লোকজন বসে রয়েছে। কথাটা মনে উদয় হতে-না-হতেই ওর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। চোখের সামনে লাল লাল ফুলকি ফুটতে শুরু করল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সেই লাল ফুলকিগুলো বৃত্তের মতো ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ কানের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ। সামনের চেয়ারটা দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরল গোরা। তখনই ও শুনতে পেল, কাছেই কোথায় যেন খোল-করতাল বাজছে। ওর চোখের সামনে থেকে মঞ্চটা উধাও হয়ে গিয়েছে। হ্যালোজেন লাইটও। পিচের রাস্তাটা নেই। এই একটু আগেও দোকানপাটে আলো জ্বলছিল। সেই জায়গাটা এখন গাছগাছালিতে ভরা। গোধূলিবেলায় আকাশ এখন ঘষা কাচের মতো। আবছা আলোয় হালকা কুয়াশা ভেদ করে গোরার চোখে পড়ল, ডানদিকে অল্প দূরেই জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার। নামসংকীর্তন করতে করতে একদল লোক সেই সিংহদ্বারের দিকে এগিয়ে আসছে। মন্দিরের সামনে আসার পর লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পেল গোরা। পঁচিশ-তিরিশ জনের একটা দল। মুণ্ডিতমস্তক, পরনে কোঁচা মারা ধুতি। সামনের দিকে কয়েকজন নামসংকীর্তন করছে। তাদের ঠিক পিছনেই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচছে তিন-চার জন।

যারা নাচছে, তাদের মধ্যে নিজেকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল গোরা। হ্যাঁ, ওর শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তবুও লাফ দিয়ে দিয়ে ও নাচছে। ও কি পাগল হয়ে গেছে? না হলে এরকম বালখিল্য আচরণ করছে কেন? কলকাতায় কালীপুজোর ভাসানে তাসা পার্টির সঙ্গে চ্যাংড়া ছেলেদের নাচতে দেখেছে গোরা। দেখে ওর খুব খারাপ লাগত। ও ভাবত, নিজে কোনওদিন এরকম কুৎসিত নাচতে পারবে না। কিন্তু আজ নিজেকেই উন্মত্তের মতো নাচতে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। কখনও জমিতে আছাড় খাচ্ছে, ধুলোয় মুখ ঘষছে। তারপর ফের উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করছে। ওকে ঘিরে নাচছে আরও তিনজন। তাদেরও চিনতে পারল গোরা। অদ্বৈত, শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ। গোরা দেখল, ওর মুখটা ধুলোয় চেনা যাচ্ছে না। কার পট্টবস্ত্র দিয়ে যেন ওর মুখটা পরিষ্কার করে দিল অদ্বৈত।

সমুদ্রের দিক থেকে এক সম্ভ্রান্ত মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আগে অনেকবার দেখেছে গোরা। বাসুদেব সার্বভৌম। তাঁকে দেখেই সংকীর্তন থেমে গেল। সঙ্গীসাথিরা সবাই একযোগে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল। সার্বভৌম কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। গোরা নিচু হয়ে বলল, 'উঠো, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।'

হাত ধরে তুলে গোরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই আনন্দাশ্রু। সার্বভৌম বললেন, 'আপনি যে আলালনাথ পর্যন্ত এসেছেন, সেই সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম কৃষ্ণদাসের কাছে।'

গোরা বলল, 'হ্যাঁ, নিত্যানন্দের মুখে আমিও সেই সংবাদ শুনেছি। ও পুরী থেকে আলালনাথ গিয়েছিল আমাকে আনতে।' কথাগুলো বলেই ও চমকে উঠল। এ কি, ও এসব কী কথা বলছে?

সার্বভৌম হাতজোড় করে বললেন, 'প্রভু, কেমন হল আপনার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ?'

গোরা বলল, 'রায় রামানন্দ ছাড়া, তোমাদের মতো ভক্ত কোথাও দেখতে পেলাম না।'

'এই কারণেই আমি মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, রায় রামানন্দের সঙ্গে আপনার দেখা হোক। ওঁর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল প্রভু?'

'গোদাবরী নদীর তীরে। সে স্নান করতে এসেছিল। গোদাবরী থেকে যখন উঠে এল, তখন দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তাকে বললাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমি এখানে এসেছি। নীলাচলে সার্বভৌম খুব গুণগান করত তোমার সম্পর্কে। শুনে রামানন্দ কী বলল, জানো?'

'কী বললেন প্রভু?'

'বলল, আমি শূদ্রাধম দাস। সার্বভৌম আমাকে স্নেহ করেন। আমি ওঁর ভৃত্যের মতো। আমি ভাগ্যবান, ওঁর কৃপাতেই আজ আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি বললাম, সার্বভৌম তোমাকে ভৃত্যবৎ জ্ঞান করে না। তোমাকে মহাজ্ঞানী বলেই মান্য করে। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হয়ে গেছে। সার্বভৌমকে একবার আমি ভক্তিতত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল, একমাত্র রামানন্দই ভক্তিতত্ত্ব জানেন। উনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

'ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে রায় রামানন্দ কী বললেন প্রভু? আপনি কি ওঁর ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

'বিলক্ষণ। যেদিন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তার পরদিন আমি ওর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করেছিলাম। সেই স্থানে দীর্ঘসময় ধরে সে আমাকে ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়েছিল। শুনে আমার মন দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। সেই শাস্ত্র আলোচনা বিশদভাবে পরে তোমাদের বলব।'

সার্বভৌম বললেন, 'প্রভু, পথিশ্রমে আপনি ক্লান্ত। আপনার বাসস্থান স্থির করেছি। আপনি কি সেখানে বিশ্রাম নিতে যাবেন, না কি আগে মন্দিরে গিয়ে একবার জগন্নাথ দর্শন করবেন?'

'বাসস্থান? আমার তো কোনও বাসস্থানের প্রয়োজন নেই সার্বভৌম।'

'আছে, প্রভু আছে। রাজগুরু কাশী মিশ্রের উদ্যানবাটিতে, শ্রীরাধাকান্ত মঠে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকে নিরাশ করবেন না।'

সার্বভৌমের অনুরোধে কিছু একটা ছিল। তা লক্ষ করে গোরা বলল, 'চলো, আগে তো প্রভুকে একবার দেখে আসি। প্রায় দুই বছর প্রভুকে দর্শন করা হয়নি।'

কথাগুলো বলেই গোরা সিংহদ্বারের দিকে এগোল। সূর্যদেব অস্তে গিয়েছেন। জগমোহনের দিকটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রবেশপথের সিঁড়িতে তৈলপ্রদীপ জ্বালাতে শুরু করেছেন সেবকরা। গোরার মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি হল। এ কোন মন্দিরে ও এল? ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গে সন্ধেবেলায় ও যখন মন্দিরে আসত, তখন বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করত জগন্নাথ মন্দির। কিন্তু এ মন্দির তো অমাবস্যার আঁধারে ঢাকা! পরক্ষণেই ওর মনে হল, ও এখন অতীতে বিচরণ করছে। সেই সময় বিদ্যুৎ ছিল না। মন্দিরে আলো আসবে কী করে? নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্দ আর মুকুন্দকে সঙ্গে নিয়ে ও খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

বাইশ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে গোরা যখন জগমোহনে পা দিল, তখন জগন্নাথদেব সবে দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। কালাঘাট দ্বার, জয়-বিজয় দ্বার আর বেহরণ দ্বার একে একে খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিহারী সেবক পালঙ্ক সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এবার সন্ধ্যারতি শুরু হবে। গোরা গরুড় স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীলাচলে প্রথমবার যখন এসেছিল, তখন থেকেই ও জগন্নাথ দর্শন করে গরুড় স্তম্ভের গায়ে একহাতে ভর দিয়ে। ওর মনে পড়ল, দাক্ষিণাত্যে রওনা হওয়ার আগে, ও জগন্নাথের রাই-দামোদর বেশ দেখে গিয়েছিল। রাই মানে রাধা, আর দামোদর মানে শ্রীকৃষ্ণ। এই বেশে জগন্নাথ সাত রকমের মালা পরেন। জগন্নাথের সেই ছবিটাই এতদিন ওর মনে গেঁথে ছিল। এখন প্রভুর মকর বেশ। প্রভুর মাথায় তুলসী পাতার বিরাট একটা মুকুট। এ বেশ রাধাকৃষ্ণের প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন নয়, এ বেশে জগন্নাথ যেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর।

কথাটা মনে হতেই গোরার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। রত্নসিংহাসনে আসীন বিগ্রহের দিকে ও নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে সন্ধ্যারতি শুরু করে দিয়েছেন পান্ডারা। গর্ভগৃহে শুধুমাত্র প্রদীপের আলো ঘুরে বেরাচ্ছে। শালখুঁটি বেড়ার এপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু ভক্ত সেই সন্ধ্যারতি দেখছেন। দূরে কোথাও সংকীর্তন হচ্ছে। কৃষ্ণের নাম আসা মাত্র গোরার মন আনন্দ রসে পূর্ণ হয়ে গেল। মন্দির সেবকদের মধ্যে কেউ একজন সেই সময় মালা-চন্দন পরিয়ে দিলেন গোরাকে। সেই বেশে গোরাকে দেখে সঙ্গী ভক্তরা আনন্দে উদ্বেলিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নামসংকীর্তন শুরু করে দিলেন। এতক্ষণ যাঁরা গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে প্রভু জগন্নাথের সন্ধ্যারতি দেখছিলেন, বিগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা এসে যোগ দিলেন কীর্তনে। গোরার শরীরের ভেতরটা ফের কাঁপতে লাগল। মনে হল, শরীর আর ওর বশে নেই। কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে ক্রমশই ও রাধাভাবে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। কী যেন হল, ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়ে ও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগল।

নাচতে নাচতে অনেকক্ষণ পরে গোরা আবিষ্কার করল, চোখের সামনে থেকে মন্দির অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। জগন্নাথদেবের বিগ্রহটাও আর ও দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকার উধাও। হ্যালোজেনের তীব্র আলোয় গোরা দেখতে পেল, ও মঞ্চের ঠিক নিচেই নাচছে। ওর বাঁদিকে সার সার চেয়ারে প্রচুর মহিলা বসে আছেন। ডানদিকে পুরুষ। তাঁদের সবার চোখেই বিস্ময়ের চিহ্ন। মহিলারা উলুধ্বনি দিচ্ছেন। কীর্তনীয়ারা মঞ্চ থেকে নিচে নেমে, ওকে ঘিরে খোল-করতাল নিয়ে নাচতে শুরু করেছেন। ঘন ঘন হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিজেকে আর সামলাতে পারছে না গোরা। চিৎকার করে বলে উঠল, 'কৃষ্ণ তুমি কোথায়? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন?' কথাগুলো বলেই ও অবাক হয়ে গেল। তবুও, একই কথা প্রলাপের মতো ও বলতে লাগল। বলতে বলতে ওর গলার স্বর ভেঙে গেল। একটা সময় তা রোদনের মতো শোনাতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে হঠাৎই ও আছড়ে পড়ল পিচের রাস্তায়। এবং জ্ঞান হারাল।

......কতক্ষণ অচেতন ছিল, গোরা জানে না। ও শুনতে পেল, দূরে কেউ ভজন গাইছেন, 'আদি-অন্ত মেরা হ্যায় রাম'। চোখ খুলেই ও দেখল, কেউ একজন জলের ঝাপটা দিচ্ছেন। আশপাশে বেশ কিছু মানুষ উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে একজনকে গোরা চিনতে পারল। ভুবনেশ্বরের রেড্ডি কাকা। ইউনিক পার্কে ওদের প্রতিবেশী। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে বসে বলল, 'রেড্ডিকাকা, আপনি এখানে?'

অদ্ভুত ব্যাপার, রেড্ডিকাকা ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'আজই জগন্নাথ দর্শনে এসেছিলাম। ভাগ্যিস এসেছিলাম। তোমার আসল রূপ আজ তাই দেখতে পেলাম। প্রভু, তোমার চরণে ঠাঁই দাও আমায়। আমি আর ভুবনেশ্বরে ফিরছি না।'

উনষাট

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় মিলনী রেস্তোরাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল জয়দেব। সাড়ে সাতটা বেজে গেল, অথচ উপাসনার দেখা নেই। এই এক ঘণ্টায় অন্তত বার পঁচিশেক ও ফোন করেছে উপাসনার মোবাইলে। কিন্তু ও ধরছেই না। ফোনে বারবারই নট রিচেবল বলছে। গেল কোথায় উপাসনা? সময় যত গড়াচ্ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে জয়দেবের। মনে মনে নানা সম্ভাবনা ও খতিয়ে দেখতে শুরু করল। গোরার সঙ্গে কোথাও যায়নি তো? প্রশ্নটা ওর মনে উঠেই মিলিয়ে গেল। না, তা হতে পারে না। একটু আগে ডাক্তারের চেম্বারের যখন গোরার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, তখন গোরা বলেছিল, পার্টির লোকজন ওর কাছে আসবে। পার্টির সমাবেশ নিয়ে কথা বলতে। সুতরাং পার্টির লোকজনের সঙ্গেই ও ব্যস্ত থাকবে। না, গোরা নয়। তবে কি হঠাৎ করে ভুবনেশ্বর থেকে স্বাতীরা এসেছিল? ওরাই কি হোটেল থেকে উপাসনাকে তুলে নিয়ে মন্দিরের দিকে গেছে? অনেক সময় মন্দিরের কাছাকাছি অঞ্চলে জ্যামার লাগানো থাকে। তাই মোবাইলে তখন কাউকে ধরা

যায় না। কিন্তু স্বাতীরা পুরীতে এলে, উপাসনা নিশ্চয়ই ওকে আগে ডেকে নিত। ওকে ফেলে পুজো দিতে যেত না।

তাহলে? ভুল করে উপাসনা আবার সী বিচের দিকে চলে গেল না তো? স্বর্গদ্বারের কাছে একটা জায়গায় রোজই ওরা কিছুক্ষণ সময় কাটায়। হয়তো উপাসনা সেখানেই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। জয়দেব হঠাৎ দ্বিধায় পড়ল। ও ঠিক কি মেসেজ দিয়েছিল? উপাসনাকে মিলনী রেস্তোরাঁয় দেখা করতে বলেছিল, না কি ওকে সী বিচেই যেতে বলেছিল? ও ফোন খুলে দেখল, মেসেজ ডিলিট করে ফেলেছে। দুশ্চিন্তায় রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে জয়দেব পা বাড়াল উপাসনাদের হোটেলের দিকে। ওর মন বলতে লাগল, উপাসনা নিশ্চয়ই কোনও বিপদের মধ্যে পড়েছে। সুশোভনদার পিছনে যারা লেগেছিল, উপাসনা তাদের হাতে পড়ল না তো? কথাটা মনে হতেই টেনশন বেড়ে গেল জয়দেবের। কী জানি, হয়তো লোকগুলো আড়াল থেকে টার্গেট করেছিল উপাসনাকে। হয়তো জানতে পেরেছে, উপাসনার রিসার্চের কথা। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সর্বনাশ! ওই লোকগুলো সব পারে। কথাগুলো ভাবতেই বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল জয়দেবের। স্বাতী আর নবেন্দুর কাছে ও কী জবাব দেবে? ওরা তো এসে বলবেই, আপনার ভরসায় মেয়েটাকে পাঠালাম। আর আপনি ওকে রক্ষা করতে পারলেন না?

হোটেলে এসে জয়দেব রিসেপশনে খোঁজ করল উপাসনার। ম্যানেজার প্রকাশ বলে ছেলেটা চেনা। ওকে দেখে বলল, 'দিদি তো বেরিয়ে গেছে সন্ধে ছ'টার সময়। পুঁথি বিক্রি করার জন্য একজন দালাল এসেছিল। শুনলাম, তার সঙ্গে গেছে।'

দালালের সঙ্গে উপাসনা একা গিয়েছে? বিশ্বাস হল না জয়দেবের। ও বলল, 'তুমি যে দালালের কথা বলেছিলে, সে এসেছিল, না অন্য কেউ?'

প্রকাশ বলল, 'জানি না। সেই সময়টায় রিসেপশনে আমি ছিলাম না। কিচেনে ছিলাম। কেন দাদা, কোনও প্রবলেম হয়েছে না কি?'

'তুমি একবার খোঁজ করে দেখবে ভাই, তোমার লোকটাই এসেছিল কি না? তার কোনও ফোন নম্বর আছে? আমার মনে হচ্ছে, উপাসনা কোনও বিপদের মধ্যে পড়েছে।'

শুনে প্রকাশের মুখের রঙ বদলে গেল। ল্যান্ডলাইন থেকে ও দালালকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কয়েকবার ডায়াল করার পর লাইনটা পেয়ে ও কথা বলতে লাগল। তারপর ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'না, দাদা। আমার দালাল আজ আসেনি। কী হল, বলুন তো? দিদি তাহলে গেলেন কার সঙ্গে?'

'তুমি কার কাছ থেকে শুনলে, উপাসনা দালালের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।'

'আমাকে বিস্তি বলল। আপনি চেনেন ওকে। দাঁড়ান, ওকে একবার ডাকি।'

একটু পরে বিস্তির মুখে পুরো বৃত্তান্ত শুনে জয়দেবের মনে হল, মেয়েটা রেখে ঢেকে বলছে। প্রকাশ যখন জিজ্ঞেস করল, লোকটাকে দেখতে কেমন, তখন বিস্তি একবার বলল, সাদা ধুতি আর ফতুয়া পরা ছিল। অনেক পরে বলল, গলায় বেগুনি রঙের পট্টবস্ত্রও ঝোলানো ছিল। একবার বলল, লোকটার গোঁফ ছিল, গাট্টাগোট্টা ধরনের। খানিকক্ষণ

পরে বলল, না, গোঁফদাড়ি কিছু ছিল না। লোকটার পরনে ছিল সিল্কের বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি। বিন্তিকে ভয় দেখানোর জন্যই জয়দেব বলল, 'মনে হয়, পুলিশে খবর দিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, উপাসনা কিডন্যাপড হয়েছে। পুলিশ এসে কথা বলুক বিন্তির সঙ্গে। কেননা, একমাত্র ওই দালাল লোকটাকে দেখেছে। তার আগে আমি একবার স্বর্গদ্বার থেকে ঘুরে আসছি। ওখানে যদি উপাসনাকে না পাই, তাহলে তুমি পুলিশ ডেকো।'

কথাগুলো বলেই জয়দেব হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। একটা সাইকেল রিকশায় চেপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও পৌঁছে গেল স্বর্গদ্বারের কাছে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এই সময় সী বিচের ধারে লোকজন কমতে থাকে। যে জায়গাটায় ওরা নিয়মিত বসে, সেখানে গিয়ে জয়দেব দেখল, কেউ নেই। ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। দিন তিনেক আগেও ওরা দুজন এই জায়গাটায় বসে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। সমুদ্র সেই আগের মতোই আছে, তেমনই গজরাচ্ছে। ঢেউগুলো প্রায় পাঁচিলের সামনে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। নোনা জল হঠাৎ আছড়ে পড়ে কোনও কোনওদিন ওদের ভিজিয়েও দিয়েছে। খিলখিল করে তখন হেসে উঠেছে উপাসনা। সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়দেব। বিয়ের জন্য দিদি যে ওকেই পছন্দ করেছে, সে কথা ও নাটকীয়ভাবে উপাসনাকে বলবে, ঠিক করে রেখেছিল আজ। সেই সুযোগটাই পেল না।

হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য জয়দেব ফের রাস্তায় উঠে এল। আর তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে একটা লোক ওর সামনে এসে দাঁড়াল। গায়ে সস্তার একটা কম্বল জড়ানো, মুখ ঢাকা। ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলো। লোকটা কে, জয়দেব বুঝতে পারল না। নিজেকে আড়ালে রেখেই লোকটা বলল, 'জয়দেব ভাইনা। আমার পিছন পিছন আসুন। কথা আছে।'

অচেনা লোকের মুখে নিজের নাম শুনে চমকে উঠল জয়দেব। কে এই লোকটা, ওকে চেনে? ডান দিকে তাকিয়ে ও দেখল, স্বর্গদ্বারে শ্মশানের কাছে এখনও কিছু লোকজন রয়েছে। এরা বেড়াতে এসে উলটোদিকের হোটেলগুলোতে উঠেছে। সাহায্যের জন্য ডাকলে, ছুটে আসবে। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে ও দৃঢ়ভাবে বলল, 'কে আপনি? যা বলার এখানে বলুন।'

মুখের ঘোমটা পলকের জন্য সরল। লোকটা বলল, 'আমি পুরন্দর। গোরাভাই-এর বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মনে আছে? আপনি যাকে খুঁজছেন, আমি জানি তিনি কোথায় আছেন।'

পুরন্দর! আরে, ও জানল কী করে, উপাসনাকে পাওয়া যাচ্ছে না? পুরন্দর অ্যাদ্দিন ছিলই বা কোথায়? জয়দেবের মনে পড়ল, ভুবনেশ্বরে চুরির দায়ে লোকটা যেদিন মার খেয়েছিল, সেদিন অবশ্য বলেছিল বটে, ওর বাড়ি পুরীতে। পুরন্দরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তীব্র কৌতূহল নিয়ে ও পুরন্দরের পিছু নিল। প্রায় আধ কিলোমিটার বালিয়াড়ি পেরিয়ে নির্জন জায়গায় গিয়ে পুরন্দর দাঁড়াল। তারপর গায়ের কম্বলটা খুলে বালির উপর বিছিয়ে বলল, 'বসুন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

কম্বলের উপর বসে জয়দেব বলল, 'তুমি জানলে কী করে, উপাসনাকে পাওয়া যাচ্ছে

না?'

পুরন্দর বলল, 'আমি জানি, কারণ কিডন্যাপিংয়ের প্ল্যানটা আমি আড়াল থেকে শুনে ফেলেছি।'

'তুমি সিওর, ও কিডন্যাপড হয়েছে? কারা কিডন্যাপ করেছে ওকে?'

'তাদের নাম আমি বলতে পারি। কিন্তু আপনি তাদের চিনবেন না। আসল রাগটা ছিল সুশোভনবাবুর উপর। এখন বিষনজরে পড়েছেন আপনি। ওরা জানতে পেরেছে, দিদিমণির সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক রয়েছে। আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই দিদিমণিকে ওরা কিডন্যাপ....।'

মাঝপথেই পুরন্দরকে থামিয়ে দিল জয়দেব, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সুশোভনবাবুর নাম তুমি জানলে কী করে?'

পুরন্দর বলল, 'যাঁরা সুশোভনবাবুকে কিডন্যাপ করেছিল, তাদের মুখেই শুনেছি।'

'তার মানে? উনিও কিডন্যাপড হয়েছিলেন না কি? তাহলে বেরিয়ে এলেন কী করে?'

'ওকে বিষাক্ত জড়িবুটি খাইয়ে....ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'তুমি কি জানো, স্লো পয়েজনিংয়ের জন্য উনি মারা গেছেন?'

'না, জানি না। তবে মারা যাবেন, জানতাম। যদি মারা না যেতেন, তাহলে পাগল হয়ে একদিন পুরীর রাস্তায় ঘুরে বেরাতেন।'

'এই পাষণ্ডগুলো কারা পুরন্দর?'

'সে অনেক কাহিনি। এদের একটা গুপ্ত সংগঠন আছে। সারা দেশ জুড়ে এদের বিশাল নেটওয়ার্ক। এই ক'দিন আগেও আমি এদের হয়ে কাজ করতাম। এদের জন্য অনেক পাপ করেছি। আর নয়। এবার আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে নেমেছি। এই গুপ্ত সংগঠন আমিই ধ্বংস করে দেব।'

'আমার উপর এদের রাগ কেন?'

'শুধু আপনার উপর নয়, মহাপ্রভুকে নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের সবার উপরই এদের রাগ। জানেন, আপনাকে মেরে ফেলার জন্যও আমাকে এরা নির্দেশ দিয়েছিল। কলকাতায় আমি সেই চেষ্টাও করি। তখন আপনি বুঝতেও পারেননি। আপনার কপালটা ভালো। দুবার আপনি বেঁচে গিয়েছেন।'

'তোমার ধারণা ভুল পুরন্দর। আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। পুলিশ আমাকে অ্যালার্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, মহাপ্রভুকে নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের উপর এদের এত রাগ কেন? এই সংগঠনটা অপারেট করে কোত্থেকে?'

'এই পুরী থেকে। এটা একটা ধর্মীয় উন্মাদের অর্গানাইজেশন। এদের হেড কোয়ার্টার্স কোথায়, অ্যাদ্দিন তা জানতাম না। কিন্তু সেটাও মনে হয়, আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। আসলে আমি ছোটোবেলা থেকে এদের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বড়ো হয়েছি। এরা যা করতে বলেছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। একটা মাত্র কাজই করতে পারিনি। সেটা হল, আপনাকে মারা। তাই আমিও এদের বিষনজরে পড়ে গিয়েছি। এই যে দেখছেন,

নিজেকে কেমন লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে।'

'এই গুপ্ত সংগঠন সম্পর্কে তুমি আর কি জানো, পুরন্দর?'

'বিশেষ কিছু না। এরা আমাকে জানতেও দেয়নি। কিছুদিন আগে মন্দিরের এক দইতাপতি প্রথম আমাকে বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে যাঁরা হত্যা করেছিলেন, তাঁদেরই বংশধররা এই গুপ্ত সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন অতটা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ নিশ্চিত হলাম। বংশপরম্পরায় কী তীব্র আক্রোশ এঁরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, ভাবুন। পাঁচশো বছর পরেও সেই আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।'

'তুমি কি নিশ্চিত, মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল?'

'বলছি। আশাকরি, আপনি কাউকে বলবেন না। পুরীতে আজই একজন......তাঁর নাম আপনাকে বলতে পারব না....আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক আমেরিকান বৈষ্ণবের। এই লোকটার আসল নাম রবার্ট ক্লিফোর্ড। কিন্তু বৈষ্ণব হওয়ার পর নাম বদলে, হয়েছে আত্মানন্দ দাস। রিসেন্টলি হলিউড থেকে একটা সিনেমা কোম্পানির লোকজন পুরীতে এসেছে। তারা মহাপ্রভুকে নিয়ে একটা ছবি তৈরি করতে চায়। ওদেরকে সাহায্য করছে এই আত্মানন্দ। ওকে দেখলে আপনি আমেরিকান বলে চিনতে পারবেন না। গায়ের রঙ আমাদেরই মতো। দীর্ঘদিন কলকাতায় আমেরিকান কনসুলেটে চাকরি করেছে বলে, পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। আত্মানন্দের সঙ্গে যে মেয়েটা লিভ টুগেদার করে....মানে ওর সাধনসঙ্গিনী মাধবী, সে এক বাঙালি মেয়ে। তবে এখানকার নয়, বাংলাদেশের সিলেটের। আজ দুপুরে দীর্ঘসময় ধরে আত্মানন্দ আর মাধবীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তখনই নিশ্চিত হলাম, পাঁচশো বছর আগে, অহেতুক সন্দেহ করে মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল। ওঁদের কাছে না কি কিছু ডকুমেন্টও আছে। তাই ওরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর হয়ে, সিনেমা বানাচ্ছে।'

হলিউডের লোকজন যে পুরীতে এসেছে, তা জয়দেবের আগেই জানা ছিল। কেননা, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে অবধূত গোস্বামীজির সঙ্গে যেদিন সিনেমার লোকেরা কথা বলতে গিয়েছিল, সেদিনই উপাসনাকে নিয়ে ও আশ্রমে হাজির হয়েছিল। কিন্তু এ কী বলছে পুরন্দর! মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে হলিউড ছবি করছে? শুধু এই বিষয়টাই নিয়ে? তবে যে ওরা সেদিন অবধূতজিকে বলল, সিনেমার বিরাট একটা অংশের থিম মহাপ্রভুর রাধাভাব নিয়ে? নিজেকে রাধা কল্পনা করে মহাপ্রভু কীভাবে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, স্ক্রিপ্টে সেই অংশটাই প্রাধান্য পাবে। অবধূতজি তো সেদিন ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে অনেক কথা বললেন ওঁদের। আত্মানন্দ কি সেদিন ছিল ওদের সঙ্গে? আত্মানন্দ সম্পর্কে আরও জানার জন্য জয়দেব জিজ্ঞাসা করল, 'আত্মানন্দের সঙ্গে কথা বলে তোমার কী মনে হল পুরন্দর?'

'আসলে ও একজন এজেন্ট। আপনি কি বুঝতে পারছেন, এজেন্ট বলতে আমি কাদের বোঝাচ্ছি? বাইরে থেকে দেখে ওকে বোঝা যায় না। গলার কণ্ঠী, কপালে তিলক, হাতে জপের মালা। কিন্তু ও একদিকে যেমন বৈষ্ণব পণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনই মার্শাল আর্টে ব্ল্যাকবেল্ট হোল্ডার। এই আত্মানন্দ হল আমেরিকার এক গুপ্ত সংগঠনের এজেন্ট। সংগঠনের

নামটা আপনাকে বলছি না। আপনি বুঝে নিন। মহাপ্রভুর বাণী এরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এদের হেড কোয়ার্টার্স নবদ্বীপের কাছে মায়াপুরে। মাসকয়েক আগে ওদেরই সংগঠনের একজন এজেন্টকে আমি খুন করেছিলাম। আমাদের সংগঠনের পূজ্যপাদদের নির্দেশেই খুনটা করেছিলাম। সেই সূত্রে আত্মানন্দ আমাকে এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রথম মোলাকাতেই বুঝে গেছি, ওর সঙ্গে এখন শত্রুতা না করে, যদি হাত মেলাতে পারি, তাহলে আমি যা চাইছি, তা সম্পন্ন করতে পারব। সেই কারণেই খুনোখুনিতে যাইনি।'

জয়দেবের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। পরিষ্কার করে বোঝার জন্য ও বলল, 'আত্মানন্দ যে অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য কী?'

'দুটো উদ্দেশ্য। এক, শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এদের প্রচুর টাকা। এরা দু'হাতে টাকা ছড়াচ্ছে। মায়াপুর এরা প্রায় কিনে ফেলেছে। একদিন দেখবেন, পুরো নবদ্বীপটাও এদের দখলে চলে যাবে। বিশেষ করে, চৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো। এরা নানা দেশে মন্দির গড়লেও, এখনও পুরীতে ঢুকতে পারেনি। আত্মানন্দরা এবার সেই চেষ্টাই করছে।'

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিল জয়দেব। বলল, 'এদের দু'নম্বর উদ্দেশ্যটা কী?'

'চৈতন্যচর্চা যারা মুছে দিতে চায়, তাদের ধ্বংস করা। প্রভু জগন্নাথের দয়ায় আত্মানন্দের সঙ্গে আজ আমার আলাপ হয়ে গেল। এবার আমি প্রতিশোধ নেব।'

'পুরন্দর, তুমি কি সিওর, আত্মানন্দ তোমাকে যা বলেছে, সত্যি?'

'সত্যি কি মিথ্যে জানি না। তবে এটুকু বুঝেছি, ওদের সংগঠন অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। আমি যে ধ্বংসের কাজটা একা করতে পারব না জয়দেববাবু। আত্মানন্দের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। যাক গে, অনেক কথা হল। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আগে ম্যাডামকে উদ্ধার করে আনি।'

শুনে জয়দেব খানিকটা দ্বিধায়, 'পুলিশকে খবর দিলে হত না?'

'দরকার নেই। আপনি কী আমার সঙ্গে একা যেতে অস্বস্তিবোধ করছেন জয়দেববাবু?' বলেই হাসল পুরন্দর। তারপর বলল, 'থাক তাহলে। আপনি কোন হোটেলে আছেন, বলুন। ম্যাডামকে আমি সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'কিডন্যাপ করে উপাসনাকে ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে পুরন্দর?'

'কোথায় নিয়ে তুলবে, তা শুনেছি। আমার বিশ্বাস, ম্যাডামকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা কিডন্যাপ করেনি। ওরা আক্রোশ মেটাবে অন্যভাবে। মাহেরি....মানে দেবদাসীদের একটা ব্রথেল আছে এখানে। ওরা সেখানেই তুলবে ম্যাডামকে। পুলিশ সেখানে ঢুকতেও পারবে না। ওই গোপন অন্দরের চত্বরে আমি আজীবন কাটিয়েছি। আমার থেকে ভালো আর কেউ জায়গাটা চেনে না।'

'তোমার কি মনে হয়, গোরাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত?'

'এই গুপ্ত সংগঠনের কথা শোনার পরও কি আপনার মনে হচ্ছে, দল বেঁধে যাওয়া উচিত? আমার তো মনে হয় না। ওই বিপজ্জনক পাতাল গৃহে আপনাকেও নিয়ে যেতাম

না। শুধু নিয়ে যাচ্ছি, ম্যাডাম আমাকে চিনতে পারবেন না বলে। একটা কথা বলি, আপনিও একটু সাবধানে থাকবেন জয়দেববাবু। এর পরের টার্গেট আপনি। তারপর গোরাভাইনা। তবে এও জেনে রাখুন, আমি থাকতে আপনাদের কেউ কিছুই করতে পারবে না। সে যাক, আমার মনে হয়, আমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছি। ম্যাডামকে যদি ফিরে পেতে চান, তাহলে আমার সঙ্গে শিগগির চলুন।'

কথাগুলো বলেই পুরন্দর উঠে পড়ল। কম্বল থেকে বালি ঝেড়ে ফের গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তায় উঠে এসে, দাঁড়িয়ে থাকা একটা অটো রিকশার পিছনের সিটে গিয়ে বসল। অগত্যা জয়দেবও ওর পাশে গিয়ে বসল। ড্রাইভার অটোতে স্টার্ট দিতেই পুরন্দর বলল, 'রবার্ট, বিষ্ণু মন্দিরের দিকে চলো।' নামটা শুনে চমকে উঠল জয়দেব। এই অটো ড্রাইভারই তাহলে রবার্ট.....মানে আত্মানন্দ!

ষাট

রেড্ডি কাকাকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছে গোরা। কিছুতেই পিছু ছাড়ছেন না। ওকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। তারপর হোটেলেই একটা ঘর ভাড়া করে রয়ে গিয়েছেন। সারাক্ষণ হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কখনো কখনো কেঁদে ফেলছেন। চেতলায় রাসবিহারীবাবুর মধ্যেও এই একই পরিবর্তন লক্ষ করেছিল গোরা। সেখান থেকে পালিয়ে এসে না হয় বেঁচেছে। কিন্তু রেড্ডিকাকার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে, কী করে ও ভেবে পাচ্ছে না। একটু আগে ওর ঘর থেকেই রেড্ডি কাকা কথা বলছিলেন, ভুবনেশ্বরে নিজের বাড়িতে। তেলুগু ভাষায় কী বললেন, গোরা তা জানে না। কিন্তু কথা বলার সময় বারবার ওর নামটা উল্লেখ করছিলেন। গোরা নিশ্চিত, রেড্ডি কাকিমা এতক্ষণ সব উগরে দিয়েছেন মায়ের কাছে গিয়ে। আর সে সব অতিরঞ্জন শুনে মা ফোন করে বলবে, 'কাল সকালেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবি। না হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।'

ব্যস, দলিত পার্টির সমাবেশের দফা রফা। আজ রাতেই কেশব ভারতীর সঙ্গে কথা বলবে বলে, গোরা ঠিক করে রেখেছিল। পুরীর সমাবেশ যাতে উনি প্রধান বক্তা হিসাবে আসেন। কিন্তু গোরা এখন দ্বিধায়, কেশবজিকে আমন্ত্রণ জানাবে কি না। সর্বভারতীয় এক নেতাকে ডেকে তারপর নিজেই যদি হাজির থাকতে না পারে, তাহলে বদনাম হয়ে যাবে। এসব কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। বিছানায় আর ও শুয়ে থাকতে পারল না। কী ভেবে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। চোখ মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। রাতের দিকে আগে কখনও ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়নি। পাঁচতলা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, রাস্তাঘাট এখন বেশ ফাঁকা। অনেক দূরে কেউ বোধহয় মীরার ভজন গাইছে। মাইকে সেই গান

উত্তাল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। মন্দিরের কাছে সেই অনুষ্ঠানটা তাহলে এখনও চলছে। ওখানকার কথা ফের মনে পড়ায়, গোরা দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কী করে পারল, ও ওইভাবে সকলের সামনে নাচতে। ওর ভেতর কি কেউ ভর করেছিল? পিচের রাস্তায় আছাড় খাওয়ার পর ওর ডান কনুই ঠুকে গিয়েছিল। হোটেলে ফেরার পর গোরা দেখে, কনুইয়ের কাছটা কালশিটে পড়েছে। প্রকাশ ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো এনে দিয়েছিল। রেড্ডি কাকা এই খানিক আগে পর্যন্ত কালশিটের উপর বরফ ঘষেছেন। কনুইয়ের কাছে হাত দিয়ে গোরা টের পেল, ব্যথাটা অনেক কমে গিয়েছে। প্রকাশ এত যত্ন করে যে, একটা অয়েন্টমেন্ট আর পেনকিলার ট্যাবলেটও নিয়ে এসেছে কাছাকাছি এক ডাক্তারখানা থেকে। টেবলের উপর রেখে বলে গেছে, 'রাতের দিকে যদি ব্যথা-ট্যাথা হয়, তাহলে ট্যাবলেটটা খেয়ে নেবেন।'

শীত শীত করছে বলে গোরা পাখাটা বন্ধ করে দিল। তারপর আলো নিভিয়ে কম্বলটা গায়ের উপর টেনে শুয়ে পড়ল। উলটোদিকের দেওয়ালে নীল রঙের একটা ছোটো আলো জ্বলছে। হালকা নীলাভ রঙ ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘর জুড়ে। অন্যদিন, গোরা এত ক্লান্ত থাকে, চোখ বুজলেই রাজ্যের ঘুম ওকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ শুয়ে থাকা সত্ত্বেও ওর চোখে ঘুম এল না। জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর জগমোহনে গরুড় স্তম্ভটা বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। স্তম্ভে একহাতে ভর রেখে ও তাকিয়ে রয়েছে রত্নসিংহাসনের বিগ্রহের দিকে। গর্ভগৃহে শুধুমাত্র আলো। চোখ বন্ধ করে গোরা নিজের দিকে একবার ভালো করে তাকাল। এ কী! ওর পরনে শুধুমাত্র কৌপীন কেন? এ তো সন্ন্যাসীর বেশ! ও তো কখনো কৌপিন পরেনি!

চোখ খুলতেই গোরা চমকে উঠল। নীলাভ আলোটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবুও কত মনোরম আর স্নিগ্ধ। হঠাৎই বারান্দার দিকের দরজাটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল। গোরা দেখতে পেল, জ্যোতির্ময় এক পুরুষ এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গায়ের রঙ নীল। শরীরের নানা জায়গায় সোনার অলঙ্কার। মাথায় সুদৃশ্য মুকুট। তাতে একটা ময়ূরের পালক। এক হাতে সুদর্শন চক্র। অন্য হাতে বরাভয়। ওর দিকে তাকিয়ে সেই পুরুষ স্মিত হাসছেন। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তিনি মিলিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ....ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওর সামনে এসে হাজির হয়েছেন....এই অনুভূতি গোরাকে প্রথমে অবশ করে দিল। তারপর ওর মনে হল, হতেই পারে না। ও স্বপ্ন দেখেছে। সত্যিই কী? এই তো একটু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও সমুদ্র দেখছিল। তাহলে ঘুমোল কখন? ভুবনেশ্বরে ওদের মন্দিরে এই কৃষ্ণেরই বিগ্রহ আছে। মা তাঁকে রোজ পুজো করেন। যেন তিনিই রক্তমাংসের চেহারা ধরে ওকে দেখা দিয়ে গেলেন। ভাবতেই গোরার সারা শরীর মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে লাগল।

খানিক পর কাঁপুনি থেমে যেতেই গোরার মনে হল, এই জ্যোতির্ময় পুরুষকে এর আগেও কোথাও যেন দেখেছে। কোথায়, ও তা মনে করতে লাগল। নবদ্বীপের টোলে?

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের উঠোনে? গয়ায় পিণ্ডদানের আসরে? না কি নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরে? গোরার আরও মনে হল, তাঁর সঙ্গে ও নিভৃতে কথাও বলেছে। সম্ভবত বৃন্দাবনের কুঞ্জে। অথবা গম্ভীরার মেঝেতে শুয়ে। এ ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ওর মনে হতে লাগল। পর মুহূর্তে ও ভাবল, আরে, ও তো কখনো যায়ইনি গয়াতে। অদ্বৈত আচার্যকে চেনে না। গম্ভীরা কী, তাও জানে না। তাহলে সে সব কথা ওর মনে পড়ছে কেন? গুলিয়ে যাচ্ছে, সবকিছু জটিল হয়ে যাচ্ছে। দ্বৈতসত্তার দোলাচলে ওর মাথার ভেতর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। গোরা বুঝতে পারল না, আসলে ও কে?

ঠিক এই সময় ছটফট করতে করতে গোরার মনে হল, ওকে যেন জোর করে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীতে। ওর কানের পাশে সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। যেন ঝড়ের কাছে ও আত্মসমর্পণ করেছে। কোনও কিছুই আর ওর বশে নেই। একটু পরে অবশ্য সব শান্ত হয়ে গেল। গোরা দেখতে পেল, কোনও এক অজানা দেশে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ও বসে আছে। ওর পরনে একটুকরো গেরুয়া কাপড়। মস্তক মুণ্ডিত, ওকে ঠিক সন্ন্যাসীর মতো লাগছে। পিছনে বেশকিছু মানুষ বসে আছে। বোধহয় কারও জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। এই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক রাজপুরুষ। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরেই তিনি হাতজোড় করে বসলেন। গোরা স্মিত হেসে তাঁকে প্রশ্ন করল, 'আলোচনা তাহলে শুরু করা যাক। এমন একটা শ্লোক আমাকে বলো তো রামানন্দ, যাতে পুরুষের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয়েছে?'

রাজপুরুষ বললেন, 'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম।'

'এর অর্থ ভক্তদের তুমি বুঝিয়ে দাও রামানন্দ।'

'মানুষ শাস্ত্রের নির্দেশমতো, নিজের নিজের বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করবে। তা হলেই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হবে। এ ছাড়া বিষ্ণুসন্তোষের আর কোনও উপায় নাই। প্রভু, চার ধরনের বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আর চার ধরনের আশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বর্ণাশ্রমের অধিকার যারা মেনে চলেন, তাঁদের পরমগতি লাভ হয়।'

গোরা বলল, 'বিষ্ণুভক্তিই সার কথা, এটা ঠিক। বর্ণাশ্রমাচার পালন করতে করতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। মহৎসঙ্গে মানুষের ভক্তিলাভের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু বর্ণশ্রমাচার পরম্পরালব্ধ। সাধ্যভক্তির সাক্ষাৎ সাধন নয়। তাকে অন্তরঙ্গ সাধন না হলে বহিরঙ্গ সাধন বলাই ভালো। তাই তুমি যে শ্লোকটির কথা উল্লেখ করলে, তাতে সাধ্যের নির্ণয় হল না। হল সাধনের নির্ণয়। রামানন্দ, তুমি অন্য শ্লোক বলো।'

রামানন্দ বললেন, 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদার্পণম॥'

প্রভু, গীতায় আছে, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কৌন্তেয়, তুমি ভোজন, হবন, দান, তপ বা অপর যে-কোনও কাজই করো না কেন, সব আমাতে অর্পণ করো। প্রভু,

বর্ণাশ্রমাচার পালন সাধ্যভক্তির বহিরঙ্গ সাধন তো বটেই। কেননা, ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত না হওয়ায় তা সকামবৎ ও কঠোর। কিন্তু গীতায় উল্লেখ করা কর্মযোগ নিষ্কাম। কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত। তাই একে সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন বলা যায়।'

গোরা বলল, 'তোমার কথা মানতে পারছি না রামানন্দ। কৃষ্ণে অর্পিত কর্মও, কর্মই। শুদ্ধাভক্তি নয়। ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন, ভক্তিই হওয়া উচিত। আরোপসিদ্ধা ভক্তি কখনোই পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হতে পারে না। নতুন কিছু বলো।'

'তাহলে শুনুন', রামানন্দ বললেন, 'গীতায় কৃষ্ণ বলছেন, স্বধর্মের দোষগুণ বিচার করে, মদুপদিষ্ট স্বধর্মসকল পরিত্যাগ করে, একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহলে আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব।'

গোরা বলল, 'কিন্তু শরণাপত্তি কখনোই উত্তমা ভক্তি বলে গণ্য হতে পারে না।'

'তাহলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন হোক। কেননা, জ্ঞানমার্গে সুখ ও দুঃখ বাস্তব নয়। যে পুরুষ শুদ্ধজীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ করে ব্রহ্মভূত হয়েছেন, প্রসন্নচিত্ত হয়েছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে পরা মদ্ভক্তি লাভ করে থাকেন।'

'কিন্তু রামানন্দ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি তার অঙ্গমাত্র। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাহায্যে ব্রহ্মলাভ হতে পারে, এমনকী মোক্ষলাভও। কিন্তু প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান করতে পারে না। এরপর কী আছে, তুমি বলো।'

'প্রভু, প্রেমভক্তি।'

'হ্যাঁ, প্রেমভক্তি সাধ্যের সার, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি যে প্রেমের কথা বলছ, সেটা মমত্ববর্জিত শান্তপ্রেম। এর থেকেও শ্রেষ্ঠ কোনও প্রেম থাকলে তুমি বলো।'

'দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম। যদি তাও না হয়, তাহলে প্রভু, কান্তাপ্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট। শান্তের গুণ দাস্যে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে, শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে, শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ কান্তাপ্রেমেই দেখা যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ কান্তাপ্রেমের কাছেই বশ্যতা স্বীকার করেছেন। ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমই তাই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'এরপরও যদি কিছু থাকে, তাহলে বলো।'

'এরপরও প্রশ্ন করতে পারেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছে কি না, আমি জানতাম না। তবুও আপনি যখন জানতে চাইছেন, তখন বলি, ব্রজদেবীগণের মধ্যে রাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি।'

গোরা বলল, 'তোমার কথা শুনে মন মধুররসে ভরে উঠল। এই আলোচনা শোনার জন্যই আমি এতদূর ছুটে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব নিয়ে তোমার সঙ্গে আরও কথা বলতে চাই। তোমার এখানে দিন দশেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

রামানন্দ বললেন, 'প্রভু, আমি তো কিছুই জানি না। আপনি যা বলাচ্ছেন, তাই বলে

যাচ্ছি। ভালো কী মন্দ, তা জানি না। রাধার প্রেম নিয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাবে, এখন থাক। এখন চলুন, আমার গৃহে পায়ের ধুলো দেবেন। একবার আপনার দর্শন পেয়েছি, আপনাকে আমি আর ছাড়ছি না।'

গোরা বলল, 'চলো তাহলে। আমারও মনে হচ্ছে, তোমাকে ছাড়া আমারও চলবে না।'

বলেই গোরা আসর ছেড়ে উঠে পড়ল। আস্তে আস্তে সবাই উঠে দাঁড়াল। পনেরো-কুড়ি জনের একটা দল। গোদাবরী নদীর পার দিয়ে দলটা হেঁটে যাচ্ছে রাজপথের দিকে। সন্ধে হয়ে এসেছে। নদীর পারে বিশাল বিশাল গাছ। গাছের বাসায় ফিরে আসছে পাখিরা। পাখিদের কিচির মিচির শুনতে শুনতে গোরার হঠাৎ নবদ্বীপের কথা মনে পড়ল। গঙ্গার ঘাটেও এইরকম পাখির কলতান ও শুনতে পেত। গঙ্গার ঘাটে ছোটোবেলায় তো ও কম দুষ্টুমি করেনি। অনেক স্মৃতি ওর জড়িয়ে ওই ঘাটগুলির সঙ্গে। বাবা একবার টোল ছাড়িয়ে দিয়ে ওকে বলেছিলেন, তোর লেখাপড়া করার কোনও দরকার নেই। গোরা তা মানতে চায়নি। বাবাকে ও জব্দ করেছিল, অভিনব এক উপায়ে। কে একজন বলেছিল, মৃত প্রাণীর অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিলে তার সদগতি করা হয়। সঙ্গীসাথিদের নিয়ে গোরা রোজ মৃত প্রাণীর অস্থি খুঁজে বের করত। তারপর সেগুলি নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলত। জল অপবিত্র হচ্ছে বলে, প্রতিবেশীরা একদিন অভিযোগ করলেন ওর বাবার কাছে। সেই সুযোগে গোরা সবার সামনে বলেছিল, ওকে যদি পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে আর কোনওদিন এ কাজ করবে না।

...পাখির ডাক অনেকক্ষণ ধরে কানে এসে বাজছে। চোখ খুলতেই গোরা বুঝতে পারল, ডোর বেলের আওয়াজ। কেউ বোধহয় ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ঘড়িতে এখন ন'টা বাজে। অন্য দিনে নিচের পার্টি অফিস থেকেই ও উঠে আসে দশটার সময়। এমন কিছু রাত হয়নি। বিছানা থেকে নেমে, কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে ও দেখল, টুবাই। ভাঙা গলায় ও বলল, 'আয়।'

'শরীর খারাপ না কি? কতক্ষণ ধরে বেল টিপছি, তোর সাড়াই নেই। ঘুমিয়ে পড়েছিলি?'

কোনও উত্তর না দিয়ে গোরা ফের বিছানায় এসে বসল। গলা যে ভেঙে গিয়েছে, সেটা ও এইমাত্র আবিষ্কার করল। গলার আর দোষ কী। কীর্তনের অনুষ্ঠানে যা জোরে ও চিৎকার করছিল। কথাটা মনে পড়ায় গোরা বাস্তবে ফিরে এল।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে টুবাই বলল, 'আঃ, বেলফুল আর চন্দনের কী সুন্দর গন্ধ তোর ঘরে। এল কোত্থেকে রে? কোনও অনুষ্ঠানে গিয়েছিলি না কি?' বলেই ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল টুবাই। তারপর বলল, 'না, কোথাও তো বেলফুলের চিহ্ন নেই!'

টুবাই জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর ছোটোবেলাকার বন্ধু। বিশ্বাস করে সবকিছু ওকে বলা যায়। বিছানায় বসে গোরা মনস্থির করে নিল, ঘরের ভেতর সুন্দর গন্ধটা কেন, তা ও বলবে টুবাইকে।

তার আগে ও বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দে। তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

বিকেলবেলা থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে, ধীরে ধীরে গোরা সব খুলে বলল টুবাইকে। এর আগে একদিন কথায় কথায় টুবাইকে ও বলেছিল, মাঝে মাঝে চোখের সামনে ও অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পায়। এমন সব ঘটনা দেখে, যা মেলাতে পারে না। খড়কুটোর মতো ও আঁকড়ে ধরল টুবাইকে। প্রথম দিন সেই নৌকোয় পুঁথি নিয়ে আলোচনা থেকে শুরু করে...একটু আগে রায় রামানন্দের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা। সব বলে গোরা হালকা হল, 'কেন এসব হচ্ছে বল তো?'

টুবাই বলল, 'তুই বুঝতে পারছিস না? বুঝবিই বা কী করে? শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিস্ট....কেউই প্রথম জীবনে বুঝতে পারেননি। কিন্তু আমি তোকে বুঝতে পারছি। কেওনঝড়ের সেই সন্ন্যাসী আমাকে তাহলে ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু তোর জীবনে যে এতকিছু ঘটছে, আগে বলিসনি কেন গোরা?'

'আমি নিজেই এত কনফিউজড...'

'দ্যাখ গোরা, তোর সঙ্গে আমি একজনের খুব মিল খুঁজে পাচ্ছি। পাঁচশো বছর আগে তাঁর জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তোর জীবনেও সেই সব ঘটনা ঘটছে। তবে এখনকার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। প্রথম ঘটনাটার কথা বলি। তুই বললি, নবদ্বীপের গঙ্গায় নৌকা করে যাওয়ার সময় তোরই মতো দেখতে একজনকে তুই প্রথম দেখতে পাস। নৌকোয় রঘুনাথ বলে আরও একজন ছিল। সে তোর মতো দেখতে ছেলেটাকে বলেছিল, তার মতো একই বিষয় নিয়ে সেও একটা পুঁথি লিখেছে। তার পুঁথি যদি ছাত্রদের হাতে যায়, তাহলে ওর পুঁথি কেউ আর পড়বে না। রঘুনাথের সেই অনুরোধ শুনে, তোর মতো দেখতে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে তার পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিল। তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'এই ঘটনাটা তুই কখন দেখেছিলি, মনে করে দ্যাখ। ইউনিভার্সিটিতে যখন বিপ্লব তোকে ডিবেট থেকে নাম তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে, তাই না? শুনে তুই আর ডিবেটে পার্টিসিপেটই করিসনি।'

গোরা অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি, এই দুটো ঘটনা তো কখনও মিলিয়ে দেখিনি?'

'মিলিয়ে দ্যাখ। অতীতের ঘটনাগুলো তুই যা দেখেছিস, তার সঙ্গে এখনকার ঘটনার মিল আছে। অর্থাৎ ঘটনাগুলো তোর আগের জীবনেও ঘটেছিল। দ্যাখ ভাই, যাঁর সঙ্গে তোর খুব মিল খুঁজে পাচ্ছি, তাঁকে নিয়ে লেখা প্রচুর বই আমি পড়েছি। তাঁর জীবনের ঘটনাবলি আমার মুখস্থই বলতে পারিস। এই আজকের ঘটনাটার কথাই ধর। রায় রামানন্দের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা....এটাও কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আমার মনে হচ্ছে না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তিনি একটা দোলাচলে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি কোনপথে এগোবেন? ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় রামানন্দই তাঁকে উপায়টা বাতলে দেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল রাধাভাব। একমাত্র রাধার কাছেই শ্রীকৃষ্ণ

বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি এরপরেই নিজেকে রাধা বলে ভাবতে শুরু করেন। পুরীতে ফিরে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে দেন। তোর জীবনেও শিগগির এমন কোনও ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে রে গোরা। এমন একজন কেউ তোর জীবনে আসবেন, যিনি তোকে ঠিক রাস্তায় ঠেলে দেবেন।'

'তুই কার জীবনের সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাচ্ছিস, বল তো টুবাই?'

'কে আবার? শ্রীচৈতন্যদেব। আমি সিওর, তোর মধ্যে তিনিই ফিরে এসেছেন পাঁচশো বছর পর।'

একষট্টি

বিষ্ণু মন্দিরের ঠিক এক-দেড়শো মিটার আগে অটো রিকশার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রবার্ট ওরফে আত্মানন্দ। তারপর ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে, অটো টানতে টানতে নিয়ে এল মন্দিরের কাছে। চারদিক শুনশান। আশপাশের দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। পুরন্দর বুঝতে পারল, কেন রবার্ট নিঃশব্দে অটোটা মন্দিরের কাছে নিয়ে এল। দোকানের ভেতর কেউ শুয়ে থাকতেও পারে। ইঞ্জিনের শব্দে ডালা খুলে কেউ উঁকি দিলেও দিতে পারে। তাই কোনও ঝুঁকি নিল না রবার্ট। মনে মনে ওর প্রশংসা করল পুরন্দর। বিদেশি এই এজেন্টদের কাছ থেকে কত কী শেখার আছে।

অটো থেকে নেমেই ও বলল, 'তুমি এখানে ওয়েট করো রবার্ট। আমি জয়দেববাবুকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি। দেখো, কোনও ঝামেলায় জড়িয়ো না।'

রবার্ট বলল, 'গো ম্যান। ডোন্ট ওয়ারি। আই ক্যান প্রোটেক্ট মাইসেলফ। অটোটা আমি ওই ঝোপের আড়ালে রাখছি। ব্রিং দ্যাট লেডি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল।'

'আমার পিছন পিছন আসুন জয়দেববাবু।' বলে কোমর থেকে একটা পিস্তল এগিয়ে দিয়ে পুরন্দর বলল, 'ভয় পাবেন না। এটা সঙ্গে রাখুন। খুব বিপদে না পড়লে, এটা ব্যবহার করবেন না।'

বলেই লাফ দিয়ে পুরন্দর বিষ্ণু মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে পড়ল। ঘন অন্ধকার, ভেতরটা কিছু দেখাই যাচ্ছে না। কিন্তু পুরন্দরের অভ্যাস আছে। মন্দিরের প্রতিটা কোণ ওর চেনা। প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির। অনেক জায়গার খিলান ভেঙে পড়েছে। নিচে ইট-কাঠের স্তূপ। খাঁজে খাঁজে সাপ-খোপের আস্তানা। ছোটোবেলায় খপ করে, লেজ ধরে সাপকে আছড়ে মারার খেলা খেলত পুরন্দররা। সাপকে ও ভয় পায় না। কিন্তু জয়দেববাবু শহরের লোক। অজান্তে কোথায় পা দিয়ে ফেলবেন। বিপত্তি ডেকে আনবেন। সেই আশঙ্কা থেকেই জয়দেবের হাতটা ধরল পুরন্দর। তারপর বলল, 'সাবধানে আসুন।'

মন্দিরের বারান্দা দিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। নাট মন্দির পেরিয়ে ওদের জগমোহনের দিকে বাঁক নিতে হবে। ওখানে একটা গোপন দরজা আছে। আগে যখন দেবদাসী প্রথা

চালু ছিল, তখন ওই দরজা দিয়েই মাহেরিরা উঠে আসত, নিচের অন্দরমহল থেকে। আগে দরজাটা ছিল কাঠের। এখন কলাপসিবল গেট লাগানো আছে। তা আবার লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। ওখান দিয়ে নিচে নামা যাবে না। পুরন্দর পাতালে যাতায়াত করে অন্য রাস্তা দিয়ে। মন্দিরের বর্জ্য পদার্থ যে জায়গায় ফেলা হয়, তার পাশ দিয়ে। জায়গাটা পূতিগন্ধময়। অন্য কেউ গেলে তার বমি উঠে আসবে। সেটা মনে পড়ায় পুরন্দর ফিসফিস করে বলল, 'সঙ্গে কি রুমাল আছে জয়দেববাবু? নাকে চাপা দিয়ে নিন।'

খানিক পরে সিঁড়ি দিয়ে ওরা পাতালে নেমে এল। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুরন্দর ভাবার সময় নিল, উপাসনাকে কোথায় রাখতে পারে বিম্বিসার? পূজ্যপাদ পদ্মনাভ মেয়েটাকে বেলি নানীর ঘর পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। আশা করা যায়, তাকে এখন ওখানেই পাওয়া যাবে। যদি না ইতিমধ্যে বিম্বিসাররা মত বদলে ফেলে। পূজ্যপাদ পদ্মনাভ সাধারণত বিষ্ণু মন্দিরে আসেন রাত বারোটা-সাড়ে বারোটার পর। হাতে এখনও ঘণ্টাখানেকের মতো সময় আছে। এর মধ্যে যা করার করে ফেলতে হবে। মনস্থির করে পুরন্দর বেলি নানীর ঘরের দিকে এগোল। সাত-আটটা থাম পেরিয়ে যেতে হবে দক্ষিণদিকে। থামের খিলানে বড়ো বড়ো তেলের প্রদীপ বসানো। হলদে মৃদু আলো স্থির হয়ে জ্বলছে। প্রতিটা থামের উলটোদিকে মাহেরিদের ঘর। সেখানে এখন স্ফূর্তির ফোয়ারা চলছে। জয়দেবকে খুব সাবধানে পা ফেলতে বলল পুরন্দর। দরজা খুলে ফট করে কেউ বেরিয়ে এলেই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

বেলি নানীর ঘরের সামনে গিয়ে পুরন্দর ইঙ্গিত করল, এই সেই ঘর। তারপর দরজায় খানিকক্ষণ কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল, ভেতরে কেউ আছে কি না। নাহ, ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। উপাসনা কি তাহলে ভেতরে নেই? পুরন্দর আশা করেছিল, কান্নার আওয়াজ পাওয়া যবে। কিডন্যাপিংয়ের কেস-এ সাধারণত যা হয়। হাত দিয়ে দরজায় ও সামান্য ধাক্কা দিল। দেখল, অল্প ফাঁক হয়ে গেল। তার মানে, ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করা নেই। খুব আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলে, ভেতরে মুখ বাড়িয়ে পুরন্দর দেখল, একটা মেয়ে শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে ও বলল, 'দেখুন তো, উনি কী না?'

জয়দেব ভেতরে চোখ দিয়ে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

পুরন্দর বলল, 'যান, আপনি আগে যান। আমি আগে গেলে ম্যাডাম চিৎকার করে উঠতে পারেন। আমাকে উনি বোধহয় চিনতে পারবেন না। আপনি গিয়ে কথা বলুন। দেখুন, উনি উঠে আসতে পারবেন কি না। যান জয়দেববাবু, কুইক। কেউ এসে পড়ার আগে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।'

জয়দেব যখন ঘরে ঢুকতে যাবে, তখনই উপর থেকে লোহার শেকল খোলার আওয়াজ পেল পুরন্দর। এ ব্যাপারে ও খুব সজাগ। তার মানে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ও জয়দেবের হাত ধরে টানল। কেউ যদি বেলি নানীর ঘরে চলে আসে, তাহলে জয়দেব বিপদে পড়ে যাবে। এক লাফে ওরা দুজন থামের আড়ালে

গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। বিম্বিসার না কি? পুরন্দরের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। ছেলেটাকে ও আজ চরম শিক্ষা দেবে। সেই সঙ্গে পদ্মনাভর উদ্দেশে একটা বার্তাও। পুরন্দর আর আপনার কেনা গেলাম নয়। ছায়ামূর্তিটা কাছাকাছি আসতেই ওর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। বিম্বিসার নয়, এক মহিলা। হাতে করে কিছু নিয়ে আসছে। মহিলা কাছে এসে, বেলি নানীর ঘরের সামনে দাঁড়াতেই পুরন্দর তাকে চিনতে পারল। এই মহিলা কাঁকুড়গাছির সেই অম্বালিকা বলে মেয়েটার মা না? হ্যাঁ, বেলি নানী একদিন বলেছিল বটে, মহিলা ঘরসংসার ফেলে এসে, এখন পদ্মনাভর আশ্রয়ে রয়েছে।

মহিলা ঘরের ভেতর ঢুকতেই নিঃশব্দে পুরন্দরও পিছু নিল। দরজায় পিঠ লাগিয়ে ও দেখল, মহিলা বলছে, 'মেয়ে, ও মেয়ে... উঠে বোস। তোর জন্য শাড়ি-গয়না এনেছি।'

উপাসনা ম্যাডাম বিছানায় উঠে বসার সময়ই পিছন থেকে কুংফু স্টাইলে মহিলার ঘাড়ে আঘাত করল পুরন্দর। মট করে শুধু একটা শব্দ হল। মহিলার দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। জীবনে কখনো কোনও মহিলাকে এভাবে আঘাত করেনি পুরন্দর। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর কোনও উপায়ও ছিল না। উপাসনা ম্যাডাম বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ মুখ ফোলা ফোলা। বোধহয় কান্নাকাটি করেছেন। পাছে উনি চিৎকার করে ওঠেন, সেই আশঙ্কায় পুরন্দর দ্রুত বলল, 'জয়দেববাবু আমার সঙ্গেই এসেছেন। আপনি ভয় পাবেন না। আমি পুরন্দর। ভুবনেশ্বরে আপনি আমায় দেখেছেন। চট করে নেমে আসুন। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।'

কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দর শুনতে পেল, পিছন থেকে কে যেন বলছে, 'ওহ, তোমার নামই পুরন্দর? ভালোই হল, এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পুরন্দর দেখল, জয়দেববাবুকে ঢাল করে বিম্বিসার ঘরের ভিতর ঢুকে এসেছে। ওর ডান হাতে পিস্তল। জয়দেববাবুর কপালে সেটা ঠেকিয়ে রেখেছে। এক ধাক্কায় জয়দেববাবুকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে পিস্তল বাগিয়ে বিম্বিসার বলল, 'তোমার কথা পূজ্যপাদ আগেই আমাকে বলে রেখেছিলেন। কিন্তু তোমার এমন দুঃসাহস হবে, আমি কল্পনাও করিনি।'

উপাসনা ম্যাডাম আতঙ্কে বিছানা থেকে নেমে এসে, জয়দেববাবুর পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছেন। এই সময়ে নার্ভ হারালে মুশকিল। বিম্বিসারকে পাত্তা না-দেওয়ার ভঙ্গিতে পুরন্দর বলল, 'জেনে খুশি হলাম, পদ্মনাভ তোকে আমার সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়েছে। কী বলেছে, বল ভাইনা, আগে সে সব শুনি। তারপর আমার দুঃসাহস তোকে দেখাব।' বলতে বলতে পুরন্দর দু'পা এগোল। লাথির রেঞ্জে বিম্বিসারকে নিয়ে আসা দরকার।

'খবর্দার। কাছে আসবি না কিন্তু।' বিম্বিসার পিছু হঠছে। তখনই ওর চোখে পড়ল মেঝেতে পড়ে থাকা অম্বালিকার মায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, 'মেরে ফেলেছ না কি? জানো, তুমি কার গায়ে হাত দিয়েছ?'

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করছে বিম্বিসার। বোধহয় হেড কোয়ার্টার্সে কথা বলতে চায়। পুরন্দর লক্ষ করল, বিম্বিসারের বাঁহাতটা কাঁপছে। কীসব লোককেই না পদ্মনাভরা এখন দলে নিচ্ছে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে যাদের হাত কাঁপে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, 'জানি, কার গায়ে হাত দিয়েছি। পদ্মনাভর উপপত্নীকে। পদ্মনাভকেও আমি মারব। তবে এখন না। আমার কিছু হিসেব চোকানো বাকি আছে ওর সঙ্গে।'

'আর এক পা কাছে এলেই আমি কিন্তু গুলি করে দেব।'

'কর, গুলি কর। তার আগে পদ্মনাভকে জানিয়ে দে, আমি এখানে আছি। তোকে আমি সময় দিচ্ছি। হেড কোয়ার্টার্সকে তুই অ্যালার্ট করে দে।'

ঘরের ভিতর প্রদীপের আলোতেও, পিস্তল ধরে রাখা বিম্বিসারের ডান হাতটাকে পুরন্দর এবার কাঁপতে দেখল। দেখে মনে মনে ও হাসল। বিম্বিসার মোবাইল ফোনে লাইন লাগানোর চেষ্টা করছে। ওর চোখ এখন মোবাইল সেটের পর্দার দিকে। ওকে আর সময় দেওয়া যাবে না। মুহূর্তে মনস্থির করে নিল পুরন্দর। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে, পুরো শরীরটাকে ঘুরিয়ে, ডান পায়ে সজোরে বিম্বিসারের তলপেট লক্ষ করে লাথি চালাল ও। বিম্বিসার ছিটকে পড়ল দরজার গায়ে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। হাত থেকে পিস্তল ছিটকে গিয়েছে, মেঝেতে আধশোয়া হয়ে বড়ো বড়ো শ্বাস নিচ্ছে বিম্বিসার। পালটা আঘাত করার সুযোগ কাউকে দেয় না পুরন্দর। তাই কোমর থেকে নিজের পিস্তলটা বের করে ও বলল, 'উঠে দাঁড়া। মেঝেতে পড়ে থাকা কুত্তাদের আমি আঘাত করি না।'

দরজা ধরে বিম্বিসার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বারদুয়েক চেষ্টা করেও ও পারল না। পুরন্দর জানে, চোটটা ওর কোথায় লেগেছে। সরাসরি অণ্ডকোষে। চুলের মুঠি ধরে বিম্বিসারকে ও তুলে বলল, 'পদ্মনাভ তোকে বলেনি, আমাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে? তাহলে কেন পিস্তল দেখালি ভাই। শোন তোদের কথা আমি আজ ভোরে আড়াল থেকে সব শুনে ফেলেছি। সুশোভনকে কেন মেরে ফেললি বিম্বিসার? একটা বয়স্ক লোক, তোদের কী ক্ষতি করেছিল?' কথাগুলো বলতে বলতেই ওর মুখ লক্ষ করে ঘুসি মারল পুরন্দর।

বিম্বিসারের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। তা দেখে 'মা গো' বলে চিৎকার করে উঠলেন উপাসনা ম্যাডাম। পাশ ফিরে পুরন্দর দেখল, ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ম্যাডামের। এমন নৃশংস মার বোধহয় কাউকে কখনও খেতে দেখেননি। অজ্ঞান হয়ে গেলে মুশকিল। তাই ও জয়দেবকে বলল, 'আপনি ম্যাডামকে নিয়ে বাইরে যান। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকুন। এই শুয়োরের বাচ্চার একটা ব্যবস্থা করে আমি আসছি।'

দরজার কাছ থেকে বিম্বিসারকে হিড়হিড় করে টেনে, ঘরের মাঝে আনল পুরন্দর। ওর পেট থেকে কথা বের করতে হবে। আরও... আরও ভয় না দেখালে ও কথা বলবে না। দরজা খুলে জয়দেববাবু আর উপাসনা ম্যাডাম বাইরে চলে যেতেই নিশ্চিন্ত হয়ে

বিম্বিসারের পেটের উপর বসল পুরন্দর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার বল তো ভাইনা, সুশোভনবাবুকে খুন করলি কেন? না বললে এখুনি তো মুখে সব গুলি উগড়ে দেব।'

'তুমি বেইমান, তোমাকে কোনও কথা বলব না।'

মুখটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। বিম্বিসার চোখ খুলতে পারছে না। ওর গলা থেকে উত্তরীয়টা খুলে মুখের রক্ত মুছে দিল পুরন্দর। ফের বলল, পদ্মনাভর কুনজর সুশোভনবাবুর উপর পড়ল কেন রে?' কথাগুলো বলতে বলতে পাঁজরের বিশেষ একটা অংশে চাপ দিল পুরন্দর। ও জানে, যন্ত্রণায় এবার বিম্বিসার চিৎকার করে উঠবে। ঠিক হলও তাই। তবুও মুখটা এ পাশ ও পাশ নাড়াল বিম্বিসার। অর্থাৎ বলবে না। দেখে গলা টিপে ধরল পুরন্দর, 'বল, না হলে তোর লাশ পাতাল ঘরে নিয়ে যাব। তারপর ইঁদুরদের খাওয়াব। মরার আগে জেনে রাখ, পদ্মনাভর মেয়ে মন্দাকিনীর লাশ আমি কিন্তু ইঁদুরদের খাইয়েছি।'

শুনে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল বিম্বিসারের। পুরন্দর গলায় চাপ কমিয়ে দিতেই খকখক করে কাশতে লাগল ও। ঠিক ওই সময়েই ঘরের কোথাও মোবাইল ফোন বেজে উঠল। বিম্বিসারের মোবাইল ফোন। ওর হাতে থেকে ছিটকে পড়েছিল। চোখ বুলিয়ে পুরন্দর দেখতে পেল, হাতের নাগালেই সেটটা পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে সেটটা তুলে নিয়ে পর্দায় চোখ রাখতেই পুরন্দর দেখল, এইচ কিউ লেখা রয়েছে। তার মানে হেড কোয়ার্টার্সের ফোন। সুইচ অন করার আগে বিম্বিসারকে ও বলল, 'এই নে। পদ্মনাভ বোধহয় তোকে ফোন করেছে। ওকে কী বলবি ভালো করে শোন। বলবি, মেয়েটা রাজি হয়ে গেছে। সাজগোজ করছে। পদ্মনাভ যেন ঘণ্টাখানেক পরে আসে। অন্য কোনও কথা যদি বলিস, তাহলে...।'

বিম্বিসার কিন্তু বেগড়বাই করল না। শেখানো কথাগুলো তোতা পাখির মতো আউড়ে গেল। দু'প্রান্তের কথাই পুরন্দর শুনতে পাচ্ছে। পদ্মনাভর ভরাট গলাটা ও অনেক দিন পর শুনল। শুনতে শুনতে ওর মারাত্মক রাগ হল। বিম্বিসার লাইনটা কেটে দেওয়ার পর ও বলল, 'শোন ভাইনা, পদ্মনাভকে তুই কতটা চিনিস, আমি জানি না। তোকে বলছি, ওদের হয়ে আর কোনও কাজ করিস না। আমি ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই দল থেকে সরে এসেছি। নরকে যদি যেতে না চাস, তাহলে আমি যা জানতে চাইছি, খুলে সব বল। বুড়ো মানুষটাকে তুই খুন করলি কেন?'

বিড়বিড় করে বিম্বিসার বলল, 'ছবিটার জন্য।'

মুহূর্তে ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল পুরন্দরের। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তিম দশা নিয়ে আঁকা ওই ছবিটা উদ্ধার করতেই একদিন ও উলটোডাঙার প্রেসে গিয়েছিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'ছবিটা পেয়েছিস?'

'না। লোকটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। অনেক মারধর করা সত্ত্বেও আমাকে বলেনি।'

'আমাদের হেড কোয়ার্টার্স কোথায়, তুই জানিস?'

শুনে বিম্বিসার অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বলল, 'তুমি জানো না?'

'আজ ভোরে তুই আর পদ্মনাভ যেখানে কথা বলছিলি, সেটাই তো হেড কোয়ার্টার্স, তাই না?'

'জানোই তো, তাহলে আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কাচের বাক্সে ওখানে যে কঙ্কালটা শোয়ানো আছে, সেটা কার?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে।' বলেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল পুরন্দর। বিম্বিসারকে প্রশ্ন লাভ নেই। আর দেরি করা উচিত হবে না। বিষ্ণু মন্দির থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাইরে জয়দেববাবু আর ম্যাডাম ওর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। ওদের দুজনকে রবার্টের অটো রিকশায় তুলে দিয়ে আসতে হবে। বিছানায় পড়ে থাকা শাড়িটা দিয়ে ভালো করে বিম্বিসারের মুখ আর হাত-পা বেঁধে দিল পুরন্দর। তারপর ওর মোবাইলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে বলল, 'পদ্মনাভকে বলিস, ওর আয়ু আর বেশিদিন নেই।' কথাগুলো বলার পরই ওর নজর গেল অম্বালিকার মায়ের দিকে। মরে গেল নাকি? হাঁটু গেড়ে বসে নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে পুরন্দর বুঝল, বেঁচে নেই। পাপী মহিলাকে এখানে ফেলে রেখে কোনও লাভ নেই। চট করে বডিটাকে ও কাঁধে তুলে নিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে জয়দেববাবুকে বলল, 'চলুন, যে রাস্তা দিয়ে এসেছি, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের বাইরে বেরোতে হবে।'

মিনিট পাঁচেক পর মন্দিরের বাইরে ওরা বেরিয়ে এল। ওদের দেখে রবার্ট অটো থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'এই দুজনকে নিয়ে আমি আশ্রমে চলে যাচ্ছি। তারপর কী করব, বলো।'

পুরন্দর ফিসফিস করে বলল, 'আজ রাতেই এঁদের নিয়ে তুমি ভুবনেশ্বরে চলে যাবে। ওখানে এঁদের বন্ধুরা থাকেন। ম্যাডামকে তুমি সেখানে পৌঁছে দেবে।'

'ও কে বস। ডেড বডিটার কী করবে?'

'ঝোপের মধ্যে ফেলে যাব।'

'অ্যাজ ইউ উইশ।' বলেই অটো টানতে টানতে রবার্ট খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। জয়দেববাবু আর ম্যাডাম অটোতে উঠে বসেছেন। সেদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পুরন্দর। এবার ওর আসল লড়াই শুরু হল। ডেড বডিটা নিয়ে ও ঝোপের দিকে এগোতেই, হঠাৎ ধারেকাছে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেল পুরন্দর। চোখ তুলে উপরে তাকাতেই আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ওর শরীর। মানুষের মতো দেখতে বিরাট একটা পাখি উড়ে এসে বসেছে মন্দিরের গেটে। দেখেই পুরন্দর বুঝতে পারল, প্রাণীটা কী হতে পারে। ক্যাতায়নী!! ক্যাতায়নী!!! মরা মানুষের গন্ধে উড়ে এসেছে। হাত দশেক উপরে প্রাণীটা বসে আছে। যে-কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ডেডবডি ফেলে দিয়ে পুরন্দর প্রাণপণ দৌড়ে ঢুকে গেল বিষ্ণু মন্দিরের ভেতরে।

বাষট্টি

বেলা ন'টায় মায়ের ফোনে ঘুম ভাঙল গোরার, হ্যাঁ রে, মুকুন্দ কি তোর কাছে পৌঁছেছে?' ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল গোরা। ঘরঘরে গলায় বলল, 'না মা।'

'এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিলি কেন রে। শরীর-টরীর খারাপ না কি?'

'তেমন কিছু না। আমি ঠিক আছি। তুমি কেমন আছো মা?'

'ভালো আর তুই থাকতে দিবি কই? আমায় বললি, পুরীতে দিন দুয়েকের জন্য থাকবি। দশ দিন হয়ে গেল, এখনও তুই ওখানে পড়ে আছিস।'

মা সেই একই কথা বলে যাবে। তা এড়ানোর জন্য গোরা বলল, 'ফোন করেছিলে কেন মা?'

মা বলল, 'কাল বাড়িতে গোকুল পিঠে হয়েছিল। তুই খেতে ভালোবাসিস। প্রিয়া তোর জন্য পাঠিয়ে দিতে বলল। তাই তোর জন্য পাঠিয়ে দিলাম।'

কী বললে মা খুশি হবে গোরা জানে। তাই বলল, 'ভালো করেছ মা। তোমার মতো পিঠে কেউ করতে পারবে না।'

'আরে, আমি করেছি কে বলল? পিঠে বানিয়েছে তো প্রিয়া। আমার থেকেও ভালো করে। খেয়ে দেখিস। মেয়েটার মধ্যে সব রকমের গুণ আছে রে। মনটাও এত ভালো...'

এই কথাটা মায়ের মুখ থেকে অন্তত হাজারবার শুনেছে গোরা। যখন ফোন করে, তখনই মা একবার-না-একবার প্রিয়ার কথা তুলবেই। আসলে প্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। মায়ের মনের কথা গোরা জানে। কিন্তু ও প্রিয়াকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কেন একটা মেয়ের জীবন শুধু শুধু নষ্ট করবে? মায়ের মুখে প্রিয়ার প্রশংসা শুনতে শুনতেই গোরা দরজা খুলে দিল। দেখল, টুবাই। ইশারায় ওকে বসতে বলে, গোরা মাকে বলল 'প্রিয়া ভালো আছে মা?'

'ওই একরকম। কলেজে ছুটি, তাই সারাদিন এ বাড়িতেই আমার পিছন ঘুরঘুর করছে। কবে যে পাকাপাকি ওকে এ বাড়িতে আনতে পারব, কে জানে?'

আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না গোরার। বলল, 'ঠিক আছে মা, মুকুন্দ এলে তোমায় ফোন করব।'

'এই শোন, ফোন ছাড়িস না।' মা বলল, 'তোদের রেড্ডিকাকা কাল এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। অনেকক্ষণ গল্প করে গেলেন।'

কাল বিকেল থেকেই রেড্ডিকাকাকে চোখে পড়েনি গোরার। তাহলে ভুবনেশ্বরে ফিরে গেছেন। মাকে কী বলেছেন, জানার জন্য গোরা বলল, 'কী গল্প করলেন, মা?'

'সে অনেক কথা। তোর খুব প্রশংসা করলেন। হ্যাঁ রে, তুই না কি আজকাল সকাল বিকেল দু'বেলা জগন্নাথ মন্দিরে যাচ্ছিস? শুনে আমার এত ভালো লাগল, যে কী বলব। তোর রেড্ডিকাকা তো বলল, তুই না কি কোথায় কীর্তনের সঙ্গে নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে গেছিলি? তোর বাবারও একবার এরকম হয়েছিল। ভক্তিভাব না থাকলে এ হয়

না। তোকে একটা কথা বলে রাখি বাবা। মন্দিরে কখনও তুই একা যাবি না। মনে থাকবে কথাটা?'

'থাকবে মা। টুবাই এখানে আছে। সব সময় আমার সঙ্গে থাকে। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'ব্যস ব্যস। আমি নিশ্চিন্দি। তোর পার্টির সমাবেশ কবে ঠিক হল রে?'

'আগামী রোববার মা। তবে পুলিশ এখনও পার্মিশন দেয়নি। ওরা চাইছে না, সমাবেশটা আমি পুরীতে করি।'

'এসব ঝামেলায় তুই যাচ্ছিস কেন গোরা? কী দরকার দলিতদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? শোন বাবা, রাজনীতি করার জন্য তুই জন্মাসনি। তুই আধ্যাত্মিক জগতের লোক। সেটা আর কয়েক মাস পরেই তুই টের পাবি। অ্যাদ্দিন তোকে কিছু বলিনি। কিন্তু তোর রেড্ডিকাকার মুখে যা শুনলাম, তাতে মনে হল, সময় এসে গেছে। রাধাগোবিন্দ এবার তোকে প্রবলভাবে টানবেন।'

মায়ের কথা শুনে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল গোরা। সুরটা কেমন যেন অন্যরকম। মা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করল না, কবে ফিরবি। বরং উৎসাহ দিল, রোজ জগন্নাথ মন্দিরে যেতে। আর দু'একটা কথা বলে গোরা ফোন ছেড়ে দিল। তারপর টুবাইকে বসতে বলে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। কাল অনেক রাত অবধি ও জেগে ছিল। পর পর কয়েকটা রাতে এমন হল। আলো নিভিয়ে দেওয়ার পরই ঘর বেলফুল আর চন্দনের সুগন্ধে ভরে যাচ্ছে। যেন কোনও দেবালয়ের গর্ভগৃহে ও শুয়ে আছে। ঘরের নীল আলোয় ও অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। একদিন দেখল, ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পুরো সমুদ্রটা নীল হয়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের গায়ের মতো নীল। সমুদ্রটা গর্জন করে ওকে ডাকছে। পাঁচতলা থেকে দৌড়ে নিচে গেল ও। তারপর হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। বিরাট বিরাট ঢেউ ওকে টেনে নিয়ে গেল অনেকটা দূর। জলের তলায় ও তলিয়ে গেল।

আরেক দিন দেখল, জলের নিচে ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। ওর নিস্পন্দ দেহটা কোনওকিছুর সঙ্গে আটকে রয়েছে। কেউ বোধহয় ও দেহটাকে টেনে তুলছে জল থেকে। খানিক পরেই গোরা দেখল, ওটা একটা নৌকো। জালের ভেতর মাছেদের সঙ্গে ওর দেহটাকে উঠতে দেখে জেলেরা হা-হুতাশ করছে। ধরাধরি করে ওরা দেহটাকে বালির উপর শুইয়ে দিল। ভোর হয়ে আসছে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ওর দেহটা দেখে গোরা আঁতকে উঠল। ওর হাত-পা এত অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে গেল কী করে? জলে ডুবে গেলে কি মানুষের এরকম শারীরিক বিকৃতি হয়? অনেকক্ষণ ধরে ও বালিয়াড়িতে পড়ে রইল। হঠাৎ দেখল, পারের দিক থেকে 'প্রভু প্রভু' বলে কয়েকজন দৌড়ে আসছে। নিথর দেহটাকে দেখে ওরা কান্নাকাটি শুরু করল। ওরাই ধরাধরি করে শরীরটা এক মঠে নিয়ে গেল। চোখমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে ওরা ধরেই নিল, প্রভুর তিরোধান হয়েছে। দল বেঁধে ওরা নামসংকীর্তন আরম্ভ করল। অবাক কাণ্ড, হরিনাম শোনা মাত্রই গোরা দেখল, ওর শরীরে চেতনা ফিরে আসছে।

ওয়াশরুমে চোখমুখে জলের ঝাপটা দিতেই ওই দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল ওর চোখের সামনে থেকে। বেরিয়ে এসে গোরা বলল, 'মনটা খুব চঞ্চল হয়ে গিয়েছে। চল, একবার মন্দিরে ঘুরে আসি।'

টুবাই বলল, 'এখনই যাবি? কাগজে পড়লাম, বেলা এগারোটার সময় চিফ মিনিস্টার প্রতাপ পট্টনায়ক নাকি মন্দিরে যাবেন। ওই সময় সিকিউরিটি খুব প্রবলেম করবে।'

গোরা বলল, 'চিফ মিনিস্টার কি ধার্মিক টাইপের? শুনেছি, উনি না কি লেফট মাইন্ডের?'

'ছাড় তো। ওড়িশায় পলিটিক্স করবেন, আর ধর্ম মানবেন না, তাই হয় নাকি? প্রতাপ পট্টনায়ককে আমি ভালো করে চিনি। রোজ অ্যাসেম্বলিতে দু'বেলা দেখছি। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে কী আর উনি এমনি এমনি আসছেন? কারণ আছে।'

'কী কারণ রে?'

'বছরখানেক আগে, মন্দির কমিটির একটা সেকশন দাবি তুলেছিল, দেবদাসী প্রথা ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতাপ পট্টনায়েক সেটা নস্যাৎ করে দেন। কয়েকটা কাগজে ওর বিরুদ্ধে তখন এডিটোরিয়াল বেরিয়েছিল। ধর্মীয় আচরণে বাধা দিচ্ছেন। বিদেশে পড়াশুনো করেছেন বলে ঠাকুরদেবতা কিছু মানেন না। মন্দিরের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেছিল। সেটা ফের মেরামত করতে চান চিফ মিনিস্টার। সেই কারণে মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন।'

'চল, বেলা এগারোটার আগেই আমরা মন্দিরে ঢুকে যাই।'

'যাবি, চল তাহলে। তোর যখন এত ইচ্ছে।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই টুবাইকে নিয়ে নিচে নেমে এল গোরা। হোটেল থেকে মন্দির বেশ খানিকটা দূরে। রোজ যাওয়ার সময় ওরা হোটেলের রিকশা করে যায়। ফেরার সময় হেঁটে ফেরে। আজ রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। আকাশ মেঘলা। ওরা দু'জন মন্দিরের দিকে হাঁটতে লাগল। অফ সিজন বলে রাস্তায় খুব লোকজন নেই। ভাঁটার সময়, সমুদ্রের জল অনেকটা সরে গিয়েছে। সী বিচে কিছু টুরিস্ট স্নান করছে। গোরার মনে পড়ল, পুরীতে এসে এবার একদিনও সমুদ্রে স্নান করেনি। আজ নামলে কেমন হয়? ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে যখন পুরীতে আসত, তখন অনেকক্ষণ ধরে স্নান করত সমুদ্রে নেমে। বাবা স্নান করার কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে গিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে হয়। তখন তো সাঁতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেত গোরা।

স্বর্গদ্বারের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ গোরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, শ্মশানের কাছে একজন ক্ষৌরকার বসে আছে। তখনই ওর চুল কাটার কথা মনে পড়ল। কেটে নেবে না কি? শেষবার কেটেছিল সেই কলকাতায়। চুল এখন একেবারে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। দু'তিন দিন আগে টুবাই একবার বলেছিল, চুলটা কেটে ফেলতে। কিন্তু এর মধ্যে গোরা সময় বের করে উঠতে পারেনি। স্বর্গদ্বারের কাছে দু'তিনজন ক্ষৌরকারকে, রোজই মন্দিরে যাতায়াতের পথে গোরা লক্ষ করে। কিন্তু কাউকে কোনওদিন ফাঁকা পায়নি।

শ্মশানযাত্রী, তীর্থযাত্রীদের ভিড় সবসময়। শ্মশান থেকে ফেরার সময় কেউ মাথা কামিয়ে নেয়। কেউ বা মন্দিরে যায় মাথা কামিয়ে। আজ একজনকে ফাঁকায় বসে থাকতে দেখে গোরা বলল, 'টুবাই দাঁড়া। চুলটা কেটে নেওয়া যাক। মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।'

টুবাই বলল, 'কেটে নে। দশটা তো মাত্তর বাজে। হাতে অনেক সময় আছে।'

আশ্চর্য, কাছে যেতেই ক্ষৌরকার উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আসুন প্রভু।'

প্রভু কথাটা খট করে গোরার কানে এসে বাজল। লোকটা ওকে প্রভু বলছে কেন? প্রশ্নটা করতে গিয়েও গোরা নিজেকে সামলে নিল। হয়তো ভুল শুনেছে। তাই পরনের পাঞ্জাবিটা খুলে, টুবাইয়ের হাতে দিয়ে, খালি গায়ে ও টুলের উপর বসে পড়ল। পাঞ্জাবিতে চুল লেগে থাকলে, পরে গা কুটকুট করতে পারে। মন্দিরে গিয়ে তখন ও অস্বস্তিতে পড়বে। ক্ষৌরকার জল দিয়ে ওর চুল ভিজিয়ে নিচ্ছে। সেই সময় গোরা স্পষ্ট শুনতে পেল, কে যেন বলল, 'আপনি যে আসবেন আমি জানতাম প্রভু।'

কথাটা কি ক্ষৌরকার বলল? ঘাড় ঘুরিয়ে গোরা ওর মুখের দিকে তাকাল। না, গম্ভীর মুখে ক্ষৌরকার চুল ভিজিয়ে নিচ্ছে। মনে হল না, কথাটা ও বলেছে। ঘাড় সিধে করে বসে, গোরা চোখ বন্ধ করল। আর তখনই শুনতে পেল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না প্রভু? আমি গণপতি। গম্ভীরায় প্রায়ই আমি আপনার ক্ষৌরকর্ম করতে যেতাম।'

গোরা মনে মনেই উত্তর দিল, 'কে গণপতি? তোমাকে তো মনে পড়ছে না?

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছি প্রভু। পাঁচশো বছর ধরে আপনার অপেক্ষাতেই আমি ছটফট করছি। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারছি না। আমাকে উদ্ধার করুন প্রভু।'

'উদ্ধার করার আমি কে?'

'ছলনা করবেন না প্রভু। আমি আপনার লীলা নিজের চোখে দেখেছি। দক্ষিণ দেশ থেকে আপনি যেদিন প্রথম শ্রীক্ষেত্রে পা দিলেন, সেদিন স্নান করতে নামার আগে আপনি আমার কাছে, ঠিক এই জায়গাতেই ক্ষৌরকর্ম করতে বসেছিলেন। ক্ষৌরকর্ম শেষ হওয়ার পর আপনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আপনার স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল।'

লোকটা অদৃশ্য থেকে ওর সঙ্গে কথা বলেই যেতে থাকল। গোরা বাস্তবে ফিরে এল, যখন শুনল টুবাই মারমুখী হয়ে বলছে, 'এ কী, এ তুমি কী করলে? তুমি এর মাথা কামিয়ে দিলে কেন? তোমাকে তো চুল কাটতে বলা হয়েছিল?'

ক্ষৌরকার বলল, 'আমার এখানে যে সবাই মুণ্ডন করতেই আসে বাবু।'

টুবাইকে থামিয়ে দিল গোরা। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আহ, কী আরাম লাগছে জানিস? মাথাটা যেন হালকা হয়ে গেল। আজ থেকে আমি ঘুমোতে পারব। কেমন লাগছে রে আমাকে দেখতে? বাবা মারা যাওয়ার পর যখন মাথা কামিয়ে ছিলাম, তখন সবাই আমাকে গৌরাঙ্গ বলে ডাকত।'

টুবাই হেসে বলল, 'এখনও তোকে মহাপ্রভু বলেই মনে হচ্ছে। স্বর্গদ্বারের মোড়ে

মহাপ্রভুর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। তোর সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল। কিন্তু আমি ভাবছি, তোর মায়ের কথা। মুণ্ডন করেছিস শুনলে মাসিমা কিন্তু কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন।'

পাঞ্জাবির পকেট থেকে টাকা বের করে ক্ষৌরকারকে দিতে গেল গোরা। কিন্তু সে কিছুতেই নেবে না। উলটে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল, 'আপনি মহাপুরুষ। আপনার কাছে পয়সা নিলে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। আমি জানি, আপনি হোটেল গম্ভীরাতে আছেন। অনুমতি করুন, রোজ আমি গম্ভীরাতে গিয়ে আপনার ক্ষৌরকর্ম করে দিয়ে আসব।'

শুনে হাসল গোরা। টুবাইকে বলল, 'প্রকৃত ভারতের চেহারাটা দেখেছিস টুবাই। ধর্মের নামে কত নিচের লেভেলেও কনসেশন পাওয়া যায়। কী আর করা যাবে, চল, সমুদ্রে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসি। তারপর মন্দিরে যাব।'

...স্নান করে সী বিচ থেকে গোরা যখন উঠে এল, তখন ওর পরনে মাত্র ধুতি। ও লক্ষ করল, লোকজন ফিরে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। কয়েকজন পিছন পিছন আসছে। অস্বস্তি কাটানোর জন্যই ওরা দু'জন রিকশায় চাপল। পুরীর অলিগলি দিয়ে ওরা যখন মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দেখল, রাস্তায় প্রচুর পুলিশ। তার মানে চিফ মিনিস্টারের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। সিংহদ্বারের কাছে বিরাট লাইন। তা দেখে গোরা বলল, 'লাইনে দাঁড়ালে অনেক সময় লেগে যাবে। চল টুবাই, তার চেয়ে পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকি। ওদিকটায় ভিড় নেই।'

টুবাই হেসে বলল, 'তোর তো ব্যাঘ্রদ্বার দিয়েই ঢোকার কথা। সিংহদ্বার দিয়ে নয়। সিদ্ধপুরুষরা ওই পশ্চিমদিগের দ্বার দিয়েই মন্দিরের ভেতর যান। আগের জন্মেও তুই যখন মন্দিরে আসতিস, তখন ব্যাঘ্রদ্বার দিয়ে ঢুকতিস।'

পুবদিকের সিংহদ্বার থেকে মন্দিরকে বেড় দিয়ে হেঁটে দুজনে ব্যাঘ্রদ্বারের কাছে এল। পরিষ্কার জলে পা ধুয়ে নিল গোরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওরা দুজন সরাসরি চলে এল নাটমন্দিরে। অন্যদিন এখান থেকে বহু ভক্ত জগন্নাথ দর্শন সারেন। আজ প্রায় ফাঁকা। মেঝেতে বসে শুধু দু'তিনজন গীতাপাঠ করছেন, বিষ্ণুনাম জপছেন। নাটমন্দিরের সবথেকে পবিত্র স্থান গরুড় স্তম্ভ। এখান থেকে খুব সুন্দর জগন্নাথ দর্শন করা যায়। কিন্তু গরুড় স্তম্ভের কাছে না দাঁড়িয়ে গোরা আরও বাঁদিকে সরে দাঁড়াল। ভোগমণ্ডপের দ্বারের পাশে, দেওয়ালে বাঁ হাতের ভর দিয়ে ও রত্নসিংহাসনের দিকে তাকাল। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ওর মনে একটা অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি হল। মনে হল, এর আগেও ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ও জগন্নাথ বন্দনা করেছে। মনে মনে আওড়িয়েছে,'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'

কথাগুলো ওর মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয় এল। 'হে প্রভু, তোমার বাঁশির সুর আনন্দে আমাকে ভাসিয়ে দেয়। সেই সুরে জগৎসংসারও মোহিত হয়ে পড়ে। তুমি দয়ার সিন্ধু, নিখিল জগতের বন্ধু, তোমার চরণ বন্দনা করেন লক্ষ্মী, গণেশ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, এমনকী স্বয়ং শিবও। দয়া করে তুমি একবার আমায় দেখা দাও।' বারবার মনের মধ্যে এই কথাগুলো আলোড়িত হতে থাকল গোরার। একটা সময় ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। শরীর

কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বেদিতে আসীন বিগ্রহগুলো সব ঝাপসা হয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হল, কে যেন ওকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। মহাশূন্য দিয়ে সোঁ সোঁ করে ভেসে যাচ্ছে। মাথা ঘুরে যাতে মেঝেতে পড়ে না যায়, সেই কারণে পাশেই দাঁড়ানো টুবাইয়ের কাঁধ ডান হাত দিয়ে খিমচে ধরল গোরা।

একটু পরে গোরা টের পেল, রত্নসিংহাসনের দিকে ও দৌড়ে যাচ্ছে। কালাঘাট দুয়ারের কাছে গিয়ে ব্যাঘ্র বিক্রমে মেঝেতে পা ঠুকছে। জগন্নাথ বিগ্রহের উদ্দেশে বলছে, 'আমাকে দেখা দাও। না হলে তোমাকে আমি অপবিত্র করে দেব।' পূজারিরা দৌড়ে এসেছেন। ওকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন নাটমন্দিরের দিকে। কূর্মপ্রাচীরের কাছে পৌঁছতেই টুবাই ওকে ধরে ফেলল। বলল, 'গোরা চল, ভিতরবেড়ায় থাকা আর নিরাপদ নয়। আমরা হোটেলেই ফিরে যাই।'

স্খলিত পায়ে গোরা নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে। আজ ওর মনে খুব আনন্দ হচ্ছে। কেন জানে না, ওর মনে হচ্ছে, এ জগতে সবই মায়া। সারসত্য হচ্ছে, ভগবানকে পাওয়া। জীবনের একটা লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছে গোরা। সকালে মা ঠিকই বলেছিল, দলিত পার্টি করে কোনও লাভ হবে না। ওদের সমস্যা আছে, থাকবে। মেটানোর দায়িত্ব যাঁর, তিনিই মেটাবেন। এক নিমেষে দায়িত্বটা শ্রীকৃষ্ণের পায়েই অর্পণ করল গোরা। কথাটা ভাবতেই মনটা হালকা হয়ে গেল ওর। শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিতে ও লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। আর তখনই দেখল, পুলিশ বেষ্টিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন চিফ মিনিস্টার প্রতাপ পট্টনায়ক। ওকে দেখে হঠাৎ চিফ মিনিস্টার দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

তেষট্টি

মাধবী মেয়েটাকে বেশ ভালো লেগে গেল জয়দেবের। বয়স উপাসনার মতোই। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। চোখমুখে প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ। কথাবার্তায় ও জানতে পারল, সিলেটের মেয়ে হলেও মাধবী কলকাতায় পড়াশুনো করেছে। সেখানেই আমেরিকান কনসুলেটে ওর সঙ্গে আত্মানন্দের আলাপ এবং প্রেম। ওরা দুজন পুরীতে এসেছে বছরখানেক আগে। আগ্রায় তাজমহল দেখে ফেরার পথে ওরা বৃন্দাবনে ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানেই দুজন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। সেখানেই কণ্ঠিবদল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ প্রচারের কাজে নেমে পড়েছে আত্মানন্দ। আর মাধবী ওর সাধনসঙ্গিনী হওয়া ছাড়াও, এই আখড়াটা সাজিয়েগুজিয়ে তুলেছে। একটা গেস্ট হাউস চালাচ্ছে, যেখানে আমেরিকান বৈষ্ণবরা এসে থাকতে পারেন। মায়াপুর থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা এখানে ওঠেন।

বিষ্ণু মন্দির থেকে ওরা যখন আত্মানন্দদের আখড়ায় আসে, তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে অনেকটা দূর, সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায় এই আখড়া।

চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অটো থেকে ওরা নামতেই মাধবী দরজা খুলে দিয়েছিল। আত্মানন্দকে প্রশ্ন করেছিল, 'কুনও এনকাউন্টার হয় নাই তো? তোমাগো এত দেরি দেইখ্যা, আমি তো ডরে মরি।'

ওদের সঙ্গে মাধবীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আত্মানন্দ বলেছিল, 'এনকাউন্টার হয়েছিল। তবে আমার সঙ্গে নয়। সে কথা পরে তোমায় বলব। আগে তুমি এক কাজ করো। উপাসনা ম্যাডামদের জন্য একটা গেস্ট রুম খুলে দাও। আর ওদের জন্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধ নিয়ে এসেছিল মাধবী। বলেছিল, 'আশ্রমে রাধাগোবিন্দের ভোগ আছে। এট্টু পরেই আইন্যা দিমু। আপনেরা হাত-মুখ ধুইয়্যা লন।'

গরম দুধটায় চুমুক দিয়ে উপাসনা খানিকটা সুস্থ হয়েছে। অটোতে আসার সময় পিছনের সিটে সারাক্ষণ ওকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল উপাসনা। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। তখন জয়দেব মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। সী বিচে যদি পুরন্দরের সঙ্গে ওর দেখা না হত, তাহলে কী হত, ভাবতেই জয়দেব শিউরে উঠছিল। এতক্ষণে নরপশুটা উপাসনাকে ছিঁড়ে খেত। ওর জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত। ওই অন্ধকারময় পাতাল ঘর থেকে জীবনে আর কোনওদিন উপাসনা বেরোতে পারত কি না সন্দেহ। পুরন্দর বলছিল, ওটা ব্রথেল। তার মানে যে মহিলাকে ওরা ঘরে ঢুকতে দেখেছিল, তারও পেশা বেশ্যাবৃত্তি! পুরন্দর কি তাকে মেরে ফেলেছে? অস্বাভাবিক শক্তি কিন্তু লোকটার। কাঁধে করে এমনভাবে মহিলাটিকে বাইরে নিয়ে এল, যেন একটা ছাগলছানাকে বইছে।

গেস্ট রুমের বিছানায় চোখ বুজে উপাসনা শুয়ে আছে। ওর কোলে মাথা দিয়ে। জয়দেব কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণ উপাসনাকে ও কোনও কথা জিজ্ঞেস করেনি। শক্ কাটিয়ে ওঠার সময় দিয়েছে। উপাসনাকে চোখ খুলতে দেখে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব নরম গলায় জয়দেব বলল, 'শরীরটা এখন ভালো লাগছে সোনা?'

উপাসনা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

'আমাকে না জানিয়ে হোটেল থেকে একা লোকটার সঙ্গে কেন বেরিয়ে গেলে তুমি?'

'ভুল করেছি। ভাবতেও পারিনি, লোকটা কিডন্যাপ করার জন্য এসেছে। হোটেলে বিন্তি তখন এমন ভাব দেখাল, যেন লোকটাকে ও চেনে। প্রায়ই যাতায়াত করে হোটেলে। যেন আমার জন্য প্রকাশই লোকটাকে রিসেপশনে বসিয়ে রেখেছে।'

'তার মানে, বিন্তিকে কাজে লাগিয়েছিল বিম্বিসার। ওর পিছনে যে একটা অর্গানাইজড গ্যাং রয়েছে, তা তো তুমি বুঝতেই পারলে। পুরন্দরের মুখে অনেক কথা শুনেছি। সব তোমায় এখন বলা যাবে না। কিন্তু ... আজ যা হল, তাতে তোমায় আর পুরীতে রাখা উচিত হবে না সোনা।'

'আমি এখন কী করব জয়?'

'আমার মনে হয়, পুরন্দর যা অ্যাডভাইস করল, সেটাই মেনে চলা উচিত। চলো, আজ রাতেই তোমাকে স্বাতীর কাছে রেখে আসি।'

'না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তুমিও স্বাতীর ওখানে ফিরে চলো।'

'কিন্তু আমি তো যেতে পারব না সোনা। সুশোভনবাবুর মৃত্যু নিয়ে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। পুলিশ আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, পুরীতে থাকতে। ওরা পার্মিশন না দিলে আমি কোথাও যেতে পারব না। লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো।'

'না জয়, তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। চুলোয় যাক আমার রিসার্চ। তোমাকে পেয়েছি, আমি আর কিছু চাই না। জানতাম, আমি জানতাম... এরকম কোনও দুর্ঘটনা আমার জীবনে ঘটবে। শ্রীবৎসের অভিশাপ... কখনও বিফলে যাবে না।'

কথাগুলো বলতে বলতে উপাসনা ওর হাতটা জড়িয়ে ধরেছে। ভালোবাসায় বুকটা ভরে গেল জয়দেবের। ও বলল, 'জানো, আজ দিদি ফোন করেছিল বেহালা থাকে। কী বলল, শুনবে?'

শুনে উঠে বসল উপাসনা। জিজ্ঞেস করল, 'কী বলল গো?'

'আমার বিয়ে ফাইনাল করে ফেলেছে।'

'এই কথাটা বলার জন্যই কি তুমি মিলনী রেস্তোরাঁয় আমায় যেতে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ। পাত্রী বেহালারই। অরিজিন্যালি তোমাদের নবদ্বীপের মেয়ে।'

'তাই না কি?' মুখ টিপে হাসল উপাসনা। 'আজ কাকিমাও আমায় ফোন করেছিল। আমার বিয়েও ফাইনাল করে ফেলেছে। পাত্র বেহালায় থাকে। আমি মত দেবো কি না বুঝতে পারছি না।'

কথাটা শুনে উপাসনার দিকে তাকাল জয়দেব। ওর মুখে দুষ্টুমির ছাপ। দু'হাতে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জয়দেব বলল, 'ওহ্, জানো তাহলে! মত না দিয়ে তুমি পারবে? এই যে একটু আগে বললে, তোমাকে পেয়েছি, আমি আর কিছু চাই না?'

উপাসনা ওর বুকে মাথা রেখে, দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। ওর মুখটা তুলে ধরে জয়দেব ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল,'আমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছ সোনা?'

উপাসনা বলল, 'এই... করছটা কী? মাধবী আশপাশে কোথাও আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর গলা, 'আশপাশ নয়, সামনেই আসে। সব দেইখ্যাও ফ্যালসে।' বলতে বলতেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল মাধবী। হাসিমুখে বলল, 'রাধে রাধে। চলেন জয়ভাই, একবার মন্দির ঘুইর‍্যা, তারপর প্রসাদ নিবেন।'

কথাগুলো শুনেই উপাসনা ছিটকে সরে গেল। আর ঠিক সেই সময় ঘরের আলোটা নিভে গেল। তার মানে লোডশেডিং। পুরীতে ঘন ঘন হয়। মাধবী কোত্থেকে টর্চ নিয়ে এল, কে জানে? ওরা দুজনে মাধবীর পিছু পিছু মন্দিরে গিয়ে দেখল, পুরোটাই মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। বেল ফুল দিয়ে সাজানো। ফুলের গন্ধে চারদিক ম ম করছে। মন্দিরের ভেতর প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় জয়দেব দেখল, বিগ্রহটা পাঁচ ফুটের কাছাকাছি। কালো কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি। বংশীবদন। আবছা আলোয় মনে হচ্ছে, সত্যি বোধহয় বেদিতে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রণাম সেরে ডাইনিং রুমে ঢুকে জয়দেব দেখল, চেয়ার টেবিলের কোনও ব্যবস্থা নেই।

মেঝেতে মাত্র দু'টো আসন পাতা আছে। সেটা দেখে জয়দেব বলল, 'আত্মানন্দ কই, তাকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না। কোথাও গেছে না কি?'

মাধবী বলল, 'একডা ফোন আইসিল। তাড়াহুড়ায় বাইর হইয়া গেল। আইয়া পড়ব। আপনেরা শুরু কইর‍্যা দেন। আমাগো আখড়ায় টেবিল চেয়ারের সিস্টেম নাই। খাইতে বইস্যা আপনেগো অসুবিধা হইব মনে হয়। ন্যান, শুরু করেন।'

প্রসাদ বলতে খিচুড়ি ভোগ, বেগুন আর কুমড়ো ভাজা, সামান্য ঘ্যাট ও পায়েস। সেটাই অমৃতের মতো মনে হল জয়দেবের। সেই দুপুরের পর আর কিছু ওর পেটে পড়েনি। ও চুপচাপ খেতে লাগল। পাশে বসে হাতপাখা নাড়ছে মাধবী। হঠাৎ বলল, 'জয়ভাই, কইলকাত্তায় থাকার সময় আপনের সাথে দেখা হইলে আমার উপকার হইত।'

'কেন বলো তো?'

'আমার সম্পর্কে তুমি জানলে কী করে?'

'ক্যান, আত্মানন্দের কাছে। আপনেরা যহন ম্যাডামরে উদ্ধার করতে মন্দিরে ঢোকেন, তহন অটোতে ওয়েট করার সময় ও আমারে ফোনে সব কইয়া দিসে।'

'তুমি কী নিয়ে রিসার্চ করছ মাধবী?'

'নিত্যানন্দ। মহাপ্রভু ক্যান তাঁরে পুরী থেইক্যা গৌড়ে পাঠাইয়া দিসিলেন? হেইডা আমার সাবজেক্ট। একজন আমেরিকান রিসার্চার এই নিয়া একটা বই লিখসে। তাতে কইসে, মহাপ্রভু নাহি নিত্যানন্দের পপুলারিটি দেইখ্যা খুব জেলাস হইয়া পড়সিলেন। তাই তারে গৌড়ে পাঠাইয়া দ্যান। আসলে তো তা না। হেইডাই আমি ক্লারিফাই করুম।'

খেতে খেতে জয়দেব বলল, 'যতসব বোগাস ব্যাপার। এই সব বই ছাপা হয় কেন?'

'আপনের কী মনে হয় জয় ভাই? মহাপ্রভু ক্যান নিত্যানন্দরে নিজের কাসে রাখেন নাই?'

'উনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিত্যানন্দর মতো উদার আর সর্বজাতিপ্রিয় ব্রাহ্মণ আর দ্বিতীয়টি নেই। নিত্যানন্দ জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। তাই উনি নিত্যানন্দের উপরই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বৈষ্ণব সমাজের দ্বার সবার জন্য খুলে দিতে। সেই সময়কার পরিস্থিতিটা চিন্তা করো মাধবী। একদিকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের জন্য চাপ। সমাজের নীচ জাতির মানুষ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের বৈষ্ণব সমাজে টেনে নেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল। মহাপ্রভু এই কারণেই নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমেরিকানদের লেখা কোনও বইকে গুরুত্ব দেওয়াই উচিত নয়। তুমি তো জানোই, বৈষ্ণব সমাজের উপর মহাপ্রভুর যে প্রভাব, তার কোনও তুলনা নেই।'

'উনি নিজে ক্যান গৌড়ে গেলেন না জয়ভাই?'

'তার অনেক কারণ ছিল। রাজনৈতিক কারণে অদ্বৈত আচার্য ওঁকে গৌড়ে ফিরতে মানা করেছিলেন। আসলে কী জানো, মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন, নিত্যানন্দের যা সাংগঠনিক দক্ষতা, তাতে সারা গৌড় জুড়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা ওঁর পক্ষেই

সম্ভব। তুমি দেখো, মহাপ্রভু কেমন দূরদর্শী ছিলেন। ওঁর কথায় নিত্যানন্দ গৌড়ে ফিরে খড়দহে ঘাঁটি গাড়লেন। তিনি ও তাঁর ছেলে বীরভদ্র সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে আহ্বান জানালেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের জন্য। সেই সময় নিত্যানন্দ সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ নাহলে ব্যভিচারে দেশ ভরে যেত। বৈষ্ণব ভেকধারী নেড়ানেড়ি সম্প্রদায় ওঁর পায়ের কাছে আশ্রয় নিলেন। বৌদ্ধরাও দলে দলে ধর্ম বদলে হিন্দু সমাজে স্থান পেলেন। তুমি জানতে চাইলে, মহাপ্রভু কেন নিজে ধর্মপ্রচারের কাজে আসেননি। উনি ছিলেন ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যে রাজচক্রবর্তী। উনি রাধাভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকার জন্য উনি পাঠিয়েছিলেন নিত্যানন্দকে। মহাপ্রভুর আদেশেই নিত্যানন্দ সামাজিক দুর্গতি থেকে উদ্ধার করেছিলেন নীচু জাতির মানুষকে। এই কারণেই গৌড়ে তখন সাধারণ মানুষের কাছে নিত্যানন্দের নাম মহাপ্রভুর থেকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। লোকে বলত, 'হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হইল শ্রীচৈতন্য।' অর্থাৎ কি না নিত্যানন্দ হলেন রাজা, আর শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রধানমন্ত্রী। তবে নিত্যানন্দ পুরীতে এলেই মহাপ্রভু ওঁর সঙ্গে আলাদা করে বসতেন। গৌড়ের কথা জানতে চাইতেন। একটা সুন্দর আনডারস্ট্যান্ডিং ছিল দুজনের মধ্যে।'

'আপনে ঠিকই কইসেন জয়ভাই। নিত্যানন্দ একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টর।'

'উনি কীসব কাজ করে গেছেন বলো তো? বৌদ্ধ আখড়ায় বিয়ের কোনও প্রথা ছিল না। সেই সময় নেড়ানেড়ি সমাজ এমন ভোগবিলাস আর ব্যভিচারের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাত, লোকে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। তাদের সন্তান-সন্ততিরা নামগোত্রহীন হয়ে পড়েছিল। পুরী থেকে এসেই নিত্যানন্দ তাদের মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু করলেন। পূর্বজীবনে কে কোন জাতির ছিলেন, তা ভুলে যেতে বললেন। এইভাবে তিনি বৈষ্ণব সমাজে একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। নিত্যানন্দ নিজেও দুটো বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন। এটা অবশ্য মহাপ্রভুর আদেশেই করেছিলেন। সংসারাশ্রমে থেকেও যে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করা যায়, সেটা দেখানোর জন্য। আর যে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়, সেটা হল, সেই সময় নীচু জাতের লোকেদের বাড়িতে ব্রাহ্মণরা পুজো করতে চাইতেন না। নিত্যানন্দ বৈষ্ণব গোঁসাইদের দিয়ে সেই কাজটা করাতেন। এই সব সংস্কার যদি তিনি সেই সময় না করতেন, তাহলে নীচু জাতির লোকেরা দলে দলে রাজার ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত।'

'আপনে ঠিকই কইসেন। নিত্যানন্দ না থাকলে হেই সময় বৈষ্ণবধর্ম এতডা ছড়াইত না।'

'একবার ভাবো তো মাধবী... সেই সময় বাংলার ঘরে ঘরে কষ্টিপাথরের তৈরি বাসুদেবের মূর্তি পুজো হচ্ছে। সেই বিগ্রহের সামনে বসে ভক্তরা দিনরাত্তির জপ করে চলেছে। কুলবধূরা সকাল-সন্ধ্যায় ফুল দিয়ে বিগ্রহ সাজাচ্ছে, নৈবেদ্য তুলে দিচ্ছে, যত্নের সঙ্গে ভোগ রান্না করছে। আর কোন সময়ে এটা সম্ভব হচ্ছে? যখন নাকি ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দলে দলে বাংলার মন্দির ধ্বংস করছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের জোর করে

গোমাংস খাইয়ে ধর্মচ্যুত করছে। যখন হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়। যবনদের অত্যাচারে মন্দির থেকে বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে উনি আর নিত্যানন্দ সেই সময় সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাঙালির ঘরে ঘরে। এটা একটা ধর্মীয় বিপ্লবই বলতে পারো।'

মাধবী চুপ করে জয়দেবের কথা শুনছিল। এবার বলল, 'আপনে খুব সুন্দর কথা ক'ন জয়ভাই। আপনেরে একবার আমাগো দ্যাশে নিয়া যাইতে পারলে, ভালো হইত।'

উপাসনার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দেশ কোথায় মাধবী?'

'সিলেটে। আমি কিন্তু মহাপ্রভুর ফ্যামিলির ডিসেনডান্ট।'

শুনে চমকে উঠল জয়দেব। বলল, 'তাই না কি? কোন তরফে? আমি যতদূর জানি, জাজপুর থেকে সিলেটে পালিয়ে গিয়েছিলেন, মধুকর মিশ্র। তাঁরই পৌত্র মহাপ্রভুর বাবা জগন্নাথ মিশ্র। উনি যখন তরুণবয়স্ক, তখন সিলেটে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেই কারণে জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে চলে আসেন। আর পরিবারের বাকি সদস্যরা থেকে যান সিলেটেরই ঢাকা দক্ষিণ বলে একটা জায়গায়।'

মাধবী বলল, 'ঠিকই হুনসেন। তবে মধুকর মিশ্রের বাকি পোলারা কিন্তু থাইক্যা গেসিলেন সিলেটে। আমি সেই বংশেরই মাইয়্যা। কাউকে আমি এই পরিচয়ডা দিই না।'

খাওয়া শেষ হওয়ার পর এঁটো থালা নিয়ে জয়দেব আর উপাসনা উঠে দাঁড়াল। ডাইনিং হলের বাইরে এসেই ওরা চমকে উঠল। দেখল, উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে আত্মানন্দ। বোধহয় পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে এসেছে। ওর হাতে লম্বা, গোটানো একটা ছাতা। মাধবী ওর দিকে টর্চের আলো ফেলতেই সবার চোখে পড়ল, আত্মানন্দের কপালের কাছে সামান্য কেটে গিয়েছে। জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছে। মাধবী কিছু বলতে যাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরল আত্মানন্দ। ফিসফিস করে বলল, 'এখানে কোনও কথা নয়। আমার অ্যান্টি চেম্বারে চলো। সব বলছি।'

...খানিক পর ধাতস্থ হয়ে আত্মানন্দ বলল, 'কী হয়েছিল, তা বলার আগে জয়দেব তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। জিনিসটা আমি পেয়েছি, ডিউক হোটেলে তোমার ঘর থেকে। মনে হয়, এই জিনিসটার জন্যই ওরা তোমার ঘরে লোক পাঠিয়েছিল।'

কথাগুলো বলতে বলতেই লম্বা ছাতাটা হাতের সামনে টেনে আনল ও। তারপর বলল, 'এই ছাতাটা চিনতে পারছ জয়দেব?'

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল জয়দেব। এ তো সুশোভনদার ঘর থেকে পাওয়া, বাঁশের তৈরি সেই ছাতা, যা ও নিজের ঘরে এনে রেখেছিল। ও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই, ছাতার হাতলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেলল আত্মানন্দ। বলল, 'এই বাঁশের ফাঁপা ডান্ডার ভেতর সুশোভনবাবু একটা ছবি গোল করে জড়িয়ে, লুকিয়ে রেখেছিলেন। কেন রেখেছিলেন, তুমি হয়তো জানতে পারো।'

বলতে বলতে খুব সাবধানে ও সেই ছবিটা বের করে আনল। টেবিলের উপর ছবিটা ও পেতে দিতেই, চমকে উঠল জয়দেব। এটাই কি জামিল ফেরদৌস ওরফে গোকুলানন্দের

আঁকা সেই ছবি? যা জোগাড় করার জন্য সুশোভনদা পুরীতে থেকে গিয়েছিলেন। এই ছবি উনি পেলেন কোথায়? কলকাতার জাদুঘর থেকে কি নিয়ে এসেছিলেন? নরহরি মহাপাত্র বলেছিলেন, কেওনঝড়ের এক মন্দিরে একটা ছবি লুকোনো রয়েছে। তাহলে কি সেই ছবির ফোটো কপি উনি করে রেখেছিলেন? ভাবতেই তালগোল পাকিয়ে গেল জয়দেবের মনে। আত্মানন্দ টর্চের আলো ফেলতেই ছবিটা দেখার জন্য ও টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

চোষট্টি

দুপুরবেলায় নিজের ঘরে শুয়ে গোরা বিশ্রাম নিচ্ছিল। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে ওর শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল। হঠাৎ খুব গরম লাগছে। দরদর করে ও ঘামতে লাগল। গায়ে অসহ্য জ্বলুনি শুরু হয়েছে। ঠান্ডা মেঝেয় ওর গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করল। পরনের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে, ডিভান থেকে ও মেঝেতে নেমে এল। আজকাল হঠাৎ হঠাৎই ওর শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছে। আর তারপরই কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতীতে। ইদানীং গোরার মনে হচ্ছে, টুবাইয়ের ধারণাই ঠিক। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ওর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। আর তা ও বুঝতে পারছে, মহাপ্রভুর উপর লেখা কিছু বই পড়ে। টুবাই চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যবিলাস, চৈতন্যভাগবত এনে দিয়েছে। সেগুলো খুঁটিয়ে পড়ার পর এই ভাবনাটা গোরার মনে গেড়ে বসেছে। একেক সময় ওর মনে হয়, এও কি সম্ভব? পাঁচশো বছর আগে ঘটে যাওয়া এক মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি? এই প্রশ্নটা জাগার সময় প্রথম প্রথম ওর শরীরে শিহরণ জাগত। কিন্তু এখন সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। অদৃশ্য থেকে কে যেন ওকে কথা বলিয়ে নেয়।

অন্য সময়ের মতো আজও মেঝেতে শুয়ে থাকার সময় একটা ঘোরের মাঝে চলে গেল গোরা। ও দেখল, চারপাশটা হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করেছে। মোজাইকের মেঝেটা মাটির হয়ে গিয়েছে। আশপাশটা আর ইটকাঠের বলে মনে হচ্ছে না। অদূরে গাছপালায় ঘেরা বেশ কিছু মাটির কুটির। মাটির দেওয়ালে সুন্দর আলপনা দেওয়া। গোরার চোখে পড়ল, ও একটা বেদির উপর বসে আছে। বেদির নিচে একপাশে নিত্যানন্দ আর দামোদর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এমন সময় কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন বাসুদেব সার্বভৌম। অতীতে বিচরণের সময় এই মানুষটাকে বেশ কয়েকবার দেখেছে গোরা। কেন জানে না, মানুষটাকে ওর আত্মীয়েরও অধিক বলে মনে হয়। সর্বদা ওকে আগলে রেখেছেন। সার্বভৌম কাছে এসে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু, একটা নিবেদন আছে।'

গোরা বলল, 'বলো সার্বভৌম, এত ইতস্তত করছ কেন?'

হাতজোড় করে সার্বভৌম বললেন, 'গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্র আমার কাছে একটা

পত্র লিখেছেন। তাতে উনি ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, আপনার দর্শনপ্রার্থী হতে চান। আপনি আজ্ঞা দিলেই কটক থেকে উনি আমার কুটিরে পদার্পণ করবেন।'

কথাটা গোরার পছন্দ হল না। ও ভালো করেই জানে, ওড়িশার রাজার সঙ্গে গৌড়ের যবন রাজার সম্পর্ক খুব খারাপ। গৌড়ে থাকার সময় ও যবন রাজার রোষে পড়ে গিয়েছিল। অদ্বৈত আচার্য তখন চাননি ও গৌড়ে থাকুক। সন্ন্যাস নেওয়ার পর, মায়ের কথায় গোরা শ্রীক্ষেত্রে চলে আসে। ওর মনে হল, পুরী থেকে কটকে রাজদর্শনে গেলেই গৌড়ে রটনা হবে, ও যবন রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সেই খবর চলে যাবে যবন রাজার কানে। তার ফল ভালো হবে না। ভুগতে হবে নবদ্বীপবাসীকে। না, না, ওড়িশা রাজার সঙ্গে দেখা করতে ও যাবে না। কিন্তু সরাসরি না করে দিলে সার্বভৌম কষ্ট পেতে পারেন, তাই গোরা চুপ করে রইল।

সার্বভৌম ফের বললেন, 'কী হল, কোনও উত্তর দিচ্ছেন না কেন প্রভু?'

গোরা বলল, 'এই অনুরোধটা আমায় তুমি কোরো না। জানোই তো, আমি সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন... বিষভক্ষণের মতো।' কথাগুলো বলেই গোরা অবাক হয়ে গেল। কে যেন ওকে বলিয়ে নিল।

সার্বভৌম বললেন, 'আপনি যা বলছেন, তা ঠিক। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের পরম ভক্ত ও সেবক। তিনি অন্য রাজাদের মতো নন।'

'তবুও রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠময়ী নারীর সংস্পর্শে যেমন বিকার জন্মে, তেমনই রাজ সংসর্গেও বিকার জন্মে। তুমি আর কখনও এই ধরনের অনুরোধ নিয়ে আসবে না।'

'কিন্তু আপনি কৃপা না করলে, রাজা যে রাজত্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত প্রভু। ভিখারি হতেও তাঁর আপত্তি নেই।'

'উনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এরপর হয়তো এমনও দিন আসবে, তোমরা আমাকে কটকে রাজদরবারে নিয়ে যেতে চাইবে। আড়ালে ভক্তরা তখন আমাকে ভর্ৎসনা করে বলবে, সন্ন্যাসীর এ কী আচরণ! কী দামোদর, তুমি কী বলো?'

দামোদর বলল, 'তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তোমাকে আমি কী পরামর্শ দিব। রাজার স্নেহই একদিন তোমার সঙ্গে রাজার মিলন ঘটাবে। আমি জানি, সেই দৃশ্যও একদিন আমাকে দেখতে হবে।'

নিত্যানন্দ এতক্ষণ চুপ করেছিল। গোরা তার দিকে তাকাতেই নিত্যানন্দ বলল, 'রাজদর্শনে তোমার যদি ভাই অনীহা থাকে, তাহলে তোমার গায়ের উত্তরীয়টা রাজার কাছে পাঠিয়ে দাও। তোমা-জ্ঞানে এই উত্তরীয়টা উনি পুজো করতে পারেন। ভাই, এতে তোমার আপত্তি নেই নিশ্চয়।'

না, এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কথাটা মনে ধরল গোরার। বেদির উপর রাখা উত্তরীয়টা ও তুলে দিল সার্বভৌমের হাতে। ওর পোশাক হাতে পেয়ে যদি রাজা সন্তুষ্ট হন, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সার্বভৌম আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। উত্তরীয়টা

হাতে নিয়ে চলে গেলেন কুটিরের দিকে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে গোরা বলল, 'তুমি আমায় বাঁচালে নিত্যানন্দ। এই কারণেই তোমাকে আমি এত পছন্দ করি।'

...আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝেই গোরা হঠাৎ শুনতে পেল, কেন যেন বলছে, 'এই গোরা, ওঠ। অবেলায় ঘুমোচ্ছিস কেন? ওঠ, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে যেতে হবে।'

কথাগুলো কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল গোরা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, টুবাই। সরাসরি ঘরের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওদেরই বয়সি একটা ছেলে। আগে তাকে কোথাও দেখেছে বলে গোরা মনে করতে পারল না। টুবাই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমের ঘোরে কার সঙ্গে কথা বলছিল রে গোরা?'

গোরা লজ্জা পেয়ে বলল, 'কথা বলছিলাম না কি? কী বলছিলাম রে?'

'সবটা তো শুনতে পাইনি। ঘরের ঢোকার পর শুনলাম, কাকে যেন বলছিস, এই কারণেই তোমাকে আমি এত পছন্দ করি। কাকে রে?'

সঙ্গে সঙ্গে গোরার মনে পড়ে গেল, একটু আগে ও কথা বলছিল, নিত্যানন্দের সঙ্গে। উত্তরটা শোনার জন্য টুবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। সেটা লক্ষ করে গোরা বলল, 'তোকে'।

'আমি ভাবলাম, ঘুমের ঘোরে তুই প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলি। যাক গে, তোর সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যই এই ছেলেটাকে নিয়ে এলাম। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। নাম মুরারি দইতাপতি। আমরা ওকে দাসুয়া বলে ডাকি।'

দাসুয়া হাতজোড় করে নমস্কার করল। প্রতি নমস্কার করে গোরা বলল, 'বোসো ভাই। আমিও কি তোমাকে দাসুয়া বলে ডাকতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। তোমাকে আমি সেদিন মন্দিরে দেখেছি। সেবাইতরা যেদিন তোমাকে মন্দির থেকে বের করে দিচ্ছিল। আমি তখন মন্দির চত্বরেই ছিলাম। তুমি কেন বিগ্রহ ছুঁয়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছিলে ভাইনা? পরে বাবার মুখে শুনলাম, তুমি ফের মন্দিরে গেলে, তোমার ওপর ওরা নজর রাখবে।'

টুবাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আরে, দাসুয়ার আসল পরিচয়টা তো তোকে দেওয়াই হয়নি। ওর বাবা জগন্নাথ মন্দিরের খুব ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক। রামচন্দ্র দইতাপতি। সেদিন তুই লক্ষ করিসনি। চিফ মিনিস্টার যেদিন মন্দিরে যান, মনে আছে... আমরা তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম, সেই সময় প্রতাপ পট্টনায়েককে যিনি মন্দিরের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিই রামচন্দ্র দইতাপতি। পরদিন সব কাগজের ফ্রন্ট পেজে ওঁর ছবি বেরিয়েছিল চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে।'

গোরা ঠিক মনে করতে পারল না। আসলে সেই সময় ও ওর মধ্যেই ছিল না। ওর শরীরে সেই সময় কৃষ্ণস্ফূর্তির বন্যা বইছিল। পরদিন গোরা খবরের কাগজও দেখেনি। রামচন্দ্র পান্ডাকে ওর চোখে পড়বে কী করে? গোরা ভালো করে তাকাল দাসুয়ার দিকে। পরনে ব্র্যান্ডেড শার্ট, লিভাইসের জিনস্। ওকে কোনও পান্ডার ছেলে বলে ভাবা খুব কঠিন। আসলে যুগ বদলাচ্ছে। পান্ডাদের ছেলেরাও কলেজে পড়াশুনা করেছে। মন্দিরের

বাইরে ওরা কেন এখন ফতুয়া আর ধুতি পরে জীবন কাটাবে? মেঝে থেকে দাঁড়িয়ে গোরা বলল, 'দাঁড়াও ভাইনা, আমি চোখ মুখে জল দিয়ে আসি।'

অ্যাটাচড বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর গোরা দেখল, টুবাই আর দাসুয়া বারান্দায় চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসেছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ও বারান্দায় বেরিয়ে এল। এই সময়টায় পারতপক্ষে ও বারান্দার দিকে আসে না। পুরীর সী বিচে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। বিকেলের নরম আলোয় পাঁচতলায় দাঁড়িয়ে গোরা দেখল, সী বিচে প্রচুর লোক গিজগিজ করছে। কোনও পার্বণ আছে বোধহয়। ভিড়ের মাঝে কিছু সাধুসন্তও চোখে পড়ল গোরার। আজকাল কত নতুন নতুন সী বিচ নিয়ে লেখা হচ্ছে কাগজে। কিন্তু পুরীর বিচ-এর আকর্ষণ সম্ভবত কোনওদিনই কমবে না। রেলিংয়ে ভর দিয়ে ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

টুবাই বলল, 'যে কারণে তোর কাছে দাসুয়াকে নিয়ে এলাম, একটু মন দিয়ে শুনবি গোরা?'

'কী কারণ রে?'

'ওদের একটা এনজিও আছে। যাদের কাজ হল মন্দিরের পান্ডাদের শিক্ষিত করা। শিক্ষিত করা মানে লেখাপড়া শেখানো নয়। এই ধর, তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হবে, কেন তাঁদের সঙ্গে জুলুম করা উচিত হবে না, ধর্মের নামে ঠকানো যাবে না... এই সব শেখানো আর কী। খানিকটা গ্রুম করা। ওদের এটা বোঝানো, এমন কিছু কোরো না, যাতে মন্দির সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে কেউ বাড়ি ফেরে। আসলে সাউথের মন্দিরগুলোতে একটা সিস্টেম আছে। ওখানে ফালতু হুজ্জোত হয় না। পান্ডাদের গা জোয়ারি নেই। সেই এনভায়রনমেন্টটাই দাসুয়ারা জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে আসতে চাইছে।'

শুনে গোরা একটু অবাকই হল। পান্ডাদের অত্যাচারে তীর্থযাত্রীরা কতটা দুর্ভোগে পড়েন, তা বহুবার ওর চোখে পড়েছে। দাসুয়ারা সেই পরিবেশটা বদলাতে চাইছে, জেনে ওর ভালো লাগল। দাসুয়াকেই ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এই এনজিও-র নাম কী?'

'তীর্থযাত্রী সহায়ক সমিতি। আসলে আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে টুরিজ্যম-এর এক সেমিনারে গিয়ে। আমাদের রাজ্যের টুরিজ্যম ইন্ডাস্ট্রিটা খুব খাপছাড়া অবস্থায় আছে। সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক পুরীতে আসেন। আমরা সার্ভে করে দেখেছি, এঁদের মধ্যে একটা ভালো পার্সেন্টের লোক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান কিছু পান্ডার দুর্ব্যবহারের কারণে। লোকে একবার তিরুপতি বা বৈষ্ণোদেবী দর্শনে গেলে বারবার যেতে চান । কিন্তু একবার জগন্নাথ দর্শনে এসে, অনেকেই ফের পুরীতে আসতে ভয় পান পান্ডাদের অত্যাচারে। আমরা চাই তাঁরা বারেবারে আসুন।'

গোরা বলল, 'খুব ভালো কাজে নেমেছ। পান্ডারা কি রেসপন্স করছেন?'

উৎসাহ পেয়ে দাসুয়া বলল, 'না। ওঁদের অনেকেই এটা পছন্দ করছেন না। বিশেষ করে যাঁরা পুরনোপন্থী, তাঁরা। আমার বাবা অবশ্য আমাদের পিছনে রয়েছেন। সেই কারণে আমাকে ওঁরা এখনও মন্দির থেকে ঘাড় ধাক্কা দিতে পারেননি। তবুও বলব, পান্ডাদের ফ্যামিলির কারেন্ট জেনারেশনের ছেলেরা ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা

ওদের ক্লাস নিচ্ছি। সমাজের নানা স্তর থেকে প্রোফেশনাল লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি ওদের কাছে। ওরা বোঝাচ্ছেন, আমাদের ইকনমির উন্নতির জন্যই মন্দিরের ইমেজটা ক্লিন রাখা খুব দরকার। গোরা ভাইনা, মানসিকতার খানিকটা যে পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা বেশ টের পাচ্ছি।'

'কীরকম?'

'একটা উদাহরণ দিই। এই কিছুদিন আগেও কেউ হুইল চেয়ারে বসে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে পারতেন না। ওটা নিষিদ্ধ ছিল। অথচ প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক বহু মানুষ আছেন, যাঁরা চলাফেরা করতে পারেন না বলে জগন্নাথ দর্শন করতে পারেন না। আমরা মন্দির কমিটির লোকজন আর পান্ডাদের বুঝিয়েছি, অশক্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। ওঁরা যদি হুইলচেয়ারে বসে মন্দিরে ঢুকতে পারেন, তাহলে পান্ডাদেরই ইনকাম বাড়বে। বহু আর্গুমেন্ট করার পর ওঁরা অনুমতি দিয়েছেন। পিছনের দ্বার দিয়ে তীর্থযাত্রীরা এখন হুইল চেয়ারে বসেই মন্দিরে যেতে পারছেন। আমাদের একটা বড়ো ভিকট্রি হয়েছে, বলতে পারো।'

গোরা শুনে খুব খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ, তোমাদের আর কী অ্যাজেন্ডা আছে?'

'অনেক। তোমার কাছে আমাদের বুকলেটগুলো পাঠিয়ে দেব। সবথেকে বড়ো লড়াইটা যে এখনও বাকি। সেই লড়াইয়ের জন্যই তোমার কাছে আসা। তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।'

'বড়ো লড়াই মানে?'

'বলছি। মন্দির ঘিরে এমন সব নিয়ম আছে, যা আজকের দিনে অচল। যেমন, মন্দিরের ভিতর কেউ বন্দুক নিয়ে ঢুকতে পারবে না। কেন এমন হবে, বলো তো? এত হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে আসেন, তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে না? এই দেখো না, কাশীর মন্দিরের সামনে ক'দিন আগেই বোমা ফাটল। কত লোক ঘায়েল হলেন। উদাহরণ তো হাতের কাছেই রয়েছে। এরকম দুর্ঘটনা তো যে-কোনও দিন এখানেও ঘটতে পারেন।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি, মন্দিরের ভিতর একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে!'

'আছে, তবে নাম কা ওয়াস্তে। পুলিশ আছে, তবে বন্দুক নেই। পুলিশের হাতে শুধু লাঠি। প্রায়ই পান্ডাদের সঙ্গে পুলিশের ঝগড়া লাগছে। চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আমরা এ নিয়ে কথা বলেছি। শুনলাম, মন্দির কমিটির পান্ডাদের সঙ্গে উনি কথা বলেছেন। দেখি, কী হয়। গোরা ভাইনা, কী আর বলব, মন্দিরে ঢোকার পথে দেখবেন, একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, বিধর্মীদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। এটা কেন হবে? একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই গোঁড়ামির কোনও মানে হয়? মন্দির তো সব ধর্মের মানুষের জন্যই খুলে দেওয়া উচিত। ইসকন-এর লোকরা মন্দিরে আসতে চান। তাঁদের আটকে রেখে লাভ কি? আসুন না ওঁরা। আফটার অল, ওঁরা তো মহাপ্রভুকে সারা বিশ্বের কাছে চেনাচ্ছেন।'

গোরা বলল, 'এটা তোমরা ডিম্যান্ড করেছ না কি?'

'না, এখনও করিনি। তবে শিগগির করব। এই লড়াইটাতেই তোমাকে আমাদের পাশে থাকতে হবে।' বলেই দাসুয়া থেমে ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মোবাইলটা বাজছে।'

রিং-হচ্ছে শুনে গোরা দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকে সেটটা হাতে নিল। মনে হয়, জয়দেব। কাল থেকে ওর কোনও পাত্তা নেই। বোধহয় আসতে চাইছে। পর্দার দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, না, জয়দেব নয়। অচেনা নাম্বার। সেটটা কানের কাছে তুলে ও বলল, 'হ্যালো।'

'গোরাবাবু, আমি পুরীর কালেক্টর বাসুদেব পট্টনায়েক বলছি। চিনতে পারছেন।'

গোরা বলল, 'হ্যাঁ, বলুন। হঠাৎ কী মনে করে? আপনার মেসেজ টুবাই আমাকে দিয়েছে। ফর ইয়োর ইনফরমেশন, দলিত পার্টির সমাবেশ...'

বাসুদেববাবু বললেন, 'আরে সে ব্যাপারে ফোন করিনি। আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল। আমার সঙ্গে আপনাকে একবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে। আসলে এটা চিফ মিনিস্টারের রিকোয়েস্ট'।

'কেন বলুন তো?' গোরা ভেতর ভেতর অবাক হলেও ফের প্রশ্ন করল, 'কী কারণে?'

'চিফ মিনিস্টার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। গোপনে... ওঁর বাড়িতে। সেই কারণেই আমার কাছে মেসেজ পাঠিয়েছেন। আপনার সুবিধেমতো সময়ে আমিই আপনাকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু আমার যাওয়া কি ঠিক হবে? আমি দলিত পার্টি করি। উনি অন্য পার্টির নেতা। জানাজানি হলে আমার পার্টির কর্মীদের কাছে একটা ভুল মেসেজ যাবে। আমাদের সমাবেশটা তো ওঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর বিরুদ্ধে।'

'গোরাবাবু, যতদুর আমি জানি, দলিত পার্টির সমাবেশ আটকানোর জন্য নয়। জগন্নাথ মন্দিরে রিসেন্টলি বোধহয় উনি আপনাকে দেখেছেন। আপনার সম্পর্কে উনি খোঁজখবর নিয়েছেন। আপনাকে যে সেদিন মন্দির থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, উনি সেটা জানেন। সেই কারণেই কথা বলতে চান।'

শুনে গোরার হাসি পেল। ও বুঝে গেল, প্রতাপ পট্টনায়েক ওকে রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চান। মন্দির কর্তাদের শায়েস্তা করবেন। তাই ও বলল, 'থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনভিটেশন মি. পট্টনায়েক। আমি লিডার হতে চাই না। চিফ মিনিস্টারকে আপনি বলবেন, আমার পক্ষে দেখা করা সম্ভব না। সরি, আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে পারছি না।' বলেই গোরা লাইন কেটে দিল।

তখনই ফট করে একটা দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে দেখা করবে না বলে... বাসুদেব সার্বভৌমকে ও ফিরিয়ে দিচ্ছে!

পঁয়ষট্টি

খুব খুঁটিয়ে জামিল ফেরদৌসের আঁকা ছবিটা দেখতে লাগল জয়দেব। এটাও রঙিন ছবি। জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে গড়ুর স্তম্ভের কাছে লুটিয়ে পড়ছেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর পিছনেই উদ্যত লাঠি হাতে এক দুর্বৃত্ত। আশপাশে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে একজনের পোশাক দেখে জয়দেবের মনে হল, রাজপুরুষ। কোমরে হাত দিয়ে খুব উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। জয়দেব বুঝতে পারল, জামিল ফেরদৌসের প্রথম যে ছবিটা ও দিনক্ষণ ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে ছিল, তার সঙ্গে এই ছবির সন্ন্যাসীর পোশাকে মিল আছে। হলুদ রঙের একটুকরো কাপড়। কিন্তু এই ছবিটা সুশোভনদা পেলেন কোত্থেকে? সন্ন্যাসীকে যদি মহাপ্রভু বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে লাঠি হাতে মানুষটা দীনবন্ধু প্রতিহার। রাজপুরুষটি কি তাহলে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর? না কি তাঁর অনুগত অন্য কেউ?

জয়দেব মনে মনে এসব ভাবার সময়ই ঘরের আলো ফিরে এল। টর্চ বন্ধ করে আত্মানন্দ বলল, 'এই ছবিটা সুশোভনবাবু লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন, তুমি জানো?'

সব কথা খুলে বলা ঠিক হবে কি না, জয়দেব বুঝে উঠতে পারল না। পাশ কাটানোর জন্যই ও বলল, 'সঠিক বলতে পারব না। উনি আর্ট ক্রিটিক ছিলেন। অ্যান্টিক ছবি খুঁজে বের করে, তা নিয়ে লেখালেখি করে উনি খুব আনন্দ পেতেন। যতদূর জানি, এই ছবিটার সন্ধানেই উনি পুরীতে আসেন। সে কথা আমাকে বলেও ছিলেন।'

'তার মানে... এটা একটা দুষ্প্রাপ্য ছবি। তবে আসল নয়। এটা ফোটো কপি। ছবির সাবজেক্ট দেখে আমার মনে হচ্ছে, পাঁচ-ছয়শো বছর পুরনো কোনও ঘটনা। গরুড় স্তম্ভের মেঝেটা ভালো করে দেখো জয়দেব, এখনকার মতো নয়। মন্দিরের ভিতর একজন সন্ন্যাসীকে কেউ প্রহার করছেন... আড়াল থেকে সেটা কেউ হয়তো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনিই পরে এঁকেছেন। ছবিটা দেখে আমার প্রথম অনুভূতির কথা বলব জয়দেব, এটা সেই বহু আলোচিত ঘটনা নয় তো?'

শুনে চমকে উঠল জয়দেব। আত্মানন্দের মুখে 'প্রহার', 'প্রত্যক্ষ', 'আলোচিত'... এই সব শব্দগুলো শুনে ও এমনিতেই অবাক হচ্ছিল। শেষে ওর অনুমানের কথা শুনে বুঝতে পারল, আত্মানন্দের কাছে কোনও কিছু লুকোনো ঠিক হবে না। পুরন্দর বলেছিল, আত্মানন্দ মহাপ্রভুকে নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছে। এমনও হতে পারে, ও নতুন কোনও তথ্য দিতে পারে। জয়দেব তাই খোলাখুলিই বলল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ছবিতে রত্নবেদির উপর বিগ্রহগুলো দেখা যাচ্ছে না কেন, বুঝতে পারছি না। দেখা গেলে ছবিটা আরও অথেনটিক হত।'

আত্মানন্দ বলল, 'বিগ্রহগুলো দেখা যাচ্ছে না বলেই কিন্তু ছবিটা বিশ্বাসযোগ্য। কোনও একটা প্রাচীন পুঁথিতে আমি পড়েছি, মহাপ্রভুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন নাকি বিগ্রহগুলো সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। একটাই কারণে, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যেন জগন্নাথের

চোখের সামনে না ঘটে। দাঁড়াও, এই ছবিটা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আমি সংগ্রহ করছি। চলো, বেসমেন্টে যাই। সেখান থেকে চেষ্টা করে দেখি।'

জয়দেব প্রশ্ন করল, 'তোমাদের এই আশ্রমে... বেসমেন্টেও কোনও ঘর আছে না কি?'

মুচকি হেসে আত্মানন্দ বলল, 'আছে। আমাদের নেটওয়ার্ক ওখানেই। গেলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু এখানে যা দেখবে, সেটা কখনো কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।' কথাগুলো বলেই ও পাশ ফিরে মাধবীকে বলল, 'ডার্লিং, তুমি উপাসনা ম্যাডামকে নিয়ে গেস্ট রুমে চলে যাও। আমরা খানিকক্ষণ পরে উঠে আসছি। আজ রাতেই এঁদের দুজনকে আমি ভুবনেশ্বরে পৌঁছে দেব।'

উপাসনাকে নিয়ে মাধবী গেস্ট রুমের দিকে চলে যাওয়ার পর আত্মানন্দ অ্যান্টি চেম্বারের একদিকের দরজা খুলে বলল, 'এখানে সিঁড়ি আছে। সাবধান, আমার পিছন পিছন নিচে নেমে এসো।'

একটু পরে নিচে নেমে উজ্জ্বল আলোয় জয়দেব দেখল, বিরাট বড়ো একটা হলঘর। কর্পোরেট অফিসের মতো সাজানো গোছানো। নানা ধরনের কিউবকিলস। প্রতি ক'টা ডেস্কে কম্পিউটার। পাঁচ-ছ-টা ছেলেমেয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছে। আত্মানন্দকে দেখে ওরা সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেকের পরনে সাদা ফতুয়া আর ধুতি। মাথা ন্যাড়া, কপালে তিলক। একদিকের দেওয়ালে বড়ো এলসিডি টিভিতে কোনও প্রোগ্রাম চলছে। নিজের চেম্বারে ঢুকে ইন্টারকমে আত্মানন্দ বলল, 'জয় রাধে। সোনারেখা, আমার ঘরে একবার আসবে? কাজ আছে।'

একটা মেয়ে চেম্বারে ঢুকতেই আত্মানন্দ ছবিটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আমাদের প্রতিটা কেন্দ্রে পিডিএফ করে দাও। সেইসঙ্গে একটা বার্তা দাও, এই ছবিটা সম্পর্কে যদি কারও কিছু জানা থাকে তাহলে এখুনি যেন... আমাকে জানায়। যাও, খুব তাড়াতাড়ি কাজটা করো।'

ছবি হাতে নিয়ে মেয়েটা চলে যেতেই জয়দেব জিজ্ঞেস করল, 'মায়াপুরে তোমাদের একটা সেন্টার আছে জানতাম। আরও অন্য কোথাও আছে না কি রবার্ট?'

'অনেক। তবে প্রধান কেন্দ্র চারটে। সবথেকে বড়োটা মায়াপুরে। আর অছে লস অ্যাঞ্জিলেস, প্যারিস ও স্টুটগার্টে। আমাদের হংকং কেন্দ্রটাও আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছে। ইদানীং চিনা বংশোদ্ভূতরা ভক্তিবাদে খুব আকৃষ্ট হচ্ছেন। ওখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্দিরে ভক্তদের দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। দেখবে না কি? এখানে বসেই তোমাকে দেখাতে পারি। হংকংয়ের সঙ্গে আমাদের এখানকার সময়ের তফাত সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো। ওখানে এখন ভোর পাঁচটা। ভক্তরা নামসংকীর্তনে বেরিয়ে পড়েছেন। দাঁড়াও, এলসিডিতে তোমায় সব দেখাচ্ছি।'

নিজের চেম্বারে বসেই রিমোট কন্ট্রোলে এলসিডি-র প্রোগ্রাম বদল করল আত্মানন্দ। জয়দেব দেখল, হংকংয়ের রাস্তা দিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জনের একটা দল নামসংকীর্তন

করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, কেউ খোল-করতাল। দু'একজন ছাড়া বাকি সবাই চাইনিজ অরিজিন। পরনে সাদা ফতুয়া ও ধুতি। সবাই মুণ্ডিত মস্তক। তবে প্রত্যেকের মাথায় গিঁট দেওয়া টিকি। হংকং শহরের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর দেখে জয়দেব অবাক হয়ে গেল। বিশেষ করে আলোর বিজ্ঞাপনগুলো দেখে। এখনও ওখানে সূর্যের আলো পরিষ্কার ফোটেনি। সত্যি, শহরটাকে যেন আলাদা জগৎ বলে মনে হল ওর।

জয়দেব এলসিডি-র দিকেই তাকিয়েছিল। হঠাৎ আত্মানন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো মহাপ্রভুর মৃত্যুরহস্য নিয়ে রিসার্চ করছ জয়দেব, তাই না? কতদূর এগোলে?'

জয়দেব ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। প্রায় শেষ করে এনেছি। এবার লেখার কাজটা শুরু করব।'

'তোমার কি মনে হয়, ওঁকে হত্যা করা হয়েছিল?'

'আমার তো তাই মনে হয়। তবে জোর গলায় সেটা বলতে পারছি না। আমার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। এই ছবিটার আশায় এতদিন বসেছিলাম। ছবিটা ইঙ্গিতও দিচ্ছে, মহাপ্রভুকে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তুমি বলছ, ছবিটা আসল নয়। এতেই আমি দমে যাচ্ছি। জানো আত্মানন্দ, সুশোভনদা আমাকে বলেছিলেন, জামিল ফিরদৌস মোট তিনটে ছবি এঁকেছিলেন। এটি দ্বিতীয় ছবি। তৃতীয় ছবিটা নাকি কেওনঝড়ের এক গভীর জঙ্গলে এক পুরনো মন্দিরের মধ্যে লুকোনো রয়েছে। সেই ছবিটা পেলে আরও পরিষ্কার হওয়া যাবে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে।'

'এই জামিল ফেরদৌস লোকটা কে?'

'মহাপ্রভুর এক শিষ্য। ইনি মুসলমান ছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ইনি নাম নেন গোকুলানন্দ।'

'তাই বলো। এই কারণেই আমি বুঝতে পারছিলাম না। দাঁড়াও, দেখি এর সম্পর্কে আমাদের লাইব্রেরিতে কিছু তথ্য আছে কি না। এখুনি পেয়ে যাব।'

টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপটা কাছে টেনে নিল আত্মানন্দ। তারপর নিবিষ্ট মনে ওর জ্ঞানভাণ্ডার খুলতে লাগল। মিনিট দুয়েক পরে ল্যাপটপের দিকে চোখ রেখেই ও বল, 'এই তো পেয়েছি। গোকুলানন্দ। আসলে ইনি এক গুপ্তচর ছিলেন। গৌড়ের নবাব একে পাঠিয়েছিলেন মহাপ্রভু সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর পাওয়ার জন্য। সেইসময় ওড়িশার রাজার প্রধান অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধরের আশ্রয়ে ছিলেন ইনি। শ্রীক্ষেত্রে তখন কেউ জানত না, ইনি যবন। গোবিন্দ বিদ্যাধর একবার মহাপ্রভুকে ধর্মচ্যুত করার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করেন। ম্লেচ্ছ ফেরদৌসের হাত দিয়ে তিনি মহাপ্রভুকে ভিক্ষান্ন পাঠান। কিন্তু ভিক্ষার সেই চাল রান্না হওয়ার সময় একটা বিরাট পক্ষী এসে তাতে মলত্যাগ করে। ফলে মহাপ্রভুকে সেই অন্নগ্রহণ করতে হয়নি। ফেরদৌস পরবর্তীকালে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে... মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হন। গুপ্তচরবৃত্তি ছেড়ে দেন। একবার রথযাত্রার সময় পুরীতে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তার পর থেকে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে।

লুকিয়ে খড়দহে গিয়ে তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন নিত্যানন্দের কাছে। নাম নেন গোকুলানন্দ।'

মাঝে বাধা দিয়ে জয়দেব বলল, 'আমি যতদূর জানি, এই গোকুলানন্দ ওরফে ফেরদৌসই একমাত্র মন্দিরে হাজির ছিলেন, যখন মহাপ্রভুকে মেরে ফেলা হয়। দেখো তো, এটা সত্যি কি না?'

'দেখছি।' বলে ফের ল্যাপটপের পর্দায় চোখ রাখল আত্মানন্দ। তার পর বলল, 'গোকুলানন্দ একদিকে যেমন বলশালী ছিলেন, তেমনই নিপুণ চিত্রকর। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ জয়দেব। গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুগামীরা যখন গম্ভীরা থেকে মহাপ্রভুকে মন্দিরে ডেকে নিয়ে যান, তখন তাঁরা মহাপ্রভুর আর কোনও শিষ্যকে সঙ্গে যেতে দেননি। একমাত্র গোকুলানন্দই সঙ্গে গিয়েছিলেন। কারণ হত্যাকারীরা তাঁকে নিজেদের লোক বলেই মনে করেছিলেন। মন্দিরের ভেতর অসুস্থ মহাপ্রভুর সঙ্গে দুর্বৃত্তরা কীরকম আচরণ করেছিলেন, তার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন এই গোকুলানন্দ। তোমার কথাই ঠিক। শোনো, আমাদের তথ্যভাণ্ডারে যা আছে, তা তোমাকে জানাচ্ছি। এই গোকুলানন্দ পুরী থেকে উধাও হয়ে গেছিলেন মহাপ্রভুর তিরোধানের দিন। শোনা যায়, উনি কেন্দুঝরার জঙ্গলে চলে যান। এই কেন্দুঝরাই হচ্ছে কেওনঝড়। ওখানেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম পালন করেন জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত। হ্যাঁ, উনি তিনটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তার দু'টি পাওয়া যাচ্ছিল না। একটি কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয় কলকাতার জাদুঘরে। এই তো... সুশোভনবাবুর নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি। ইনিই সেই চিত্রটি উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় চিত্রটির কথা উল্লেখ নেই। তুমি ঠিকই বলেছ, একটি চিত্র কেওনঝড়ের ওই মন্দিরে রয়েছে।'

জয়দেব অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা এতসব তথ্য সংগ্রহ করলে কী করে আত্মানন্দ?'

'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? গত চারশো বছরে মহাপ্রভু সম্পর্কে সারা বিশ্বে যেখানে যা প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের তথ্যভাণ্ডারে তা গুছিয়ে রাখা আছে। বহু প্রাচীন পুঁথি আমরা অনুবাদ করছি। আমাদের সেন্টারগুলোতে এই কাজ করার জন্য প্রচুর কর্মী রয়েছেন। তাঁরা তথ্যগুলো আপডেট করেন। এই তো... সোনারেখা এসে গিয়েছে। এখুনি ছবিটার সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া যাবে। জয় রাধে... বলো সোনারেখা, কোনও কেন্দ্র থেকে কোনও খবর পেলে?'

'জয় রাধে... স্টুটগার্ট থেকে রেসপন্স পাওয়া গেছে।'

'ঠিক আছে। আমি দেখে নিচ্ছি। ধন্যবাদ সোনারেখা। তুমি যেতে পারো।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর আত্মানন্দ ফের ল্যাপটপে মন দিল। একটু পরে বলল, 'জয় রাধে, জয়দেব... তথ্য পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ আমলে কেন্দুঝরার রাজার কাছ থেকে গোকুলানন্দের আঁকা দুটি ছবি উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন এক ইংরেজ অফিসার। ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন আগে। সেই অফিসার বিলেতে ফিরে যাওয়ার আগে ছবি দুটি পাঠিয়ে দেন কলকাতার জাদুঘরে। এই তথ্যটা দিচ্ছে আমাদের স্টুটগার্ট কেন্দ্র। ওখানে

আমাদের একদল কর্মী গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন মহাপ্রভু সম্পর্কে। ওঁদের তথ্যগুলো তুমি চোখ কান বুজে মেনে নিতে পারো।'

জয়দেব বলল, 'তুমি দেখো তো, তৃতীয় ছবিটা ঠিক কোথায় রয়েছে?'

ফের ল্যাপটপে মন দিল আত্মানন্দ। খানিকক্ষণ পর বলল, 'কেন্দুঝরার জঙ্গলে গোনাসিকা বলে একটা জায়গা আছে। খুব পরিচিত জায়গা, সেখানে ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। একেবারে বৈতরণী নদীর ধারে। তারই কাছে গোকুলানন্দ নিজে রাধাগোবিন্দের মন্দির তৈরি করেছিলেন। দাঁড়াও, আমাদের এখানে স্যাটেলাইট কানেকশন আছে। এখুনি তোমাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাই। তুমি এলসিডি-র পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকো।'

এমনও হয় না কি? আত্মানন্দর নেটওয়ার্ক দেখে জয়দেব উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। পুরন্দর তাহলে ঠিকই বলেছিল, এদের অর্গানাইজেশন অনেক স্ট্রং। পুরীতে আশ্রমের পাতাল ঘরের ভিতর বসে এরা সর্বত্র নজরদারি করছে। ভাবা যায়? মহাশূন্যে উপগ্রহের মাধ্যমে! পুরীর প্রশাসন কি তা জানে? এসব কাণ্ডকারখানা হলিউডের ছবিতে দেখেছে জয়দেব। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মানুষ আজ কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। এসব ভাবার মাঝেই জয়দেব এলসিডি-র পর্দায় ওড়িশার ম্যাপ দেখতে পেল। আত্মানন্দ মাউসে ক্লিক করতে করতে ম্যাপ ছোটো করে আনছে। তারপর বলল, 'কেন্দুঝরা জায়গাটা ২১.১ এন-২২.১০ এন অক্ষরেখা আর ৩৫.১১-৩৬.২২ এন দ্রাঘিমারেখার মাঝে। এর প্রায় তিরিশ শতাংশ এখনও জঙ্গল। এই দেখো, গোনাসিকা জায়গাটা আমি পর্দায় নিয়ে আসছি। এখানেই ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কেন্দুঝরাগড় থেকে ঠিক ৩৩ কিলোমিটার দূরে। ২১৩ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে ওখানে যাওয়া যায়।'

কথাগুলো বলতে বলতে মাউসে ক্লিক করা থামিয়ে দিল আত্মানন্দ। তারপর বলল, 'ওই অঞ্চলটা এখানে বসেই তুমি সব দেখতে পেতে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এখন কোনও কিছু দেখা যাবে না। তা ছাড়া ওখানে এখন মারাত্মক ঠান্ডা। তাপমাত্রা এক-দুই ডিগ্রির কাছাকাছি। ওইসব অঞ্চল বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে। এখন মনে পড়ছে, অনেক বছর আগে আমি ওখানে একবার গেছিলাম। তোমার কি গ্রাহাম স্টেইনসের ঘটনাটা মনে পড়ছে? অস্ট্রেলিয়ান ধর্মযাজক? যাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানার জন্য হেড কোয়ার্টার্স থেকে তখন আমাকে ওখানে যেতে বলা হয়েছিল। গ্রামটার নামও মনে পড়ছে। মনোহরপুর।'

জয়দেব বলল, 'হ্যাঁ, স্টেইনসের ঘটনাটা জানি। এই ক'দিন আগে খুনিরা শাস্তি পেল। যাক ওসব কথা। একটা রিকোয়েস্ট করব ভাই। আমার রিসার্চের ব্যাপারে তুমি কি আমাকে হেল্প করবে?'

আত্মানন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই। যদি তোমার কোনও উপকার করতে পারি, অবশ্যই করব।'

'তোমাদের রিসার্চাররা মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসেননি?

'আমি যতটুকু জানি, তাতে তোমার ধারণাই ঠিক। সেই সময় ওড়িশার রাজনৈতিক

পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ওঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। তুমি তো আজই প্রমাণ পেলে, পাঁচশো বছর পর... আজও একদল মানুষ সেই আক্রোশ বয়ে বেড়াচ্ছে। এ নিয়ে আমার সামান্য পড়াশুনা রয়েছে। সময় পেলে তোমার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনাও করতে পারি। কিন্তু তোমার দরকার, প্রমাণযোগ্য কিছু নথির। আমাদের কাছে যা নথি আছে, তা তোমাকে দেওয়া যাবে। আমি স্টুটগার্ট থেকে সে সব আনিয়ে দেবো। ওড়িশা থেকে প্রচুর প্রাচীন পুঁথি আমাদের কর্মীরা কিনেছেন। সে সব তুমি কোথাও পাবে না। সব পুঁথি আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি জার্মানিতে।'

'আত্মানন্দ, গোকুলানন্দের মন্দিরে কি একবার যাওয়া যেতে পারে? আমার শুধু দরকার গোকুলানন্দের আঁকা তৃতীয় ছবিটা। প্রথম দুটো ছবি দেখার পর আমি নিশ্চিত, তৃতীয় ছবিতে উনি এমন কিছু এঁকে গিয়েছেন, যা ডেফিনিটলি প্রমাণ দেবে, মেরে ফেলার পর মহাপ্রভুর দেহটার কী হয়েছিল। চলো না ভাই, কেন্দুঝরায় গিয়ে আমরা খোঁজ করি।'

আত্মানন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই যাওয়া যেতে পারে। তবে আমাকে কয়েকদিন সময় দিতে হবে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখি। ওই অঞ্চলটা এখন নিরাপদ নয়। ওটা এখন মাওবাদীদের ডেরা। প্রশাসন বলে কিছু নেই। যখন তখন মাওবাদীরা ওখানে হামলা চালায়। ওরা জব্দ শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে।'

কথাগুলো বলতে বলতেই ও একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'পরে কোনওদিন তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমি বলি কী, গোকুলানন্দের ছবিটা তুমি রেখে যাও। দেখি, কতটা তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পারি। তোমার মেল ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও। যাতে আমি তথ্যগুলো নিয়মিত তোমাকে পোস্ট করে দিতে পারি। আপাতত উপরে চলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। ভুবনেশ্বর যেতে হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। সাপের লেজে পা দিয়েছি। উপাসনা ম্যাডামকে আর পুরীতে রাখা ঠিক হবে না।'

ল্যাপটপ বন্ধ করে আত্মানন্দ এবার উঠে দাঁড়াল। ওর পিছু পিছু জয়দেব উপরে উঠে এল। সমুদ্রের দিক থেকে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ ভেসে আসছে। চাঁদের আলোয় আশ্রমের ভেতরটা অদ্ভুত মায়াময় বলে মনে হল ওর। গেস্টরুমে ঢুকে জয়দেব দেখল, উপাসনা ঘুমিয়ে পড়েছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। এই মেয়েটা আর ক'দিন পর ওর জীবনসঙ্গিনী হবে, ভাবতেই জয়দেবের বুকের ভিতরে পুলক জাগল। বিছানার কাছে গিয়ে ও উপাসনার ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেল।

ছেষট্টি

অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে যে ওর এভাবে দেখা হয়ে যাবে, গোরা ভাবতেই পারেনি। সিংহদ্বারের উলটোদিকে একটা শাড়ির দোকানের সামনে ও আর টুবাই দাঁড়িয়েছিল মুকুন্দের জন্য।

মন্দিরের ভেতর নানা জায়গায় পয়সা দিতে হয়। সেই কারণে টাকা ভাঙিয়ে খুচরো আনতে গিয়েছিল মুকুন্দ। সেই সময় হঠাৎ গোরার নজরে পড়ল রিকশা থেকে অদ্বৈতবাবু নামলেন। ওঁর সঙ্গে অল্পবয়সি একটা ছেলে। তাকে রিকশা থেকে ধরে নামাচ্ছেন। অদ্বৈতবাবু কলকাতা থেকে পুরীতে এসেছেন, অথচ ওকে কিছু জানাননি, তাতেই গোরার মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই ওর মনে হল, উনি জানবেন কী করে, ও পুরীতে রয়েছে? এই সময় তো ওর ভুবনেশ্বরে থাকার কথা।

পা চালিয়ে অদ্বৈতবাবুর সামনে গিয়ে গোরা নমস্কার করে বলল, 'কবে এলেন পুরীতে?'

ওকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকালেন অদ্বৈতবাবু। তার পর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'আজই ভোরে। তুমি ন্যাড়া হয়েছ কেন গোরা? কোনও খারাপ খবর নাকি?'

'না, না। তেমন কিছু নয়। চুলটা বড় হয়ে গেছিল। গরম লাগছিল। তাই কামিয়ে ফেললাম।'

'বেশ করেছ। আরে, তুমি নিজে পরিচয় না দিলে তো তোমাকে আমি চিনতেই পারতাম না। বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী টাইপের। তা, তোমার সমাবেশের খবর কী? কেশবজি আমাকে বলেছিলেন, তুমি নাকি বিশাল সমাবেশ করছ? কবে হওয়ার কথা?'

গোরা বলল, 'এখনও ঠিক হয়নি। পরে সব বলব। আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?'

'হোটেল গম্ভীরা। চেনো না কি? খুব বেশি দূরে নয়। আমাদেরই পার্টির এক কর্মীর হোটেল। কেশবজিই আমাকে এই হোটেলে উঠতে বললেন।'

'আমিও তো ওই হোটেলে আছি। পাঁচতলায়। আপনি?'

'দোতলায়। তিনটে রুম নিয়ে। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন আছেন।' বলেই পিছন ফিরে তাকালেন অদ্বৈতবাবু। পর পর তিনটে রিকশা এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গীদের দেখে নিয়ে পাশ ফিরে অদ্বৈতবাবু বাচ্চা ছেলেটাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে বোধহয় কলকাতায় তুমি কোনওদিন দেখোনি। এ আমার নাতি, তুতুন। মেন্টালি রিটার্ডেড। মেয়ের মানত আছে। তাই একে নিয়ে জগন্নাথের কাছে এসেছি।'

অদ্বৈতবাবুর মেয়েকে দু'একবার দেখেছে গোরা। শুনেছিল, উনি নর্থ ক্যালকাটার দিকে থাকেন। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, সাত আটজন পুরুষ ও মহিলা জড়ো হয়েছেন অদ্বৈতবাবুর আশপাশে। অদ্বৈতবাবুর মেয়ে মলিদিকে ও চিনতে পারল। বাকিরা সব বয়স্ক। তা দেখে ও বলল, 'আপনারা কি আগে মন্দির ঘুরে দেখবেন, না পুজো দেবেন?'

'তুমি কী সাজেস্ট করো গোরা? এখানে তো শুনেছি, পান্ডারা অনেক সময় হ্যারাস করেন। আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দিকে যে পান্ডা আছেন, তিনি অসুস্থ। তাই আসতে পারেননি।'

'দাঁড়ান, আমার এক বন্ধু আছে এখানে। পান্ডা ফ্যামিলির ছেলে। তাকে আগে ডেকে পাঠাই। বেলা এগারোটার সময় সকাল ধূপ ভোগ দেওয়া হয় বিগ্রহদের। আমার মনে

হয়, তার আগেই আপনারা পুজোটা সেরে নিন।' বলেই গোরা পাশ ফিরে টুবাইকে বলল, 'এই দ্যাখ তো, ফোনে দাসুয়াকে পাস কী না। ও থাকলে সুবিধে হবে।'

মন্দিরের ভেতর মোবাইল সেট নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না। শাড়ির দোকানে কারও কাছে ওদের মোবাইল সেট রেখে এসেছিল টুবাই। ও দোকানের ভিতর ঢুকে গেল। গোরা তখন বলল, 'চলুন, আমরা মন্দিরে যাই। আমার বন্ধুটাকে পাওয়া গেলে, নিশ্চিন্তে পুজো দিতে পারবেন।'

অদ্বৈতবাবুদের সবাইকে নিয়ে গোরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেল। সিংহদ্বার দিয়ে ঢোকার সময় সিঁড়িতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন অদ্বৈতবাবু। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের মন্দিরে ঢোকা নিষেধ... এই সাইনবোর্ডটা দেখে উনি বললেন, 'বোর্ডে কী লেখা আছে, দেখেছ গোরা? এই কারণেই এ সব মন্দিরে আমার আসতে ইচ্ছে হয় না। এই নিয়মগুলো অ্যান্টি কন্সটিটিউসনাল।'

এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে এবং তা পান্ডাদের কানে গেলে সমস্যা হতে পারে। এমনিতেই একদিন পান্ডাদের সঙ্গে ওর ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। পরে এ নিয়ে অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে কথা বলবে, ভেবে গোরা চুপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ও লক্ষ করল অদ্বৈতবাবু শক্ত করে ধরে আছেন তুতুনের হাত। তুতুন হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কৌতূহলভরে। কিন্তু অদ্বৈতবাবু প্রায় ওকে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। দেখে গোরার খারাপই লাগল। কত বয়স হতে পারে ছেলেটার? দশ-বারোর বেশি তো নয়ই। তুতুনকে চোখে চোখে রাখার জন্য ও বাঁ দিকে সরে গেল। বাঁ দিকে প্রভু জগন্নাথের রসুই ঘর। হাত ছিটকে তুতুন যদি সেদিকে চলে যায়, ভোগের পাত্র ছুঁয়ে দেয়, তা হলে পান্ডারা ভোগান্তির একশেষ করবে। ও নিজে ভুক্তভোগী।... সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অদ্বৈতবাবুকে ও জিজ্ঞেস করল, 'পুরীতে ক'দিন থাকার ইচ্ছে নিয়ে এসেছেন?'

অদ্বৈতবাবু বললেন, 'দিন চারেক। ফিরে গিয়ে একবার ইউ পি যেতে হবে। চিফ মিনিস্টার কলাবতীজি ডেকে পাঠিয়েছেন। উনি আমাদের পার্টির সঙ্গে অ্যালায়েন্সের কথা বলছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশনের ডেট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। এই টার্মোয়েলের সুযোগটা দলিত পার্টিকে নিতে হবে। পরে হোটেলে বসে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ডিটেলে আলোচনা করব। ভালই হল তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হল।'

মাস দু'য়েক আগে হলেও গোরা এ সব কথায় আগ্রহ দেখাত। কিন্তু কেন জানে না, মন্দিরের ভিতর দাঁড়িয়ে রাজনীতির কথা শুনতে ওর মোটেই ভাল লাগল না। অদ্বৈতবাবুর কথার সুর ওর আজ ভাল লাগল না। উনি আগে মানব কল্যাণের কথা বলতেন। দলিতদের উন্নতিসাধনের কথা। কিন্তু আজ গোরার মনে হচ্ছে, উনি ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকার কথা ভাবছেন। এ তো ব্যক্তিস্বার্থের কথা। দলিতরা হল শূদ্র। আবহমান কাল ধরে তারা যা করেছে, সেই বর্ণাশ্রমের অধিকার মেনে চলাই তার ধর্ম। আর সেটা করলেই তাদের পরমগতি লাভ হবে। অদ্বৈতবাবু কে? নিছকই একজন মানুষ। তাঁর সাধ্য কতটা? দলিতরা যদি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তা হলেই তাদের মুক্তি ঘটবে। গোরার

মনে হল, দলিতদের সমাবেশ করে ওর এই কথাগুলোই প্রচার করা উচিত। কিছু রাজনৈতিক বুলি উপচে দিয়ে ওদের স্বপ্ন দেখানো ভুল হবে। আর সে কথা স্পষ্টভাষায় ও জানিয়ে দেবে অদ্বৈতবাবুকে।

'গোরা, এই বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো সিঁড়ির ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে কেন বলো তো?'

একটু আনমনা ছিল গোরা। অদ্বৈতবাবুর কথায় পাশ ফিরে তাকাল। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আসা কয়েকটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে সিঁড়ির ধুলো গায়ে মাখছে। দেখে ও বলল, 'ভক্তদের পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্ছে। লোকে বলে, বাইশি পাঁহাচের ধুলো গায়ে মাখলে না কি কল্যাণ হয়।'

অদ্বৈতবাবু জিজ্ঞেস করলন,'বাইশি পাঁহাচটা কী ভাই?'

'গুণে দেখুন, মন্দিরে ওঠার জন্য এখানে বাইশটা সিঁড়ি আছে। একেই বাইশি পাঁহাচ বলে। ছোটবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলাম, এই বাইশটা সিঁড়ির ইনার মিনিং আছে। সব ভুলে গিয়েছি। দাঁড়ান, আমার বন্ধু টুবাই উঠে আসছে। ওর সব মুখস্ত। ও বলতে পারবে।'

শুধু টুবাই নয়, ওর সঙ্গে দাসুয়াকেও দেখতে পেল গোরা। ওরা কাছে আসতে ও বলল, 'এই, অদ্বৈতবাবু বাইশি পাঁহাচের মানে জানতে চাইছেন। তুই বলে দে তো।'

টুবাইয়ের এটা প্রিয় সাবজেক্ট। ও বলতে লাগল, 'জগন্নাথের মন্দিরে যাতে আপনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য... এই সব সঙ্গে নিয়ে না ঢোকেন, সেইজন্যই এই সিঁড়ি। প্রথম পাঁচটা সিঁড়ি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। তার পরের পাঁচটা হল প্রাণের। তার পরের পাঁচটা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শের। বাকি সাতটা সিঁড়ির মধ্যে পাঁচটি হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের প্রতীক। শেষ দুটো হল মানুষের বুদ্ধি আর অহংকারের। এই বাইশটা সিঁড়ি মাধ্যমে যোগদর্শনের বাইশটা তত্ত্ব সাজানো রয়েছে। অর্থাৎ কী না আপনাকে জগন্নাথ দর্শনের আগে সব জাগতিক মোহ মুক্ত হয়ে ঢুকতে হবে। আরও ব্যাখ্যা আছে। জৈনরা মনে করেন...'

অদ্বৈতবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক থাক... আমি আর নিতে পারছি না। এই যে আমরা এখন তৃতীয় সিড়িতে দাঁড়িয়ে আছি, এটা কীসের প্রতীক।' স্পষ্টতই কথায় অবিশ্বাসের সুর। শুনে গোরার ভাল লাগল না। মনে প্রাণে কট্টর বামপন্থী অদ্বৈতবাবু। চিরদিন ধর্মের বুজরুকি নিয়ে নানা যুক্তি দিয়েছেন। উনি মনে করেন, দলিতদের এই ধর্মীয় মায়া কাজল পরিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষ চিরদিন ফায়দা তুলে এসেছে। সবথেকে আগে এটাই দলিতদের বোঝাতে হবে।

টুবাই তো এতসব জানে না, অদ্বৈতবাবুকে ঘিরে ওঁর আত্মীয় পরিজনরা দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছেন। একটু উৎসাহিত হয়েই টুবাই বলল, 'বাইশি পাঁহাচের এই তৃতীয় ধাপে স্বয়ং মহাদেব অধিষ্ঠিত। প্রভু জগন্নাথের যেদিন অভিষেক হওয়ার কথা সেদিন সব দেবতা এলেও, কাশী থেকে অনেক দেরিতে এখানে এসে পৌঁছন মহাদেব। ততক্ষণে প্রভু জগন্নাথ রত্নবেদি আসনে বসে পড়েছেন। মহাদেবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনি তখন নেমে আসতে পারছেন না। এ দিকে মহাদেব সিঁড়ির তৃতীয় পর্যন্ত উঠে গোঁ ধরলেন, জগন্নাথ

না এলে, তিনি মন্দিরের ভিতর যাবেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মহাদেব মারাত্মক চটে গেলেন জগন্নাথের উপর। সেটা বুঝে জগন্নাথ খবর পাঠালেন, মহাদেবকে সিঁড়ির ওই ধাপেই অধিষ্ঠিত হতে বলো। প্রতিবার রথযাত্রার সময় আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব। ব্যস, সেই থেকে মহাদেব এই ধাপেই রয়ে গেলেন। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে একটা ছোট্ট লাল মন্দির রয়েছে। লোকে আগে ওখানে পুজো দিয়ে, তবে জগন্নাথ দর্শনে যায়।'

টুবাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই অদ্বৈতবাবু উপরে উঠতে লাগলেন। একেবারে শেষ ধাপে উঠে উনি বললেন, 'এখানে ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা কী রকম গোরা? আমার স্ত্রী আর মেয়ে জানতে চাইছিল, ভোগ দেওয়ার জন্য কত টাকা লাগতে পারে।'

গোরা বলল, 'বাঁ দিকে অন্নদান ভোগ কমিটির অফিস আছে। ২৫ টাকা থেকে ৩৬০ টাকা... নানা ধরনের ভোগ দিতে পারেন। এই সময়টা অনেক লাইন পড়ে। তবে আপনাদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। দাসুয়াকে টাকা দিন। ও এনে দেবে। চলুন, আমরা ততক্ষণে দর্শন করে আসি।'

গরুড় স্তম্ভের কাছে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সকাল ধূপের উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছে। বেলা এগারোটার সময় জগন্নাথদেবকে যে ভোগ দেওয়া হয়, তাকে সকাল ধূপ বলে। ওই সময় রসুই ঘর থেকে ভোগমণ্ডপ পর্যন্ত পুলিশ ব্যারিকেড করে দেয় দু'পাশে মোটা দড়ি দিয়ে। যাতে ভোগান্ন নিয়ে যাওয়ার সময় কারও ছোঁয়া না লাগে। সেবাইতরা পবিত্র জল ছেটাতে ছেটাতে যায়। ভোগান্নে কারও ছোঁয়া লাগলে, তা আর বিগ্রহকে দেওয়া যায় না। পুরো ভোগ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। নতুন করে ফের ভোগ রান্না করতে হয়। পুলিশ দড়ির ব্যারিকেড দেওয়ার সময় তাই পুণ্যার্থীদের হটিয়ে দেয়। হুড়োহুড়ি হয় বলে গোরা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের দিকে তাকাল। মনে মনে বারবার বলতে লাগল, 'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'।

ভিড়ের মাঝে হঠাৎই 'গেল গেল' আওয়াজ। বাঁ দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল ব্যারিকেডের মাঝে ঢুকে পড়েছে অদ্বৈতবাবুর নাতি তুতুন। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। ও দিকে, সেবাইতরা লাইন করে ভোগান্ন নিয়ে ভোগমণ্ডপের দোরগোড়ায় এসে পড়েছেন। ভোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা ওড়িয়া ভাষায় চিৎকার করে তুতুনকে সরে যেতে বলছেন। একজন সেবাইত হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিলেন ওকে। তার পর ক্রোধে চড়চাপড় মারতে লাগলেন। গোরা কী করবে বুঝে ওঠার আগেই দেখল, তুতুনকে বাঁচানোর জন্য ব্যারিকেডের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন অদ্বৈতবাবু। তাঁর ধাক্কায় ভোগান্নের মাটির পাত্রগুলো মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। দেখে কয়েকজন সেবাইত অদ্বৈতবাবুর দিকে তেড়ে গেল। ওড়িয়া ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করল। অদ্বৈতবাবুকে ধাক্কা মারতে মারতে ওরা ভোগমণ্ডপ থেকে বের করছে। গোরা শুনল, একজন বলছে, 'ভোগ নষ্ট করেছিস। সেবাইত কমিটির অফিসে চল। তোকে এক লাখ টাকা দিতে হবে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভয়ানক এই কাণ্ডটা ঘটে গেল। পাথরের মেঝেতে তুতুন জ্ঞান

হারিয়ে পড়ে আছে। ওর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ছে। অদ্বৈতবাবুর কথা ভুলে গিয়ে গোরা ভেতরে ঢুকে প্রথমেই ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল। মার খেয়ে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সময় তুতুনের মাথা ঠুকে গেছিল একটা স্তম্ভে। সেটা তখন গোরার চোখে পড়েছিল। ওকে কোলে তুলে গোরা চট করে দেখে নিল, না, মাথা ফাটেনি। কিন্তু চোখ উল্টে আছে। নিঃশ্বাস পড়ছে না। এখুনি ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। ভোগমণ্ডপ থেকে দ্রুত বেরিয়ে চাতালে এসে গোরা টুবাইকে বলল, 'দৌড়ে যা। একজন ডাক্তার ডেকে আন।'

ওর আশপাশে অনেক তীর্থযাত্রী জমে গিয়েছেন। সবাই হা হুতাশ করছেন। এইটুকু একটা ছেলে, তাকে এমন ভাবে কেউ মারে? পান্ডাগুলো মানুষ, না জানোয়ার? তুতুনকে একটা বেদির উপর শুইয়ে দিয়ে গোরা গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে হাওয়া করতে লাগল। কেউ একজন জলের বোতল এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। তুতুনের মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল গোরা। তবুও কোনও সাড়া নেই। পুলিশ চৌকি থেকে কেউ একজন বোধহয় খাকি উর্দিপরা এক কনস্টেবলকে ডেকে এনেছিলেন। সে এসেই উঁকি মেরে বলল, 'মারা গেছে নাকি?' কথাটা শুনে গোরা চমকে উঠল। এই তো আধ ঘণ্টা আগে তুতুনকে টানতে টানতে নিয়ে আসছিলেন অদ্বৈতবাবু। এর মধ্যে মরে গেল? তখনই ভিড়ের উদ্দেশে ও বলে উঠল, 'আপনাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার আছেন? যদি থাকেন, তা হলে এগিয়ে আসুন প্লিজ।'

ভিড়ের মাঝখান থেকে মাঝবয়সি এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি ডাক্তার। সরুন, আমি দেখছি।' পালস্ আর চোখের তলা দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'সরি, হি ইজ নো মোর। হি হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে।'

ঠিক তখনই একটা মর্মভেদী চিৎকার শুনতে পেল গোরা। মায়ের আর্তনাদ। মলিদি বোধহয় ডাক্তারের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। ছুটে গিয়ে বাচ্চাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, 'তোকে তো আমি ভাল করার জন্য জগন্নাথের কাছে এনেছিলাম বাবা। তোর এ কী হল?'

মলিদির বিলাপ শুনতে শুনতেই গোরার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হল। একটা লাল বৃত্ত ওর চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। ফ্ল্যাশ দেওয়ার মতো সাদা আলোও। গোরা দেখল, একটা সাদা আলোর রেখা আকাশ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। আলোর রেখা ধরে ও উপর দিকে তাকাতেই কে যেন বললেন, 'কৃষ্ণনাম বলো। কৃষ্ণনাম বলো।' তার পরই আলোর রেখাটা মিলিয়ে গেল। চোখের সামনেটা স্বাভাবিক হতেই গোরা দেখল, অদ্বৈতবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে দাসুয়া। অদ্বৈতবাবুর জামা ছিড়ে গিয়েছে। মুখের একপাশটা ফোলা। মারা যাওয়ার খবর লোকের মুখে মুখে বোধহয় ছড়িয়ে গিয়েছে। বেদির উপর নাতিকে নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উনি মেঝেতে বসে পড়লেন। গোরার তখনই চোখে পড়ল, দাসুয়ার জামায় রক্তের লাল দাগ। তার মানে...সেবাইত কমিটির অফিসের সামনে মারামারি হয়েছে।

বেদির উপর বাচ্চাটা আঁকড়ে ধরে উচ্চস্বরে বিলাপ করছেন মলিদি। গোরা এগিয়ে

গিয়ে বলল, 'মলিদি, ওকে আমার কাছে দিন। দেখি, আমি ওকে ঠিক করে তুলতে পারি কী না।'

কথাগুলো বলেই তুতুনের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল গোরা। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, তার পর ফিসফিস করে বলল, 'কৃষ্ণনাম বল বাবা। কৃষ্ণনাম বল। বল হরেকৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। চোখ খোল বাবা। চোখ খোল।' নাগাড়ে কথাগুলো বলতেই থাকল গোরা। তুতুন তবুও চোখ খুলছে না। তা দেখে, জেদ চেপে গেল গোরার। ক্রমে ক্রমে উচ্চগ্রামে কথাগুলো বলতে লাগল ও, 'কৃষ্ণনাম বল বাবা। কৃষ্ণনাম বল।'

মন্দির চাতালের এককোণে বসে দশ বারোজন নামসংকীর্তন করছিলেন। কৃষ্ণনাম শুনে তাঁরা এদিকে উঠে এসেছেন। খোল করতালসহ তাঁরাও বাচ্চাটার সামনে সংকীর্তন শুরু করে দিলেন।... অলৌকিক কাণ্ড! কিছুক্ষণ পর তুতুন আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কিছু বলার চেষ্টা করছে, অথচ বলতে পারছে না। দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে গোরা সংকীর্তনের সঙ্গে নাচতে শুরু করে দিল। প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেছে। হরি বল রে, সবাই হরি বল। একটু পরেই তুতুন এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে বসল। তারপর মলিদিকে দেখতে পেয়ে, জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মা।'

গোরার সর্বাঙ্গ দরদর করে ঘামছে। ও বেদির উপর বসে পড়ল। খুব অবসন্নবোধ করছে। মৃত একটা ছেলেকে ও বাঁচিয়ে দিয়েছে... এই কথা মনে হয়, মন্দিরের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছে। দলেদলে পুণ্যার্থীরা এসে ওকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। না, এখানে থাকা ওর আর ঠিক হবে না। ক্লান্ত গলায় কোনও রকমে গোরা বলল, 'টুবাই, শিগগির আমাকে গম্ভীরায় নিয়ে চল।' মন্দির থেকে জনস্রোত ঠেলে বেরনোর সময় গোরা স্পষ্ট দেখল, সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে হাতজোড় করে কিছু সাধু দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সাতষট্টি

বিমলা মন্দিরের কাছে অশ্বত্থ গাছের আড়ালে আত্মানন্দর জন্য অপেক্ষা করছিল পুরন্দর। পকেট থেকে সেটটা বের করে ও দেখল, আত্মানন্দরই ফোন। কথা বলার সময় কারও চোখে পড়বে না, ও এমন নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার মাঝেই লাইন কেটে গেল। কাল রাতে ক্যাতায়ণীর ভয়ে পুরন্দর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ক্যাতায়ণীর ভয়ঙ্কর চেহারাটার কথা ওর যখনই মনে পড়েছে, তখনই চমকে চমকে উঠেছে। উফ্, ওই অদ্ভুত প্রাণীটা সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। আর একটু দেরি হলেই বোধহয় ওকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু ক্যাতায়ণীরা কি জ্যান্ত মানুষ খায়? পুরন্দর দ্বিধায়। পূজ্যপাদ জগৎবল্লভ বরং উল্টো কথাটাই বলতেন। পুরন্দর জানে, দিনের আলোয় ক্যাতায়ণীদের দেখা যায় না। তাই মাঝ দুপুরে ও সুড়ঙ্গপথ ধরে বিমলা মন্দিরের দিকে

চলে এসেছে। এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে গাছের আড়াল থেকে। পুরন্দর এখন নিশ্চিন্ত, ভয়ের কিছু নেই।

কাল বিকেলে আত্মানন্দ একটা মোবাইল সেট ধরিয়ে দিয়েছিল ওর হাতে। যাতে দু'জনের মধ্যে সবসময় যোগাযোগ থাকে। ভালই করেছে, কেননা ফোনটা না থাকলে পুরন্দর জানতেই পারত না, পদ্মনাভর লোকজন রাতে ডিউক হোটেলে চড়াও হয়েছিল। শেষ রাতে আত্মানন্দ ফোন করে জানায়, জয়দেববাবু আর উপাসনা ম্যাডামকে নিয়ে ও ভুবনেশ্বর রওনা হচ্ছে। ওখান থেকে ফিরে দুপুরের কোনও একটা সময় পদ্মনাভদের হেড কোয়ার্টার্সের সুবিধেমতো জায়গায় ডিটোনেটর ফিট করে রাখবে। তারপর রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে পুরো জায়গাটা উড়িয়ে দেবে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুরন্দর অশ্বত্থ গাছের নীচে অপেক্ষা করছে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে মাঝে একবার মিনিট দশেকের জন্য রাস্তার উল্টো দিকে গিয়েছিল। খাবারের দোকানে গিয়ে পেট পুরে পুরী আজ জিলিপি খেয়ে এসেছে। তার পর থেকেই ওর ঘুমঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এইসময় ঘুমোলে ওর চলবে না। আত্মানন্দর ফোনটাই ওকে আরও সজাগ করে দিল। হঠাৎই পুরন্দরের মনে হয়, নিশ্চয় জরুরি কোনও কারণে আত্মানন্দ ওকে ফোন করেছিল। ভুবনেশ্বরে যাওয়ার পথে কোনও ঝামেলা হয়নি তো? হয়তো সেই কারণেই ওর আসতে দেরি হচ্ছে। কথাটা মাথায় ঢুকতেই সেটটা হাতে নিয়ে ও ফোন করল আত্মানন্দকে। ও প্রান্তে সুইচ অন হতেই পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'পৌঁছে দিয়েছ?'

আত্মানন্দ বলল, 'হ্যাঁ। সেফলি। তুমি এখন কোথায়?'

'বিমলা মন্দিরের কাছে অশ্বত্থ গাছের তলায়। তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। শোনো, মুখোমুখি হওয়ার আগেই তোমায় খবর দিচ্ছি। বিষ্ণু মন্দিরের সামনে একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। তুমি যে মহিলার লাশটা ফেলে ফেলে গিয়েছিল, সেটা কেউ আধখানা খেয়ে ফেলে রেখে গেছে। পুলিশ জায়গাটা ঘিরে রেখেছে।'

খবরটা শুনে পুরন্দর শিউরে উঠল। ঐ নিশ্চয় ক্যাতায়ণীর কাজ। নিজেকে সামলে ও কোনওরকমে বলল, 'তাই নাকি? আর কিছু শুনলে?'

'নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। একজন নাকি দেখেছে, আকাশ থেকে একটা পাখি এসে লাশটা খাচ্ছিল। যাক সে কথা। যে জন্য তোমায় ফোন করলাম, সেটা বলি। আমি দেখলাম, পুলিশ স্নিফার ডগ নিয়ে এসেছে। সাবধান, স্নিফার ডগ কিন্তু গন্ধ শুঁকে পাতালে তোমার ডেরায় পৌঁছে যাবে।'

সেটা কি সম্ভব? মনে হয় না। স্নিফার ডগ বিষ্ণু মন্দিরে ঢুকতেই দেবেন না পূজ্যপাদরা। ওঁরা বাধা দিলে পুলিশ এক পাও এগোবে না। তাই পুরন্দর বলল, 'ওরা আমার টিকিও ছুঁতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

'আসছি। মনে হচ্ছে, একটা ফেউ আমার পিছু নিয়েছে। সেই কারণেই ওয়েট করছি।'

আত্মানন্দ তা হলে কাছাকাছি কোথাও আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে পুরন্দর গাছের গুঁড়িতে

বসে পড়ল। ওর চোখের ভেতরটা কটকট করছে। জলের ঝাপটা দিতে পারলে ভাল হত। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যই ও চোখের পাতা বন্ধ করে ভাবতে লাগল, এখানকার কাজ শেষ করার পর কী করবে। হেড কোয়ার্টার্স উড়িয়ে দেওয়ার পর ওর দ্বিতীয় কাজ পদ্মনাভকে খুন করা। হ্যাঁ, আজকের মধ্যেই তা করতে পারলে, রাতের দিকে ও চলে যাবে ভুবনেশ্বরে। কয়েকটা দিন মায়ের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। ওখানে বেশি নানী আছেন। আর আছে অম্বালিকা। কথাটা মনে পড়তেই একটা শিহরণ খেলে গেল পুরন্দরের শরীরে। সঙ্গেসঙ্গে কাছে পিঠে হাসির ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল পুরন্দর। কে হাসে? চোখ মেলে তাকাতেই ও জমাট বেঁধে গেল। কাছেই ভাঙা দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ওর ছায়া। বলল, 'তুই যা ভাবছিস, তা কিন্তু হবে না।'

নিজের ছায়াকে আরও একবার দেখেছিল পুরন্দর। ভুবনেশ্বরে মায়ের বাড়িতে। ও জানে, মৃত্যুর আগে না কি মানুষ নিজের ছায়া দেখতে পায়। তা হলে কি ওর মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছে? কথাটা মাথায় আসতেই ওর সবকিছু গুলিয়ে গেল। ছায়া কী বলতে চাইছে, তা জানার জন্য ও বলল, 'কী হবে না?'

ছায়া বলল, 'এই ... অম্বালিকাকে নিয়ে তোর স্বপ্ন দেখা। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। বুঝলি বোকা। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তো ক'টা মাত্তর দিন বাকি। বাঁচতে চাস তো, সব পাপ ধুয়ে ফ্যাল।'

শুনে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল পুরন্দরের। শূন্য চোখে ও ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল। স-ব ধ্বং-স হ-য়ে যা-বে? পূজ্যপাদরা বলতেন বটে, পাপের ভার এই পৃথিবী আর সহ্য করতে পারবে না। ভগবান তখন অবতার হয়ে নেমে আসবেন। তিনি নিজেই সব ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু কীভাবে? প্রশ্নটা ওর মনে আলোড়ন তুলতেই ছায়া বলল, 'মহাশূন্য থেকে আগুনের একটা গোলা নেমে আসবে এই ধরাধামে। প্রচণ্ড ধাক্কা দেবে। মাটির তলা কেঁপে উঠবে। সমুদ্রের জল উথাল পাথাল করবে। তখনই মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা। হা হা হা। পুরন্দর... ভাল চাস তো এখনই তুই ধুয়ে ফ্যাল সব পাপ।'

পাপ কি গায়ে লেগে থাকা কাদা, যে ও পুকুরে ডুব দিয়ে ধুয়ে ফেলবে? প্রশ্নটা করতে গিয়েও, করতে পারল না পুরন্দর। ছায়া উধাও, ও দেখল আত্মানন্দ ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁর কাঁধে একটা বিরাট হ্যাভারস্যাক। বোধহয় তাতে ব্লাস্টের সব সরঞ্জাম আছে। এ দিক ও দিক তাকিয়ে... নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মানন্দ বলল, 'চলো, এ বার যাওয়া যাক। ফেউটাকে ধোঁকা দেওয়া গেছে।'

কোনও কথা না বলে পুরন্দর উঠে দাঁড়াল। ভাঙা দেওয়ালের পাশ দিয়ে আগাছা সরিয়ে ও সুড়ঙ্গপথের মুখে এসে দাঁড়াল। তার পর কাঠের ভারী পাল্লার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এসো।'

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় আত্মানন্দ বলল, 'তোমার কি মনে হয়, ওদের হেড কোয়ার্টার্সে এখন খুব বেশি লোকজন থাকবে?'

পুরন্দর বলল, ‘আমার কোনও আন্দাজ নেই।’

‘যদি এনকাউন্টার হয়, তা হলে পিস্তল ব্যবহার কোরো। তোমার কাছে আছে, না আমি দেবো।’

‘দরকার হলে চেয়ে নেবো। মনে হয় না লাগবে। এই সময়টায় ওরা মন্দিরের কাজে ব্যস্ত থাকে।’

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বার দুয়েক এ দিক ওদিক করেছে পুরন্দর। বাঁকগুলো মোটামুটি পরিচিত। টর্চের আলো ফেলে ওরা দু'জন সাবধানে এগোতে লাগল। মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা পৌঁছল দেবালয়ের কাছে। আগের দিন নাটমন্দিরে প্রচুর লোকের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল পুরন্দর। এ দিন একেবারে শুনশান। হাঁটতে হাঁটতে আত্মানন্দ ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। পাতাল নিয়ে কৌতূহল মেটাচ্ছে। ওকে বলতে হল রাজা দিব্যদেবাদিদেবের কথা। কেন তিনি পাতালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? শুনে আত্মানন্দ বলল, ‘এইবার বুঝেছি। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এই দেবালয়ের কাছাকাছি কোন একটা ঘরে জগন্নাথদেবের প্রচুর অলঙ্কার রাখা আছে। খুঁজে দেখবে না কি পুরন্দর?’

আত্মানন্দের এই অনুরোধটা ভাল লাগল না পুরন্দরের। আগের দিন ও প্রান্ত থেকে আসার সময় আশপাশে অনেক ঘর দেখতে পেয়েছে ও। কোথায় কী আছে, তা দেখার মানসিকতা ওর তখন ছিল না। পাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ওর মনপ্রাণ হাঁসফাঁস করছিল তখন। অনুরোধটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে ও বলল, ‘যে কাজের জন্য আমরা এসেছি, সেটা আগে করলে ভাল হয় না?’

আত্মানন্দ বলল, ‘সেই কাজটা আগে করলে, অলঙ্কারের চিহ্ন তুমি খুঁজে পাবে না। সময় বাঁচানোর জন্য এক কাজ করো পুরন্দর। তুমি একটা ঘর দেখো। আমি অন্যটা। আমার মনে হয়, অলঙ্কারগুলো যদি সত্যিই থাকে, তা হলে তা ফেলে রেখে যাওয়ার থেকে আশ্রমের কাজে লাগানো অনেক ভাল।’

কথাগুলো বলেই নাটমন্দিরের লাগোয়া একটা ঘরে ঢুকে গেল আত্মানন্দ। অগত্যা পুরন্দরও দেবালয়ের পাশে একটা ঘরে ঢুকল। পুরনো কিছু আসবাব, আর ধূলিমলিন পোশাক পড়ে রয়েছে। না, তেমন কিছু নেই। পুরন্দরের মনে হল, অলঙ্কার যদি সত্যিই এখানে থাকে কোনও না কোনও গোপন জায়গায় থাকবে। অথবা সিন্দুক জাতীয় কোনও কিছুতে। কয়েকশো বছর ধরে এই জনশ্রুতি চলে আসছে। এই অলঙ্কার উদ্ধারের কাজে সেবাইতদের বংশের অনেকেই আগে এখানে এসেছেন। এমনও হতে পারে, সেই গুপ্তধন তাঁরা উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন। ইচ্ছে না করলেও, আত্মানন্দের মন রাখার জন্য পুরন্দর একটার পর একটা ঘরে খোঁজ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ওর মনে পড়ল, বেলি নানীর মুখে ও শুনেছে, ভক্তদের কাছ থেকে পাওয়া প্রভু জগন্নাথের অলঙ্কারাদি রত্নসিংহাসনের নীচে লুকানো থাকত। এমনও তো হতে পারে, এখানে দেবালয়ে যখন বিগ্রহ ছিলেন, হয়তো তার বেদির নীচেই রত্নভাণ্ডার ছিল। কথাটা মনে হওয়ার পরই পুরন্দর নাটমন্দিরে ফিরে এল। দেখল, আত্মানন্দ নাটমন্দিরের সিঁড়িতে বসে রয়েছে। ওকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, ‘সন্ধান পেলে?’

ঘাড় নেড়ে পুরন্দর বলল, 'না। তবে কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে, দেবালয়ের বেদির নীচটা একটা দেখলে হয়।'

'থাক এখন। এই মাত্র মাধবীর ফোন এসেছিল। টিভিতে দুপুর থেকে একটা ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং নিউজ। আজ জগন্নাথ মন্দিরে সকাল ধূপের সময় নাকি একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে। এক মহাপুরুষ না কি একটা মৃত বাচ্চাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। পুরন্দর, এখানকার কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শেষ করে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। এই ঘটনার কথা আমাদের সব কেন্দ্রে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমাকে খবর দিতে হবে, এই মহাপুরুষটি কে?'

জগন্নাথ মন্দিরে অলৌকিক ঘটনা নতুন কোনও কথা নয়। প্রায়ই ঘটে। সেজন্য টিভির নিউজের কথা বিশদ জিজ্ঞাসা করল না পুরন্দর। আত্মানন্দ আমেরিকার লোক। মন্দিরের মাহাত্ম্য আর কতটুকু জানে? এটা ভেবে ও বলল, 'চলো, তা হলে এগোনো যাক।'

আধ ঘণ্টা পর পুরন্দর ঠিক জায়গাটা আবিষ্কার করল, যেখান থেকে ও গতকাল পদ্মনাভ আর বিম্বিসারের কথা শুনে ফেলেছিল। দেওয়ালের ও পাশ থেকে অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এই সময়ে এত লোক থাকার তো কথা নয়! তবে কি ওরা ভুল দিনে চলে এল? পাথরের খাঁজে পা দিয়ে উঠে দেওয়ালের ফোকর দিয়ে ওপাশে উঁকি দিতেই পুরন্দর অবাক হয়ে গেল। মশালের আলোয় ও দেখতে পেল, নীচের হলঘরে প্রচুর লোক। তাদের সবার পরনে বেগুনি লাল রঙের ফতুয়া আর ধুতি। হলঘরের মাঝখান থেকে কাচের বাক্স উধাও। সেই নরকঙ্কালটাও নেই। তার বদলে ওই জায়গায় শোয়ানো রয়েছে নিথর একটা উলঙ্গ দেহ। বেগুনি পোশাক পরা লোকগুলো ওই দেহটিকে ঘিরে বসে আছে। হলঘরের বাঁ দিকে একটা শ্বেত পাথরের মূর্তি দেখতে পেল পুরন্দর। ফুলের মালায় প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে মূর্তির দেহ। তখনই পুরন্দরের চোখে পড়ল পদ্মনাভকে। মূর্তির পাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন।

ইতিমধ্যে আত্মানন্দ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও ফিসফিস করে বলল, 'এখানে কী হচ্ছে বলো তো? এই লোকগুলো কারা? মাই গুডনেস। শোয়ানো মৃতদেহটাই বা কার?'

পুরন্দর বলল, 'জানি না। তবে ওই যে লোকটা চেয়ারে বসে আছে, তাকে চিনে রাখো। ওর নাম পদ্মনাভ। ওর নির্দেশেই আমি অনেক খারাপ খারাপ কাজ করেছি এতদিন।'

আত্মানন্দ বলল, 'ওহ্ এই লোকটাই পদ্মনাভ প্রতিহার। এ-ই তা হলে কিং পিন।'

.... নীচের হলঘরে হঠাৎ সবাই চুপ হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পদ্মনাভ। তার পর বলতে শুরু করলেন, 'মহাত্মা দীনবন্ধু প্রতিহারের জন্মবার্ষিকীতে আপনারা এতক্ষণ পূজ্যপাদদের কথা শুনলেন। প্রায় পাঁচশো বছর আগে উনি কীভাবে ওড়িশার নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন, তাও জানালেন। একটা বীর জাতির মর্যাদা উনি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সবাই জানলেন, সেই সময় গৌড় থেকে আসা এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর জন্য ওড়িয়া জাতির শৌর্য-বীর্য কীভাবে লুপ্ত হতে বসেছিল। মহাত্মা দীনবন্ধু, সেই সন্ন্যাসীকে হত্যা করে জাতির প্রতি তাঁর মহান কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমি করতে

চাই না। উনি আমার একুশতম পূর্বপুরুষ ছিলেন। এবং যে কাজ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, পাঁচশো বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা সেই কাজগুলোই করে যাচ্ছি। গত বছর এই দিনটিতে আমি কথা দিয়েছিলাম, ওই ভণ্ড সন্ন্যাসীর বারো ভক্তকে আমরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। শুনে খুশি হবেন, আমি সেই কথা রাখতে পেরেছি। আপনাদের সামনে এই যে শবটিকে দেখছেন, এটি আমাদের দ্বাদশ শিকার। এর নাম শ্রীবৎস গোস্বামী। নবদ্বীপের বাসিন্দা। বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি। ইনি শ্রীক্ষেত্রে এসেছিলেন নবদ্বীপের তীর্থযাত্রীদের নিয়ে। কটকে আমরা এর বাস অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছিলাম। ইনি হাসপাতালে কোমা অবস্থায় ছিলেন। গতকাল একে হত্যা করে আমাদের সংস্থারই এক বীর যোদ্ধা এখানে নিয়ে এসেছে। তার নাম বিম্বিসার। তাকে আমি উঠে দাঁড়াতে বলছি।'

ভিড়ের মাঝখান থেকে বিম্বিসার উঠে দাঁড়াল। ওর কপালে ব্যান্ডেজ। দেওয়ালের খাঁজ থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে পুরন্দর। এই বিম্বিসার বলে ছেলেটা তা হলে কটকে পদ্মনাভর এজেন্ট! এতদিন এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত পুরন্দর। কখনও হেড কোয়ার্টার্সে দেখার সুযোগ পায়নি। দীনবন্ধু প্রতিহারের জন্মবার্ষিকীতে যে কোনও সম্মেলন হয়, তাও ও জানত না। এমনও হতে পারে, সংস্থায় যারা ওপরের দিকে আছে, তাদেরই হয়তো ডাকা হয়। পদ্মনাভদের চোখে তো ওর মতো লোকেরা কীটস্য কীট। ওর কোনও মূল্যই ছিল না তা হলে! ইস, কী ঝুঁকিই এতদিন ও নিয়েছে, এই লোকটার নির্দেশ পালন করার জন্য। পুলিশের কাছে ধরা পড়লে ওকে সারাজীবন জেলে কাটাতে হবে। শয়তান, হাত নিসপিস করে উঠল পুরন্দরের। ওর ইচ্ছে করল, পিস্তল বের করে এখুনি পদ্মনাভর মুণ্ডুটা থেতলে দেয়।

'এইবার শেষ অনুষ্ঠান।' পদ্মনাভ উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনারা নিষ্ঠাভরে একে একে আপন কর্তব্য সম্পন্ন করুন। আমাকে এখন জগন্নাথ মন্দিরে যেতে হবে।'

কথাগুলো বলেই পদ্মনাভ হাঁটা দিলেন করিডোরের দিকে। তাঁর পিছন পিছন দু'জন দেহরক্ষী সঙ্গ নিল। পদ্মনাভ তা হলে দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরছেন! ভাবতেই মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল পুরন্দরের। পদ্মনাভ নির্ঘাত ভয় পেয়েছেন। না হলে দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতেন না। কিন্তু উনি চলে যেতেই যা শুরু হল, তা দেখে পুরন্দর শিউরে উঠল। ও দেখল, বেগুনি পোশাক পরা লোকগুলো একে একে শবদেহের কাছে আসছে। দেহটাতে লাথি মেরে গালাগাল দিচ্ছে। তার পর লিঙ্গ বের করে, প্রস্রাব করছে দেহটার উপরে। একজন মলত্যাগ করতেও বসে গেল। তা দেখে উল্লাসে মেতে উঠল অন্যরা। দেখতে দেখতে পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল পুরন্দরের। বমি এসে গেল। সত্যিই যাতে বমি হয়ে না যায়, সেজন্য ও মুখ ফিরিয়ে নিল।

আত্মানন্দ ফিসফিস করে বলল, 'চৈতন্যভক্তদের উপর এদের কত ঘৃণা, লক্ষ করেছ পুরন্দর? নিজের চোখে না দেখলে, আমি বিশ্বাসও করতাম না, একটা মৃতদেহকে কেউ এ ভাবে অসম্মান করতে পারে। এই লোকগুলো জানোয়ারেরও অধম। এদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

মুখটা রাগে লাল হয়ে গিয়েছে আত্মানন্দের। পিঠের হ্যাভারস্যাকটা সামনের দিকে নিয়ে এল ও। তার পর ক্লিপ খুলে ভেতর থেকে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড বের করে আনল। তা দেখে পুরন্দর বলল, 'এই, তুমি করছটা কী? এখন না। আগে দেখো এরা কতক্ষণ থাকে। মৃতদেহটা নিয়ে এরা কী করে, সেটা আমাদের জানা উচিত।'

আত্মানন্দ গোঁ ধরার মতো করে বলল, 'তুমি যা-ই বলো না কেন, আজ আমি এদের পুরো অর্গানাইজেশনটা উড়িয়ে না দিয়ে এখান থেকে নড়ছি না।'

কথাগুলো শেষ করার পরই ওর মোবাইল ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। রিং টোন 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।' পাতালের অভ্যন্তরে সেই সুর সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে পুরন্দর দেখল, বেগুনি পোশাক পরা মুখগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই মুখগুলোতে আক্রোশ ফুটে বেরোচ্ছে। আত্মানন্দকে ও বলতে গেল, 'পালাও।' কিন্তু তার আগেই পুরন্দর দেখল, আত্মানন্দ মুখ দিয়ে ছিলে খুলে, গ্রেনেড নীচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। বিকট একটা শব্দ হল। সঙ্গেসঙ্গে পুরন্দর ছিটকে পড়ল নীচেতে।

আটষট্টি

উপাসনারা যখন ভুবনেশ্বরের ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনে পৌঁছল, তখন ভোর ছ'টা। সবে আলো ফুটেছে। এই সময়টায় রোজ স্বাতী আর নবেন্দু জগিং করতে যায়। ওরা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে। রওনা হওয়ার আগে স্বাতীকে একবার ফোন করে দিলে ভাল হত। কথাটা জয়দেব একবার বলেছিল বটে, কিন্তু অত রাতে উপাসনা ওকে ঘুম থেকে তুলতে চায়নি। ফোন করলে স্বাতীরা টেনশনে পড়ে যেত। গাড়িটা স্বাতীর বাড়ির তলায় এসে দাঁড়াতেই উপাসনা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, জয়দেব ঘুমিয়ে রয়েছে। নানা চিন্তায় উপাসনা সেটা খেয়ালও করেনি। জয়দেবের ঘুমন্ত মুখটা দেখে ওর মায়া হল। বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। আহা রে, দুর্ভাবনায় বেচারির মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে। আলতো ধাক্কা মেরে উপাসনা বলে, 'জয়, ওঠো। আমরা ভুবনেশ্বরে পৌঁছে গেছি।'

শেষ রাতে ওরা পুরী থেকে রওনা হয়েছিল। রবার্ট সকালবেলার জন্য অপেক্ষা করতে চায়নি। মারাত্মক স্পিডে গাড়ি চালিয়েছে। মানুষটা কি রাতে ঘুমোয় না? অন্য কেউ হলে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ত। রবার্টের যেন এনার্জির শেষ নেই। গাড়ি থেকে নেমেই রবার্ট ডিকি খুলে দ্রুত ওদের মালপত্তর নামিয়ে দিল। তার পর জয়কে বলল, 'আই গট টু গো ম্যান। পরে ফোন করব। টেক কেয়ার।' বলেই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। ওর তাড়াহুড়ো দেখে উপাসনার মনে হল, রবার্ট চায় না, ও কারও চোখে পড়ুক।

মালপত্তর নিয়ে গেটে ঢোকার মুখে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্বাতীর। পরনে ট্র্যাকসুট, জগিং করতে বেরোচ্ছিল। অবাক হয়ে ও বলল, 'তোরা হঠাৎ? আয় আয়। কী আশ্চর্য, কাল সন্ধেবেলা থেকে তোদের কথা খুব মনে হচ্ছিল। তুই কী মেয়ে রে উপা। কাল

রাতে এতবার ফোন করলাম, তোর কোনও সাড়া নেই! আজকাল মিসড কল দেখাও ছেড়ে দিয়েছিস না কি?'

এত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেওয়ার সম্ভব না। কাল সন্ধেবেলা থেকে ওর উপর দিয়ে কী ঝড় গিয়েছে, সেটা শুনলে স্বাতী খুব ভয় পেয়ে যাবে। তবে সে ঘটনা ওকে বলা যাবে না। তাই উপাসনা বলল, 'তুই একা কেন রে? নবেন্দু নেই?'

'আছে, ঘুমোচ্ছে। কাল অনেক রাতে ও কেওনঝরগড় থেকে ফিরেছে। কিন্তু তোরা হঠাৎ চলে এলি? কাজ মিটে গেছে নাকি তোর? রিসার্চের জন্য আলটিমেটলি কিছু পেলি, উপা?'

উপাসনা বলল, 'আগে ঘরে চল। জম্পেশ করে এক কাপ চা খাই। তারপর যত খুশি প্রশ্ন করিস, সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

স্বাতী হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'জয়, রেলিংয়ের ধারে যে লোকটা কুকুরদের বিস্কুট খাওয়াচ্ছে, তাকে দেখে রাখো। ওই লোকটাই নরেশ জেনা। যার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চেয়েছিলে। দু'তিন দিন হল, পুরী থেকে ফিরে এসেছে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে।'

উপাসনা তাকিয়ে দেখল, বয়স্ক একটা লোক আপন মনে কুকুরদের সঙ্গে খেলা করছে। খালি গা, পরনে গেরুয়া রঙের লুঙ্গি। তাকে ঘিরে দশ বারোটা নেড়ি কুকুর লাফালাফি করছে। বিস্কুট ধরা হাতটা নরেশ জেনা উঁচু করে রেখেছে। আর কুকুরদের বলছে, 'আগে কৃষ্ণ বল, তা হলে বিস্কুট পাবি।' উপাসনার হাসি পেয়ে গেল দৃশ্যটা দেখে।

তখনই জয়দেব ওকে বলল, 'আরে, এই লোকটাকে তো আমি চিনি। মা চিন্ময়ীর আশ্রমে দেখেছি। অবধূতজি একে খুব পছন্দ করেন। এই তা হল নরেশ জেনা। ইস, আগে জানলে আমার খুব কাজে দিত। অবধূতজির সামনেই ওর পেট থেকে কথা বের করে নিতে পারতাম।'

কথা বলতে বলতেই ওরা তিনজন দোতলায় উঠে এল। ঘরে ঢুকে স্বাতী বলল, 'উপা তোরা গেস্ট রুমে ঢুকে যা। ফ্রেশ হয়ে নে। আমি ততক্ষণে চা রেডি করি।' বলেই মুচকি হেসে ও কিচেনের দিকে পা বাড়িয়ে নীচু গলায় বলল, 'এই শোন, গেস্ট রুমের দরজাটা কিন্তু খোলা রাখিস।'

স্বাতী কিচেনে ঢুকে যাওয়ার পর উপাসনা ফিসফিস করে বলল, 'জয়, তুমি একাই যাও। ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি গিয়ে স্বাতীকে একটু হেল্প করি। একসঙ্গে দু'জনে গেস্ট রুমে ঢুকলে... স্বাতী পরে আমায় জ্বালিয়ে মারবে।'

এক পা এগিয়ে জয়দেব বলল, 'কিডন্যাপিংয়ের কথাটা স্বাতীদের বলবে না কি?'

'তোমার মাথা খারাপ? ভুলেও উচ্চারণ কোরো না।'

'তা হলে আমাদের বিয়ের কথাটা?'

'আমি বলব না। ইচ্ছে হলে, তুমি বলতে পারো।'

'চুমু টুমু খাওয়ার কথা?'

'ছিঃ, কী অসভ্য গো তুমি। সব সময় তোমার ওই চিন্তা। দাঁড়াও, বিয়ের আগে পর্যন্ত তোমার ধারে কাছেও আমি যাব না।'

'এ রকম শাস্তি আমায় দিও না সোনা। প্লিজ।'

'তুমি যাবে, না... স্বাতীকে আমি ডাকব।' কপট রাগে প্রায় ধাক্কা মেরেই জয়দেবকে গেস্ট রুমে ঢুকিয়ে দিল উপাসনা। গত বারো ঘণ্টা ধরে ও যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রথম ও একটু হালকা বোধ করল।

কিচেনে ঢুকতেই স্বাতী ওকে জিজ্ঞেস করল, 'উপা, সত্যি করে বল তো, তোদের ব্যাপারটা কদ্দুর এগোল? জয়দেব কি তোকে প্রোপোজ করেছে?'

উফ, স্বাতীর সেই এক অ্যাজেন্ডা। পুরীতে আসার সময় ট্রেনের কামরায় কথাটা ওর মাথায় ঢুকেছে। সেই পোকাটা এখনও নড়ছে। স্বাতীকে ধাঁধায় রাখার জন্যই উপাসনা বলল, 'পরে বলব। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?'

'কারণ আছে।' স্বাতী এ বার সিরিয়াস। ড্রয়িংরুমের দিকে একবার তাকিয়ে চাপা গলায় ও বলল, 'জয়দেবের সামনে তোকে কিছু বলিনি। কাল সন্ধেবেলায় তোর মা আমাকে ফোন করেছিল। তোর বিয়ের নাকি সব ঠিক হয়ে গেছে। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। আমি কায়দা করে বললাম, তুই লাইব্রেরিতে গেছিস। মাসিমা তোকে ফোন করতে বলেছিল রাতের দিকে। সেটা তোকে কনভে করতে পারিনি। ভালই হল, তুই এসে গেছিস। ব্রেকফাস্ট করার পর নবদ্বীপে তুই একবার ফোন করিস।'

'জানি, কাকিমার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।'

'তুই কী করবি এখন?'

'কী আর করব? বাড়ির এগেনস্টে যেতে পারব না ভাই। আমার অত সাহস নেই।'

চায়ের জল ওভেনে বসিয়ে স্বাতী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'অবাক লাগছে ভাই, ভালবাসিস একজনকে কিন্তু বিয়ে করবি অন্যজনকে। আমি হলে পারতাম না। ইস, জয়দেবের জন্য আমার সত্যিই খারাপ লাগছে। তোর যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, জয়দেব তা জানে?'

'জানে। আমি বলে দিয়েছি।'

'ওর কোনও রিঅ্যাকশন হল না?'

'কই, সে রকম তো কিছুই লক্ষ করলাম না। সব শুনে ও নিজেই বলল, চলো তা হলে, তোমাকে স্বাতীর কাছে রেখে আসি।'

'এই কথা বলল না কি? বুঝেছি, তোকে তা হলে কতটা ভালবাসে।' মুহূর্তেই বদলে গেল স্বাতীর গলার স্বর, 'পুরুষ জাতটাই এ রকম। আমি তো ভাই গোবিন্দকে ঠাস করে চড় মেরেছিলাম। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ কথা বলার পরও ও যখন চুপ করে ছিল...'

'তুই কি জয়দেবকে চড় মারতে বলছিস?'

'সেটা তুই ঠিক করবি। আমি তো শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি, তোর বিয়ের কথা শুনেও জয়দেবের কোনও হেলদোল হয়নি? সত্যি করে বল তো, তোদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে, না হয়নি? তুই বোধহয় কিছু হতে দিসনি, তাই না?'

স্বাতীর কথা শুনে প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল উপাসনার। কিন্তু তা চেপে রেখে নিরীহ মুখ করে ও বলল, 'না, না, হয়েছে। তবে সবটা হয়নি।'

'জয়দেবটা আশ্চর্য মানুষ তো! ফুলে মধু খাবে, অথচ বিয়ে করার নাম নেই! তুই কী চাস আগে বল। তার পর দেখিস, ওকে আমি কী রকম চেপে ধরি। আমিও নবদ্বীপের মেয়ে। দেখিস, বাপ বাপ বলে তখন বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।'

'প্লিজ, এখন ওকে কিছু বলিস না স্বাতী। আগে দেখি, বাড়ির ঠিক করা ছেলেটা কী রকম। মানে...ছেলেটা জয়দেবের থেকে বেটার কী না। তার পর দেখা যাবে।'

'কী বলছিস তুই, জানিস? এখন তো তোর উপরই আমার রাগ হচ্ছে রে।'

'রাগ করিস না ভাই। সারা জীবন যার সঙ্গে কাটাতে হবে, আগে তাকে যাচাই করব না?'

'সরি, এর পর আমি কোনও কথাই বলব না তোকে। তোর সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে গেল আজ থেকে। যার সঙ্গে খানিকটা ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে, তাকে ছেড়ে অন্য কারও গলায় ঝুলে পড়তে তোর লজ্জা করবে না? সেই লোকটাকে তো ঠকানো হবে। তোর মনে যদি এতই বাছবিচার থাকত, তা হলে জয়দেবকে অ্যালাউ করলি কেন? তুই তো এ রকম ছিলিস না উপা। খুলে বল তো ভাই, জয়দেব কি তোর সঙ্গে জোর করে ফিজিক্যাল রিলেশন করেছিল?'

'না, ঠিক জোর করে না। আবার খানিকটা জোর করেও বটে।'

শুনে স্বাতী অবাক খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তার পর গুম হয়ে গেল। আর কোনও কথাই জিজ্ঞেস করল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা তৈরি করে ফেলে, ট্রে হাতে নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। স্বাতীর পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে ঢুকে উপাসনা দেখল, নবেন্দু ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মুখোমুখি সোফায় বসে কথা বলছে জয়দেবের সঙ্গে। ওকে দেখে নবেন্দু হেসে বলল, 'গুড মর্নিং। তোমার রিসার্চের কাজ কমপ্লিট হল উপা? নবদ্বীপ থেকে তো ডাক এসে গেল।'

উপাসনা বলল, 'না, কমপ্লিট হল না নবেন্দুদা। ইচ্ছেটাও কেমন যেন চলে গেল।' কথাটা বলেই আড়চোখে জয়দেবের দিকে তাকাল উপাসনা। স্নান সেরে নিয়েছে। খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে ওকে। পরনে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি। বোতাম খোলা বলে বুকের লোম উঁকি মারছে। ওই বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছিল ও, গাড়িতে করে আসার সময়। কথাটা মনে হতেই উপাসনার শরীরটা শিরশির করে উঠল। চোখ ফিরিয়ে ও স্বাতীর দিকে তাকাল। মুখ গোমড়া, চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছে জয়দেবকে। চোখে চোখে কথা বলার জন্য, জয়দেবের ঠিক উল্টো দিকের সোফায় গিয়ে বসল উপাসনা। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে যাতে সামাল দিতে পারে।

চায়ে চুমুক দিয়ে জয়দেব বলল, 'আহ, দারুণ। স্বাতীর চায়ের জবাব নেই।'

নবেন্দু বলল, 'তার মানে ও কোনও কারণে রেগে আছে। আমি দেখেছি, কোনও কারণে যদি স্বাতী কারও উপর চটে থাকে, সেদিন মন দিয়ে চা-টা করে। এই সাত সকালে কার উপর চটলে স্বাতী? নরেশ জেনা, না অন্য কেউ?'

স্বাতী বলল, 'চুপ করো তো। ইয়ার্কি ভাল লাগছে না।' স্পষ্টতই বিরক্তি দেখিয়ে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পর বলল, 'আমি বেড রুমে আছি। দরকার হলে ডেকো।'

ওকে আরও চটানোর জন্য উপাসনা বলল, 'বোস না স্বাতী, জয়দেব তোদের... কী যেন বলবে।'

স্বাতী বলল, 'না রে, বসতে পারব না। তোরা কথা বল। ততক্ষণে আমি বেডরুমটা গুছিয়ে ফেলি।'

স্বাতী ড্রয়িংরুম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর উপাসনা মজা করে বলল, 'নবেন্দুদা, কী এমন করেছেন যে, আমার বন্ধু এমন চটে আছে?'

নবেন্দু বলল, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। কেওনঝড়গড় থেকেই তো ফিরলাম কাল রাত একটায়। ফেরার কথা ছিল সন্ধে সাতটায়। বাড়িতে ফোন করে জানাতে পারিনি ফোনে চার্জ ছিল না বলে। সেই কারণেও রাগটা হতে পারে। কী করব বলো। হাইওয়েতে যা জ্যাম, উফ, সে এক কাণ্ড বটে!'

জয়দেব চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কেন, কোনও অ্যাক্সিডেন্ট?'

'আরে না। কে যেন গুজব রটিয়ে দিয়েছে, উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির গুম্ফাতে না কি হাজার হাজার সাধু জড়ো হয়েছেন। দিনের বেলায় তাঁদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাতের বেলায় কোত্থেকে যেন তাঁরা হাজির হচ্ছেন। কী সব হোম যজ্ঞ করছেন। তাঁরা দল বেঁধে পুরীর দিকে যাবেন। সেই সাধুদের চাক্ষুষ করার জন্য লোকে ভিড় করে আছে হাইওয়ে জুড়ে। পাগলামি ছাড়া আর কী বলব?'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো?'

'আরও শুনবে? গাড়ি থেকে নেমে আমার ড্রাইভার খোঁজ করে এসে বলল, অলৌকিক কাণ্ড। মাটির নীচ থেকে নাকি খোল করতাল বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। ওই সাধুরা না কি দিনের বেলায় মাটির নীচে থাকেন। ঠিক একশো বছর পর পর না কি কোনও এক পূর্ণিমার রাতে... মাটির তলা থেকে ওঁরা একবার করে বেরিয়ে আসেন। এই বার সেদিন তিথিটা পড়েছে মাঘী পূর্ণিমায়।'

জয়দেব বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সুশোভনদার মুখে শুনেছিলাম, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি থেকে ধবলগিরি পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গে নাকি বসবাস করেন সাধুরা। একটা বিশাল অনন্তসর্প পাহারা দেয় তাঁদের। কয়েক বছর আগে এখানকার পি ডবলু-ডি-র এক অফিসার ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে ধবলগিরি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অলৌকিক কী সব দেখে এসে তিনি নাকি পাগল হয়ে যান।'

'হতে পারে। এখানে একবার কোনও গুজব ছড়ালেই হল। কেওনঝড়গড় থেকে কী শুনে এলাম, শুনবে? সেটাও এক ইন্টারেস্টিং রিউমার। খুব শিগগির কল্কি অবতার না কি পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। কলিযুগ না কি শেষ হয়ে এসেছে। অলরেডি তার সূচনা হয়ে গিয়েছে। জাপানে সুনামিই তার প্রমাণ। এরপর একের পর এক দুর্যোগ আসবে পৃথিবীতে। সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'কোথায় শুনলে এ সব রিউমার?'

'কেওনঝড়গড়ে আমাদের কোম্পানির এক এজেন্ট আছেন। তিনি খুব পণ্ডিত মানুষ। পরশু রাতে ওঁর বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মেয়ের বিয়ের পাকা দেখা উপলক্ষে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের বাড়িতে ওঁর গুরুদেব এসেছেন। ড্রয়িংরুমে বসে আমরা টিভি দেখছিলাম। সেই সময় জাপানে সুনামির ধ্বংসলীলা দেখাচ্ছিল। তখনই গুরুদেব কথায় কথায় বললেন, ধ্বংসের সবে তো শুরু। আর কিছু দিনের মধ্যে সূর্যের দেহ থেকে একটা অংশ এসে আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। সেই সময় কল্কি অবতার হাজির হবে ধরাধামে। তিনিই সব ধ্বংস করে দেবেন। এর পর ফের সত্যযুগ শুরু হবে।'

'জিজ্ঞেস করলে না, এ সব কথা উনি জানলেন কী করে?'

'মালিকা সাহিত্যেই সব লেখা আছে।' বলেই উপাসনার দিকে তাকিয়ে নবেন্দু ঠাট্টা করে বলল, 'চট করে জয়দেবের সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেলো উপাসনা। হনিমুনেরও সময় পাবে না।' তার পর বেডরুমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বন্ধুর কী হল বলো তো? বেডরুমে এমন কী কাজ পড়ে গেছে যে, আমাদের আড্ডা ছেড়ে ওখানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?'

উপাসনা মুচকি হেসে বলল, 'আমি বলছি। কিচেনে ও জানতে চাইছিল, জয়ের সঙ্গে আমার কতটা ইন্টেমেসি হয়েছে। বলিনি, তাই বোধহয় আমার উপর রেগে আছে।'

শুনে জয়দেব আর নবেন্দু দু'জনেই হেসে উঠল। হাসি থামতেই নবেন্দু বলল, 'স্বাতী খুব সিম্পল মেয়ে, বুঝলে। ও মনে প্রাণে চায়, তোমার সঙ্গে জয়দেবের বিয়ে হোক। তোমাদের দু'জনকেই ও খুব পছন্দ করে। আমাকে কী বলে জানো, উপার মতো একটা ভাল মেয়ে যেন কোনও বাজে ছেলের পাল্লায় না পড়ে। জয়দেব ওকে খুব সুখে রাখবে।'

উপাসনা বলল, 'আমি জানি নবেন্দুদা।'

'তা হলে ওকে বললে না কেন, তোমাদের মধ্যে কতটা ইন্টেমেসি হয়েছে?'

'পরে তো বলবই। তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমাদের দুই বাড়ির মত আছে বিয়েতে।'

'আরে বাঃ, এতক্ষণ চেপে রেখেছ কেন কথাটা? কনগ্রাটস জয়দেব। আজ সবাই মিলে সেলিব্রেট করলে কেমন হয়? তোমাদের অনারে আজ আর অফিস যাব না। চলো, কোথাও লাঞ্চ করে আসি।'

জয়দেব বলল, 'লাঞ্চ নয়, ডিনার। সব খরচ আমার।'

'বেশ, তাই হবে। তোমরা বোসো। আমি দেখে আসি, আমার বউয়ের রাগ পড়ল কী না।'

নবেন্দু সোফা ছেড়ে ওঠার আগেই পর্দার পাশে স্বাতীর হাসিভরা মুখ উঁকি দিল। ওর হাতে একটা বালিশ। বোধহয় বিছানা গোছাতে গোছাতেই চলে এসেছে। দোরগোড়া থেকেই উপাসনাকে ও বলল, 'সব কানে গেছে। তুই এত স্মার্ট হয়ে গেছিস? মিথ্যুক কোথাকার।' বলতে বলতেই স্বাতী বালিশটা ছুড়ে মারল।

উনসত্তর

ওলিউড বলে যে কোনও টিভি চ্যানেল আছে, গোরা তা জানত না। হলিউড, বলিউড, টলিউডের নাম শুনেছে ও এতদিন। ওলিউডের নাম এই প্রথম শুনল, যখন টুবাই এসে বলল, 'ওলিউড চ্যানেল থেকে তোকে ইন্টারভিউ নিতে এসেছে। আসতে বলব?'

দুপুরে মন্দির থেকে ফিরে এসেই গোরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, ওর কোনও আন্দাজ নেই। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ। শুধু নীল আলোটা জ্বলছে। উত্তর না দিয়ে প্রথমেই ও জিজ্ঞেস করল,

'এখন ক'টা বাজে রে?'

'সন্ধে ছ'টা-সোয়া ছ'টা তো হবেই।'

'চল, একবার মন্দিরে যাই। সন্ধ্যারতিটা দেখে আসি।'

'না রে, মন্দিরে যাওয়া তোর ঠিক হবে না। তোকে মন্দিরে দেখলে পাণ্ডারা রিঅ্যাক্ট করতে পারে। দুপুরে ঝামেলার জের অনেকটা গড়িয়েছে। আমি মিঃ বাসুদেব পট্টনায়েককে ফোন করেছিলাম। তুই তো চিনিস, পুরীর কালেক্টর। উনি দু'জন পান্ডাকে অ্যারেস্ট করেছেন। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে পান্ডাদের একটা সেকশন মন্দিরের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জগন্নাথদেবের ভোগ হয়নি। উনি না খেয়ে সারাদিন কাটিয়েছেন। লোকাল টিভি প্রথমদিকে খবরটা পুরো পান্ডাদের দিকে টেনে দেখাচ্ছিল। কিন্তু দাসুয়ারা প্রেস ক্লাবে গিয়ে সত্যি ঘটনাটা জানিয়ে দেয়। দাঁড়া, ব্রেকিং নিউজটা তোকে দেখাই। তা হলে তুই সিচুয়েশনটা বুঝতে পারবি।'

রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে টুবাই চালু করে দিল। গোরা দেখল, টিভির পর্দায় ধ্বংসলীলার দৃশ্য। মায়ানমারে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে ৭। সেই খবর দেখাচ্ছে। এই ক'দিন আগে জাপানে ভূমিকম্প হল। আবার মায়ানমারে? এত ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আগে হত না। একটা বাচ্চা ছেলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেঁচে আছে। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে দমকলের লোকেরা। বাচ্চাকে দেখে হঠাৎ গোরার মনে পড়ল অদ্বৈতবাবুর নাতি তুতুনের কথা। টিভির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ রে, মলিদির ছেলেটা এখন কোথায়? ও ঠিক আছে?'

টুবাই বলল, 'ঠিক আছে মানে? দৌড়চ্ছে। প্রভু জগন্নাথ যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য। তোর স্পর্শে ছেলেটা শুধু বেঁচে যায়নি, ওর অসুখও সেরে গেছে। মলিদি বলছিলেন, আজ পর্যন্ত ও কোনওদিন মা বলে ডাকেনি। মন্দিরে এই প্রথম ডাকল। এতদিন মেন্টালি রিটার্ডেড ছিল। আজ দুপুর থেকে একদম নর্মাল বাচ্চাদের মতো বিহেভ করছে। অদ্বৈতবাবু যে কী খুশি, তোকে সেটা বলে বোঝাতে পারব না। একটা নাস্তিক মানুষ, তাঁকে তুই একেবারে বদলে দিয়েছিস গোরা। দ্যাখ না, ও বেলায় পুজো দিতে পারেননি বলে, এ বেলায় দাসুয়াকে নিয়ে ফের মন্দিরে গেছেন।'

'হ্যাঁরে, দাসুয়াদের সঙ্গে কি সেবাইত কমিটির লোকজনদের মারপিট হয়েছিল?'

'হাঁ। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। ভাগ্যিস দাসুয়া আজ মন্দিরে ছিল। তাই আমরা বেঁচে গেছি। ওদের এনজিও-র কেউ একজন আজ দারুণ একটা কাজ করেছে। মন্দিরে ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা মানা, তুই তো জানিস। কিন্তু দাসুয়াদের একজন, সিক্রেট ক্যামেরা দিয়ে পুরো ইন্সিডেন্টটা তুলে রেখেছিল। ওরাই ওলিউড চ্যানেলকে ভিডিও ফুটেজ সাপ্লাই করেছে। দাসুয়া বলল, ওরা ঠিক করেই রেখেছিল, মন্দিরের ভেতর কারা অসভ্যতা করে, তার প্রমাণ ক্যামেরায় তুলে রাখবে। সেই সুযোগটা আজ পেয়ে গেল। পুলিশ তো টিভি-র খবর দেখেই পান্ডাকে ধরেছে। ওরা পদ্মনাভ পান্ডার লোক। এই লোকটা কে জানিস? ওই যে... যার মেয়ে নিখোঁজ, অথচ পুলিশে কমপ্লেন করেনি।'

টুবাইয়ের কথাগুলো শেষ হতেই গোরা দেখল, টিভিতে ব্রেকিং নিউজ বদলে গিয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের ছবি দেখানো হচ্ছে। আরে...এ তো ওর ছবি। দু'হাত তুলে নাম সংকীর্তন করছে। ওর আশপাশে প্রচুর লোকের ভিড়। পর্দায় বারবার ওর ছবি ফ্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে। আর ছবির উপর বড়োবড়ো করে লেখা বেরিয়ে আসছে, 'কে এই মহাপুরুষ?' বারকয়েক এই লেখাটা দেখানোর পর পর্দায় একটা মেয়ের মুখ ভেসে উঠল। সে বলল, 'নমস্কার... আমি রিমা রথ... শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান... কে এই মহাপুরুষ? আজ দুপুরে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এক মৃত বাচ্চাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন এক মহাপুরুষ। কে ইনি? ইদানীং কেন তাঁকে মন্দিরে দেখা যাচ্ছে? সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিয়োতে আজ উপস্থিত হয়েছেন মালিকা সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মৃগাঙ্ক মহাপাত্র এবং বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী সংগঠনের মহাসচিব সুকান্ত মোহান্তি।

পর্দায় প্রবীণ দুই ভদ্রলোকের ছবি ভেসে উঠল। অ্যাঙ্কর মেয়েটি দু'জনের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'নমস্কার মৃগাঙ্কবাবু। জগন্নাথ মন্দিরে আজ একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একমাত্র আমাদের চ্যানেলই... এক্সক্লুসিভ সেই ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখিয়েছে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি পুরো ঘটনাটি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললে, 'এ ধরনের ঘটনা যে ঘটবে, তা আগেই আমরা জানতাম। মালিকা সাহিত্যে এর উল্লেখ রয়েছে। কলিযুগের শেষে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। তিনিই পাপাচারে ক্লান্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন। সেই কারণে আপনাদের চ্যানেলে খবরটা দেখে আমি অন্তত অবাক হইনি। মহাপুরুষ বলে যাঁর ছবিটি আপনারা বারবার দেখাচ্ছেন, জুম করুন, তা হলে দেখবেন, পাঁচশো বছর আগের এক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত মিল আছে।'

রিমা বলে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কার কথা বলছেন? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব?'

'হ্যাঁ, আমি তাঁর কথাই বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঁচশো বছর পর তিনিই ফিরে এসেছেন মানুষকে উদ্ধার করতে। লক্ষ করেছেন কি, মানুষ কত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কত লোভী, হিংস্র এবং স্বার্থপর হয়ে গেছে? দ্বাপর যুগের শেষে ঠিক এইরকম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। যাদবকুল বিনষ্ট হয়েছিল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে। কলিযুগের

শুরুতেও কলির অত্যাচারে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কলির জন্মই হয়েছিল ক্রোধের ঔরসে হিংসার গর্ভে। তার শাসনকালে পৃথিবী থেকে যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি ধর্মকর্ম অন্তর্হিত হয়ে গেছিল। বেদাদিশাস্ত্র বিলুপ্ত। যজ্ঞ না হওয়ায় দেবগণ অনশনে মুমূর্ষপ্রায়। তাঁরা তখন শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাঁদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তিনি কল্কি নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করবেন শম্বল নামে এক গ্রামে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদশার ঔরসে বসুমতীর গর্ভে। তাঁর আবির্ভাবের পরই সত্যযুগের সূচনা হবে।'

'আপনি কি মনে করেন...ইনিই কল্কি অবতার হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন?'

'হতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত নই। আমি যতদূর জানি, মালিকা সাহিত্যে শম্বল বলে যে গ্রামটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি এখনকার সম্বলপুর। বহু বছর আগে ওখানকার একটা পরিবারের কথা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। বিষ্ণুদশা নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী বসুমতী নাকি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমি তখন থাকতাম কটকে। কাগজে ঘটনাটা জানার কয়েকদিন পর আমি ছুটে যাই সম্বলপুরে। গিয়ে শুনি, ওই পরিবারটি ওখানে নেই। কয়েকজন সাধু এসে না কি পুত্র সন্তানসহ ওই পরিবারটিকে নিয়ে গিয়েছেন গোপন কোনও স্থানে।'

রিমা বলে মেয়েটা এ বার সুকান্তর দিকে ঘুরে তাকাল। সুকান্ত মিটিমিটি হাসছে। তা লক্ষ করে রিমা জিজ্ঞেস করল, 'মন্দিরের পুরো ঘটনাটা শুনে আপনার কী মনে হচ্ছে সুকান্তবাবু?'

'পুরো ব্যাপারটাই বোগাস। প্রথম কথা মন্দিরের ভেতর বাচ্চা ছেলেটা যে মারা গিয়েছিল, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ কারও হাতে নেই। হয়তো মারধর খেয়ে ছেলেটা অচেতন হয়ে পড়েছিল। কীর্তনের সময় চেঁচামেচিতে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। আমরা যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করি না...'

'কিন্তু মন্দিরের ভেতর তখন একজন ডাক্তার হাজির ছিলেন। তাঁর বাইট আমরা দেখিয়েছি।'

'সেটাও আমি দেখেছি। কিন্তু তিনি যে আদৌ ডাক্তার তার কোনও প্রমাণ আছে? মৃগাঙ্কবাবু যাকে মহাপুরুষ বলে চালানোর চেষ্টা করছেন, তাকে আমি চিনি। গোরা... আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। পরে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় চলে যায় পড়াশুনা করতে। শুনেছি ও এখন দলিত পার্টি করে। পুলিশের ভয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে পুরীতে রয়েছে। এখানে দলিত পার্টির সমাবেশ করতে চায়। ওর বাবার নামও বিষ্ণুদশা নয়। মায়ের নাম আমি জানি...বিশাখা ভোই। যিনি একসময় জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। আমার তো মনে হয়, পুরো ঘটনাটাই গোরার পূর্বপরিকল্পিত। চট করে যাতে বিখ্যাত হতে পারে, সেজন্য মন্দিরের ভেতর নাটক সাজিয়েছে। যাকে আপনারা ডাক্তার বলে চালানোর চেষ্টা করছেন, খোঁজ করে দেখুন, সে হয়তো গোরার পার্টির কোনও লোক। আপনাদের উচিত ছিল আজ গোরাকে এখানে ডাকা। তা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা যেত, বাচ্চা ছেলেটার সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে ওর কী উদ্দেশ্য আছে।'

রিমা মেয়েটা বলল, 'আমরা চেষ্টা করছি, ওঁকে যাতে ফোনে ধরা যায়। কিন্তু সুকান্তবাবু, ছেলেটার মা আমাদের বলেছেন, মার খাওয়ার পর বাচ্চাটার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল না...'

এই পর্যন্ত শোনার পর টুবাই টিভিটা বন্ধ করে দিল। তারপর রাগত স্বরে বলল, 'সুকান্তটা আর বদলাল না। ছি, ছি, মাসিমা যদি এই প্রোগ্রামটা দেখেন, তা হলে কী ভাববেন বল তো? থাক, এই কন্ট্রোভার্সিতে তোর জড়ানোর দরকার নেই গোরা। টিভি-র ছেলেটাকে আমি বলে দিচ্ছি, চলে যেতে। তোকে ইন্টারভিউ দিতে হবে না।'

গজগজ করতে করতে টুবাই ঘর থেকে উঠে গেল। ওর রাগ দেখে গোরা মুচকি হাসল। সুকান্তকে বহুদিন পর ও দেখল। এই সেই সুকান্ত, যার সঙ্গে টুবাইয়ের আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল। টুবাই মহাপ্রভুর বংশের ছেলে বলে স্কুলে আলাদা খাতির পেত মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে। সেটা সহ্য করতে পারত না সুকান্ত। টুবাইকে বাঙালি বলে টিটকিরি মারত। ওর ভয়ে টুবাই বাংলায় কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। গোরা শুনেছে, কলেজ লাইফে সুকান্ত নিজেকে কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিত। ও বলত, ধর্ম হল আফিংয়ের মতো। জগন্নাথদেব সম্পর্কে তখন প্রকাশ্যেই যা-তা বলত। সেই কারণেই নাকি ওর বাবা ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। সুকান্ত নাকি কিছুদিন আগে, মন্দিরে ফের দেবদাসী প্রথা চালু করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছিল মহিলা সমিতির সঙ্গে।

সুকান্তকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে গোরা অবাকই হল। সুকান্ত তা হলে ওর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে। না হলে বলতে পারত না, পুলিশের ভয়ে ও কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বরে পালিয়ে এসেছে। সত্যি বলতে কী, সুকান্ত একটু আগে টিভিতে যা বলল, তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। হয়তো তুতুন ছেলেটা তখন সত্যিই সেন্সলেস হয়ে ছিল। ডাক্তার বলে তখন যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, হয়তো তিনিই ভুল করেছিলেন বুঝতে। নিজেকে তো গোরা ভাল করে জানে। ওর ভেতর এমন কোনও শক্তি নেই, যাতে একটা মৃত বাচ্চার জীবন ও ফিরিয়ে দিতে পারে। একটু আগে টুবাই বলছিল বটে, গোরা তোর স্পর্শে ছেলেটার রোগ সেরে গেছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? টিভির সাংবাদিকরা পারেনও বটে, তিলকে তাল করে দেখাতে। যাচাই করার কোনও বালাই নেই। একটা খবর চালিয়ে দিতে পারলেই হল। মুশকিল হল, টিভির দৌলতে লোকের মুখে মুখে এই কথাগুলো ছড়িয়ে গিয়েছে। সবাই বিশ্বাসও করে নেবে, ঘটনাটা সত্যিই অলৌকিক।

মনে মনে অপরাধবোধে ভুগতে থাকল গোরা। জগন্নাথ মন্দিরে স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠান করছেন। এ সব অলৌকিকত্ব তাঁকেই মানায়। তুতুনের সত্যিই যদি পুনর্জীবন হয়ে থাকে, তা হলে প্রভু জগন্নাথের কৃপাতেই তা হয়েছে। ফাঁকতালে ও সেই কৃতিত্বটা নিতে যাবে কেন? কথাটা ভাবতেই গোরার ভেতরটা ছটফট করে উঠল। নাহ, টিভিতে এই কথাগুলো ওর বলে দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে লোকের ভুল ভেঙে দেওয়া যেত। একটা তীব্র অস্বস্তি ওকে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। একটু আগে টিভিতে মৃগাঙ্কবাবু বলে একজন

অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব না কি পাঁচশো বছর পর ওর মধ্যে ফিরে এসেছেন। ও কল্কি অবতারও হতে পারে। কথাবার্তা শুনে তখন অবশ্য মনে হচ্ছিল, মৃগাঙ্কবাবু শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু এমন বোকা বোকা কথাবার্তা বলছিলেন কেন তা হলে? অবতার কী, উনি জানেন না?

বিছানা থেকে নেমে, দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল গোরা। সন্ধে নেমে এসেছে। দূরে সী বিচের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জন শোনা যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোরার হঠাৎই বাবার কথা মনে পড়ল। ভুবনেশ্বরে ওদের বাড়ির নাটমন্দিরে বসে যখন বাবা শ্লোক আবৃত্তি করতেন, তখন বাবার গলা গমগম করত। বাবা ওকে দশাবতার স্তোত্রম আবৃত্তি করতে শিখিয়ে ছিলেন। 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং। বিহিতবহিত্রচরিত্রমদেম্।। কেশব ধীতমীনশরীর-জয় জগদীশ হরে।। ক্ষিতিরতিবিপলুতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।'

বাবা বাংলায় অনুবাদ করে শোনাতেন শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম কাব্যে কবি জয়দেবের লেখা ওই সংস্কৃত শ্লোক। 'যে বেদে তোমার চরিত্র ভবসাগরের তরণীরূপে উপদীষ্ট হয়েছে, সেই বেদকে প্রলয়ের জলরাশির মধ্যেও তুমি অনায়াসে ধারণ করে রেখেছিলে, মৎস্যরূপে ধরে নৌকারূপী হয়ে। হে কেশব, হে মৎস্যরূপী, হে জগদীশ্বর, হে হরি। তোমার জয় হোক।' বাবা বলতেন, 'জানিস গোরা, এই পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ভগবান স্বয়ং অবতার হয়ে ধরাধামে নেমে আসেন। যে আধারে তিনি প্রকটিত হন, তিনিই হলেন তাঁর অবতার। পৃথিবীতে এসে তিনি প্রাণীসকলকে উদ্ধার করেন। সৃষ্টির পর থেকে ভগবান মৎস্য, কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ-বলরাম, বুদ্ধদেব রূপে মোট নয়বার পৃথিবীতে এসেছেন। এ বার আসবেন কল্কি অবতার হয়ে। ম্লেচ্ছদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য। দশাবতার স্তোত্রম রোজ আবৃত্তি করবি গোরা। এতে তোর চিত্তশুদ্ধ হবে।'

গোরা বুঝতে পারত না, মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান পশুরূপে অবতার হয়ে আসবেন কেন? মাছ, কচ্ছপ, শুয়োর এ তো সব তুচ্ছ প্রাণী। এদের পুজো করবে কেন মানুষ? প্রশ্নটা একদিন বাবাকে করায়, উনি বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীর সব কিছুই সেই একই ব্রহ্ম। দেবতা-মানবে, পশু-পক্ষীতে, নদী-সমুদ্রে, বন-উপবনে, পাহাড়-পর্বতে, কোনও ভেদ নেই রে। ভগবান যেমন আমাদের মধ্যে আছেন, তেমনই পশুপাখি, সব জড়াজড় বস্তুতেই বিরাজ করছেন। আসলে কী জানিস, তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই প্রয়োজন আছে বলে সৃষ্টি করেছেন। মাছ, কচ্ছপ, বরাহ এ সব তুচ্ছ প্রাণী বলে উড়িয়ে দিস না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপদের দিনে, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু কাজে লেগেছিল। এই যে মৎস্য অবতারকে নিয়ে যে শ্লোকটা তুই আবৃত্তি করিস, তার কাহিনি তুই জানিস?'

গোরা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না।

'পরে একদিন শুনে নিস আমার কাছ থেকে। তবে এই অবতার তত্ত্বকে নিছক ধর্মীয় কাহিনি বলে উড়িয়ে দিস না। এর পিছনে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি আছে। স্কুলে তোদের

কি থিওরি অব এভোলিউসন পড়িয়েছে? তা হলে বুঝতে পারবি, চার্লস ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের সঙ্গে অবতার তত্ত্বের কোথায় যেন মিল আছে। এই পৃথিবীতে প্রাণীদের উদ্ভব হওয়ার তত্ত্বটা হল, ছোট প্রাণী থেকে আস্তে আস্তে বড় প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ং ভগবানও ছোট প্রাণী থেকে ক্রমশ বড় প্রাণীর দেহ ধারণ করে পৃথিবী রক্ষা করছেন। প্রথমে মাছ, তারপর কচ্ছপ, তারও পর বরাহ। বড় হয়ে আরও যখন পড়াশুনা করবি তখন জানবি, এই পৃথিবীতে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স রাখার জন্য সব প্রাণীকেই দরকার হয়। পশুপাখি জাতীয় প্রাণীকে যাতে কেউ ধ্বংস করে না ফেলে, সেই কারণেই ভগবান মাঝে মাঝে তাদের আকার ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছেন। এই যে দেবতাদের বাহন কোনও পশু বা পাখি। কেন বল তো? কেন গণেশের বাহন ইঁদুর, বা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। তার কারণ মানুষকে একটা থ্রেট দিয়ে রাখা। এরা দেবতার বাহন, এদের মেরে ফেলো না। তা হলে দেবতা পাপ দেবে।'

বহুদিন পর বাবার কথাগুলো মনে পড়ায় গোরার চোখের কোণ ভিজে এল। অবতার তত্ত্ব নিয়ে পরে ও অনেক পড়াশুনা করেছে। বাবার বলা কথাগুলো মিলিয়েও দেখেছে। কত সহজ করে কথাগুলো বলতেন তখন বাবা। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে, সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, গোরা একবার নীচের দিকে তাকাল। হোটেলের সামনে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। আরে, এই মানুষগুলো কারা? ভাল করে তাকাতেই গোরা দেখল নীচের মানুষগুলো ওর দিকেই হাতজোড় করে আছে। আশ্চর্য, মানুষগুলো ওর জন্যই নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে না কি? অজানা আশঙ্কায় গোরার শরীর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ নেমে গেল। নিশ্চয়ই টিভিওয়ালাদের গিমিক। টিভিতে হয়তো বলে দিয়েছে, ও হোটেল গম্ভীরায় রয়েছে।

নাহ, পুরীতে আর থাকা যাবে না। পালাতে হবে। না হলে এই ধর্মান্ধ মানুষগুলো ওকে পাগল করে দেবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেই ও হুটারের শব্দ শুনল। লাল আলো জ্বালিয়ে কতকগুলো গাড়ি এগিয়ে আসছে হোটেলের দিকে। ভিড় করে থাকা মানুষ সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। তৃতীয় গাড়ি থেকে যিনি নেমে এলেন, তাঁকে দেখে গোরা অবাক হয়ে গেল। তিনি আর কেউ নন। চিফ মিনিস্টার প্রতাপ পট্টনায়ক।

সত্তর

গায়ের ধুলো ঝেড়ে আগে উঠে দাঁড়াল আত্মানন্দ। তারপর আদেশ করার সুরে বলল, 'চলো পুরন্দর, এখুনি এদের হেড কোয়ার্টার্সে ঢুকে যাই। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমাদের কাজ সারতে হবে। পুলিশ আসার আগেই। হারি আপ।'

লাফ দিয়ে পুরন্দর উঠে দাঁড়াল। না, শরীরের কোথাও চোট লাগেনি। সামনে তাকিয়ে দেখল, দেওয়ালটা উড়ে গিয়েছে। কিন্তু ধুলো আর ধোঁয়ায় ওদিকের কিছু দেখা যাচ্ছে

না। ধোঁয়া নাকে ঢুকে যাওয়ায় পুরন্দর খকখক করে কাশতে শুরু করল। একটু পরে কাশির দমক থামতেই ও দেখতে পেল, মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে কিছু ক্ষতবিক্ষত দেহ। শ্বেতপাথরের মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আশপাশের খিলান ভেঙে পড়েছে। যে চেয়ারে খানিক আগে পদ্মনাভ বসেছিলেন, সেটা উড়ে গিয়ে আটকে রয়েছে ছাদের কার্নিশে। আকাশ দেখা যাচ্ছে।

আত্মানন্দ ওর দিকে একটা মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা মুখে আটকে নাও। শিগগির, এদের অফিস ঘরে যে করেই হোক, আমাদের পৌঁছতে হবে।' কথাগুলো বলেই নিজে মাস্ক পরে নিয়ে লাফ দিয়ে ও সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আত্মানন্দকে স্থির, অবিচল থাকতে দেখে পুরন্দর অবাক হয়ে গেল। আশপাশে মৃতদেহের খণ্ডাংশ পড়ে আছে। মশালের আগুনে হলঘরের একটা দিক জ্বলছে। সেই আলোয় পুরন্দর বিম্বিসারের মুন্ডুটা আবিষ্কার করল। মাত্র বারো ঘণ্টা আগে ও বিম্বিসারের গলা টিপে ধরেছিল। এই একটু আগেই ওকে দেখল, ভিড়ের মাঝে উঠে দাঁড়াতে। পাপের শাস্তিভোগ করে সেই বিম্বিসার এখন খণ্ডিত দেহে পড়ে আছে মেঝেতে।

করিডোর দিয়ে আত্মানন্দ দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিম্বিসারের কথা ভুলে পুরন্দর আত্মানন্দের পিছু নিল। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডান দিকে একটা ঘরের দিকে ওর চোখ গেল। মশালের আলো নয়, অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে হালকা নীলাভ একটা আলো ঠিকরে বেরচ্ছে। আরে, এই তো সেই কাচের বাক্স, যার ভেতর একটা কঙ্কাল শোয়ানো আছে। ছাদের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে কাচের বাক্সে। কিন্তু কঙ্কালটা অবিকৃত রয়েছে। শুধু পায়ের দিকটা হেলে পড়েছে নীচের দিকে। কাঁধে হালকা টোকা মেরে ঘরের দিকে আত্মানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পুরন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি, এই কঙ্কালটা কার? কেন এরা যত্ন করে এতদিন রেখে দিয়েছে?'

দু'জনে কাচের বাক্সের কাছে গিয়ে ভাল করে তাকাল। পুরন্দর লক্ষ করল, আত্মানন্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন চিন্তা করছে। তারপরই পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে ও কাকে যেন মেসেজ পাঠাতে শুরু করল। গতকাল এই বাক্সটাকে পুরন্দর হলঘরে দেখেছিল। বিম্বিসাররা এত ভারী বাক্সটাকে এতদূর নিয়ে এল কীভাবে? কথাটা মনে হতেই পুরন্দরের চোখে পড়ল, বাক্সটা কাঠের ক্যাবিনেটে বসানো, তার তলায় চাকা লাগানো রয়েছে। ক্যাবিনেট আর কাচের বাক্স—দু'টোই হালফিলের। অর্থাৎ কাচের বাক্সটাকে এরা ঠেলে যে-কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আত্মানন্দ মেসেজ পাঠাতে ব্যস্ত। কঙ্কালের পা হেলে রয়েছে দেখে, পুরন্দর হাত দিয়ে সেটা সোজা করে দিতে গেল।

আর তখনই প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করল শরীরে। কঙ্কাল স্পর্শ করা মাত্রই ও শরীরে মারাত্মক একটা শক্ খেল। চোখের সামনে তীব্র সাদা আলোয় ঝলসে গেল পুরন্দরের। কে যেন প্রবল আকর্ষণে ওকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল আলোর কেন্দ্রে। অনেকটা যাওয়ার পর কোথাও যেন ধুপ করে আছড়ে পড়ল পুরন্দর। চোখের সামনেটা স্বচ্ছ হতেই ও দেখল,

সময় অপরাহ্ণ। তবুও সুসজ্জিত এক পালঙ্কে ও ঘুমিয়ে আছে। ওর বিছানার পাশে মদের পাত্র। বোঝাই যাচ্ছে, মদ্যপান করতে করতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আত্মানন্দ ওকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করছে। চোখ খুলে বিরক্তি প্রকাশ করল ও। আত্মানন্দ ওকে বলল, 'ভাই জগাই, জানলা দিয়ে দ্যাখ, টুলো পণ্ডিতটা কেত্তন করতে করতে দলবল নিয়ে এদিক পানেই আসছে। চল, ওকে নিয়ে আজ এট্টু তামাশা করি।'

কে জগাই? পুরন্দর বুঝতে পারল না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে ও দেখল, একদল লোক হরিধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। খোল, করতাল, শঙ্খ, ভেরি বাজিয়ে। ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণ বুঝে, ক্রুদ্ধ হয়ে ও বলল, 'আমার বাড়ির সামনে হল্লাগল্লা? বড্ড বার বেড়েছে পণ্ডিতের। চল মাধাই, আজ ওকে শিক্ষে দিতে হবে।'

দু'জনে মিলে ওরা বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। ওকে আর আত্মানন্দকে দেখে দলটা উচ্চস্বরে কীর্তন করতে লাগল। ওদের থামিয়ে দিয়ে আত্মানন্দ বলল, 'তোদের এত দুঃসাহস, জগাই-মাধাইয়ের বাড়ির সামনে খোল করতাল বাজাচ্ছিস?'

দলের ভিতর থেকে একজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে বলল, 'ওরে মাধাই, আয়, তুইও আমাদের সঙ্গে খোল করতাল বাজা। হরির নাম কর। হরির নামে সব পাপ স্খালন হয়ে যায় রে।' বলতে বলতে সন্ন্যাসী কাঁদতে লাগল। দেখে পুরন্দর খুব অবাক হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর কি এতটুকুও ভয়ডর নেই? আত্মানন্দকে মারমুখী হতে দেখেও অবিচল রয়েছে কী করে? সন্ন্যাসীকে কাঁদতে দেখে পুরন্দরের মনটা একটু নরম হয়ে গেল। তখনই ও দেখল, আত্মানন্দ রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে। রাস্তা থেকে কলসির কাণা তুলে নিয়ে ও ছুঁড়ে মারল সেই সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীর কপাল ফেটে, ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। আত্মানন্দ ফের আঘাত করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে হাত ধরে থামিয়ে পুরন্দর বলল, 'দাঁড়া মাধাই, আর না। সন্ন্যাসীকে মারার মধ্যে কোনও পৌরুষ নেই।'

আশ্চর্য, মার খাওয়ার পরও সন্ন্যাসী আনন্দে নেচে যাচ্ছে। নাচতে নাচতেই বলল, 'তোদের দুর্গতি যে আর সহ্য করতে পারছি না ভাই। আমাকে মারলি, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। একবার বল, আমার সঙ্গে অন্তত একবার বল, হরি হরি।'

ঘোরের মধ্যে পুরন্দর দেখল, ভিড়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ গোরাভাই বেরিয়ে এল। ভয়ানক ক্রুদ্ধ। ওকে বলল, 'এত পাপ করেও তোদের পাপের পিপাসা মেটেনি। নিত্যানন্দ তোদের কী ক্ষতি করেছিল যে ওকে তোরা মারলি? তোদের যদি এতই মারার ইচ্ছে, তা হলে আমাকে মারলি না কেন? পাপাত্মা, তোদের পাপের ঘট পূর্ণ হয়ে গেছে। এ বার শাস্তি পাওয়ার জন্য তৈরি হ।'

কথাগুলো বলেই গোরাভাই চিৎকার করে উঠল, 'চক্র, চক্র।' সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা আগুনের গোলা ছুটে আসতে লাগল ওর দিকে। দেখে পুরন্দর মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল। তখন নিত্যানন্দ নামের সেই সন্ন্যাসী কেঁদে আকুল হতে লাগল। গোরাভাইয়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে সে বলল, 'প্রভু কর কী? সব ভুলে গেলে? তুমি না বলেছিলে, এই অবতারে চক্র ধরবে না। ভক্তিরসে ডুবিয়ে পাপীদের উদ্ধার করবে। জগাই মাধাইকে

যদি বধই করো, তা হলে ওরা উদ্ধার পাবে কী করে? প্রভু আমি বলছি, ওদের ক্ষমা করে দাও।' কীর্তনের দলের সবাই মিলে গোরাভাইকে একই অনুরোধ করতে লাগল।

চোখের সামনে এসব কী হচ্ছে, পুরন্দর কিছুই বুঝতে পারছে না। গোরাভাইকে কেন এই সন্ন্যাসীরা প্রভু বলে সম্বোধন করছে, কেনই বা ওর নাম জগাই, পুরন্দরের মাথায় ঢুকল না। নিত্যানন্দ নামের সন্ন্যাসীর দিকে ও তাকিয়ে রইল। এ কেমন ধারার সন্ন্যাসী? মার খেয়েও ব্যথা পায় না। উল্টে যে লোকটা মারল, তার হয়ে ক্ষমা চায়? গোরাভাইয়ের পা দুটো ধরে সন্ন্যাসী বলতে লাগল, 'জগাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে প্রভু। অন্তত ওকে তুমি কৃপা করো।'

শুনে গোরাভাইয়ের মুখ থেকে কঠিনভাব উধাও। বলল, 'সে কী, ও কখন তোমার প্রাণরক্ষা করল?'

সন্ন্যাসী বলল, 'এই তো এখুনি। মাধাই যখন দ্বিতীয়বার আমাকে মারতে আসে, তখন এই জগাই ওকে বাধা দিয়েছিল। ওকে তিরস্কার করেছিল।'

গোরাভাই বলল, 'তাই না কী? ওরে জগাই, আজ থেকে আমি তোরই হয়ে গেলাম।' কথাগুলো বলে গোরাভাই ওকে জড়িয়ে ধরল। সেই আলিঙ্গনে পুরন্দরের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে ও রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল।... অনেকক্ষণ পর ও যখন চোখ খুলল, তখন রাত হয়ে গিয়েছে। কানের কাছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। চাঁদের আলোয় পুরন্দর দেখল, গঙ্গার ঘাটে ও শুয়ে আছে। এক বলশালী লোক ওকে কোলে তুলে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে নেমে যাচ্ছে। ও কি তা হলে মারা গেছে? তা কি করে হয়? ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখল, গঙ্গার পারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্নান করতে নেমেছে গোরাভাইও। কে যেন ওর আর আত্মানন্দের হাতে তামা তুলসী তুলে দিল। গোরাভাই জোরে জোরে বলতে লাগল, 'ওহে মাধব, ওহে জগন্নাথ, তোমরা আজ পর্যন্ত যত পাপ করেছ, তামা-তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়ে সেই পাপ আমাকে উৎসর্গ করে নিষ্পাপ হও।'

শুনে পুরন্দরের বুকের ভেতরটা গলে গেল। চোখ খোলার পর থেকেই ওর ভেতরটা আনন্দে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে। মন থেকে হিংস্র ভাবটা উধাও। গোরাভাইয়ের স্পর্শে যেন ওর নবজন্ম হয়েছে। হঠাৎই ওর মনে হল, ওর পাপ অন্যকে ও দান করা কি উচিত হবে? না, এ সম্ভব না। বহু বছর ধরে নবদ্বীপের মাটিতে ও আর আত্মানন্দ মিলে বহু অন্যায় আর অত্যাচার করেছে। লোকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। যবনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। নিজেরা মদ্যপান করে, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়েছে নিরীহ মানুষদের। জাতধর্ম নষ্ট করেছে তাদের। ওদের পাপের তো সীমা নেই। সেই পাপের শাস্তি ওদেরই বহন করা উচিত। কয়েক লহমায় সেসব ভেবে পুরন্দর বলল, 'মাফ করো প্রভু। লোকে তোমাকে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করে। তোমাকে আমার পাপ দিতে পারব না।'

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ গোঁ ধরে থাকতে পারল না পুরন্দর। কথার যুদ্ধে হেরে গেল।

একটা সময় গোরাভাই বলল, 'তোদের সব পাপ আমি গ্রহণ করলাম।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোরাভাইয়ের সোনার বর্ণ কালো হয়ে গেল। দেখে পুরন্দর চমকে উঠল।

...'পুরন্দর, আরে এই পুরন্দর, তুমি এখানে করছটা কী? কখন থেকে তোমাকে আমি খুঁজে বেরাচ্ছি।' আত্মানন্দের কথায় ঘোর কেটে গেল পুরন্দরের। 'এই কঙ্কালটার আসল রহস্য আমি জেনে গেছি। যে করেই হোক, কাচের বাক্সটাকে আমাদের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।'

আত্মানন্দের কথায় পুরন্দর বাস্তবে ফিরে এল। ওর মনে পড়ল, কেন ওরা পাতাল ঘরে এসেছে। ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইস, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিষ্ণু মন্দিরে কাজ সেরে দ্রুত ওদের বেরিয়ে পড়া দরকার। ধাতস্থ হয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যটা কী করে জানলে?'

আত্মানন্দ বলল, 'এ আর এমন কী কঠিন? এখানে থেকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। নবদ্বীপ কেন্দ্র থেকে ওরা আমাকে রহস্যটা জানিয়ে দিল। শুনলে তুমি চমকে উঠবে। আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের সব কেন্দ্রের রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে পারো।'

'হেঁয়ালি না করে আসল কথাটা বলো তো?'

'এটা তাঁরই কঙ্কাল, যাঁকে পদ্মনাভরা এতদিন তোমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে।'

'তুমি সিওর?'

'আমাদের রিসার্চারদের ধারণা তো তাই। তবে ফরেনসিক পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। ভুবনেশ্বরে নরেশ জেনা বলে একজন ফরেনসিক এক্সপার্ট আছেন... এখন রিটায়ার্ড... তাঁকে তুলে আনতে বলে দিলাম। তিনিই পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন, সত্যিটা কী? কিন্তু এই কাচের বাক্সটা আগে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ডিএনও পরীক্ষা করতে হবে। অনেক কাজ বাকি।'

আত্মানন্দের কথা শুনে পুরন্দর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। লোকটা কত কী জানে? ও হাঁ করে কাচের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইল। এত বড় একটা বাক্স এখান থেকে চক্রতীর্থে নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আবার আত্মানন্দের পক্ষে অসম্ভবও নয়। পুরন্দর এটা ভেবেই অবাক হয়ে গেল, পাঁচশো বছর ধরে একটা কঙ্কাল এমন অবিকৃত থাকতে পারে কী করে? প্রাকৃতিক কারণেই তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই আত্মানন্দ বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? আগেকার দিনে তোমাদের দেশের মানুষ হয়তো এমন কোনও ভেষজ পদার্থের কথা জানতেন, যা মাখিয়ে রাখলে কোনও কিছু নষ্ট হয় না। সেটাও আমরা বুঝতে পারব, লস অ্যাঞ্জিলেস থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে। যাক সে সব কথা। সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। আমার সঙ্গে তুমি হাত লাগাও। চট করে কাচের বাক্সটাকে দেওয়ালের ও প্রান্তে নিয়ে যাই চলো।'

পুরন্দর বলল, 'হেড কোয়ার্টার্সে ব্লাস্ট করবে না?'

'দরকার নেই। যা ড্যামেজ হওয়ার, একটা গ্রেনেডে তা হয়ে গেছে। এদের হেড

কোয়ার্টার্সে আসল জায়গাটা আমি খুঁজে পেয়েছি। মেন সার্ভারের কাছেও পৌঁছে গেছিলাম। সেখান থেকে হার্ড ডিস্কটা খুলে এনেছি। এই ডিস্কটাতে সব ডাটা রেকর্ড করা আছে। আমার আশ্রমে গিয়ে হার্ড ডিস্কটা আমাদের মেন সার্ভারে লাগিয়ে দিলেই এদের হাঁড়ির খবর পেয়ে যাব।' বলেই চুপ করল আত্মানন্দ। তারপর কান খাঁড়া করে কী যেন শুনে ফের বলল, 'বিষ্ণু মন্দিরের ওপর অনেক লোকজনের আওয়াজ পাচ্ছি। পুলিশ হয়তো এতক্ষণে ব্লাস্টের কথা জেনে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীচে নেমে আসবে। তার আগেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। এখন আমাকে একটু সাহায্য করবে চলো।'

দু'জনে মিলে কাচের বাক্সটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে হাঁটতে লাগল সুড়ঙ্গ পথের দিকে। দেওয়ালের এ পাশে চলে আসার সময়ই পুরন্দর দেখতে পেল, অন্ধকারের মধ্যে কে একজন উঠে বসেছে। বিস্ফোরণে হয়তো মরেনি, আঘাত পেয়ে এতক্ষণ অচেতন ছিল। লোকটা উঠে বাধা দেওয়ার আগেই আত্মানন্দ বাঁ হাতে গুলি করল। ওর রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে। খুট করে একটা আওয়াজ হল। লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালের ও পাশে। আত্মানন্দের অভ্রান্ত নিশানা দেখে পুরন্দর মনে মনে তারিফ করল।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে টর্চের আলো ফেলে দ্রুত পায়ে ওরা এগোতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত বোধ করল। গ্রেনেড বিস্ফোরণে এদিকেও অনেক জায়গায় পাথরের চাঙড় খসে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয় না। প্রাকৃতিক কারণেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছাদ ঝুলে ছিল। বিস্ফোরণের কম্পনে নানা জায়গায় জীর্ণ অংশগুলো খসে পড়েছে। সেসব এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে নাটমন্দিরের কাছে পৌঁছে আত্মানন্দ বলল, 'এখানে একটু বিশ্রাম নিলে কেমন হয় পুরন্দর?'

সঙ্গে সঙ্গে কাচের বাক্সটা ওরা নামিয়ে রাখল। নাটমন্দিরের সিঁড়িতে বসে হাঁফ ছাড়ল পুরন্দর। কাঁধের কাছটা টনটন করছে। লজ্জায় সে কথা বলতে পারছিল না ও আত্মানন্দকে। সিঁড়িতে বসে ও পা দুটো ছড়িয়ে দিল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, চারপাশ থেকে ইঁদুরের দল সারি দিয়ে দেবালয়ের দিকে যাচ্ছে। তার মানে বিস্ফোরণে ইঁদুরগুলো বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কিন্তু এত ইঁদুর দেবালয়ের দিকে যাচ্ছে কেন? চোখের ইঙ্গিতে সেটা পুরন্দরকে দেখাতেই, ও লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তুমি একটু বোসো। এরা কোথায় যাচ্ছে, দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখে আসছি।' পিঠের ব্যাগ থেকে আত্মানন্দ তখন জলের বোতল বের করেছিল। নিজে জল না খেয়ে বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ও উঠে গেল দেবালয়ের দিকে।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে পুরন্দরের। ঢকঢক করে বোতলের অর্ধেক জল ও গলায় ঢেলে দিল। একটু পরেই ওর সারা শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথার ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল। কয়েকদিন আগে এই সিঁড়িতে বসেই ওর ঘুমঘুম পেয়েছিল। সে কথা মনে হতেই পুরন্দর হাত পা ছেড়ে দিল। হঠাৎ এ রকম হল কেন? জলের ভেতর কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল আত্মানন্দ? কথাটা মনে হওয়া সত্ত্বেও পুরন্দর বিশ্বাস করল না। কেন আত্মানন্দ

ওর সঙ্গে গদ্দারি করতে যাবে? না, না, এ হতেই পারে না। দেবালয়ের দিকে ও একবার তাকাল। তারপর কাচের বাক্সটার দিকে। আতঙ্কিত চোখে পুরন্দর দেখল, কাঠের ক্যাবিনেটে ওর ছায়া পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কপাল চাপড়ে ভীষণ কান্নাকাটি করছে।

সিঁড়ির উপর কতক্ষণ ও পড়েছিল, পুরন্দর জানে না। চোখ খুলে ও দেখল, আত্মানন্দ ধারেকাছে নেই। কাঠের বাক্সটা পড়ে আছে। কিন্তু ভেতরের কঙ্কালটা সেখানে নেই। মুহূর্তেই ও বুঝে গেল, আত্মানন্দ ওকে বোকা বানিয়ে চলে গেছে। ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল সেটটা ও বের করে আনতে গিয়ে দেখল, সেটাও নেই। উঠে বসতে গিয়ে ওর মাথা টলে গেল। কিন্তু খানিক পরে ও উঠে দাঁড়াল। সুড়ঙ্গ পথে ঘন অন্ধকার। তা সত্ত্বেও ওর চোখে পড়ল, আত্মানন্দ ভুল করে টর্চ ফেলে গিয়েছে। টর্চ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে পুরন্দর বিমলার মন্দিরের দিকে এগোল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ও যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎই ঝোপের মাঝখান থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে একজন এগিয়ে এল। তার একহাতে পিস্তল, অন্য হাতে হ্যান্ডকাফ। পিস্তল বাগিয়ে লোকটা বলল, 'তোর খেল খতম পুরন্দর। আমি বিমল রাউথ। সিবিআই অফিসার। চল, আজ থেকে সারা জীবন... যাতে তোকে জেলের ভাত খেতে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।'

একাত্তর

চিফ মিনিস্টার প্রতাপ পট্টনায়ক না কি টুবাইকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। ওরা নিশ্চিন্তে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে পারে। কেউ ওদের উত্ত্যক্ত করবে না। করলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সত্যিই, দু'দিন ধরে গোরা দু'বেলা মন্দিরে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে থাকছে সাত আট জনের একটা দল। পান্ডাদের কেউ কোনও অশান্তির চেষ্টা করেনি। গোরা টের পাচ্ছে, দাসুয়ার ছেলেরাও আশপাশে থাকছে। মন্দিরে গিয়ে গোরা গরুড় স্তম্ভের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যায় ওখানে। স্তম্ভে এক হাতে ভর দিয়ে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে। কেন তাকিয়ে থাকে গোরা নিজেও জানে না। তখন জগৎ সংসারের কথা ওর মনেও থাকে না। নাওয়া খাওয়াও সব ভুলে যাচ্ছে। মুকুন্দই ওকে টেনে ফের হোটেল গম্ভীরায় ফিরিয়ে আনে।

সেদিন চিফ মিনিস্টার যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন বিশ্রাম নেওয়ার অছিলায় গোরা দেখা করেনি। উনি আধ ঘণ্টা বসে থেকে টুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলে চলে যান। পরে টুবাই বলেছিল, 'কাজটা তুই ভাল করিসনি গোরা। পাঁচ মিনিট ওঁর সঙ্গে কথা বললে, কী এমন ক্ষতি হত? উনি তো পলিটিক্যাল ফায়দা তোলার জন্য তোর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। উনি এসেছিলেন, মন্দিরের ওই মিরাকল্-এর ঘটনাটা টিভিতে দেখে। আসলে ওঁর স্ত্রী... মিসেস পট্টনায়কের তাগিদ ছিল বেশি।'

গোরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'মিসেস পট্টনায়কও ওঁর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন না কি?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যই তো আমার আরও খারাপ লাগছে। মিসেস পট্টনায়ককে না কি কয়েকদিন আগে কোন এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, শিগগির এক মহাপুরুষের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হবে। তিনিই না কি স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করবেন। জ্যোতিষী আরও বলেছেন, মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমনও হতে পারে, প্রতাপ পট্টনায়ককে না কি রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে। উনি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জগতে চলে আসবেন। এর পরেই মিসেস পট্টনায়ক স্বপ্নে তোকে দেখেন। তুই নাকি স্বপ্নে ওঁকে বলছিস, পুরীতে আয়। আমার সঙ্গে দেখা হবে।'

গোরা চুপচাপ টুবাইয়ের কথাগুলো শুনেছিল। তারপর বলেছিল, 'এ সব কথা তোর বিশ্বাস হয়?'

টুবাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিল, 'জানি না, কেন তোর বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার কিন্তু কথাবার্তা বলে মনে হয়নি, মিসেস পট্টনায়ক বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। উনি তো সবার সামনে বলেই ফেললেন, ওলিউড টিভিতে তোকে দেখে উনি চমকে ওঠেন। স্বপ্নে দেখা সেই একই মানুষ। তখনই উনি হ্যাসবেন্ডের কাছে জেদ ধরেন, পুরীতে নিয়ে আসতে হবে। চিফ মিনিস্টার আমাকে কী বললেন, জানিস? যেদিন উনি প্রথম তোকে মন্দিরে দেখেন, সেদিনই নাকি বুঝতে পেরেছিলেন, তুই সাধারণ মানুষ না।'

গোরা অধৈর্য হয়ে বলল, 'কিন্তু তুই তো জানিস টুবাই, আমি কে। তুই কেন এই আজগুবি রটনায় যোগ দিবি? পরে তো লোকে আমাকে ভণ্ড বলবে। চল ভাইনা, আমরা ভুবনেশ্বরে চলে যাই। মায়ের জন্য আমার মন যেন কেমন করছে।'

টুবাই বলেছিল, 'তুই যেতে চাইলেই কি আর যেতে পারবি? প্রভু জগন্নাথ তোকে যেতেই দেবেন না। তোর চারপাশে যা কিছু ঘটছে, সবই জানবি, তাঁরই ইচ্ছায়।'

বলেই আর কথা বাড়ায়নি টুবাই। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। গতকাল ও ভুবনেশ্বরে গিয়েছে। চাকরিতে ইস্তফা দিতে। যাওয়ার আগে টুবাই জনে জনে বলে গিয়েছে, ওর দিকে যেন নজর রাখে। এই নজরদারি গোরার একদম ভাল লাগছে না। বদ্ধ ঘরে থাকার সময় ও হাঁফিয়ে উঠছে। কখনও কখনও চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দেখছে। যার সঙ্গে কস্মিনকালেও ওর কোনও সম্পর্ক ছিল না। বাইরের বারান্দায় গিয়ে যে ও খোলা হাওয়ায় বসবে, তারও কোনও উপায় নেই। ওকে দেখার আশায় নীচে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে। টিভির কী অসীম শক্তি! একদিনের একটা প্রোগ্রাম, ওকে ওড়িশার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। এখন ওর মনেও পড়ছে না, পুরীতে ও এসেছিল, দলিত পার্টির সমাবেশ করার জন্য। সেই সমাবেশের কথা ভুলে ওর পার্টির কর্মীরাও এখন ওর মাহাত্ম্য প্রচারে নেমে পড়েছে। এমনকী, অদ্বৈতবাবুর মতো মানুষ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'ভগবানে আমি বিশ্বাস করতাম না গোরা। এখানে এসে টের পেলাম, ভগবান আছেন। তোমাদের মতো মানুষদের পাঠিয়েই উনি বুঝিয়ে দেন, উনি আছেন। দলিত পার্টির কাজ তোমাকে করতে হবে না গোরা। উনি যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠিয়েছেন, সেটাই তুমি মন দিয়ে করে যাও।'

ঘরে বসে গোরা এইসব কথাই চিন্তা করছিল। এমন সময় মুকুন্দ এসে মোবাইল ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কলকাতা থেকে জয়দেববাবু ফোন করেছেন। বললেন, খুব দরকার।'

অনেক দিন জয়দেবের পাত্তা নেই। ডাক্তার পদ্মিনীর চেম্বারে ওর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল। মাঝে ওর কথা মনেও পড়েনি। গোরা বুঝতে পারল না, জয়দেব কলকাতায় চলে গেল কেন? ওকে না বলেই চলে গেল? ফোনটা হাতে নিয়ে ও বলল, 'আরে, কলকাতায় তুমি কবে গেলে জয়দেব?'

জয়দেব বলল, 'গতকাল এসেছি। এমন সব ঘটনা ঘটে গেল... তোমাকে বলে আসার সুযোগই পেলাম না ভাই। শোনো গোরা, যে কারণে ফোনটা করলাম, একটা গুড নিউজ আছে। উপাসনাকে বিয়ে করছি। অনুষ্ঠান করে এপ্রিলের শেষদিকে। রেজেস্ট্রি বিয়েটা করব বইমেলা শেষ হওয়ার পরেই।'

গোরা বলল, 'বাঃ, সত্যিই গুড নিউজ। তোমাদের দেখে অবশ্য আমার মনে হচ্ছিল, সম্পর্কটা বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে। বাড়ির মত আছে?'

'হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মতেই হচ্ছে। ভেবেছিলাম, বিয়ে থা করব না। কিন্তু উপাসনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে মনটা একেবারে বদলে গেল ভাই। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। ওর মতো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া সত্যিই খুব ভাগ্যের। যাক সে কথা, তোমাদের ওখানকার খবর কী?'

তার মানে এখানকার কোনও খবর জয়দেবের কাছে পৌঁছয়নি। বলার দরকারও নেই, ও কেমন ফেঁসে গিয়েছে। ওলিউড চ্যানেলে যেদিন ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছিল, সেদিন মনে হয়, জয়দেব পুরীতে ছিল না। তাই ওর চোখে পড়েনি। বোধহয় কেউ বলেওনি ওকে। গোরা বলল, 'ভাল। আমিও বোধহয় দু'একদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বর ফিরে যাচ্ছি।'

'ডাক্তার পদ্মিনীর সঙ্গে তুমি আর যোগাযোগ করনি?'

'না, ভাই। আসলে মাথা থেকে হারিয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তাগাদা মারারও কেউ ছিল না। তুমি ছাড়া তো আমার এই রোগের কথা আর জানে টুবাই। আমি তো হোটেল ছেড়েই এ ক'দিন বেরোইনি। কেন, ডাক্তার পদ্মিনীর সঙ্গে কি তোমার যোগাযোগ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কাল আমি ফোন করেছিলাম।' বলে জয়দেব থেমে একটু পরে বলল, 'ওঁর তো সর্বনাশ হয়ে গেছে। সাধুরা ওকে যে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন, সব ফলে গেছে।'

'কী হয়েছে ডাক্তার পদ্মিনীর? ভাই, আমায় খুলে বলো তো।'

'আরে, সাধুরা যেদিন ওঁর চেম্বার অ্যাটাক করেন, সেদিন রাতেই ডাক্তার পদ্মিনীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ঠিক সময়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ায় উনি বেঁচে যান। এখনও নার্সিং হোমেই আছেন। আমার ফোন উনি ধরতেই চাইছিলেন না। দু'তিনবার ট্রাই করার পর উনি ফোন ধরে বললেন, ক'দিন আগে বিষ্ণু মন্দিরে না কি ব্লাস্ট হয়েছিল। তাতে ওর চেম্বার ধসে নীচে পড়ে গেছে। ওঁর সত্তর-আশি লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ডাক্তার

পদ্মিনী খুব কান্নাকাটি করছিলেন কাল ফোনে। অনেক কষ্ট করে রিসার্চ সেন্টার গড়ে তুলেছিলেন, সব জলে চলে গেল। জানো গোরা, উনি আমাকেই দুষছিলেন। বলছিলেন, আপনি যদি গোরাবাবুকে আমার চেম্বারে নিয়ে না আসতেন, তা হলে আজ আমার এই অবস্থা হত না।'

গোরা বলল, 'আশ্চর্য, আমার কানে তো কিছু আসেনি। ঠিক আছে, আমি ডাক্তার পদ্মিনীকে একবার ফোন করছি। উনি আমার ব্যাপারে কি কিছু বললেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেও এক ধোঁয়াশা। তোমার যা কিছু উনি রেকর্ড করেছিলেন, সব না কি ফাঁকা রয়ে গেছে। মানে... কোনও কিছু রেকর্ডেড হয়নি। এখন তো আর সেসব উদ্ধার করার কোনও সম্ভাবনা নেই। বিষ্ণু মন্দিরে ব্লাস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু বিষ্ণু মন্দিরে ব্লাস্টটা কারা করল ভাই, কেনই বা করল?'

'সে কী! কিছুই শোনোনি? আমি অবশ্য সেদিন ভুবনেশ্বরে নবেন্দুদের বাড়িতে ছিলাম। ওখানেই টিভিতে দেখলাম, সে এক ভয়াবহ কাণ্ড। প্রচুর মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া গেছিল। এত লোক পাতাল ঘরে জমায়েত হয়েছিল কেন, প্রথমে পুলিশ বুঝতেই পারেনি। পরে জানতে পারে, ওরা একটা উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য। ওই পাতাল ঘর থেকে ওদের কাজকর্ম চালাচ্ছিল। দু'দিন ধরে তো টিভি ওই ব্লাস্ট নিয়েই খবর করে গেল। পুলিশ একজনকে অ্যারেস্ট করেছে।'

'এই উগ্রপন্থী সংগঠনটা কাদের জয়দেব?'

'জানি না। তবে দাশরথিবাবু সেদিনই নবেন্দুদের বাড়িতে এসেছিলেন। টিভি দেখতে দেখতে তিনি আমায় কিছু অদ্ভুত কথা বললেন।... গোরা, দাশরথিবাবুকে কি তুমি চেনো?'

'না। তবে তোমার মুখে ওঁর নাম একদিন শুনেছি।'

'ইনি হলেন নবেন্দুদের পারিবারিক বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা করছেন। অভিজ্ঞ মানুষ। উনিই আমায় বললেন, এই ধর্মীয় সংগঠনটা হল চৈতন্যবিরোধী কিছু বিকৃতমনস্ক মানুষের সংগঠন। এদের কাজ হচ্ছে, বেছে বেছে চৈতন্যপ্রেমী মানুষদের হত্যা করা। আশ্চর্য, তোমাদের পুরন্দরদার মুখেও আমি ক'দিন আগে এই গুপ্ত সংগঠনটার নাম শুনেছি।'

'পুরন্দরদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল না কি?'

'হ্যাঁ। কেন দেখা হয়েছিল, ফোনে তোমাকে বলতে পারব না। বইমেলা শেষ হওয়ার পরই আমি ফের পুরীতে যাব। তখন খুলে সব বলব। তবে পুরন্দরদা একটা কথা সেদিন আমায় বলেছিল। সে কথা মনে পড়ে গেল। গোরা, ভাই তুমি সাবধানে থেকো। এই গুপ্ত সংগঠনটা তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে।'

'আমাকে। কিন্তু কেন? আমি চৈতন্যপ্রেমী নই। আর ওদেরও কোনও ক্ষতি করিনি। তা হলে ওরা আমার উপর নজর রাখছে কেন? তাছাড়া পুরন্দরদাই বা সেটা জানল কী করে?'

'বলতে পারব না ভাই। তবে এটুকু জানি, পুরন্দরদা থাকতে তোমার গায়ে কেউ আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবে না। লোকটাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে আমার অন্তত মনে হয়েছে, হি ইজ আ রিয়েল হিরো। সুপারম্যান। দেখা হলে তোমায় বলব। এই প্রসঙ্গটা এখন থাক। আমার কথাটা মনে থাকে যেন। ডাক্তার পদ্মিনীর সঙ্গে একবার কথা বোলো। আর আমাদের বিয়েতে তোমার কিন্তু আসা চাই। বাড়িতে তোমার গল্প এত করেছি যে, মা তোমাকে খুব দেখতে চাইছেন।'

'নিশ্চয় চেষ্টা করব।'

জয়দেব লাইনটা কেটে দেওয়ার পর গোরা চুপ করে বসে রইল। অনেকদিন পর পুরন্দরদার কথা ওকে কেউ বলল। ভুবনেশ্বর থেকে সেই যে পুরন্দরদা উধাও হয়ে গিয়েছিল, তার পর থেকে তার কোনও পাত্তাও নেই। জয়দেবের কথা অনুযায়ী, পুরন্দরদা তা হলে এখন পুরীতে। এত ঘটনা ঘটে গেল, অথচ দেখা করতে এল না। পরক্ষণেই গোরার মনে হল, হয়তো পুরন্দরদা এসেছিল। মুকুন্দরা দেখা করতে দেয়নি। ওই বা চিনবে কী করে? পুরন্দরদাকে তো মুকুন্দ দেখেইনি। পুরন্দরদাকে চেনে একমাত্র টুবাই।

দরজায় টকটক শব্দ। মুকুন্দ মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এক ম্যাডাম আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। সেই সক্কাল থেকে বসে আছেন। বাইরে বসে খুব কান্নাকাটি করছেন। পাঠিয়ে দেবো?'

শুনে গোরা একটু অবাকই হল। জিজ্ঞেস করল, 'কে রে? তুই চিনিস?'

মুকুন্দ বলল, 'ভুবনেশ্বর থেকে এসেছেন। নাম বললেন, প্রভা পাণিগ্রাহী। দেখলেই নাকি আপনি চিনতে পারবেন। আমাদের ইউনিক টু-তেই না কি থাকেন।'

কে প্রভা পাণিগ্রাহী, গোরা মনে করতে পারল না। মন্দিরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে ওর বুকের ভেতরটা আকুলবিকুলি করে। মনে নানা প্রশ্ন জাগে। জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ও সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর জানতে চায়। হে জগন্নাথ, হে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি এ কী কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেললে আমাকে। আমি তো দলিতদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের হিতসাধন করতে চেয়েছিলাম। এ তুমি কোন পথে ঠেলে দিলে আমাকে? আমি তো বুঝতেই পারছি না, কার হিতসাধন করার জন্য মন্দিরে সেদিন তুমি ওই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটালে? উত্তর দাও ভগবান। আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। জয়দেবের ফোন না এলে গোরা এতক্ষণে গরুড় স্তম্ভের গায়ে দাঁড়িয়ে এই সব প্রশ্নই ছুড়ে দিত বিগ্রহের উদ্দেশে। না, না, ওকে এখনই মন্দিরে যেতে হবে। ও জানে, একদিন না একদিন উত্তর ও পাবেই।

কোনও মহিলার সঙ্গে কথার সময় এখন ওর নেই। চট করে কথাটা ভেবে নিয়ে গোরা মুকুন্দকে বলল, 'মহিলাকে এখন পাঠাতে হবে না। টুবাইকে বল, স্নান সেরে আমি এখুনি মন্দিরে যাব।'

কথাগুলো বলেই গোরা বাথরুমে ঢুকে এল। হোটেল গম্ভীরায় বাথরুম খুব সুন্দর সাজানো গোছানো। একদিকে বেসিনের গায়ে দেওয়াল জুড়ে বিরাট আয়না। অন্যদিকে

বাথটব। ওর লম্বা শরীরটা বাথটবে আঁটে না। শাওয়ার খুলে তাই স্নান সেরে নেয় গোরা। আজ ঝরনা জলের নীচে দাঁড়াতেই ওর শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। চোখ বুজে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের কথা ও ভাবতে লাগল। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগল, "জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'। কতক্ষণ বিড়বিড় করেছে, ওর মনে নেই। হঠাৎ চোখ খুলে আয়নার দিকে তাকাতেই ও অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পেল।

কাচের আয়নাটা যেন এলসিডি টিভির সেট। সিনেমার মতো কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ফের ও অতীতে ফিরে গিয়েছে। গোরা দেখল, অজানা কোনও জায়গায় এক ধনী লোকের বাড়ির শয্যাঘরের মেঝেতে ও শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে প্রদীপ জ্বলছে। গোরার মনে পড়ল, দুপুরবেলায় ওর সঙ্গীরা যখন ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করতে এই বাড়িতে ঢুকেছিল, তখন হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে এক স্থূলকায় মানুষ বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ওকে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি তীর্থরাম। এই অক্ষয়বট অঞ্চলের জমিদার। স্থানীয় বৌদ্ধদের মুখে শুনেছি, আপনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য দক্ষিণ ভারতে এসেছেন। দয়া করে আমার গৃহে যদি পায়ের ধুলো দেন, তা হলে আমি কৃতার্থ হব।'

গোরা তখনই জেনেছিল, জায়গাটার নাম অক্ষয়বট। তীর্থরাম বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিল, ভোগী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দীর্ঘ পথিশ্রমে ওরা সবাই ক্লান্ত। তাই গোরা রাজি হয়ে গিয়েছিল আতিথ্য নিতে। দিনান্তে এক বার ভিক্ষান্ন গ্রহণের পর ওরা সংকীর্তন করেছে। আয়নায় গোরা দেখল, রাতে মেঝেতে শুয়ে ও ইষ্টনাম জপছে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল দু'জন সুবেশা নারী ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করছে। তাদের গায়ের সুগন্ধি নাকে আসতেই, গোরা অভিসন্ধি বুঝতে পারল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তর্কযুদ্ধে ওর কাছে হেরে গিয়েছিল। তাই ওর গায়ে কলঙ্কলেপনের চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা কারা?'

একজন বলল, 'আমি সত্যবাঈ। আর এ হল লক্ষ্মীবাঈ। আপনার পদসেবা করতে এসেছি।'

গোরা কঠিন গলায় বলল, 'তোমরা এখুনি চলে যাবে। না হলে তোমাদের খুব ক্ষতি হবে।'

'হোক ক্ষতি। গৃহকর্তার আদেশ আমরা অমান্য করতে পারব না।'

গোরা তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে স্পর্শ কোরো না। করলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবে।'

'অভিসম্পাত কোরো না গো। তোমার মতো দিব্যকান্তি পুরুষ আমাদের জীবনে আর কখনও আসেনি। এসো, রাতটাকে আমরা রঙিন করে তুলি।' কথাগুলো বলতে বলতেই সত্যবাঈ ওর অঙ্গস্পর্শ করল। তার পরই ছিটকে পড়ল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাকরোধ হয়ে গেল। সত্যবাঈয়ের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর সঙ্গিনী। হাঁটু গেড়ে বসে সত্যবাঈকে সে ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় করে বলল, 'মহাত্মন, গৃহকর্তার কথা শুনে আমরা আপনাকে

পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, আমরা পাপ করেছি। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন। দয়া করে আমার সঙ্গিনীকে আপনি ভাল করে দিন।'

ঘরের মেঝেতে সে মাথা খুঁড়তে লাগল। তার কান্নায় মন গলে গেল গোরার। ও বলল, 'হরির নাম বলো। বলো হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে হরে। তা হলেই তোমার সঙ্গিনী উঠে দাঁড়াবে। শোনো, আজ থেকে তোমাদের সব পাপ আমি গ্রহণ করলাম।'

... হরির নাম করার সঙ্গে সঙ্গে গোরার সারা শরীর আনন্দে কাঁপতে লাগল। ঝরনার ঠান্ডা জলে সেই কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। উর্ধ্ববাহু হয়ে ও নাচতে লাগল। তখনই আয়নার দিকে তাকিয়ে ও দেখল, সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সাদা পর্দায় কালো বিন্দু ঝিরঝির করছে। হঠাৎ ওর মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। কাটা তালগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল বাথরুমের মেঝেতে। জ্ঞান হারানোর আগে গোরা টুবাইয়ের গলা শুনতে পেল, 'মুকুন্দ, তাড়াতাড়ি আয়। এ দিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

বাহাত্তর

মন্দির থেকে গম্ভীরায় ফেরার সময় টুবাই বলল, 'অবধূতজির আশ্রমে একবার ঘুরে যাব না কি? এই বাঁ দিকেই ওর আশ্রম। চল যাই। উনি কাল লোক পাঠিয়েছিলেন, তোকে নিয়ে যেতে।'

পুরীতে আসার পর থেকে জয়দেব বেশ কয়েকবার ওকে মা চিন্ময়ীর এই আশ্রমে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কোনও না কোনও কারণে গোরার যাওয়া হয়নি। জয়দেব বলেছিল, অবধূতজি না কি পণ্ডিত মানুষ। ওঁর সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগবে। টুবাই কথাটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে ও রাজি হয়ে গেল। গম্ভীরায় ও অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। সারাদিন লোকের আনাগোনা। ওকে দেখার জন্য আকুতি। মা চিন্ময়ীর আশ্রমে গেলে কিছু সময় তো ভাল কাটবে।

সঙ্গে সঙ্গে রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল টুবাই। ভাড়া মিটিয়ে ও বলল, 'মা চিন্ময়ীর আশ্রমটা একটু ভিতরের দিকে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কয়েকদিন আগে একটা ঝামেলা হয়েছিল আশ্রমকে ঘিরে। তখন খবর করার জন্য আমাকে আসতে হয়েছিল। আয়, আমার পিছু পিছু আয়।'

টুবাইয়ের পিছু পিছু অবধূতজির আশ্রমের ভিতরে ঢুকল গোরা। এই আশ্রমের পাশ দিয়ে বেশ কয়েকবার ও টোটা গোপীনাথের মন্দিরে গিয়েছে। বাইরে থেকে দেখে গোরার কখনই মনে হয়নি, আশ্রমের ভেতরে এত বড় উঠোন রয়েছে। গোরার চোখে পড়ল, উঠোনের মাঝে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে লাল সিমেন্টের বাঁধানো অখণ্ডমণ্ডলাকার বড় একটা বেদি। বাঁ দিকে নাট মন্দির। সেখানে সন্ধ্যারতি চলছে। বেশ কিছু ভক্ত হাতজোড়

করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোরা আশপাশে একবার নজর বোলাল। নাট মন্দিরের উল্টো দিকে দোতলা একটা লাল রঙের বাড়ি। কিন্তু প্রবেশপথ লোহার খাঁচা দিয়ে ঘেরা। আশ্রম না, জেলখানা? দেখেই গোরার অস্বস্তি শুরু হল। পাশ থেকে তখনই টুবাই ফিসফিস করে বলল, 'গোরা, তুই বেদির ওপর গিয়ে বোস। অবধূতজি এখুনি আসবেন।'

লাল বেদির উপর বসার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরে জ্বলুনি শুরু হল। খুব গরম বোধ হচ্ছে দেখে, গায়ের পাঞ্জাবিটা ও খুলে ফেলল। তবুও দরদর করে ঘাম বেরচ্ছে। এত ঘাম হওয়ার তো কথা নয়। শারীরিক কষ্ট একটু কমার পর, ওর চোখের সামনে থেকে দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করল। গোরা দেখল, সন্ধ্যারতি শেষ করে বাঁ দিকের নাট মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজনকে ওর খুব চেনা লাগল। দীর্ঘকায়, রাজ পুরুষের মতো দেখতে। পরনে গেরুয়া রঙের লুঙ্গি, হাতে একটা পাত্রে সন্ধ্যারতির পঞ্চপ্রদীপ। দীপ্ত এই সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখেছে, মনে করার জন্য স্মৃতির অতলে ডুব দিতেই, নামটা গোরার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আরে, ইনিই তো রায় রামানন্দ। একটা সময় এঁর সান্নিধ্যেই ষোলো সতেরোটা বছর গোরার কেটেছে। রামানন্দকে দেখে ওর মন প্রসন্ন হয়ে গেল। মুখে স্মিত হাসি ধরে রেখে, গোরা পরীক্ষা করতে চাইল, রামানন্দ ওঁকে চিনতে পারেন কী না।

রামানন্দ সামনে এসেই হাতজোড় করে বললেন, 'আমি অবধূত গোস্বামী। আপনার কথা জয়দেবের মুখে অনেক শুনেছি। আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম।'

গোরা বলতে যাচ্ছিল সৌজন্যমূলক অন্য কথা। কিন্তু ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ, বহু বছর পর ফের দেখা হল। তোমার কাছে আসার জন্য আমার মনটাও খুব আকুলি বিকুলি করছিল।'

রামানন্দ ওরফে অবধূত গোস্বামীর চোখ মুখে অপার বিস্ময়। বেদির নীচে, গোরার পায়ের কাছে উনি বসে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না গোরাবাবু।'

গোরা বলল, 'আমাকে না চেনার ভান করছ কেন রামানন্দ? তুমি তো জানোই, তোমার সান্নিধ্য আমার কাছে কতটা কাঙ্ক্ষিত ছিল একটা সময়। তুমি কাছে থাকা মানেই মনের ভেতর ভক্তিভাবের উদয় হওয়া। বুকের ভেতর আনন্দরস ক্ষরণ হতে থাকা। বিদ্যা অর্জনের পথে এক একটা সোপান পেরিয়ে যাওয়া। এসো, তুমি আর আমি মিলে আজ সেই কাজটাই করি।'

গোরার কথা শুনে উপস্থিত ভক্তরা বেদির নীচে বসে পড়লেন। অবধূতজি বললেন, 'আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে গোরাবাবু। লোকের মুখে শুনেছি, আপনি সেদিন মন্দিরে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর আপনাকে অসীম ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি অতি সাধারণ মানুষ। আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

গোরা বলল, 'বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে। তোমাকে দেখে আমার সেই কথাটাই মনে হচ্ছে। বলো তো রামানন্দ, ভেবে বলো, কোন বিদ্যা বিদ্যার সার?'

অবধূতজি বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন গোরাবাবু। আপনি পণ্ডিত মানুষ। আপনার সঙ্গে বিদ্যা আলোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হয়ে যাবে।'

'ছলনা কোরো না রামানন্দ। সন্ন্যাসীর পক্ষে তা শোভা পায় না। এখানে অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলো, কোন বিদ্যা বিদ্যার সার?'

'জিজ্ঞাসা করছেন যখন, তখন বলছি। কৃষ্ণভক্তিই সর্ববিদ্যার সার।'

'বলো, জীবের কোন কীর্তি শ্রেষ্ঠ?'

'কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলে যদি কোনও জীবের খ্যাতি হয়, তা হলে সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।'

'শুনে প্রীত হলাম রামানন্দ। বলো, সম্পত্তির মধ্যে কোন সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ?'

'রাধাকৃষ্ণপ্রেমই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।'

'দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ গুরুতর?'

'কৃষ্ণ বিরহের কারণে যে দুঃখ উৎসারিত হয়, সেটাই গুরুতর দুঃখ।'

'বাঃ, এ বার বলো, মুক্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?'

'কৃষ্ণপ্রেমভক্তই মুক্তশ্রেষ্ঠং।'

'গানের মধ্যে কোন গান শ্রেষ্ঠ?'

'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি বিষয়ক গানই শ্রেষ্ঠ গান।'

'শ্রেয়োর মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ প্রধান?'

'কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের প্রধান শ্রেয়।'

'স্মরণের মধ্যে কোন স্মরণ উৎকৃষ্ট?'

'কৃষ্ণ-নাম-গুণ লীলার স্মরণই উৎকৃষ্ট স্মরণ।'

'ধ্যানের মধ্যে কোন ধ্যান সর্বোত্তম?'

'রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মধ্যানই সর্বোত্তম ধ্যান।'

'শ্রোতব্যের শ্রেষ্ঠ কী?'

'রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য।'

'উপাস্যের মধ্যে প্রধান কী?'

'যুগল রাধাকৃষ্ণের নামই প্রধান উপাস্য।' বলেই হাতজোড় করে অবধূতজি বললেন, 'আর আমার পরীক্ষা নেবেন না প্রভু। আমার মুখ দিয়ে আপনি যা বলাচ্ছেন, আমি তাই বলে যাচ্ছি। চলুন, এখন আশ্রমের ভিতর চলুন। আমরা একান্তে কিছু আলোচনা করি। আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

বলেই অবধূতজি উঠে দাঁড়ালেন। বেদি থেকে নেমে এসে গোরা হরিধ্বনি দিল। সমবেত ভক্তরাও হরিনাম করতে লাগলেন। উঠোনে অন্ধকার নেমে এসেছে। চারদিকে ফুলের গন্ধ ম ম করছে। আশপাশে বেল ও জুই ফুলের গাছ। আশ্রম থেকে মন্দিরে যাওয়ার বাঁধানো রাস্তায় কে যেন টিমটিমে কয়েকটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। অবধূতজি ডান দিকে মূল আশ্রমের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু কে যেন গোরাকে বাঁ দিকে নাটমন্দিরের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল। পাশ ফিরে ও অবধূতজিকে বলল, 'চলো রামানন্দ, তোমার

মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে আসি।' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে গোরা লম্বা লম্বা পা ফেলে নাটমন্দিরের দিকে এগোতে লাগল।

মন্দিরের ভিতর অল্প পাওয়ারের ছোট্ট আলো জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বিগ্রহের দিকে তাকাতেই গোরার সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ উঠল। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণর এক হাতে বাঁশি। অন্য হাত রাধার কোমর বেষ্টন করে রয়েছে। যেন অনন্ত প্রেমের প্রতীক। এই ধরনের বিগ্রহ কখনও গোরার চোখে পড়েনি। চিরদিন মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণকেই ও দেখে এসেছে। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোরা ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ল। নিজেকে ও রাধার জায়গায় দাঁড় করাল। হাত জোড় করে ও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে লাগল। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। মহামন্ত্রে বত্রিশটি শব্দ। এক একটির অর্থ এক এক রকম। শুরু হরে দিয়ে। তার মানে ... হে নন্দনন্দন, স্বমাধুর্য গুণে তুমি আমার মনপ্রাণ সব হরণ করেছ। তারপর কৃষ্ণ। হে যশোদানন্দন, তুমি অখণ্ড আনন্দদাতা। সে জন্য তোমাকে কৃষ্ণ বলে জানি। তারপর ফের হরে। হে গোপিকানন্দন, তুমি নারীর লজ্জা, ভয়, সংকোচ সব হরণ করেছ। তারপর কৃষ্ণ। হে মানসরঞ্জন, তুমি আমাকে আকর্ষণ করো বলেই তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ। হে শ্রীকৃষ্ণ...

বিগ্রহের সামনে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে গোরা মহামন্ত্রের এক একটি শব্দের ব্যাখ্যা অনুভব করতে লাগল। ওই ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। ওর ঘোর ভাঙল, অবধূতজির ডাকে, 'চলুন গোরাবাবু। মন্দির প্রাঙ্গণ বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে।'

মন্দির থেকে নেমে একটু পরেই অবধূতজির সঙ্গে আশ্রম বাড়িতে এসে ঢুকল গোরা। দরজা পেরিয়েই বিশাল এক হল ঘর। মোজাইকের মেঝেতে বসে অনেকে ধ্যান করছেন। ওখানেই টুবাইকে দেখতে পেল গোরা। দু'পাশের দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনেকগুলো পেন্টিং টাঙানো। টুবাই মন দিয়ে সেই পেন্টিং দেখছে। গোরা দেখল, ঘরের এক প্রান্তে সিংহাসনে এক সাধিকার ছবি। তাঁর চোখ দু'টিতে অসম্ভব মায়া মাখানো। কপালে বিরাট টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অবধূতজি ঘরে ঢুকেই হাতজোড় করে প্রণাম করলেন সাধিকার ছবিতে। তার পরই পাশ ফিরে ফিসফিস করে গোরাকে বললেন, 'ইনিই মা চিন্ময়ী। আমাদের এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।'

গোরাও প্রণাম করল। পুরীতে এই রকম অনেক সাধক-সাধিকার আশ্রম রয়েছে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে নিয়মিত এসেওছে এই ধরনের আশ্রমে। হলঘরের ভিতরে ও ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় অবধূতজি বললেন, 'ওপরে চলুন গোরাবাবু। সামান্য ফলাহারের ব্যবস্থা হয়েছে।'

ফলাহারের কথা শুনে ওর খিদে পেয়ে গেল। মাঝবেলায় মন্দিরে সামান্য প্রসাদ এনে দিয়েছিল মুকুন্দ। সেই মহাপ্রসাদ পাশে রেখে ও যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেই মহাপ্রসাদ উধাও। বাঁদর দলের কীর্তি। তাই আজ সারাদিন ওর পেটে কিছু পড়েনি। অবধূতজির পিছন পিছন একতলার ছাদে উঠে এসে গোরা দেখল, আশ্রমকর্মীরা

ফলাহারের ব্যবস্থা করছেন। ডাইনিং টেবলের দু'পাশে দুটি মাত্র চেয়ার। তার মানে, নিভৃতে কথা বলতে আগ্রহী অবধূতজি। চান না, তাঁরা কথা বলার সময় অন্য কেউ থাকুক। একটু পরে ওদের দু'জনকে রেখে আশ্রম কর্মীরা সবাই নীচে নেমে গেলেন।

ফলাহার শুরু করে অবধূতজি বললেন, 'আপনার কাছে জয়দেবকে নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে আমিই যেতাম গোরাবাবু। কিন্তু জয়দেব হঠাৎ কলকাতায় চলে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি।'

গোরা বলল, 'আমিও জানতাম না জয়দেব কলকাতায় চলে যাবে। আমার সঙ্গে রিসেন্টলি ওর কথা হয়েছে। বইমেলা নিয়ে ও খুব ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। তুমি বলো, কেন আমার কাছে যেতে চাইছিলে?'

'বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওটা সমুদ্রের দিক। আশ্রম থেকে বিচ পর্যন্ত পিছনের অনেকটা জায়গা আমাদের। কিন্তু বছরখানেক ধরে কিছু লোক আমাকে খুব উত্ত্যক্ত করছেন ওই জায়গাটা নিয়ে। ওঁরা বলছেন, জায়গাটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এই লোকগুলো পুরীর হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পান্ডা। তাঁদের সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে এক পান্ডাও যোগ দিয়েছেন। প্রায়ই ওঁরা আমাকে হুমকি দিচ্ছেন। মেরে ফেলার ভয় দেখাচ্ছেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দির অপবিত্র করে দিচ্ছেন...।'

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা ওঁরা কীজন্য চাইছেন?'

'ওদের হোটেলের এক্সটেনশন করার জন্য। আসলে আশ্রমের এই অংশটুকু কবজা করতে পারলে, ওঁরা ওঁদের হোটেল ফাইভ স্টার করে নিতে পারবেন। পুরীতে এমন হোটেল নেই বললেই চলে। ওঁরা জোর করে কনস্ট্রাকশন শুরু করেছিল। আমি কোর্টে গিয়ে ইনজাংশন নিয়ে এসেছি।'

গোরা বলল, 'আমি তোমাকে কীভাবে হেল্প করতে পারি রামানন্দ?'

অবধূতজি বললেন, 'শুনেছি চিফ মিনিস্টার আপনাকে খুব মানেন। ওর কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন? ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টটা এখন ওঁর হাতে। তাই হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের উনি চেনেন। চিফ মিনিস্টারকে আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই, যাতে আমাদের কেউ ডিসটার্ব না করেন।'

গোরা বলল, 'চিফ মিনিস্টার কাল সকালে আমার কাছে আসবেন। তোমাকে তখন ডেকে নেব।'

... আধ ঘণ্টা পর গম্ভীরায় ফিরে এল গোরা। আজকাল আর হোটেলের রিসেপশন দিয়ে ও ঢুকতে পারে না। পিছনের গেট দিয়ে ওকে ঢুকতে হয়। সামনের দিকে বিরাট একটা ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। কার নির্দেশে, কেউ জানে না। রোদ বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে, ম্যারাপের নীচে লোক দাঁড়িয়ে থাকে শুধু ওকে দেখার জন্য। দাসুয়ার মুখে গোরা শুনেছে, লোকে নাকি এখন জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার আগে হোটেল গম্ভীরায় আসছে। দলিত পার্টি করার সময় রোজই প্রচুর লোকের মুখোমুখি হতে হত গোরাকে। কোনও দিন ও বিরক্ত হয়নি। তখন ওর মনে হত, দেশের কাজ করছে। এখন যেটা হচ্ছে, তার কোনও অর্থ

খুঁজে পাচ্ছে না গোরা। কেবলই মনে হচ্ছে, আত্মপ্রচার। যা একদমই ও চায় না।

লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে আসার পর টুবাই বলল, 'এই রে, তোকে বলতে ভুলে গেছি। প্রভা পাণিগ্রাহী বলে এক মেয়ে রোজ ভুবনেশ্বর থেকে আসছে। তোর সঙ্গে কী যেন কথা বলতে চায়। চার পাঁচদিন ওকে ঘুরিয়েছি। আজ সেই দুপুর থেকে বসে আছে। একটা সময় কান্নাকাটিও করছিল। প্লিজ, দু'চার মিনিট কথা বলে ওকে বের করে দিস। আমি নীচে যাচ্ছি। দু'তিনটে ফোন করতে হবে।'

ঘরে ঢুকে গোরা বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখ মুখে জল দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর ও দেখল, ঘরের মাঝে ওরই বয়সি একটা বিবাহিতা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দরী, কোনও অভিজাত পরিবারের হবে। ওকে দেখে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। তার পর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে, কান্নামাখা গলায় বলল, 'আমাকে উদ্ধার করুন প্রভু।'

মেয়েটা পা জড়িয়ে ধরার আগেই সভয়ে সরে গেল গোরা। বলল, 'আরে, ওঠো, ওঠো। কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?'

'খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি প্রভু।' মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটা হাতজোড় করে বলল, 'আপনি আমায় বাঁচান। সাত বছর হল, আমার বিয়ে হয়েছে। এখনও কোনও সন্তান হয়নি। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাঁজা বলে আমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করছেন। ওদের গঞ্জনা আর আমি সহ্য করতে পারছি না। ওরা বলছেন, আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। আমার স্বামীর ফের বিয়ে দেবেন। ওরা মেয়ে দেখাও শুরু করেছেন।'

শুনে গোরা কিছুই বুঝতে পারল না। ও বলল, "ওরা যদি তোমার উপর নির্যাতন করে থাকেন, তা হলে তুমি পুলিশের কাছে যাচ্ছ না কেন?'

'গিয়ে কোনও লাভ হয়নি প্রভু। টাকা পয়সা দিয়ে ওরা পুলিশের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এই দেখুন, আমার উপর কী ধরনের অত্যাচার করেছেন, তার নমুনা...' বলতে বলতে আঁচলটা বুক থেকে সরিয়ে দিল মেয়েটা। তার পর তলপেটের একটা অংশ দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন, আমার স্বামীর বীরপুরুষির নমুনা। সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ। আরও দেখবেন...'

ফর্সা দুটো স্তন প্রায় উন্মুক্ত হয়ে আছে। শাড়ির ভাঁজ খুলতে শুরু করেছে মেয়েটা। দেখে ... হঠাৎই সত্যবাই আর লক্ষ্মীবাইয়ের কথা মনে হল গোরার। অক্ষয়ধামের সেই দুটো মেয়েকে এই ক'দিন আগেই ও দেখেছে অতীতে গিয়ে। মেয়ে দুটোর কথা মনে পড়তেই, ষড়যন্ত্রের আঁচ পেল গোরা। দরজার দিকে তাকিয়ে ও দেখল, বন্ধ। মেয়েটা ঘরে ঢোকার পর তা হলে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছে। কড়া গলায় ও বলল, 'থাক, থাক। তোমাকে ও সব দেখাতে হবে না। তুমি এখন যাও। আমি তোমাকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না।'

মেয়েটা বলল, 'এ কথা বলবেন না প্রভু। কয়েকদিন আগে মন্দিরের ভেতর একটা

মরা বাচ্চাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি। টিভিতে তা দেখে আমি এতদূর ছুটে এসেছি। আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন।...' বলতে বলতে শাড়ি খুলে ফেলল মেয়েটা। পিঠের দিকে হাত ঝুলিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল। যৌন তাড়নার লক্ষণ দেখতে পেল গোরা। ঘনঘন শ্বাস ফেলে কাছে এগিয়ে আসতে আসতে মেয়েটা বলল, 'দয়া করে আমাকে একটা সন্তান দিন প্রভু। কেউ জানতে পারবে না। সন্তান দিয়ে আমাকে বাঁচান।'

তিয়াত্তর

হাওড়া স্টেশন থেকে কাটোয়া লোকালে ওকে তুলে দেওয়ার পর কাকা বলল, 'বাড়ি পৌঁছেই খবর দিস উপা। সুটকেশটা ঠিকঠাক নামিয়ে নিস। ভুলে যাস না যেন, কেমন?'

উপাসনা ঘাড় নেড়েছিল। মনে মনে ওর হাসি পাচ্ছিল। ও কি বাচ্চা মেয়ে, সুটকেশ নামাতে ভুলে যাবে? প্রায় দু'মাস পর ও নবদ্বীপে ফিরছে। এর পর কলকাতায় ফিরবে একেবারে এপ্রিলের মাঝামাঝি। বিয়ে চুকে যাওয়ার পর। কাকিমা তাই জিনিসপত্তর সব যত্ন করে গুছিয়ে দিয়েছে সুটকেশে। ওর মধ্যে সোনার গয়নাগুলোও আছে। তবুও অনেক কিছু বেহালার বাড়িতে পড়ে রইল। কাকার সঙ্গে কাকিমাও এসেছে স্টেশনে। জয়দেব ফোনে বলেছিল, ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওর বইমেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। ও বলেছিল, উপাসনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তারপর স্টেশন থেকেই সোজা মিলনমেলায় চলে যাবে। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আর মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। এখনও এল না। উপাসনা জানলা দিয়ে বারবার প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাতে লাগল।

কাকা জলের বোতল কেনার জন্য স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ফাঁকে কাকিমা হেসে বলল, 'অত উতলা হোস না উপা। জয় যখন বলছে, তখন আসবেই। ও কথার খেলাপ করে না।'

শুনে উপাসনাও হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'আমার বয়ে গেছে ওর জন্য উতলা হতে।'

কাকিমা বলল, 'আর তো ক'টা দিন মাত্র। বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর দেখবি, বরের জন্য সত্যি সত্যি মন উচাটন হয় কী না? শোন, বইমেলা শেষ হওয়ার পরই, জয়দেবকে দেখতে যদি তোর ইচ্ছে হয়, তা হলে ফোনে আমায় জানাস। আমি কোনও একটা ছুঁতোয় ওকে নবদ্বীপ পাঠিয়ে দেব।'

'তোমার কি মনে হয়, ও যাবে?'

'যাবে না মানে? এমনিতেই তো হুলো বেড়ালের মতো তোর পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যদি বলি তা হলে নবদ্বীপ কেন, নৈনিতালেও চলে যাবে।'

জয়দেব আর হুলো বেড়াল! কল্পনা করতেই উপাসনা হো হো করে হেসে উঠল। সত্যি, বেহালার বাড়িতে ও যে ক'দিন এসেছে, ওর সঙ্গে এমন ঘুরঘুর করেছে, তখন

... হা হা হা ... ওকে হুলোই মনে হয়েছে। ইস, জয়দেবটা না... একেবারে বোকা টাইপের। কাকা-টাকা কে কাছে আছে, কাউকে মানে না। একে সেকেন্ড না দেখলে ছটফট করে। ওর পিছন পিছন রান্না ঘরেও ঢুকে যায়। কাকিমা তো হুলো বেড়াল বলবেই। আগে কাকিমা কখনও এ ধরনের রসিকতা করত না। কিন্তু নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে এখন মাঝে মাঝে আলটপকা কথা বলে ফেলছে। বিয়ে হয়ে গেলে অথবা বিয়ে ঠিক হলে মেয়েরা বোধহয় বন্ধুর মতো হয়ে যায়। অন্তত কাকিমার আচরণ দেখে ওর তাই মনে হচ্ছে।

ট্রেন ছাড়ার হুটার দিল। জানলা দিয়ে কাকা তাড়াতাড়ি জলের বোতলটা এগিয়ে দিতেই কাকিমা নীচু গলায় বলল, 'হুলোটা এলো না তা হলে।'

হাসতে হাসতে উপাসনা বলল, 'আচ্ছা করে বকে দিয়ো তো।'

কাকা বুঝতে না পেরে বলল, 'কাকে বকবে রে?'

কাকিমা বলল, 'সে একজন আছে। জানতে চেয়ো না।'

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাকা-কাকিমা আড়াল হয়ে যেতেই উপাসনার মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। কথাটা কাল রাত থেকেই ওর মনে হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ও নবদ্বীপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেটা সফল হল না। অর্থাৎ কী না রিসার্চ। যাঁর উৎসাহে ও রিসার্চ শুরু করেছিল, সেই আচায্যিমশাইও চলে গেলেন। গভীর একটা বিশ্বাস থেকেই আচায্যিমশাই ওকে গবেষণা করতে বলেছিলেন। নিজে কিছু তথ্যও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ওঁর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারল না উপাসনা। এ বার নবদ্বীপ গেলে ওঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ভাবতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটা কথা ভেবে কষ্টবোধ করতে লাগল উপাসনা, গোঁসাই বাড়ির শ্রীবৎসের অভিশাপই শেষ পর্যন্ত লেগে গেল।

ট্রেন স্পিড নিতেই হঠাৎ শ্রীবৎসের চিন্তা উপাসনার মাথায় ভিড় করে এল। শ্রীবৎস কি নবদ্বীপে ফিরে গিয়েছে? ওর সম্পর্কে উপাসনা শেষ যে খবরটা শুনেছিল, তা হল, অ্যাক্সিডেন্টের জন্য ও কটকের হাসপাতালে ভর্তি আছে। নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে ওঠেনি। নবদ্বীপে যদি সত্যিই ও ফিরে যেত, তা হলে ফলাও করে পরপুরুষের সঙ্গে লিঙ্গরাজ মন্দিরে ওর ঘোরা অথবা এক হোটেলে থাকার কথা এতদিনে রাষ্ট্র করে দিত। মা বাবার কানে সেই খবর পৌঁছে দিত পিসি। জগন্নাথ আছেন। না হলে শ্রীবৎসর ওই রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তবে এখন ওর নামে স্ক্যান্ডাল রটালেও কোনও ক্ষতি নেই। জয়দেবের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। মাকে উপাসনা বলতে পারবে, জয়দেবের সঙ্গে ও লিঙ্গরাজ মন্দির দেখতে গিয়েছিল। ব্যস, সাতখুন মাফ। এখনও জয়দেবকে মা দেখেনি, শুধু টেলিফোনে কথা বলেছে। তাতেই মায়ের এমন ইম্প্রেশন হয়েছে যে, ওর মতো ছেলে হয় না।

ট্রেন বালি স্টেশনে এসে দাঁড়াল। উফ, এখনও অনেক স্টেশন। বেলা দেড়টার আগে কিছুতেই ও বাড়ি পৌঁছতে পারবে না। বোন বলেছে, স্টেশনে এসে রিসিভ করবে। ওই সময় বাবার চেম্বার বন্ধ থাকার কথা, যদি না খুব বেশি পেসেন্ট থাকে। বাবাও চলে আসতে পারে বোন সুরোর সঙ্গে। সুরো খুব এক্সাইটেড জয়দেবকে নিয়ে। প্রায়ই নাকি

ফোনে কথা বলে জয়দেবের সঙ্গে। সুরো বলেই দিয়েছে, 'দিদি, তোর বরটাকে বলে দিবি, আমার সঙ্গে যেন চালাকি না করে। ভাবছে, জেলার মেয়েরা খুব আনস্মার্ট। কথা বলে ঘুলিয়ে দেওয়া যায়। আমার সঙ্গে কিন্তু পেরে উঠবে না।'

উপাসনা বলেছে, 'পারবি না। আমিই পারিনি, তুই পারবি কী করে?'

সুরো ওর থেকেও মিষ্টি দেখতে। জয়দেবকে ছবি পাঠিয়েছিল মেল করে। জয়দেব বলেছে, 'এ হে, ভুল হয়ে গেছে উপা। তোমাকে দেখার আগে যদি তোমার বোনকে দেখতাম, তা হলে তো ডিসিশনই নিতে পারতাম না।' কথাটা সুরোকে রিলে করেছিল উপাসনা। শুনে ও বলেছে, 'খবর্দার, এ দিকে যেন হাত না বাড়ায়। আমি অলরেডি বুকড হয়ে গিয়েছি।' উপাসনা ফোনে জানতে চেয়েছিল, সে কে? সুরো বলেছে, নবদ্বীপে এলে সব জানতে পারবি। এ বার গেলে হয়তো দেখা হবে, ওর মনের মানুষটি কে? নবদ্বীপেরই কেউ হবে। সুরো নবদ্বীপেই থাকতে চায়। বাবা মায়ের কাছাকাছি।

উল্টো দিকের সিটে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। অনেকটা স্বাতীর মতো দেখতে। স্বাতীর কেউ হয় না কি? অনেকক্ষণ দেখার পর উপাসনার একবার মনে হল, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তা হলে ভদ্রমহিলা নবদ্বীপ অবধি নিশ্চিন্তে বসতে দেবেন না। কথা বলেই যাবেন। উপাসনার এই অভিজ্ঞতা আগে হয়েছে ট্রেন জার্নিতে। ভদ্রমহিলার বয়স অবশ্য স্বাতীর থেকে অনেক বেশি। ছেলে, ছেলের বউকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছেন। কাটোয়া পর্যন্ত যাবেন। ছেলের বউটা মাথায় ঘোমটা দিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে। তার কোলে মাস দু'তিনেকের ছোট্ট বাচ্চা। বউয়ের মুখটা উপাসনা ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। তবুও এর মনে হল, বয়স আঠারো উনিশের বেশি না। এই বয়সেই বাচ্চার মা হয়ে গেল? উপাসনা একবার ওর বরের দিকে তাকাল। গম্ভীর হয়ে উলটো দিকে তাকিয়ে। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার, চব্বিশ পঁচিশ?

ভদ্রমহিলা কিছু জিজ্ঞেস করলেই বউটা মৃদুস্বরে উত্তর দিচ্ছে। ওদের কথাবার্তা শুনে উপাসনা বুঝতে পারল, বাচ্চার জন্ম দিতে ছেলের বউ কলকাতায় তার বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। এ বার বাচ্চা নিয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে। শাশুড়ি নিজে তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ভদ্রমহিলা সুযোগ পেলেই বকুনি দিচ্ছেন। বাচ্চা মানুষ করা অত সহজ নয়। মা হওয়া কঠিন।

শুনে উপাসনা জানলার দিকে তাকাল। জয়দেবের মাও কি এইরকম বকাবকি করবেন? ভদ্রমহিলাকে মাত্র একবারই দেখেছে উপাসনা। কাকার বাড়িতে দেখতে এসেছিলেন ওকে। খুব শান্ত স্বভাবের। কথাও বলেন খুব কম। প্রথম দেখাতেই ওর চিবুক ছুঁয়ে আদর করে উনি বলেছিলেন, 'আমার বাউন্ডুলে ছেলেটাকে চোখে চোখে রেখো মা।'

আচ্ছা, এমনও তো একদিন হতে পারে, আজ থেকে বছর দেড় দুয়েক পরে এই কাটোয়া লোকালেই হয়তো বাচ্চা নিয়ে ও কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। ওকে নিতে এসেছেন জয়দেবের মা। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করেই ... মনে মনে উপাসনা বলে উঠল, 'এ মা, না না।' এত তাড়াতাড়ি ও বাচ্চার মা হতে পারবে না। বিয়ের পর এখন বছর তিন

চারেক ওরা ঘুরবে ফিরবে। জয়দেব রিসার্চ শেষ করার পর, তবেই ওরা বাচ্চার কথা ভাববে। জয়দেবকে ও আগেই এ সব বলে দেবে। এই পরামর্শটা অবশ্য ওকে ভুবনেশ্বরে দিয়েছে স্বাতী। ও বলেছিল, 'আমিও একটু দেরিতে চেয়েছিলাম রে। কিন্তু কী করে যে প্রেগনেন্ট হয়ে গেলাম, বুঝতেই পারলাম না। এক একদিন প্রোটেকশন নেওয়ার টাইমই পেত না নবেন্দু। ও তখন এত রেকলেস ছিল, তোকে কী বলব। একবার ইচ্ছেটা জাগলে, ছেলেরা বড্ড তাড়াহুড়ো করে রে। না দিলে নবেন্দু খুব রেগে যেত। তার পর আমি ঠিক করলাম, ধুস... তোর জিনিস, তুই যেভাবে ইচ্ছে কর। আমি কিছু বলব না। উপা, তুই বাবা, আমার মতো ভুল করিস না।'

ভুবনেশ্বরে স্বাতীদের বাড়িতে ওরা দু'দিন ছিল। ওই দুটো দিন খুব আনন্দে কেটেছিল উপাসনার। আজ স্টেশনে আসার আগে ও ফোন করেছিল স্বাতীকে। জানিয়ে দেওয়ার জন্য, ও নবদ্বীপে যাচ্ছে। স্বাতী বলল, নবেন্দু কাল সম্বলপুরে গেছে। বাড়িতে ও একা। ও আর একটা খবরও দিল, যা শুনে চমকে উঠেছে উপাসনা। নরেশ জেনাকে কে বা কারা যেন কিডন্যাপ করেছে। ভোরবেলায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উনি কুকুরদের বিস্কুট খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা দুটো লোক জোর করে ওঁকে গাড়িতে তোলে। ঘটনাটা অনেকেই দেখেছে। কিন্তু কেউ এগোতে সাহস পায়নি। কেননা লোক দুটোর হাতে রিভলবার ছিল। নরেশ জেনার মতো আধ পাগল একটা লোককে কার এমন প্রয়োজন হল? ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনে কেউ বুঝতে পারছেন না।

চোখ বুজে নরেশ জেনার কথাই ভাবছিল উপাসনা। ট্রেন বেলুড় স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ খুলেই ও দেখল, ব্রততী ওর কামরাতেই উঠছে। এই ব্রততীর সঙ্গে রোজই ওর দেখা হত আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ওরই বয়সি, রিসার্চ করছে বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। প্রায় মাসখানেক পর ওকে দেখল উপাসনা। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ব্রততীর? চোখ মুখে কালি পড়ে গিয়েছে। কেমন যেন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে ওকে দেখে। রোজই বিকেল বিকেল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে যেত ব্রততী। ওর বয়ফ্রেন্ড এসে দাঁড়িয়ে থাকত চিড়িয়াখানার গেটে। ব্রততী কামরার উলটো দিকে চলে যাচ্ছে দেখে উপাসনা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'এই ব্রততী, এদিকে এসো।'

ডাক শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে এ দিকে তাকাল ব্রততী। ট্রেনের কামরায় ওকে হয়তো আশা করেনি। একটু অবাক হয়েই কাছে এসে ও বলল, 'উপাসনা, তুমি এখানে?'

'বাড়ি যাচ্ছি।'

'ও হ্যাঁ, তোমার বাড়ি তো নবদ্বীপের দিকে। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি কেন লাইব্রেরিতে? আমিও অবশ্য এ মাসের প্রথম থেকে আর যেতে পারছি না।'

উপাসনার পাশে একটা সিট খালি হতেই বসে পড়ল ব্রততী। উপাসনা বলল, 'আমি পুরীতে গিয়েছিলাম। রিসার্চের কাজে। সেই কারণেই লাইব্রেরিতে আর যাওয়া হয়নি। তা, তুমি এদিকে থাক না কি?'

'না। আপাতত কিছুদিন এসে রয়েছি। মামার বাড়িতে। শ্রীরামপুরে একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছি। যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছিল গড়িয়া থেকে।'

লাইব্রেরির ক্যান্টিনে কোন কোনদিন রিসার্চ নিয়ে যখন আলোচনা হত, তখন ব্রততী বলত, ডক্টরেট না করা পর্যন্ত চাকরি বাকরি নেব না। বিয়ে-থাও করব না। ওর কথা শুনে উপাসনা তখন ভাবত, ইস আমিও যদি ব্রততীর মতো স্বাধীন হতে পারতাম! এই একমাসের মধ্যে কী এমন হল, ব্রততী চাকরি নিয়ে ফেলল? প্রশ্নটা করা উচিত কী না, উপাসনা ঠিক করতে পারল না। তার আগেই ব্রততী বলল, 'তোমার রিসার্চ কদ্দূর এগোল উপাসনা? পুরীতে গিয়ে কি কমপ্লিট করতে পারলে?'

'না গো। সাবজেক্টটা এমন গোলমেলে...'

'মাঝে টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম... বোধহয় একটা হিন্দি চ্যানেলেই। শ্রীচৈতন্যদেবের পুনর্জন্ম নিয়ে। তুমি কি দেখেছ সেই প্রোগ্রামটা?'

'না তো। কী দেখাল গো?'

'পুরীতে ফের তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরে তিনি নাকি একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। একটা মৃত বাচ্চাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সে কী, তুমি এই প্রোগ্রামটা দেখনি? এখান থেকে অনেকেই তো এখন পুরী যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে। পুরীতে গম্ভীরা বলে না কি একটা হোটেল আছে, এখন তিনি সেখানে আছেন। আমার এক মাসতুতো দাদা গেছেন ওখানে। এখনও ফিরে আসেননি। ফিরে এলে তাঁর মুখ থেকে সব শুনতে পাবো।'

উপাসনা অবাক হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। আরে ... গম্ভীরা হোটেলেই তো ও এতদিন ছিল। কই, কেউ তো অলৌকিক ঘটনাটার কথা ওদের বলেনি? ও পুরীতে থাকাকালীন এই ঘটনা ঘটে থাকলে নিশ্চয় কেউ না কেউ ওর বা জয়দেবের কানে পৌঁছে দিত। তার মানে ... ওরা পুরী থেকে বেরিয়ে আসার পর এ সব হয়েছে। স্বাতীকে রাতে ফোন করে জানতে হবে, ও কিছু শুনেছে কী না। না, না ... নবেন্দুকে ফোন করতে হবে। ওর এ সব ব্যাপারে আগ্রহ আছে। কিন্তু নবেন্দু যে এখন সম্বলপুরে। উপাসনা খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে বলল, 'টিভিতে তুমি কী দেখেছ, ডিটেলে বলবে?'

'আরে ... ওরা একটা প্রোগ্রাম দেখায়, 'মানো ইয়া না মানো'। শনি-রবিবার রাতের দিকে সেই প্রোগ্রামে এ সব অদ্ভুত জিনিস দেখায়। চ্যানেল সার্ফ করতে করতে হঠাৎই সেদিন আমার চোখে পড়ল। পুরীর মন্দিরে এক সন্ন্যাসী একটা মৃত বাচ্চাকে বাঁচিয়ে তুললেন। স্রেফ হরি সংকীর্তন করে। ফুটেজ কোত্থেকে পেল, কে জানে? সত্যি বলতে কী, সেই সন্ন্যাসীকে একদম চৈতন্যদেবের মতো দেখতে। মানে... ছবিতে আমরা চৈতন্যদেবকে যে রকম দেখি, ঠিক সেই রকম।'

ব্রততীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উপাসনা হঠাৎ লক্ষ করল, উলটো দিকে বসা বয়স্ক ভদ্রমহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে ওদের কথা শুনছেন। নাহ্, ট্রেনে বসে এ সব কথা আলোচনা করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। যে বিপদের মধ্যে ও পড়েছিল! কে বলতে

পারে, শয়তান পদ্মনাভর লোকজন ওকে এখনও ফলো করে যাচ্ছে কী না? প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য নীচু গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা এখন কোন স্টেজে আছে ব্রততী? দেখাদেখি, ঘোরাঘুরি, মেশামেশি তো হয়ে গিয়েছে অ্যাদ্দিনে। মানে প্রেমের তিনটে স্টেজ তো পেরিয়ে গিয়েছ...'

ব্রততী মুখ শুকনো করে বলল, 'কাটাকাটির স্টেজে। একটা স্কাউন্ড্রেলকে আমি ভালোবেসে ছিলাম বুঝলে? আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিল।'

'কী বলছ তুমি!' অবাক হয়ে উপাসনা বলল, 'কাটাকাটি হয়ে গেছে মানে?'

'মানে ছাড়াছাড়ি। বাস্টার্ডটা শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল। বাড়িতে বউ রেখে আমার সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিল। জানো, সেই বউ আমার বাড়িতে গিয়ে যাচ্ছেতাই ইনসাল্ট করল আমার বাবা-মাকে। ভয় দেখাল, আর যদি মেশামেশি করি, তা হলে গুন্ডা নিয়ে গিয়ে বাড়িতে চড়াও হবে। মা তো অসুস্থই হয়ে পড়েছিল সেই সময়। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একদিন কয়েকটা ছেলে ঘিরে ধরল আমায়। কী বলল শুনবে? মৃগাঙ্কদার অনেক টাকা খসিয়েছিস তুই। সোনাগাছিতে তোর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আরও সব নোংরা কথা। তাই লাইব্রেরিতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বাবা বলল, তুই কিছুদিন মামার বাড়িতে গিয়ে থাক। কপাল ভালো, শ্রীরামপুরে একটা স্কুলে বাংলা পড়ানোর চাকরি পেয়েছি। তাই বেঁচে গেছি।'

ট্রেনের স্পিড কমে আসছে। বোধহয় সামনেই কোনও স্টেশন। কথা বলা শেষ করে ব্রততী চট করে উঠে দাঁড়াল, 'এই চলি। শ্রীরামপুর স্টেশন এসে গিয়েছে। তোমার কথা কিছুই জানা হল না। তোমার ফোন নম্বরটা দাও। পরে ফোন করব।'

ব্রততী নেমে যাওয়ার পর উপাসনা থম মেরে বসে রইল। কী নাম বলল, ওর বয়ফ্রেন্ডের? মৃগাঙ্ক। ওই ছেলেটাকে কী ভালোই না বাসত ব্রততী। তার এই পরিণতি? ছেলেরা এই রকমই হয় না কি? ব্রততীর দুর্দশার কথা শুনে একটা অজানা আশঙ্কা ওকে ঘিরে ধরল। জয়দেব যদি ওর সঙ্গে কোনওদিন প্রতারণা করে? তা হলে হয়তো ও মরেই যাবে। জয়দেব ছাড়া বাঁচা ওর পক্ষে সম্ভবই না। পরক্ষণেই নিজের মনকে উপাসনা সান্ত্বনা দিল, না না, জয়দেব সে রকম ছেলেই নয়।

শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ উপাসনার কানে এল, 'তুমি কদ্দূর যাবে মা?'

উলটো দিকের ভদ্রমহিলা। চোখ খুলে ও বলল, 'নবদ্বীপ।'

'তোমাদের কথাবার্তা শুনছিলাম। তুমি শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে রিসার্চ করছ? তা হলে কাটোয়ায় আমার বাড়িতে একবার এসো। কাটোয়ায় উনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আমার বাড়ির সিন্দুকে প্রাচীন দুটো পুঁথি আছে। তোমায় দেখাতে পারব। তোমার কাজে লাগতে পারে।'

চুয়াত্তর

প্রভা পাণিগ্রাহী চলে যাওয়ার পর থেকে ঘরের দরজা আর খোলেনি গোরা। পুরী থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। মনে হচ্ছে; এমন কোনও জায়গায় চলে যেতে, যেখানে ওকে কেউ চিনবে না। আর পাঁচটা লোকের মতো নিশ্চিন্তে ও জীবন কাটাতে পারবে। একটু আগে যা ঘটে গেল, এখনও তার ঘোর ও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এতদিন ও বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে ছিল। এখন মনে হচ্ছে, না, টুবাইরা যা বলছে, হয়তো ঠিক। পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে যা ঘটেছিল, অনুরূপ ঘটনা ওর জীবনেও ঘটে চলেছে। নাহ, এই জীবনটা তো ও কখনও চায়নি। ও নিজে দলিত বলে, দলিত জাতির কাজে লাগতে চেয়েছিল। পুরীতে ধর্মান্ধ মানুষদের মাঝে আর কিছুদিন থাকলে ও পাগল হয়ে যাবে। ওকে ফের কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

রাতেই গোরা ঠিক করল, সবার অলক্ষে ও পুরী থেকে বেরিয়ে যাবে। প্রথমে ও ভুবনেশ্বরে যাবে মায়ের কাছে। তার পর সুবিধামতো সময়ে কলকাতায়। ওখানে বিরাট জনপদের মাঝে ও আগের মতোই নিশ্চিন্তে ঘুরে বেরাবে। কিন্তু গভীর রাতে দরজা খুলেই ও দেখে, মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে শুয়ে আছে মুকুন্দ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওকে টপকে সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে গোরা পিছন ফিরে দেখল, মুকুন্দ পাশ ফিরে শুল। বেচারা সারাদিন ওকে চোখে চোখে রাখে। সারাদিন ওপর নীচ করে। নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। ওকে নিয়ে গোরা খুব মুশকিলে পড়েছে। চারপাশের ঘটনাবলীতে মুকুন্দ এমন মোহগ্রস্ত যে, আর কলকাতায় ফেরার নামই করছে না। অথচ ওর এখনও বি টেকের সেমিস্টার বাকি রয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমেই গোরা অবাক হয়ে গেল। রিসেপশনের দরজাটা হাট করে খোলা। সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছেন রেড্ডি কাকা, কলকাতার রাসবিহারীবাবুসহ আরও অনেকে। দেখে একটা হিমস্রোত ওর মেরুদণ্ড বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। এ কী! ঘোর সংসারী সব মানুষ, পরিবার ছেড়ে এখানে এভাবে দিন কাটাচ্ছেন। কীসের মোহে? আশ্চর্য, ও তো কাউকে আসতে বলেনি। সব থেকে বড় কথা, ও জানেও না, রাসবিহারীবাবু পুরীতে এসেছেন। উফ্, এঁরা সবাই ওকে মহাপুরুষ বলে ধরে নিয়েছেন। ওর সান্নিধ্যে থাকতে চাইছেন। মহাপুরুষ... কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর পা আটকে গেল। একটা পা করে পিছু হটে ও আবার উঠে এল পাঁচতলায়।

নিজের ঘরে ঢোকা মাত্রই পুরো ঘটনাটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই ঘণ্টা পাঁচেক আগে... ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল প্রভা পাণিগ্রাহী বলে মেয়েটা। ওর ঔরসে সন্তান চাইছিল। ব্লাউজ খুলে ফেলেছিল। ভরাট দুটো স্তন উন্মুক্ত। শাড়িও ও ডিভানের উপর ছুঁড়ে ফেলে দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আসুন প্রভু, আমার মনস্কামনা পূর্ণ করে দিন।'

ওর যৌনতাড়িত মুখটা দেখে গোরা কড়া গলায় ধমক দিয়েছিল, 'তুমি এখুনি চলে যাও। না হলে আমি লোকজন ডাকব।'

মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল প্রভা পাণিগ্রাহীর মুখ। হিংস্র হয়ে উঠেছিল এই ক্রন্দনরত মুখ। মেয়েটা বলেছিল, 'লোকজন ডাকবেন। ডাকুন। তাদের আমি বলব, সারাটা দিন বসিয়ে রেখে, গভীর রাতে নিজের ঘরে ডেকে আপনি আমায় রেপ করার চেষ্টা করেছেন। সারাটা দিন এখানে আমায় অনেকেই দেখেছে। তারা সাক্ষী দেবে। কাল সকালেই আমি টিভি চ্যানেলে গিয়ে আপনার কথা রাষ্ট্র করে দেব। আপনি ভণ্ড। আপনাকে অ্যারেস্ট করা উচিত।'

শুনে মেঝেতে পা আটকে গিয়েছিল গোরার। ওর সন্দেহটাই তা হলে ঠিক। ষড়যন্ত্র। ওর বদনাম করার জন্য মেয়েটাকে কেউ পাঠিয়েছে। কী করে মেয়েটার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে, ও ভেবে উঠতে পারল না। হঠাৎ দেখল, ঘরের নীল আলোটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বেল আর জুঁই ফুলের গন্ধ ঘরের ভেতরে ভরে যাচ্ছে। দূর থেকে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরের পরিবেশ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য, কে যেন ওকে বলিয়ে নিল 'বজ্র', 'বজ্র'। জোর গলায় কথাটা বলার পরই দমকা হাওয়ায় সমুদ্রের দিককার দরজাটা খুলে গেল। সাদা আলোর একটা চক্র ঘরের ভেতর ঢুকে, মৌমাছির গুনগুনানির মতো শব্দ করে, ঘুরতে লাগল ঘরের ভিতর।

মেয়েটা ওকে জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল। বিস্ফারিত চোখে ও চক্রটার দিকে তাকিয়েছিল। সেই সময় গোরা আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল ওর মুখে। তখনই বলেছিল, 'ভালো চাও তো, এখনই চলে যাও। না হলে এই চক্র তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে দেবে।'

চক্রটা ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশই বৃত্তটা ছোট করে আনছিল। একবার ওর শরীর ছুঁয়েও বেরিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটা তখন বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। আপনাকে পরীক্ষা করতে এসে আমি অপরাধ করেছি। আমাকে চলে যেতে দিন।'

মিনিট কয়েক পর পায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে প্রভা পাণিগ্রাহী যা বলেছিল, তা শুনে গোরার মুখ ঘৃণায় কুঁচকে উঠেছিল। মেয়েটা বলেছিল, আসলে ও টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার। চ্যানেল ওড়িশার। ওরা নাকি ওলিউড চ্যানেলের রাইভাল। ওলিউড চ্যানেল গোরাকে মহাপুরুষ বানিয়ে দিয়ে টিআরপি অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে। সেই কারণে ওকে বেইজ্জত করার জন্য চ্যানেল ওড়িশা প্রভাকে পাঠিয়েছিল। স্টিং অপারেশন করার জন্য। প্রভা বলল, ওর সঙ্গে একটা ক্যামেরাও আছে। সেটা ফিট করে রেখেছে ডিভানের উলটো দিকের টেবলের উপর। যৌন সম্পর্কের পুরো ছবি তাতে উঠে যেত। সেই ফুটেজ ওরা দরকার হলে দেখাত ওদের প্রোগ্রামে। চ্যানেলে চ্যানেলে রেষারেষির কথা গোরা শুনেছে। কলকাতাতেও ওর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ে নিজের বদনামের ঝুঁকি নিয়েও এই স্টিং অপারেশন করবে? কেন? প্রভা বলল, ও তালচেরির মেয়ে।

বহুদিন ধরে ফ্রিল্যান্সিং করছে। এই ফুটেজটা নিয়ে যেতে পারলে, ওর চাকরি নাকি পাকা হয়ে যেত।

মেয়েটাকে গোরা ক্ষমা করে দিয়েছে। তারপর আশ্বাস দিয়েছে, চিফ মিনিস্টারকে বলে একটা সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। ও চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল গোরা। একটা বিপদ কাটিয়ে ওঠার থেকেও বড় প্রশ্ন ওকে ভাবনায় ফেলেছিল, কে ওকে দিয়ে 'বজ্র বজ্র' কথাটা বলিয়ে নিল। মনের ভিতরে ডুব দিয়ে হঠাৎ ও উত্তরটাও পেয়ে গিয়েছিল। অতীতে গিয়ে ... ও একবার একটা দৃশ্য দেখেছিল। নবদ্বীপে জগাই-মাধাই কলসির কাণা ছুঁড়ে যখন নিত্যানন্দকে আঘাত করেছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেবকেও ক্রুদ্ধ হয়ে 'বজ্র বজ্র' কথাটা বলতে শুনেছিল। আর তখনই আলোর একটা চক্র এসে জগাই-মাধাইকে ভয় দেখাতে শুরু করে। হয়তো ওর অবচেতন মনে এই কথাটা গাঁথা ছিল। প্রভা বলে মেয়েটার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোনও উপায় না দেখে বলে ফেলেছে।

কী হত, যদি মেয়েটা যদি ক্যামেরায় তোলা ওই বিশ্রী ছবি নিয়ে বেরিয়ে যেত? কথাটা ভাবতে ভাবতেই রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলায় গোরা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে থাকার সময় ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। গভীর রাতে ও কোনও এক কুঞ্জবনে গিয়েছে। কাঁধ উঁচু গাছের ফাঁকে ঘুরে বেরাচ্ছে। মিষ্টি বাঁশির সুর ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছে কুঞ্জবনে। বংশীবাদক কে, তাকে খুঁজছে গোরা। মনটা খুব উতলা হয়ে উঠেছে তাকে দেখার জন্য। যেন তাকে দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যাবে। কুঞ্জবনের ভেতর এক সরোবরের কাছে পৌঁছল গোরা। গাছের আড়াল থেকে দেখতে পেল, সরোবরের ও প্রান্তে একদল যুবতী মস্করা করছে নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যমণি অপূর্ব এক সুন্দরী।

এক কদম্ব গাছের তলায় বসে রয়েছে সেই সুন্দরী। এ প্রান্ত থেকে যুবতীদের কথা শুনতে পাচ্ছিল গোরা। একজন বলল, 'তোর শ্যাম আজ আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না রে। মনে হয়, বিশাখার সঙ্গে কোথাও সে প্রেমে মজেছে। চল রাধে, তোকে বাড়িতে রেখে আসি।'

সুন্দরী মেয়েটার নাম তা হলে রাধে। সে বলল, 'হতেই পারে না। সখী, আমার শ্যাম অন্য কাউকে প্রেম নিবেদন করতেই পারে না। তোরা আমাকে ভুল বোঝাচ্ছিস। খুঁজে দ্যাখ, সে এই কুঞ্জবনের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। শুনছিস না, সে কোথাও বাঁশি বাজাচ্ছে? তার বাঁশির সুরের জাদু এমনই যে, আমি ঘরে থাকতেই পারব না। শ্যামের বিরহ জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না রে।'

সখীদের অন্য একজন বলল, 'সারা কুঞ্জবন আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি রাধে। কোথাও সে নেই। চল, আর রাত করে কাজ নেই। ধরা পড়ে গেলে ফের তোকে শাশুড়ির গঞ্জনা শুনতে হবে।'

রাধে বলল, 'সেই গঞ্জনাতে সুখ আছে রে। তোরা তো জানিসই, আমার শ্যাম চট করে ধরা দিতে চায় না। তাকে পেতে গেলে অনেক কষ্ট পেতে হয়। দেখিস, একটু

পরেই সে এসে হাজির হবে। মুখে দুষ্টুমির হাসি নিয়ে। আমাকে বাহুডোরে বাঁধবে।'

একজন বলল, 'সেই আশাতেই তুই বসে থাক। আর সে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াক।'

অন্য যুবতীরা হেসে উঠল সে কথায়। কিন্তু রাধে বলে সেই সুন্দরী কেঁদে ফেলল শুনে। বলল, 'ওর সম্পর্কে এমন কঠিন কঠিন কথা বলিস না সখী। আমি যে সহ্য করতে পারি না। আমার শ্যাম আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারেই না। তাছাড়া আমার মতো কেই বা ওকে ভালোবাসবে, বল? ওকে পেতে গেলে আমার মতো উতলা হতে হবে। এ সব মর্ম তোরা বুঝবি না।'

সরোবরের এ প্রান্ত থেকে সব শুনতে পাচ্ছে গোরা। হঠাৎ ও প্রান্তের কুঞ্জবন সাদা আলোয় ভরে উঠল। যেন হাজার চাঁদের জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আলো দেখে যুবতীদের মধ্যে হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। সুন্দরীকে কদম্ব গাছের তলায় বসিয়ে রেখে অন্যরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গোরা দেখল, দু'হাত পিছনে রেখে পা টিপে টিপে একজন কদম্ব গাছের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর গায়ের রং শ্যামবর্ণ। মাথায় ময়ূরের পালক। দেখেই তাঁকে চিনতে পারল, এই তো সেই মহান পুরুষ, বিশ্ববিধাতা। যাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সাধনা করে যাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি কাছে এগিয়ে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল গোরার। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করে ফেলল।

বেলা ন'টার সময় ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল মুকুন্দ। 'প্রভু, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চিফ মিনিস্টার এসে পড়বেন। আপনি স্নান সেরে নিন।'

মুকুন্দকে অনেকবার প্রভু বলে ডাকতে বারণ করেছে গোরা। ছেলেটা শোনে না। বকাবকি করলে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে। কোনও কথা না বলে গোরা মেঝে থেকে উঠে পড়ল। বেলা দশটার সময় প্রতাপ পট্টনায়েকের আসার কথা। ভাগ্যিস মুকুন্দ ওকে তুলে দিল। ভালোই হল, কাল রাতে ও হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি। অবধূতজিকে ও কথা দিয়েছিল, চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে বসিয়ে দেবে। সেই কাজটা না করে, ভুবনেশ্বর পালিয়ে গেলে, অবধূতজি ওর সম্পর্কে একটা বিশ্রী ধারণা করতেন। বাথরুমে ঢোকার আগে মুকুন্দকে ও বলল, 'টুবাই কোথায় রে?'

মুকুন্দ বলল, 'টুবাইদা মা চিন্ময়ীর আশ্রমে গেছেন। অবধূতজিকে নিয়ে আসতে।'

কথাটা বলে মুকুন্দের চলে যাওয়ার কথা। তবুও ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোরা জিজ্ঞেস করল, 'কীরে, তুই কি কিছু বলবি?'

বলতে গিয়েও মুকুন্দ নিজেকে সামলায়, 'এখন বলব, না কি পরে শুনবেন।'

'না, এখনই তুই বল। কোনও খারাপ খবর নাকি। ভুবনেশ্বর থেকে মায়ের কোনও ফোন এসেছিল?'

বলবে না বলবে না করেও মুকুন্দ বলে ফেলল, 'কাল রাতে যে মেয়েটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সে সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে।'

শুনে গোরা চমকে উঠল। বলল, 'ডুবে গেছে মানে? তুই কি করে জানলি?'

ভোরবেলায় আমি স্নান করতে গেছিলাম। তখনই দেখলাম, ওই মেয়েটা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এখানে বেশ কয়েক দিন এসেছে তো। তাই মুখটা খুব চেনা হয়ে গেছিল। দেখলাম, নুলিরা সব ভিড় করে আছে। ওরাই পুলিশে খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে এই একটু আগে ডেড বডিটা নিয়ে গেল।'

'পুলিশ কিছু বলছিল?'

'বলল, মেয়েটা সুইসাইড করেছে।'

'মেয়েটা যে এখানে এসেছিল, সে কথা কি তুই কাউকে বলেছিস?'

'না, বলিনি। মনে হয়, কাল রাতে মেয়েটা আর বাড়ি ফিরে যায়নি। রিসেপশনে ঘণ্টাখানেক চুপ করে বসেছিল। তার পর আর ওকে দেখিনি...'

মুকুন্দর বাকি কথা শোনার জন্য গোরা আর দাঁড়াল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। দিনের শুরুতেই একটা দুঃসংবাদ। শুনে মনটা খুব ভারী হয়ে গেল। কাল রাতে প্রভা পাণিগ্রাহী যখন নেমে গিয়েছিল, তখন রাত প্রায় দশটা। তখন ওকে খুশি বলেই মনে হয়েছিল গোরার। তার পর ওর কী এমন হল যে, আত্মহত্যা করে ফেলল? আত্মগ্লানি? অপরাধবোধ? না কি পেশাদারি জগতের মারাত্মক চাপ। এমনও হতে পারে, মেয়েটা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চ্যানেল থেকে কোনও ফোন পেয়েছিল। হয়তো ওরা জানতে চেয়েছিল, কাজটা হয়ে গেছে কি না। ও না বলার পর, হয়তো ওকে কটু কথা শুনতে হয়েছে।

ঘরের ভেতর কারও মোবাইল ফোন বাজছে। অন্য রকম রিং টোন। কার হতে পারে? ইদানীং গোরা আর মোবাইল ফোনটা নিজের কাছে রাখে না। মুকুন্দই ফোন ধরে। রিং টোন শুনে, হঠাৎই গোরার মনে হল, প্রভা বোধহয়, ওর মোবাইল ফোন ফেলে রেখে গিয়েছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ও দেখল, যা ভেবেছে, ঠিক তাই। প্রভা পাণিগ্রাহীরই সেট পড়ে আছে। ফোনটা তুলে সুইচ অন করতেই ও প্রান্ত থেকে ভরাট গলা শুনতে পেল গোরা, 'মিনিস্টার গোবিন্দ সাহু বলছি। ফুটেজ নিয়ে এখুনি চ্যানেলে চলে এসো। ভণ্ড সাধুটাকে আজই এক্সপোজ করে দেব।'

পঁচাত্তর

সকাল থেকে মনমোহন বলে মিষ্টির দোকানটায় বসে আছে পুরন্দর। পূজ্যপাদ পদ্মনাভর জন্য। কাল রাতে আত্মানন্দ খবর দিয়েছে, পদ্মনাভ পান্ডা ভুবনেশ্বরে আসবেন। লিঙ্গরাজ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের এক কর্তার সঙ্গে মিটিং করার জন্য। আত্মানন্দ এই খবরটা জানতে পেরেছে, হেড কোয়ার্টার্স থেকে নিয়ে যাওয়া হার্ড ডিস্ক মারফত। আত্মানন্দের সঙ্গে ওর খুব বেশি কথা হয়নি। ও শুধু বলল, 'এমন সব খবর জানতে পেরেছি, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। একটা তথ্য তোমাকে দিচ্ছি, তোমার পদ্মনাভ

কয়েকশো কোটি টাকার মালিক। ফান্ডিং হত আমেরিকা থেকে। সব খুঁজে বের করে ফেলব। আমার আরও দু একটা দিন লাগবে, তথ্যগুলো খতিয়ে দেখতে।'

মনমোহন দোকানটা বিন্দুসায়রের ঠিক উলটো দিকে। পার্কিং স্পেসের গায়েই। পুরন্দর জায়গাটা বেছে নিয়েছে, এটা আন্দাজ করে, পদ্মনাভ গাড়িতে করে আসবেন। পার্কিং স্পেস থেকে মন্দির কয়েকশো মিটার। এই রাস্তাটা ওঁকে হেঁটে যেতে এবং ফিরতে হবে। আজ সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। প্রচুর লোক মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। ভিড়ের মাঝে মিশে গিয়ে কাজ হাসিল করবে পুরন্দর। ওর তৃতীয় আর শেষ প্রতিজ্ঞাটা পালন করবেই। পূজ্যপাদকে গুলি করে মারবে। তারপর একটা অটো রিকশা নিয়ে চলে যাবে মায়ের বাড়ি। পূজ্যপাদ যাতে ওকে চিনতে না পারেন, তার জন্য ভোল একেবারে বদলে ফেলেছে ও। চুল, গোঁফ, দাড়ি সব কামিয়ে ফেলেছে ভোরবেলায়। গেরুয়া লুঙ্গি আর ফতুয়া পরেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি পুরন্দর। তখন ওর খুব হাসি পেয়েছিল। ওকে দেখতে একেবারে সন্ন্যাসীদের মতো লাগছে। কেউ ভাবতেই পারবে না, ও অনেকগুলো মার্ডার করেছে।

পূজ্যপাদ কখন আসবেন, কে জানে? বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে পুরন্দর দোকানের ভিতর দিকে তাকাল। উলটো দিকের টেবলে দু'টো ছেলে বসে আছে। নীচু স্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। গোরা ভাইয়ের বয়সিই হবে। ওদের কথাবার্তা শুনেই পুরন্দর জানতে পারল, ফর্সা সুন্দর মতো ছেলেটার নাম দাসুয়া। সে পুরী থেকে এসেছে। অন্যজনকে সে ব্যবসা বোঝাচ্ছে। পুরীর মন্দির সম্পর্কিত কোনও ব্যবসা। এই কারণেই পুরন্দর আকৃষ্ট হল। ছেলে দুটো যাতে বুঝতে না পারে, সে জন্য ফের বাইরের দিকে তাকিয়ে, পুরন্দর শুনতে লাগল দাসুয়ার কথা। 'আমি তো একটা চেন করার কথা ভাবছি। ভুবনেশ্বরেই দশ বারোটা স্টল খোলার কথা। যদি দেখি, ভোগের বিজনেস প্রফিটেবল হচ্ছে, তা হলে পুরো ইস্টার্ন জোনে ছড়িয়ে দেব।'

অন্য ছেলেটা বলল, 'ভোগ যদি নষ্ট হয়ে যায় দাসুয়াদা? তখন কী হবে?'

'নষ্ট হবে কেন? সেভাবেই প্যাকেজ করে পাঠাব। মন্দিরের অন্নদান ভোগ কমিটি, যেভাবে ডোনারদের কাছে ভোগ পাঠায়, আমরাও সেইভাবে পাঠাব। শোন, মন্দিরের ভেতর আমরা একটা এনজিও খুলেছি। তার নাম তীর্থযাত্রী সহায়ক সমিতি। আমার বয়সি তিরিশটা ছেলে সমিতিতে রয়েছে। পরিষ্কার কথা ভাই, এনজিওর জন্য আমার টাকার দরকার। তবে পান্ডাদের মতো খাবলে টাকা আদায় করে নয়, বুদ্ধি খরচ করে আমরা টাকা তুলব। তখনই আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে।'

কথাটা শুনে পুরন্দর চমকে তাকাল দাসুয়া বলে ছেলেটার দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের। কিন্তু এর সঙ্গে মন্দিরের সম্পর্কটা কী? পান্ডাদের নিন্দে করছে এখানে বসে। বুকের পাটা আছে। জগন্নাথ মন্দিরের ভোগ পুরীর বাইরে বিক্রি করার কথা ভাবছে। সত্যিই, ভুবনেশ্বর বা কলকাতায় বসে যদি কেউ নির্দিষ্ট স্টল থেকে ভোগ কেনার সুযোগ পায়, তা হলে তো হু হু করে বিক্রি হবে। মন্দিরে অবশ্য অনেক রকমের ভোগ। তার

মধ্যে নানারকম শুকনো ভোগও আছে। দূরে পাঠাতে অসুবিধা হবে না। খিচুড়িপ্রসাদ, মালপোয়া ভোগও আছে। সব থেকে দাম বেশি মাখন ও মিছরিভোগ। ওদের আশ্রমে জগন্নাথের ভোগ খেয়েই তো পুরন্দররা এত বড় হয়েছে।

'ভোগের প্রাইসিংটা কী রকম হবে দাসুয়াদা?'

'সেটা তোদের সঙ্গে বসে ঠিক করতে হবে। মন্দিরে নিমকদার খিচুড়িভোগের দাম সব থেকে কম। ২৫ টাকা থেকে ৪০০ টাকা। এখানে দামটা ৪০ থেকে শুরু করতে পারিস। তবে একবার মার্কেট সার্ভে করে নিস। যদি দেখি, পপুলার হচ্ছে, তা হলে দিনে পাঁচবারের ভোগও পাঠাতে পারি। না রে ভুল বললাম, রাতে বড়শৃঙ্গার ধূপ পাঠানো যাবে না। তার চেয়ে বরং, ভোরবেলায় প্রথম ভোগ ... যাকে বলে গোপালবল্লভ, আর সকালে সকাল ধূপ ও মধ্যাহ্ন ধূপ পাঠিয়ে দেব। বিকেলে বেলায় স্টল থেকে তোরা বিক্রি করবি। হ্যাঁ, স্টলের লুকটা যেন ভালো হয়। আর সেটা লোকাল কোনও মন্দিরের কাছাকাছি হলে আরও ভালো।'

'বাব্বা, তুমি তো অনেক ভেবে চিন্তে এসেছ দেখছি।'

'ভাবনা-চিন্তা না করলে হবে? সব কিছুতেই কর্পোরেটাইজেশন দরকার বুঝলি। আমার মাথায় আরও অনেক ব্যবসার কথা ঘুরছে। পরে তোদের সঙ্গে শেয়ার করব। তুই আর বেশি ভাবিস না। কোমর বেঁধে নেমে পড়। ওই যে... আমার বাবা এসে পড়েছেন। চিফ মিনিস্টারের কাছের লোক। বাবা ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সুযোগে আমিও ভাবলাম, তোর সঙ্গে একবার কথা বলে যাই। তাই বাবার সঙ্গে চলে এলাম। কাল অথবা পরশু তুই বরং একবার মন্দিরে আয়। ফাইনাল কথা হবে তখন। দাঁড়া, তোর সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিই।'

বাঁ দিকে তাকিয়ে পুরন্দর দেখল, রামচন্দ্র দইতাপতি দোকানের ভিতর ঢুকে এলেন। এই রে, চোখে পড়ে গেলে মুশকিল হবে। টেবলের উপর একটা খবরের কাগজ পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করল পুরন্দর। এমনিতেও অবশ্য ওকে চিনতে পারার কথা নয় পূজ্যপাদর। পুরন্দর খুশি হল জেনে, দাসুয়া রামচন্দ্র দইতাপতির ছেলে। বাঃ, কথাবার্তায় তো খুব চৌখস ছেলেটা। পুরন্দরের মনে পড়ল, বেলি নানী অনেকদিন আগে একবার বলেছিলেন, রামচন্দ্রের ছেলে না কি দিল্লিতে পড়াশুনো করে। এ সেই ছেলে না কি? হতে পারে। কথাবার্তা শুনেই মনে হচ্ছে, বাবার মতোই সৎ।

পূজ্যপাদকে দেখে দোকানের মালিক হাতজোড় করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলে পূজ্যপাদ বললেন, 'এখানে এসে কোনও লাভ হল না দাসুয়া। চিফ মিনিস্টার এখানে নেই। উনি ভোর বেলাতেই পুরী গিয়েছেন গোরাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ হয়তো আর ফিরবেন না। ওঁর সিএ বললেন, জগৎসিংহপুরে নাকি খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে সকাল থেকে। পুরী থেকে উনি জগৎসিংহপুরে চলে যেতে পারেন।'

দাসুয়া বলল, 'আপনি গেস্ট হাউসে যাবেন, নাকি সোজা পুরীতে?'

এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। পদ্মনাভ না কি একটু পরেই লিঙ্গরাজ মন্দিরে

আসবে। ওকে অ্যাভয়েড করতে চাই। চল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই।'

আশপাশ না তাকিয়েই ছেলেদের নিয়ে পূজ্যপাদ বেরিয়ে গেলেন। পুরন্দর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটু আগে একটা কথা খট করে ওর কানে এসে বাজল। পূজ্যপাদ বললেন, চিফ মিনিস্টার পুরীতে গোরাবাবুর কাছে গেছেন। গোরাবাবু মানে কি ওর গোরাভাই? হতেও পারে। গোরাভাই দলিত পার্টির নেতা। হয়তো চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণেই গোরাভাইয়ের যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু ও কেন পুরীতে? পুরন্দর ধন্ধে পড়ল, এ ওরই গোরাভাই কি না। মায়ের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে ওর সঙ্গে গোরাভাইয়ের আর যোগাযোগ হয়নি। আজ মায়ের কাছে গেলে হয়তো জানা যাবে, ও পুরীতে গিয়েছে না, ভুবনেশ্বরেই আছে।

খবরের কাগজটা মুখের আড়াল থেকে সরিয়ে পুরন্দর টেবলের উপর রাখল। হঠাৎ প্রথম পাতার একটা ছবির দিকে ওর নজর গেল। বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ছবির নীচে লেখা খবরটা ও দ্রুত পড়তে শুরু করল। প্রাচীন মন্দিরের ভেতর অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণে জীর্ণ মন্দিরের যে অংশ ভেঙে পড়েছিল, তার ভেতর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। খুবই বিকৃত অবস্থায়। কয়েকটি মৃতদেহ দেখে পুলিশের ধারণা হয়েছে, কেউ খুবলে খুবলে খেয়েছে। খবরটা পড়ে কেঁপে উঠল পুরন্দর। কাত্যায়ণীদের কাজ নয়তো? রাতের অন্ধকারে আকাশ থেকে নেমে এসে হয়তো শবভক্ষণ করে গিয়েছে। ক্যাতায়ণীদের কথা মনে পড়ায় পুরন্দর ঘামতে শুরু করল।

সেই সময় ওকে বাঁচিয়ে দিল আত্মানন্দের ফোন, 'তোমার পূজ্যপাদ আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পার্কিং স্পেসে পৌঁছে যাবে। তুমি যেখানে আছ, সেখানেই বসে তাকে দেখতে পাবে।'

শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পুরন্দর। বেশি কথা বলতে মানা করে দিয়েছে আত্মানন্দ। তাই হু বলে লাইনটা কেটে দিতে যাচ্ছিল ও। ও দিক থেকে আত্মানন্দ বলল, 'একাই আছে। মন্দিরে ঢোকার আগেই কাজটা সেরে ফেলো। ওর ফেরার জন্য অপেক্ষা কোরো না। তখন সঙ্গে লোক থাকতে পারে। আমি পার্কিং স্পেসেই আছি। গাড়ির নাম্বার সিক্স টু সেভেন নাইন।' বলেই আত্মানন্দ লাইন কেটে দিল।

চমকে পার্কিং স্পেসের দিকে তাকাল পুরন্দর। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কোনটা সিক্স টু সেভেন নাইন, খুঁজে পেতে সময় লাগবে। আত্মানন্দ যে হাজির থাকবে, পুরন্দর তা ভাবতেই পারেনি। কাল রাতে যখন ওরা পূজ্যপাদকে মেরে ফেলার প্ল্যান করে, তখনও কিছু বলেনি ও। হয়তো ডাবল কভারও করে রেখেছে। ওরা খুব সায়েন্টিফিক অ্যাকশন করে। আত্মানন্দকে ও যত দেখছে, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ ও যে এই মিষ্টির দোকানে বসে আছে, সেটা আত্মানন্দেরই দয়ায়। এতক্ষণে ওর কটকের জেলে থাকার কথা। সিবিআই অফিসার বিমল রাউথ সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছিল ওর জন্য।

বিমলা মন্দিরের সুড়ঙ্গে সেদিন যা ঘটেছিল, তা মনে পড়লে পুরন্দর এখন লজ্জাই

পায়। আত্মানন্দ সম্পর্কে ও সত্যিই ভুল ধারণা করেছিল। নাট মন্দিরের সিঁড়িতে যখন ওর ঘুম ভাঙে, ধারে কাছে আত্মানন্দকে ও তখন দেখতে পায়নি। কাচের বাক্সের ভিতর থেকে কঙ্কালটাও উধাও হয়ে গিয়েছিল। পুরন্দরের তখন মনে হয়েছিল, কঙ্কাল ও সার্ভারের হার্ড ডিস্ক আত্মসাৎ করার জন্য, আত্মানন্দ ওকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু আসলে ঘটনাটা যে তা নয়, সেটা সুড়ঙ্গের মুখে যাওয়ার পর ও বুঝতে পারে। অন্ধকারে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বিমল রাউথ ওকে বলল, 'তোর খেল খতম পুরন্দর...'। আরও কী সব ডায়লগ দিয়েছিল, পুরন্দরের এখন মনে নেই। বিমল রাউথ সবে হ্যান্ডকাফ বের করেছে, ঠিক তখনই খুট করে একটা শব্দ হল। বিমল রাউথ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে।

হঠাৎ কী হল, সেটা পুরন্দর বুঝে ওঠার আগেই, উলটো দিক ও আত্মানন্দের গলা থেকে শুনতে পেয়েছিল, 'সোজা রাস্তার দিকে হেঁটে যাও। আমার দিকে তাকিয়ো না। জিলিপির দোকানের উলটো দিকে একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। গিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বোসো।'

আত্মানন্দের কথামতোই ঝোপঝাড় পেরিয়ে সোজা জিলিপির দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল পুরন্দর। হ্যাঁ, একটা ছোট্ট অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের সামনের সিটে ও বসে পড়েছিল। গুমোট গরমে দরদর করে ঘামছে। গায়ে ধুলোমাখা জামাটা ও তাই খুলে ফেলেছিল। ডানদিকে তাকাতেই পুরন্দরের চোখে পড়েছিল, জিলিপির দোকানে কয়েকটা লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ খোচরও হতে পারে। বিমল রাউথ একা অ্যাকশনে থাকবে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সটা এমনভাবে দাঁড় করানো রয়েছে যে, জিলিপির দোকান থেকে দেখা যাবে না, ঝোপের দিক থেকে কে বেরিয়ে এল। তবুও নিজেকে আড়াল করার জন্য জামাটা পাগড়ির মতো মাথায় জড়িয়ে নিয়েছিল পুরন্দর।

দোকান থেকে জিলিপি ভাজার গন্ধ ভেসে নাকে আসছে। আত্মানন্দের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে পুরন্দরের খিদে চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। ঘণ্টা সাত-আটেক ওর পেটে কিছু পড়েনি। খিদে পাওয়াটা স্বাভাবিক। অ্যাম্বুলেন্সে বসে থাকার সময়ই পুরন্দরের মনে পড়েছিল, ছোটবেলায় বেলি নানী ওদের একটা মন্ত্র শিখিয়েছিল, খিদে ভুলে থাকার। কোনও কোনও দিন মন্দির থেকে অনাথ আশ্রমে ভোগ আসতে এক-দেড় বেলা দেরি হয়ে যেত। খিদের জ্বালায় মাহেরিদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খেতে শুরু করত ওরা। একদিন বেলি নানীর চোখে পড়ে যায়। দেখে কেঁদে ফেলেছিল বেলি নানী। ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ফল, পায়েস খেতে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'তোর যদি খুব খিদে পায়, তাহলে এই মন্ত্রটা জপবি। দেখবি, আর খিদে পাচ্ছে না।'

অ্যাম্বুলেন্সে বসে অনেক চেষ্টা করেছিল পুরন্দর সেই মন্ত্রটা মনে করার। কিন্তু মনে করতে পারেনি। তখনই ও দেখেছিল, কাঁধে একটা বস্তা নিয়ে আত্মানন্দ অ্যাম্বুলেন্সের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনের দরজা খুলে কাকে যেন বলল, 'মাধবী, এই বস্তার মধ্যে প্রচুর দামী জিনিস আছে। সামলে রেখো।'

অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার সময় পুরন্দর টেরও পায়নি, ভেতরে রুগী সেজে স্ট্রেচারে শুয়ে আছে মাধবী। ঘাড় ঘুরিয়ে মাধবীকে দেখে, মনে মনে আত্মানন্দর প্রশংসা করেছিল ও। আত্মানন্দ যা করে, একেবারে নিখুঁত ছকে করে। ইচ্ছে করলে ও অন্য গাড়ি নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না। সেই কারণেই সুড়ঙ্গ পথ থেকে আনা জিনিসপত্তর ওর আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে বলেছিল বোধহয় ও মাধবীকে। চক্রতীর্থের দিকে যাওয়ার সময় পুরো রাস্তায় আত্মানন্দ কোনও কথা বলেনি। মনে অনেক প্রশ্ন জমা হওয়া সত্ত্বেও, পুরন্দরও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বিষ্ণু মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের চোখে পড়েছিল, কয়েকটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় হ্যালোজেন আলো লাগিয়ে পুলিশ আর দমকল কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। ওই পথটুকু পেরনোর সময় পুরন্দর সিঁটিয়ে বসে ছিল অ্যাম্বুলেন্সে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ওরা তিনজনে বারান্দায় গিয়ে বসেছিল। সেই সময় পুরন্দর জিজ্ঞেস করেছিল, 'সুড়ঙ্গের ভিতর আমাকে ফেলে তুমি তখন পালিয়ে গিয়েছিল কেন আত্মানন্দ?'

'পালিয়ে যাইনি বন্ধু। খানিকটা সময় তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'

'এই ইচ্ছেটা তোমার হল কেন?'

'গুপ্তধনের লোভে। তোমাকে জাগিয়ে রাখলে, রাজা দিব্যদেবাদিদেবের লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। ধর্মীয় কারণেই তুমি আমাকে বাধা দিতে।'

'গুপ্তধন কি তুমি উদ্ধার করতে পেরেছ?'

'যদি বলি হ্যাঁ, তা হলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?'

'তোমাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, তোমার পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব না। একটা কথা বলো তো ভাই, আমাকে ধরার জন্য বিমল রাউথ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা তুমি জানলে কী করে? তখন তুমিই বা কোথায় ছিলে?'

'জিলিপির দোকানে এক ইনফর্মারকে বসিয়ে রেখেছিলাম। সে-ই ফোন করে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। তার আগে একবার অবশ্য সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়ে কঙ্কালটা আমি পাচার করে দিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার ঢোকার মুখে ফোনটা পেয়ে আমি পজিশন নিই। আমি জানতাম, তোমাকে ধরার জন্যই বিমল রাউথ অপেক্ষা করছে। তোমার কপাল ভালো, ও একাই অ্যাকশনে গিয়েছিল। পুরো ক্রেডিটটা নিজে নিতে চেয়েছিল। ওকে না মারলে তোমাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হত।'

... সেদিনকার কথা ভাবতে ভাবতে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল পুরন্দর। এমন সময় ওর ফোন বাজতে লাগল। সম্বিত ফিরে পেয়ে ফোনটা কানে লাগাতেই ও শুনতে পেল, আত্মানন্দ বলছে, 'কী হল তোমার পুরন্দর? লোকটা যে গাড়ির কাছাকাছি চলে আসছে। শিগগির বেরোও।'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই পুরন্দর দেখল, পূজ্যপাদ পদ্মনাভ হাঁটতে হাঁটতে পার্কিং স্পেসের দিকে আসছেন। ওই লম্বা ফর্সা চেহারাটার দিকে তাকাতেই ওর মাথায় আগুন

জ্বলে গেল। এই সেই লোকটা, যাঁকে বিশ্বাস করে জীবনে ও অনেক পাপ করেছে। এই সেই লোক, যে ওর জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। লাফ দিয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল পুরন্দর। তারপর কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভারটা একবার স্পর্শ করে নিয়ে, শরীর টান টান করে এগোতে লাগল। পদ্মনাভ কি ওকে চিনতে পারবেন? মনে হয়, না। লক্ষ্যে স্থির হয়ে পুরন্দর সোজা হাঁটতে লাগল ওর শিকারের দিকে। এমন দক্ষতার সঙ্গে ও কাজটা করবে, এত লোকের মাঝেও তা কেউ টের পাবে না।

পূজ্যপাদর দিকে তাকিয়ে এগোনোর সময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল পুরন্দর। এ কী! ওর ছায়া পূজ্যপাদর কাঁধে পা ঝুলিয়ে বসে আছে কেন? ছায়া হাতজোড় করে মিনতি করছে। যেন বলছে, না না, তুমি একে মারতে যেও না। তা হলে মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। কাঁদতে কাঁদতে ছায়া চোখের জল মুছতে লাগল। তারপর পূজ্যপাদর কাঁধ থেকে সে বুকের কাছে নেমে এল। পূজ্যপাদকে আড়াল করার ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে যেন বলতে লাগল, অনেক পাপ করেছ। আর কোরো না। তা হলে নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না। পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। আশ্চর্য, ছায়াকে কাঁদতে দেখে পুরন্দরের মনটা হঠাৎ নরম হয়ে গেল। যতবার ও নিজের ছায়ার মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই কোনও না কোনও বিপদের ইঙ্গিত পেয়েছে। কথাটা মনে হতেই, রিভলভার বের করতে ও ভুলে গেল।

সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর পিছন ফিরে পুরন্দর দেখল, পূজ্যপাদ গাড়িতে উঠে পড়েছেন।

ছিয়াত্তর

সকালে একবারই ঘরের দরজা খুলেছিল গোরা, প্রতাপ পট্টনায়ক যখন আসেন। তার আগেই মা চিন্ময়ী আশ্রম থেকে চলে এসেছিলেন অবধূতজি। নীচে কোনও একটা ঘরে তাঁকে বসিয়ে রেখেছিল টুবাই। এক সঙ্গে দু'জনকে উপরে নিয়ে এল ও। অবধূতজির মুখে আশ্রমের সমস্যার কথা শুনে চিফ মিনিস্টার কথা দিলেন, দু'একদিনের মধ্যেই হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের ডেকে পাঠাবেন। প্রবলেমটা সলভ্ করে দেবেন।

তবুও অবধূতজি বললেন, 'স্যার, আপনি যদি পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে খুব ভালো হয়। আমি ইনসিকিওর ফিল করছি।'

চিফ মিনিস্টার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে না কি? আশ্চর্য! দাঁড়ান এখুনি আমি কালেক্টরকে ফোন করে বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে রাগের সঙ্গে কালেক্টরকে উনি বললেন, 'আপনারা করেন কী? একটা কমপ্লেন হয়েছে, অথচ কেন আপনারা অ্যাকশন নেননি?'

খুশি হয়ে অবধূতজি চলে গেলেন। চিফ মিনিস্টার কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন।

তারপর হঠাৎ টুবাইকে বললেন, 'টিভিটা খোলা যাবে? ইন্টেলিজেন্স থেকে সকালে আমাকে বলেছিল, জগতপুরে না কি আজ অ্যাজিটেশন হবে। দেখুন তো, ওখানে কী হল, টিভিতে কিছু দেখাচ্ছে না কি?'

টুবাই বলল, 'আধ ঘণ্টা আগে আমি টিভি দেখছিলাম। ওখানে পুলিশ ফায়ারিং হয়েছে।'

চিফ মিনিস্টার অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? কই, এখনও তো আমায় কেউ কিছু জানায়নি। কতক্ষণ আগে ফায়ারিং হয়েছে টুবাইবাবু?'

'তখনই হচ্ছিল। কসকো কোম্পানির লোকজন পুলিশ নিয়ে জমি দখল করতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে গ্রামের কয়েকশো মহিলা জমির উপর শুয়ে পড়েছেন। কিছুতেই দখল নিতে দেবেন না। ভূমিরক্ষা কমিটির নেতা দশরথ মোহান্তিকে বলতে শুনছিলাম, 'আজ জান দিয়ে দেব, তবু জমি দেব না।' বলতে বলতে টুবাই টিভি অন করে দিল।

আজকাল টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা সর্বত্র ঘোরাঘুরি করে। ঘটনা যা ঘটে, তা লাইভ টেলিকাস্ট করে নাটকীয়ভাবে। একটা ওড়িয়া চ্যানেলে ফলাও করে জগতপুরের ঘটনাটা দেখাচ্ছে। জাপানের কসকো কোম্পানি ওখানে স্টিল ফ্যাক্টরি করার জন্য আসছে। ওরা তিন হাজার একর জমি চেয়েছিল। রাজ্য সরকার সেই জমি দেবে বলে মউ সই করে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা সেই জমি দিতে চাইছে না। বছর দুয়েক ধরে অশান্তি চলছে জগতপুরে। ওই অঞ্চলে দলিত ও আদিবাসীদের বাস। তাদের জীবিকা ওই জমি ঘিরেই। তাদের সামনে এগিয়ে দিয়েছে একশ্রেণির মানুষ। গোরা সমস্যাটা জানে। ও একবার ভেবেওছিল, জগতপুরে গিয়ে দলিত পার্টির মিটিং করবে।

ব্রেকিং নিউজে গোরা দেখল, সত্যিই ওখানে ফায়ারিং হয়েছে। মৃত আর আহতদের স্থানীয় লোকেরাই ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশও আহত হয়েছে। গুলিগোলা চলার সময় টিভির লোকজন কাছাকাছিই ছিল। ফলে ওখানে ঠিক কী হয়েছে পুরীতে বসে সবই বোঝা যাচ্ছিল। গোরা অবাক হল দেখে, প্রতিবাদী মানুষের হাতেও বন্দুক রয়েছে। গাছের আড়াল থেকে তারাও গুলি করছে পুলিশকে লক্ষ্য করে। ফলে রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে জগতপুর। জমি ভিজে উঠছে লাল রক্তে। জমি যাঁদের, তাঁরা কেউ সামনে নেই। মারা যাচ্ছে নিরীহ কিছু পুরুষ ও মহিলা। দু'বেলা অন্নসংস্থান করতে যাদের প্রাণপাত করতে হয়।

গোরা লক্ষ করল, চিফ মিনিস্টারের মুখ রাগে থমথম করছে। রুমাল দিয়ে ঘনঘন উনি মুখ মুছছেন। হঠাৎ টুবাই জিজ্ঞেস করল, 'এই দলিত মানুষগুলোর হাতে বন্দুক এল কী করে স্যার?'

চিফ মিনিস্টার বললেন, 'এদের পিছনে নকশালরা আছে। আমার দলের কিছু লোকও উস্কানি দিচ্ছে। এই যে চ্যানেলটা লাইভ অ্যাকশন দেখাচ্ছে, সেটার মালিক কে জানেন টুবাইবাবু?'

'কে স্যার?'

'আমারই ক্যাবিনেট মিনিস্টার গোবিন্দ সাহু। আমাকে ডিসলজ্ করার চেষ্টায় আছে

অনেকদিন ধরে। চিফ মিনিস্টার হতে চায়। এই স্টিল ফ্যাক্টরিটা বাহান্ন হাজার কোটি টাকার প্রোজেক্ট। প্রাইম মিনিস্টার নিজে আমাকে ডেকে প্রোজেক্টটা দিয়েছেন। যদি করতে পারি, তা হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু দেখুন, আমাকে করতে দিচ্ছে না। আর দেড় বছর পর ইলেকশন ফেস করতে হবে আমাকে। ফ্যাক্টরিটা যদি না করতে পারি, তা হলে লোকের কাছে কী কৈফিয়ত দেব? এই তো দেখছেন আমার পার্টির লোকেরাই কী রকম অ্যান্টি ক্যাম্পেন করছেন।'

গোবিন্দ সাহুর নামটা শুনেই গোরা চমকে উঠল। এই সকালবেলাতেই ওর ঘরে গোবিন্দ সাহুর ফোন এসেছিল। প্রভা পাণিগ্রাহীর সঙ্গে কথা বলছে ভেবে, লোকটা বলে ফেলেছিল, ক্যাসেট নিয়ে ওর কাছে চলে যেতে। তার মানে, লোকটা ওর দিকেও নজর দিয়েছে। ওর বদনাম করাতে চায়। গোরা এতক্ষণ বুঝতেই পারছিল না, লোকটা কেন ওর ক্ষতি করতে চায়। চিফ মিনিস্টারের কথা শুনে ওর মাথায় বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। লোকটা ওকে অপদস্থ করতে চায়, তার কারণ চিফ মিনিস্টার ওর কাছে আসেন বলে। হাতে একটা টিভি চ্যানেল আছে। আড়ালে থেকে গোবিন্দ সাহু তার পুরো ফায়দা নিচ্ছে। টুবাইকে বলা হয়নি, হোম মিনিস্টার গোবিন্দ সাহুর ফোনের কথা। ও নিশ্চয়ই লোকটাকে ভালো করে জানে।

চিফ মিনিস্টার কথা বলছেন টুবাইয়ের সঙ্গে। গোরা চুপ করে শুনতে লাগল। টুবাই বলল, 'কসকোকে কোনও বিকল্প জায়গা দিচ্ছেন না কেন?'

'সেই কথা আমার মাথায় যে আসেনি, তা নয়। ওদের বলেওছিলাম। কিন্তু ওরা তো শুধু স্টিল ফ্যাক্টরিই করছে না। আরও দু' একটা বিষয় নিয়ে জট পাকিয়েছে। পারাদ্বীপের কাছে জটাধারী বলে একটা জায়গায় ওরা নিজস্ব পোর্টও করতে চায়। ওরা বলছে, এত প্রোডাকসন হবে, তার চাপ একা পারাদ্বীপ পোর্ট নিতে পারবে না। জটাধারীতে আর একটা পোর্ট বানাতে হবে। আমার কাছে খবর আছে, কসকো কোম্পানিতে আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট আছে। আমেরিকানদের ইনভলভমেন্টের কথা শুনেই আমি একটু পিছিয়ে এসেছি। ওদের নতুন একটা পোর্ট করতে দেওয়া রিস্কি হয়ে যাবে। কেননা, ওখানে তখন আমাদের কোনও এক্তিয়ারই থাকবে না। ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে। দেশের পক্ষেও তা বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। এদিকে, প্রাইম মিনিস্টার আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমাকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছেন, যে করেই হোক ফ্যাক্টরির কাজ শুরু করতেই হবে। উনি বোধহয় কথা দিয়ে এসেছেন ওখানে।'

'আপনি দশরথ মোহান্তির সঙ্গে গোপনে কথা বলছেন না কেন?'

ওর কথায় কাজ হবে না। আসল লোকটা পিছনে রয়েছে। সে আবার কিছুতেই আমার সঙ্গে বসতে রাজি নয়। ভুল বললাম, একবার বসতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিছিয়ে যায়। পরে শুনেছি, গোবিন্দ সাহু মিটিংটা বানচাল করে দিয়েছিল পয়সাকড়ি দিয়ে।'

'কিন্তু আজ যা হল, তাতে তো কসকো আর কোনওদিনই ঢুকতে পারবে না স্যার জগতপুরে। পুলিশ গুলি না চালালেই পারত।'

'গোবিন্দ হোম মিনিস্টার। ফায়ার করার অর্ডার নিশ্চয় ও দিয়েছে। আমায় গাড্ডায় ফেলে দিল। এ নিয়ে পার্লামেন্টে কথা উঠবে, আমি জানি। সাউথ ব্লকে একটা স্পেশাল সেল খোলা হয়েছে কসকো কোম্পানি নিয়ে। খবর এতক্ষণে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। প্রাইম মিনিস্টারের ফোন এল বলে। কী মুখ নিয়ে আমি কথা বলব এখন, বলুন তো টুবাইবাবু? আসার সময় আমি বলে এসেছি, কোনও ফোন থ্রু না করতে। আমি জানি, প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে কল ওয়েট করছে আমার জন্য।'

টিভিতে পুলিশ ফায়ারিং নিয়ে আলোচনা চলছে। চ্যানেলের রাজনৈতিক ভাষ্যকার মতামত দিচ্ছেন। প্রতাপ পট্টনায়েকের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দিচ্ছেন ভদ্রলোক। জমি হস্তান্তরের সময় কেন রাজ্য সরকার ঠিকমতো মধ্যস্থতা করল না? কেন আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়গুলো খতিয়ে দেখল না? পানপাতার চাষ করে এমন একদল যে বেকার হয়ে যাবে, তা কেন ভাবল না? ওখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পানের বরোজ রয়েছে। উর্বর জমি কেন শিল্পের জন্য কেড়ে নেওয়া হবে, কেন সরকার একবার ভাবল না?

গোরা দেখল, রাগে প্রতাপ পট্টনায়েকের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। উনি বললেন, 'আপনাদের প্রোফেশনে অনেক দু'নম্বরি লোক এসে গিয়েছে টুবাইবাবু। কথাটা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। এই লোকটা মাস কয়েক আগে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কত রকম সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। তখন আমি ছিলাম ভগবান। আজ কত কটু কথা বলছে, দেখুন। সব হাফ ট্রুথ। পানপাতার চাষীদের আমি বিকল্প জায়গা দেব, প্রমিস করেছি। ওরা খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ পাল্টি খেয়ে গেল। কেন, কার প্ররোচনায়, তাও আমি জানি। আপনাকে জানিয়ে রাখি, কসকো যে জায়গাটা নিতে চাইছে, তার বেশিরভাগ অঞ্চলেই চাষবাস হয় না।'

'আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না স্যার। কেওনঝড়গড়ের খনি থেকে ওরা আয়রন নিয়ে আসবে ফ্যাক্টরির জন্য। কিন্তু কেওনঝড়গড় থেকে জগতপুর তো প্রায় দু'শো কিলোমিটার দূরে। ফ্যাক্টরিটা কাছাকাছি কোথাও করলে তো ওদের সুবিধেই হত।'

'সে কথা ওদের বলেওছিলাম। কেওনঝড়গড়ের কাছাকাছি কোথাও একটা জায়গা দিচ্ছি, আপনারা সেখানে ফ্যাক্টরিটা করুন। কিন্তু কেওনঝড়ের মাটি পরীক্ষা করে ওরা বলল, ভালো নয়। মাটি ঠিক করতে হলে, ওদের বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। ওরা তখন বলল, জগতপুরেই ফ্যাক্টরিটা করতে চায়। কেননা, পারাদ্বীপ পোর্ট সাত আট কিলোমিটারের মধ্যে। এক্সপোর্ট করতে ওদের সুবিধা হবে। কিন্তু সেদিন বিবিসিতে শুনলাম, কসকো কোম্পানির মেন বিজনেস হল জাহাজ তৈরি করা। ওদের দেশে কোস্টাল এরিয়া আর ফাঁকা নেই। সেই কারণে ভারতে ওরা জায়গা খুঁজছে। আমাদের এখানে জটাধারীতে যদি ওরা নিজেদের পোর্ট তৈরি করতে পারে, তা হলে এখানেই জাহাজ তৈরি করতে পারবে।

এখানে তৈরি স্টিলও জাহাজ বানানোর কাজে লাগাতে পারবে। কসকো কিন্তু আমাদের কিছু জানায়নি এ ব্যাপারে। আমাদের শুনতে হল, বিবিসি রিপোর্টারের মুখ থেকে।'

'তা হলে এই প্রোজেক্ট এখন বিশ বাও জলে।'

'বলতে পারেন। এখন যা অবস্থা, একমাত্র আপনারাই আমাকে বাঁচাতে পারেন টুবাইবাবু।'

গোরা ও টুবাই চমকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। দু'জনের মুখ থেকে ছিটকে বেরল, 'কীভাবে?'

চিফ মিনিস্টার গোরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহাত্মন, আপনাকে সামনে থেকে দেখার জন্য সারা ওড়িশার মানুষ পাগল হয়ে আছে। আপনি যদি একবার জগতপুরে যান, তা হলে আমার সম্পর্কে লোকের বিদ্বেষ মুছে ফেলা যাবে।'

গোরা বলল, 'আপনি কি আমার রাজনৈতিক পরিচয়টা জানেন?'

'বিলক্ষণ জানি। আপনি দলিত পার্টির নেতা। দলিত সমাজ আপনাকে খুব মানে। পিপলির ঘটনার কথা আমি পুরীর কালেক্টরের মুখে আমি সব শুনেছি। কিন্তু মহাত্মন, আপনার রাজনৈতিক পরিচয় লোকের মন থেকে মুছে গিয়েছে। এখানকার পরিচয় অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আপনার শিষ্যত্ব নেওয়ার জন্য ওড়িশার মানুষ দলে দলে পুরীতে আসছে...।'

'কিন্তু আমি জগতপুরে গিয়ে কী করব?'

'আপনি তো দলিত সমাজের হিত চান। গিয়ে ওদের সেটাই বলবেন। ফ্যাক্টরিটা হলে সামাজিকভাবে ওদের অনেক উন্নতি হবে। দলিত মানুষকে অনাহারে মরতে হবে না। জমিদারদের শোষণের মুখে পড়তে হবে না। ওখানে গ্রামবাসীদের যিনি সংঘবদ্ধ করেছেন, তাঁকে আপনি খুব ভালোভাবে চেনেন। তরুণ মাজি। কলকাতায় দলিত পার্টির লিডার ছিল। আপনার খুব অনুগত। নকশালদের সঙ্গে তাঁকে একবার ধরা হয়েছিল। কিন্তু কোর্ট থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পালিয়ে যান। আমার মনে হয়, আপনি অনুরোধ করলে উনি ফেলতে পারবেন না।'

'আপনি সিওর, এই সেই তরুণ মাজি?'

'ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট তো তাই বলছে মহাত্মন। আপনার আরও দুই অনুগত এখন জগতপুরে ওর সঙ্গে আছেন। একজনের নাম চন্দন ও অন্যজন তাঁর স্ত্রী মন্দিরা। ওরা এই মুভমেন্টের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। তবে এর পাবলিসিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। চন্দনবাবু বাই প্রোফেশন আগে চ্যানেলের রিপোর্টার ছিলেন। শুনলাম, পিপলিতে উনি নাকি আপনার সঙ্গে ছিলেন।'

'চন্দনদের কি আপনারা অ্যারেস্ট করেছিলেন?'

'না, ঠিক অ্যারেস্ট নয়। ওদের আমরা ইন্টেরোগেশন করার জন্য তুলে এনেছিলাম। অ্যাজ সাচ কোনও অ্যান্টি রিপোর্ট আমরা পাইনি। উনি ফুটেজ তোলেন, আর তা বিক্রি করেন বিভিন্ন চ্যানেলে। এটাই ওর রোজগার। ইন্টেরোগেশনের সময় উনি আপনার কথা পুলিশকে বলেছেন। সেই কারণেই আমরা জানতে পেরেছি, আপনি ওদের চেনেন। প্লিজ, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না মহাত্মন। আমি নিজে কোনও পলিটিক্যাল মাইলেজ

নেওয়ার জন্য আপনাকে এই রিকোয়েস্ট করছি না। ওড়িশার মানুষের জন্য করছি। স্টিল ফ্যাক্টরিটা যদি করতে পারি, তা হলে জানব, একটা কিছু অ্যাচিভ করেছি। শুনতে পাচ্ছি, ঝাড়খণ্ড চিফ মিনিস্টার খুব চেষ্টা করছেন, কসকোকে ওদের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, তা হলে সেটা আটকাতে পারব।'

চিফ মিনিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগল গোরার। কী উত্তর দেবে, ও ঠিক বুঝতে পারল না। ও যদি জগতপুরে যায়, তা হলে দলিত পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। দিল্লিতে নিশ্চয়ই খবরটা চলে যাবে। কেশব ভারতী ওকে ফোন করতে পারেন। পরক্ষণেই ওর মনে হল, কেশব ভারতী কে? ওই লোকটাকে পাত্তা দেওয়ারই বা কী আছে। দলিত পার্টির সঙ্গে এমনিতেই ওর সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগে কেশব ভারতী সমাবেশের কথা জিজ্ঞেস করতেন। বহুদিন হল, যোগাযোগও রাখছেন না। অদ্বৈত বাবু ছাড়া আর কারও কাছে ওর দায়বদ্ধতা নেই। পুরীতে এসে সেই অদ্বৈতবাবুই তো ওকে বলেছেন, 'গোরা, ভগবান তোমাকে যেজন্য পাঠিয়েছেন, তুমি সেই কাজটাই করো।'

মুহূর্তে গোরা মন ঠিক করে নিয়ে বলল, 'আমি একবার তরুণ মাজির সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর কোনও কন্টাক্ট নাম্বার আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে আছে। আজই কন্টাক্ট নাম্বার আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনি মনস্থির করুন মহাত্মন। আপনার জগতপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব।' কথাগুলো বলেই উঠে পড়লেন চিফ মিনিস্টার। 'চলুন টুবাইবাবু। এখুনি আমাকে ভুবনেশ্বর যেতে হবে। না হলে কথা উঠবে, এত বড় একটা ক্রাইসিসের সময় আমার পাত্তা নেই।' বলে মৃদু হেসে হাতজোড় করে নমস্কার সেরে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চোখ বন্ধ করে গোরা বসে রইল। টুবাই উপরে উঠে এলে ওর সঙ্গে আলোচনা করবে, জগতপুরে যাওয়া ওর উচিত হবে কি না? হোটেল গম্ভীরায় আসার পর থেকে গোরা খবরের কাগজ নিয়মিত দেখেনি। তাই কসকো নিয়ে সংঘাত যে এতটা গড়িয়েছে, তা জানত না। তরুণ মাজিই বা এই অঞ্চলে কেন ঘাঁটি গাড়ল, ওর বোধগম্য হল না। পিপলিতে পুরীর কালেক্টর বাসুদেববাবু অবশ্য একবার বলেছিলেন ওর কথা। তখন গোরা বিশ্বাস করেনি। কথাটা তা হলে সত্যি। এমনিতেই তরুণ পছন্দ করত না অদ্বৈতবাবুকে। চেয়েছিল, বয়স্ক লোকদের হাত থেকে নেতৃত্ব ও ছিনিয়ে নিক। কিন্তু রাজনীতিতে এমন অসহিষ্ণুতা বাঞ্ছনীয় নয়। সব কিছুর একটা সময় আছে। তরুণদের মতো গোঁয়ারদের সেটা কে বোঝাবে?

নীচ থেকে লিফট উঠে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে টুবাই উঠে আসছে। গোরা চোখ খুলল। আর টিভির দিকে চোখ পড়তেই ও দেখল, পর্দায় প্রভা পাণিগ্রাহীর ছবি। সঙ্গে ভয়েস ওভার, 'আজ সকালে পুরীর সমুদ্র তীরে এই মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। মেয়েটির নাম জানা যায়নি। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। পুলিশের ধারণা, ধর্ষিতা মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। এই মেয়েটির পরিচয় কারও জানা থাকলে, পুলিশে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।'

প্রভা পাণিগ্রাহীকে কেউ রেপ করেছিল! খবরটা শুনে গোরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সকালবেলায় মুকুন্দ বলল, মেয়েটাকে শেষবার ও দেখেছিল রিসেপশনে বসে থাকতে। রাতে হয়তো বাড়ি ফেরার কোনও সুযোগ পায়নি। হয়তো কেউ ফুঁসলিয়ে ওকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর রেপ করেছে। যদি রেপ করে থাকে, তা হলে এটা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। মেয়েটা যখন রিসেপশনে বসেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেকে ওকে দেখেছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি পুলিশকে খবরটা দেয়, তাহলে জানাজানি হয়েই যাবে, প্রভা ওর কাছে এসেছিল। কথাটা মনে হতেই একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করতে লাগল গোরার মনে।

সাতাত্তর

সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার সময় ড্রয়িং রুমে বসে জয়দেব খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে সুরেশদা। ওর বইয়ের ব্যবসায় ম্যানেজারের কাজটা করেন এই সুরেশদা। কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশনা ব্যবসায় সবাই ওঁকে চেনেন। সেই বাবার আমল থেকে আছেন। বয়স ষাটের উপর। খুব ঠান্ডা মাথার লোক। চুপচাপ কাজ করে যান। কোনওদিন কোনওরকম সমস্যায় ফেলেননি। ছোটবেলা থেকে সুরেশদাকে একই পোশাকে দেখে আসছে জয়দেব। সাদা হাফ স্লিভ শার্ট, আর হাঁটু অবধি ধুতি। পরনে রাদুর চপ্পল। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। উনি না থাকলে জয়দেব নিশ্চিন্তে রিসার্চ করতেই পারত না।

সুরেশদা থাকেন কাঁকুড়গাছিতে। কী এমন দরকার হল, উজিয়ে বেহালায়... এত দূরে উনি এলেন?

তখনই ওর মনে পড়ল, বইমেলা শেষ হওয়ার পরদিন সুরেশদা বলেছিলেন বটে, জরুরি কিছু কথা আছে। কিন্তু সেই কথা শোনার সময় পাননি জয়দেব। তখন টেম্পোতে বই তোলা হচ্ছে। সেই শেষ দেখা। গত দু'তিন দিন কলেজ স্ট্রিটে যাওয়ার সময়ই পাননি জয়দেব। বাড়িতে বিয়ের উদযোগ চলছে। প্রায়ই দিদি-জামাইবাবু আসছে মাকে সাহায্য করার জন্য। আজ অবশ্য রবিবার। বইপাড়া ছুটি। সুরেশদাকে দেখে হঠাৎ ওর মনে হল, উনি বোধহয় সেই জরুরি কথাটাই বলতে এসেছেন। জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন সুরেশদা। হঠাৎ কী মনে করে?'

সোফায় বসে সুরেশদা বললেন, 'তোমাকে কিছু কথা বলার ছিল জয়। দোকানে সবসময় অন্যরা থাকে। ফুরসত পাওয়া যায় না। সেই কারণেই চলে এলাম।'

'বেশ করেছেন। দাঁড়ান, মাকে খবর দিই। চা-টা খেয়ে তারপর কথা বলা যাবে।'

সুরেশদা বললেন, 'না থাক। বউদিকে ব্যস্ত করার কোনও দরকার নেই ভাই। আমার হাতে সময় খুব কম। ছেলে চৌরাস্তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে।'

সুরেশদার ছেলে মোহন খুব ভালো চাকরি করে। ওকে একবারই মাত্র দেখেছে জয়দেব। ওর বউভাতের সময়। ও বলল, 'মোহনকে সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতেন সুরেশদা।'

'বলেছিলাম। আসতে লজ্জা পেল। সঙ্গে বউমা আছে যে। তোমাদের এখানে ডায়মন্ড সিটি বলে কি একটা হাউসিং কমপ্লেক্স আছে। ছেলে সেখানে ফ্ল্যাট কিনেছে। এ দিকে চলে আসবে। এখন ঘরদোর সাজানোর কাজ চলছে। তাই তদারকি করার জন্য রোববারগুলো এদিকে আসে।'

ডায়মন্ড সিটিতে এক একটা ফ্ল্যাটের দাম তিরিশ-পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা। সুরেশদার ছেলে সেখানে ফ্ল্যাট কিনতেই পারে। ভালো রোজগার করে। শুনে খুব ভালো লাগল জয়দেবের। ও বলল, 'যাক, এ বার একটু আরামে থাকতে পারবেন তা হলে।'

'সেই ব্যাপারেই তো কথা বলতে এলাম ভাই। বেশ কয়েকদিন ধরেই বউমা বলছে, বাবা আপনাকে আর চাকরি বাকরি করতে হবে না। এ বার মাকে নিয়ে ধনেখালির বাড়িতে চলে যান। দেশের বাড়িটা বাসযোগ্য করে দিয়েছে ছেলে। ভাবছি, সরস্বতী পুজোর পরই কলকাতার পাট গুটিয়ে চলে যাব ধনেখালি। তুমি আমার জায়গায় একটা লোক দেখে নিও ভাই।'

শুনে একটা ধাক্কা খেল জয়দেব। এতদিনের পুরনো একটা লোক! এতটাই বিশ্বস্ত যে, ও দোকানের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করে যেতে পারত। সেই লোক চলে যাবে বলছে। সুরেশদার মতো লোক আর পাওয়া যাবে? মনে হয় না। ও বলল, 'এ কী বলছেন সুরেশদা? আপনি চলে গেলে তো আমার ব্যবসাও লাটে উঠে যাবে। কে দেখাশুনো করবে এ সব?'

'জানি ভাই। অনেকদিন আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন ছেলে মেয়ের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমারই কি কথাটা বলতে ভালো লাগছে?'

জয়দেব নাছোড় হয়ে বলল, 'আমি জানি না। আপনি মায়ের সঙ্গে কথা বলে যান। মা যদি আপনাকে ছেড়ে দেয়, তা হলে আমার আপত্তি নেই।'

সুরেশদা বলল, 'বউদিকে এর মধ্যে টেনে এনো না ভাই। একটা সময় তো থামতেই হবে। আমার সেই সময়টা এসে গিয়েছে। বইপাড়ায় প্রায় চল্লিশটা বছর কেটে গেল। অনেক বড় বড় পাবলিশার আমাকে ভাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তোমার বাবাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। উনি আমার দাদার মতো ছিলেন। কিন্তু আর উপায় নেই ভাই। শরীর দিচ্ছে না। টের পাচ্ছি, এ বার বেশি টানাটানি করতে গেলে... ইলাস্টিকের মতো ছিড়ে যাবে।'

জয়দেব বুঝতে পারল, সুরেশদা মনস্থির করেই এসেছেন। প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, 'আপনার বকেয়া টাকা পয়সাগুলো...'

'সে নিয়ে অত তাড়াতাড়ির কিছু নেই।' সুরেশদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও সব হিসেব নিকেশ পরে না হয় করা যাবে। তোমাকে আরও একটা কথা বলার ছিল। এটা নালিশ হিসাবে নিয়ো না যেন। তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

শুনে জয়দেব অবাক হয়ে তাকাল। আজ পর্যন্ত সুরেশদা কোনওদিন কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেননি। কার বিরুদ্ধে নালিশ? ও জিজ্ঞেস করল, 'এত ইতস্তত করছেন কেন? বলুন।'

'কৌশিক ছেলেটাকে তুমি খুব বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছ ভাই। ব্যবসাটা ওর হাতে ছেড়ে দিও না। এই যুগের ছেলে তো, খুব অ্যাম্বিসাস। মুখে মিছরি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছুরি উঁচিয়ে আছে।'

'কেন? ও কি অবিশ্বাসের কাজ কিছু করেছে?'

'বইমেলার পর হিসাবপত্তর কি কিছু মিলিয়ে দেখেছ? দেখলেই বুঝতে পারবে, তোমাকে ডোবানোর ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে। বইমেলার আগে তুমি অতদিন পুরীতে না থাকলেই পারতে।'

'কী বলছেন আপনি।'

'ঠিকই বলছি। সে নিজে একটা পাবলিশিং কোম্পানি খুলছে। তন্ময় বলে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের এখানে কাজ করে ঘোঁতঘাত সব জেনে নিয়েছে। লোকজনের সঙ্গে সব পরিচয় হয়ে গিয়েছে। এখন আর তোমাকে তার দরকার নেই।'

'আপনি আগে কেন আমায় সাবধান করেননি সুরেশদা?'

'আমি তো জানলাম, বইমেলার শেষদিন। ফোনে কার সঙ্গে সে কথা বলছিল। সামনের বছর নিজে স্টল দেবে। তুমি সেদিন হাওড়া স্টেশনে বোধহয় কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে। তাই স্টলে পৌঁছতে তোমার অনেক দেরি হয়েছিল। এই ছেলেটা ভালো না। একে তুমি রেখো না।'

কথাগুলো বলে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ থেকে একগাদা চিঠি আর লেখার প্যাকেট বের করে আনলেন সুরেশদা। টেবলের উপর রেখে বললেন, 'কাল দুপুরে একবার বইপাড়ায় গিয়েছিলাম। লেটার বাক্সে এই চিঠিগুলো পড়েছিল। তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম। এ বার উঠি ভাই। তোমার মায়ের সঙ্গে শেষ দেখাটা করে যাই।' বলে সুরেশদা উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

জয়দেব গুম হয়ে বসে রইল। কৌশিক ছেলেটা এইভাবে বিট্রে করতে পারে, ও স্বপ্নেও তা ভাবেনি? ছেলেটা প্রথম এসেছিল দিনকাল পত্রিকায় লেখালেখি করার জন্য। গদ্যটা ভালো লেখে। বানান সম্পর্কেও ভালো আইডিয়া আছে। এখনকার লেখক-লেখিকাদের সঙ্গেও ওর বেশ যোগাযোগ আছে। সেই কারণে মাস ছয়েক বাদে ওকে চাকরিটা দিয়েছিল জয়দেব। মনে হয়েছিল, লেখালেখি করাটা ওর প্যাশন।

পত্রিকার কাজকর্মগুলো আস্তে আস্তে সব শিখিয়েছিল জয়দেব ওকে। কৌশিকের লাইফ স্টাইল দেখে মনে হত, চাকরিটা শখের জন্য করছে না। খুব প্রয়োজন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। মাঝে মধ্যেই এসে হাত পাতত ওর কাছে। আজ মায়ের অসুখ, ওষুধ কিনতে হবে। কাল ভাইয়ের পরীক্ষা, ফি'জ দিতে হবে। এই যার অবস্থা, সে পাবলিশিং

হাউস করার জন্য তা হলে মূলধন পেল কোত্থেকে? দিনকাল থেকে সরাল না কি? কথাটা মনে হতেই রাগ হল জয়দেবের।

ওর মনে পড়ল, বইমেলার শেষ হওয়ার পর দিন সুরেশদা যখন স্টলের বইপত্র গুছিয়ে টেম্পোতে তুলছিল, তখন কৌশিক ফোন করে জানায়, ও দীঘাতে বেড়াতে গিয়েছে। অথচ আগের দিন রাতেও ক্যাম্প ফায়ারের সময় কিছু বলেনি। জয়দেব একটু অবাক হয়েই বলেছিল, 'তুই যে দীঘাতে যাবি, কই আমাকে তো কিছু বলিসনি? কবে ফিরবি।' কৌশিক বলেছিল, 'হঠাৎ ভাই আবদার করল। তাই চলে এলাম। ভালো লাগলে তিন চারদিন থাকব। না হলে কাল বিকেলেই কলকাতায় ফিরে যাব।' ওর কথায় গা ছাড়া ভাব লক্ষ করে জয়দেব আরও অবাক হয়েছিল। বইপত্তর গুছিয়ে গো ডাউনে ফেরত না পাঠিয়ে হঠাৎ কেন কৌশিক বেড়াতে গেল, সত্যি বলতে কী, তা নিয়ে জয়দেব তখন মাথাও ঘামায়নি। উল্টে ওর মনে হয়েছিল, বইমেলায় খুব খাটাখাটনি গিয়েছে, রিল্যাক্স করার জন্য ছুটি নিতেই পারে। এখন তো মনে হচ্ছে, কৌশিক কেটে পড়ল।

কথাটা মনে হতেই জয়দেব সুমিতাকে ফোন করল। বইমেলার সময় মেয়েটা খুব সার্ভিস দিয়েছে। কৌশিকের মতলব, ও নিশ্চয়ই জানবে। ও প্রান্তে সুমিতা ফোন ধরতেই জয়দেব বলল, 'কৌশিক কি ফিরেছে?'

সুমিতা বলল, 'ফিরেছে মানে? ও তো কোথাও যায়নি জয়দা। রোজই তো আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কফি হাউসে।'

'ফোন করে ওকে পাচ্ছি না কেন বলো তো?'

'ওকে আর ফোনে পাবেন না। ফোনের সিমকার্ড বদলে ফেলেছে। বইমেলার পর দিন আমাকে বলল, দিনকালে ও আর কাজ করবে না।'

সুরেশদার কথাই তা হলে ঠিক। তবুও আরও জানার জন্য জয়দেব বলল, 'কাজ করবে না কেন?'

সেটা বলতে পারব না জয়দা। ওর হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না। তন্ময় বলে ওর একটা বন্ধু জুটেছে। এক নম্বরের আঁতেল। তার সঙ্গে খালাসিটোলায় গিয়ে রোজ ড্রিঙ্ক করছে। কৌশিকের কয়েকটা কবিতা ওই আঁতেলটা ছাপিয়ে দিয়েছে সকালবেলা বলে একটা কাগজের রোববারের পাতায়। ব্যস, তার পর থেকে ওর ধারণা হয়েছে, ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের থেকে বড় কবি। যোগ্য সম্মান পাচ্ছে না দিনকালে। জানেন, ওর মা খুব দুঃখ করছিলেন আমার কাছে। ওদের সংসারটা এবার ভেসে যাবে।'

শুনে জয়দেবের খারাপই লাগল। বই পাড়ায় বহু ছেলেকে এ রকম কলার তুলতে দেখেছে। কিন্তু প্রায় সবাই বানের জলে ভেসে গিয়েছে। ফোনটা ছাড়ার আগে ও বলল, 'কৌশিকের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়, তাহলে একবার ফোন করতে বোলো আমাকে। আর... কাল তুমি আসছ তো?'

'আসব জয়দা। আমি অন্তত আপনার সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না।'

লাইনটা কেটে দিল জয়দেব। কাউকেই আর ও এখন বিশ্বাস করতে পারছে না।

মন ভালো করার জন্য উপরে নিজের ঘরে চলে এল। একান্তে উপাসনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেয় ও নবদ্বীপে ফোন করল। কাল দুপুর থেকে উপাসনার সঙ্গে ও যোগাযোগের চেষ্টা করছে। অথচ ওকে পাচ্ছে না। এ রকম কখনও হয় না। উপাসনা নবদ্বীপে চলে যাওয়ার পর ... প্রথম দিকে দিনে বারো চোদ্দো বার মেসেজ চালাচালি হয়েছে। জয়দেব এদিককার খবর দিয়েছে। উপাসনা ওদিককার। মা বিয়ের বেনারসী কিনতে যাবে। কী রং উপার পছন্দ, জানতে চেয়েছিল। মেসেজ করে দশ মিনিটের মধ্যে জয়দেব উত্তরটা এনে দিয়েছে। ও দিক থেকে উপাসনা জানতে চেয়েছে, কোন কালারের স্যুটের কাপড় তোমার জন্য কিনতে হবে, মা জিজ্ঞেস করছে। সঙ্গে সঙ্গে ও উত্তর দিয়েছে, তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। এ সব ছাড়া ভালোবাসার মেসেজও অনেক দেওয়া নেওয়া হয়েছে দু'জনের মধ্যে। হালকা থেকে গাঢ় চুমুর মেসেজও।

হঠাৎ কী যে হল, কাল দুপুর থেকে উপাসনার কোনও পাত্তা নেই। ফোন করলেও রেকর্ডেড ভয়েস আসছে, নট রিচেবল। বাড়িতে নেই না কি? তা তো হওয়ার কথা নয়। বাড়ি ছাড়া উপাসনা আর কোথায় যেতে পারে? অনেক দিন আগে ও একবার বলেছিল, ওদিকে টাওয়ারের গণ্ডগোলের জন্য ফোনের কানেকশন অনেক সময় পাওয়া যায় না। তাই বলে টাওয়ারের প্রবলেম দু'দিন ধরে চলতে পারে না। কাল দুপুর থেকে অন্তত গোটা কুড়ি মেসেজ পাঠিয়েছে ও উপাসনাকে। একটারও উত্তর আসেনি। সেই মনোকষ্ট নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল জয়দেব। সুরেশদা এসে নিজের আর কৌশিকের খবরটা দিয়ে যেন বুকে একটা পাথর চাপা দিয়ে গেলেন। পায়চারি করার ফাঁকে উপাসনাকে ধরার জন্য জয়দেব আর একবার ফোন করল। নাহ, এ বারও উল্টো দিক থেকে বলছে, সুইচ অফ।

উপরে উঠে আসার সময়, সুরেশদার আনা চিঠিপত্তর আর প্যাকেটগুলো নিয়ে এসেছিল জয়দেব। সময় কাটানোর জন্য সেগুলো ও দেখতে লাগল। নতুন লেখক-লেখিকাদের পাঠানো গল্প আর কবিতার খামগুলো ও আলাদা করে সরিয়ে রাখল। প্রাইমারি সিলেকশনটা করত কৌশিক। ও না এলে বাছাবাছির ভার জয়দেব কাল দেবে সুমিতাকে। চিঠিপত্তরের মাঝে ব্রাউন কালারের সরু একটা খাম জয়দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খামের উপর হাতের লেখাটা খুব চেনা। মা চিন্ময়ী আশ্রমের অবধূতজির। সঙ্গে সঙ্গে খামটা ও তুলে আনল। চিঠিটা এসেছে, চার দিন আগে। লেটার বক্সেই পড়েছিল। বোধহয় অবধূতজি লেখা পাঠিয়েছেন দিনকালের জন্য। দিন কয়েক আগে পুরীতে গোরাকে ফোন করেছিল জয়দেব। তখন গোরা কথায় কথায় ওকে বলে, টুবাইয়ের সঙ্গে ও নাকি অবধূতজির আশ্রমে গিয়েছিল। শুনে জয়দেব খুব খুশি হয়েছিল। দু'জনের সাক্ষাৎকার কেমন হল, সেটা জানার জন্য পরে ও অবধূতজিকে ফোনও করে। কিন্তু কথা বলতে পারেনি। উনি তখন ধ্যানগৃহে ছিলেন।

খামটা খুলে জয়দেব দেখল, ওর ধারণাই ঠিক। অবধূতজি একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।

'এ ফোর' কাগজের ভাঁজ খুলতেই একটা ছবি নীচে পড়ে গেল। জয়দেব তাকিয়ে দেখল, গোরার ছবি। মাথা ন্যাড়া। ওকে একেবারে সন্ন্যাসীর মতো মনে হচ্ছে। আরে, গোরা আবার মাথার চুল কামিয়ে ফেলল কবে? মেঝে থেকে ছবিটা তুলে এনে, জয়দেব হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অবধূতজি খামের ভিতর গোরার ছবি পাঠাতে গেলেন কেন, ও তা বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি লেখাটা ও পড়তে শুরু করল। অবধূতজি লিখেছেন, 'অনেক দিন হইল আপনার কোনও সংবাদ নাই। বাধ্য হইয়াই এই পত্র লিখিতেছি। আপনার পত্রিকার শেষ সংস্করণ পাইয়াছি। পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনার কল্যাণ কামনা করি। একটি প্রবন্ধ পাঠাইতেছি। যদি মনোমতো হয়, তাহা হইলে ছাপিতে পারেন।'

'শ্রীক্ষেত্রে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আমি ভাগ্যবান, তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে পারিয়াছি। আমরা সকলেই জানি, এই পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হইয়া যায়, তখন স্বয়ং ঈশ্বর অবতার রূপে নামিয়া আসেন। কখনও পূর্ণ অবতার। কখনও খণ্ড অবতার রূপে। তিনি এই ধরাধামকে পাপমুক্ত করেন। এই মুহূর্তে খণ্ড অবতার রূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে আমি চাক্ষুষ করিয়াছি। জয়দেববাবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।'

এই পর্যন্ত পড়ে জয়দেব থেমে গেল। আপনার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে... এই কথাটার মানে কী? মাথা মুণ্ডু কিছুই ও বুঝতে পারল না। আবার লেখায় মনোনিবেশ করল, 'গত পূর্ণিমায় আপনার পরম মিত্র আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি আমার সঙ্গে জ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন। আমি মহামূর্খ, আমি তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিব কেন? তিনি বলিলেন, পাঁচশত বৎসর পূর্বে গোদাবরী নদীর তীরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শুনিয়া আমি শিহরিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার ভিতরও অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার ভিতর হইতে কে যেন উত্তর দিতে লাগিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। মহাত্মন তাহার পর চলিয়া যান। কিন্তু সেই রাত্রিতেই আমি স্বপ্নে আকাশবার্তা শুনিতে পাই। পাঁচশত বৎসর পর তিনি পুনরায় ধরাধামে আসিয়াছেন। এইবার তিনি কলিযুগের অবসান ঘটাইবেন। আমি নিশ্চিত, স্বপ্নে আমি আপনার পরম মিত্রকেই দেখিয়াছি। তাঁহার ছবি পাঠাইলাম। শীঘ্রই মূল প্রবন্ধটি পাঠাইতেছি। বিষয়... অবতার তত্ত্ব। ছবিটি আপনি ইচ্ছা করিলে ছাপাইতে পারেন।'

গোরা... গোরাই তা হলে সেই ব্যক্তি, যাঁকে উপাসনা খুঁজে বেরাচ্ছে!! ইস, এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ওরা কেউ চিনতে পারেনি? অবধূতজি ভুল সংবাদ দেবেন না। চিঠিটা পড়েই সারা শরীরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা টের পেল জয়দেব। খবরটা এখুনি উপাসনাকে জানানো দরকার। সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে ও ফোন করল। মনে মনে প্রার্থনা করল, এ বার যেন উপাসনাকে পাওয়া যায়। নাহ্.... সেই একই উত্তর ... নট রিচেবল। তখনই ওর উপাসনার বোন সুরোর কথা মনে পড়ল। সুরোর ফোন নম্বরটা একবার ডায়েরিতে জয়দেব লিখে রেখেছিল। দ্রুত সেই নাম্বারটা বের করে ও নবদ্বীপে ফোন করল। ও প্রান্তে লাইনটা

কেউ ধরেছে। সময় নষ্ট না করে জয়দেব বলল, 'সুরো, ফোনটা এখখুনি তোমার দিদিকে দাও। একটা সুখবর আছে।'

ও প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর নেই। মাঝে মধ্যে সুরো এ রকম জ্বালায়। কখনও বলে, 'রং নাম্বার।' কখনও 'দিদি এখন বাড়ি নেই।' 'আমার সঙ্গে আগে গল্প করতে হবে।' তারপর হি হি করে হাসে। আজও সে রকম কিছু করছে ভেবে জয়দেব অনুনয় করার ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ দিদিকে দাও, সুরো। ওর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

হঠাৎ ও প্রান্তে কান্নায় ভেঙে পড়ল সুরো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে জয়দা। দিদি .... নেই।'

আটাত্তর

'গোরাদা, আপনি? আমার ফোন নাম্বার পেলেন কোত্থেকে?'

ও প্রান্তে তরুণ মাজির গলা চিনতে পারল গোরা। সেই একই রকম প্রাণবন্ত। ও বলল, 'এখন বলা যাবে না। আগে বলো, কেমন আছ তুমি?'

'ভালো, খুব ভালো। এখন জগতপুরে আছি। একটা বিরাট মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি। কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়ই। এখন দলিত মানুষের সঙ্গে আছি। ওদের সংঘবদ্ধ করতে পেরেছি। আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি গোরাদা। আপনার খবর কী বলুন। কোথায় আছেন এখন?'

'পুরীতে।' ফোনে গোরা রেখে ঢেকে কথা বলতে লাগল। এখানে সমাবেশ করার জন্য এসেছিলাম। কাল জগতপুরের ঘটনা টিভিতে দেখলাম। তখনই আমার এক রিপোর্টার বন্ধু টুবাই তোমার কথা বলল। আমি জগতপুরে যেতে চাই তরুণ। তোমার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'আসতে পারেন গোরাদা। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি না, কথা দিতে পাচ্ছি না। সেটা আপনার পক্ষেও রিস্কি হয়ে যেতে পারে।'

গোরা বলল, 'কোনও নিউট্রাল ভেনুতে মিট করা যেতে পারে?'

'সেটা আবার আমার পক্ষে রিস্কি হয়ে যাবে। সিএম আমার পিছনে এমন ফেউ লাগিয়েছেন, ধরা পড়লে আমাকে খতম করে দেবেন। আমার অবর্তমানে পুরো মুভমেন্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক কী বলো তো? কসকো প্রোজেক্টটা করতে দেবে না।'

'না, ঠিক তা নয়। প্রোজেক্টটা আমরা জগতপুরে করতে দেব না। ওরা অন্য জায়গায় করুক, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। দলিত মানুষগুলো তাও পানপাতা চাষ করে এখন বেঁচে আছে। কারখানা হলে, ভুখা মরবে। দলিত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না।'

'তরুণ, আমার মনে হয় কোথাও তোমার ভুল হচ্ছে। পান পাতা চাষ যারা করে, তারা এখন যেভাবে বেঁচে আছে, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। ওদের যারা শোষণ করে, তারা আরও ধনী হবে। আমার মনে হয়, কারখানাটা হলে, দলিত মানুষরা কাজ পাবে। জীবন যাপনের মান ওদের উন্নত হবে। ওরা প্রত্যেকে যাতে কাজ পায়, সেই অ্যাসিউরেন্সটা আমি তোমায় দিতে পারি।'

ও প্রান্তে তরুণ মাজি কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর বলল, 'গোরাদা, আপনার সম্পর্কে আমি যা খবর পাচ্ছি, তা হলে সেটা ঠিক। আপনিও আপোস করে নিয়েছেন পুঁজিপতিদের সঙ্গে। ওদের হয়ে দালালি করছেন। আপনার কাছ থেকে এটা আমি অন্তত আশা করিনি।'

আমার সম্পর্কে আর কী শুনেছ তরুণ?'

'আপনি নাকি সিএম-র ধর্মগুরু হয়েছেন। সিএম না কি পরামর্শ নিতে আপনার কাছে খুব যাচ্ছেন। এখন বুঝতে পারছি, আমার ফোন নাম্বারটা আপনাকে কে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে কথা বলে আপনার কোনও লাভ হবে না গোরাদা। আমি ছাড়ছি।'

'না, ফোনটা তুমি ছাড়বে না। নকশালদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তুমি পার্টির লাইন থেকে সরে যাচ্ছ। হিংসার আশ্রয় নিয়ে এত বড় দেশটাকে তুমি একা বদলাতে পারবে না। তুমি ভুল করছ।'

'ভুল আপনারা করছেন গোরাদা। আপনারা মুখে নিউ ডেমোক্রেসির কথা বলছেন, আর তলায় তলায় সেই ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করছেন। আপনিও অদ্বৈতদার রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছেন। শুনলাম, পুরীতে গিয়ে অদ্বৈতদা আপনাকে মহাপুরুষ বানিয়ে এসেছেন। রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা কিন্তু আমরা বানচাল করে দেব।'

শুনে গোরা ধৈর্য হারাল। তরুণ মাজি তা হলে সব খবরই পাচ্ছে। খবরগুলো ওকে কে দিতে পারে? দ্রুত ভাবতেই একজনকে ও চিহ্নিত করল। মিনিস্টার গোবিন্দ সাহু। নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে তরুণের যোগাযোগ আছে। প্রতাপ পট্টনায়েকও বললেন সেটা। গোরা নিশ্চিত, ওর সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, তা হলে এই ফোন নিশ্চয় ট্যাপ করা হচ্ছে। হোম মিনিস্টারের পক্ষে সেটা করা অসম্ভব নয়। ওর এখন সাবধানে কথা বলাই উচিত। একেবারে দলিত নেতার মতো। তাই ও ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করো। যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না। রাজনীতির সঙ্গে আমি অন্তত ধর্ম মেশাইনি। যাক সে কথা... টিভিতে দেখলাম, বিক্ষোভের সময় কাল কয়েকজন দলিত পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। প্রচুর লোক আহত হয়েছে। এরা কারা তরুণ? একজনও কি জমির মালিক? উচ্চবর্ণের মানুষরা কিন্তু তোমার কথামতো জমি আগলাতে নেমে আসেনি। তারা দিব্যি ড্রয়িং রুমে বসে দলিত রক্তে জমি উর্বর হতে দেখছে। তোমরা দলিতদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছ। এটা তো কথা ছিল না। আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তুমি কী লাভ করবে, আমি অন্তত বুঝতে পারছি না।'

তরুণ বলল, 'আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করি গোরাদা। প্লিজ, এই মুভমেন্ট থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। আপনাকে আমি সম্মান করি। এখনও আমি বিশ্বাস করি, পারলে

আপনিই পারবেন সারা ভারতের দলিত সমাজে জাগরণ আনতে। জগতপুরে দলিতদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখছি, টিভিতে আপনার প্রচার শুনে... সবাই আপনাকে মহাপুরুষ বলে ধরে নিয়েছে। খুব সাকসেসফুলি এই কাজটা আপনি করেছেন। জগন্নাথ মন্দির থেকে এখনই সরে এলে আপনি বিরাট লিডার হতে পারবেন। শুনছি, সিএম নাকি আমাকে কাউন্টার করার জন্য আপনাকে এখানে পাঠাচ্ছেন। প্লিজ, এখানে আসবেন না।'

'আমাকে কি তুমি ভয় দেখাচ্ছ তরুণ? আমি তো ভাবতেই পারছি না, আমারই প্রেসিডেন্সি কলেজের এক প্রাক্তন পড়ুয়া আমাকে হুমকি দিচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে তা হলে কোনও লাভ নেই।'

'আপনি যা মনে করেন। ছাড়ছি।' বলেই তরুণ লাইনটা কেটে দিল।

গোরা কথা বলছিল লাউড স্পিকারে। পাশে বসে টুবাই সবই শুনেছে। ও বলল, 'আমি জানতাম রে। তোর জগতপুরে যাওয়া তরুণ পছন্দ করবে না। আজ নিশ্চিত হয়ে গেলাম, ও পুরোপুরি গোবিন্দ সাহুর শেল্টারে রয়েছে। যা শুনেছি, ঠিক। গোবিন্দ সাহু এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টায় রয়েছে। মাইনিং এরিয়ায় নকশালদের গতিবিধির খবর পাচ্ছে ওর কাছ থেকে। অন্যদিকে, জগতপুরের মুভমেন্টটা জিইয়ে রাখছে, সিএমকে বেইজ্জত করার জন্য। পার্টির অনেকেই এই পাওয়ার গেমে ঝুঁকে পড়েছে গোবিন্দ সাহুর দিকে। অন্য মিনিস্টারদেরও লোকটা হাত করেছে নানা রকম প্রলোভন দিয়ে। যে করেই হোক, এই লোকটা সিএম হবেই ওড়িশার।'

গোরা বলল, 'সে না হয় বুঝলাম। আমার কী ডিসিশন নেওয়া উচিত বলে তোর মনে হয়।'

'সেটা পরে তোকে বলব। এখন চল, মন্দিরে যাই। দু'তিনদিন তুই কিন্তু মন্দিরে যাসনি।'

'দাঁড়া, তা হলে স্নান করে নিই।' বলেই গোরা উঠে পড়ল।

... জগন্নাথ মন্দিরে ওরা যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় দশটা। ব্যাঘ্রদ্বার দিয়ে ঢুকে গোরা এগোতে লাগল গরুর স্তম্ভের দিকে। আজকাল মন্দিরে এলেই তীর্থযাত্রী আর ভক্তরা ওকে ঘিরে ধরে। টিভিতে লোকে ওকে দেখেছে বলে চিনতে পারে। কেউ কেউ আবার মহাপুরুষ ভেবে ওর পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ে। তখন খুব অস্বস্তি হয় গোরার। ও নিজে ভক্তভাব নিয়ে মন্দিরে আসে। অথচ লোকে ওকে ভগবদ্ভাবে দেখতে চায়। আগে রোজ বিগ্রহের গোপালবল্লভ ভোগের সময় ও মন্দিরে আসত। একদল লোক ওর চরণ স্পর্শ করার জন্য গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। আজকাল তাই মন্দিরে ঢোকার সময় অঙ্গবস্ত্রটা মাথায় জড়িয়ে নেয়। যাতে কেউ ওকে চট করে চিনতে না পারে।

আজ মন্দিরে বোধহয় কোনও পার্বণ আছে, তাই বেশ ভিড়। দক্ষিণ ভারত থেকে একদল তীর্থযাত্রী এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে এক শাড়িবান্ধা পান্ডার। মন্দিরে দু'ধরনের পান্ডা আছেন। একদল শাড়িবান্ধা পান্ডা। এঁদের মাথায় সাদা শাড়ি পাগড়ির মতো করে বাঁধা থাকে। অন্যদল হলেন অশাড়িবান্ধা। যাঁদের মাথায় পাগড়ি থাকে না। তীর্থযাত্রীরা কী বলছেন, গোরা একবর্ণও বুঝতে পারল না। মন্দিরে এ

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে গোরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেল। গরুড় স্তম্ভের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। ভোগমণ্ডপ দ্বারের বাঁ পাশটা ফাঁকা। তাই ওখানে দাঁড়িয়ে ও রত্নসিংহাসনের দিকে তাকাল। বাঁ দিক থেকে পরপর বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথ। বেশ কিছুদিন ধরে আসার ফলে মন্দিরের কাজের ধারা সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল গোরা। দেখেই বুঝতে পারল, বিগ্রহের অবকাশ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ দন্তমার্জন, প্রক্ষালন ও স্নান। এ বার গোপালবল্লভ ভোগের পালা।

রত্ন সিংহাসনের উজ্জ্বল আলোর দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই গোরার শরীরটা কাঁপতে থাকল। অতীতে ফিরে যাওয়ার ওর সেই রোগটা ফিরে এল না কি? ও এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। কোথাও টুবাইকে দেখতে পেল না। অসহায় হয়ে গোরা বাঁদিকে দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলাল। একটা অজানা আশঙ্কা ওকে আঁকড়ে ধরল। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মনে মনে জগন্নাথ স্তব উচ্চারণ করতে লাগল। 'রং দারুব্রহ্মা মূর্তিং প্রণবতনুবরং ... সর্ববেদান্ত কল্পবৃক্ষ ভবজলতরণী ... সর্বতখানুখম ... যোগীনাংহংসতত্ত্বং হরিহর নমিত ... শ্রীপতি বৈষ্ণবানাং ... শৈবানাং ভৈরবাস্যাং পশুপতি পরমং ... শাক্ততন্ত্রে শবিতং চ ... বৌদ্ধানাং বৌদ্ধসাক্ষাৎরূপ ভয়তি বরো ... জৈন সিদ্ধান্তমূর্তিঃ ... তাং দেবো পাতু নিত্যং কলি কলুষহরং ... নীল শিলাধিনাথঃ...।

নিমীলিত চোখে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গোরার মনে হল, ও গর্ভগৃহের পাতালে প্রবেশ করেছে। চাঁদের আলোর মতো নরম, সাদা এক আলোকবর্তিকা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওর উচ্চারিত মন্ত্রগুলো গমগম করছে, পাতাল প্রকোষ্ঠে। ওর চারপাশে, পায়ের নীচে অসংখ্য শালগ্রাম শিলা। দেখে গোরা ভয় পেয়ে গেল। ও এ কী করছে! নারায়ণস্বরূপ শালগ্রাম শিলা মাড়িয়ে ও কোথায় যাচ্ছে? এই একটাই কারণে আজ পর্যন্ত কোনওদিন ও গর্ভগৃহে ঢুকে বিগ্রহ দর্শন করেনি। কেননা, ও জানে গর্ভগৃহের নীচে শালগ্রাম শিলা রয়েছে। পায়ের নীচে শালগ্রাম শিলা দেখে ওর শরীরটা আরও বেশি করে কাঁপতে শুরু করল।

সেইসময় পাতালের অভ্যন্তর থেকে বাঁশির সুমধুর আওয়াজ শুনতে পেল গোরা। শুনে ওর বুকের ভেতরটা আকুলি বিকুলি করে উঠল।

কে বাজাচ্ছে ওই বাঁশি? গোরার মনে হল, তাঁকে দেখতে না পেলে বেঁচে থাকা সম্ভবই না। তীব্র আকর্ষণে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল ও। এমন বংশীবাদন আর কারও পক্ষে সম্ভবই না। ইনিই তিনি। বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণ। চিৎকার করে গোরা এক সময় বলে উঠল, 'দেখা দাও। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি দেখা দাও।' বলতে বলতে ওর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। পাগলের মতো পাথরের দেওয়ালে ও মাথা খুঁড়তে লাগল। 'দেখা দাও, হে কৃষ্ণ।' বলতে বলতে ওর গলার স্বর ভেঙে গেল। পাতালের অভ্যন্তরে বাঁশির সুর অনুসরণ করে অনেকটা দূরে চলে এল। একটা সময়... মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

চোখ খুলতেই গোরা দেখতে পেল টুবাইকে। ভোগ মণ্ডপের বাইরে দালানে ও শুয়ে আছে। সামনে উবু হয়ে বসে টুবাই। ওদের চারপাশে অসংখ্য মুখ। চারদিকে একবার

নজর বুলিয়ে গোরা বলে উঠল, 'কৃষ্ণ কোথায় গেলেন, তুই কি তাঁকে দেখেছিস টুবাই?'

টুবাই বলল, 'কোথায় আর যাবেন? তোর বুকের মাঝেই আছেন।'

গোরা বলল, 'তাই নাকি। আমার বুকের মাঝেই আছেন? তা হলে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' বলেই দু'হাতের আঙুল দিয়ে ও বুকটা চেপে ধরল। বুক চিরে দেখতে চাইল, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আছেন কি না?

নখের আঘাতে রক্ত বেরিয়ে আসার পর, ওকে জোর করে চেপে ধরল টুবাই। ফের গোরার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল। শরীর শিথিল হয়ে গেল। নাড়ির স্পন্দন স্তব্ধ। মৃতের লক্ষণ দেখে কান্না মাখানো গলায় চিৎকার করে টুবাই বলে উঠল, 'শিগগির কেউ ঘড়া করে জল নিয়ে আসুন। মাথায় জল ঢালতে হবে।'

ভিড় ভেঙে অনেকেই জল আনতে ছুটে গেলেন। মন্দিরের ভিতর বোধহয় রটে গিয়েছে, নতুন মহাপ্রভুর ভাবসমাধি হয়েছে। গোপালবল্লভ ভোগের সময় মন্দির খালি করে সবাই ডান দিকের চাতালে চলে এসেছেন। সেখানে আর পা রাখার জায়গা নেই। একদল ভক্ত হরিনাম শুরু করে দিলেন। সেই নাম শুনে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেতে লাগল গোরা। তীর্থযাত্রীদের টুকরো মন্তব্য ওর কানে আসছে। 'জগন্নাথ মন্দির হল মহাভাব সমাধির জায়গা। মহাভাব সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না বলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও শ্রীক্ষেত্রে আসেননি। ওঁর যে ঘনঘন ভাবসমাধি হত।' আর একজন বললেন, বিবেকানন্দও আসেননি। তবে মা সারদা একবার এই মন্দিরে এসেছিলেন।' সংলাপগুলো শুনে গোরা ধন্দে পড়ল, ওরও কি ভাবসমাধি হয়েছিল?

ঘড়া ঘড়া জল ঢালার পর ও সুস্থ হয়ে উঠল। উঠে বসেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল। পা দুটো টুবাইয়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'নে, তোরা এ বার আমাকে পুজো কর।'

টুবাই কিন্তু অবাক হল না। জল দিয়ে প্রথমে গোরার পা ধুইয়ে দিল। ভিড় করে দাঁড়ানো ভক্তদের অনেকের হাতে পুজোর ডালা। সেখান থেকে ফুল তুলে নিয়ে টুবাই গোরার পায়ের কাছে রাখল। তার পর 'নমো দেবায়' শ্লোক বলতে লাগল। স্তুতি শেষ হওয়ার পর নতজানু হয়ে গোরাকে ও প্রণাম করল। ওর দেখাদেখি ভক্তরা অনেকেই গোরাকে প্রণাম করতে শুরু করলেন।

গোরা বলল, 'নে, এবার হরির নাম কর।'

টুবাই যেন ওর দাসানুদাস। ও যা করতে বলছে, নিবিষ্ট মনে তাই করে যাচ্ছে। টুবাই হরি সংকীর্তন শুরু করায়, ওর সঙ্গে অনেকেই কণ্ঠ মেলালেন। কেউ কেউ নাচতেও লাগলেন। মধুর আবেশে গোরার চোখ বন্ধ হয়ে এল। দু'হাতে তাল মেলানোর সময় আনন্দে ওর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বেরিয়ে এল। নিমীলিত চোখেই ও দেখতে পেল, চারদিকে অনন্ত কোটি দেবগণ ওর স্তুতি করছেন। পরম সুন্দর তাঁদের জ্যোতির্ময় রূপ। তাঁদের মাঝে ঋষিগণ করজোড়ে বেদ পাঠ করছেন। তাঁদের সমবেত স্বরে আনন্দধারা বয়ে যাচ্ছে। ফুলের সৌরভে ম ম করছে চারদিক।

দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর গোরা টুবাইকে বলল, 'তোর যা ইচ্ছা, আমার কাছ থেকে বর চেয়ে নে টুবাই। বল, তোর কী চাই?'

টুবাই বলল, 'তুমি আমার সামনে আছ। আমার কোনও বর চাওয়ার নেই।'

গোরা বলল, 'না না। তোকে বর চাইতেই হবে। একবার যখন আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে, তখন সেটা ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

অনিচ্ছায় টুবাই বলল, 'বেশ তাই হোক। তুমি আমাকে যে প্রেমভক্তি দেবে, তা যেন আমি সকলের মধ্যে বিতরণ করতে পারি।'

অপরূপ এই বরপ্রার্থনা শুনে সমবেত ভক্তগণ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। দেখে মিটিমিটি হাসতে শুরু করল গোরা। টুবাইয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে তার পর বলল, তুই যেরকম ভক্ত, তাতে অন্য বর চাইতেই পারিস না। তাই হোক।'

ভক্তদের মধ্যে আরও অনেকে কাছে এসে বর প্রার্থনা করছেন। ভগবদ্ভাবে গোরা যেন কল্পতরু। যে যা চাইছেন, তাঁকে সেই বর দিচ্ছে। 'প্রভু, আমার বাবা অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাকে ভালো করে দিন।' 'প্রভু, আমার স্বামী কুষ্ঠ রোগে ভুগছেন, তাকে মুক্ত করে দিন।' 'প্রভু, আমার ছেলে ঘোর নাস্তিক, তার যেন সুমতি হয়।' 'প্রভু, প্রভু, প্রভু... আমার অমুক চাই, প্রভু আমার তমুক চাই।' কত প্রার্থনা নিয়েই না মানুষ মন্দিরে আসে? গোরা তাদের শুধু বলছে, 'হরির নাম কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এমন সময় মূর্তিমান উৎপাতের মতো এসে হাজির হল একদল পাণ্ডা। বলল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এ মন্দির প্রভু জগন্নাথের। এখানে বসে তুমি পুজো নিচ্ছ? এখুনি চলে যাবে। না হলে তোমায় মারতে মারতে আমরা বের করে দেব।'

মারমুখী পাণ্ডাদের দেখে ভক্তরা গর্জে উঠে বলল, 'চেষ্টা করে দেখুন। মন্দির আর মন্দির থাকবে না। লাশঘর হয়ে যাবে।'

পাণ্ডাদের সঙ্গে ভক্তদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল দেখে টুবাই বলল, 'চলো গোরা, আমরা গম্ভীরায় ফিরে যাই। এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।'

কোনও কথা না বলে গোরা উঠে পড়ল। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পর ও বলল, 'আমার কী হয়েছিল বল তো টুবাই? শরীরটা এতক্ষণ বশে ছিল না। কোনও প্রলাপ বকিনি তো? পাণ্ডারা এত ক্ষেপে গেল কেন আমার উপর?'

টুবাই ছোট্ট উত্তর দিল, 'আসল রূপে আজ তুমি প্রকট হয়েছিলে। আমি ভাগ্যবান, তাই দেখতে পেলাম।'

উনআশি

নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করে পুরন্দর অবাক হয়ে যাচ্ছে। সেই উগ্রভাবটা ওর মধ্যে আর নেই। মানুষ খুন করার তাগিদ ও আর বোধ করছে না। হেড কোয়ার্টার্সের

আদেশ পাওয়ার জন্য টেনশনে থাকে না। কামজনিত উত্তেজনাও ওর আজকাল হয় না। আর পাঁচটা গৃহস্থ মানুষ যেভাবে দিন কাটায়, ওর জীবনও সেই রকম নিস্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছে। সেই ছোটবেলা থেকে অনাথ আশ্রমে। বড় হওয়ার পর পূজ্যপাদ পদ্মনাভর তাড়নায় যাযাবর জীবনের একাকিত্ব ভোগ করেছে। এই প্রথম ও সাংসারিক সুখানুভূতিটা টের পাচ্ছে।

পুরন্দর এখন রয়েছে ভুবনেশ্বরে মায়ের বাড়িতে। সকালবেলায় ওর ঘুম ভাঙে, লাগোয়া মন্দিরে ধর্মীয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে। বিশাখা মা আর বেলি নানীরা সাতসকালেই স্নানাদি সেরে পুজোর উদযোগ শুরু করে দেন। বিছানায় ইচ্ছে করেই ও শুয়ে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত অম্বালিকা চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হয়। বেলি নানীর সঙ্গে অম্বাও ভুবনেশ্বরে চলে এসেছে। মেয়েটাকে আগে ও দূর থেকে দেখত। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত। গত তিন চারটে দিন খুব কাছ থেকে দেখছে। মেয়েটা সত্যিই ফুলের মতো সুন্দর। তুলোর মতো নরম। যখন কথা বলে, তখন পুরন্দরের মনে হয়, বীণা বাজছে। আগে ওকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখত পুরন্দর। কিন্তু এখন নিজেকেই প্রবোধ দেয় এই বলে, তোর ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে অম্বালিকাকে জড়ানোর কথা কখনও মনে ঠাঁই দিস না রে মূর্খ। তুই কীটস্যকীট, ঘোর পাপী। প্রভু জগন্নাথ কোনওদিন তোকে ক্ষমা করবেন না।

সময় পেলেই পুরন্দর আজকাল নাটমন্দিরে গিয়ে বসে থাকে। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে। অদ্ভুত সব প্রশ্ন ওর মনে তখন জাগে। পাথরের মূর্তির কাছে ও উত্তরগুলো জানতে চায়। ওর প্রধান জিজ্ঞাস্য, পদ্মনাভ ওকে দিয়ে যেসব পাপ করিয়েছেন, তা স্খালন করবে কী করে? পাপের দায় কি একা ওকেই নিতে হবে? যাঁর নির্দেশে ও অমানবিক কাজগুলো করেছে, কেন তাঁকেও কিছু ভোগ করতে হবে না? একান্তে পেয়ে পুরন্দর একদিন মন্দিরের পুরোহিতকে প্রশ্নটা করেছিল। উনি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও বাছা। উনি সকলের পাপ হরণ করেন। তবে আকুল হয়ে ওকে ডাকতে হবে। না হলে সাড়া দেবেন না।' কিন্তু আকুল হওয়া মানেটা কী, পুরন্দর বুঝতে পারছে না।

মায়ের বাড়িতে সারাদিন সবকিছু একটা নিয়মের মধ্যে চলে। এটাও খুব ভালো লাগে পুরন্দরের। এ বাড়িতে এখন গোরাভাই নেই, অথচ ভীষণভাবে আছে। দিনে একবার না একবার মা আক্ষেপ করবেই। এখনও গোরাভাইকে দেখেনি বেলি নানী। বিশাখা মায়ের কাছে রোজ রোজ বোধহয় গল্প শোনে। বেলি নানীর খুব কৌতূহল গোরাভাইকে নিয়ে। 'তোর ছেলেটাকে একবার আসতে বল না বিশাখা। কে যেন সেদিন বলছিল, ওকে দেখে না কি মহাপ্রভু বলে ভ্রম হয়। স্বভাবেও না কি সে মধুর। আশ হয়, তাকে প্রাণভরে দেখি। কবে মরে যাব, তার ঠিক নেই।' বিশাখা মা উত্তর দেয়, 'বালাই ষাট বেলি দিদি। ওরকম বোলো না। আমার গোরা দেখবে, যে কোনওদিন চলে আসবে।'

বেলি নানীর কথা শুনে মাঝে পুরন্দরের ইচ্ছে হয়েছিল, পুরীতে গিয়ে গোরাভাইকে একবেলার জন্য ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু এই সময়টা পুরীতে যাওয়া-আসা করা খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে। পুলিশ ওকে আর আত্মানন্দকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে,

সিবিআই অফিসার বিমল রাউথের মার্ডারের ব্যাপারে। মাঝে একদিন আত্মানন্দ ওকে ফোন করেছিল। বলেছে, দিল্লি থেকে আর একজন অফিসার এসেছেন। তিনি নানা জায়গায় গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। পুলিশ নাকি জিলিপির দোকানের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরন্দরের একটা স্কেচও আঁকিয়েছে। তাতে অবশ্য পুলিশের লাভ হবে না। কেননা, মাথা ন্যাড়া করে ফেলার পর ওর চেহারা এমন বদলে গিয়েছে, ওকে চেনা সম্ভব না।

এই ক'দিনে মায়ের মুখে গোরাভাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে পুরন্দর। সন্ধ্যারতি হয়ে যাওয়ার পর মা কোনও কোনওদিন গল্প করতে বসে বেলি নানী, অম্বালিক, প্রিয়ার সঙ্গে। তখন সিঁড়িতে বসে পুরন্দর সব শোনে। পুণ্যলগ্নে জন্ম হয়েছিল গোরাভাইয়ের। ফাল্গুন মাসে আকাশে তখন পূর্ণ চাঁদ। হাজার শঙ্খধ্বনি হয়েছিল নাকি সেই সময়। গণৎকার এসে বলেছিলেন, 'তোর গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছেন রে বিশাখা। আধ্যাত্মিক জগতে উনি নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করবেন। শেষ রাতে আঁতুরঘরে নাকি দুজন সাধু এসে হাজির হয়েছিলেন। শিশুপুত্রকে তুলে নিয়ে ওর পিঠে একটা লাল জড়ুল এঁকে দিয়েছিলেন ওঁরা। সেই চিহ্ন এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে গোরা।'

সকালবেলায় মুখটুখ ধুয়ে ঘরে বসে গোরাভাইয়ের কথাই ভাবছিল পুরন্দর। এমন সময় দেখল, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অম্বালিকা ঘরে ঢুকল। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। ওর রূপ আরও খুলে গিয়েছে। টেবলের উপর চায়ের কাপটা রেখে অম্বালিকা মৃদুস্বরে বলল, 'আপনাকে মা একবার ডেকেছেন।'

কথাগুলো জলতরঙ্গের শব্দ তুলে পুরন্দরের কানে এসে ঢুকল। অম্বালিকা যখন রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে ওর কাছে আসে, তখন পুরন্দরের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তবুও ও বলল, 'মা মানে? বিশাখা মা, নাকি বেলি নানী? তোমার মা?'

মুখ তুলে তাকিয়ে অম্বালিকা আরও মৃদুস্বরে বলল, 'বিশাখা মা। উনি নিজের ঘরে রয়েছেন। আপনাকে এখুনি একবার যেতে বললেন।'

'কোনও দরকার আছে?'

'আপনাকে বোধহয় একবার ভোই স্টোর্সে যেতে হবে। মোবাইলে রিচার্জ করে দিতে হবে। ফোনে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চান। লাইন কেটে দিয়েছে।' কথাগুলো বলেই অম্বালিকা চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও চলে যাক, মন চাইছিল না। তাই পুরন্দর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বাড়িতে কি আজ কোনও পার্বণ আছে?'

ঘাড় নাড়ল অম্বালিকা। বলল, 'হ্যাঁ, মা সরস্বতীর পুজো। পুরোহিত মশাই এসে গিয়েছেন। একটু পরেই অঞ্জলি দিতে হবে। আপনি স্নান করে নিন।'

মা সরস্বতীর পাঠশালায় কোনওদিন পড়েনি পুরন্দর। অঞ্জলি দেওয়া তো দূরের ব্যাপার। নিজেকে ও গোমুখ্যুই ভাবে। সেটা অম্বালিকা জানবে কী করে? কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ও শুধোল, 'স্নান না করে কি অঞ্জলি দেওয়া যায় না?'

শুনে ফিক করে হেসে ফেলল অম্বালিকা। বলল, 'তা কী করে হবে? স্নান করলে মন শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ না হলে কী মায়ের আরাধনা করা যায়?'

'বাঃ, এই তো সুন্দর কথা বলছ। তা হলে সারাদিন চুপচাপ থাকো কেন?'

'আমার খুব ভয় করে।'

'ভয় করে কেন? এখানে তোমার কীসের ভয়?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে অম্বালিকা বলল, 'পুরীর মন্দির থেকে যদি কেউ আসে... আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়? শুনলাম, মাহেরিদের নাকি বিষ্ণুমন্দিরে জড়ো করা হচ্ছে।'

খুব মায়া হল পুরন্দরের কথাগুলো শুনে। ও বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি ভয় পেয়ো না, কেমন?'

ঘাড় নাড়ল অম্বালিকা। তারপর বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বলো, এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন?'

'মা বলে, আপনি নাকি কোথাও বেশিদিন ধরে থাকতে পারেন না। কোথায় কোথায় চলে যান। অনেক দিন আপনার টিকি দেখা যায় না। আমাদের ছেড়ে আপনি কোথাও চলে যাবেন না তো?'

শুনে বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠল পুরন্দরের। ও বলল, 'কথাটা মা ঠিকই বলেছে। তবে তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

অম্বালিকা কী বুঝল কে জানে? মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমি তাহলে যাই।'

ও চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পর বিশাখা মায়ের ঘরে ঢুকে পুরন্দর দেখল, টিভির সামনে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে মা। ওকে দেখে বলল, 'এই দ্যাখ বাছা, টিভিতে কী দেখাচ্ছে।'

টিভির পর্দার দিকে তাকিয়ে পুরন্দর দেখল, গ্রামের আল পথ ধরে বিরাট ... বিরাট একটা মিছিল যাচ্ছে। মিছিলের সামনের দিকে রয়েছে কয়েকজন জটাধারী সাধু। কোনও ধর্মীয় মিছিল হবে বোধহয়। ওড়িশায় এমন কিছু নতুন নয়। হরির নামসংকীর্তন করতে করতে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে। কারও হাতে খোল, করতাল, কারও মুখে শঙ্খ ও ভেরি। মা এই প্রোগ্রাম দেখছে কেন, পুরন্দর বুঝতে পারল না। কিন্তু ভালো করে দেখার পর ও চিনতে পারল, মিছিলের পুরোভাগে রয়েছে গোরাভাই। ওর মাথায় একজন ছত্রী ধরে আছে। টিভি ক্যামেরায় বারবার ওর মুখটা দেখানো হচ্ছে। রিপোর্টারের কথা শুনে পুরন্দর জানতে পারল, পুরী থেকে জগতপুরে গিয়েছে গোরাভাই। ওখানে কারখানার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। তখনই মাটির নীচ থেকে একটা মন্দির বেরিয়ে এসেছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের একটা প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সেই মন্দির নতুনভাবে তৈরি করা হবে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্থানীয় মানুষরা গোরাভাইকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে পুরী থেকে। আজ থেকে ওখানে অষ্টপ্রহর কীর্তন হবে।

পর্দায় চোখ রেখে পুরন্দর এমন কিছু দেখতে পেল না, যাতে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ আছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। কোনও

কিছু না ভেবেই ও প্রশ্ন করল, 'আপনি কাঁদছেন কেন মা? এত উতলা হওয়ার কারণটাই বা কি?'

মা বললেন, 'উতলা হওয়ার কারণ আছে বাছা। তোকে কেন ... আমি কাউকেই সেটা বলতে পারব না। মায়ের মন তো? কেন জানি না, কুডাক দিচ্ছে। টিভিতে দেখছি, জগতপুরে কয়েক দিন ধরেই খুব গণ্ডগোল চলছে। ওখানে নকশালদের খুব উৎপাত হয়েছে আজকাল। গোরার ওখানে যাওয়া... উচিত হয়নি।'

'অনেক লোকজন আছে। আপনি অযথা চিন্তা করবেন না মা।'

'পুরীতে তোর সঙ্গে গোরার কোনওদিন দেখা হয়েছে, বাছা?'

'না। তবে জয়দেবভাইয়ের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল।'

'শুনলাম, ধর্মে খুব মতি হয়েছে আজকাল আমার গোরার। এখানে রেড্ডি বলে একজন থাকেন। মাঝে মাঝে উনি খবর এনে দেন ওর। মাঝে টিভিতে নাকি ওকে খুব দেখিয়েছে। রেড্ডি বলছিলেন, গোরার কাছে না কি আজকাল শ'য়ে শ'য়ে লোক আসে। জগন্নাথ মন্দিরেও এত ভিড় হয় না। শুনে আমি তো ভয়ে মরি। প্রভু জগন্নাথ যেন রুষ্ট না হন আবার। হ্যাঁ রে বাছা, ওকে নিয়ে তুই কিছু শুনিসনি। তুই যেখানে থাকিস, সেখান থেকে গম্ভীরা হোটেল কতদূরে রে?'

'দেড়-দু কিলোমিটার হবে।'

'পুরীতে অ্যাদ্দিন কী করতি রে তুই? রোজই কথাটা জিজ্ঞেস করব ভাবি। কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় না।'

প্রমাদ গুনল পুরন্দর। বুদ্ধি করে ও বলল, 'কেন বেলি নানী আপনাকে কিছু বলেনি?'

'বলেছিল। পদ্মনাভর হয়ে না কি কীসব কাজ তুই করতি। কী কাজ রে? লোকটা একটা আস্ত শয়তান। তোকে দিয়ে খারাপ কাজ-টাজ করায়নি তো?'

সরাসরি প্রশ্নটা শুনে পুরন্দর খেই হারিয়ে ফেলল। জন্মদাত্রী মায়ের সামনে মিথ্যে কথা ওর মুখ দিয়ে বেরল না। বানিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই ওকে বাঁচিয়ে দিল ফোন। হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল। জামার পকেট থেকে সেটটা বের করে দেখল, আত্মানন্দ। কাল রাতেই আত্মানন্দের সঙ্গে ফোনে ওর কথা হয়েছে। হঠাৎ কী এমন হল, ফের ফোন করল? মায়ের সামনে আত্মানন্দের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। তাই ফোনে কথা বলার অছিলায় পুরন্দর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'খবর কী বলো?'

'ভালো নয়। তুমি একটু দেখা করতে পারবে? আমি এখন ভুবনেশ্বরে।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পুরন্দর জানতে চাইল, 'ঠিক কোথায়?'

'সেদিন ইউনিক টু-র যে জায়গায় তোমাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনেই একটা মণিহারি দোকান। ভোই স্টোর্স। শিগগির চলে এসো। আমার পিছনে পুলিশ লেগে আছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

রাস্তার উলটো দিকেই ভোই স্টোর্স। দ্রুত পায়ে পুরন্দর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

দুরে একটা কোয়ালিস দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই জানলার কালো কাচ নামিয়ে আত্মানন্দ বলল, 'গাড়িতে উঠে এসো।'

নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে আত্মানন্দ। ড্রাইভারের পাশে সিটে পুরন্দর বসতেই আত্মানন্দ বলল, 'দুটো খারাপ খবর আছে পুরন্দর। সেই ম্যাডাম খুন হয়ে গেছেন।'

'কার কথা বলছ?' খবরটা শুনে পুরন্দর ঘুরে বসল।

'যাকে আমরা পাতাল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। জয়দেববাবুর লাভার উপাসনা ম্যাডাম। খবরটা আজ সকালেই পেলাম। আমাদের মায়াপুরের আশ্রম থেকে। একটা আশঙ্কা আমার ছিলই। জানতাম, পদ্মনাভ ওকে ছেড়ে দেবে না। প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কলকাতায় আমি লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু সিম্পলি ফর ল্যাক অফ ইনফর্মেশন... শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।'

'কী বলছ তুমি? কী করে এসব হল?'

'পদ্মনাভর অর্গানাইজেশনে যে মেয়েরাও আছে, তা কি তুমি জানতে পুরন্দর?'

পুরন্দর বলল, 'না। কখনও শুনিনি।'

'কাল রাতে ওদের সার্ভার থেকে পাওয়া মেটিরিয়ালস নিয়ে আমরা কয়েকজন বসেছিলাম। তখনই জানলাম, মেয়েদের দলটা কাজ করত পদ্মনাভর মেয়ে মন্দাকিনীর আন্ডারে। মন্দাকিনী রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় কিছুদিন আগে। কিন্তু ওর মেয়েরা এখনও অ্যাকটিভ। ওরাই উপাসনা ম্যাডামের পিছনে লেগেছিল। কাল সুযোগটা পেয়ে যায়।'

শুনে মন্দাকিনীর যন্ত্রণাকাতর মুখটা চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। পুরন্দর বলল, 'মার্ডারটা কি ওরা কলকাতায় গিয়ে করে এসেছে?'

'না। ম্যাডাম নবদ্বীপের মেয়ে। দিন সাতেক আগে উনি লোকাল ট্রেনে নবদ্বীপে যাচ্ছিলেন। সেখানে ট্রেনের কামরায় ওর সঙ্গে এক পরিবারের আলাপ হয়। কথায় কথায় ম্যাডাম হয়তো ওর রিসার্চের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। শুনে সেই পরিবারের মাঝবয়সি এক মহিলা ম্যাডামকে বলেন, কাটোয়ায় তার বাড়িতে না কি প্রাচীন একটা পুঁথি আছে। যা রিসার্চে সাহায্য করবে। কাটোয়ায় গেলে উনি তা দেখাতে পারবেন। টোপটা ম্যাডাম তখন বুঝতে পারেননি। পরশু সকালে উনি একাই যান কাটোয়ায়। বাড়িতে বলেছিলেন, বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবেন। কিন্তু ফিরে আসতে পারেননি। ওর লাশ পুলিশ পায় রেল লাইনের ধারে।'

'খুন হলেন কী করে?'

'বিকেলের দিকে ম্যাডাম ট্রেনে করে ফিরছিলেন। পিছন থেকে ধাক্কা মেরে ওঁকে ফেলে দেওয়া হয়।'

'তুমি এ খবর পেলে কী করে?'

'আমাদের নেটওয়ার্কে। ম্যাডাম যেদিন নবদ্বীপে যাচ্ছিলেন, সেদিন ট্রেনের কামরায় আমারও লোক ছিল। ওদের কনভার্সেশন আমার লোকও শুনেছিল। কিন্তু তখন আমরা

জানতাম না, পদ্মনাভর অর্গানাইজেশনে মহিলা এজেন্টও আছেন। মাঝবয়সি মহিলার সঙ্গে সেদিন ছিলেন তার সাজানো ছেলে, ছেলের বউ আর সদ্যোজাত একটা শিশু। ট্রেনের কামরায় উনি এমন গল্প ফেঁদেছিলেন, কারও মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। ওই মহিলাকে আমরা কাল্ ট্রেস করেছি। আজ ভোরে উনি পালিয়ে পুরীতে চলে এসেছেন। ওকে যা শাস্তি দেওয়ার, আমি দেব। তার আগে তোমাকে আর একটা দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি এখানে চলে এলাম।'

'আবার কী দুঃসংবাদ আত্মানন্দ?'

'লিঙ্গরাজ মন্দির থেকে আসার সময় সেদিন... কথায় কথায় তুমি গোরাভাইয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলে। পরে আমি ওঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। তুমি নিশ্চয় জানো, উনি এখন জগৎপুরে। স্রেফ অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের জন্য উনি ওখানে যাননি। আমার কাছে খবর আছে, ওখানে ওঁকে খুনের চেষ্টা হবে। কিন্তু ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। আমি জগৎপুরে যাচ্ছি। ভাই, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

আশি

বুদ্ধিটা দিয়েছিল টুবাই। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে। সারা দিনে ও খবরের কাগজ পড়ার সময় পায় না। এত লোক ওকে সামলাতে হয়। রাতের দিকে নিজের ঘরে বসে বোধহয় ও কলিঙ্গ টাইমসে চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎ এসে হাজির। হাসিমুখে বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না, তোমার জগতপুরে যাওয়া উচিত কি না? প্রবলেমটা সলভ করে ফেলেছি।'

মেঝেতে শুয়ে গোরা মন্দিরের পান্ডাদের সঙ্গে ওর ঝামেলার কথা ভাবছিল। পান্ডারা ওর মন্দিরে যাওয়া পছন্দ করছেন না। টুবাইকে দেখে উঠে বসে ও বলল, 'কীভাবে করলি?'

খবরের কাগজটা দেখিয়ে টুবাই বলল, 'এই দ্যাখ, কাগজে কী লিখেছে। মাস দুয়েক আগে সরকারের লোকজন জগৎপুরে জমি দখল করার জন্য যখন পানের বরোজ ভেঙে দিচ্ছিল, তখন মাটির নীচে একটা প্রাচীন মন্দিরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আমার এক রিপোর্টার বন্ধু মধুশ্রী কলিতা এই রিপোর্টটা করেছে। তাকে ফোন করে জানলাম, মন্দিরটা পাঁচশো বছরের পুরনো। মহাপ্রভু না কি ওখানে একবার গিয়েছিলেন।'

গোরা বলল, 'কিন্তু এই মন্দিরের সঙ্গে আমার জগৎপুরে যাওয়ার কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না।'

টুবাই বলল, 'একটা ছুতো পাওয়া গেল। মধুশ্রী আমাকে বলল, ওখানে যে ছেলেটা মন্দির ফের প্রতিষ্ঠা করার জন্য টাকাপয়সা তুলছে, সে না কি আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। নাম গয়াধর মল্লিক। তবে আমি খেয়াল করতে পারছি না। দাঁড়া, তাকে একবার ফোন করে দেখি।'

'কী নাম বললি? গয়াধর মল্লিক। আরে, ওই নামে তো আমিও একজনকে চিনি। মাসখানেক আগেও আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরের বাড়িতে। দলিত পার্টি করে। পিপলিতে আমি যেদিন ইনজিয়র্ড হলাম, তার দু'দিন পর ও গিয়েছিল। খুব এনার্জিটিক ছেলে।'

'ব্যস, তা হলে তো আরও ভালো।' বলেই টুবাই ফোনের সুইচ টিপতে লাগল। একটু পরে লাইনটা পেয়ে ও বলল, 'গয়াধর, টুবাই বলছি পুরী থেকে। চিনতে পারছিস?'

স্পিকার চালিয়ে দিয়েছে টুবাই। ফলে ও প্রান্ত থেকে গয়াধরের গলা পেল গোরা। 'চিনতে পারব না কেন? বল, কেমন আছিস? শুনলাম, তুই না কি খবরের কাগজে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?'

'মধুশ্রী বলেছে, বুঝি? ওর সঙ্গে আমার কথা হল। ওর কাছ থেকেই তোর ফোন নাম্বারটা পেলাম। তুই এখন কী করছিস গয়া?'

'পলিটিকস। জানিসই তো, যেখানে আমি থাকি, সেটা দলিত বেল্ট। এম এ পাশ করার পর এখানেই মাস্টারি করছিলাম। কিন্তু ভালো লাগল না। ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি দলিতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। ফোনটা করে তুই ভালো করেছিস টুবাই। হ্যাঁরে, গোরাভাই কি এখন পুরীতে? উনি না কি একদম বদলে গিয়েছেন? ওঁর সম্পর্কে যা টিভিতে দেখছি, সত্যি? তুই কি কিছু জানিস? এই তো ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হল, তখন তো কিছু বুঝিনি।'

'যা দেখেছিস, সব সত্যি। ওর সঙ্গে আমিও এখন পুরীতে আছি। ইন ফ্যাক্ট, গোরার জন্যই ফোনটা তোকে করলাম। ও একবার তোদের ওখানে যেতে চায়। তোদের ওখানে কসকো নিয়ে যে প্রবলেমটা চলছে, সে ব্যাপারে কথা বলতে চায় দশরথ মোহান্তির সঙ্গে। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। গোরাকে আমিই দশরথের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু একটা ডেথ থ্রেট আছে। সেই কারণে অন্য একটা ছুতোয় ওকে... জগৎপুরে নিয়ে যেতে হবে।'

'দশরথের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। তুই যদি বলিস, তা হলে পাঁচ সাত দিন পর তোদের ওখানেই ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি। বুঝতেই তো পারছিস, এখানে অ্যাজিটেশন মারাত্মক আকার নিয়েছে। এখন দশরথকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'না না। তার দরকার নেই। মধুশ্রী বলেছিল, তুই না কি মাটির নিচ থেকে পাওয়া একটা মন্দির ফের প্রতিষ্ঠা করছিস। আমি বলি কী, তুই ওই মন্দিরটা ঘটা করে উদ্বোধন কর। আর সেই সময় গোরাকে নিয়ে যা। টাকার কোনও অভাব হবে না। যত লাখ টাকাই লাগুক, আমি জোগাড় করে দেব।'

ও প্রান্তে গয়াধর উত্তেজিত। বলল, 'আরে, তা হলে তো দারুণ হয়। গোরাবাবু যদি আসেন, তার থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না।'

'তার আগে একটা কথা বল তো ভাই। গোরার কথা কি তোদের ওখানকার লোকজন জানে?'

'জানে মানে? খুব ভালোমতো জানে। ওঁকে দেখার জন্য এখান থেকে অনেক লোক পুরীতেও গিয়েছিল। উনি যদি আসেন, তা হলে পুরো জগৎপুর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'গোরা গেলে কোথায় রাখবি ওকে? ভালো সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে তো?'

'কোনও চিন্তা করিস না ভাই। এখানেও জগন্নাথের একটা মন্দির আছে। বিখ্যাত সরলা মন্দিরও। মা সরস্বতীর মন্দির। শহর থেকে অবশ্য কয়েক কিলোমিটার দূরে। কাঁকনপুর বলে একটা জায়গায়। দুটো মন্দিরের গেস্ট হাউস বেশ ভালো। তবে তুই রাজি হলে গোরাভাইকে আমার বাড়িতে এনেও রাখতে পারি। তা হলে ... বলতে পারিস, একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে।'

'সেটা কীরকম?'

'পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। এক রাত্তির নামসংকীর্তনও করেন। সেই সময় উনি একটা কমণ্ডলু ফেলে রেখে যান। আমার পূর্বপুরুষরা তামার সেই কমণ্ডলু কালো কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখেছিলেন। সেই থেকে নিত্য পুজো হয় কমণ্ডলু। তোরা এলে দেখাতে পারি।'

শুনে লাফিয়ে উঠেছিল টুবাই। 'ব্যস, ব্যস। তোর বাড়িতেই গোরাকে রাখার ব্যবস্থা কর। মন্দিরটা তুই আর্লিয়েস্ট কবে উদ্বোধন করতে পারবি?'

'গোরাভাই যবে সময় দেবেন। তুই বল, কবে ওঁকে নিয়ে আসতে পারবি? আমি মন্দিরের উদ্বোধন সেদিনই করার ব্যবস্থা করব।'

'দাঁড়া, ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।' বলেই হাত দিয়ে ফোনটা ঢেকে টুবাই জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাওয়ার কথা বলব?'

গোরা বলল, 'পরশুই বলে দে। আমি গেলে বিক্ষোভে ভাঁটা পড়বে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করা যায়, ততই মঙ্গল।'

শুনে গয়াধরকে টুবাই বলল, 'শোন, পরশু সকালের দিকেই তোর ওখানে পৌঁছে যাব। এখানকার টিভি চ্যানেলে সেটা আমি অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। কুইক লোকের কাছে খবরটা চলে যাবে। তা হলে ওই কথাই রইল। পরশু কেমন... আর হ্যাঁ, সিকিউরিটির কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় রাখিস।'

... মাত্র একদিনের মধ্যে গয়াধর যে এত ভালো অর্গানাইজ করতে পারবে, সেটা গোরা বা টুবাই কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। হাইওয়ে থেকে জগৎপুরের রাস্তায় ঢোকার পরই ওরা সেটা টের পেল। প্রতাপ পট্টনায়ক পুরী থেকে পুলিশ হুটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পুরীর বাইপাস ধরে ওরা নির্ঝঞ্ঝাটেই জগৎপুরে পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে। চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে ওরা দেখল, কয়েক হাজার লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। গয়াধর বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। ওদের জন্য সুন্দর সাজানো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গয়াধর টুবাইকে বলল, 'মন্দির পর্যন্ত তোমাদের রথে করে নিয়ে যাব। যাতে সবাই গোরাবাবুকে চাক্ষুষ করতে পারে। সেই ভোরবেলা

থেকে এত লোক ওয়েট করছে। আমি বুঝতে পারছি না, মন্দিরের উদ্বোধনের সময় কী হবে।'

চড়া রোদে রাস্তার দু'পাশে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেউ ফুল ছেটাচ্ছেন, কেউ শাঁখ বাজাচ্ছেন। কেউ উলু দিচ্ছেন। বেশিরভাগই মহিলা। কয়েকজন রাস্তায় শুয়েও পড়লেন। মহাপ্রভুর পায়ের ধুলো নেবেন বলে। গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে তাঁদের সরিয়ে দিল। শোভাযাত্রার সামনের দিকে খোল, করতাল, খঞ্জনি নিয়ে অনেকেই কীর্তন শুরু করে দিয়েছে। ভক্তরা নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার আগে গোরা দেখল, একটু দূরে টিভির ওবি ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। দশ-বারোজন সাংবাদিক বুম হাতে দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে একজনকে চন্দনের মতো মনে হল। সত্যিই চন্দন হলে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে। গয়াধরকে ও জিজ্ঞেস করল, 'আগে মন্দিরে গেলে হয় না?'

গয়াধর বলল, 'আগে মন্দিরে যাবেন? আমি ভাবছিলাম, আগে আমার বাড়িতে গিয়ে স্নানটান করে একটু বিশ্রাম নিয়ে তার পর মন্দিরে যাবেন। ঠিক আছে, মন্দিরেই চলুন। আমি জগৎপুর থানাকে বলে দিচ্ছি, যাতে ওখানে ভালোরকম পুলিশ পোস্টিং করে রাখে। জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকেও আসতে বলে দিচ্ছি। উনি আপনাকে দেখতে চান।

ঘোড়ায় টানা রথে বসে মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল গোরার। ওর মাথায় ছত্রী ধরে রয়েছে টুবাই। পাশে বসে গয়াধর। খানিকটা পথ পেরোনোর পর গোরার ইচ্ছে করল, রথ থেকে নেমে ভক্তদের সঙ্গে নাচতে। হরিনাম শুনলেই আজকাল ওর শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। নিজেকে আর তখন স্থির রাখতে পারে না গোরা। পাঁচশো বছর আগে এই রাস্তা দিয়ে মহাপ্রভু হেঁটে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন নিশ্চয়ই এত মানুষ ছিলেন না। কারা ছিলেন, টুবাই মনে হয় বলতে পারবে। হয়তো গয়াধরও জানে। বংশপরম্পরায় শুনে আসছে।

চৌরাস্তার মোড় থেকে মন্দিরে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। আসার সময় একটা বটগাছ দেখিয়ে গয়াধর বলল, 'এই গাছটার নীচে একটা সময় মহাপ্রভুর পঞ্চসখা কিছুদিন গোপনে বসবাস করেছিলেন। শোনা যায়, সেই সময় ওঁরা না কি কিছু গুপ্ত সাহিত্য রচনা করেন। সেটা অবশ্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্তী সময়ে। বুঝতেই পারছেন, তখন মহাপ্রভুর কীরকম প্রভাব এই অঞ্চলে ছিল। এখনও সেটা বর্তমান। এখানে প্রচুর কীর্তন দল রয়েছে। এই যে দেখছেন, শোভাযাত্রার সঙ্গে এত কীর্তনীয়া, সবই কিন্তু এই রাহামা অঞ্চলের।'

মন্দিরের দিকে এগনোর সময়ই গোরার চোখে পড়ল, দু'পাশে প্রচুর সুপারি আর কাজু গাছের বাগান। জায়গাটা দেখে ওর মনে হল, আগে একবার এসেছে। চিন্তা করতে গিয়ে ওর মাথা টিপটিপ করতে লাগল। মন্দিরের কাছে পৌঁছে ও দেখল, লোকে লোকারণ্য। মহাপ্রভুর নামে লোকে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। রথ থেকে নেমে খানিকটা হেঁটেই গোরা মন্দির দেখতে পেল। এক বিশাল বটগাছের পাশে বহু প্রাচীন মন্দির। গয়াধররা বোধহয় সামান্য

সংস্কার করেছে। খননকার্যও সম্পূর্ণ হয়নি। পাশ থেকে গয়াধর বলল, 'চলুন, ভিতরে ঢোকা যাক। বিগ্রহ দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

কালো কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি। তাঁর চার হাত। বিগ্রহ দেখেই গোরার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল। ও মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ভাবসমাধির মাঝেই ও দেখল, গোধূলি বেলায় গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে রয়েছে স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, হরিদাস ঠাকুর, মুকুন্দ আরও অনেকে। পরিশ্রান্ত হয়ে ও একটা বটগাছের তলায় বসেছে। তেষ্টায় ওর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। জলের খোঁজে যেতেই অনতিদূরে এক কুটির থেকে এক প্রবীণ মানুষ বেরিয়ে এসে ওদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

সামনে থেকে কেউ একজন বলল, 'আমরা শ্রীক্ষেত্র থেকে আসছি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ। গৌড় দেশে যাচ্ছি।'

'মহোদয় আপনারা ভুল পথে এসেছেন। এই বনের শেষে যবন সম্প্রদায় বসবাস করে। যবনরাজ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। যে-কোনও মুহূর্তে আপনাদের আক্রমণ করতে পারেন। দয়া করে আর এগোবেন না। আপনাদের জীবনহানি ঘটতে পারে। আজ রাতে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। কাল প্রত্যুষে আমার পুত্ররা আপনাদের ঠিক রাস্তায় পৌঁছে দেবে।'

হরিদাস ঠাকুর গিয়ে সেই কুটির থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এল। রাতে আকাশে চাঁদ ওঠার পর সবাই মিলে ওরা নামসংকীর্তন শুরু করে দিল। খোল, করতাল আর খঞ্জনির শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বনাঞ্চলে। গোরা আকুল হয়ে ডাকছে, 'হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি? দেখা দাও।' সেই করুণ বিলাপ শুনে বনের পশুপাখিরও চোখে জল। এমন সময় কে যেন এসে খবর দিল, কোলাহল শুনে যবনরাজা ক্রুদ্ধ। তিনি দলবল নিয়ে এদিকেই আসছেন। জীবনহানির আশঙ্কা দেখেও গোরার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ও নেচে নেচে হরি সংকীর্তন করেই যেতে লাগল।

আশ্চর্য, ক্রোধ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, গভীর নিশীথে আড়াল থেকে গোরার পায়ের কাছে এসে বসে পড়লেন যবনরাজা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কে আপনি মহাত্মন? আপনার আকুতি শুনে আমার মতো বিধর্মীরও প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আপনি এখানে এলেন কী করে?'

হাত ধরে তাঁকে তুলে, বুকে জড়িয়ে ধরল গোরা। তারপর বলল, 'আমরা গৌড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। গন্তব্য নবদ্বীপ। পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছি।'

যবনরাজা বললেন, 'চিন্তা করবেন না। আমার সৈন্যরা আপনাদের গৌড়ের পথে এগিয়ে দেবে।'

... অতীতের দৃশ্যগুলো চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। গোরা বুঝতে পারল এই সেই বটগাছ। যার নীচে বসে ওরা সেই রাতে নামসংকীর্তন করেছিল। এই সেই বটগাছ, যেখানে ও কমণ্ডলু ফেলে গিয়েছিল। পরে নীলাচলে ফিরে সে কথা একদিন বলেওছিল পঞ্চসখাকে। মন্দিরের মেঝে থেকে আস্তে আস্তে ও উঠে বসল। তারপর

গয়াধরকে বলল, 'শিগগির আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। আমার যে কমণ্ডলুটা তোমার বাড়িতে রাখা আছে, সেটা আমি দেখতে চাই।'

গয়াধরের বাড়ি মন্দিরের কাছেই। জায়গাটার নাম পাণ্ডুয়া। পাঁচিল ঘেরা বিশাল বাড়ি। গোরার ধারণাই ছিল না, গয়াধর এত ধনী পরিবারের ছেলে। বাড়িতে নিয়ে আসার আগে ও বলছিল, রাহামায় ওদের বড় পানের বরোজ আছে। প্রচুর লোক তাতে কাজ করে। তা ছাড়া সুপারি বাগানও আছে বেশ কয়েকটা। তবে ওদের আসল রোজগার পেঁপের চাষ করে। টুবাই এই অঞ্চলে একাধিকবার এসেছে। ও বলল, 'তোদের এই অঞ্চলটাতেই কোথাও ঠাকুর পরিবারের একটা বাড়ি আছে, না রে? কোথায় যেন পড়েছিলাম, সেই বাড়িতে বসেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা লিখেছিলেন।'

গয়াধর বলল, 'ঠিক শুনেছিস। আমরা তো তৈরি হচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের দেড়শোতম জন্মবার্ষিকীতে বিরাট একটা অনুষ্ঠান করব বলে। ফুল সাইজের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তিও আমরা বসাব চৌরাস্তার মোড়ে। তখন কিন্তু গোরাভাই আপনাকে ফের আসতে হবে।'

গয়াধরের বাড়িতেও ছোট একটা মন্দির রয়েছে। তাতে মহাপ্রভুর বিরাট একটা মূর্তি। নিচেই কাচের বাক্সের ভেতর সেই কমণ্ডলু। তার পাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। গয়াধরের বাবা দিবাকর মল্লিক বললেন, ওদের পঞ্চদশ পুরুষ আগে একজন মহাপ্রভুর ব্যবহার করা এই কমণ্ডলুটা বটগাছের তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে প্রদীপটাও ওরা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তবে বাড়ির মন্দিরটা অত পুরনো নয়। মাত্র দু'পুরুষ আগে এই মন্দিরটা ওরা তৈরি করেন। গোরার মনে পড়ল, পুরীর গম্ভীরাতেও মহাপ্রভুর একটা কমণ্ডলু, পাদুকা আর কাঁথা ও দেখেছে। ওখানেও একটা প্রদীপ জ্বলছে পাঁচশো বছর ধরে। গয়াধরদের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ছোটো একটা মূর্তিও রয়েছে। বিগ্রহকে প্রণাম করে গোরা নেমে এল।

সন্ধেবেলাটা ওর কেটে গেল দশরথ মোহান্তির সঙ্গে কথা বলতে। এই কাজটা করার জন্যই গোরার এতদূরে আসা। প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা বলে গোরা বুঝতে পারল, জগৎপুরে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ চালিয়ে দশরথদের এখন মনে হচ্ছে, এটা সমাধানের পথ নয়। মাওবাদীদের হাতে আন্দোলনের রাশ চলে যাওয়ায় অনেকেই অখুশি। তরুণ মাজিরা খুনখারাপির রাস্তায় হাঁটছে দেখে, দশরথদের দলের মধ্যেই এখন আওয়াজ উঠেছে, বাইরের লোকের কর্তৃত্ব ওরা আর সহ্য করবে না। দশরথ হাতজোড় করে বলল, 'আপনি আসায় আমাদের খুব উপকার হয়েছে। গয়াদা আর আমি লোককে বোঝাব। আপনি খালি চিফ মিনিস্টারকে বলুন, ঠিক দাম যেন জমির মালিকরা পায়। অন্তত একটা কমপেনসেশন প্যাকেজ যেন খুব শিগগির উনি অ্যানাউন্স করেন।'

শুনে গোরা বলল, 'ঠিক আছে, আপনাদের কথা আমি চিফ মিনিস্টারের কাছে পৌঁছে দেব।'

উঠে যাওয়ার আগে দশরথ একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর একটা কথা। আপনাকে একটু সাবধান করে যেতে চাই। কেওনঝড়গড় থেকে একদল মাওবাদীর আজ এখানে

আসার কথা আছে। ওরা ডেঞ্জারাস টাইপের। যত তাড়াতাড়ি পারেন, আপনারা এই অঞ্চল ছেড়ে পুরীতে চলে যান।'

টুবাই বলল, 'আমরা কিন্তু পুলিশ প্রোটেকশন নিয়েই এসেছি।'

দশরথ বলল, 'তবু অ্যালার্ট করে গেলাম। পুলিশকে বিশ্বাস নেই।' শুনে টুবাই চমকে তাকাল গোরার দিকে।

... ভোরে পুরীর দিকে রওনা হবে বলে একটু তাড়াতাড়িই গোরা শুয়ে পড়েছিল। গভীর রাতে খুট করে একটা আওয়াজ। গোরার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে ও দেখল, ওর বিছানার সামনে একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে উঠে বসতে দেখেই লোকটা বলল, 'গোরবাবু, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম আত্মানন্দ। পুরন্দর আমার বন্ধু। সে আমার সঙ্গেই এসেছে। নিচে গাড়িতে বসে আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। না হলে আপনার জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে।'

একাশি

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আত্মানন্দ বলল, 'গোরাভাই, এখন কোথায় যেতে চান?'

আসার সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে টুবাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে গোরা। প্রশ্নটা শুনে ও বলে উঠল, 'পুরীতে। কাল দুপুরে ওখানেই চিফ মিনিস্টারের আসার কথা। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।'

'আপনাদের যেমন ইচ্ছে।' খানিকটা এগিয়ে আত্মানন্দ ফের বলল, 'আমরা কিন্তু সোজা রাস্তায় যাব। কটক ঘুরে পুরীতে। তবে আশা করছি, ভোরবেলার মধ্যে আপনাদের পৌঁছে দিতে পারব।'

সন্ধেবেলায় দশরথ সাবধান করেছিল। তারপর এই আত্মানন্দের আবির্ভাব এবং ওর কথাবার্তা শুনে গোরা একটা অশনি সংকেত টের পাচ্ছিল। সত্যিই তো, দু'চারজন পুলিশ কনস্টেবলের উপর ভরসা রাখাটা ঠিক হবে না। বন দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলটায় মাওবাদীরা কতটা শক্তিশালী, সে সম্পর্কেও ওর কোনও ধারণা নেই। এমনিতেই, জগৎপুরে ওর আসাটা তরুণ মাজিরা পছন্দ করেনি। তার উপর যদি শোনে, দশরথ আন্দোলন তুলে নিতে বলেছে, তাহলে দুইয়ে দুইয়ে চার করে নেবে। খবরটা পুলিশ মন্ত্রী গোবিন্দ সাহুর কাছেও নিশ্চয় পৌঁছে গিয়েছে। তবুও গোরা ইতস্তত করছিল। কিন্তু আত্মানন্দ পুরন্দরদার কথা বলায় ও রাজি হয়ে গিয়েছিল, গয়াধরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে।

সকালবেলায় ওকে না দেখে গয়াধরের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, গাড়িতে বসে গোরা সেটাই ভাবছে। টিভির বেশ কয়েকজন রিপোর্টার এখনও ওখানে রয়েছে। সকালে তারা সব জানতে পারবে। ব্রেকিং নিউজে খবরটা ফলাও করে ওরা প্রচারও করতে পারে। 'পুরীর মহাপুরুষ উধাও। সন্দেহ মাওবাদীদের দিকে।' সেই খবর যদি ভুবনেশ্বরে মায়ের চোখে পড়ে, তাহলে তো মা হার্টফেল করবে। না, না, মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে

যাওয়া দরকার। মনে মনে গোরা হিসাব করে নিল। তারপর আত্মানন্দকে বলল, 'কটক থেকে আপনি ভুবনেশ্বরের রাস্তা ধরবেন। আমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাই। কয়েক মিনিট কথা বলেই আমরা পুরী রওনা হব।'

গাড়ি চালাচ্ছে আত্মানন্দ। ও বলল, 'ঠিক আছে।'

আত্মানন্দের পাশেই বসে আছে পুরন্দরদা। সত্যি বলতে কী, গোরা প্রথমে পুরন্দরদাকে চিনতে পারেনি। আগে কখনও পুরন্দরদাকে ন্যাড়া মাথায় দেখেনি। তার উপর পরনে প্যান্ট-শার্ট, একেবারে ভোল পালটে গিয়েছে। সেই যে পুরন্দরদা দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর থেকে ওর আর কোনও পাত্তাই নেই। গোরা বুঝতে পারছে না, আত্মানন্দ বলে লোকটার সঙ্গে পুরন্দরদার যোগাযোগ হল কী করে? আত্মানন্দ জানলই বা কী করে, ওর জীবনহানির আশঙ্কা আছে। আত্মানন্দ লোকটাই বা কে? ওকে কি পুরন্দরদাই ডেকে এনেছে? এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে গোরার মাথায় ভিড় করে এল। গাড়িতে ওঠার পর থেকে ও পুরন্দরদার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি। একটা আন্দাজ পাওয়ার জন্যই ও জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো পুরন্দরদা? অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। তুমি এখন আছো কোথায়?'

'ইউনিক টু-তে। আপনাদের বাড়িতে।'

'মা কেমন আছে?'

'ভালো। শুধু আপনার কথাই বলে। আজ দুপুরেই টিভিতে আপনাকে দেখে কান্নাকাটি করছিল। মায়ের ধারণা হয়েছে, আপনাকে আর সংসারজীবনে ধরে রাখা যাবে না।'

কথাগুলো শুনে গোরা চুপ করে গেল। মায়েরা আগে থেকে বোধহয় সব আন্দাজ করতে পারে। সত্যিই, ওর পক্ষে আর গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওর মনপ্রাণ জুড়ে ছিল দলিতরা। ওদের কল্যাণ সাধনেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে, এমনটাই ও ভেবেছিল। কিন্তু পর পর কয়েকটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে, ওর জীবনের চাওয়াটাই বদলে গিয়েছে। ভক্তিচর্চা করে ও এখন ভগবদ্দর্শন করতে চায়। রোজ পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার পর থেকে ওর জীবনে নতুন একটা তরঙ্গ এসেছে। সেই তরঙ্গ ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, গোরা জানে না।

গভীর রাতে নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে। লোকালয় আসছে, আবার পিছনে চলে যাচ্ছে। পাশে বসে টুবাই ঢুলতে শুরু করেছে। গোরার চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝেই ও শুনতে পাচ্ছে, আত্মানন্দর ফোনটা বেজে উঠছে। চাপা গলায় ও কী যেন বলছে। গোরা বুঝতে পারছে, কেউ বা কারা ওকে ফোনে খবর দিচ্ছে। কিন্তু এত রাতে...ওর জন্য কারা জেগে রয়েছে? আত্মানন্দ কি পুলিশের লোক? কিছুক্ষণ পর আবার একটা ফোন এল। দু'একটা কথা বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল আত্মানন্দ। তারপর ফিসফিস করে পুরন্দরদার সঙ্গে কী একটা কথা বলে, হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের অনেকটা ভিতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল আত্মানন্দ। ইঞ্জিন বন্ধ করেই ওরা দুজন ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করে নিল।

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

পুরন্দরদা চাপা গলায় বলল, 'আপনাকে যারা খুন করতে চায়, তারা এই রাস্তা ধরে জগৎপুরে যাচ্ছে। একটু পরেই ওদের গাড়িটা এখান দিয়ে যাবে।'

'কারা আমাকে খুন করতে চায়?'

আত্মানন্দ বলল, 'সে কথা আপনার শুনে কাজ নেই। তবে জেনে রাখুন, আমরা থাকতে আপনার চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

বোধহয় কাছাকাছি কোথাও জলাশয় আছে। জোনাকি পোকা দেখতে পাচ্ছিল গোরা। জঙ্গলের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। গাড়ির ভেতর চুপ করে বসে থাকার সময় ওর কানে তালা লেগে গেল। দূরে হাইওয়ের একাংশ দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁক দিয়ে। হাইওয়েতে বিজলি বাতি নেই। কিন্তু আকাশে চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। হালকা জ্যোৎস্নায় তাই রাস্তাটা পরিষ্কার দৃশ্যমান। ওই দিকেই তাকিয়েছিল গোরা। হঠাৎ লক্ষ করল, আত্মানন্দ আর পুরন্দরদা সামনের সিটে নেই। ওরা কখন যে গাড়ি থেকে নেমে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে, গোরা টেরও পায়নি। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে ও চমকে উঠল। আরে, পুরন্দরদা বন্দুক চালাতে জানে না কি? কই, ওকে দেখে তো কখনও তা মনে হয়নি।

মিনিট পাঁচেক পর একটা ছোটো জিপ হুস করে জগৎপুরের দিকে চলে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মানন্দ আর পুরন্দর ফের গাড়ির ভিতর উঠে এল। ড্রাইভারের সিটে বসেই আত্মানন্দ বলল, 'একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল গোরাভাই। আপনি কি কিছু দেখেছেন?'

গোরা বলল, 'দেখলাম। একটা গাড়ি চলে গেল।'

'আরে না না। আমি গাড়ির কথা বলছি না। হাইওয়ের ধারে বেশ কয়েকজন সাধু যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের আপনার চোখে পড়েনি? ওঁরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যাতে হাইওয়ে থেকে আমাদের গাড়িটা দেখা না যায়। আমার তো তাই মনে হল।'

গোরা অবাক হয়ে বলল, 'সাধু, কই না তো?'

'তাহলে আমি হয়তো ভুল দেখেছি।' বলেই গাড়িতে ফের স্টার্ট দিল আত্মানন্দ।

হাইওয়ে ধরে ওরা যখন কটকে পৌঁছল, তখন রাত সাড়ে চারটে। টুবাই হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝে যে গাড়ি জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছিল, বেচারি তা টেরও পায়নি। ওর দিকে তাকিয়ে গোরা একটু বিষণ্ণবোধ করল। পরিবার ছেড়ে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে টুবাই ওর সঙ্গে পড়ে রয়েছে। কীসের টানে কে জানে? গোরা ওকে অনেক বুঝিয়েছে, ভুবনেশ্বরে ফিরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু টুবাই রাজিই হচ্ছে না। বারবার বলছে, 'কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তুমি যদি সাংসারিক জীবনে ফিরে যাও, তাহলে আমিও ফিরে যাব।'

গোরা কিছুতেই বুঝতে পারে না, ওর সঙ্গে নিজের তুলনা করা কি উচিত হচ্ছে টুবাইয়ের?

গোরা তো ঠিকই করে ফেলেছিল, রাজনীতি করে জীবন কাটিয়ে দেবে। দলিতদের সঙ্গেই বাকি জীবনটা কাটাবে। টুবাইয়ের পরিস্থিতিটা তো সেরকম নয়। ওর মা ওর বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করেছিলেন। হয়তো পুরীতে পড়ে না থাকলে এতদিনে টুবাইয়ের

বিয়েটাও হয়ে যেত। ওকে কে বোঝাবে, সংসারে থেকেও ভক্তিচর্চা করা যায়। দিনে লক্ষবার হরিনাম করে লক্ষেশ্বর হওয়া যায়?

পুরন্দরদা আর আত্মানন্দ নিজেদের মধ্যে কী কথা বলছে। একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য চোখ বুজল গোরা। চোখে একটু ঘোর লেগে এল। আশ্চর্য, তখন নিজেকে ও আবিষ্কার করল রাধাকান্ত মঠে। গম্ভীরায় বসে ও তখন হরিনাম বিতরণের কথা ভাবছিল। আহ্লাদিত মুখে হঠাৎ সেখানে উদয় হল টুবাই। কাছে এসে বসতেই গোরা ওর হাত ধরে বলল, 'অনেকদিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম নিত্যানন্দ। তুমি যত শিগগির পারো, গৌড়ে চলে যাও। গিয়ে জীবসকলকে উদ্ধার করো।'

টুবাই বলল, 'ওটা আমার দ্বারা হবে না।'

গোরা অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকো, তাহলে আর জীবন উদ্ধার হয় না।'

টুবাই বলল, 'তোমার জীবন, তুমি উদ্ধার করো। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

টুবাইকে জেদ করতে দেখে গোরা মন খারাপ করে বসে রইল। অদ্বৈত আচার্যের উপর ও একটা দায়িত্ব দিয়েছে। আচণ্ডাল কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের। সেই কাজটা উনি যথাসাধ্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকার্যের জন্য একজনকে দরকার। সেটা সম্ভব হতে পারে নিত্যানন্দকে দিয়ে। সেটা ভেবে নীরবে অশ্রুমোচন করতে লাগল গোরা। দেখে টুবাই মত পালটে বলল, 'প্রভু, তোমার কী আজ্ঞা বলো, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

গোরা বলল, 'শ্রীপাদ, আমার মনে এই সাধ ছিল যে, আমি হরিনাম বিতরণ করব। কিন্তু নাম বিতরণ করতে গিয়ে নামের শক্তিতে আমার বুকের ভেতর একটা তরঙ্গ উঠেছে। তাই আমি আর আমার মধ্যে নেই। আমি এখন ভেসে চলেছি।'

শুনে টুবাইও কাঁদতে শুরু করল। গোরার গলা জড়িয়ে ধরে ও বলল, 'প্রভু, তুমি প্রাণ, আমি দেহ। গৌড়ে চলে গেলে তোমার বিরহ আমাকে সহ্য করতে হবে। তবুও তোমার আজ্ঞা আমি পালন করব।'

গোরা বলল, 'গৌড় বড়ো কঠিন জায়গা। পড়ুয়া পণ্ডিতদের ভিড়। ওখানে ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষের খুব প্রয়োজন। না হলে কৃতকার্য হওয়া যাবে না।'

'আপনি চিন্তা করবেন না প্রভু।'

'শোনো শ্রীপাদ, তোমাকে ছাড়া আমার মনের কথা আমি আর কাকেই বা বলব। গৌড়ের মানুষকে তুমি ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। তুমি উদাসীন ব্রত নিয়ে বসে থাকলে ওখানে মানুষ হাহাকার করবে। কাজেই তুমি কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ে চলে যাও। মূর্খ-নীচ, পণ্ডিত-পড়ুয়া, দুর্মতি-পাপী, সবাই যেন হরিনাম করে সুখী হতে পারে। যাকেই তুমি সামনে পাবে, তাকেই উদ্ধার করবে।'

'আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়?'

'তা হোক। যে যতই পাপী হোক, তাকে তুমি কৃপা করবে।'

'প্রভু, আমি পুতুল, তুমি সূত্রধর। যেমন নাচাবে, তেমনই নাচব। আমি গৌড়ে চললাম।'

'তুমি আমায় কৃতার্থ করলে নিত্যানন্দ। আর একটা কথা, গৌড় থেকে তুমি কিন্তু যখন-তখন এখানে আসবে না। কারণ, তুমি এলে অনেকটা সময় বিফলে যাবে।'

...গাড়ি কোনও কারণে ব্রেক কষেছে। ঝটকা ঘোর কেটে গেল গোরার। ও দেখল, টুবাইও সোজা হয়ে বসেছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হল আত্মানন্দ?'

'শ্বেতসর্প। রাস্তা পার হচ্ছিল। ভাগ্যিস, হেডলাইটের আলোয় আগে দেখতে পেয়েছিলাম।' সামনে থেকে উত্তর দিল আত্মানন্দ।

টুবাই হাই তুলে বলল, 'যাত্রাকালে শ্বেতসর্প দর্শন শুভ। রাস্তায় আর কোনও বিপত্তির চান্স নেই। কোথায় এলাম ভাই?'

আত্মানন্দ বলল, 'ফুলনাকরা। আর মাত্র মিনিট দশেক। তারপরই ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাব। একটা নিবেদন আছে গোরাভাই। আপনাদের নামিয়ে দিয়েই আমাকে এখুনি দৌড়তে হবে পুরীর দিকে। জরুরি কাজে।'

'এত সংকোচ করতে হবে না। পরে আমরা চলে যেতে পারব। পুরীতে তুমি কোথায় থাকো আত্মানন্দ?'

'পুরন্দর সব জানে। ওকে রেখে যাচ্ছি। ওর কাছে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নেবেন।'

দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। ড্যাশ বোর্ডে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ছাট দেখে গোরা বাইরের দিকে তাকাল। এতক্ষণ গাড়ির ভিতরে বসেছিল বলে, ওরা কেউ বুঝতে পারেনি, আকাশে মেঘ জমেছে। ফাল্গুন মাসের এই সময়টায় বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উষ্ণায়নের জন্য আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গোরা মনে মনে প্রার্থনা করল, বাড়ি ঢোকার আগে যেন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু না হয়। সাড়ে পাঁচটার আগে বাড়ির সদর দরজা খোলা পাওয়া যাবে না। ওদের বাইরে দাঁড়িয়েই তাহলে ভিজতে হবে।

ভুবনেশ্বর শহরটা হাতের তালুর মতো ওদের চেনা। দোকানপাট এখন বন্ধ। তা সত্ত্বেও, গোরা বুঝতে পারল, ওরা ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। এই আবাসনেই থাকে নবেন্দুরা। জয়দেবের সঙ্গে ওদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গোরা এসেওছে। উপাসনার হাতে মিষ্টি শরবত খেয়ে গিয়েছে। উপাসনার কথা মনে হতেই জয়দেবের চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওদের বিয়ের সময় কলকাতায় যেতেই হবে। জয়দেবকে ও কথা দিয়েছে। কিন্তু তারপর যেসব ঘটনা পুরীতে ঘটে গিয়েছে, তা তো আর জয়দেব জানে না। এই পরিস্থিতি থেকে ও কবে বেরিয়ে আসতে পারবে, গোরা তা নিজেও বুঝতে পারছে না। ইউনিক টু-তে ওদের বাড়ির সামনে আত্মানন্দ তিনজনকে নামিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেল। দূর থেকেই গোরা দেখল, বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। অনেকদিন পর বাড়িতে ফিরে ওর মনটা আনন্দে ভরে উঠল। পুরন্দরদা আর টুবাইকে ও বলল, 'এই, তোমরা একটু পরে ঢুকো। আমি একা গিয়ে মাকে চমকে দিতে চাই।'

পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মায়ের ঘরের কাছে যেতেই গোরা অপরিচিত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মাকে কেউ ধমকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে এই মানুষটা?। উঁকি মেরে ঘরের ভিতর তাকাতেই গোরা দেখল, জটাধারী এক সাধু মায়ের ঘরের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাগী গলায় উনি বলছেন, 'তোকে আমি কি বলে গিয়েছিলাম, মনে নেই? ছেলের যেদিন ঠিক চব্বিশ বছর পূর্ণ হবে, সেদিন আমি ফিরে আসব। ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার দিন ওকে আমাদের কাছে নিয়ে যাব। বারো বছর আগে আমি আরও একবার এসেছিলাম। তোকে মনে করিয়ে দিতে। আর আজ বলছিস, ছেলেকে ফিরিয়ে দিবি না। মহাপাপী হবি তুই। নরকেও যে তোর ঠাঁই হবে না রে, বিশাখা।'

মা কাঁদতে কাঁদতে সাধুর পা জড়িয়ে ধরেছে। বলল, 'আমাকে এই শাস্তি দেবেন না বাবা। ছেলেকে ছাড়া আমি যে বাঁচবই না। বুকের দুধ খাইয়ে ওকে বড়ো করেছি। তিলে তিলে মানুষ করেছি...'

'থাম।' গর্জে উঠে সাধুবাবা বললেন, 'সেই দিনটার কথা তোর মনে নেই? সম্বলপুরের মন্দিরে গোপনে তোর হাতে ওই ছেলেকে আমি তুলে দিয়ে এলাম। ওঁর জন্মবৃত্তান্তও তোকে বলেছিলাম। ওঁর বাবার নাম বিষ্ণুশর্মা আর মায়ের নাম সুমতি। এও বলেছিলাম, মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মেছে এই ছেলে। এই ছেলেই মহাপ্রভু। পাঁচশো বছর পর, আবার জন্ম নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন পূর্ণ অবতার হয়ে। ওঁর পরিচয় তুই গোপন রাখিস। জানাজানি হলে শত্রুরা ওঁকে মেরে ফেলবে। সারা পৃথিবীতে ওঁর পরিচয় জানেন, আর মাত্র চৌষট্টি জন। তখনই তোকে বলেছিলাম, ওঁর যখন চব্বিশ বছর বয়স হবে, তখন ওঁকে আমরাই প্রকাশ্যে নিয়ে আসব। সেই দিনটা এসে গিয়েছে। পূর্ণিমার দিন গভীর রাতে, আমরা চৌষট্টি জন একসঙ্গে আসব। ছেলেকে নিয়ে যাব কেওনঝড়গড়ে গোপন মন্দিরে।'

সাধুবাবার পায়ে মা মাথা ঠুকছে। অনুনয় করছে, 'দয়া করুন বাবা। আমাকে দয়া করুন। আমার কোল খালি করবেন না।'

'কেন, তোর গর্ভের সন্তান তো তোর কাছেই ফিরে এসেছে। আর একটু পরেই ওরা দুজন তোর কাছে আসবে। তোর নিজের ছেলেকে অনেক অবহেলা করেছিস। এখন আঁকড়ে ধর। আর ক'দিনই বা সময় পাবি। আমি চললাম।' বলেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন সেই জটাধারী সাধু।

শুনতে শুনতে গোরা থাম ধরে নিজেকে সামলাল। সাধুবাবা এ কী বললেন? এতদিন ও যাঁকে মা বলে জেনে এসেছে, সেই বিশাখা মাহেরির ছেলে ও নয়! সাধুবাবা বললেন, তোর গর্ভের সন্তান তো তোর কাছেই ফিরে এসেছে। তার মানে, পুরন্দরদা মায়ের নিজের সন্তান? ক'দিনই বা সময় পাবি, এর মানেটাই বা কী? সত্যি কথাটা জানার জন্য গোরা মায়ের ঘরের চৌকাঠে পা দিল।

বিরাশি

প্রায় আড়াই মাস পর জয়দেব ভুবনেশ্বর স্টেশনে পা দিল। আসলে ভুবনেশ্বর আসার জন্য ও ট্রেনে ওঠেনি। ওর গন্তব্য ছিল পুরী। কিন্তু ট্রেন ভুবনেশ্বর স্টেশনে পৌঁছনোর পর ওর বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠেছিল। এই শহরটায় উপাসনার স্মৃতি এতটাই জড়িয়ে যে, কামরায় ও আর বসে থাকতে পারেনি। দু'দিন পর পুরীতে পৌঁছলেও ওর কোনও ক্ষতি নেই। কোনওদিন না গেলেও কিছু আসে যায় না। বাকি জীবনটা নিয়ে ও কী করবে, জয়দেব এখনও ঠিক করতে পারেনি। পরশু রাতে বেহালার বাড়িতে অনেক রাত অবধি জেগেছিল। হঠাৎই ওর অবধূতজির কথা মনে পড়েছিল। তখনই ও সিদ্ধান্ত নেয়, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটাবে। কাল রাতে টিকিট কেটে ও ট্রেনে উঠে পড়েছে।

উপাসনার মৃত্যুটা ওর মন ভেঙেচুরে, একেবারে দুমড়ে দিয়েছে। কোথাও গিয়ে জয়দেব শান্তি পাচ্ছে না। সবসময় ওর উপাসনার কথা মনে পড়ছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে, খুঁজে খুঁজে ও সেই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসল, যেখানে আগের বার বসেছিল উপাসনার সঙ্গে। কে একজন মার্ডার হওয়ার জন্য ওদের কামরার সবাইকে খানিকক্ষণের জন্য এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। স্বাতী, নবেন্দু আর গোরাও সঙ্গে ছিল সেদিন। স্বাতীদের সঙ্গে উপাসনা চলে গিয়েছিল ভীম ট্যাঙ্কি আবাসনে। আর ও গিয়ে উঠেছিল একটা হোটেলে। লোকাল ট্রেন ধরে পুরীতে না গিয়ে ও যে কেন ভুবনেশ্বরে থেকে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও জয়দেব মনে করতে পারল না। বোধহয় উপাসনার টানেই ও থেকে গিয়েছিল।

সকাল ছ'টা বাজে। প্ল্যাটফর্মে অতটা ভিড় নেই। হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। তবুও উঠে শেড-এর তলায় যাওয়ার ইচ্ছে হল না জয়দেবের। ওর মনে পড়ল, উপাসনা একবার বলেছিল, বৃষ্টিতে ভিজতে ওর খুব ভালো লাগে। ছোটোবেলায় নবদ্বীপে না কি বছরের প্রথম বৃষ্টির দিন ও আর ওর বোন সুরো দোতলার ছাদে উঠে বৃষ্টির জলে খুব ভিজত। শুনে জয়দেব বলেছিল, বিয়ের পর বেহালায় ওদের বাড়ির উঠোনে ওরা দুজন একসঙ্গে ভিজবে। কল্পনায় ও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল, 'তখন আমাদের পরনে কিছু থাকবে না।' শুনে ওর হাতে চিমটি কেটে উপাসনা বলেছিল, 'সবসময় এক চিন্তা, তাই না? দেখব, আসল সময়ে তুমি কতটা পারো।'

এইরকম টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি নিয়েই জয়দেবের দিন কাটে। পুরীর সমুদ্র সৈকতে দিনের পর দিন বসে গল্প করা। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা। সুরোর ফোনটা যে ওর সুখস্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেবে, জয়দেব ভাবতেও পারেনি। ওই ফোনটা পাওয়ার পর বাড়িতে যখন ও দুঃসংবাদটা দেয়, মা তখন কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল। 'কী বলছিস রে তুই খোকা? কে এই সর্বনাশটা করল? অমন শান্ত প্রকৃতির একটা মেয়ে, ওর সঙ্গে কার শত্রুতা ছিল?'

জয়দেব উত্তর দিতে পারেনি। ওর মাথায় একবার পদ্মনাভ পান্ডার কথা এসেছিল। উপাসনার উপর পদ্মনাভ পান্ডার রাগ থাকা স্বাভাবিক। মুখের গ্রাস হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেই কথা ও ভুলবে কী করে? তাই বলে নবদ্বীপে এসে ওর লোক উপাসনাকে খুন করে যাবে, সেটা বিশ্বাস করতে জয়দেবের মন চাইছিল না। পরে নবদ্বীপে ফোন করে দিদি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল উপাসনার বাবার সঙ্গে। পরদিন মা, দিদি, জামাইবাবু...সবাই ওকে বলেছিল একবার নবদ্বীপে যেতে। কিন্তু জয়দেব যায়নি। একে উপাসনার পরিবারের কাউকে ও চেনে না, তার উপর ওদের মুখোমুখি হতে ও ভয় পেয়েছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী, উপাসনা না কি গর্ভবতী ছিল।

'আরে, জয়দেব না?' চেনা গলা শুনে জয়দেব চমকে তাকাল। নবেন্দু, ওর সামনে দাঁড়িয়ে। বলল, 'তুমি এখানে? কখন এলে?'

বেঞ্চ ছেড়ে জয়দেব উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এই একটু আগে।'

'তোমাকে তো প্রথমে চিনতেই পারছিলাম না। এ কী চেহারা হয়েছে তোমার। একগাদা দাড়ি, গোঁফ।'

মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল জয়দেবের। ও পালটা প্রশ্ন করল, 'কোথাও যাচ্ছ বুঝি? স্বাতী আর বাচ্চা কেমন আছে?'

'ভালো। অফিসের কাজে কলকাতায় যাব বলে বেরিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে সেই ইচ্ছেটা চলে গেল। চলো, আমাদের বাড়িতে চলো। স্বাতীকে আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি।'

জয়দেব বলল, 'থাক ভাই। আজ নয়। পুরীতে যাচ্ছিলাম। কেন যে এখানে নেমে পড়লাম, নিজেও জানি না। পুরী থেকে অন্য কোনওদিন তোমার এখানে ঘুরে যাব।'

নবেন্দু বলল, 'তা হয় না কি? ভুবনেশ্বরে এসে, আমার ওখানে না গিয়ে তুমি পুরী চলে গেছ, শুনলে স্বাতী আমাকে খেয়ে ফেলবে। তোমার কোনও কথা শুনব না ভাই। আমার সঙ্গে চলো।'

পাশে রাখা কিট ব্যাগটা হাতে তুলে নিল নবেন্দু। তারপর জোর করে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কোনওরকমে একটা অটো রিকশা ধরে, স্বাতীকে ফোন করে দিল নবেন্দু। তারপর বলল, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি ভাই। নবদ্বীপে ফোন করে, উপাসনার অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে তো আমরা শকড। দিন দুয়েক স্বাতীকে সামলাতেই পারিনি। ও এমন কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু এমন দুর্ঘটনা তো সবার জীবনেই ঘটে। সেটা তোমায় মেনে নিতে হবে।'

শুনে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল জয়দেবের। নিজেকে সামলানোর জন্য, ও বাইরের দিকে তাকাল। কলকাতায় সমবয়সি এমন কোনও বন্ধু ওর নেই, যে উপাসনার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা জানে। নবেন্দু আর স্বাতীই শুধু জানত। এই দুজন মনেপ্রাণে চেয়েছিল, ওদের ভালোবাসা পূর্ণতা পাক। বিয়ের ডেট ঠিক হয়ে যাওয়ার পর জয়দেব যেদিন ফোন করে স্বাতীকে জানায়, সেদিন ও বলেছিল, 'যাব না মানে? আমরা তো

কবজি ডুবিয়ে খাব। আর একটা কথা, আমার প্রথম ঘটকালি। প্রাপ্যটা যেন পাই মশাই। বন্ধুর কাছ থেকে তো আর আদায় করা যাবে না। আপনি কিন্তু ফাঁকি দেবেন না।'

জয়দেব হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ঠিক আছে।' ও ভেবেই রেখেছিল, স্বাতীকে একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি দেবে। সত্যিই তো, স্বাতী মাঝে না থাকলে উপাসনার সঙ্গে ওর প্রেম হত? কখনো না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যে স্বাতীর বাড়ি যেতে হবে, জয়দেব সেটাও স্বপ্নেও ভাবেনি। অটো রিকশাটা লিঙ্গরাজ মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেয়ে ফের জয়দেবের চোখে জল এসে গেল। এই মন্দিরের ভিতরই উপাসনার হাত ধরে যেদিন ও বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ দেখা হয়েছিল শ্রীবৎসের সঙ্গে। উপাসনার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। নবদ্বীপে ফিরে শ্রীবৎস দুর্নাম রটাবে, ওর চরিত্রে কালি ছিটিয়ে দেবে, এই আশঙ্কায়।

দরজা খুলে ওকে দেখেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল স্বাতী। 'জয়দেবদা, এ কী হল? আপনাদের বিয়ের কথা শুনে, আমি আর নবেন্দু গিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে এলাম। এই তার পরিণাম।'

কিট ব্যাগটা মেঝেয় রেখেই নবেন্দু ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্বাতীকে নিয়ে। ওর মাথাটা বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি শান্ত হও প্লিজ। তুমি কান্নাকাটি করলে জয়দেব যে ভেঙে পড়বে। ওকে দেখে বুঝতে পারছ না, কী কষ্টের মধ্যে রয়েছে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটা সময় স্বাতী উঠে বাথরুমের দিকে গেল। সেই ফাঁকে নবেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'নবদ্বীপে একটা কথা রটেছে, উপাসনাকে না কি মার্ডার করা হয়েছে। সেটা কি সত্যি?'

শুনে জয়দেব সতর্ক হয়ে গেল। নবদ্বীপে পুলিশ কতটুকু ইনভেস্টিগেশন করেছে, ওর কোনও ধারণা নেই।

ও তাই বলল, 'তোমরা কার কাছ থেকে শুনেছ?'

'স্বাতী শুনেছে, ওর বাড়ির লোকেদের মুখ থেকে।'

'ঠিকই শুনেছ।' জয়দেব বলতে শুরু করল। উপাসনার কিডন্যাপড হওয়া, ওর উদ্ধার পর্ব, পদ্মনাভদের অর্গানাইজেশন, পুরন্দরদা, আর আত্মানন্দের কথা ধীরে ধীরে সবই নবেন্দুকে ও বলল। কোনওকিছুই লুকোল না। সবশেষে বলল, 'শেষবার উপাকে নিয়ে যেদিন তোমাদের এখানে এলাম, সেদিন আমরা খুব টেনশনে ছিলাম। ভেবেছিলাম, কলকাতায় চলে গেলে পদ্মনাভর লোকেরা আর আমাদের ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আমরা বোধহয় ভুল ভেবেছিলাম। পদ্মনাভ পান্ডাদের অর্গানাইজেশনটা অনেক স্ট্রং। যত দিন যাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, এটা ওদেরই কাজ। তাই যদি হয়, তাহলে এবার ওরা আমাকে টার্গেট করবে। ওদের মোকাবিলা করার জন্য আমি পুরীতে যাচ্ছি।'

'নবদ্বীপের পুলিশকে তোমার সব খুলে বলা উচিত ছিল জয়দেব।'

'পুলিশকে বলে কোনও লাভ হত না। পুরীতে আমি যাচ্ছি, পুরন্দরদাকে খুঁজে বের করার জন্য। আমার মনে হয়, পারলে ওরাই শাস্তি দিতে পারবে পদ্মনাভ পান্ডাদের।'

'পুরন্দরবাবুর কোনও কনটাক্ট নাম্বার কি তোমার কাছে আছে?'

'না নেই। তবে আত্মানন্দ আমাকে ওর একটা ফোন নাম্বার দিয়েছিল। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কলকাতা থেকে। ওকে পাইনি। যতবারই করেছি, উত্তর পেয়েছি 'নট রিচেবল'। দেখি, এখান থেকে ওকে পাই কি না। আর না পেলে ওর আশ্রমে চলে যাব। ওদের আশ্রমটা আমি চিনি, চক্রতীর্থ আরও একটু এগিয়ে।'

'তোমার কি একা পুরীতে যাওয়া ঠিক হবে জয়দেব?'

'কী আর হবে? বড়ো জোর প্রাণটা যাবে। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই নবেন্দু।'

'কিন্তু তোমার মা? তাঁর কী হবে? তোমার পাবলিকেশন, কে দেখবে?'

'মাকে দেখার জন্য দিদি আছে। আর ব্যবসার ভার সুস্মিতা বলে একজনকে আমি দিয়ে এসেছি। ওর সঙ্গে আমার ভাগ্নেও থাকবে। ওরা ব্যবসাটা রাখতে পারলে, রাখবে। না হলে বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে দেবে মাকে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

'মাকে কি সেটা বলে এসেছ?'

'কলকাতায় আমি আর থাকতে পারব না নবেন্দু। আমি পাগল হয়ে যাব তাহলে। আপাতত অবধূতজির কাছে যাচ্ছি। দেখি, মনটাকে শান্ত করতে পারি কি না। তারপর ডিসিশন নেব। তুমি আমাকে আটকে রেখো না নবেন্দু। বৃষ্টি ধরলে আমি আজই চলে যাব।'

'ঠিক আছে। আজই চলে যেয়ো। তবে তার আগে স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নাও। আমার গাড়ি তোমাকে পুরী পৌঁছে দেবে। ট্রেন বা বাসে যাওয়ার দরকার নেই।'

...স্নান সেরে ড্রয়িংরুমে এসে জয়দেব দেখল, নবেন্দু মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছে। ওকে দেখেই নবেন্দু বলল, 'ব্রেকিং নিউজটা দেখো জয়দেব। গোরাবাবুর খবর দেখাচ্ছে। ওকে না কি পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভুবনেশ্বরে এসে গোরার কথা একবারও মনে পড়েনি জয়দেবের। পর্দায় গোরাকে দেখে অবধূতজির চিঠির কথা ওর মনে পড়ল। অবধূতজির মতো পণ্ডিত ও বিচক্ষণ মানুষ, গোরাকে মহাপুরুষ বলে মেনে নিয়েছেন। নিশ্চয় গোরার মধ্যে তিনি কিছু দেখেছেন। সোফায় বসে ও টিভির পর্দার দিকে চোখ রাখল। ওড়িয়া চ্যানেলে গোরাকে নিয়ে অদ্ভুত একটা খবর দেখাচ্ছে গোরা জগৎপুরে গিয়েছিল প্রাচীন একটা মন্দিরের উদ্বোধন করতে। কাল রাতে সেখান থেকে না কি দেবতারা ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন। একজন আই উইটনেসের ইন্টারভিউ দেখাচ্ছে পর্দায়।

সে বলছে, 'কাল রাতের কথা ভেবে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। নিজের চোখে দেখেছি, মাঝরাতে আকাশ থেকে সাদা একটা রথ নেমে এল। ঠিক মল্লিক বাড়ির পিছনদিককার ফটকের সামনে। রথের ভিতরে দুজন দেবতা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের একজনের মাথা ন্যাড়া। এক দেবতা এক লাফ মেরে সোজা উঠে এলেন দোতলায়। আর ন্যাড়া মাথা দেবতা, তিনি রথেই বসে রইলেন।'

বুম হাতে এক রিপোর্টার জিজ্ঞেস করল, 'অত রাতে তুমি ওখানে তখন কী করছিলেন?'

'আমি কটক জেলার লোক। আমার মেয়ে খুব অসুস্থ। ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন। আমি পাণ্ডুয়ায় এসেছিলাম বাচ্চা মেয়েটার জন্য। মহাপ্রভুর চরণামৃত নিয়ে যেতে। কাল ওকে দেখার সুযোগ পাইনি। তাই গাছতলাতেই শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আজ সকালবেলায় দর্শন পাব। কিন্তু আমার কপাল এত ভালো, যে কাল রাতেই মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে গেলাম। আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল।'

'তুমি কি ঠিক দেখেছ, যাঁরা ওকে তুলে নিয়ে গেলেন, তাঁরা দেবতা?'

'বিশ্বাস করুন, তাঁরা দেবতাই। ওদের গা দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছিল। গাছের আড়াল থেকে আমি দেখলাম, বাড়ি থেকে তিনজন বেরিয়ে এলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দও ছিলেন। বাইরে এসে মহাপ্রভু কথা বলতে লাগলেন ন্যাড়ামাথা দেবতার সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে ওরা রথে উঠে পড়লেন।'

'দেবতারা যখন মহাপ্রভুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তুমি চিৎকার করলে না কেন?'

'মাথা খারাপ। চিৎকার করব কেন? ওরা আমায় দেখতে পেলে, আমি যে অন্ধ হয়ে যেতাম।'

টিভিতে এবার একটা প্যাকেজ দেখাচ্ছে। জগৎপুরে মহাপুরুষ। শোভাযাত্রা করে গোরাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘোড়ায় টানা রথে করে। শোভাযাত্রায় প্রচুর লোক নামসংকীর্তন করতে করতে এগোচ্ছেন। পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে নবেন্দু বলল, 'মানুষ কত ধর্মান্ধ হয়ে গিয়েছে, জয়দেব বুঝতে পারছ? কটকের লোকটা যা বলল, তোমার কি মনে হচ্ছে, তা সত্যি?'

জয়দেব বলল, 'আমার তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আজকাল টিভি দেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সব সাজানো খবর। আমার মনে হয়, কটকের এই লোকটা টিভিরই কেউ হতে পারে। তাকে দিয়ে হয়তো টিআরপি বাড়াচ্ছে।'

'হয়তো তাই। কিন্তু ওই বাড়ি থেকে গোরাবাবু নিখোঁজ হলেন কী করে? এই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। যদি ধরে নিই, উনি নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছেন, তাহলে গৃহকর্তাকে বলে যাবেন না কেন? গোরাবাবু কিডন্যাপড হননি তো? তুমি কি একবার ফোন করবে গোরাবাবুকে?'

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করতে যাচ্ছিল জয়দেব। এমন সময় খাবারের প্লেট নিয়ে হাজির হল স্বাতী। নবেন্দুর শেষ কথাটা হয়তো শুনতে পেয়েছিল। ভাঙা গলায় ও বলল, 'এখন ফোন টোন করতে হবে না। আগে খেয়ে নাও। জয়দার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আজকাল খাওয়া-দাওয়ার কথা জয়দেবের মনে থাকে না। সকাল থেকে কিছুই পড়েনি ওর পেটে। খেতে বসে জয়দেব মারাত্মক খিদে অনুভব করল। চুপচাপ ও খেতে লাগল। শেষবার স্বাতীর বাড়িতে ও আর নবেন্দু যখন লাঞ্চ করতে বসেছিল, তখন সার্ভ করেছিল উপাসনা। আজ ও নেই। ভাবতেই চোখের কোণ ভিজে উঠল জয়দেবের। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছেটাই ওর চলে গেল।

ওকে দেখে নবেন্দু বলল, 'খাচ্ছ না কেন ভাই? খেয়ে নাও, আর ক'দিনই বা খাওয়ার সুযোগ পাবে?'

জয়দেব ওর ঠাট্টা বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই নবেন্দু বলল, 'আরে গত পরশু অফিসের কাজে কেওনঝড়গড়ে গেছিলাম। ওখানে শুনলাম, কোন এক জ্যোতিষী না কি বলেছেন, খুব শিগগিরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ওখানে তো নানা জায়গায় রীতিমতো যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। মণ মণ ঘি পুড়ছে সেই যজ্ঞে। ওখানেই শুনলাম, কলিযুগ শেষ হয়ে আসছে। পৃথিবীতে এবার মহাপ্রলয় হবে। কথাগুলো সবাই বিশ্বাস করেও নিয়েছে। জানো, ওই রিজিওনে আমাদের ব্যবসা শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। যার কাছেই যাই, সে বলে, দাঁড়ান মশাই, প্রাণে বাঁচি। কী হাস্যকর, তাই না?'

জয়দেব বলল, 'ট্রেনে আসার সময় একটা ইভনিং ডেইলিতে পড়ছিলাম, রাজস্থান, গুজরাত, ইউপি-তেও না কি যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

নবেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, ওরা এসব ব্যাপারে আমাদের থেকে এক কদম এগিয়ে।'

জয়দেব উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় টের পেল বাঁ পকেটে মোবাইল ফোনটা বাজছে। দিদি ছাড়া আর কে হবে? বাঁ হাত দিয়ে সেটটা তুলে এনে ও দেখল, না দিদি নয়। অচেনা একটা নাম্বার। একটু অবাক হয়েই ও সুইচ অন করল। ও প্রান্তে আত্মানন্দের গলা, 'কাল কি আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন জয়দেববাবু? আমার ফোনে মিসড কল দেখলাম।'

জয়দেব বলল, 'হ্যাঁ, করেছিলাম। আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার ছিল।'

'আপনাকেও আমার দরকার। মনে আছে, জামিল ফেরদৌসের আঁকা একটা ছবির কথা, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? তার সন্ধান পেয়েছি। আজ রাতেই পুরীতে আমার আশ্রমে চলে আসুন। ছবি উদ্ধারে আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। বলেই লাইন কেটে দিল আত্মানন্দ।

তিরাশি

মা ঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। মায়ের মাথাটা কোলে তুলে নিল গোরা। পাথর হয়ে বসে রইল। জটাধারী সাধুর কথাগুলোই ওর মনে পাক খাচ্ছে। অর্ধেক কথা ও বুঝতেই পারেনি। সাধু বললেন, 'এই ছেলেই মহাপ্রভু। পাঁচশো বছর পর, আবার জন্ম নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন পূর্ণ অবতার হয়ে। ওঁর পরিচয় তোকে গোপন রাখতে বলেছিলাম।...সারা পৃথিবীতে ওঁর পরিচয় জানেন, আর মাত্র চৌষট্টি জন।...ওঁর যখন চব্বিশ বছর বয়স হবে, তখন ওঁকে আমরাই প্রকাশ্যে নিয়ে আসব।' এসব কথার মানেটা কী? টুবাই একবার বলেছিল বটে, 'মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে তোর জীবনের অনেক মিল আছে। তোর মধ্যেই হয়তো উনি ফিরে এসেছেন।' গোরা তখন টুবাইয়ের

কথায় অতটা গুরুত্ব দেয়নি। আজ জটাধারী সাধুর মুখে যা শুনল, তা ও উড়িয়ে দিতে পারছে না।

এই চৌষট্টি জন সাধু কারা? কোথায় রয়েছেন তাঁরা? এই দুটো প্রশ্ন গোরাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। বরাবর ও দেখেছে, সাধুসন্তরা ওর সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেন। কোথাও মুখোমুখি হলে, ওর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কলকাতায় থাকার সময় মুকুন্দ একবার বলেছিল, ও যখন ঘুমোয়, তখন না কি দুজন সাধু মাথার কাছে বসে ওকে পাহারা দেন। পরে রাসবিহারীবাবুর মুখে ও শুনেছিল, একদিন রাতে পুলিশ যখন ওকে অ্যারেস্ট করতে আসে, তখন প্রচুর জটাধারী সাধু না কি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। ওর ফ্ল্যাটে পুলিশকে ঢুকতে দেয়নি। এই তো কিছুদিন আগে, এই ভুবনেশ্বরেই, ভোই স্টোর্স থেকে ফেরার পথে এক বামন সাধু ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিন রেড্ডি কাকা সামনে এসে না দাঁড়ালে গোরা খুব মুশকিলে পড়ে যেত।

কোনওকিছু গভীরভাবে চিন্তা করলেই গোরার মাথা টিপটিপ করে। পাছে অতীতে ফিরে যায়, এই ভয়ে ও আগে মায়ের দেহটা তুলে, বিছানায় শুইয়ে দিল। জানলার দিকে তাকিয়ে ও দেখল, বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দূরে মাঝে মাঝে কোথাও বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এতক্ষণে টুবাই আর পুরন্দরদার বাড়িতে ঢুকে আসার কথা। হয়তো বৃষ্টির কারণে এখনও ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোই স্টোর্সের সিঁড়িতে। বাড়িতে কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। নিস্তব্ধ ঘরে পায়ের দিকে বসে গোরা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখনও ও বিশ্বাস করতে পারছে না, বিশাখা মাহেরি ওর মা নয়। হঠাৎ তখনই ওর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, ওর আসল মা কে? কার গর্ভে ওর জন্ম হয়েছে?

তাহলে আমিই বা কে? জিজ্ঞাসাটা মনে আসতেই ওর চোখের সামনে থেকে দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গোরা দেখল, প্রাচীন এক বটবৃক্ষের নিচে এক বেদিতে ও বসে আছে। ওর সামনে হাতজোড় করে বসে আছে শ্রীরূপ গোস্বামী। বেদির নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুরধনী গঙ্গা। দেখেই গোরা বুঝতে পারল, জায়গাটা প্রয়াগ। শ্রীরূপ গোস্বামীকে নিয়ে ও যেখানে বসে, সেটা দশাশ্বমেধ ঘাট। শ্রীরূপকে ও কৃষ্ণতত্ত্ব, ভগবদ্‌ভজন তত্ত্ব এবং সম্বন্ধ তত্ত্ব বোঝাচ্ছে।

'এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীব রয়েছে। তাদের কর্ম অনুযায়ী তারা দেহ থেকে দেহান্তরে, এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে ভ্রমণ করছে। এইভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে সংসার কারাগারে তারা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই জীবসকল ভগবানের অখণ্ড আণবিক অংশবিশেষ। জীবাত্মার আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, তা জড় দৃষ্টির অগোচর। মনে করো, কেশাগ্রের দশ সহস্রাংশের একাংশ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তাঁর কৃপালাভের জন্য, তিনিই দয়া করে জীবের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। সাধারণত, বদ্ধদশায় পতিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ভগবদ্‌ভজন সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকে। শ্রীরূপ তোমাকে বলি, যে পন্থা অবলম্বন করলে চিন্ময়লোকে ফিরে যাওয়া যায়, সাধারণ মানুষকে সেই পন্থা অর্থাৎ কি না, ভক্তিতত্ত্বের হদিশ তোমাকে দিতে হবে। এই ভক্তিতত্ত্ব হচ্ছে মহাসমুদ্র। তার সীমা পরিসীমা

নেই। সেই সমুদ্রের একটা বিন্দু গ্রহণ করে, তোমাকে আমি ভক্তিরসের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা আন্দাজ দেওয়ার চেষ্টা করছি। দাক্ষিণাত্য থেকে এই তত্ত্ব আমি জেনে এসেছি রায় রামানন্দের কাছ থেকে।'

শ্রীরূপ জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু, আগে বলুন জীবাত্মা কয়প্রকার?'

'দুই প্রকার...নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। নিত্যবদ্ধ জীবকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন অচল ও সচল। যে জীব চলাফেরা করতে পারে না, এক জায়গাতেই অবস্থান করে, তারা অচল। যেমন বৃক্ষ। আর যারা চলাফেরা করে তাদের জঙ্গম জীব বলা হয়। যেমন পশু, পাখি। এদের আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যারা আকাশে ওড়ে, তারা খেচর। যারা জলে থাকে তারা জলচর। আর যারা স্থলে চলাফেরা করে, তাদের বলা হয় ভূচর অথবা স্থলচর। মনুষ্য জাতি হচ্ছে, স্থলচর প্রাণীর ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। তাদের মধ্যে সদাচারী, ভগবানবিশ্বাসী এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী খুবই নগণ্য। মনুষ্যজাতির মধ্যে জ্ঞানী বা মনোধর্মী দার্শনিক আরও কম। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু একজন মুক্তপুরুষ হচ্ছেন তিনিই, যিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস মনে করেন। তিনিই কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণভাবনাময়।'

'প্রভু, প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের বাসনা কী?'

'পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একীভূত হওয়া। কৃষ্ণভক্তরা সম্পূর্ণভাবে বিষয়-বাসনাহীন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে॥' অর্থাৎ 'হে মহামুনে। কোটি কোটি মুক্তপুরুষ যোগ সাধনায় সকল পরমার্থীদের মধ্যে প্রশান্তাত্মা, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভজনে ব্রতী ভক্ত বস্তুত দুর্লভ।'

'প্রভু, ভগবদ্ভজনের কয়টি সোপান?'

'তিনটি। প্রথমটি হচ্ছে সাধ্য বা ভগবদনুশীলনের সূচনাক্রম। দ্বিতীয়টি ভক্তিযোগ সাধন। আর তৃতীয় বা অন্তিম স্তরটি হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম লাভ। ভগবদ্ভজনের নয়টি বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। যেমন—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি। শ্রবণ-কীর্তনের ফলে মনুষ্য হৃদয়ে সব সংশয় দূর হয়ে যায়। এইভাবে ভজনে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাথমিক স্তরে ভগবৎ-প্রেম লাভের লক্ষণ 'ভাব' অবস্থা প্রাপ্তি। এর থেকে আরও উন্নত অবস্থা রয়েছে। যেমন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক। এই স্তরগুলি অতিক্রম করে সম্ভব হলে ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত লীলা অর্থাৎ ভক্তিরসের বিনিময় হয়।'

'প্রভু, ভাব-এর উচ্চতর অবস্থার লক্ষণগুলো কী কী?'

'তেরোটি লক্ষণ রয়েছে। নৃত্য, ভূমিতে বিলুণ্ঠন, গীত, ক্রোশন, রোমাঞ্চ, হুঙ্কার, জৃম্ভন, শ্বাসবৃদ্ধি, লোকাচারে উপেক্ষা, লালাস্রাব, হাস্য, উদঘূর্ণা ও হিক্কা। একই সময়ে সব লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। অন্তরে রসের প্রভাবে লক্ষণের উদয় হয়। শোনো শ্রীরূপ, এই অপ্রাকৃত রস কিন্তু পাঁচ প্রকার। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মাধুর্যরতি। শান্তরতি হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক সোপান। এই পর্বে ভগবানের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। দাস্যরতি পর্বে, নিজেকে ভগবানের আশ্রিত দাস হিসাবে মনে হয়। সখ্যরতিতে, ভগবৎ-প্রেমের

বিকাশ পর্ব। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করেন। এই অবস্থায় আরও উন্নত হলে ভক্ত ও ভগবানে সখ্যরসের বিনিময় হয়। এই সখ্যরতি ক্রমে বাৎসল্যরতিতে পরিণত হয়। এই পর্বে ভক্ত ভগবানকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন। তখন ভগবানও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যান। এই অবস্থায় উন্নত হলে ভক্ত ভগবানকে আলিঙ্গন করতে পারেন, তাঁর শিরচুম্বন পর্যন্ত করতে পারেন। আর মাধুর্যরতিতে ভক্ত যেন ভগবানের প্রেমিক। যেমন বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হয়েছিল...।'

...কাছে কোথাও বাজ পড়ল। সেই শব্দে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন, গোরা ফের বাস্তবে ফিরে এল। পালঙ্ক থেকে নেমে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে ওর মনে জিজ্ঞাসার আকুতিও। ভক্তিমার্গে ও নিজে কোন স্তরে রয়েছে, এই প্রশ্নটাই ওকে টেনে আনল নাটমন্দিরে। ভিজতে ভিজতে ও নাটমন্দিরে উঠে গেল। মন্দিরের দরজা বন্ধ দেখে, গোরা সিঁড়ির শেষ ধাপেই বসে পড়ল। চোখ বুজে ও ভাবতে লাগল, আধ্যাত্মিক গুণাবলি নিয়েই ওর পুনর্জন্ম হয়েছে কি না? হ্যাঁ, জগন্নাথ মন্দিরে একাধিকবার ওর ইচ্ছে হয়েছে, ছুটে গিয়ে বিগ্রহকে আলিঙ্গন করার। ইদানীং ওর মনে হচ্ছে, ভগবানকে পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে রাধাপ্রেম। নিজেকে রাধার মতো নিবেদন করা। মাধুর্যরতিতে ও বিভোর হয়ে রইল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে।

কতক্ষণ ওইভাবে বসেছিল গোরা জানে না। হঠাৎ দেখল, নিজের ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছে। ঘরের ভিতর চন্দন, বেল আর জুঁই ফুলের গন্ধ ম ম করছে। ওর চারপাশে কয়েকটা উদ্বিগ্ন মুখ। টুবাই, পুরন্দরদা, বেলি নানি, রেড্ডি কাকা। রাসবিহারীবাবুকেও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও একটু অবাকই হল। কিন্তু মা কোথায়? মায়ের জ্ঞান কি এখনও ফেরেনি? বিছানায় উঠে বসে গোরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই টুবাই এগিয়ে এসে বলল, 'কেমন বোধ করছেন প্রভু?'

ভক্তিমার্গের চিন্তা মাথা থেকে উধাও। গোরা বলল, 'ভালো। মা কোথায় রে?'

'মন্দিরে। পুরোহিত মশাই এসেছেন। কাকি পুজোর আয়োজন করছেন।'

বিছানা থেকে নেমে পড়ল গোরা। বলল, 'স্নান সেরে আমিও মন্দিরে যাব। 'তার আগে তোমার সঙ্গে একান্তে আমার কিছু কথা আছে।' বলেই টুবাই অন্যদের দিকে তাকাল। বেলি নানি, পুরন্দরদা, রেড্ডি কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর টুবাই বলল, 'কাউকে না জানিয়ে কাল রাতে জগৎপুর থেকে আমরা বেরিয়ে আসার পর...নানা গুজব ছড়িয়েছে। এক-একটা টিভি চ্যানেল এক-একরকম খবর দেখাচ্ছে। সকালে চিফ মিনিস্টার আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি জানতে চাইছিলেন, আমাদের ঠিক কী হয়েছে।'

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের নিয়ে কী গুজব রটেছে?'

'শুনে তোমার হাসি পাবে। স্বর্গ থেকে রথ নেমে এসে আমাদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছে। মাওবাদীরা আমাদের কিডন্যাপড করেছে। এমনও রটেছে, জগৎপুরের মন্দিরের ভিতর থেকে না কি আমাদের আদৌ বেরোতে দেখা যায়নি। কিন্তু সবথেকে ক্ষতিকারক যে

রটনাটা সেটা হল, পুরীতে সেই টিভি সাংবাদিক প্রভা পাণিগ্রাহীর মৃত্যুর জন্য না কি তুমিই দায়ী।'

'এই খবরটা আমায় দিলেন চিফ মিনিস্টার। হোম মিনিস্টার গোবিন্দ সাহু তোমাকে ফ্রেম করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেননা, মেয়েটাকে শেষ দেখা গিয়েছিল গম্ভীরা হোটেলে। অনেকেই জানেন, সে তোমার ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিল। গম্ভীরাতে না কি কাল পুলিশ গিয়েছিল তদন্ত করতে।'

প্রভা পাণিগ্রাহীকে নিয়ে যে গোবিন্দ সাহু জট পাকানোর চেষ্টা করবেন, সেটা গোরা আগেই টের পেয়েছিল। কেননা, মেয়েটাকে গোবিন্দ সাহুই পাঠিয়েছিলেন, ওর কলঙ্ক রটানোর জন্য। গোবিন্দ সাহুর ফোন পাওয়ার কথাটা ও টুবাইকে বলেনি। ও জিজ্ঞেস করল, 'প্রতাপ পট্টনায়েক আর কী বললেন?'

'আমাদের পুরীতে চলে যেতে বললেন। যত শিগগির সম্ভব।'

'দশরথ মোহান্তির সঙ্গে আমাদের যেসব কথা হয়েছে, তা কি ওঁকে বলেছিস?'

'হ্যাঁ। দশরথরা বিক্ষোভ তুলে নেওয়ায় উনি খুব খুশি। দিল্লি থেকে প্রাইম মিনিস্টার ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গোবিন্দ সাহুকে পালটা প্যাঁচ দেওয়ার জন্য প্রতাপ পট্টনায়েক তৈরি হচ্ছেন। ওড়িশা থেকে একজন এমপি-কে রাজ্যসভায় পাঠানোর কথা। প্রতাপ পট্টনায়েক সেই জায়গায় গোবিন্দ সাহুকে নমিনেট করছেন। আসলে গোবিন্দ সাহুকে আর উনি স্টেট পলিটিক্স করতে দেবেন না।'

'প্রভা পাণিগ্রাহীর কেসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বল তো?'

'ইন্টেলিজেন্স সোর্সের খবর, মেয়েটাকে গোবিন্দ সাহুর লোকজন এক সুপারি কিলারের মাধ্যমে খুন করিয়েছে। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখলে, পরে সমস্যা হত। কেননা, ও পরে সব ফাঁস করে দিতে পারত। সেটা আন্দাজ করেই চিফ মিনিস্টার কেসটা সিআইডি-র হাতে দিয়েছেন। ওর বিশ্বস্ত এক অফিসারের কাছে। তিনিই না কি বলেছেন, আসল খুনি জগন্নাথ মন্দিরের কাছাকাছি কোনও ধর্মীয় স্থানে লুকিয়ে রয়েছে। পুরী থেকে সে বেরিয়ে যেতে পারেনি। অথবা তাকে চলে যেতে দেওয়া হয়নি। তাকে খুব শিগগির ধরে ফেলা যাবে। তোমার চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। চলো, আমরা পুরীতে ফিরে যাই।'

'এই বৃষ্টিতে পুরীতে আমরা যাব কী করে টুবাই?'

'এখন তো যাওয়া যাবে না। রাতের দিকে যেতে হবে। শুনলাম, গুজবের কারণে তোমার হাজার হাজার ভক্ত গম্ভীরা হোটেলের সামনে জড়ো হয়েছেন। পুরীর কালেক্টর বাসুদেববাবু আমায় ফোন করেছিলেন। আমরা নিরাপদে আছি, শুনে উনি নিশ্চিন্ত হলেন। উনিই আমাদের পুরী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আপাতত তুমি যাও, নিশ্চিন্তে স্নান সেরে এসো।'

...শাওয়ার খুলে স্নান করার সময় গোরার মনটা শান্ত করার চেষ্টা করল। একটা সময় ও নিজে রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে কখনো থাকতে চায়নি।

প্রতাপ পট্টনায়েক আর গোবিন্দ সাহুর সংঘাতে ও যে কী করে জড়িয়ে পড়ল, গোরা নিজেও সেটা ভেবে উঠতে পারছে না। কী করে এই গোলকধাঁধা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়, সে কথা ও ভাবতে লাগল। আর পাঁচটা মানুষের মতো ও যেন বদ্ধদশায় আটকে রয়েছে। ওর কোনও প্রয়োজনই ছিল না, জগৎপুরে গিয়ে দশরথ মোহান্তির সঙ্গে কথা বলার। স্রেফ চিফ মিনিস্টারের অনুরোধ রাখতে গিয়ে ওকে মাওবাদীদের রোষের মুখে পড়তে হল।

পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভুকেও কি এই অবস্থায় পড়তে হয়েছিল?

গোরার মনে পড়ল, মহাপ্রভুও রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেননি। ভগবদ্ভজনের মাঝেও তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গৌড়ের নবাব হুসেন শাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন। তার আগে তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। কথায় কথায় রাজা বললেন, হুসেন শাহকে তিনি পরাস্ত করতে চান। কিন্তু সেই সময় মহাপ্রভু নিত্য তাঁর ভক্তদের মারফত গৌড়ের খবরাখবর পেতেন। তিনি শুনেছিলেন, অসমের কয়েকটি অঞ্চল জয় করে, হুসেন শাহ ধীরে ধীরে বলশালী হয়ে উঠেছেন। রাজা যুদ্ধে পেরে উঠবেন না তার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, রাজার অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গেও নবাব অশুভ আঁতাত গড়ে তুলেছেন। ফলে রাজা যদি গৌড় আক্রমণে যান, তাহলে ঘরে-বাইরে পর্যুদস্ত হবেন। মহাপ্রভু জানতেন, রাজাকে হত্যা করে হুসেন শাহ, ওড়িশাকে করদ রাজ্যে পরিণত করতে চান। তারপরই তিনি গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে ওড়িশার দায়িত্ব দেবেন। এইসব কারণে রাজাকে গৌড় আক্রমণে যেতে নিরস্ত করেন মহাপ্রভু। তাঁকে বলেন, 'নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে, বরং তোমার উচিত বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা। উচিত তাঁর কাছে পরাজয়ের গ্লানি মেটানো।' মহাপ্রভুর কথা শুনেই রাজা প্রতাপচন্দ্র আর গৌড় আক্রমণে যাননি। যুদ্ধ করতে তিনি বিজয়নগরের দিকে চলে যান।

আশ্চর্য, পাঁচশো বছর পরও ঠিক একই ঘটনা ঘটতে চলেছে। একটা নয় একাধিক ঘটনা। জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডারা কোনওদিনই মহাপ্রভুকে পছন্দ করেননি। এখন ওকেও পছন্দ করছেন না কিছু পান্ডা। মহাপ্রভুর বিরোধিতা করেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্মার্তরা। এখন টিভি চ্যানেলে বসে ওরও নিন্দা করছেন একদল বুদ্ধিজীবী। ও যে ভণ্ড সাধু, তা প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পাঁচশো বছর আগে, রায় রামানন্দের এক আত্মীয় গোপীনাথ পট্টনায়েকের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্র। সরকারি কোষাগার তছরুপের কারণে। মহাপ্রভুর অনুরোধে সেই শাস্তি রদ করা হয়। এতে খেপে যান অমাত্যরা। এখন পুরীর হোটেল মালিকরাও ওর উপর চটেছেন। অবধূতজির পাশে ও দাঁড়িয়েছে বলে। গোরা জানতে পেরেছে হোটেল মালিকদের উসকে যাচ্ছে গোবিন্দ সাহু।

নাহ্, এইসব নানা কারণে ওর ভগবদ্ভজনে বিঘ্ন ঘটছে। ওকে বেরিয়ে আসতে হবে এই জট খুলে। সেটা যত শিগগির সম্ভব। কথাটা ভাবতে ভাবতে গোরা শুকনো পোশাক পরে নিল। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ও দেখল, প্রিয়া ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে

পূজারিণী বেশ। ওর হাতে শরবতের গেলাস। মুখ তুলে তাকিয়ে ও বলল, 'মা আপনাকে ডেকে পাঠালেন। পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে।'

গোরা কোনও কিছু বলার আগেই, কাছে-পিছে কোথাও বাজ পড়ল বিকট শব্দ করে। ভয়ে কেঁপে উঠল প্রিয়া, 'মা গো'। ওর হাত থেকে শরবতের গেলাসটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। গোরা দেখল, প্রিয়া বাঁ হাতে পালঙ্কের ছত্রী ধরার চেষ্টা করছে। মাথা ঘুরে ও মেঝেতে পড়ে যেতে পারে ভেবে, সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়ে প্রিয়াকে ধরে ফেলল গোরা। তখনই ও অনুভব করল, কী যেন ওর পায়ের ভিতর ঢুকে গেল। সূচ ফোটানোর মতো একটা ব্যথা, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঠে এল। প্রিয়াকে জড়িয়ে ধরে, নিচের দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা কাচের টুকরো ওর পায়ে ঢুকে গিয়েছে।

চুরাশি

ভোই স্টোর্সের বারান্দায় বসে রয়েছে পুরন্দর আর টুবাই। মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে। জলের ছাটে প্রায় পুরো শরীর ভিজে গিয়েছে দুজনের। বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ দেখতে পারছে না পুরন্দর। গাড়ি থেকে নামার পর গোরাভাই যে কেন এমন হেঁয়ালি করল, ও বুঝতে পারছে না। নিজে আগে বাড়ি ঢুকে গেল। বলল, মাকে চমকে দেবে। আসলে কিন্তু তা নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। হয়তো গোরাভাই এমন কোনও ঘটনা ঘটাবে, যেখানে ওদের কোনও ভূমিকা নেই। বাড়ি ঢোকার ব্যাপারে সামান্য সময়ের তফাত, হয়তো পরবর্তী ঘটনার অনেক তারতম্য ঘটিয়ে দিতে পারে। আগে এসব নিয়ে ভাবত না পুরন্দর। এখন ভাবছে। কাল থেকে ওর মনে হচ্ছে, জগতে যা কিছু ঘটে, সবই পূর্বনির্দিষ্ট। গোরাভাইয়ের মতো মহাপুরুষরা আগেভাগে সব বুঝতে পারে। ওরা সাধারণ মানুষ। ওরা কি করে বুঝবে?

বৃষ্টির প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। গাড়ি থেকে ওরা যখন নেমেছিল, তখন আকাশে মেঘ থাকা সত্ত্বেও দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন চারদিক ঘন অন্ধকার। আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভোই স্টোর্স থেকে বিশাখা মায়ের বাড়ি কয়েক হাত দূরে। অথচ কী আশ্চর্য, সেই বাড়িটাই চোখের সামনে থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। গাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে। ঘনঘন বাজ পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমক দেখে একটু অস্বস্তি শুরু হল পুরন্দরের মনে। পাতাল ঘরের অন্ধকারে যার জীবন কেটেছে, তার বিচলিত হওয়ার কথা নয়। তবুও অবাক চোখে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন ও দেখতে লাগল।

'মহাপ্রলয় তাহলে শুরু হয়ে গেল পুরন্দরদা।'

আনমনা হয়ে বৃষ্টি দেখছিল পুরন্দর। টুবাইয়ের কথা শুনে ও ফিরে তাকাল। তার পর বলল, 'হ্যাঁ, চট করে থামবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

টুবাই বলল, 'আর থামবে না পুরন্দরদা। শেষের দিন শুরু হয়ে গেল।'

কথাটা টুবাই এমনভাবে বলল, পুরন্দরের গা শিউরে উঠল। ভয় বলে কোনও বস্তু ওর অভিধানে নেই। অন্তত এতদিন তো ছিলই না। কিন্তু গোরাভাইয়ের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে, ও যেন কেমন বদলে গিয়েছে। মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। শেষের দিন কথাটার অর্থ ও বুঝতে পারল না। টুবাইয়ের দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

'তুমি কি কিছুই শোননি পুরন্দরদা? কাগজে কিছু পড়নি?'

'না টুবাইভাই। কাগজ পড়ার অভ্যেস আমার নেই। কী লিখেছে কাগজে?'

'কাল রাতে গয়াধর মল্লিকের বাড়িতে ধরিত্রী কাগজে দেখলাম, ফ্রন্ট পেজে লিখেছে, এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তার প্রথম লক্ষণটা দেখা গিয়েছে। পাহাড়ের চুড়োয় কোই ফুল ফুটেছে। সেই ফুলের ছবিও ওরা ছাপিয়েছে কাগজে।'

'পাহাড়ে ফুল ফোটার সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্পর্কটা কী টুবাইভাই?'

'অচ্যুতানন্দ বলে গিয়েছেন যে! তুমি কি ওঁর নাম শুনেছ কখনও?'

'না। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, জানব কী করে?'

'উনি ছিলেন মহাপ্রভুর শিষ্য। পাঁচশো বছর আগে উনি কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। কলিযুগের শেষে কী কী হবে, তারই বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন। তারই একটা হল, পর্বত শিখরে ফুটিবে কোই, অচ্যুত বচন মিথ্যা না হই। পূর্ব ভানু অবা পশ্চিমে যিব, অচ্যুত বচন আনন হইব। সেটাই ঘটেছে। স্বর্ণচূড়া পর্বতের উপরে কোই ফুল ফুটেছে। অচ্যুতানন্দের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। পূর্বদিকের সূর্য পশ্চিমদিকে উঠলেও উঠতে পারে। কিন্তু অচ্যুত বচন কখনোই অন্যথা হবে না।'

'স্বর্ণচূড়া পাহাড়টা কোথায় টুবাইভাই?'

'বালেশ্বর জেলায় নীলগিরি অঞ্চলে। ওই পাহাড়ের একটা অংশের নাম শালবনী পাহাড়। তার পূর্বদিকে সানকালীয়া ঠাকুরানির মন্দির। পশ্চিমদিকে বড়কালীয়া ঠাকুরানির মন্দির। মাঝে আদিবাসীদের এঙ্গাসারেম মন্দির। ওখানেই স্বর্ণচূড়ায় ছোট্ট জলাশয়ে দুটো কোই ফুলের সন্ধান পেয়েছে রিপোর্টাররা। একটার রঙ সাদা, অন্যটার রঙ লাল। কাগজে খবরটা পড়েই বহু মানুষ ছুটে গিয়েছে সেখানে। পুজো আর যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে।'

'এখন কী হবে টুবাইভাই?'

'মহাপ্রলয়ের লক্ষণ ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ পাবে। এই বৃষ্টি যদি টানা সাত দিন সাত রাত্তির চলে, তাহলে ধরে নিতে হবে, পৃথিবী ধ্বংস হতে আর বেশি দেরি নেই। রাতের বেলায় আকাশে রামধনু দেখা যাবে। দিনের বেলায় ঘোর অন্ধকার। অচ্যুতানন্দ আরও কী লিখে গিয়েছে জানো পুরন্দরদা? তিনি ডাক দিবে ভৈরবী, পৃথিবী হব কম্পমান। তার মানে পাতাল থেকে ভৈরবী তিন তিনবার হুঙ্কার ছাড়বেন। সেই বিকট শব্দে পৃথিবীটা কেঁপে উঠবে। এক-একটা আওয়াজে কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে। রাতের আকাশে

তখন কাত্যায়নীদের দেখা যাবে। তারা মৃত মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য মর্তে নেমে আসবে। সেই সময় ঘনঘন ভূমিকম্প হবে...।'

নাহ্, আর শোনার ইচ্ছে নেই পুরন্দরের। আকাশে কাত্যায়নীদের দেখা যাবে...এ পর্যন্ত শুনেই পুরন্দর কেঁপে উঠল। দেখা যাবে মানে? অলরেডি দেখা গিয়েছে। কলকাতায় থাকার সময়ই ও কাত্যায়নীকে দেখতে পেয়েছে। আধা নারী, আধা পক্ষী। খুব কাছ থেকেও ও দেখেছে। বিষ্ণুমন্দিরের ফাটলে বসেছিল। কী ভয়ঙ্কর দেখতে। কী বিশাল তার চঞ্চু। উফ, ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল পুরন্দর। একবার ও ভাবল, মুখ ফুটে বলে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল।

ভোই স্টোর্সের বারান্দায় প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির রুদ্রলীলা দেখছে। তাপমাত্রা ভয়ানক নেমে এসেছে। একটা সময় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল দুজন। শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বড়ো বড়ো বরফের টুকরো এসে পড়ছে আকাশ থেকে। গড়িয়ে যাচ্ছে অ্যাসফাল্টের রাস্তায়। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ টুবাই বলল, 'এবার চলো পুরন্দরদা। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল পুরন্দর। বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে ওরা সদর দরজার কাছে এল। এই সময় পুরন্দর দেখল, কোত্থেকে একটা নেড়ি কুত্তা জুটে গিয়েছে। ওদের পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে নেতিয়ে গিয়েছে বেচারা। মুখে কুঁইকুঁই আওয়াজ করছে। অন্য সময় হলে এক লাথি মেরে বাড়ির বাইরে বের করে দিত পুরন্দর। কিন্তু ও লক্ষ করল, কুকুরটা গর্ভবতী। মায়াবশত চতুষ্পদ প্রাণীটাকে ও কোলে তুলে নিল। আহা রে, বেচারা। কৃষ্ণের জীব। ওর কষ্ট লাঘব করতে পারলে, নিজের পাপের বোঝা খানিকটা তো কমবে। এই ভাবনায়, নাটমন্দিরের সিঁড়ির নিচে শুকনো মেঝেতে কুকুরটাকে ও শুইয়ে দিল।

বারান্দায় উঠে মায়ের ঘরে ঢুকে পুরন্দর দেখতে পেল, বিছানায় মায়ের পায়ের কাছে বসে রয়েছে গোরাভাই। টুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ঘরে আরও অনেকে রয়েছে। দেখে ও আর দাঁড়াল না। ওর সারা শরীর ভিজে জবজব করছে। আগে শুকনো পোশাক গায়ে দেওয়া দরকার। মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে পুরন্দর নিজের ঘরে চলে এল। কাল দুপুরে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘরটা খুব অগোছালো অবস্থায় রেখে গিয়েছিল। ভিতরে ঢুকে ও দেখল, সব পরিপাটি হয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই অম্বালিকার কাজ। ঘরটাকে ও সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। কথাটা ভাবতেই ওর মনের ভিতরকার চাপা উদ্বেগ কর্পূরের মতো উবে গেল। পৃথিবী হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ওর গোরাভাই তো থাকবে। নতুন করে নিশ্চয়ই সৃষ্টি করবে গোরাভাই। ওরা মহাপুরুষ, ভগবানের সমান। ওরা সব পারে। পুরন্দর ঠিক করে নিল, গোরাভাইকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

আলনা থেকে শুকনো তোয়ালে টেনে নিল পুরন্দর। ভিজে পোশাক ছেড়ে গা মুছতে লাগল। কাল দুপুর থেকে ও ভিজছে। দু'দুবার ওর ভিজে পোশাক গায়েই শুকিয়ে গিয়েছে। ও আর আত্মানন্দ কাল যখন জগৎপুরে পৌঁছয়, তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মন্দির

প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে, গোরাভাই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য গয়াধর মল্লিকের বাড়িতে ঢুকে গিয়েছে। কখন বেরিয়ে আসবে, আদৌও বেরোবে কি না, সে খবর কেউ জানে না। কিন্তু আত্মানন্দ কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। গয়াধর মল্লিকের বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি পার্ক করার সময় ও নিজের গলায় একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে নিয়েছিল। ওর গলাতেও ক্যামেরা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'চলো, আমরা প্রেসের লোকেদের সঙ্গে ভিড়ে যাই। তাহলে কারও নজরে পড়ব না।'

অবস্থা দেখে পুরন্দরও বুঝেছিল, টাটকা খবর যদি পেতে হয়, তাহলে সাংবাদিকদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। ওরা আধ ঘণ্টা অন্তর খবর পাঠাচ্ছে অফিসে। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতেই, ছোটো মাইক নিয়ে যে যা ইচ্ছে, বলে যাচ্ছে। ওদের মধ্যেও কী রেষারেষি! শুনে আত্মানন্দ আর ও খুব মজা পাচ্ছিল। একজন বলল, 'এই সেই গদাধর মল্লিকের বাড়ি, যেখানে মহাপুরুষ এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিকেলের মধ্যেই তিনি পুরীর দিকে রওনা হয়ে যাবেন।' একটু পরেই অন্য এক সাংবাদিক বলতে শুরু করল, 'আমাদের কাছে খবর আছে, গোরা মহাপ্রভু কাল সকালের আগে জগৎপুর ছাড়বেন না। বিকেলের দিকে মন্দিরে গিয়ে তিনি একটা মিরাকল করবেন। সন্ধে ছ'টার সময় সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটবে।'

আধ ঘণ্টা পর বাড়ির ভিতর থেকে গয়াধর মল্লিক বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, 'দয়া করে চ্যানেলে চ্যানেলে আপনারা গুজব ছড়াবেন না। প্লিজ, আপনাদের অনুরোধ করছি। একটু আগে পুলিশ আমায় বলল, হাইওয়ে ধরে কাতারে কাতারে লোক এদিকে আসছেন। মিরাকল দেখার জন্য। কেন লোকের মনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন?'

কে শোনে কার কথা? সঙ্গে সঙ্গে একজন সাংবাদিক মাইকে বলতে শুরু করলে, 'হাজার হাজার মানুষ হাইওয়ে ধরে পাণ্ডুয়ার দিকে এগিয়ে আসছেন। সবাই সন্ধেবেলায় মিরাকল দেখতে চান। মহাপুরুষ যাঁর বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন, সেই গয়াধর মল্লিক আমাদের জানালেন...।'

চোখ টিপে আত্মানন্দ বলেছিল, 'কী বুঝছ, পুরন্দর?'

পুরন্দর বলেছিল, 'যে কাজে এসেছি, আগে সেটার কথা ভাব।'

'রাতের আগে কিছু হবে বলে মনে হয় না। একটু আগেই পিছনের দরজা দিয়ে দশরথ মোহান্তি এসেছেন। গোপনে তোমার গোরাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। এই খবরটা যদি সাংবাদিককুল পায়, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, বলো তো?'

'তুমি কী করে জানলে', এই প্রশ্নটা করা ছেড়ে দিয়েছে পুরন্দর আজকাল। আত্মানন্দের পক্ষে সবই সম্ভব। ওদের নেটওয়ার্ক এত ভালো যে, অনেক খবরই ওরা আগে আগে পেয়ে যায়। দুজনে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও বৃষ্টির ছাটে ভিজে গিয়েছিল পুরন্দর। গয়াধরের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে আত্মানন্দ ফিসফিস করে বলেছিল, 'বাড়ির ভিতরে আমাকে ঢুকতে হবে। দাঁড়াও চেষ্টা করে দেখি।'

অনেক চেষ্টা করেছিল আত্মানন্দ কাল। তবুও দিনের বেলায় গয়াধর মল্লিকের বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ঠিক গোরাভাইকে ও উদ্ধার করে নিয়ে এল। তারপর থেকে গোরাভাইকে যত দেখেছে, ততই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে পুরন্দর। চুম্বকের মতো একটা শক্তি আছে গোরাভাইয়ের। একেবারে কাছে টেনে নেয়। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে নানা কথা শুনেছে সারা দিন। কেবল হাতের স্পর্শে কারও অসুখ ভালো করে দিয়েছে গোরাভাই। কারও পাগলামি সারিয়ে দিয়েছে। কারও বন্ধ্যাত্ব দূর করেছে। এক একবার এরকম অলৌকিক কিছু ঘটেছে। আর ভক্তরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে গোরাভাইয়ের নামে। বেলি নানী আর মায়ের কাছে এসব গল্প করার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল পুরন্দর। দেখল, মন্দিরে পুজোর উদ্যোগ চলছে। প্রচুর লোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতালে।

এই ঝড়জলের মাঝেও বোধহয় আশেপাশে রটে গিয়েছে, পুরীর সেই মহাপুরুষ আসলে বিশাখা মাহেরির ছেলে। গোরাভাইকে দেখার জন্য প্রচুর লোক আসতে শুরু করেছে, ওদের ইউনিক টু-র বাড়িতে। উঠোন ভরে গিয়েছে। দরজার বাইরেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে। তবে জগৎপুরে পুরন্দর যে উন্মাদনা দেখে এসেছে, তার তুলনায় এই ভিড় কিছুই না। এখানকার লোক গোরাভাইকে ছোটোবেলা থেকে দেখে অভ্যস্ত। সেই মানুষটাই যে আধ্যাত্মিক মার্গের এত উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছে, সেটা শুনেই এরা অবাক। গোরাভাই অবশ্য এখনও মন্দিরে আসেননি। টুবাইভাইকে জিজ্ঞেস করে পুরন্দর জানতে পারল, গোরাভাই স্নান করতে ঢুকেছে। এখনই চলে আসবে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুজোর তোড়জোড় দেখছিল পুরন্দর। আসলে ওর চোখ তখন অম্বালিকার দিকে। স্নান সেরে গরদের শাড়ি পরেছে। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল এলিয়ে রেখেছে। নাটমন্দিরে মা আর বেলি নানীর পাশে বসে পুজোর কাজ করছে অম্বালিকা। ফুলের মালা গাঁথছে। ওর দিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়ছিল না পুরন্দরের। এত পবিত্র ওই মুখটা যে, ওর মনে হচ্ছিল, অম্বালিকা যেন সদ্য ফোটা চাঁপা ফুল। নিজের ক্লেদাক্ত জীবনের কথা ভেবে একটা সময় চোখ জোর করে সরিয়ে নিল পুরন্দর। ওর মতো ঘৃণ্য, পাপীর কামনাই করা উচিত নয় অম্বালিকাকে।

আজ এ বাড়িতে আসার পর থেকে, অম্বালিকার মুখোমুখি হয়নি পুরন্দর। অম্বা কি ওর উপর রেগে আছে? হতে পারে। কাল সকালেই ও প্রতিজ্ঞা করেছিল, অম্বাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে আত্মানন্দের সঙ্গে ওকে জগৎপুরে চলে যেতে হল। রাতে ফিরতে পারেনি। অম্বাকে দেওয়া কথার খেলাপ হয়ে গেল। সত্যি কথাটা তো অম্বাকে জানানো যাবে না। পুজো হয়ে গেলে, এক ফাঁকে অম্বাকে ও মানিয়ে নেবে। অম্বার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গোরার ঘরের দিকে তাকাতেই পুরন্দর দেখল, রেড্ডিকাকা হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন। ওকে দেখেই কাঁদোকাঁদো মুখে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে পুরন্দর। গোরা মহাপ্রভুর পা কেটে ব্লিডিং হচ্ছে। শিগগির একজন ডাক্তার নিয়ে আসা দরকার।

আমি শরৎ ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

শুনেই ইন্দ্রিয়গুলো টানটান হয়ে উঠল পুরন্দরের। তার মানে? কেউ চোরাগোপ্তা আক্রমণ করল না কি? রেড্ডিকাকা আর কিছু বলার আগেই লাফ মেরে গোরাভাইয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। স্নানঘরে গোরাভাইয়ের পা কাটল কী করে, ও বুঝে উঠতে পারল না। ঘরে ঢুকে ও দেখল, গোরাভাই মেঝেতে বসে। বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘরের মেঝেতে গেলাসের ভাঙা অংশ ছড়িয়ে রয়েছে। দেখেই পুরন্দর বুঝে গেল, দুর্ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে। হাঁটু গেড়ে বসে গোরাভাইকে ও জিজ্ঞেস করল, 'কাচের টুকরোটা কি বের করা গেছে?'

গোরাভাই বলল, 'হ্যাঁ, তুলে ফেলেছি। প্রিয়া ডেটল আর অ্যান্টিসেপটিক অয়েন্টমেন্ট আনতে গেছে। তেমন কিছু হয়নি পুরন্দরদা। ব্যান্ডেজ বেঁধে নিলেই হবে।'

'দেখি।' বলেই গোরাভাইয়ের বাঁ পা স্পর্শ করল পুরন্দর। সঙ্গে সঙ্গে কারেন্টের মতো শক খেল। ওর মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল, কে যেন ওকে সোঁ করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে ব্রহ্মাণ্ডের দিকে। ওর চোখের সামনে দিগন্তহীন নীলিমা। গ্রহ, তারামণ্ডলী ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই অসীম মহাশূন্যের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোরাভাই। ওর পরনে দেবতাদের বেশ। মাথায় মুকুট, গায়ে স্বর্ণালঙ্কার। দেখে পুরন্দরের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অবাক হয়ে ও দেখল, ষড়ভুজ গোরাভাই ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চার হাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র। বাকি দুই হাতের একটিতে বাঁশি, অন্যটি আশীর্বাদের ভঙ্গি।

বিশ্বরূপ দর্শন করে, পুরন্দর অভিভূত। গোরাভাই তাহলে মানুষ নয়, আসলে দেবতা। ছোটোবেলায় বিষ্ণুমন্দিরের অনাথ আশ্রমে দেবতাদের সম্পর্কে পূজ্যপাদরা অনেক কথা বলতেন। গোরাভাইয়ের সঙ্গে তো তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওঁরা বলতেন, আকাশেরও অনেক উপরে ভগবান থাকেন। সেই জায়গাটার নাম স্বর্গ। ওখানে কোনও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। অনেক পুণ্য না করলে না কি স্বর্গে যাওয়া যায় না। গোরাভাইকে ছুঁয়ে ফেলে ও তাহলে এ কোথায় এল? এটাই কি স্বর্গ? যেখান থেকে দেবতারা আগুনের গোলা ছোড়েন? বহুদিন আগে প্রথম যেদিন পুরন্দর মায়ের বাড়িতে ঢুকেছিল, সেদিন চোর অপবাদে মার খাওয়ার পর ও গোরাভাইয়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছিল। ওঁর পবিত্র স্পর্শে সারা শরীরটা যেন সেদিন জুড়িয়ে গিয়েছিল। মনে মনে পুরন্দর আফসোস করতে লাগল, এত কাছে আসা সত্ত্বেও, কেন ও গোরাভাইকে এতদিন চিনতে পারেনি?

গোরাভাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে পুরন্দর বলল, 'আমাকে উদ্ধার করুন প্রভু। জীবনে অনেক পাপ করেছি। আমার একটা গতি করে দিন।'

গোরাভাই হেসে বলল, 'পা ছাড়ো পুরন্দর। যাও, তোমার সব পাপ আমি গ্রহণ করে নিলাম। আজ থেকেই তুমি কৃষ্ণনাম জপো। সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে।'

শুনেই গোরাভাইয়ের পা ছেড়ে দিল পুরন্দর। মুহূর্তেই চোখের সামনে থেকে মহাশূন্য উধাও। ও দেখল, প্রিয়া দিদি গোরাভাইয়ের বাঁ পা কোলে তুলে নিয়েছে। সাদা কাপড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। ঘরের ভেতর ঢুকে এসেছে মা, বেলি নানী ও অম্বা। পুজোর

সময় কেন এমন অঘটন ঘটল, বলে কাঁদতে শুরু করেছেন মা। বেলি নানী তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। গোরাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শরীরের প্রতিটি লোম কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল পুরন্দরের। কাকে ও বলবে, একটু আগেই স্বয়ং ভগবানকেই ও প্রত্যক্ষ করেছে। কে-ই বা ওর কথা বিশ্বাস করবে? কিন্তু সত্যিই কি ও ভগবানকে দেখেছে? একটু দ্বিধায় পুরন্দর। আরে, ওর মতো পাপীর কাছে ভগবান ধরা দেবেন কেন?

ঠিক এমন সময় নাটমন্দিরে নামসংকীর্তনের আওয়াজ শুনতে পেল পুরন্দর। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। দর্শনার্থীরা নামসংকীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। হরির নাম শোনামাত্রই পুলক জেগে উঠল পুরন্দরের মনে। আনন্দে সারা শরীর ভরে গেল। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। দু'হাত আপনা থেকে উর্ধ্বে উঠে গেল। নামকীর্তনের ছন্দে ও শরীরটাকে দোলাতে লাগল। নাচতে নাচতেই সবার অলক্ষ্যে ও বেরিয়ে এল বারান্দায়। তারপর নেমে গেল নাটমন্দিরের উঠোনে। ওকে বিভোর হয়ে নাচতে দেখে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন মেয়েরা। গোরাভাই ভেবে, ভুল করে ওকে ঘিরেই নাচতে শুরু করলেন কীর্তনীয়ারা। গোরাভাইয়ের সেই ভগবানরূপটাই এখন পুরন্দরের চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের ইচ্ছায় ও হরিনামে ডুবে গেল।

পঁচাশি

জানলার কাচ হাত দিয়ে মুছে নিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে টুবাই বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা পিপলির কাছে পৌঁছে গিয়েছি। পুরীতে পৌঁছতে একঘণ্টার মতো লাগবে।'

মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়িটা এয়ার কন্ডিশনড বলে জানলার কাচ বাষ্পে ভর্তি। ভেতর থেকে গোরা দেখতে পাচ্ছিল না, ওরা ঠিক কোথায় রয়েছে। টুবাইয়ের কথা শুনে ও খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। ভুবনেশ্বর থেকে যখন ওরা রওনা হয়েছিল, তখন বেলা দুটো বাজে। মা কিছুতেই ওদের ছাড়তে চাইছিল না। একবেলা থাকার নাম করে গোরা মায়ের কাছে এসেছিল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে দেড় দিন কেটে গিয়েছে। বাড়তি একটা দিন ভুবনেশ্বরে থাকা ওর মোটেই উচিত হয়নি। এর মধ্যে চিফ মিনিস্টার বারতিনেক ফোন করেছেন। পুরীর কালেক্টর বাসুদেববাবু অন্তত বারছয়েক। প্রতিবারই উনি তাগাদা দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। চিফ মিনিস্টার স্রেফ আপনার জন্যই পুরীতে বসে আছেন। রাজনীতিতে মাথা গলাবে না, গোরা ঠিক করেছিল। শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারল না। দশরথ মোহান্তির সঙ্গে ওর কী কথা হয়েছে, সেটা না কি প্রতাপ পট্টনায়েক ওর মুখে সরাসরি শুনতে চান। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে পুরী যেতে হবে। ওর কিছু করার নেই।

বাসুদেববাবু পুরী থেকে একটা কোয়ালিস গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে পুরন্দরদা। পিছনে ও আর টুবাই। তারও পিছনে রাসবিহারীবাবু আর রেড্ডিকাকা। কোয়ালিসের পিছনে একটা মারুতি ভ্যানও অনুসরণ করছে। গোরা জানে, নিরাপত্তার কারণেই বাসুদেববাবু একজন অফিসারকে সঙ্গে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে দুজন আর্মড

গার্ড দিয়ে। তার অবশ্য দরকার ছিল না। রাস্তাঘাট একেবারে শুনশান, ফাঁকা। দুর্যোগের দিনে কে-ই বা রাস্তায় বেরোবে? টানা দুদিন ধরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাওয়ার জন্য রোজ পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে বাস ছাড়ে। অন্যদিন এই রাস্তায় গাড়ির ভিড় থাকে। আজ কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি গোরার।

অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্য ওর বাঁ পা-টা এখন টনটন করছে। কাচের টুকরোয় সেদিন কেটে গিয়েছিল। ক্ষত এখনও শুকোয়নি। গোড়ালির কাছটা সামান্য ফুলে রয়েছে এখনও। শরৎ ডাক্তার বলেছেন, সারতে সময় নেবে। ছোটোবেলায় খেলতে গিয়ে প্রায়ই ওর রক্তপাত হত। মা তখন দৌড়ত ওই শরৎ ডাক্তারের কাছে। ওষুধ লাগালে দু'তিন দিনের মধ্যে ঘা শুকিয়ে যেত। এবার পা কেটে যাওয়ার প্রথম দিন বাড়িতে পুজো-আচ্চা ছিল। তাই শরৎ ডাক্তারের সঙ্গে গোরার বিশেষ কথা হয়নি। কিন্তু আজ সকালে উনি নিজেই এসেছিলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। গড় হয়ে দুজনে ওকে প্রণামও করলেন। বয়স্ক মানুষ, গোরা লজ্জায় তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারের স্ত্রী তখন হাতজোড় করে বললেন, 'আপনি মহাপুরুষ। আপনাকে প্রণাম করে আমরাই ধন্য হলাম।'

মা, বেলি নানী, প্রিয়া, পুরন্দরদা সবাই তখন ঘরে। গোরা হেসে বলেছিল, 'আমি মহাপুরুষ, কী করে বুঝতে পারলেন?'

'ছলনা করবেন না প্রভু। চিকিৎসাবিজ্ঞানও আপনার কাছে তুচ্ছ। একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে কাল। ডাক্তারের গলায় একটা আব মতো হয়েছিল। ভয়ে উনি অপারেশন করাচ্ছিলেন না। পাছে ক্যানসার ধরা পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন, সেই আব উধাও হয়ে গিয়েছে। কাল আপনার পা ছুঁয়েছিলেন ব্যান্ডেজ করার জন্য। তারপর থেকে সেই আব আর নেই। আপনি মহাপুরুষ না হলে কি এটা সম্ভব হত প্রভু?'

কথাটা মনে পড়ায় গোরা মনে মনে হাসল। কারও পায়ের ছোঁয়ায় টিউমার সেরে যাওয়া সম্ভব না কি? হয়তো কোনও কারণে গ্ল্যান্ড ফুলেছিল। সেটা এমনিই সেরে গিয়েছে। আর এঁরা তাতে অলৌকিকত্ব দেখতে পাচ্ছেন। সত্যি, ওড়িশার মানুষ আর কবে যুক্তিবাদী হবে? শরৎ ডাক্তারের মতো শিক্ষিত মানুষও এমন ধর্মান্ধ হয়ে গিয়েছেন যে, ওর উপর দেবত্ব আরোপ করছেন। বিচক্ষণ মানুষ, হঠাৎ কেন এমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়বেন? ওঁকে দেখে যে আরও পাঁচটা মানুষ প্রভাবিত হবেন। গোরা ভেবেছিল বলবে, ও যদি সত্যিই মহাপুরুষ হত, তাহলে তো নিজের পায়ের ক্ষত পলকেই সারিয়ে ফেলতে পারত। সেই ক্ষত কেন দু'দিন ধরে ওকে ভোগাচ্ছে।

গাড়ি আশি-নব্বই কিলোমিটার স্পিডে দৌড়চ্ছে। গোরা হঠাৎ লক্ষ করল, গাড়ি টালমাটাল হয়ে গিয়েছে। একবার ডানদিকে হেলে পড়ছে, অন্যবার বাঁদিকে। চাকায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো? পিছনের সিটে বসা রেড্ডিকাকার মাথা বোধহয় গাড়ির ছাদে ঠুকে গিয়েছিল। উনি উফ্ বলে একবার চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ড্রাইভার গাড়ি থামাও। ভূমিকম্প হচ্ছে।'

ভয় পেয়ে ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল। দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে এল সবাই। হ্যাঁ, রাস্তায় দাঁড়াতেই ওরা টের পেল, মাটি কাঁপছে। বৃষ্টির মাঝেও আশপাশ তাকিয়ে এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল, পিপলির বাজার এরিয়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার ধারেই বিরাট একটা জলাশয়। তাতে ঢেউয়ের পর ঢেউ, জল এসে আছড়ে পড়ছে রাস্তায়। মুখ তুলে তাকিয়ে গোরা দেখল, দূরে কয়েকটা দোতলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। লোকজন সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওই ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে দাঁড়িয়েও মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে। ভয় কাটানোর জন্য উলু দিচ্ছে। বাজারের অল্প কয়েকটা দোকানই খোলা ছিল। টিন বা অ্যাসবেস্টারের চালার ছোটো ছোটো দোকান। প্রায় সব ক'টাই ভূমিশয্যা নিয়েছে।

পিচের রাস্তায় ফাটল ধরেছে। পুকুরের জল সোঁ সোঁ শব্দে চলে যাচ্ছে ধরিত্রীর অভ্যন্তরে। যেন এতদিন তৃষিত ছিল। গাড়ি ব্রেক কষার শব্দে অনেকেই এদিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ওকে চিনতে পেরে, কাঁদতে কাঁদতে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল, 'প্রভু, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনি আমাদের বাঁচান।'

কয়েক সেকেন্ডের কম্পন মাত্র। তারপরই থেমে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির তোড় থামেনি। ভেঙে পড়া বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে গোরার মনে হল, ভেতর থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসতে পারেনি। নিশ্চয়ই মানুষজন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। আগে তাদের বের করে আনা দরকার। তাই লোকটার হাত ধরে টেনে তুলে গোরা বলল, 'কান্নাকাটি কোরো না। আগে যাও, লোকজনকে উদ্ধার করো।'

লোকটা তবুও পা ছাড়ে না, 'না, না প্রভু, আমাদের ছেড়ে আপনি কোথাও যাবেন না। আপনি এলেন বলে ভূমিকম্প থেমে গেল। না হলে আরও ভয়ানক কিছু ঘটত।'

পিছনের পুলিশের ভ্যান থেকে অফিসার নেমে এগিয়ে এসেছেন। উনি বললেন, 'স্যার, আমি পিপলি থানায় খবর দিয়েছি। রেসকিউ পার্টি এখুনি চলে আসবে। আপনি গাড়িতে উঠে পড়ুন। এখানে ওয়েট করলে চলবে না। লোকজনের মুখে এখুনি আপনার কথা ছড়িয়ে যাবে। তারপর আপনার খারাপ কিছু হলে কালেক্টর সাহেব আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

সত্যি, ওকে দেখে আরও লোকজন জড়ো হচ্ছে। আর দেরি করলে পিপলি থেকে চট করে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। পুলিশ অফিসারের কথা শুনে গোরা গাড়িতে উঠে পড়ল। এরকম ভয়ানক অভিজ্ঞতা ওর জীবনে আগে কখনো হয়নি। ভূমিকম্পের কথা আগে ও শুনেছে। কাগজেও পড়েছে। কিন্তু পায়ের তলায় যে মাটি এমনভাবে কেঁপে ওঠে, সেটা ও কল্পনাতেও কোনওদিন আনতে পারেনি। ছোটোবেলায় মা বলত 'পুরীতে কখনোই ভূমিকম্প হবে না। জগন্নাথদেব যে আছেন ওখানে। তাঁর এমন মহিমা, আজ পর্যন্ত পুরীতে কখনো ভূমিকম্প হয়নি। যেদিন হবে, জানবি, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।' কথাগুলো বলেই মা জগন্নাথদেবের উদ্দেশে প্রণাম করত। কিন্তু মায়ের কথা তো মিলল না। কী এমন অনাচার হল, পুরী জেলাতেও ভূমিকম্প হয়ে গেল?

গাড়ি ফের চলতে শুরু করেছে। রাস্তায় নানা জায়গায় ফাটল। হেড লাইট জ্বালিয়ে খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। ঝাঁকুনি সামলানোর জন্য হ্যান্ডেল ধরল গোরা।

আর তখনই বাঁ পা-টা টনটন করে উঠল। ভূমিকম্পের সময় অত খেয়াল করেনি। লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল গাড়ি থেকে। নিচের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারল, পায়ের ব্যান্ডেজ ভিজে গিয়েছে। সেটা বৃষ্টির জলে, না কি রক্তে, গোরার বোধগম্য হল না। গোড়ালি কেটে যাওয়ার পর থেকে ও এমনিতে ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেই ব্যথা চিনচিন করে ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর শরৎ ডাক্তার হাঁটাচলা করতে মানা করেছিলেন। যাতে ঘায়ে সেপটিক না হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। গাড়ি থেকে নামার পর জলকাদায় পা দিয়ে ফেলল।

ফোনে টুবাই এতক্ষণ কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। পায়ের অবস্থার কথা ওকে এখন বলা যাবে না। বললেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। পাশে বসে ওর টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছিল গোরা। শুনেই বুঝল টুবাই ভুবনেশ্বরে বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বলছে। টুবাইয়ের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ফোনের লাইন ও কেটে দেওয়ার পর গোরা জিগ্যেস করল, 'বাড়ির সবাই ঠিকঠাক আছে?'

টুবাই বলল, 'হ্যাঁ, প্রিয়া ফোন করে জানতে চাইছিল, আমাদের কিছু হয়েছে কি না? টিভিতে ভূমিকম্পের খবর দেখাচ্ছে। ভয়ানক নেচারের ভূমিকম্প হয়ে গেল। টিভিতে বলেছে, রিখটার স্কেলে ৬.৯। এপিসেন্টার সিকিমের কোনও একটা জায়গা।'

'কী হত, ওই সময় যদি আমাদের গাড়িটা চলন্ত অবস্থায় উলটে যেত?'

'আশ্চর্যের কিছু ছিল না। হতেই পারত। কিন্তু তুমি সঙ্গে আছো বলে হল না। আমার ভয় লাগছে কেন জানো, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ফের আর একবার আর্থকোয়েক হবে। সেটা আরও মারাত্মকও হতে পারে। আমার মনে হয়, ফাঁকা কোনও জায়গায় আমাদের গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত।'

'কিন্তু পর পর দু'বার ভূমিকম্প হয় বলে তো কখনও শুনিনি আমি।'

'সায়েন্স তাই বলে। প্রিয়া বলল, আর্থকোয়েক মাপার খবরটা ওরা পেয়েছে, বিবিসি থেকে। হিমালয়ান প্লেট আর ইন্ডিয়া প্লেটের ঘষাঘষির ফলে না কি এই আর্থকোয়েক। এই সংঘর্ষটা না কি প্রায়ই ঘটবে এর পর থেকে। বিবিসি-ই বলেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফের আর্থকোয়েক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আমি এসব নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি মালিকা সাহিত্যে অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা।'

'হ্যাঁ, তুই একবার বলেছিলি বটে। সেখানে কি ভূমিকম্পের কথা বলা ছিল?'

'আলবাত ছিল। গাড়িটাকে দুলতে দেখে তাই আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করছিলাম, প্রভু রক্ষা করো।'

পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য গোরা বলল, 'আমাদের মধ্যে একমাত্র পুরন্দরদাই ভয় পায়নি। তাই না পুরন্দরদা?'

গোরার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। সামনের সিট থেকে পুরন্দরদা বলল, 'ভয় পাব কেন? এ তো প্রভু জগন্নাথের লীলা। ভূমিকম্প হয় কেন জানো? পূজ্যপাদদের কাছে শুনেছি, এই পৃথিবীর ভার বইছে বাসুকি বলে এক নাগ। তার ফণায় পৃথিবীটাকে

ধরে রেখেছে। বাসুকি নাগের পাঁচ পাঁচটা ফণা। পাপে যখন পৃথিবীর ভার বেড়ে যায়, তখন পৃথিবীটাকে সে আর ধরে রাখতে পারে না। এক ফণা থেকে অন্য ফণায় নিয়ে যায়। নাড়াচাড়ায় পৃথিবীটা দুলে ওঠে। আর তখনই ভূমিকম্প হয়।'

শুনে গোরা বলল, 'তাহলে পৃথিবীটা পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে, কী বলো পুরন্দরদা।'

'হয়েছে তো বটেই। তা না হলে ভগবান আপনাকে মর্ত্যে পাঠাবেন কেন?'

শুনে চমকে উঠল গোরা। ও আশাই করেনি, পুরন্দরদার মতো লোক টুবাইয়ের মতো কথা বলবে। আর কোনও কথা না বলে ও চুপ করে রইল।

...বেলা চারটের মধ্যে পুরীতে পৌঁছনোর কথা ওদের। যখন পৌঁছল, তখন সন্ধে ছ'টা। পুরী শহরে ঢোকার মুখে গোরা টের পেল ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুরনো বাড়ি ধসে পড়েছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তবুও বৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আতঙ্কে তাঁদের চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছে। পুরী শহরে ইদানীং বড়ো বড়ো ইমারত গড়ে উঠেছিল। তার বেশিরভাগই হোটেল। এই সময়টায় হোটেলগুলোতে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে। ভোগান্তি হবে তাঁদেরই। ভূমিকম্পের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে বোধহয়। হোটেলগুলো অন্ধকার হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন এই সময়টায় মন্দিরে মন্দিরে আরতি হয়। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। আজ ভূতুড়ে পরিবেশ হয়ে রয়েছে। গোরা মনটাকে তৈরি করে রাখল, গম্ভীরাতেও তাহলে আলো থাকবে না। এখন হোটেলে গিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকা যাক।

চট করে ভেবে গোরা বলল, 'আগে আমি একবার মন্দিরে যাব টুবাই। মনটা দর্শন করার জন্য আনচান করছে। চার-পাঁচদিন হয়ে গেল, জগন্নাথ দর্শন করিনি।'

মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে কারও আপত্তি নেই। তবুও টুবাই বলল, 'যেতে পারো। কিন্তু তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবে তো? পায়ের ক্ষতের কথা কিন্তু মাথায় রেখো।'

পিছন থেকে রেড্ডিকাকা বললেন, 'প্রভু মন্দিরে কালকে গেলে হয় না। এই ঝড়-বাদলার মধ্যে যাওয়ার দরকার কি? গম্ভীরায় রেস্ট নেবেন চলুন।'

গোরা জেদ ধরে বসল, 'না, না। আমি যাব। তোমরা আমায় বাধা দিয়ো না।'

সিকিউরিটির গাড়িটা কোয়ালিসের সামনে চলে এসেছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের দিকে না গিয়ে ড্রাইভার সেই গাড়িটার পিছু নিল। সিকিউরিটিকে বোধহয় বলা আছে, সোজা গম্ভীরা হোটেলে পৌঁছে দেবে। সেই কারণে ওই দিকেই যাচ্ছে। পুরন্দরদা কিছু বলেছিল বোধহয় ড্রাইভারকে। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই স্যার। এসকর্টের বাইরে যেতে পারব না। আমার চাকরি চলে যাবে।'

শুনে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল গোরার। আজ থাক তাহলে। জগন্নাথদেব হয়তো চান না, ও মন্দিরে যাক। এ তো তাঁরই খেলা। উনি না টানলে কেউ যেতে পারে না। এত কাছে এসেও ওকে তাই হোটেলে ফিরে যেতে হচ্ছে। পুরন্দরদা জোরাজুরি করছিল। কিন্তু গোরা বলল, 'থাক পুরন্দরদা, ওকে জোর কোরো না। কাল সকালে না হয় মন্দিরে যাব।'

খানিকটা এগিয়ে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। গোরা দেখল, এসকর্ট গাড়ি থেকে নেমে

আসছেন সিকিউরিটি অফিসার। হাতজোড় করে বললেন, 'গাড়ি আর যাবে না প্রভু।'

'কেন কী হয়েছে অফিসার?'

'বড়ো রাস্তার পাশে যে পুরনো বিষ্ণুমন্দিরটা ছিল, ভূমিকম্পের পর সেটা মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছে। সামনের দিকে প্রচুর দোকান ছিল। সে সব নিশ্চিহ্ন। রেসকিউ পার্টি পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। না কি বলেছে, রাস্তার একাংশ ধসে পড়তে পারে। কোনও গাড়ি যেতে দিচ্ছে না ওরা। আমি রিস্ক নিতে পারব না।'

শুনেই চমকে উঠল গোরা। এটাই সেই মন্দির, যেখানে ডাক্তার পদ্মিনীর চেম্বার ছিল। একটা প্রাচীন মন্দির একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নাহ্, লক্ষণগুলো তো ভালো মনে হচ্ছে না। তাহলে টুবাই যা বলল, মালিকা সাহিত্যের প্রবচনই সত্যিই হতে যাচ্ছে? গোরা বাইরের দিকে চোখ ফেরাল। ডাক্তারের চেম্বারের কাছে একটা ছোটো মন্দির ছিল। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। যে মন্দিরের বিগ্রহটাকে ও চোখের সামনে ক্রমে বড়ো হতে দেখেছিল একদিন। সেই মন্দিরটাও কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে? গোরা দেখল, না ভেঙে পড়েনি। আশেপাশের দোকানগুলো নেই। কিন্তু মন্দিরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভগবানের কী আশ্চর্য লীলা। জায়গাটা পুলিশ ব্যারিকেড করে রেখেছে। নো এন্ট্রি বোর্ড বসিয়ে দিয়েছে।

টুবাই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সিকিউরিটি অফিসারকে জিগ্যেস করল, 'তাহলে এখন উপায়টা কী?'

অফিসার বললেন, 'রিকশা ছাড়া তো উপায় নেই। হোটেলটা খুব বেশি দূরেও নয়। গলি দিয়ে চলে গেলে মিনিট সাত আটেক লাগবে। চলুন স্যার, আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চারটে রিকশা জোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু কোয়ালিস থেকে নামার পরই মাথাটা কেমন যেন করে উঠল গোরার। কেউ একজন ছাতা ধরেছে মাথায়। তা সত্ত্বেও বৃষ্টির ছাটে ও ভিজে গেল। রিকশায় ওঠার পরই ওর খুব শীত শীত করতে লাগল। বাঁ পা এতক্ষণ টনটন করছিল। এখন একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগল গোরা। পিপলিতে গাড়ি থেকে নেমে একবার ভিজেছিল। তখন গাড়ির ভেতর ঠান্ডায় পাঞ্জাবি শুকিয়েছে। তখন খেয়াল করেনি, এখন টের পেল, কাজটা ও ভালো করেনি। গা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছে। গলায় হাত দিয়ে গোরা বুঝতে পারল, জ্বর আসছে।

রিকশাতে ওর পাশে বসে রয়েছে টুবাই। জ্বর আসছে জানতে পারলে ও অযথা উদ্বিগ্ন হবে। প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে লাগল গোরা। টুবাইয়ের সঙ্গে কথা বললে হয়তো শারীরিক অস্বস্তিটা এড়ানো যাবে। পুরী থেকে বেরিয়ে জগৎপুরে রওনা দেওয়ার পর থেকে টুবাইকে কখনো একা পায়নি গোরা। এই প্রথম ওকে ফাঁকা পেল। মনের ভেতর গোপন করে রাখা কথাগুলো বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। 'তোকে একটা কথা বলা হয়নি টুবাই। এতদিন আমি যাকে মা বলে জানতাম, তিনি আমার আসল মা নন। তার গর্ভে আমি জন্মাইনি।'

শুনে টুবাই চমকে উঠবে, গোরা ভেবেছিল। কিন্তু সেরকম কিছু হল না দেখে ও

নিজে একটু অবাক হল।

টুবাই খুব নিস্পৃহভাবে বলল, 'জানি।'

'কী করে জানলি?'

'মালিকা সাহিত্যে তার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। অচ্যুতানন্দের কথা তোমাকে বলেছি। তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভুর আরও চার শিষ্য মালিকা সাহিত্য রচনা করেছিলেন। আমি তাঁদের রচনাও পড়েছি। তাঁদেরই একজন লিখে গেছেন। পুনর্জন্ম হওয়ার পর তুমি পালিকা মায়ের কাছে মানুষ হবে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রতিপালিত হয়েছিলেন মা যশোদার কাছে।'

'আমার আসল মা তাহলে কে?'

'তিনি খুব শিগগিরই তোমার কাছে আসবেন। তুমি তাঁকে চিনতে পারবে না। কিন্তু তিনি তোমাকে স্পর্শ করে চলে যাবেন। পরিচয় দেবেন না। তাঁর কথা ভেবে তুমি কষ্ট পেয়ো না। মা দেবকীর কথা কেই বা আর মনে রেখেছে? সবাই মা যশোদাকেই জানে। আর এসব নিয়ে একটা কথাও নয় প্রভু। তোমার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি, এতটা ধকল সহ্য হয়নি।'

অন্ধকার গলি দিয়ে রিকশাগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। চারপাশটা একেবারে অচেনা লাগছে গোরার। রিকশার দুলুনিতে মাথাটা ঘুরতে শুরু করল ওর। টুবাইয়ের কাঁধে ও মাথা দিল। সঙ্গে সঙ্গে টুবাই চমকে উঠে বলল, 'এ কী জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তোমার প্রভু। এখন কী করি। এই দুর্যোগে তো ডাক্তারও পাওয়া যাবে না পুরীতে।'

গোরা জড়ানো গলায় বলল, 'রাজা প্রতাপরুদ্রকে খবরটা দাও নিত্যানন্দ। উনি রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠাবেন। রাজার আদেশ রাজবৈদ্য অমান্য করতে...।' কথাগুলো আর শেষ করতে পারল না গোরা। ওর চোখ বুজে এল। চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার।

...অনেক রাতে ধীরে ধীরে ওর চেতনা ফিরে এল। ও আবিষ্কার করল গম্ভীরার ঘরে শুয়ে আছে। অল্প পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বলছে। ওর চারপাশে অনেক সাধু। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছেন। চোখ বন্ধ করে তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল গোরা। কে একজন বললেন, 'মহাত্মন বশিষ্ঠ, আপনি কী বলেন। এমতাবস্থায় মহাপ্রভুকে কি নিয়ে যাওয়া উচিত?'

সামনে থেকে গম্ভীর গলায় অন্যজন উত্তর দিলেন, 'শরীরের ক্ষত। সেটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলেছে অশ্বত্থামা। মহাপ্রলয়ের আগে সিদ্ধান্তটা আমাদের নিতে হবে।'

ছিয়াশি

গায়ে বেশ জ্বর। চোখ খুলতে পারছিল না গোরা। চোখের পাতা এমন ভারী হয়ে গিয়েছে। উপুড় হয়ে ও শুয়েছিল। হঠাৎ যেন কার গলা শুনতে পেল, 'প্রভু, জয়দেব এসেছে।'

জয়দেবের নাম শুনে গোরা চোখ খুলে উঠে বসল। অনেকদিন জয়দেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। উপাসনার মৃত্যুর খবর ও অবধূতজির মুখে শুনেছে। তারপর থেকেই জয়দেবের জন্য মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। ওর বিয়েতে কলকাতায় যাওয়ার জন্য গোরা মনে মনে প্রস্তুত ছিল। চোখ খুলে গোরা যাকে দেখল, সে জয়দেব বলে ওর মন বিশ্বাস করতে চাইল না। চোখের কোণে কালি, একগাল গোঁফ-দাড়ি, গায়ের রঙ কালো হয়ে গিয়েছে। একদম ভেঙে পড়া একটা মানুষ। নিজের শারীরিক অস্বস্তির কথা ভুলে গোরা বলে উঠল, 'এ কি, তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না জয়দেব।'

'তোমার শরণ নেওয়ার জন্যই এলাম গোরা। অবধূতজিই বললেন, তোমার কাছে আসতে।'

'এসো এসো, আমার কাছে বসো। কেমন আছেন অবধূতজি? পুরীতে এখন আছেন?'

'না। উনি পানিবাবার কাছে গিয়েছেন।' বলেই একটু অবাক ভঙ্গিতে তাকাল জয়দেব। তারপর বলল, 'মা চিন্ময়ীর আশ্রমে যা হয়েছে, তার কি তুমি কিছুই শোনোনি?'

গোরাও অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'না। আমি কয়েকদিন এখানে ছিলাম না। কী হয়েছে ওখানে?'

'ভাঙচুর, খুন। কাগজে তো খুব লেখালিখি হয়েছিল এ নিয়ে। অবধূতজি সেই সময় আশ্রমে ছিলেন না বলে বেঁচে গিয়েছেন। একদল লোক রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছে আশ্রমে। দুজন আশ্রমিক খুন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন অবধূতজির নিকট-আত্মীয়।'

কথাগুলো শুনে গুম হয়ে রইল গোরা। এ নিশ্চয়ই হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের লোকদের কাজ। চিফ মিনিস্টারের অনুরোধ ওঁরা রাখলেন না। তার মানে গোবিন্দ সাহুর দল এখন আরও উগ্র হয়ে গিয়েছে। প্রতাপ পট্টনায়েককে ওঁরা আর মানছেন না। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেই অবধূতজি চলে গিয়েছেন পানিবাবার কাছে। গোরা জিগ্যেস করল, 'অবধূতজি কি আর ফিরে আসবেন না?'

জয়দেব বলল, 'মনে হয়, না। আমার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে পরশুদিন বিকালে কেওনঝড়গড়ের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে। তখনই উনি বললেন, মা চিন্ময়ীর আশ্রমে আর ফিরবেন না। কেওনঝড়গড়ে ওঁদের কী যেন এক মহাসম্মেলন আছে। সারা ভারত থেকে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক কিছু মানুষ জড়ো হচ্ছেন। সেখানে উনি ব্যস্ত থাকবেন। কলকাতা থেকে আমি পুরীতে এসেছিলাম, ওঁর কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। উলটে উনিই আমাকে মা চিন্ময়ী আশ্রমের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার মনের যা অবস্থা, তাতে অতবড়ো দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সেটা শোনার পর উনি আমাকে তোমার কাছে আসতে বললেন।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুমি কেওনঝড়গড় গিয়েছিলে কেন?'

'একটা ছবির খোঁজে। আত্মানন্দ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি আত্মানন্দকে চিনলে কী করে?'

'পুরন্দরদা মারফত। আত্মানন্দের মুখেই শুনলাম, তোমার জীবনহানির জন্য একদল লোক উঠেপড়ে লেগেছে। গোরা তুমি সাবধান। পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভুর অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, সেটা তোমারও কপালে লেখা আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

কথাটা উপেক্ষা করল গোরা। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরানোর জন্য বলল, 'তোমার রিসার্চ কি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে জয়দেব?'

'মনে হয়। আমি জামিল ফেরদৌসের আঁকা শেষ অর্থাৎ তৃতীয় ছবিটা হাতে পেয়ে গিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, রিসার্চ শেষ করার জন্য এতদিন এই ছবিটার অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। কিন্তু হদিশ পাচ্ছিলাম না। কথায় কথায় আমি আত্মানন্দকে এই ছবিটার কথা বলি। সত্যি লোকটার ক্ষমতা আছে বটে। ও একটা দুঃসাধ্য কাজ করেছে। কেওনঝড়গড়ের জঙ্গলের মধ্যে এক গোপন মন্দির থেকে ও ছবিটা উদ্ধার করে এনেছে। আমাকেও ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান নিয়ে রহস্যের সম্ভবত সমাধান হয়ে গেল। এই জামিল ফেরদৌসই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তিনটে ছবি এঁকে সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেন। অন্তিম মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল, এতদিনে আমরা তা জানতে পারলাম। ছবিগুলোর কথা প্রথম জানতে পারেন সুশোভনদা। কী দুর্ভাগ্য দ্যাখো ওঁর। ছবিটার জন্য বেঘোরে প্রাণ দিলেন। অথচ দেখে যেতে পারলেন না।'

এইসব কথা জয়দেবের মুখে আগে শুনেছে গোরা। ওর কৌতূহল হল ছবিটা সম্পর্কে। ও জিগ্যেস করল, 'ছবিটা কি তোমার সঙ্গে আছে?'

'আছে। দাঁড়াও, ঘরের দরজাটা আগে বন্ধ করে দিয়ে আসি। আমি চাই না, কেউ দেখে ফেলুক।'

কথাগুলো বলে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল জয়দেব। তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ বের করে আনল। সেটা খুলে চোখের সামনে মেলে বলল, 'এটা অবশ্য আসল ছবি নয়, জেরক্স কপি। আসল ছবিটা আত্মানন্দর কাছে রয়েছে। সেটা ও ক্যুরিয়রে করে লস অ্যাঞ্জেলিসে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ছবিতে জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। বাইশি পাহাড় দিয়ে ওঠার পরই এই অংশটা দেখা যায়। গোরা দেখল, সেখানে মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরেছেন কয়েকজন। তাদের হাতে উদ্যত লাঠি। সন্ন্যাসী উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ছবিটা রঙিন। নিখুঁতভাবে আঁকা। গোরা মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'কে এই সন্ন্যাসী?'

জয়দেব বলল, 'মহাপ্রভু। বুঝতে পারছ না। মহাপ্রভুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন খুব কাছেই ছিলেন জামিন ফেরদৌস ওরফে গোকুলানন্দ। আসলে উনি ছিলেন নবাব হুসেন শাহর গুপ্তচর। পুরীতে ওঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রর অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধর। রাজা সে কথা অবশ্য জানতেন না। গোবিন্দ বিদ্যাধর এই জামিল ফেরদৌসকে লাগিয়ে রেখেছিলেন মহাপ্রভুর পিছনে। মহাপ্রভু যে ভণ্ড সন্ন্যাসী, সেটা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু বেশ কিছুদিন মহাপ্রভুকে নজরে রাখার পর জামিল ফেরদৌস বুঝতে পারেন,

মহাপ্রভুই স্বয়ং ঈশ্বর। মুসলমান হয়েও তিনি মহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। মহাপ্রভু যথারীতি তাঁকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর নতুন নামকরণও করেন, গোকুলানন্দ। গোবিন্দ বিদ্যাধররা এই পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র আঁচ পাননি। তাই তারা যখন খুন করার জন্য মহাপ্রভুকে ডেকে নিয়ে যান, তখন জামিল ফেরদৌসকে আটকাননি।'

'তাহলে তুমি নিশ্চিত যে, মহাপ্রভুকে খুন করা হয়েছিল।'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। এটা একটা প্রামাণ্য দলিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর জামিল ফেরদৌস চলে যান কেওনঝড়গড়ে। সেখানে প্রাচীন এক মন্দিরে শেষ জীবনটা কাটান।...'

'কিন্তু এই একটা ছবি দেখে তুমি কী করে নিশ্চিত হলে মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল।'

'আমি নিশ্চিত। আমার কৌতূহল মিটে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, এই রিসার্চ পেপার পাবলিশ করে হইচই বাধিয়ে দেব। কিন্তু আশ্চর্য, এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না। জীবন সম্পর্কেই আমার আর আগ্রহ নেই। একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে পুরীতে এসেছি। আশা করি, তুমি সেই জিজ্ঞাসার উত্তর আমাকে দিতে পারবে। কিন্তু তোমার শরীরের যা অবস্থা দেখছি, তাতে প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করছে না।'

গোরা হেসে বলল, 'না, না। আমার কথা ভেবো না। বলো, কী তোমার প্রশ্ন?'

'পুরীতে আসার সময় ট্রেনে তোমার সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয় হয়, সেদিন তুমি বলেছিলে, পূর্বজন্মে আমি না কি তোমারই অনুগামী হরিদাস ছিলাম। কিন্তু তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল, আমার জীবনে তা ঘটল না কেন? তুমি সন্দেহ করেছিলে, হরিদাসের সঙ্গে নর্তকী মাধবীর গোপন সম্পর্ক ছিল। সেই কারণে তুমি হরিদাসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপর হরিদাস আত্মহত্যা করেন। আমি কেন আত্মহত্যা করতে পারলাম না? উপাসনার বিরহ সহ্য করতে না পেরে আমিও তো আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলাম।'

'ঈশ্বর চাননি তাই। তুমি জানো না জয়দেব, আত্মহত্যা মহাপাপ? ঈশ্বর চাননি তুমি এই পাপের ভাগীদার হও। উনি তোমাকে দিয়ে অন্য কিছু করাতে চান। এ জগতে যা কিছু ঘটে, সবই পূর্বনির্দিষ্ট। এই যে তুমি আজ এই মুহূর্তে এখানে এসেছ, সেটাও তোমার জন্মলগ্ন থেকে ঠিক করা ছিল। উপাসনার মৃত্যু, সেটাও পূর্বনির্ধারিত ছিল। দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।'

'তোমার বিরহের তীব্রতা আমি অনুভব করতে পারছি জয়দেব। বিশ্বাস করো, আমিও এই মানসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গত দুটো দিন কাটিয়েছি। অসুস্থতার জন্য এই গম্ভীরায় আমি আটকা পড়ে আছি। প্রভু জগন্নাথকে দেখার জন্য আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে। তবুও ছুটে যেতে পারছি না। এই বিরহ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দিনরাত হরিনাম করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে জয়দেব? আমাকে একবার জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যেতে পারবে? এঁরা আমাকে যেতে দিচ্ছে না।'

জয়দেব কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ শুনে জয়দেব তাড়াতাড়ি ছবির কাগজটা গুটিয়ে ফেলল। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। গোরা দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসী। তাঁর বয়স আন্দাজ করতে পারল না গোরা। মাথায় শ্বেতশুভ্র জটা, গোঁফ-দাড়ি। এক হাতে কমণ্ডলু, অন্য হাতে ত্রিশূল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল গোরা। করজোড়ে বলল, 'আমার প্রণাম নেবেন মহাত্মন।'

ঘরে ঢুকে পালটা দু'হাত জড়ো করে সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি ঋষি পরাশর। মহর্ষি বশিষ্ঠ আমার পিতামহ। বিশেষ প্রয়োজনে উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

কথাটা শুনে গোরা জয়দেবের দিকে তাকাল। ওর চোখ-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মহর্ষি বশিষ্ঠ। তিনি তো সত্য যুগের। তিনি পরাশর মুনিকে পাঠাবেন কী করে? গোরার মনে পড়ল, দেবীভাগবতে পরাশর মুনির কথা ও পড়েছে। ইনি বেদ রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা। এঁরা সবাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে কলি যুগে এখনও বেঁচে আছেন কী করে? মহর্ষি বশিষ্ঠেরই বা ওকে কী প্রয়োজন, গোরা তাও বুঝতে পারল না। জয়দেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ও জিগ্যেস করল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মহাত্মন।'

পরাশর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি প্রভু। যুগ পরিবর্তন হতে চলেছে। কলি যুগের অবসান হবে। এই সন্ধিক্ষণে আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন।'

'আমাকে কোথায় যেতে হবে?'

'জাজপুর জেলায় নিয়মগিরির এক গোপন গুম্ফায়। সেখানে আপনার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন তিন যুগ ধরে।'

নিয়মগিরির কথা গোরা শুনেছে বাবার কাছ থেকে। খুব ছোটোবেলায় নাটমন্দিরে বসে বাবা সব আশ্চর্য কাহিনি বলতেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর। নিয়মগিরিতে না কি দু'হাজার রহস্যময় গুহা আছে। এক একটা গুহায় অসংখ্য রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে না কি পাতালে চলে যাওয়া যায়। এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর একেবারে শেষপ্রান্তে। বাবা বলেছিলেন, ওইসব গুহায় যে-কেউ ঢুকতে পারে না। গুহার ভেতর কোনও কোনও জায়গায় না কি গাছের অদ্ভুত শিকড় পাওয়া যায়। যা বেটে চোখে লাগালে অন্ধকারেও সবকিছু দেখা যায়। দিব্যসৃষ্টি লাভ হয়। নিয়মগিরির কথা শুনে গোরার আরও মনে পড়ল, সেই গাছের নাম অগ্নিবলা। স্থানীয় মানুষরা অনেকেই অগ্নিবলা চূর্ণ চোখে লাগিয়ে গুহার ভিতর ঢুকেছে। পাতালে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। নিয়মগিরির একটা গুহার নাম মণিনাগ। তার ভেতর দিয়েই নাকি পাতালে প্রবেশ করা যায়। ওই গুহায় এখনও বসবাস করেন অমরত্ব পাওয়া মহামুনি আর কিছু বীর্যবান পুরুষ। অশ্বত্থামা, পরশুরাম। বাসুকি নাগও রয়েছেন।

বাবা যখন বলেছিলেন, তখন বিশ্বাস হয়নি গোরার। ধর্মান্ধ মানুষ কত কীই না বিশ্বাস

করেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাবা বলেছিলেন, বাসুকি নাগ একবার নাকি কঠিন তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা হাজির হয়ে বলেন, 'তোমার কী চাই বলো।'

বাসুকি তখন বলেন, 'আমি আমার দুষ্ট ভ্রাতাদের থেকে দূরে থাকতে চাই। পরলোকেও যেন তাদের সঙ্গে আমার দেখা না হয়।' ব্রহ্মা তখন বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি তাহলে পাতালে চলে যাও। পৃথিবীকে ধারণ করো।' বাসুকি কি তাহলে ওই নিয়মগিরির গুহা দিয়েই পাতালে গিয়েছিলেন? এখনও পৃথিবী ধারণ করে আছেন তাঁর ফণায়? পুরন্দরদা তো তাহলে সেদিন সত্যি কথা বলেছিল ভূমিকম্পের পর।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ঋষি পরাশর বললেন, 'আমার পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং আরও কয়েকজন আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। কিন্তু আপনার শরীরে ক্ষত রয়েছে দেখে, সেদিন চলে যান। কিন্তু আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। পর্বতচূড়ায় কোই ফুল ফুটে গিয়েছে। আর দিন দুয়েকের মধ্যে পাতাল ভৈরবী হুঙ্কার ছাড়বেন। আমি দুটো ভেষজ পদার্থ নিয়ে এসেছি। একটি বিশল্যকরণী। লাগালে আপনার পায়ের ক্ষত কিছু সময়ের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অন্যটি অগ্নিবলা, চোখে লাগালে আপনি দিব্যদৃষ্টি পাবেন। বারো বছর আগে আপনাকে আমরা ভেষজ স্নান করিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই আপনি অতীত অবলোকনের ক্ষমতা পান। আজ থেকে আপনি ভবিষ্যৎও দেখতে পাবেন।'

ঋষি পরাশর অদ্ভুত সব কথা বলে যাচ্ছেন। গোরা বুঝতে পারছে না। সরাসরি ও জিগ্যেস করল, 'আমাকে আপনাদের কী প্রয়োজন, তা কি জানতে পারি?'

'নিয়মগিরিতে গেলেই সেটা বুঝতে পারবেন। আপনাকে যা বলার মহর্ষি বলবেন। আষাঢ়ের সপ্তমী তিথিতে আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন। আমরা পুষ্পক রথ নিয়ে হাজির হব।' কথাগুলো বলেই ঋষি পরাশর কমণ্ডলুর ভিতর থেকে মাটির দুটো পাত্র বের করে আনলেন। পাত্র দুটো গোরার পায়ের কাছে রেখে, তারপর হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মাটির দুটো পাত্রের দিকে তাকিয়ে রইল গোরা। কোনটা ক্ষত নিরাময়ের জন্য বিশল্যকরণী, কোনটা দিব্যদৃষ্টির জন্য অগ্নিবলা—ও বুঝতে পারল না। এর ভিতরে রাখা একটি ভেষজ পদার্থ চোখের পাতায় লাগালে ও না কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে। কিন্তু দেখে লাভ কী? এমনিতেই ওর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটছে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এক বছর আগে, ইউনিভার্সিটি চত্বরে বসে ও চিন্তাই করতে পারত না, লোকে ওকে মহাপুরুষ-বানিয়ে দেবে। লাখ লাখ মানুষ ওকে দেখার জন্য ছুটে আসবে সারা দেশ থেকে। দলিতদের অধিকার আদায় করার লড়াই থেকে ও সরে এসে হরিনাম প্রচারের ব্রতী হবে। কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ ওর চোখের সামনে ধরা দেবেন। জগন্নাথদেবের সঙ্গে ও কথা বলবে। মহর্ষি বশিষ্ঠ ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হবেন। গোরা বিশ্বাস করার চেষ্টা করল, সত্যিই কি ঋষি পরাশর ওর সঙ্গে কথা বলে গেলেন? সত্যিই কি তিনি পুষ্পক রথ নিয়ে হাজির হবেন? অ্যাবসার্ড!

বসে থাকার সময়ই ও টের পেল, শরীরের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। একবার স্নান করে নিলে হয়তো শরীরের তাপ কমতে পারে। কিন্তু উঠে গিয়ে স্নানঘরে ঢোকার শক্তি ওর অবশিষ্ট নেই। পা ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে। ক্ষতস্থান থেকে রস বেরোচ্ছে। টুবাই কাল রাতে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। ক্ষত দেখে উনি ইঞ্জেকশন দিতে চাইছিলেন। কিন্তু শরীরে সুচ ফোটানোর কথা ভাবলেই আঁতকে ওঠে গোরা। ছোটোবেলা থেকেই ওর ভীষণ ভয়। কিছুতেই ও ইঞ্জেকশন নিতে রাজি হয়নি। ডাক্তার তখন বললেন, 'তাহলে আমার নার্সিংহোমে নিয়ে চলুন। আমার ভয় হচ্ছে, প্রভুর পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু অ্যামপিউট করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।'

কথাটা মনে পড়ায় গোরা চোখ বুজল। ওর কপালের পাশটা টিপটিপ করতে লাগল। মাথার ভিতরে একটা লাল বৃত্ত ঘুরতে লাগল। সেটা থিতু হওয়ার পর গোরা দেখতে পেল, এক বিশাল বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিকটেই উত্তাল সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে ও দেখতে পেল, বিরাট একটা শাল্মলী বৃক্ষের তলায় পদ্মাসনে বসে আছেন মহাবলী এক পুরুষ। দেখেই গোরা বুঝতে পারল, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহোদর বলরাম। দূর থেকে প্রণাম করার পর ও যা দেখল, তাতে ওর সারা শরীরের রোম শিহরিত হয়ে উঠল। গোরা দেখল, বলরামের মুখ থেকে শ্বেতবর্ণ, সহস্রশীর্ষ, রক্তমুখ এক মহানাগ বেরিয়ে আসছে। সেই নাগ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক—অনেকেই উঠে এসেছেন। মহানাগ সমুদ্রে প্রবেশ করার পরই বলরামের দেহ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোরা, ওর সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। একটা সময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও এগিয়ে গেল। বলরাম যেখানে বসে ছিলেন, সেখানে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল। গোরার মনে হল, ওরও অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। শুয়ে থাকার সময়ই ও হঠাৎ অনুভব করল, ওর পায়ের তলায় কী যেন এসে ফুটল। একটা তীব্র ব্যথা পা থেকে ওর মাথায় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। পায়ের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, ও বাণবিদ্ধ হয়েছে। একটু পরেই এক ব্যাধ কাঁদতে কাঁদতে ওর পায়ের সামনে আছড়ে পড়ে বলল, 'প্রভু, আমি জরা। দূর থেকে মৃগ ভেবে আপনার দিকে শর নিক্ষেপ করেছিলাম। না জেনে ঘোর পাপ করে ফেললাম। নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।'

গোরা বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার হাতেই যে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হবে, এটা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তুমি নিমিত্ত মাত্র। দাঁড়াও, তোমাকে আমি স্বর্গলোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।'

...পায়ের তলা থেকে ব্যথাটা ধীরে ধীরে ফের উঠে আসছে। গোরা উঠে বসার চেষ্টা করল। চোখ মেলে ও দেখল, টুবাই ও জয়দেব সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় সেই বনাঞ্চল? নিমেষে সব মিলিয়ে গিয়েছে। ও গম্ভীরাতেই শুয়ে আছে। টুবাই ওকে বলল, 'প্রভু, জয়দেব এসেছে।'

গোরা বলল, 'হ্যাঁ, একটু আগেই ও আমার সঙ্গে কথা বলছিল। ঋষি পরাশর এসেছিলেন বলে... ওকে বাইরে যেতে বলেছিলাম।'

'কে ঋষি পরাশর, প্রভু? কেউ তো আসেননি। জয়দেব আপনার ঘরে ঢোকেনি।'

কী বলছে টুবাই! গোরার সব ঘুলিয়ে গেল। ও বোঝার চেষ্টা করল, জ্বরের প্রকোপে ও কি এতক্ষণ অলীক দর্শন করছিল? ইংরেজিতে যাকে বলে হ্যালুসিনেশন?

সাতাশি

স্নানঘরের জানলার কাচটা বোধহয় ঝোড়ো হাওয়ায় কখনো ভেঙে গিয়েছে। স্নান করার সময় বাইরের দিকে চোখ যেতেই গোরা দেখতে পেল, বৃষ্টির প্রকোপ বিন্দুমাত্র কমেনি। জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অন্যদিন আলোর জন্য সব ঝলমল করে। কিন্তু আজ ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢেউগুলো যেন আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব গ্রাস করে নেওয়ার জন্য। টানা পাঁচদিন বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। থামার কোনও লক্ষণ নেই। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি গোরার। টুবাই বলছিল, শুধু ওড়িশাতেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই না কি বৃষ্টি হচ্ছে। মরুভূমিতেও জলপ্লাবন দেখা দিয়েছে। আমেরিকার আবহাওয়া দফতর থেকে না কি আগাম সতর্ক করে দিয়েছে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।

ভুবনেশ্বর থেকে ফেরার পর ভালো করে স্নান করতে পারেনি গোরা। ডাক্তারের বারণ ছিল। পায়ের ক্ষতে যেন জল না লাগে। কিন্তু আজ সকালে গোরা আর থাকতে পারেনি। পায়ে পলিথিনের ব্যাগ জড়িয়ে নিয়েছে। যাতে স্নান করার সময় জলে ভিজে না যায়। স্নান করার সময়ই ও মনে মনে ঠিক করে রাখল, আজ কারও কথা শুনবে না। আগে স্নান সারার পর যেমন মন্দিরে যেত, আজও সেরকমই যাবে। বহুদিন মন্দিরে গিয়ে প্রভু জগন্নাথের সামনে দাঁড়ানো হয়নি। মনটা আকুলি-বিকুলি করছে। রত্নবেদির কাছে গিয়ে ও স্তব আওড়াবে। চারপাশের ঘটনাবলি ওকে যথেষ্ট নাড়া দিচ্ছে। বিশেষ করে, ঋষি পরাশরের আগমন। ও বুঝতে পারছে, খুব শিগগির ওর জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটবে, যা একেবারেই আশা করেনি। কাল গভীর রাতে গোরা একবার ভেবেছিল, চোখের পাতায় অগ্নিবলা লাগিয়ে একবার ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে নেবে। কিন্তু পরে অনেক ভেবে নিজেকে নিবৃত্ত করে।

স্নানঘর থেকে বেরিয়েই দেখল, ড্রয়িংরুমে চন্দনকে নিয়ে টুবাই বসে আছে। ওকে দেখেই দুজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল। চন্দনের সঙ্গে অনেকদিন গোরার দেখা হয়নি ও খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। প্রতিবার মন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। এই মহাদুর্যোগে বোধহয় এবার আনেনি। কিন্তু চন্দন এল কোথা থেকে?

সেটাই গোরা জিগ্যেস করল, 'কেমন আছো চন্দন? এতদিন কোথায় ছিলে?'

চন্দন বলল, 'মাওবাদীদের ডেরায়। ওদের উপর ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করছিলাম।'

মাওবাদীদের কথা শুনে গোরার কৌতূহল হল। ও বলল, 'জঙ্গলে তরুণ মাজি বলে কারও সঙ্গে তোমাদের আলাপ হয়েছে?'

প্রশ্নটা শুনে চন্দন আর টুবাই নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। বোধহয় কোনও কথা জানাতে ইতস্তত করছে। কয়েক সেকেন্ড পর চন্দন বলল, 'হ্যাঁ আলাপ হয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, তরুণ মাজি সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করার জন্যই এখানে এলাম।'

'ও এখন কোন অঞ্চলে অপারেট করছে?'

'জগৎপুরে। আপনাকে হত্যা করার জন্য উনি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জগৎপুরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রাতে আপনাকে পাননি। আপনাকে না পেয়ে সব আক্রোশটা ওরা ঝেড়ে এসেছেন গয়াধর মল্লিকের বাড়িতে। ফ্যামিলির সব পুরুষকে নির্বিচারে খুন করেছেন। তরুণ মাজিদের ধারণা হয়েছিল, মল্লিকরা আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।'

খবরটা শুনে মন বিষণ্ণ হয়ে গেল গোরার। ও বলল, 'তুমি সেখানে ছিলে না কি?'

'ছিলাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই আপনাকে দেখা দিইনি। আমি বা মন্দিরা—কেউই চাইনি, মাওবাদীরা জানুক আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাহলে আমাদের খুব অসুবিধা হয়ে যেত। মাওবাদীরা জানে না কিন্তু আমি জানি, সেদিন কারা আপনাদের দুজনকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের ছবি আমার কাছে তোলা আছে।...গয়াধর মল্লিকের বাড়ি থেকে সেই রাতে যখন আপনারা বেরিয়ে আসেন, তখন ক্যামেরা নিয়ে আড়ালে আমি হাজির ছিলাম। পুরোটাই আমি ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছি।'

'ওই দুজনকে তুমি চেনো?'

'চিনতাম না। কিন্তু ছবি দেখে পরে ওদের হদিশ পেয়েছি। যে দুজন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন রবার্ট। আমেরিকান এজেন্ট। কেওনঝড়গড়ে তার সঙ্গে আলাপ হল। অন্যজনকে একটু আগে নিচে দেখলাম, কয়েকজন সাধুর সঙ্গে বসে, ধর্মালোচনা শুনছেন। টুবাইদা আমাকে বললেন, উনি পুরন্দরদা, আপনার দাদা।'

'এই ডকুমেন্টারি ছবিটা তোমরা তৈরি করছ কার জন্য?'

'শুরু করেছিলাম নিউজ চ্যানেলে বিক্রি করার জন্য। কিন্তু আপনি সিন-এ চলে আসার পর সিচুয়েশন পালটে গিয়েছে। হলিউডের এক ফিল্ম কোম্পানি ইন্টারেস্ট নিয়েছে। এরাই আবতার বলে একটা ছবি তৈরি করেছিল। দেখবেন, মাঝেমধ্যে স্টার মুভিজে দেখায়। নিয়মগিরি পাহাড়ে ডঙ্গোরিয়া বলে এক আদিবাসী সম্প্রদায় আছে। আবতার ছবিটা তাঁদের লড়াই নিয়ে। ডিরেক্টর জেমস ক্যামেরন নিজে স্বীকার করেছেন সে কথা। ওই কোম্পানিই মহাপ্রভুকে নিয়ে একটা সিনেমা তৈরি করবে। আ স্টোরি অব অ্যান আবতার। ওদের হয়ে আমি এখান থেকে ফুটেজ পাঠাচ্ছি।'

ওহ্, মহাপ্রভুকে নিয়ে সিনেমাটা তাহলে হচ্ছে! কী নাম যেন সেই ভদ্রলোকের...গোরা

মনে করতে পারল না। ভদ্রলোক কলকাতায় মাথা খারাপ করে দিয়েছিলেন কয়েকটা দিন। লিড রোলে অ্যাক্টিং করতে হবে আপনাকে। পরে উনি টুবাইকেও ধরেন। চন্দন কি সে সব কথা জানে? জগৎপুরের ফুটেজ নিয়ে হলিউডের লোক কী করবে, কে জানে? একটু চুপ করে থেকে গোরা বলল, 'তোমার ডকুমেন্টারি ছবি বানানোর কাজ কতদিন চলবে?'

'আজই শেষ। একটা সুখবর দিই। মন্দিরা মা হতে যাচ্ছে। খুব অ্যাডভান্সড স্টেজ। ও এখন কলকাতায়। যে-কোনওদিন ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হবে। ওর মা-বাবা আমাদের বিয়েটা মেনে নিয়েছেন। আমি কাল দুপুরেই কলকাতায় চলে যাব। তবে যাওয়া হবে কি না, সেটা নির্ভর করছে, আপনার উপর।'

গোরা বলল, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না চন্দন।'

'আপনাকে একবার আমি জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে যাব। সেখানে আপনার কিছু ছবি তুলব। হলিউডের কোম্পানি থেকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। ওরা এই ফুটেজ এখন চাইছে। কিন্তু আপনার পায়ের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মন্দিরে যাবেন কী করে? যা বৃষ্টি হচ্ছে...এই আলোতে ছবিও কেমন হবে, জানি না।'

মন্দিরে যাওয়ার কথা শুনে গোরার মনটা নেচে উঠল। ঘরে টুবাই বসে না থাকলে ও তখনই বলে উঠত, এখুনি চলো। কিন্তু ও জানে, টুবাই রাজি হবে না। ও লক্ষ করছে, শুধু টুবাই নয়, আরও চারজন—রাসবিহারীবাবু, রেড্ডিকাকা, পুরন্দরদা আর মুকুন্দ, ওর চারপাশে একটা বলয় তৈরি করেছে। এই পাঁচজন পালা করে ওর দিকে নজর রাখছে। ফলে ভুবনেশ্বর থেকে আসার পর গম্ভীরার বাইরে পা রাখা গোরার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদের বাইরে আর কেউ নেই, যার সঙ্গে ও মন্দিরে যেতে পারে। চন্দনকে হয়তো প্রভু জগন্নাথই পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোরা ঠিক করে রাখল, আগে থেকে চন্দনকে ও ইঙ্গিত দিয়ে রাখবে। সবার অজান্তে যাতে ওর সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে।

তখনই ওর মনে হল, গেলে কাল সকালেই ওকে মন্দিরে যেতে হবে। পরশু আষাঢ় মাসের সপ্তমী। ওই দিন পরাশর মুনির আসার কথা। ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যেন হাজির হবেন। কাল না গেলে আর কোনওদিন ওর জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হবে না। পরাশর মুনির কথা টুবাইদের গোরা খুলে বলেনি। বললে ওরা আরও আঁকড়ে ধরবে। সবকিছু ও ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যা হওয়ার তা হবেই। এই যে মন্দিরে ওর যাওয়া হচ্ছে না, সেটাও প্রভু জগন্নাথ ওকে টানছেন না বলে। টুবাইরা বলছে, ক্ষত নিয়ে মন্দিরে যাওয়া যাবে না। নানারকম প্রশ্ন উঠবে। ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। ওর শত্রুর তো অভাব নেই!

মনের ভিতর এইসব কথা নিয়ে আলোড়ন হওয়ায়, গোরা হঠাৎ ক্লান্তি অনুভব করল। অথচ স্নান সেরে বেরিয়ে আসার পর ওর বেশ তরতাজা লাগছিল। চন্দনদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে হবে। ইচ্ছেটা হওয়ায়, গোরা বলল, 'আমার জন্য একটু শরবতের ব্যবস্থা করবে টুবাই।'

গোরা ভেবেছিল, টুবাই উঠে বাইরে যাবে। কিন্তু ও সেই তাগিদই দেখাল না। কোমরের খোঁট থেকে মোবাইল সেট বের করে মুকুন্দকে ফোন করে ও বলল, 'এখুনি মহাপ্রভুর জন্য ফলাহারের ব্যবস্থা করো। এখানে চন্দনও আছে।' তারপরই পাশ ফিরে চন্দনকে একটু রুক্ষ গলায় টুবাই বলল, 'মহাপ্রভুকে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে শুটিং করার আইডিয়াটা বাদ দাও চন্দন। মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। তুমি বিপদে পড়ে যাবে।'

চন্দন বলল, 'আমার কাছে লুকনো ক্যামেরা আছে টুবাইদা। কেউ বুঝতেও পারবে না।'

'তবুও তুমি চেষ্টা কোরো না। এখানকার পরিস্থিতির কথা তুমি সব জানো না। যাক গে, যা বলার জন্য তুমি এসেছিলে, তা কিন্তু এখনও বলোনি চন্দন।'

এবার গোরার দিকে তাকিয়ে চন্দন বলল, 'বলছি। কিন্তু এটা যেন এই চার দেওয়ালের বাইরে না যায়। মাওবাদীদের কাছে খবর আছে, কাল গম্ভীরা থেকে এক শোভাযাত্রা বেরোবে আপনাকে নিয়ে। সেই মিছিল যাবে কেওনঝড়গড় জঙ্গলের এক মন্দির পর্যন্ত। লক্ষ লক্ষ সাধুর সমাগম হবে সেখানে। এই প্রথম উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির পাতাল থেকে বামন সাধুরা নাকি বেরিয়ে এসে সেই মিছিলে যোগ দেবেন। আপনিই যে মহাপ্রভু এবং পুনর্জন্ম নিয়েছেন, সেটা সাধুসন্তরা এই প্রথম প্রকাশ্যে জানাবেন। মুশকিল হল, আপনাকে মেরে ফেলার জন্য মাওবাদীদের একটা দল পুরীতে অলরেডি পৌঁছে গিয়েছে। সাধুসন্তের বেশে এরা ভক্তদের মধ্যে ভিড়ে যাবে। এদের মদত দেওয়ার জন্য থাকবে গোবিন্দ সাহুর স্পেশাল ফোর্স।'

'ঠিক কারা মহাপ্রভুকে হত্যা করতে চায় এবং কেন, তুমি জানো চন্দন?'

'আমি পুরোটা জানি না। একটা কারণ যে দশরথ মহান্তি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। পুরীর মন্দিরের এক পান্ডা পদ্মনাভও এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে হোম মিনিস্টারের খুব ভালো সম্পর্ক। কোনও কারণে হোম মিনিস্টারও ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন আপনাদের উপর। মাওবাদীদের সঙ্গে হোম মিনিস্টারের মাঝে মাঝেই কথা হত। সেই সময় ওঁকে বিষোদ্গার করতে শুনেছি।'

এই পর্যন্ত শুনে টুবাই বলল, 'থাক, আর শুনে কাজ নেই। এসব আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রভু এখন বিশ্রাম নেবেন। চলো আমরা বাইরে যাই।'

চন্দনকে নিয়ে টুবাই বাইরে চলে যাওয়ার পর গোরা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। মার্বেল পাথরের মেঝের স্পর্শে ওর অঙ্গ শীতল হয়ে গেল। চোখ আপনা থেকে বুজে এল। ইদানীং জগৎপুর থেকে ফেরার পর চোখ বন্ধ করলেই ও অলীক দর্শন করছে। সেই ঘটনাগুলো অতীতে কখনো হয়তো ঘটে গিয়েছে। চন্দনের সাবধানবাণী নিয়ে ভাবতে ভাবতেই গোরা অর্ধ শতাব্দী সময় পিছিয়ে গেল। অদ্বৈত আচার্যের কথা ওর মনে পড়ল। সেদিনও এমন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাধাকৃষ্ণ মঠের গম্ভীরায় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শান্তিপুরের এক ভক্ত। তার হাত দিয়ে মহাপ্রভুর কাছে একটা চিরকুট পাঠিয়ে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তাতে লেখা, 'প্রভুকে কহিও আমার কোটি

নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।। বাউলরে কহিও লোকে হৈল আউল। বাউলরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।। বাউলরে কহিও কাজে নাহিক আউল। বাউলরে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।'

চিঠির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে মহাপ্রভুর অসুবিধা হয়নি সেদিন। গুপ্তভাষায় তর্জাটি লিখে অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উনি জানতেন। ধরেই নিয়েছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকবেন না। ওঁকে ঘিরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় ওড়িশায় থাকা মহাপ্রভুর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। এবার লীলা সংবরণ করার সময় হয়ে গিয়েছে। বৈষ্ণব আন্দোলন যথেষ্ট মাত্রা পেয়েছে। এখন মহাপ্রভুর...গৌড়ে ফিরে আসা প্রয়োজন। চিঠির সাংকেতিক অর্থ অনুধাবন করার পরই মহাপ্রভু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রথম বলি হবেন তিনি। তবুও স্থির করেছিলেন, যা-ই ঘটুক, তিনি আর নবদ্বীপে ফিরে যাবেন না।

...দরজায় টকটক শব্দ। শুনে গোরা চোখ খুলেই দেখল, রাধাকান্ত মঠ উধাও। ও গম্ভীরার মেঝেতে শুয়ে আছে। মুকুন্দ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর এক হাতে শরবতের গেলাস। অন্য হাতে একটা পাথরের পাত্রে ফল ও পিঠে-পুলি। কাল মুকুন্দের হাত দিয়েই গোরা মায়ের জন্য প্রভু জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ পাঠিয়েছিল। ভুবনেশ্বর থেকে মুকুন্দ কখন ফিরে এসেছে, গোরা তা জানে না। মুকুন্দকে দেখেই ওর মায়ের কথা মনে পড়ল। পিঠে-পুলি বোধহয় মা-ই পাঠিয়েছে। ও জিগ্যেস করল, 'মাকে কি বলেছিস, সর্বদাই তাঁর কথা আমি চিন্তা করি।'

মুকুন্দ বলল, 'বলেছি মহাপ্রভু। শুনে কান্না বন্ধ করে উনি আমায় বললেন, আপনার যত্ন নিতে। উনি আপনার জন্য পিঠে-পুলি, খাজা গজা পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু গত দু'দিন ধরে টেলিফোন ব্যবস্থার অবস্থা খুব খারাপ। জলঝড়ে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলাতে পারলাম না।'

অনেকক্ষণ আগে টুবাই ওকে শরবত ও ফলাহার আনার কথা বলেছিল। এতক্ষণ মুকুন্দ কী করছিল?

মায়ের পাঠানো পিঠে মুখে দিয়ে গোরা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তোর এত দেরি হল কেন রে?'

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল মুকুন্দ। কিন্তু উত্তর দিল না। দেখে গোরা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'উত্তর দিচ্ছিস না যে বড়?'

মুকুন্দ মৃদুস্বরে বলল, 'আসব কী করে? নিচে যে পুলিশ এসেছিল।'

সেই প্রভা পাণিগ্রাহীর কেসটার জন্য না কি? যার সঙ্গে জড়িয়ে হোম মিনিস্টার গোবিন্দ সাহু ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। পুলিশ এসেছিল শুনে গোরার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ও বলল, 'কেন, পুলিশ এসেছিল কেন?'

'পুরন্দরদার জন্য। পুরন্দরদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।'

'কেন পুরন্দরদা কী অপরাধ করেছে?'

'মার্ডার। পুরন্দরদা না কি কলকাতায় বেশ কয়েকটা মার্ডার করেছে। নবদ্বীপেও নাকি এক ফরেনারকে মেরে ফেলেছিল। পুরন্দরদাকে ধরার জন্য দিল্লি থেকে একজন সিবিআই অফিসার পুরীতে এসেছিলেন। তিনি নিখোঁজ। পুলিশের সন্দেহ, তাঁকেও না কি খুন করেছে পুরন্দরদা।'

শুনে গোরা চমকে উঠল। পুরন্দরদা মানুষ খুন করেছে? হতেই পারে না। প্রথম প্রশ্নটাই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'টুবাই আর রেড্ডিকাকারা জানে? তখন ওরা ছিল?'

'ছিল। পুলিশ কারও কথা শোনেনি। ওঁরা সবাই...পুলিশের সঙ্গে কোতয়ালি থানায় গেলেন। ওখান থেকে কালেক্টরের বাড়িতে যাবেন। আপনাকে কিছু জানাতে মানা করেছিলেন আমাকে। যা বলার, ওঁরা ফিরে এসে আপনাকে বলবেন।'

পুরন্দরদার বিপদের কথা শুনে খাওয়ার ইচ্ছে উবে গিয়েছে গোরার। মাথায় একরাশ চিন্তা এসে জুটল। পুরন্দরদা কি সত্যিই মার্ডার করেছে? পুরন্দরদার অতীত সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই গোরার। কিন্তু কী হবে, কথাটা যখন মায়ের কানে যাবে? এটা গোবিন্দ সাহুর চাল নয়তো? না কি পুরন্দরদাকে অ্যারেস্ট করার পিছনে একটাই কারণ। ওকে হেনস্থা করার আগে গোবিন্দ সাহু একটা টোকা মেরে দেখে নিলেন। পুরন্দরদা যে ওর দাদা, সেটা নিশ্চয়ই হোম মিনিস্টার জানেন। এবার ফলাও করে টিভিতে গ্রেফতারের খবরটা উনি প্রচার করবেন। যাতে গোরার বদনাম হয়।

এই পরিস্থিতিতে পুরন্দরদাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে চিফ মিনিস্টার প্রতাপ পট্টনায়েক। পুরীতে ফেরার পর মাত্র একবারই ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন প্রতাপ পট্টনায়েক। টুবাইয়ের মুখে গোরা শুনেছে, ভূমিকম্প পীড়িত মানুষের জন্য আর্থিক সাহায্য চাইতে উনি দিল্লিতে গিয়েছেন। সেখান থেকে কি ফিরেছেন? টুবাই হয়তো জানে। নাহ্, যা করার, আজ রাতেই করতে হবে। পুরন্দরদাকে একবার কোর্টে চালান করে দিলে, পরে বের করে আনা খুব মুশকিল হয়ে যাবে।

ছটফট করতে করতে গোরা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'টুবাই ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার কাছে আসে। যেভাবেই হোক, প্রতাপ পট্টনায়েকের সঙ্গে আজ কথা বলতে হবে। তুই এখন যা মুকুন্দ। আমাকে একটু একা থাকত দে।'

কথাগুলো ও এমন আদেশের সুরে বলল যে, মুকুন্দ আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর গোরা দেওয়ালে টাঙানো শ্রীকৃষ্ণের ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখ বুজে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেই জুঁই আর চাঁপার সৌরভ অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, পা টেনে টেনে ও বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। ভুবনেশ্বর থেকে ফেরার পর থেকে, ঝড়জলের জন্য বারান্দার দিককার দরজাটা ও খোলেনি। দরজাটা খুলতেই গোরা সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাঁদিকে তাকাতেই ও চমকে উঠল।

আকাশে ঘন অন্ধকার। তা সত্ত্বেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিশাল রামধনু। নিয়নের আলোর মতো উজ্জ্বল সাতটা রঙ। রাতের অন্ধকারে রামধনু উঠেছে! এ কীসের ইঙ্গিত? ভাবার মাঝেই রেলিংটা শক্ত করে ধরে ফেলল গোরা।

অষ্টাশি

ভুবনেশ্বরের বাড়িতে মায়ের শোয়ার ঘরে দেবদাসী সাজে মায়ের একটা ছবি টাঙানো আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ছবিটা দেখেছে গোরা। সেই ছবিটা ও এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। আগে কখনো খুঁটিয়ে দেখেনি। এইমাত্র ওর নজরে পড়ল, নৃত্যরতা মায়ের পাশে আরও একজনকে দেখা যাচ্ছে। দেবদাসীরই সাজে প্রিয়া। ওর দিকে তাকাতেই ছবিটা হঠাৎ চলতে শুরু করল। গোরা নিজেকে আবিষ্কার করল জগন্নাথের মন্দিরে। সন্ধ্যারতির পর মন্দির প্রাঙ্গণ প্রদীপের আলোয় সাজানো হয়েছে। দেবদাসীদের নৃত্য প্রদর্শন চলছে। প্রিয়া গাইছে, 'রতিসুখ সারে গতম অভিসারে মদনমোহন বেশং, ধীরে সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।' ভক্তদের মাঝে ও বসে রয়েছে নিমীলিত চোখে। গানের এই লাইনটা শুনে মন চঞ্চল হয়ে উঠল ওর।

প্রিয়া গুর্জরি রাগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই পদটি গাইছে। যমুনার তীর, বনের মাঝে মদনমোহন বেশে শ্রীকৃষ্ণ। গান শুনতে শুনতে চোখের সামনে এই ছবিটা ফুটে উঠতেই গোরা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। শ্রোতাদের মাঝখান থেকে উঠে ও নাচতে শুরু করল। যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। নাচতে নাচতেই ওর মনে হল, না, এই জীবন আর ও রাখবেই না। শ্রীকৃষ্ণকে না পেলে ও যমুনার জলেই নিজেকে বিসর্জন দেবে। রাধাকে পেলে ও শ্রীকৃষ্ণকে পেতেও পারে। রাধা ভ্রমে প্রিয়াকে আলিঙ্গন করার জন্য ও ছুটে গেল। সঙ্গীরা উঠে গিয়ে ওকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু গোরার তখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। ওকে ধরে রাখে সাধ্য কার? দেবদাসীরা ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। নৃত্য অনুষ্ঠান ভণ্ডুল। ভীত চোখে প্রিয়া মাকে জড়িয়ে ধরেছে। মন্দিরের সেবাইতরা কুপিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন গোরার দিকে। পরিস্থিতি জটিল দেখে সঙ্গীরা গোরাকে ধরে জোর করে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এল।

এই দৃশ্যটা দেখার কথা নয় গোরার। দেবদাসীদের প্রথা কবে বাতিল হয়ে গিয়েছে। অথচ সারারাত ধরে গোরা এইসব অলীক দর্শন করছে। ঘণ্টা পাঁচেক আগে ও না কি বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। টুবাই সেই সময় দেখতে পেয়ে ওকে বারান্দা থেকে টেনে আনে। সত্যিই কি ও পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল? অনেক চেষ্টা করেও গোরা তা মনে করতে পারেনি। অনেক ভেবে আবছা আবছা একটা কারণ খুঁজে পাচ্ছিল। রাতের আকাশে রামধনু দেখার পর ওর মনে হয়েছিল, মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার ওর চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। রামধনুর আশপাশে একে একে দেবতারা এসে

দাঁড়াচ্ছিলেন। ওঁরা বিষ্ণু বন্দনা শুরু করে দিয়েছিলেন। আকাশময় সাদা আলোর ছটায় গোরার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত চোখ সরিয়ে ফের সমুদ্রের দিকে তাকাতেই ও দেখেছিল, বিপুল জলরাশি থেকে সাদা ঢেউ উঠে আসছে। গম্ভীরার চারতলায় এসে আছড়ে পড়ছে। ওই অন্ধকারের মধ্যেও সমুদ্রের নীল রঙ গোরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ। মনে হয়, তাঁকে আলিঙ্গন করার বাসনাতেই গোরার তখন ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করেছিল সমুদ্রে। .

টুবাই যখন ওকে টেনে ঘরের ভিতর ঢোকানোর চেষ্টা করছে, তখন গোরার শরীরে অসুরের শক্তি। ইচ্ছে করলে টুবাইকে নিয়েই গোরা জলে ঝাঁপ দিতে পারত। কিন্তু টুবাই তখনই কানের কাছে হরির নাম জপ করতে লাগল। তারপরই গোরা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। টুবাই ওকে ধরে নিয়ে এসে মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছিল। ওর হাঁকডাকে তখন ঘরের ভিতর এসে পড়েছে রেড্ডিকাকা, রাসবিহারীবাবু, জয়দেব আর মুকুন্দ। ওরা সবাই মিলে হরিসংকীর্তন শুরু করেছিল। শুনতে শুনতে গোরার ঘোর কেটে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর ও স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, 'তোমরা যাও টুবাই। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। প্রভু জগন্নাথের জন্য আমার মন আকুলি-বিকুলি করছে। আমি তাঁর ভজনা করব।'

কথাগুলো বলেই গোরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আর খানিক পরেই মায়ের দেবদাসী সাজের ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ওর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল। যে মায়ের কোলেপিঠে ও মানুষ হয়েছে, তিনি ওর গর্ভবতী মা নন। যে মানুষটাকে বাবা বলে ও জেনে এসেছে, তাঁর ঔরসেও ওর জন্ম হয়নি। চব্বিশ বছর পর এই সত্য আবিষ্কার করে গোরা বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। বাবাকে ভালো করে বোঝার সুযোগ কোনওদিন ওর হয়নি। বাবা সর্বদা মায়ের রূপছটার আড়ালেই থেকে গিয়েছেন। বাবাকে ও দেখতে পেত নাটমন্দিরে সকালে পুজোর সময়, অথবা সন্ধ্যায় পাঠরত অবস্থায়। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাবার মধ্যে কোনওরকম হীনমন্যতা গোরা লক্ষ করেনি। অত্যন্ত বিচক্ষণ, শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চবর্ণের মানুষদের মতোই ছিলেন উনি। সর্বদা সদ্‌শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ওকে।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ভুবনেশ্বরে ওদের বাড়ির নাটমন্দিরে বাবাকে এখন দেখতে পাচ্ছে গোরা। নির্জন নাটমন্দির। সিলিং থেকে ঝোলানো বিজলি বাতির বৃত্তে বাবা পদ্মাসনে বসে। তাঁর সামনে ছোট্ট টুল। তার উপর রাখা সরলাদাসের মহাভারত। অনুচ্চ স্বরে বাবা স্বর্গারোহণ পর্ব পড়ছেন। স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন, দেবতাদের সঙ্গে একই আসনে বসে আছেন দুর্যোধন। তাঁকে দেখেই রাগে জ্বলে উঠলেন যুধিষ্ঠির। কুপিত স্বরে বললেন, দুর্যোধনের মতো পাপীর সঙ্গে তিনি স্বর্গে বসবাস করবেন না। মহামুনি নারদ তখন যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'অতীতে যা ঘটেছে, সব ভুলে যাও।' বাবাকে অনেকবার এই পর্ব পড়তে শুনেছে গোরা। ও জানে, এরপর যুধিষ্ঠির, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত তাঁর ভাই, আত্মীয়স্বজন ও মিত্রপক্ষের যোদ্ধাদের দেখতে চাইবেন। ফলে স্বর্গে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে একবার নরকদর্শন করতে হবে।

গোরা প্রশ্ন করত, 'রোজ রোজ একই পুঁথি পড়েন কেন বাবা?'

'রোজ মহাভারত পাঠ করলে যে পাপমুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মলাভ করা যায়। যিনি শোনেন, তিনিও পাপমুক্ত হতে পারেন। শোনো গোরা, মহাভারতে যা আছে, তা অন্য ধর্মগ্রন্থে থাকতে পারে। কিন্তু যা মহাভারতে নেই, তা অন্য কোথাও নেই। অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্ত ধর্মগ্রন্থাদি, বেদ-বেদাঙ্গ একদিকে, কেবল মহাভারত আর এক দিকে বাবা। তুমিও বড়ো হলে মহাভারত পড়বে।'

নাটমন্দিরে পঠনরত বাবার ছবিটা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। বাবার কথা মনে পড়ায় গোরার চোখের কোণ ফের ভিজে উঠল। বাবার কথামতো ও বহুবার মহাভারত পড়েছে। কলকাতায় পড়াশুনোর দিনগুলোতে ও সময় পেলেই মহাভারত নিয়ে বসে যেত। পড়তে ওর অদ্ভুত লাগত। যেন ম্যাজিক রিয়েলিজম। যেখানে দেবতা আর মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা। মুনিঋষি, এমনকী দৈত্য-দানবরাও হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করেন। তাঁরা এমন সব বর পান, যা অবিশ্বাস্য। প্রবল পরাক্রমী প্রচুর রাজার হদিশ পাওয়া যায় মহাভারতে। যাঁদের প্রধান কাজই হল যজ্ঞ করা। তাঁরা যেসব অস্ত্র নিয়ে লড়েন, তার কাছে এখনকার সমরাস্ত্র তুচ্ছ। মুনিঋষিরা কথায় কথায় শাপ দেন। সে সব ফলেও যায়। কোনওকিছুই যেন অসম্ভব নয় মহাভারতে। পুত্রলাভার্থে রাজার স্ত্রীও মুনিঋষির সঙ্গে শুয়ে পড়তে পারেন। নারীগর্ভের কোনও প্রয়োজন নেই। মনুষ্যজন্মের জন্য মাছের পেট, শরের ঝোপ, এমনকী কলসীও জরায়ুর কাজ চালাতে পারে। সামাজিক ব্যবস্থা এমন, দশমবর্ষীয়া বালিকাকে বিয়ে করতে হয় তিরিশ বছর বয়স্ক পুরুষকে। মহাভারতে এমনও সরোবরের কথা উল্লেখ আছে, যেখানে স্নান করলে পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন।

মহাভারতে বরাবরই শ্রীকৃষ্ণকে রহস্যময় চরিত্র বলে মনে হত গোরার। তখন ওর যুক্তিবাদী মন। সবে ও অদ্বৈতবাবুর সান্নিধ্যে এসেছে। দলিতদের হিতসাধনে ব্যস্ত। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ওর ঈশ্বর বলে মনে হত না। ওর মনে হত, শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুলের অভিজাততন্ত্রের এক প্রধান মাত্র। কিন্তু প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থানীয়। উদ্‌যোগ পর্বে ওই অংশটা পড়তে ওর খুব ভালো লাগত, যেখানে পাণ্ডবদের দূত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করার মতলব করছেন দুর্যোধন। সেটা আন্দাজ করে শ্রীকৃষ্ণ সভাসদদের বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন। সভাসদরা সবাই অভিভূত। কিন্তু দুর্যোধনের আস্ফালন আর থামে না। দুর্যোধন হলেন সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের বৈবাহিক। তিনিও বিশ্বাস করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে। ...সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত কী পালটে গিয়েছে। সেই শ্রীকৃষ্ণই এখন গোরার আরাধ্য দেবতা, সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই গোরার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। মেঝেতে ও মাথা ঠুকতে লাগল। মুখ ঘষতে থাকল। নির্জন ঘরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'দেখা দাও, হে প্রভু দেখা দাও।' চোখের জলে মেঝে সিক্ত হয়ে গেল। অনেক পরে গোরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। কোনও এক পর্বতমালায় ও হাজির হয়েছে। সেখানে শূন্যে বিশাল বিশাল সব গাছ। তারা মেঘ ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই গাছের উপর

বিরাট এক মন্দির। ভাসমান অনেক সিঁড়ি পেরিয়ে ও মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গোরা যা দেখল, তাতে চমকে উঠল। ও দেখল, একটা বেদির উপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁর হাত ও পা কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এ কী দেখছে ও! শ্রীকৃষ্ণকে কে বন্দি করে রেখেছেন? কার এমন সাধ্য? গোরা দৌড়ে গিয়ে বন্ধন খুলে দিতে গেল। কিন্তু বেদির কাছে পৌঁছনোর আগে কে যেন ওকে তুলে ধরে শূন্যে ছুড়ে দিল। ভয়ে গোরা চিৎকার করে উঠল।

...'কী হয়েছে প্রভু? পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে?'

চোখ খুলেই গোরা দেখল, ঘরের ভিতর মুকুন্দ এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখমুখে মারাত্মক উদ্বেগ। ছেলেটা সামান্য কারণেই বিচলিত হয়ে ওঠে ওর জন্য। দেখে খুব মায়া হল বলে, গোরা বলল, 'না, ব্যথা করছে না। তুই এখনও জেগে আছিস কেন রে?'

'টুবাইদাদারা এখনও যে ফেরেননি থানা থেকে।'

'হয়তো বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছে। আমার পায়ের কথা তোকে ভাবতে হবে না। তুই যা, একটু ঘুমিয়ে নে। তোকে দেখেই মনে হচ্ছে, ঢুলে পড়ে যাবি।'

পায়ের ক্ষতের কথা গোরা ভুলেই গিয়েছিল। মুকুন্দ দরজার দিকে পা বাড়াতেই এবার ও পায়ের দিকে তাকাল। পায়ের পাতা ফুলে ঢোল, লাল হয়ে গিয়েছে। ক্ষতস্থান দিয়ে রস বেরিয়ে আসছে। দিন দুয়েক আগে টুবাই শরৎ ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল। উনি ওষুধ লাগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষত নিরাময়ের কোনও লক্ষণ গোরা দেখতে পায়নি। ক্ষতের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ গোরার ঋষি পরাশরের কথা মনে হল। উনি বলেছিলেন, বিশল্যকরণী লাগালে দ্রুত ক্ষত সেরে যাবে। লাগিয়ে পরখ করবে না কি? মেঝের এক কোণে পাথরের দুটি বাটি রাখা আছে। তার একটাতে আছে বিশল্যকরণী। কথাটা মনে হতেই সেদিকে তাকিয়ে গোরা বলল, 'এই শোন মুকুন্দ, একটু দাঁড়া। ওই যে দুটো বাটি দেখছিস, আমার হাতের কাছে এনে দে তো।'

বাটি দুটো হাতে নিয়ে মুকুন্দ অবাক গলায় বলল, 'এতে কী আছে প্রভু? আপনাকে কে দিয়ে গেল?'

উত্তর না দিয়ে গোরা বলল, 'এবার তুই যা। থানা থেকে সবাই ফিরলে, একবার আমার কাছে নিয়ে আসিস, কেমন?'

মুকুন্দ বেরিয়ে যাওয়ার পর বাটি দুটোর দিকে তাকাল গোরা। একটার ভিতর তৈল পদার্থ। অন্যটিতে শিকড়বাটা জাতীয় কিছু। তৈলটা কি অগ্নিবলা? হ্যাঁ, তাই হবে। চোখের পাতায় লাগালেই ভবিষ্যৎ দেখা যাবে। নিশ্চিত হয়ে গোরা অন্য বাটি থেকে কিয়ৎ পরিমাণ শিকড়বাটা তুলে নিয়ে ক্ষতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চিনচিনে ব্যথাটা কর্পূরের মতো উবে গেল। ক্ষতের জায়গায় ঠান্ডা প্রলেপ অনুভব করল গোরা। হ্যাঁ, এটাই তাহলে বিশল্যকরণী। এই ভেষজ ওষুধ লাগানোর পরই তো শক্তিশেলে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা মনে পড়ায় বাটি থেকে আরও কিছুটা ভেষজ পদার্থ তুলে নিয়ে গোরা ক্ষতস্থানে লাগাল। কিছুক্ষণ পরই ও টের পেল, পায়ের ব্যথাটা আর নেই। সারা শরীর ক্লান্তিতে

ভেঙে পড়ছে। চোখ বুজে আসছে। ক্ষতের কারণে বেশ কিছুদিন ও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমোলেও অল্প সময়ের মধ্যে ফের জেগে উঠেছে। শারীরিক আরামের কারণেই ধীরে ধীরে ও গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

...কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল গোরা জানে না। ও ফের চোখ খুলল মুকুন্দর ডাকে, 'প্রভু উঠুন। চিফ মিনিস্টার আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছেন।'

এই দুর্যোগে চিফ মিনিস্টার দিল্লি থেকে ফিরতে পেরেছেন কি না, সে প্রশ্নটা গোরার মনে জাগল না। ও বলল, 'কেন পাঠিয়েছেন, জিগ্যেস করেছিস।'

'আপনাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে এসেছেন উনি। চিফ মিনিস্টার না কি মন্দিরে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য। জরুরি দরকার।'

মন্দিরে যাওয়ার কথা শুনে প্রাণ নেচে উঠল গোরার। ভোর পাঁচটার আগে মন্দির খুলবে না। তবে কি ভোর হয়ে গিয়েছে? ও জিগ্যেস করল, 'ক'টা বাজে রে মুকুন্দ?'

'বেলা আটটা-সাড়ে আটটা হবে।'

'টুবাইরা ফিরেছে?'

'না এখনও ফেরেননি। আমার মনে হয়, ওঁরাও মন্দিরে গিয়েছেন। প্রভু আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমিও আপনার সঙ্গে মন্দিরে যাব। আপনাকে একা ছাড়ব না।'

'তাহলে ভদ্রলোকটাকে একটু অপেক্ষা করতে বল। আমি চোখ মুখে জল দিয়ে আসি।'

কথাগুলো বলেই গোরা উঠে দাঁড়াল। কাচে পা কেটে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম কারও সাহায্য ছাড়া ও হাঁটছে। দু'এক পা বাড়ানোর পর, পায়ে কোনও ব্যথা টের পেল না। কথাটা মনে হতেই গোরা পায়ের দিকে তাকাল। ক্ষতের কোনও চিহ্নই নেই। দেখে ও অবাক হয়ে গেল। ঋষি পরাশর তাহলে ঠিকই বলেছিলেন। যাক, এখন তাহলে মন্দিরের ভিতর ঢোকার কোনও বাধা নেই। মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, বিস্ফারিত চোখে ও পায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়তো ভাবছে, রাতারাতি ক্ষত সেরে গেল কী করে? ও তো আর বিশল্যকরণীর কথা জানে না। কথাটা কাউকে বলারও দরকার নেই। মুচকি হেসে গোরা স্নানঘরে ঢুকে গেল। চট করে মুখ-চোখে জল দিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, 'চল, মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক। প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করে আসি।'

নিচে হোটেলের রিশেপসনে নেমে আসতেই, চিফ মিনিস্টারের পাঠানো ভদ্রলোক গড় হয়ে ওকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু আমার একটা নিবেদন আছে। সি এম আপনাকেই শুধু নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে যদি কেউ যেতে চান, তিনি সোজা মন্দিরে চলে যেতে পারেন।'

কিন্তু মুকুন্দ কিছুতেই রাজি নয়। অনেক কষ্টে গোরা ওকে বুঝিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। চারদিন আগে ও যখন গম্ভীরায় ঢুকেছিল, তখন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ বৃষ্টির প্রকোপ অতটা নয়, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। অন্য দিন এইসময় পুরী শহরের এইদিকটা জমজমাট থাকে। দোকানপাট খুলে যায়। লোকজন, রিকশায় পথ চলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। পুরীকে আজ মনে হচ্ছে প্রেতপুরী। বাহ্যিক অসঙ্গতি

অবশ্য গোরার মনে রেখাপাত করছে না। ও বিহ্বল হয়ে আছে, জগন্নাথ দর্শনের প্রত্যাশায়।

রত্নবেদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। চোখ বুজে আউড়ে যাবে জগন্নাথদেবের স্তব। সুরেলা কণ্ঠে গাইবে সেই গীত, 'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'

প্রতিদিন পশ্চিম দিকে ব্যাঘ্র দ্বার দিয়ে মন্দিরে ঢোকে গোরা। বেরিয়ে আসে সিংহদ্বার দিয়ে। আজ নিচের দিকে কাঠের পাল্লা কেটে, পিতলের চাদরে মোড়া যে ছোট্ট দরজাটা আছে, সেটা খোলা। বিশেষ প্রয়োজনে এই দরজাটা ব্যবহার করে সেবাইতরা। নিচু হয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার আগে গোরার চোখে পড়ল, বাইরে দু'পাশের সিংহ মূর্তির সামনে কয়েকজন বলশালী মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই সিকিওরিটির লোকজন। চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে রয়েছে। দরজার ভিতরে মন্দিরের প্রবেশপথের দু'পাশে উঁচু পাথরের বেদি। তাতেও কিছু লোক বসে। বেদির উপরে উত্তরদিকের দেওয়ালে পতিতপাবনের একটা তৈলচিত্র রয়েছে। পূর্বদিকে মুখ করে। রোজ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওই ছবিতে একবার প্রণাম করে গোরা। অভ্যাসবশত আজও করল। জগন্নাথদেবই যে পতিতপাবন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় গোরা লক্ষ করল, সিংহদ্বারের ছোট্ট দরজাটায় খিল দেওয়া হচ্ছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করার কথা নয়। কোনওদিন হয়নি। পিছনদিকে একবার তাকিয়ে, গোরা একটু অবাক হল। কিন্তু কোনও কথা না বলে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। খানিক পরে গরুড় স্তম্ভের কাছে গিয়ে ও দেখল, রত্নবেদিতে দারুমূর্তিগুলো সব চাদর দিয়ে ঢাকা। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। রোজ এই সময়টায় সকাল ধূপ অর্থাৎ সকালের ভোগ দেওয়া হয়ে যায়। আজ তার কোনও লক্ষণ দেখতে পেল না গোরা। আজ কি তাহলে আলাদা কোনও পার্বণ আছে? প্রভুকে কি পর্দার আড়ালে রাখা হবে? বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের মতো। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিকে পর্দার আড়ালে রাখা হয়। দিনান্তে খোলা হয় ঝাঁকিদর্শনের জন্য! নাকি অন্য কোনও কারণ আছে? এমনও হতে পারে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঠিক সময়ে সেবাইতরা আসতে পারেননি। নাহ্, তা তো সম্ভব নয়! মন্দিরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

গরুড় স্তম্ভ স্পর্শ করে, চোখ বুজে গোরা প্রভু জগন্নাথের অনিন্দ্যরূপ দর্শন করতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল,

'হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপামাং বিততিমপারাং যাদবপতে
অহো দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।'

জগন্নাথ স্তবে বিভোর হয়ে থাকার সময়ই গোরা টের পেল, কে একজন ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কী যেন বলছে। নিচের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, প্রিয়ার বয়সি একটা মেয়ে। মনে হয়, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসেছে। পরনের শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। যৌবন ফুটে বেরোচ্ছে। মেয়েটা হাউহাউ করে কাঁদছে। প্রভা পাণিগ্রাহীর কথা মনে হওয়ায় গোরা সতর্ক হয়ে গেল। পিছু হটে ও জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে মা?'

মেয়েটা হাতজোড় করে বলল, 'আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান মহাপ্রভু। উনি মৃত্যুশয্যায়।'

গোরা বলল, 'কোথায় তোমার স্বামী?'

'কল্পবটের নিচে শুয়ে আছেন। শ্বাস তুলছেন। একটু আগে চিফ মিনিস্টার আমাকে বললেন, আপনি না কি মন্দিরে এসেছেন। খুঁজতে খুঁজতে আপনার কাছে এলাম। শুনেছি, জগৎপুরে আপনার স্পর্শে মৃতমানুষ উঠে বসেছে। একমাত্র আপনিই পারেন আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে।'

'তুমি ভুল শুনেছ মা। অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। প্রভু জগন্নাথকে মন দিয়ে ডাকো। উনি ইচ্ছে করলে তোমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'দয়া করে কল্পবটের কাছে চলুন মহাপ্রভু। একবার। ওখানে চিফ মিনিস্টারও আছে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

প্রতাপ পট্টনায়েকের নাম শুনে গোরা বলল, 'চলো তাহলে।'

মুক্তিমণ্ডপে পা দিয়েই গোরা দেখতে পেল কল্পবটের নিচে বেদিতে একজন শুয়ে আছেন। তাঁর কাছাকাছি দু'তিনজন দাঁড়িয়ে। তাঁদের একজনকে ও চিনতে পারল, পদ্মনাভ। কিন্তু প্রতাপ পট্টনায়েক কোথায়। তাঁকে তো দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গোরা বেদির কাছে যেতেই শয়ান অবস্থা থেকে লোকটা উঠে বসল। তারপর হাতজোড় করে বলল, 'আসুন মহাপ্রভু। আপনাকে দেখেই আমি ভালো হয়ে গেছি।' কথাগুলো বলেই লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল।

তাকে দেখেই গোরা চিনতে পারল। টিভিতে দেখেছে। গোবিন্দ সাহু, হোম মিনিস্টার। তাহলে গোবিন্দ সাহুই ফাঁদে ফেলে ওকে মন্দিরে নিয়ে এসেছেন! চন্দন তাহলে ঠিকই বলেছিল। মনে মনে গোরা প্রভু জগন্নাথকে ডাকতে লাগল।

উননব্বই

কাছেপিঠে কোথাও কড়াৎ কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। কানে তালা ধরে গেল গোরার। প্রকৃতির রোষ যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কল্পবট সংলগ্ন এলাকায় আধো অন্ধকার। গোবিন্দ সাহুর সঙ্গীরা অত কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, বৃষ্টির কারণে তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না গোরা। লোকগুলোকে প্রেতের মতো মনে হচ্ছিল ওর। কী হিংস্র তাদের শরীরী ভাষা। পরনে বেগুনি রঙের ধুতি ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। মাথায় বেগুনি উত্তরীয়, ঘোমটার মতো দেওয়া। কারও চোখ-মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না গোরা। চারদিক থেকে এগিয়ে এসে লোকগুলো ওকে ঘিরে ফেলল।

বেদি থেকে নেমে এলেন গোবিন্দ সাহু। তারপর ওর সামনে এসে হাতজোড় করে বললেন, 'আপনার দর্শন পেয়ে আমি আজ ধন্য হলাম মহাপ্রভু। আপনি স্বয়ং অবতার।

লোকে বলে আপনি না কি প্রভু জগন্নাথের থেকেও বড়ো। আমি পাপী মানুষ, আপনার কাছে আসার সাহস পাইনি এতদিন।'

গোবিন্দ সাহু যে ব্যঙ্গ করে কথাগুলো বলছেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই গোরার। ওকে কেন মন্দিরে ডেকে আনল, সেটা জানার জন্য ও জিগ্যেস করল, 'ভনিতা ছেড়ে আসল কথা বলুন গোবিন্দ।'

'আপনি জানেন না? আপনার তো জানা উচিত। আপনার প্রধান শিষ্য...প্রতাপ পট্টনায়েকের দালাল সাংবাদিক কী নাম যেন তার তাকে তো বেশ কয়েকদিন কথাগুলো ফোনে আমি বলে দিয়েছি। উনি কিছু বলেননি আপনাকে?'

'কী বলেছেন শুনি?'

'তেমন কিছুই না। বলেছিলাম, ভগবদ্ভক্তি আপনি প্রচার করুন। সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু ওড়িশার মাটিতে নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আপনারা কলকাতায় চলে যাবেন ততই আপনাদের পক্ষে মঙ্গল। তা, আপনি তো আমার কথা শুনলেনই না।'

'কেন, ওড়িশার মাটিতে নয় কেন?'

'আপনি এখানে লোক ঠকাচ্ছেন বলে।' কথাগুলো বলেই গোবিন্দ সাহু গলার স্বর পালটে ফেললেন। গোরার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হিসহিস করে বললেন, 'তুই যে মহাপুরুষ না...আসলে এক মহাভণ্ড, আজই তা প্রমাণ করে দেবো।'

গোরাও বলার ভঙ্গি বদলে ফেলে বলল, 'তুই প্রমাণ করার কে মূর্খ? তুই তো ক্ষমতালোভী এক পাষণ্ড।....তুই প্রতারক। না হলে মিথ্যে কথা বলে আমাকে মন্দিরে টেনে আনতিস না।'

চিৎকার করে উঠলেন গোবিন্দ সাহু, 'তোর ইতিহাস তো আমি জানি। দলিত পার্টির নেতা থেকে আচমকা মহাপুরুষ হয়ে গেলি কী করে রে তুই? সাদাসিধে, ধর্মভীরু ওড়িয়াদের চোখে ভগবান। কিন্তু তুই কি জানিস, কলকাতায় যে দলিত মানুষগুলোকে তুই নাচিয়েছিলি, আজ তাদেরই একজন তোকে খুন করার জন্য পাগলা হয়ে গেছে। শোন রে ভণ্ড, মন্দিরে তুই যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি, সে এখন নজরবন্দি হয়ে রয়েছে ভুবনেশ্বরে। রাজদণ্ড এখন আর তার হাতে নেই, বুঝলি?'

'কে বলল, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি? আমি এসেছি প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য। তুই পাপী, তুই এর মর্ম বুঝতে পারবি না।'

'মর্ম বোঝার দরকারও নেই। আমি রাজনীতি করে খাই। তোর রঙ বদলের কারণটা আমি বুঝতে পারছি। তুই পুরীতে এসেছিস, দলিত পার্টির শক্তি বাড়াতে। দিল্লিতে তোদের নেতা কেশবজির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনিই বললেন, ওড়িশায় তোকে পাঠানো হয়েছে আদিবাসী এরিয়ায় দলিত পার্টির ইমেজ বাড়ানোর জন্য। দলিত মানুষ তত্ত্ব বোঝে না। ধর্ম মানে। সেই রাস্তাতেই তুই এগোনোর চেষ্টা করেছিলি। কিন্তু আর কোনও সুযোগ তোকে আমি দেব না। ভবিষ্যতে ওড়িশার মানুষ যাতে কোনওদিন তোর নাম উচ্চারণ না করে, তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

'তোর কি মনে হয় গোবিন্দ, ওড়িশায় দলিত পার্টির শক্তি বাড়ানোর জন্য আমি পুরীতে আছি?'

'সে উত্তরটা তোকে দিতে যাব কেন? তবে জেনে রাখ, ওড়িশায় তোর ভক্তদের ছোটো বড়ো কোনও নেতা আর বোধহয় বেঁচে নেই। গত দু'দিনে লোক পাঠিয়ে সবাইকে আমি হত্যা করেছি। এমন প্যানিক ছড়িয়ে দিয়েছি, এখন রাস্তা দিয়ে তুই হেঁটে গেলে, একটা মানুষকেও সঙ্গে পাবি না। মানছি, তোর মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। তোর এমন ক্ষমতা, প্রতাপ পট্টনায়েকের মতো ঝানু একজন পলিটিশিয়ানকেও তুই পকেটে পুরে ফেলেছিস। তোর জন্যই লোকটা রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছে। পার্টির পক্ষে যেটা ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুটো বাই ইলেকশনে আমরা হেরে গিয়েছি। এর জন্য দায়ী একমাত্র তুই। তোকে ক্ষমা করা সম্ভব না।'

'তুই ক্ষমা করা না করার কে গোবিন্দ? আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, তাহলে আমায় শাস্তি দেবেন। প্রভু জগন্নাথ। শোন পাষণ্ড, আমার উপর তোর রাগের কারণটা কিন্তু আমি জানি।'

'কী জানিস, তুই?'

'চিফ মিনিস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তুই ষড়যন্ত্র করছিস। কেন গোবিন্দ?'

'সে কৈফিয়ত তোকে দেব কেন? শোন, প্রশ্ন করার কোনও অধিকার তোর নেই। তোর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আমার দফতরে জমা পড়ে আছে। আজ তোর বিচার হবে।'

'শুনি, এক এক করে অভিযোগগুলো বল আমাকে।'

ঠিক সেই সময় আকাশ জুড়ে বিজলির চমক। রুপোলি রেখাগুলো এক প্রান্ত থেকে ছুটে গেল অন্য প্রান্তে। সেই আলোয় গোবিন্দ সাহুর মুখটা ভালো করে দেখতে পেল গোরা। বাজ পড়ার বিকট আওয়াজ যাতে শুনতে না হয়, সেই কারণে কানে হাত দিয়ে রেখেছে গোবিন্দ সাহু। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ওর ভীতসন্ত্রস্ত মুখটা দেখে করুণা হল গোরার। কড়াৎ কড়াৎ করে কোথাও বাজ পড়ল। আওয়াজ থামার পর গোবিন্দ সাহু বলল, 'তোর বিরুদ্ধে অবৈধ যৌনসম্পর্ক, ধর্মীয় জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা...কী নেই। এমনকী, ধর্ষণের পর প্রভা পাণিগ্রাহী বলে একটা মেয়েকে খুনের অভিযোগও রয়েছে।'

'প্রভা পাণিগ্রাহীকে তুই কেন পাঠিয়েছিলি, তার প্রমাণ কিন্তু আমার কাছে ছিল। সেটা আমি পুরীর কালেক্টরের হাতে তুলে দিয়েছি।'

'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। তুই যে একটা লম্পট, তার প্রমাণ দিতে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন। লক্ষ্মীমণি বলে এক ধনী বিধবা। গম্ভীরা হোটেলে যার বালক সন্তান তোর কাছে রোজই আসত। সেই বালকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তুই লক্ষ্মীমণির সতীত্ব হনন করার চেষ্টা করেছিলি। মনে আছে, এই তো মাস তিনেক আগের ঘটনা।'

'মিথ্যে কথা। প্রভু জগন্নাথই জানেন, কেন ওই মহিলাকে আমি দূর করে দিয়েছিলাম। আমার পার্ষদরাও সে কথা সবাই জানে।'

'কথায় কথায় প্রভু জগন্নাথকে টেনে আনছিস কেন শয়তান? প্রভু জগন্নাথকে তো তুই মানিসই না। শোন, তোর বিরুদ্ধে পান্ডা মহারাজদের অনেক অভিযোগ...।' কথাগুলো বলেই গোবিন্দ সাহু ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই, পদ্মনাভ পান্ডা কই... মহাপ্রভুর সামনে আপনি একবার আসুন। বলুন, আপনি কী বলতে চান।'

ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলেন পদ্মনাভ পান্ডা। পুরন্দরদার মুখে এই লোকটার নিষ্ঠুরতার অনেক ঘটনা শুনেছে গোরা। শান্ত সৌম্য চেহারার আড়ালে একটা লোকের মধ্যে এত বিষ থাকতে পারে, দেখে ওর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। পদ্মনাভও শুরু করলেন গোবিন্দ সাহুর ঢঙে, 'পাঁচশো বছর ধরে আপনাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি মহাপ্রভু। বংশ-পরম্পরায় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আমার সৌভাগ্য, আজ আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। ওড়িয়া জাতির কল্যাণে আমার এক পূর্বপুরুষ দীনবন্ধু প্রতিহার যে দায়িত্বটা আমাদের হাতে সঁপে গিয়েছিলেন, আশীর্বাদ করুন, সেই কাজে আজ যাতে আমি সফল হতে পারি।'

গোরা কিছুই বুঝতে পারল না। ও প্রশ্ন করল, 'কে দীনবন্ধু প্রতিহার? কী দায়িত্বই বা তিনি তোমাদের দিয়ে গিয়েছেন?'

'পূর্বজন্মের কথা কি মহাপ্রভুর কিছুই মনে নেই? আপনার অবতারত্ব নিয়ে আমার ঘোর সন্দেহ এসে যাচ্ছে মহাপ্রভু। লোকে বলে আপনি স্বয়ং ঈশ্বর। যদি তাই হন, তাহলে আপনি ত্রিকালদর্শীও হবেন। তাহলে কেন মনে করতে পারছেন না দীনবন্ধু প্রতিহার কে? আমাদের সেই পরমপুরুষ, যিনি আপনাকে হত্যা করেছিলেন। যাতে আপনি বৈকুণ্ঠলোকে যেতে পারেন। সেই জন্মে পঞ্চসখাকে আপনি বলে গিয়েছিলেন, পাঁচশো বছর পর ফের আবির্ভূত হবেন। তাঁরাই পুঁথি লিখে এতদিন আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এবার অবশ্য সেই সুযোগ আপনি পাবেন না। এ জন্মে আপনার পঞ্চসখা...কী নাম যেন তাদের...টুবাই, জয়দেব, রেড্ডিকাকা, রাসবিহারী আর পুরন্দরকে আমরা বন্দি করে রেখেছি। আপনাকে হত্যা করে, তারপর তাঁদেরও...।'

এইরকমই একটা সন্দেহ গোরার মনে দানা বাঁধছিল। টুবাইদের জন্য হঠাৎ ওর মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

ও বলল, 'তোমার সঙ্গে তো কোনও শত্রুতা নেই পদ্মানাভ। কেন আমাকে হত্যা করবে?'

গলার স্বর বদলে ফেললেন পদ্মনাভ, 'শত্রুতা আছে। পাঁচশো বছরের পুরনো শত্রুতা। আগের জন্মে তুই আমাদের ভাতে মারার উপক্রম করেছিলি। এই জন্মেও সেটা করে যাচ্ছিস। এই মন্দির ঘিরেই আমাদের রুটি রোজগার। কিন্তু ভক্তরা এখন মন্দিরেই আর আসছে না। আগে তোকে দেখার জন্য গম্ভীরায় যাচ্ছে। তারপর মন্দিরে আসছে। তোর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। মন্দিরে বসে প্রভু জগন্নাথকে অবজ্ঞা করে তুই নিজের পুজো নিয়েছিস। বহুবার দারুমূর্তি ছোঁয়ার চেষ্টা করে অপবিত্র করে দিয়েছিস পুজোর উপকরণ। ভক্তদের তুই বোঝাচ্ছিস, তুই প্রভু জগন্নাথের অংশ।'

'সেটাই যে সত্যি পদ্মনাভ। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমাকে হত্যা করে তুই মহাপাপ করবি পদ্মনাভ।'

'আমি তা মনে করি না। শোন রে ভণ্ড, তোকে একটু পরেই বৈকুণ্ঠে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তোকে হত্যা করে এই মন্দিরেই, তোর শবদেহটা আমরা পুঁতে ফেলব। মন্দিরের বাইরে কেউ জানতেই পারবে না, শেষ মুহূর্তে তোর কী হয়েছিল। বৈকুণ্ঠে যাওয়ার আগে শুনে যা, তোর শিষ্য...প্রতাপ পট্টনায়েকও জানেন, আজ তোর কপালে কী লেখা আছে। আই বি-র লোকেরা হয়তো এতক্ষণে ওঁকে খবরও দিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও, তোকে বাঁচানোর জন্য উনি পুরীতে আসবেন না। আর যদি আসেনও, তাহলে গুমখুন হয়ে যাবেন।'

কথাগুলো বলার ফাঁকেই কোমরের খোঁট থেকে ছোট পিস্তল বের করলেন পদ্মনাভ। তারপর হোম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোবিন্দ, তোমার লোকজনদের যে কাজটা করে রাখতে বলেছিলাম, সেটা কি করে ফেলেছে?'

গোবিন্দ সাহু বললেন, 'হ্যাঁ পদ্মনাভ। কৈবল্য বৈকুণ্ঠমে মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রভু জগন্নাথের পুরনো দারুমূর্তিরও নিচে শোয়ানোর ব্যবস্থা করেছি আমাদের মহাপ্রভুকে। যাতে ভক্তদের কাছে প্রচার করে দিতে পারি, গোরা মহাপ্রভু জগন্নাথের দেহে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। হা হা হা।'

পদ্মনাভ বললেন, 'এই খবরটা কিন্তু তুমি প্রতাপ পট্টনায়েককে দিয়ে প্রচার করাবে। তোমার টেলিভিশন চ্যানেলে তাঁকে নিয়ে গিয়ে। তাঁর মুখে শুনলে লোকে আর কোনও প্রশ্ন তুলবে না। হা হা হা।'

'ঠিক ঠিক। অবতাররা অপ্রকট হন। তাঁরা যদি আর পাঁচটা মানুষের মতো মরেন, তাহলে সেটা ভালো দেখায় না। লোকে বিশ্বাস করবে না।'

'ঠিক বলেছ গোবিন্দ। গোরা মহাপ্রভু অন্তর্ধান নিয়ে নানারকম গুজব ছড়িয়ে দাও। তাহলে ওর মাহাত্ম্য আরও বাড়বে। কাউকে দিয়ে বলাও, ওকে শেষ দেখা গিয়েছে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। কেউ বলুক, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলতে বলতে ও নেমে গিয়েছে সমুদ্রে।'

'এই মাত্র আমার লোকেরা এসে খবর দিল, সিংহদ্বারের বাইরে প্রচুর ভক্ত এসে জড়ো হয়েছে। ওদের জড়ো করেছিল মুকুন্দ বলে একজন। আমার লোক মুকুন্দকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে এসেছে। বোধহয় এর মধ্যেই ওকে পুঁতে ফেলেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। মন্দিরের দরজা তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া দরকার। না হলে সন্দেহ বাড়বে। ব্যাঘ্রদ্বার দিয়ে লোকজন নিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তারপর তুমি বাকি কাজটা সেরে ফেলো। আর হ্যাঁ, গোরা মহাপ্রভুর যদি শেষ কোনও ইচ্ছে থাকে তাহলে সেটা পূরণ করে দিয়ো, কেমন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বলুন মহাপ্রভু, আপনার শেষ ইচ্ছেটা কী? লক্ষ্মীমণিকে কি ডেকে দেব? হা হা হা। অন্য কোনও ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারেন।'

শুনে গোরার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে নিজেকে ও শান্ত করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ক্ষমা করো হে প্রভু। এঁদের তুমি ক্ষমা কোরো।'

কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ হল। ঠিক তখনই বুকের বাঁদিকে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা টের পেল গোরা। টাল সামলাতে না পেরে ও শক্ত পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল। উপুড় হয়ে শোয়ার পর ও দেখতে পেল, বুক থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে রক্তের ধারা মিশে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। গোরা টের পেল, অনেকগুলো মানুষ ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উন্মত্তের মতো পদাঘাত করছে। খানিকক্ষণ পর হঠাৎই ওর দেহটা ভারশূন্য হয়ে গেল। মুক্তিমণ্ডপ ছেড়ে ও আকাশের দিকে উড়তে লাগল।

মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে গোরা একটা জায়গায় এসে দেখল, ওর সামনে বিশাল এক বটগাছ। তার উপর এক বিরাট এক মন্দির। চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে মন্দির থেকে। কয়েক হাজার সিঁড়ি পেরিয়ে সেই মন্দিরে পৌঁছতে হয়। নিচের দিকে সিঁড়ি দিয়ে বহু মানুষ উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাঁদের দেহগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে কিছু নরনারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোরা দেখল, সেই মহাবৃক্ষের বাঁদিকে অনন্তশয্যায় শুয়ে রয়েছেন শ্রীবিষ্ণু। মন্দির প্রাঙ্গণের ডানদিকে একটা বেদি রয়েছে। দেখে ও চমকে উঠল, বেদির উপর একটা ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে। আগেও কি ও একবার এই মন্দিরে এসেছিল? সঙ্গে সঙ্গে গোরার মনে পড়ল, গম্ভীরায় শুয়ে দু'তিনদিন আগে এই দৃশ্যটা আগে একবারও দেখেছে।

ছোটোবেলায় বাবার মুখে গোরা একবার শুনেছিল, শ্রীকৃষ্ণের লীলা দ্বাপর যুগেই শেষ হয়ে যায়নি। অবতার হয়ে মর্তে এসে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যা বিষ্ণুর পছন্দ হয়নি। কলিযুগের শেষে তিনি বিচার করবেন বলে, শ্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞাত কোনও স্থানে তিনি বেঁধে রেখেছেন। এটাই কি তাঁর সেই বিচারসভা? তা না হলে বেদিতে শ্রীকৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন? গাছের আড়াল থেকে চারদিকে নজর বোলাল গোরা। তখনই দেখল, শ্রীবিষ্ণুর নিচে বিচারকের আসনে বসে রয়েছেন যোগমায়া। শ্রীবিষ্ণুর হয়ে সওয়াল করছেন, একদা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহচরী ললিতা ও বিশাখা।

ললিতা বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে ষোলো দফা অভিযোগ রয়েছে কৃষ্ণ। বিষ্ণু তোমাকে তাঁর অবতার রূপে পাঠিয়েছিলেন মর্তে। কিন্তু তাঁর মর্যাদা তুমি রাখোনি সখা। আমরাও তার সাক্ষী। রাধাকে পরিত্যাগ করে, দ্বারকায় চলে গিয়ে, তুমি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলে। সে প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আমার প্রথম অভিযোগ, তোমার এক ঘৃণিত অপরাধ নিয়ে। জলন্ধরের সতী স্ত্রী গুণ্ডাবতীর সতীত্ব তুমি নষ্ট করেছিলে কেন, তার জবাব দাও।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তার প্রয়োজন ছিল সখী। তুমি নিশ্চয় জানো, অসুর জলন্ধর এমন একটা বিদ্যা আয়ত্ব করেছিল যা বিরল। সে একবার দেবী পার্বতীর সতীত্ব নষ্ট করতে চেয়েছিল। ফলে শাপভ্রষ্ট হয়। শাপ অনুযায়ী, যদি আমি তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না করতাম, তাহলে জলন্ধরকে হত্যা করা সম্ভব হত না। ওকে শাপমুক্ত করার জন্যই গুণ্ডাবতীকে আমি স্পর্শ করেছিলাম।'

উত্তরটা শুনে ললিতা একবার যোগমায়ার দিকে তাকালেন। মৃদু হেসে যোগমায়া ইঙ্গিতে পরবর্তী প্রশ্নটা করতে বললেন। এবার বিশাখা বললেন, 'নারীজাতির প্রতি তুমি যে সুবিচার করোনি, তার আরও উদাহরণ আছে। রাম অবতারে তুমি গর্ভাবস্থায় সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলে। কেন সখা?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আমি রাজধর্ম পালন করেছিলাম। প্রজারা নানারকম প্রশ্ন তুলছিল। রাজা হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য ছিল, প্রজাদের তুষ্ট করা।'

উত্তর শুনে বিশাখাও তাকালেন যোগমায়ার দিকে। গোরার মনে হল, যোগমায়া সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ললিতাকে ইঙ্গিত করলেন, পরবর্তী প্রশ্ন করার জন্য। এবার ললিতা একটু আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই বললেন, 'তুমি সর্বদাই পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়েছ। কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধের সময় তুমি অনেক অন্যায় আচরণও করেছ। যেমন... দ্রোণকে হত্যা করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মিথ্যে কথাও বলিয়েছিলে। কেন কৃষ্ণ? কেন মহামতি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে মিথ্যে কথাও বলিয়েছিলে। কেন কৃষ্ণ? কেন মহামতি যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অধর্ম করিয়েছিলে? যার জন্য তাঁকে একবার নরকদর্শন করতেও হয়েছিল।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি ললিতা। যে সময়ে আমি পাণ্ডবদের এই পরামর্শ দিয়েছিলাম, সেই সময় দ্রোণ তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে হাজার হাজার পাণ্ডব সেনা নিধন করছিলেন। দ্রোণ ছিলেন বেদবেদাঙ্গবিৎ সত্যধর্ম পালনকারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষকে মেরে তিনি অন্যায় করছিলেন। এই পাপকর্ম থেকে তাঁকে বিরত করার উদ্দেশ্যেই আমি চেয়েছিলাম, তিনি অস্ত্রত্যাগ করুন। আরও একটা কারণ ছিল। হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দ্রোণকে কেউ হারাতে পারতেন না। দেবতারাও নন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়তো পঞ্চদশ দিনেই থেমে যেত, যদি দ্রোণবধ না হতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও কিছু অধর্ম নয় ললিতা। সেখানে একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জয়। আমি জানতাম, পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ যদি দ্রোণের কানে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে উনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। আর তিনি তা করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে মেরে ফেলতে পারবে। সেই কারণেই আমি পাণ্ডবদের বলেছিলাম, ধর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির করো।'

ললিতা বললেন, 'কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধের সময়ও তুমি রথের চাকা বসিয়ে দিয়েছিলে, যাতে কর্ণের শর অর্জুনের শিরশ্ছেদ না করে। সেটা করা কি তোমার উচিত হয়েছিল?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ললিতে, তুমি না জেনেই অহেতুক আমার প্রতি দোষারোপ করছ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় অর্জুনের বাণে যখন কর্ণ দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল, সেই সময় কর্ণও আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, অদৃষ্টের বশে তুমি এখন ধর্ম স্মরণ করছ। ধিক তোমাকে। কৌরবরা যখন একের পর এক অধর্ম আচরণ করছিল, তখন কি তুমি তাদের বাধা দিয়েছিলে? দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির ছলনা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ভীমের খাদ্যে বিষপ্রয়োগ, অভিমন্যুহত্যা...এইসব ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে কর্ণ? তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নয়। শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হয়ে গিয়েছিল।

কোনও উত্তর দিতে পারেনি। তাই আমি মনে করি, সারথি হিসেবে অর্জুনের রথের চাকা বসিয়ে দিয়ে আমি কোনও অন্যায় করিনি।'

বিচারসভায় সওয়াল-পালটা সওয়াল শুনতে শুনতে গোরা হঠাৎ দেখতে পেল, অনন্তশয্যা থেকে শ্রীবিষ্ণু ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। উনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে একবার হাত তুলেই নিচে নামিয়ে নিলেন। হাতের তালু থেকে এক আলোকরশ্মি ছুটে এল। গোরার চোখ তাতে ঝলসে গেল।

নব্বই

থানায় বসে টুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিল জয়দেব। রাত বারোটার সময় ওরা থানায় এসেছিল। ঘণ্টাপাঁচেক ধরে অপেক্ষা করছে পুরীর কালেক্টর বাসুদেববাবুর জন্য। কিন্তু এখনও উনি আসেননি। টুবাই একবার বাসুদেববাবুর বাংলোয় যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল। কিন্তু থানার ওসি ওদের বারণ করলেন। 'বাংলোর দিকে যাবেন না। রাস্তার কোথাও ইলেকট্রিকের আলো নেই। পুরো রাস্তা কোমর অবধি জল জমে রয়েছে। বড়ো বড়ো ম্যানহোল খুলে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও জল বেরিয়ে যায়নি। এই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া আপনাদের পক্ষে ডেঞ্জার হয়ে যাবে।'

কথাগুলো শুনে টুবাই দমে গিয়েছিল। ওরা ঠিকই করে রেখেছিল, পুরন্দরদাকে না নিয়ে গম্ভীরায় ফিরবে না। কেন জানে না, সবারই মনে হচ্ছিল, পুরন্দরদাকে একা ফেলে রেখে গেলে পুলিশ খুব মারধর করবে। মেরেও ফেলতে পারে। সাংবাদিকতা করার সময় টুবাই বোধহয় প্রায়ই আসত কোতয়ালি থানায়। তলার লেবেলের বেশ কিছু পুলিশ ওকে চেনে। তাদেরই একজন নীলভদ্র মিশ্র টুবাইয়ের কাছে এসে বলে দিয়ে গেল, পুরন্দরদার মুখ থেকে কথা বের করার জন্য থার্ড ডিগ্রি মারধরের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে মাঝ রাত্তিরে হঠাৎই থানার আলো চলে গেল। নীলভদ্র ওদের জন্য একটা লণ্ঠন নিয়ে এল। সেইসঙ্গে ঠোঙ্গায় করে সামান্য খাবার। কিন্তু থানার পুরো পরিবেশটাই এমন আতঙ্কের যে, ওদের কারও খাওয়ার ইচ্ছে হল না। একটু পরে আধো অন্ধকারে ওরা দেখল, কোত্থেকে বড়ো বড়ো ইঁদুর খাবারের লোভে টেবিলের উপর উঠে পড়েছে।

মাঝে রেড্ডিকাকা একবার বলেছিল, 'জয়দেব, আমার মনে হচ্ছে, সবাই মিলে এখানে থাকার দরকার নেই। আমি বরং গম্ভীরায় চলে যাই। ওখানে মহাপ্রভুর কাছে মুকুন্দ ছাড়া আর কেউ নেই। ওঁকে একা ফেলে আসা আমাদের ঠিক হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে টুবাই বলল, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। আমার মনে হয়, বাসুদেববাবুর জন্য আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না।'

জয়দেব জিগ্যেস করল, 'তুমি যখন ফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে, তখন উনি ঠিক কী বলেছিলেন, মনে করে একবার বলো তো?'

'উনি বললেন, চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিয়েই থানায় আসবেন। কিন্তু এত দেরি হওয়ার কথা তো নয়। এমনও হতে পারে, উনি চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারেননি।'

জয়দেব বলল, 'হতে পারে। কিন্তু তোমার কী মনে হয় টুবাই, পুরন্দরদার নামে যেসব অভিযোগ পুলিশ আনছে, সেগুলো সত্যি?'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। পুরোটাই গোবিন্দ সাহুর চাল। লোকটা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মাৎস্যন্যায় চলছে ওড়িশায়। এসব কলিযুগ ধ্বংস হওয়ার ইঙ্গিত। একটু আগেই তো দেখলে থানায় কী ধরনের কেস আসছে।'

'কোনটা বলো তো?'

'বাঁদিকে মেয়েদের লকআপের ভেতরে একজন যুবতীকে দেখতে পাচ্ছ? একটু আগে পুলিশ ওকে ধরে এনেছে। মেয়েটা না কি বিষ দিয়ে ওর স্বামীকে মেরে ফেলেছে। কেন জানো? পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল। এইসব ঘটনা এখন আকছার ঘটবে। অচ্যুতানন্দ লিখে গিয়েছেন।'

'তুমি মালিকা সাহিত্যে লেখা ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো বিশ্বাস করো?'

'আলবাত করি। ওর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো মিলে যাচ্ছে বলেই, মানি। জানো, সেদিন গম্ভীরায় কী একটু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল?'

'কী হয়েছিল টুবাই?'

'সম্বলপুরের এক গ্রাম থেকে এক ভদ্রমহিলা মহাপ্রভুর কাছে এসেছিলেন, তাঁর তিন বছরের এক কন্যাকে নিয়ে। মেয়েটা না কি রজঃস্বলা হয়েছে। উনি বললেন, যে গ্রামে থাকেন, সেখানকার সব শিশুকন্যাই না কি রজঃস্বলা হয়েছে। পাঁচ বছরের একটা মেয়ে গর্ভবতীও হয়েছে। এসব খুব খারাপ লক্ষণ।'

'আমি বুঝতে পারছি না, ভদ্রমহিলা গম্ভীরায় এসেছিলেন কেন?'

'মহাপ্রভুর চরণামৃত নিতে। কেউ বোধহয় বলেছে, মেয়েটাকে চরণামৃত খাইয়ে দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তাঁকে বললাম, ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা যে এই সময় ঘটবে, তার নিদর্শন রয়েছে পুঁথিতে। অচ্যুতানন্দ বহুদিন আগেই লিখে গিয়েছেন।'

'আর কী লিখে গিয়েছেন উনি?'

'তাহলে শোনো, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। তবুও বলি, হঠাৎ করি কুহুরি মারিয়া আসিব, চর্তুদিকরে ভূমিকম্প উঠিব, নোয়া পাঠনায় ধ্বজা উড়িবে, অদিনে ফুটিবে নিম্ব কুঁড়ি। তিনি ডাক দিবে ভৈরবী, পৃথিবী হব কম্পমান। বুঝতে পারলে কিছু?'

জয়দেব অবাক হয়ে শুনছিল। ও বলল, 'কুহুরি মারিয়া আসিব, মানে...চারদিক কুয়াশায় ঢেকে যাবে, তাই না? কুহুরি কথাটার অর্থ তো কুয়াশা।'

'ঠিকই বলেছ। ভূমিকম্পের কথাটা যে মিলেছে, সেটা তো কয়েকদিন আগেই টের পেয়েছ। নোয়া পটনায় ধ্বজা উড়বার ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। নোয়া পটনা বলে একটা

জায়গা আছে, কটক জেলার মধ্যে। জাজপুর হয়ে সেই গ্রামে যেতে হয়। সেখানে একটা শিবের মন্দির আছে। ভগ্ন মন্দির। কিছুদিন আগে সেই মন্দিরের চুড়োয় একটা বিশাল পতাকা উড়তে দেখা গিয়েছে। কলিযুগ শেষ হয়ে আসার ইঙ্গিত।' একটু থেমে টুবাই হেসে বলল, 'আরে, আমি তোমাকে এত বোঝাতে যাচ্ছি কেন? তুমি তো ওড়িয়া ভাষা জানো। রিসার্চ করার জন্য না কি শিখেছিলে?'

জয়দেব বলল, 'শিখেছিলাম, কিন্তু চর্চার অভাবে অনেক শব্দের মানে ভুলে গেছি।'

'তাহলে আরও শোনো। নর দর বিমান কাড়িবে অনেক
বিনা দোষে সংহার হইবে বহু লোকঅ।'

'তুমি তো ভয় পাইয়ে দিচ্ছ টুবাই। লক্ষণগুলো তো বোঝা যাচ্ছে ভাই।'

'ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই। যুগান্তে আসল ভক্তের পরীক্ষা হবে। মাটির তলা থেকে উঠে আসবে এক তামার পুঁথি। সেই পুঁথি লোককে পড়তে বলা হবে। প্রকৃত ভক্তরাই সেই পুঁথি পড়তে পারবেন। আর যিনি পারবেন, তিনি বেঁচে যাবেন। ভগবান এইভাবেই ভক্তদের পরীক্ষা করবেন।'

ওদের কথাবার্তা ওখানেই তখন থেমে গিয়েছিল। কেননা, ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এসেছিল 'বাঁচাও, বাঁচাও'। জয়দেব আর ওর সঙ্গীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সদ্য ধরে আনা পতিঘাতিনীর উপর অত্যাচার করছে পুলিশ। বারান্দা থেকে লক-আপের দিকে খানিকটা এগিয়ে উঁকি মারতেই জয়দেবের যা চোখে পড়েছিল, তাতে ও শিউরে উঠেছিল। ধারেকাছে কোনও মহিলা পুলিশ নেই। লক-আপের পাশে এস আইদের ঘরে হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। লুঙ্গি পরা দুজন পুলিশ, প্রায় নগ্ন যুবতী মেয়েটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েছে। তাকে শক্ত করে ধরে আছে। অপর একজন মেয়েটার যৌনাঙ্গে রুলের খোঁচা মারছে।

থানায় যে এ ধরনের অমানবিক কাজকর্ম হয়, জয়দেব তা শুনেছে। কিন্তু নিজের চোখে কোনওদিন দেখেনি। থানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি যে। জীবনে একবারই ও থানায় গিয়েছিল, ওই বইয়ের দোকানে আগুন লাগার দু'দিন পর। কিন্তু একটু আগে কোতয়ালি থানায় বিকৃতমনস্ক পুলিশের ঘৃণ্য আচরণ দেখার পর ওর শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। টাটকা বাতাস নেওয়ার জন্য জয়দেব বারান্দায় বেরিয়ে এল। এক পলকের জন্য মেয়েটার যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দরী, স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। বোধহয় কোনওদিন নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি হয়নি। থানার নির্জন ঘরে, ওকে পুলিশের বিকৃত কামনার মুখোমুখি হতে হবে, হয়তো মেয়েটা কোনওদিন ভাবতেও পারেনি। হায় ঈশ্বর, এ কোন পৃথিবীতে ওরা বাস করছে? জয়দেবের একবার ওর মনে হল, ছুটে বেরিয়ে সোজা গম্ভীরায় চলে যায়। গোরার কাছে বসে মনটাকে শান্ত করে। কিন্তু পরক্ষণেই পুরন্দরের কথা ভাবল। নাহ্, চলে যাওয়া ঠিক হবে না। নিষ্ঠুরতার যে নিদর্শন একটু আগে ও দেখল, তাতে পুলিশকে বিশ্বাস নেই। পুরন্দরকে মেরে ফেলে আজ রাতেই পুলিশ কোথাও ডেডবডি হাপিশ করে দিতে পারে।

বাইরে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বড়ো বড়ো বরফের টুকরো এসে পড়ছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যান আর জিপগাড়ির মাথায়। মাঝে মাঝেই কড় কড় করে বাজ পড়ছে। ক্ষণিক আলোয় জয়দেব দেখল, থানার চৌহদ্দি জলে টইটম্বুর। গাড়ির চাকার আধখানা জলের নিচে চলে গিয়েছে। টানা সাতদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। থামার কোনও লক্ষণই নেই। জয়দেবের মনে পড়ল, কলকাতা থেকে আসার পথে ও যেদিন ভুবনেশ্বর স্টেশনে নেমে পড়েছিল, সেদিনই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সেদিনই নবেন্দুদের বাড়িতে টিভিতে ও শুনেছিল, সারা বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসন্ন। টিভিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আলোচনা হচ্ছিল। সৌরমণ্ডল থেকে একটা গ্রহাণু না কি পৃথিবীর দিকে দ্রুত ছুটে আসছে। সেটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে পারে। সেই গ্রহাণু না কি এমন জোরে আঘাত হানবে, পৃথিবী উলটেও যেতে পারে।

বরফের টুকরোয় আঘাত লাগতে পারে। জয়দেব ডানদিকে সরে এল। তখনই একটা ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতে পেল ও। গেটের সামনে বিশাল একটা বটগাছ আছে। সেখান থেকে অদ্ভুত একটা প্রাণী উড়ে আসছে। পাখির মতো বিরাট তার ডানা। কিন্তু এতবড়ো পাখি! ঈগল বা বাজ তো এতবড়ো হয় না।

জয়দেব মনে করতে পারল না, কোনওদিন এতবড়ো পাখি ওর চোখে পড়েছে কি না। স্পিলবার্গের ছবিতে ও এরকমই এক ধরনের পাখি দেখেছে...টেরাডাকটিল না কি যেন তার নাম। সেই পাখির মতো প্রাণীটা উড়ে এসে একটা সাইকেল ভ্যানের উপর বসল। চাদরে জড়ানো লম্বা কী একটা শোয়ানো রয়েছে সাইকেল ভ্যানের উপর। পাখিটা দু'হাত দিয়ে সেই বস্তুটাকে অনায়াসে তুলে নিয়ে একটা পুলিশ ভ্যানের উপর গিয়ে বসল। আরে, পাখির কি মানুষের মতো হাত থাকে না কি? আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জয়দেব বাক্‌শূন্য হয়ে গেল। চোখের সামনে এ কি দেখছে ও?

একটু পরেই টুবাইয়ের গলা শুনতে পেল জয়দেব। ও জিগ্যেস করছে 'এ কি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে! সেই কখন থেকে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

টুবাই বাঁপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জয়দেবের চোখ পুলিশ ভ্যানের দিকে। আকাশ চিরে একবার বিদ্যুৎ ঝিলিক মারতেই ও দেখতে পেল, বিকটদর্শন প্রাণীটাকে মানুষের মতো মনে হচ্ছে। দুটো হাত আছে, পা আছে। মাথায় একরাশ চুল, কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে। শুধু ঠোঁটটা পাখির মতো। হাঁটু ভাঁজ করে বসে ওই প্রাণীটা কী যেন খাচ্ছে। জয়দেবের মনে হল, মানুষের দেহাংশ। দেখে ও মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল। চাদরে জড়ানো বস্তুটা শবদেহ নয় তো? হতে পারে। হয়তো ওই সাইকেল ভ্যানে করে পুলিশ একটু আগে কোনও শবদেহ তুলে এনেছে। ময়না তদন্তে পাঠানোর জন্য বাইরেই ফেলে রেখেছিল। অদ্ভুত প্রাণীটা সেটা দেখতে পেয়ে এখন ভক্ষণ করছে।

'মেয়েটার উপর পুলিশ কী অত্যাচার করছে, দেখলে জয়দেব? দু'তিনজন মিলে ওকে রেপ করছে। উফ্, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না ভাই। পালিয়ে এলাম। এরা মানুষ, না পশু?'

টুবাইয়ের কথা কানে যাচ্ছে বটে, কিন্তু জয়দেবের চোখ তখনও পুলিশ ভ্যানের ছাদে। মাথায় অন্য চিন্তা। এই শবদেহটা কি ওই মেয়েটার স্বামীর? মেয়েটা যাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে? হতে পারে। মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পুলিশ ওর বাড়ি থেকে শবদেহটাও তুলে এনেছিল। থানার ভিতর মেয়েটা জানেও না, একটা মানবদেহী পাখি তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ওর মৃত স্বামীকে ভক্ষণ করছে। জানবে কী করে? মেয়েটাই তো এই মুহূর্তে লালসার শিকার হয়ে হয়তো অর্ধমৃত।

'কী হল ভাই, কথার জবাব দিচ্ছ না যে?'

টুবাইয়ের প্রশ্ন শুনে জয়দেব মুখে কিছু বলল না। আঙুল দিয়ে ভ্যানের দিকে দেখাল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে টুবাই কী বুঝল কে জানে? হাত ধরে টান মেরে ও বলল, 'সর্বনাশ! এখানে দাঁড়ানো আর উচিত হবে না জয়দেব। শিগগির ভেতরে চলো।'

থানার ভিতরে ঢুকেই বেঞ্চের উপর বসে পড়ল টুবাই। খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, 'মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেল জয়দেব। কাত্যায়নীরা এসে হাজির হয়েছে। মাসকয়েক আগে এদের নিয়েই গুজব ছড়িয়েছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে রাত্তিরের দিকে শবদেহ লোপাট হয়ে যাচ্ছিল। সেই রিপোর্ট করার জন্য কয়েকটা জেলায় আমাকে যেতে হয়েছিল। তখন ভেবেছিলাম, এ নিশ্চয়ই কিডনি বিক্রি চক্রের কাজ। কিন্তু আজ দেখলাম, তা নয়।'

জয়দেব কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও জিগ্যেস করল, 'কে কাত্যায়নী? তুমি কাদের কথা বলছ?'

'সে ভয়ঙ্কর জীব। মালিকা সাহিত্যে এদের উল্লেখ আছে। মহাকালী যখন পৃথিবী ধ্বংস করায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তখন মহাকালীর ঘাম থেকে এদের জন্ম হয়েছিল। এরা পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করেছিল তখন, শব ভক্ষণ করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এদের আবার দেখা গিয়েছিল। পরে যুদ্ধ থেমে গেলে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এরা অনন্ত বিশ্বে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি, কাত্যায়নী তো ভগবতীরই আর এক রূপ। মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথম এই দেবীর অর্চনা করেন। তাই তাঁর নাম কাত্যায়নী। ইনিই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। আমাদের ওখানে আশ্বিন মাসে এঁরই পূজা হয়, দেবী দুর্গা।'

'হতে পারে। কিন্তু মালিকা সাহিত্যে এদের সম্পর্কে আমি পড়েছি। কাত্তানি গুপ্তে ভ্রমণ করিবে, মারুত রূপে রহিবে, যোগিনী যোগীগণ সব একাঠে বুলিনো, দ্বারে দ্বারে মিলিবে। হয়তো কাত্তানি কথাটাই লোকমুখে এসে দাঁড়িয়েছে কাত্যায়নীতে। যাক ভাই সে সব কথা। এই নরকে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। এখন কী করা যায় বলো তো?'

'অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী।'

'আমার মনে কেন যে কুডাক দিচ্ছে, বুঝতে পারছি না জয়দেবভাই। রেড্ডিকাকা ঠিকই বলেছেন, মহাপ্রভুকে একা ফেলে চলে আসা আমাদের ঠিক হয়নি।'

কথাগুলো বলে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল টুবাই। থানা হঠাৎ নিঝুম হয়ে গিয়েছে। একটা আগেও যুবতী মেয়েটার গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জয়দেব। এখন আর শুনতে পাচ্ছে না। একটু আগে দু'একজন কনস্টেবলকে দেখা যাচ্ছিল। এখন তাদেরও পাত্তা নেই। লণ্ঠনের আলো ক্রমেই কমে আসছে। পুরো থানাটাই এখন প্রেতপুরীর মতো মনে হচ্ছে। মেঝেতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে গিয়েছে দেখে চেয়ারে পা তুলে বসল জয়দেব। ছোটোবেলায় ইঁদুরকে ও ভীষণ ভয় পেত। বেহালার বাড়িতে একবার নেংটি ইঁদুরের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। মা তখন বেহালা বাজার থেকে একটা খ্যাচাং কল কিনে আনে। একদিন ভোরে সেই খ্যাচাং কলে একটা ছোট্ট ইঁদুর ধরা পড়েছিল। মা বলেছিল, 'ইঁদুরটাকে মারিস না। ইঁদুর হল গণেশের বাহন। ওকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

মায়ের কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল জয়দেবের। কতবার মা আসতে চেয়েছিল পুরীতে। প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য। জয়দেব আনতে পারেনি। কারণ একটাই, ও রিসার্চের কাজে ব্যস্ত থাকবে। মায়ের জন্য সময় দিতে পারবে না। কিন্তু উপাসনাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর যখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, তখন জয়দেব ঠিক করেছিল, বিয়ে হয়ে গেলে সবাইকে নিয়ে ও পুরীতে আসবে। মায়ের ভার উপাসনার উপর ছেড়ে দেবে। তখন কাজের চাপ থাকবে না। নিছক বেড়ানোর জন্যই পুরীতে আসবে। গম্ভীরা হোটেলেই এসে উঠবে। গোরার সান্নিধ্যে এলে মায়েরও খুব ভালো লাগবে। তখনও অবশ্য জয়দেব জানত না, আসলে গোরা কে? অনেক পরে অবধূতজির চিঠিতে জানতে পারে।

ইস, এবারও আসার সময় মা ওকে একা ছাড়তে চায়নি। এমনও বলেছিল, 'চল বাবা, দুজনে মিলে বাকি জীবনটা শ্রীক্ষেত্রেই কাটিয়ে দিই। আমাকে একা ফেলে চলে যাস না।' কিন্তু উপাসনার বিরহে ওর মনটা তখন এমন কাতর যে, মাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা হয়নি। উপাসনার কথা মনে হতেই জয়দেব ইষ্টনাম জপ শুরু করল। গোরার কাছে ও শিখেছে। গোরা বলেছিল, মন অশান্ত হলেই ভগবানকে ডেকো। উনি চিত্তশুদ্ধ করে দেবেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ জপ করার সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের মনটা শান্ত হয়ে গেল। চোখ খোলার পর তাকিয়ে ও দেখল, ঘরে ঘন অন্ধকার। লণ্ঠনটা নিভে গিয়েছে। একটু আগে বেঞ্চের উপর শুয়ে থাকা টুবাইকে পর্যন্ত ও দেখতে পাচ্ছে না। মারাত্মক ভয়ে ওর বুকের ভিতরটা ধুকপুক করতে লাগল। এইরকম একটা ভয়ানক রাত ও জীবনে আর কখনও কাটায়নি।

টুবাইকে ডাকার কথা জয়দেব একবার ভাবল বটে, কিন্তু ওর গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না। ঠিক সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তিকে ও এগিয়ে আসতে দেখল। তারপর হঠাৎই সেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। উত্তেজনা চেয়ার ছেড়ে নেমে দাঁড়াল জয়দেব। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, উঠোন পেরিয়ে বৃষ্টির জল থানার ঘরে এসে ঢুকেছে। ওর পা গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। ওর মন বলল, থানায় বসে থাকা আর ঠিক হবে না। এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। জল বেড়ে গেলে গম্ভীরায় ফেরা মুশকিল

হয়ে যাবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ঠেলেই ও বেঞ্চের দিকে এগোল। টুবাইকে সঙ্গে নেওয়া দরকার। সবাইকে একসঙ্গে গম্ভীরায় ফিরতে হবে। টুবাই জানে, রেড্ডিকাকা আর রাসবিহারীবাবু কোথায় আছেন।

বেঞ্চের উপর শুয়ে রয়েছে টুবাই। ওর গায়ে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুবাই ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'উফ্, কী ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখছিলাম জয়দেব। ভাগ্যিস আমাকে তুমি জাগিয়ে দিলে।'

'কী স্বপ্ন দেখছিলে ভাই?'

'কারা যেন আমাদের মহাপ্রভুকে কল্পবটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ওঁর বিচার চলছে। আমাদের এখুনি মন্দিরে যেতে হবে ভাই, এখুনিই।'

শুনে জয়দেবের বুকটা কেঁপে উঠল। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে যে পরিণতি হয়েছিল, তাহলে কি সেটাই গোরার জীবনে ঘটতে চলেছে? ষড়যন্ত্রকারীরা কি তাহলে ওদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোরাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছে? হায় হায়, কী হবে? কাঁপা গলায় ও শুধু বলল, 'চলো ভাই, তাহলে বেরিয়ে যাই।'

একানব্বই

'পুলিশ তোমাকে ধরে এনেছে কেন ভাই?'

প্রশ্নটা শুনে চোখ মেলে তাকাল পুরন্দর। হাজতে ঢোকার পর থেকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ও এককোণে বসে হরিনাম জপছিল। ভালো করে কারও দিকে তাকায়ওনি পর্যন্ত। হাজতে অল্প পাওয়ারের আলোয় ও পরে দেখতে পেয়েছিল, আরও দু'তিনজন বসে। হাজত জিনিসটা কী, সে সম্পর্কে পুরন্দরের কোনও ধারণাই ছিল না। সারা রাত্তির ধরে যা দেখল, তাতে ওর এখন মনে হচ্ছে, বাইরের পৃথিবীটা কী সুন্দর। প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারল, এই সেই লোকটা, যাকে পুলিশ লাথি মেরে হাজতে ঢুকিয়েছে মাঝ রাত্তিরে। পুলিশ তখন খিস্তি মারছিল, 'পরস্ত্রীকে ফুঁসলে নিয়ে যাচ্ছিলি শুয়ার। আপাতত থাক এখানে। যতদিন না তোর লিঙ্গ কেটে আমরা কুকুরকে খাওয়াই।'

হাজতে ঢোকানোর আগে লোকটাকে মারধরও করেছিল পুলিশ। চোখের কোণে কালশিটের দাগ। মার খাওয়ার অভ্যেস নেই বোধহয়। দেখে মায়া হল পুরন্দরের। ও বলতে যাচ্ছিল, মার্ডার চার্জ। কিন্তু বলল, 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

কথাগুলো বলেই চুপ করে গেল পুরন্দর। মনটাকে শান্ত করা দরকার। হরিনাম করলে, মনকে শান্ত করা যায়। সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে পুরন্দর ধরা পড়ার পর থেকে। পুলিশ যখন গম্ভীরায় যায়, তখন ইচ্ছে করলে ও পালিয়ে যেতে পারত। দু'চারজন পুলিশকে কাবু করা ওর কাছে এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভু গোরার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ও বদলে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। পাপের শাস্তি

তো ওকে পেতেই হবে। পুলিশ যদি বিচারের জন্য ওকে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে ধরে নিতে হবে ঈশ্বরই পুলিশকে পাঠিয়েছেন।

'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, কোনও অপরাধ করতে পারো। তবুও পুলিশ ধরল কেন ভাই?' ফের ওই একই প্রশ্ন। কী কৌতূহল। প্রশ্নটা শুনে মনে মনে হাসল পুরন্দর। 'আরে, মানুষের মুখ দেখে কী সব বোঝা যায়? ও পালটা প্রশ্ন করল, 'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ভাই?'

'খুব ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। এই নরকে তুমি বেমানান। অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে আমি লক্ষ করছি ভাই। তুমি কী জপ করছিলে এতক্ষণ?'

'হ্যাঁ। হরিনাম করছিলাম।'

'আচ্ছা ভাই, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো, ঈশ্বর বলে কেউ আছেন?'

'কেন, তুমি বিশ্বাস করো না?'

'করতাম। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে মন মানতে চাইছে না। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্কের চার্জ এনেছে। কিন্তু ঈশ্বরও জানেন, আমার সঙ্গে ভগবতীর কোনও অবৈধ সম্পর্ক নেই।' কথাগুলো বলে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল লোকটা।

হাজতে এদিক-ওদিক শুয়ে রয়েছে দু'তিনজন। কান্নার আওয়াজ শুনে বিরক্ত একজন বলে উঠল, 'চুপ কর শালা। মেয়েমানুষ ভোগ করার সময় মনে ছিল না?' কথাটা এমন বিশ্রীভাবে বলল, পুরন্দরের মনে হল, উঠে গিয়ে বুকে পা চেপে ধরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ও সামলে নিল। এ কি, মনে হঠাৎ এমন হিংস্রভাব উদয় হল কেন? না, না, এটা ঠিক নয়।

লোকটার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'ভগবান মাঝে মাঝে ভক্তদের পরীক্ষা নেন ভাই। মনে করো, এই বিপদে ফেলে তোমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। উনি যেমন বিপদে ফেলেন, তেমন দেখো, উনিই ঠিক তোমাকে উদ্ধার করবেন।'

'হয়তো তুমি ঠিকই বলছ।' বলেই চুপ করে গেল লোকটা। খানিকক্ষণ পর বিড়বিড় করে বলল, 'ললাটলিখন। কে খণ্ডাবে? জ্যোতিষী আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, নারীঘটিত স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়বেন। সেটাই হল।'

পুরন্দর জিগ্যেস করল, 'তোমার বাড়ি কি পুরীতেই, না অন্য কোথাও?'

'না, আমি কটকে থাকি। আমার নাম নীলভদ্র রথ। ওখানে র‍্যাভেনশ কলেজে পড়াই। গতকালই আমি পুরীতে এসেছিলাম মন্দিরে পুজো দেবো বলে।'

'এই ঝঞ্ঝাটে তুমি জড়িয়ে পড়লে কী করে ভাই?'

'সে অনেক কথা। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে একটা কথা জিগ্যেস করব? তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কি স্থানীয় লোক?'

'বলতে পারো। আমার জন্ম এখানেই। মন্দিরের আশপাশে।' উত্তরটা দেওয়ার সময় বিষ্ণুমন্দিরের অনাথ আশ্রমের দৃশ্যটা পুরন্দরের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওর সামনে বসে রয়েছেন কলেজের এক শিক্ষক। একজন শিক্ষিত মানুষ। তাঁকে তুমি সম্বোধন করার

অধিকার ওর আছে কি না, সেই প্রশ্নটা ওর মনে উদয় হল। নিজে কোনওদিন স্কুলের গণ্ডি না পেরোলেও, কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের কথা ও জানে। খুব বিখ্যাত কলেজ। পদ্মনাভ মহারাজ একবার ওকে এই কলেজে পাঠিয়েছিলেন।

নীলভদ্র বলল, 'মন্দিরের আশপাশে যখন তোমার জন্ম, তখন নিশ্চয়ই মন্দিরের পান্ডাদের অনেককেই তুমি চেনো।'

পুরন্দর বলল, 'হ্যাঁ, অনেককেই চিনি।'

'পদ্মনাভ মহারাজ বলে কারও নাম তুমি শুনেছ?'

'নামটা শুনে পুরন্দর সোজা হয়ে বসল। জিগ্যেস করল, 'কেন বলো তো?'

'আরে আমার এই দুর্দশা তো ওই পদ্মনাভ মহারাজের জন্য। তাঁকে তুমি চেনো?'

শুনে একটা চিনচিনে রাগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। পুরন্দর বলল, 'মনে হয় চিনি। কিন্তু পদ্মনাভর সঙ্গে তোমার জানাশুনো হল কী করে?'

'শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে কটকে আমি একটা এনজিও-র সঙ্গেও যুক্ত। ভগবতী...মানে যে মেয়েটাকে জুড়ে আমার নামে স্ক্যান্ডাল রটেছে, তার বাবা এই এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বিদেশের অনেক এনজিও-র সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কয়েক বছর আগে সুইডেনের এমনই একটা এনজিও, তার নাম গোল, ভগবতীর বাবার কাছে চিঠি পাঠায়, পুরী থেকে পদ্মনাভ মহারাজ বলে একজন একটা অনাথ আশ্রম চালান, তিনি কিছু আর্থিক সাহায্য চাইছেন। আপনারা খোঁজ করে আমাদের বলুন, এমন অনাথ আশ্রম সত্যিই আছে কি না। খোঁজ নিতে এসে ভগবতীর বাবার সঙ্গে পদ্মনাভ মহারাজের পরিচয় হয়। সেই শুরু। পদ্মনাভ মহারাজ তারপর থেকে প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন।'

পরের গল্পটা পুরন্দরের জানা। ভগবতী বলে মেয়েটা নিশ্চয়ই সুন্দরী। তাই পদ্মনাভর কুনজরে পড়েছিল। ভগবতী পাত্তা দেয়নি। তাই এই পতিঘাতিনী প্রমাণের ষড়যন্ত্র। কিন্তু অনাথ আশ্রম চালানোর জন্য পদ্মনাভ কি সুইডেন থেকে টাকা পেয়েছিল? সেটা জানা দরকার। টাকার অঙ্কটাই বা কত? বিষ্ণুমন্দিরের অনাথ আশ্রম যে কীভাবে চলত, তা পুরন্দরের থেকে ভালো আর কে জানে? ও জিগ্যেস করল, 'পদ্মনাভরা কত টাকা পেতেন সুইডেন থেকে?'

'বছরে কুড়ি লাখ টাকা। আর সেই গ্রান্ট নিয়েই আমাদের উপর ওর রাগ।'

'বুঝেছি। কেননা তোমরা পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলে, আসলে অনাথ আশ্রম অনেকদিন আগে উঠে গিয়েছে। ভগবতী ও তার স্বামীও নিশ্চয় তোমার সঙ্গে ছিলেন।'

'ঠিক তাই। আমরা গ্রান্ট বন্ধ করে দিই। কিন্তু তুমি বুঝতে পারলে কী করে?'

'আমি জানি। এও জানি, পদ্মনাভর লোকজনরাই ভগবতীর স্বামীকে খুন করেছে। তারপর ভগবতীর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে... স্ক্যান্ডাল রটিয়েছে। এটাই পদ্মনাভর স্টাইল। লোকটা এমন ধুরন্ধর।'

নীলভদ্র খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, 'তুমি তাহলে পদ্মনাভকে ভালো করে চেনো।'

'বিলক্ষণ চিনি। আমি যে অনাথ আশ্রমেই বড়ো হয়েছি।'

ওদের কথাবার্তা হাজতবাসী অন্য দু'তিনজনের পছন্দ হচ্ছিল না। বোধহয় ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। একজন পাশ ফিরে শোয়ার সময় ফুট কাটল, 'এই শালা, তোরা চুপ কর।'

লোকটার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। কথা বলার ভঙ্গিটাও খুব খারাপ। শুনে পুরন্দরের মাথা গরম হওয়া সত্ত্বেও, ও চুপ করে গেল। ওর মাথায় এখন অন্য চিন্তা। বছরে কুড়ি লাখ টাকা! বিনা পরিশ্রমে, ভাবা যায়! কতভাবেই না রোজগার করে পদ্মনাভের মতো লোকগুলো!! মন্দির থেকে রোজগার, যজমানদের থেকে রোজগার। ইচ্ছে করলে টাকার গদির উপর শুয়ে থাকতে পারে পদ্মনাভরা। সুইডেন থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসত আশ্রমের জন্য। আর মন্দিরের উচ্ছিষ্ট ভোগ খেয়ে দিন কাটাতে হত, ওদের মতো হতভাগ্যদের। আচ্ছা, এটা পাপ নয়। এইভাবে প্রতারণা করে রোজগার? তাহলে পদ্মনাভ তো ওর থেকে অনেকগুণ পাপী। কত লোককেই না হত্যা করিয়েছে ওই লোকটা আড়ালে থেকে।

হরিনাম জপ করার কথা পুরন্দর ভুলে গেল। হাজতে বসে ও পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগল। এই পদ্মনাভর কথায় কত লোককেই না ও মেরে ফেলেছে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটার পর একটা নির্দেশ যেত, আর প্রাণের মায়া না করে পুরন্দর অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করত। তখন ও বুঝতই না, জীবহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ পৃথিবীতে আর নেই। হঠাৎ ওর মনে হল, না জেনে অপরাধ করলে কী পাপ হয়? এই প্রশ্নটা রাসবিহারীবাবুকে অনেকবার ও করবে ভেবেছে। একমাত্র ওই বয়স্ক মানুষটার সঙ্গেই ও মন খুলে কথা বলতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা করার সাহস ও সঞ্চয় করতে পারেনি। যদি ওর ঘৃণ্য অতীতটা প্রকাশ পেয়ে যায়!

রাসবিহারীবাবুর মুখেই পুরন্দর শুনেছে, কলকাতায় চেতলার কাছে বিশাখা মায়ের একটা ফ্ল্যাট আছে। তার ঠিক উলটোদিকের ফ্ল্যাটেই রাসবিহারীবাবুর পরিবার থাকেন। মহাপ্রভু গোরার মাহাত্ম্য অনেক আগেই না কি কলকাতায় দেখেছেন ওরা। রোজ রাতে সবার অলক্ষেই না কি অনেক সাধু আনাগোনা করতেন সেখানে। এক রাতে ওঁদের দেখে ফেলেন রাসাবিহারীবাবু। তারপর থেকে ওঁর সংসার করার ইচ্ছেটা চলে যায়। আগে প্রভু জগন্নাথের টানে বছরে একবার পুরীতে আসতেন রাসবিহারীবাবু। এখন ঠিক করেছেন পাকাপাকি থেকে যাবেন পুরীতে। বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবেন। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস, অদৃশ্যে ওই সাধুরাই মহাপ্রভু গোরাকে ঘিরে আছেন। ওঁরাই গম্ভীরায় পাহারা দিচ্ছেন।

গম্ভীরায় একতলায় রাসবিহারীবাবুর ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে পুরন্দর। যখন ইচ্ছে হয়, তখন একইসঙ্গে হরিনাম করে। রাসবিহারীবাবুর গলাটা খুব সুন্দর। কীর্তন গাইবার ধরনটাও অসাধারণ। শুনলে চোখে জল এসে যায়। ওঁর মুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা রোজই শোনে পুরন্দর। আর ভাবে, এমন একটা মহাপুরুষকে ও এতদিন ঘৃণা করে এসেছে? ইস, কেন? উত্তরটা একদিন রাসবিহারীবাবুর একটা কথাতেই পুরন্দর পেয়ে গিয়েছিল। 'ভক্তকে ভগবান

দুভাবে কাছে টেনে নেন। এক, যে তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে চায়। দুই, যে তাঁর তীব্র বিরোধিতা করে।' হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুরের কথা বলেছিলেন রাসবিহারীবাবু। সে এক আশ্চর্য কাহিনি। শ্রীবিষ্ণুর বিরোধিতা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সে কীভাবে উদ্ধার পেয়েছিল, তার গল্প। শুনে পুরন্দরের মনে হয়েছিল, হিরণ্যকশিপুর মতো পাপী যদি উদ্ধার পেয়ে থাকে, তাহলে ওরও আশা আছে। ভালো কাজ করলে ওরও পাপস্খালন হয়ে যাবে।

রাসবিহারীবাবু আরও একটা কথা বলেছিলেন। 'মানুষ যে পরিমণ্ডলে থাকে, তার প্রভাব তার মধ্যে পড়বেই। তুমি কোথায় আছো, কোন ধরনের লোক পরিবৃত হয়ে আছো, সেটা খুব জরুরি।' কথাটা শোনার পর থেকে পুরন্দর অনেক ভেবেছে। রাসবিহারীবাবুর কথাটা একশোভাগ সত্যি। একই মায়ের পেটে জন্মেছে ও আর গোরাভাই। একজন পাতাল আশ্রমে বড়ো হয়েছে, ঘৃণ্য পরিবেশে বড়ো হয়েছে। অন্যজন বৈষ্ণব পরিবারে। দুজনের মধ্যে কী অসীম পার্থক্য। রাসবিহারীবাবুরা তো ওর অতীতের কথা জানে না। জানলে হয়তো ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। যাক, পাতাল আশ্রমের মায়া কাটিয়ে যে পুরন্দর শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এটাই একটা ভালো লক্ষণ।

নীলভদ্র দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। সেদিকে চোখ যাওয়ায় পুরন্দরের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। কত বয়স হবে ভদ্রলোকের? পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ...তার বেশি নিশ্চয়ই নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বোধহয় কখনো পড়েনি। তাই খুব ভেঙে পড়েছে। নীলভদ্রকে সাহায্য করতে পারলে পুরন্দর খুব খুশি হত। কিন্তু তাহলে ওকে ফের বলপ্রয়োগ করতে হবে। দু'একজন পুলিশকে খুন করতেও হতে পারে। তাতে ওর পাপের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। না, না, এসব কথা মনে স্থান দেওয়াই উচিত না। এখনও থানায় রয়েছেন রাসবিহারীবাবু, রেড্ডিকাকা আর জয়দেববাবুরা। ওঁদের সামনে এমন কিছু করা উচিত হবে না, যাতে ওর আসল চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

কিন্তু ও চাইলেই যে সবকিছু ওর মনোমতো হবে, তার কোনও মানে নেই। হাজতের অন্যপ্রান্তে, নীলভদ্রের পাশে শুয়ে থাকা একটা লোক এইসময় উঠে বসল। দু'তিনবার হাই তুলে তারপর রুক্ষ স্বরে নীলভদ্রকে সে বলল, 'এই হাজামজাদা, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছে। একটু টিপে দে তো।'

এই ধরনের অনুরোধ যে-কেউ করতে পারে, নীলভদ্র কল্পনাও করতে পারেনি। লোকটার দিকে একবার তাকিয়েও ফের হাঁটুতে মুখ গুঁজল। সঙ্গে সঙ্গে ওর চুল মুঠিতে ধরে লোকটা বলল, 'কী বললাম, তুই শুনতে পেলি না?'

নীলভদ্র আঃ বলে কাতরে উঠল। দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল পুরন্দরের। ওর ইচ্ছে হল, উঠে গিয়ে এক লাথি মারে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ও সামলে নিল। এইসব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কোনও মানে হয় না। ও মোলায়েম স্বরে বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও না ভাই। ও দুর্বল মানুষ। তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? তুমি বরং এদিকে এসো, তোমার কী চাই, বলো আমাকে।'

লোকটা খুশি হয়ে বলল, 'তুই ইদিকে আয়।'

উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই পুরন্দরের গা ঘিনঘিন করে উঠল। লোকটার গায়ে কী দুর্গন্ধ! এইরকম দুর্গন্ধই ও একবার পেয়েছিল কলকাতায়, শিয়ালদহের হোটেলে একটা হিজড়ের শরীর থেকে। এরা কোন নরকে থাকে কে জানে? গোরাভাই বলে, কাউকে ঘৃণা করতে নেই। সমাজের যত নীচুতলার মানুষই হোক না, তাকে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে নেবে। দুর্গন্ধের কথা ভুলে গেল পুরন্দর। লোকটাকে ও বলল, 'বলো ভাই, তোমার কী সেবা করতে পারি?'

খিঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'বললাম তো, শুনতে পাসনি?'

'দয়া করে আর একবার বলো ভাই।'

'আচ্ছা ত্যাড়াব্যাঁকা লোক তো তুই। মশকরা করছিস না কি। ঠ্যাঙ ছিঁড়ে ফেলে দেবো শালা। জানিস আমি কে? দুলু বেওড়া। আমার নাম শুনলে পুরীতে বাঘ আর গোরু একঘাটে জল খায়। নে, কাঁধের কাছটায় টনটন করছে। মালিশ করে দে।'

দুলু বেওড়া কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই থানার ভিতর থেকে মেয়েলি গলায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল, 'বাঁচাও, বাঁচাও'।

চিৎকার শুনে নীলভদ্র লাফিয়ে উঠে গারদের দরজার কাছে ছুটে গেল। পুরন্দরও বসে থাকতে পারল না। ও নীলভদ্রের কাছে গিয়ে বলল, 'পুলিশ কার সর্বনাশ করছে ভাই?'

গারদের শিকে মাথা ঠুকতে ঠুকতে নীলভদ্র বলল, 'এ ভগবতীর গলা। পুলিশ বোধহয় ওকে টর্চার করছে। উফ্, ভগবান।'

ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে নীলভদ্র। ডানদিকে সরে গিয়ে পুরন্দর দেখার চেষ্টা করল, চিৎকারটা কোত্থেকে আসছে। অফিস ঘর থেকে হ্যাজাকের আলো তেড়চাভাবে এসে পড়েছে বাইরে। সেই আলোয় ও যা দেখল, তাতে ওর মনে ক্রোধ সঞ্চার হতে লাগল। ভগবতী বলে মেয়েটাকে ধর্ষণের চেষ্টা করছে দু'তিনজন পুলিশ। দৃশ্যটা যাতে নীলভদ্রের চোখে না পড়ে, সেই কারণে ওর কাঁধ ধরে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুরন্দর বলল, 'ভেঙে পড়ো না ভাই। দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে নীলভদ্র কাঁদতে লাগল। এদিকে, চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছে হাজতের অন্য লোকগুলোর। দুলু বেওড়াও উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটা শুয়ে থাকার সময় পুরন্দর ঠিক বুঝতে পারেনি... বেশ লম্বা এবং বলশালী। গারদের শিক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে দুলু বেওড়া পুরন্দরকে বলল, 'কী করবি তুই? মেয়েটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবি? পারবি না। তুই এখান থেকে বেরোতেই পারবি না। তোর উপর নজর রাখার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন পদ্মনাভ মহারাজ। আমার হাত থেকে তুই বাঁচবি না।'

লক আপে এই দ্বিতীয়বার পদ্মনাভ মহারাজের নাম শুনে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না পুরন্দর। দুলু বেওড়া তাহলে পদ্মনাভের লোক! বাকি দুজনও তাহলে ওর সঙ্গী। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে চিনচিনে রাগটা ফের ফিরে এল। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল। তখনই ওর চোখে পড়ল, এতক্ষণ ও যেখানে বসেছিল, দুলুর এক সঙ্গী, উঠে

গিয়ে ঠিক সেই জায়গাটাতেই পেচ্ছাপ করছে। দেখে প্রবল ক্রোধে লাফিয়ে উঠে পুরন্দর আঘাত করল দুলু বেওড়ার কাঁধে। অব্যর্থ লক্ষ্য। এত লম্বা শরীরটা ধপ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। মেঝের দিকে তাকিয়ে পুরন্দর নিশ্চিত হয়ে গেল, আর দ্বিতীয়বার আঘাত করতে হবে না।

দুলুর দুটো লোক বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের অগ্রাহ্য করে পুরন্দর লক-আপের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অনেকদিন পর ও একটা মানুষকে খুন করেছে। পুরনো একটা অনুভূতি টের পাচ্ছে। সেটা ভালো লাগার, না মন্দ... ও সেটা বুঝতে পারল না। ওর মন বলল, বাইরে একটা পাপ কাজ হচ্ছে। সেই কাজে বাধা দেওয়ার জন্য, যে করেই হোক... হাজতের বাইরে ওর যাওয়া প্রয়োজন ছিল। দুলু বেওড়াকে মেরে ও কোনও অন্যায় করেনি।

থানা হঠাৎ নিঝুম হয়ে গিয়েছে। হাজতের সামনে কোনও পুলিশও নেই। লোহার শিকের বাইরে হাত বাড়িয়ে পুরন্দর দেখল, মাঝারি ধরনের একটা তালা ঝোলানো রয়েছে। এই ধরনের তালা ভেঙে ফেলার অভ্যেস ওর আছে। এমনিতেই ওর শরীরে যথেষ্ট শক্তি। ক্রোধ হলে সেটা আরও অনেক বেড়ে যায়। দুই হাত গলিয়ে পুরন্দর তালাটা মুচড়ে ভেঙে ফেলল। খুট করে একটা আওয়াজ হল। দরজা খুলে নিঃশব্দে ও বাইরে বেরিয়ে এল। নীলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়ে সেই ঘরের সামনের গিয়ে দাঁড়াল, যেখানে তিন পাপাত্মা ভগবতীর যৌনাঙ্গে রুল ঢোকানোর চেষ্টা করছে।

বাইরের ঘরে ঘন অন্ধকার। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই তিন পুলিশকে খুন করে, ভগবতীর অচেতন দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে পুরন্দর বাইরে বেরিয়ে এল। এমন পেশাদারি দক্ষতায় কাজটা ও করল, টুঁ শব্দটিও হল না। বারান্দায় পা দিয়ে ওরা দেখল, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বারান্দায় জল উঠে এসেছে। কড় কড় করে বাজ পড়ছে। সেই শব্দ অনেকক্ষণ ধরে প্রলম্বিত হচ্ছে। কয়েক মিনিট হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর পুরন্দর শুনল... নীলভদ্র ফিসফিস করে বলছে, 'এই দুর্যোগে কোথায় যাবে ভাই?'

প্রশ্নটা ওর মনেও ঘুরপাক খাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে পুরন্দর আশপাশে তাকাল। তখনই ওর চোখে পড়ল, এক কোণে একটা সাইকেল ভ্যান দাঁড় করানো রয়েছে। দেখেই ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সাইকেল ভ্যানে করে ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চক্রতীর্থের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আত্মানন্দের আশ্রমে। ওখানে একবার ঢুকে পড়তে পারলে পুলিশ ওদের হদিশ পাবে না। উঠোনে জল পেরিয়ে সাইকেল ভ্যানের দিকে এগোনোর সময় হঠাৎ ডানা ঝটপটানির আওয়াজ শুনতে পেল পুরন্দর। বটগাছের দিকে তাকাতেই ওর সারা শরীর আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। ও দেখল, বিশাল ডানা মেলে একটা প্রাণী উড়ে আসছে ওর দিকে। সর্বনাশ এ তো কাত্যায়নী...কাস্তানী। ভগবতীর দেহটাকে নিয়ে দৌড়ে পুরন্দর থানার ভেতর ঢুকে এল।

বিরানব্বই

একটু আগেই ও হাজির ছিল শ্রীকৃষ্ণের বিচারসভায়। অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীবিষ্ণুর আশীর্বাদ নিচ্ছিল। হঠাৎই গোরার মনে হল, আরে, ও তো কোথাও যায়নি। জগন্নাথ মন্দিরের কল্পবটের তলায় ওর দেহটা পড়ে রয়েছে। ওর আশপাশে অনেক মানুষ। তাদের কথাবার্তাও গোরার কানে আসছে। পদ্মনাভর কণ্ঠস্বরও ও শুনতে পেল। কাকে যেন বলছে, 'নাড়ি টিপে দ্যাখ তো প্রাণ এখনও রয়েছে কি না?'

হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে তখন উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে গোরা। বৃষ্টিধারায় ওর পুরো শরীর ঢোলের মতো ফুলে গিয়েছে। কে একজন ডানহাতটা তুলে নাড়ি দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর অঙ্গ স্পর্শ করা মাত্রই সে ছিটকে পড়ল। পদ্মনাভ জিগ্যেস করল, 'কী হল রে অঙ্গদ?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'পূজ্যপাদ, ঠিক বুঝতে পারলাম না। বডি ছোঁয়ামাত্রই মনে হল, কে যেন কারেন্ট মারল।'

'যতসব ফালতু কথা। এই...বডিটা কেউ উলটে দিয়ে দ্যাখ তো, নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে কি না?'

কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। মুখের ডানদিক মুক্তিমণ্ডপের মেঝেতে। বাঁদিকের চোখ গোরা পুরো খুলতে পারছে না, বৃষ্টির জন্য। কিন্তু টের পাচ্ছে, আশপাশে কী হচ্ছে। হালকা নীল কুয়াশায় মন্দির চত্বর ঢেকে গিয়েছে। পদ্মনাভর সঙ্গীদের চোখমুখে মারাত্মক ভয়। কেউ ওর কাছে আসতে চাইছে না। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে থাকার পর মাটির তলা থেকে গুম গুম শব্দ শুনতে পেল গোরা। কয়েক সেকেন্ড অন্তর শব্দটা তলা থেকে উঠে আসছে। মুক্তিমণ্ডপের মেঝে কাঁপতে শুরু করেছে।

ওর দেহটা নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়ে শলাপরামর্শ হচ্ছে। কে একজন বলল, 'পূজ্যপাদ, এই ভণ্ডটাকে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গেলে হয় না? টোটা গোপীনাথে এখন সংস্কারের কাজ চলছে। ওখানে একে পুঁতে দিলে কেউ টেরও পাবে না।'

পদ্মনাভ বলল, 'কিন্তু ডেডবডিটা ওখানে নিয়ে যাবি কী করে?'

'কেন, হস্তীদ্বার দিয়ে। এই দুর্যোগে কারও চোখে পড়বে না।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু মিডিয়ার কানে যদি কোনওভাবে কথাটা পৌঁছে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়ে যাবে। সুযোগটা নেবেন চিফ মিনিস্টার। গোবিন্দ সাহুকে উনি শেষ করে দেবেন। সেইসঙ্গে আমরাও বাঁচব না। না, না, ডেডবডি এই মন্দিরের কোথাও লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'পূজ্যপাদ, সমুদ্রের গভীরে নিয়ে গিয়ে ডেডবডিটা ফেলে দেওয়া যায় না?'

'না। শুনলাম, সমুদ্রের জল রাস্তায় উঠে এসেছে। আরও জলস্ফীতি হবে। ঢেউয়ে যদি ডেডবডিটা ফিরে আসে, তাহলে মুশকিল। লোকে দেখলেই চিনে ফেলবে। এর বুকে গুলির ক্ষত আছে। পুলিশ ধরে ফেলবে, ওকে খুন করা হয়েছে।'

'পূজ্যপাদ, যাই বলুন, লোকটাকে মন্দিরের ভিতর ডেকে আনা উচিত হয়নি। মন্দিরকে আপনি অপবিত্র করে দিলেন।'

শুনে পদ্মনাভ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'চুপ কর মূর্খ। মহামতি দীনবন্ধু প্রতিহার যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, পাঁচশো বছর পর আজ সেটা আমি পালন করলাম। তবে আমার দায়িত্ব এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আরও বড়ো কাজ বাকি রয়েছে।'

'কী কাজ পূজ্যপাদ?'

'টেররাইজ করা। হোম মিনিস্টারকে দিয়ে এর ভক্তদের এমন টেররাইজ করব, যাতে আগামী একশো বছর ভণ্ডটার নাম কেউ আর উচ্চারণ না করে। ওড়িশার কোনও মন্দির বা গৃহে কেউ শ্রীচৈতন্যের ভজনা করার সাহস না পায়।'

এরই মধ্যে কেউ একজন এসে খবর দিল, তীর্থযাত্রী সহায়ক কমিটির দাসুয়া লোকজন নিয়ে সিংহদ্বারের বাইরে জড়ো হয়েছে। ওরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। না পারলে না কি প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকবে। লোকটার কথাও শুনতে পেল গোরা। 'মন্দিরের দরজা আর বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা যাবে না, পূজ্যপাদ। যা করার দ্রুত করুন। না হলে মন্দিরের ভেতর আজ প্রচুর রক্তক্ষয় হবে।'

শুনে পদ্মনাভ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল বলে গোরার মনে হল না। পদ্মনাভ বলল, 'দাসুয়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে আজকাল। ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাস না। আমরা গোবিন্দ সাহুর প্ল্যানমাফিকই এগোব। তাতে রক্তক্ষয় হলে, হবে। যা, এখন চট করে কেউ দেখে আয়, কোইলি বৈকুণ্ঠতে মাটি কাটার কাজটা শেষ হল কি না।'

ওহ্, তাহলে মাটির তলা থেকে ধপ ধপ আওয়াজটা গোরা এই কারণেই শুনতে পাচ্ছিল। ওকে পুঁতে দেওয়ার উদ্যোগ চলছে। কোইলি বৈকুণ্ঠে মাটি কাটা হচ্ছে। নব কলেবরের সময় এই কোইলি বৈকুণ্ঠেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পুরনো দারুমূর্তি মাটির নিচে চাপা দেওয়া হয়। অত্যন্ত পুণ্যভূমি, স্বয়ং শিব এই কোইলি বৈকুণ্ঠের রক্ষাকর্তা। নব কলেবরের আগে, এখানেই তুলসী বাগানের মধ্যে চারটি পাথরের বেদির উপর অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নতুন দারুমূর্তি তৈরি করা হয়। খুব ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে মন্দিরে এসে, কোইলি বৈকুণ্ঠের বাগানে একবার ফুল ছিঁড়েছিল গোরা। বাবা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

বৃষ্টির প্রকোপ কমছে। কুয়াশা বাড়ছে। এই কারণেই উঠে বসে, পদ্মনাভ ও তার সঙ্গীদের দেখতে পেল না গোরা। সামনে তাকিয়ে ও অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল। মন্দিরের দক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে মুক্তিমণ্ডপে পা রাখছেন ঋষি পরাশর। তাঁর পিছনে মুনিঋষিদের দীর্ঘ লাইন। কুয়াশা ভেদ করে একে একে বেরিয়ে আসছেন ওঁরা। মন্দিরের ভিতরে কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। ওর দেহ ঘিরে মুনিঋষিরা বন্দনা শুরু করলেন। তারপর একজন এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন, 'মহাত্মন, আমি মার্কণ্ডেয় ঋষি। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।'

আপনা থেকেই গোরার হাত উঠে গেল আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। মুখে বলল, 'তথাস্তু'।

মার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন, 'মহাত্মন, মহাপ্রলয়ের সময় সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার পর ভগবান বিষ্ণু এই কল্পবটের মূলে লক্ষ্মীর সঙ্গে অবস্থান করতেন। প্রলয়ের জলে সাঁতার কাটতে কাটতে আমি এই কল্পবটের সম্মুখে এসে লক্ষ্মী-নারায়ণকে দর্শন করি। নারায়ণ তখন আমাকে আদেশ দেন, এই কল্পবটের উপর এক বটপত্রে বালমুকুন্দ শায়িত রয়েছেন...তাঁকে দর্শন করে এসো। আমি বালমুকুন্দকেও দর্শন করি। তারপর এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে আমি এই কল্পবটে থেকে যাই। তিন যুগ ধরে আমি এখানে রয়েছি। ফের প্রলয় উপস্থিত। নারায়ণের নির্দেশে ফের আমি আপনার কাছে এসেছি। এই কল্পবটের নিচে আপনাকে দর্শন করে আমি ধন্য হলাম।'

এবার ঋষি পরাশর এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি মহাপ্রভু। তার আগে আপনাকে ক্ষতমুক্ত করতে হবে। আপনি স্থির হয়ে বসুন। আপনার বুকে বিশল্যকরণীর প্রলেপ দিতে হবে। তারপর চোখের পাতায় অগ্নিবলা। বৈকুণ্ঠে যাওয়ার আগে, আপনি তাহলে... বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটছে, বা ঘটবে, তা সবই দেখতে পাবেন।'

দু'তিন দিন আগে গম্ভীরায় ঋষি পরাশর একবার হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু তখন গোরার মনে হয়েছিল, জ্বরের প্রকোপে ও অলীক দর্শন করছে। কিন্তু আজ সত্যিই আবার ঋষি পরাশর সশরীরে হাজির। মন্দিরের ভিতর এই মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে, সবই বাস্তব। নিশ্চয় সবই পূর্বনির্দিষ্ট। গোরা চুপ করে বসে রইল। ভিড়ের মাঝখান থেকে একইরকম দেখতে দুই ঋষি বেরিয়ে এলেন। দুজনের হাতে দুটি পাত্র। একজন বললেন, 'মহাপ্রভু, আমি অশ্বিনীকুমার। আর এ আমার ভ্রাতা রেবন্ত। আমরা সূর্যপুত্র এবং স্বর্গবৈদ্য। আমরাই দুই পাণ্ডব...নকুল ও সহদেব। আমি আপনার ক্ষতের শুশ্রূষা করব। আর রেবন্ত আপনার দৃষ্টি প্রদান করবে। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন মহাপ্রভু।'

অশ্বিনীকুমার বুকের ক্ষতে বিশল্যকরণী লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত নিরাময় হয়ে গেল। এবার ঋষি পরাশর বললেন, 'আমার সঙ্গে ৬৪ জন পুণ্যাত্মাও এসেছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আগে আপনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে বিশালদেহী একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি পরশুরাম। রামচন্দ্র আমার বৈষ্ণব ধনু ভঙ্গ করে আমার সব তেজ হরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর আমি মহেন্দ্র পর্বতে চলে যাই। সেই ত্রেতা যুগ থেকে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

লাইন থেকে মুনিঋষিরা এক একজন করে বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। একজন বললেন, 'আমি অশ্বত্থামা। দ্রোণাচার্যের পুত্র। সদা সৎপথে থাকতে পারিনি। কখনো কখনো ক্রোধে অন্ধ হয়ে নীতিহীন কাজ করেছি। যুদ্ধে অর্জুনের কাছে হেরে বনে চলে গিয়েছিলাম। তারপর সেই সত্যযুগ থেকে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন মহাপ্রভু।'

আর একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি পাণ্ডবপুত্র অর্জুন। এই কল্পবটের কাছে আমি আরও একবার এসেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে।

সখা শ্রীকৃষ্ণের পিণ্ডদান করার জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্য ঋষি পরাশর আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আপনাকে দেখে ধন্য হলাম। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।'

...পরিচয় পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বর্গবৈদ্য রেবন্ত এসে গোরার চোখের পাতায় অগ্নিবলার প্রলেপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ভেদ করে পুষ্পক রথ গোরার চোখে পড়ল। মুক্তিমণ্ডপের একপ্রান্তে কুবেরের রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছোটোবেলায় ভুবনেশ্বরের বাড়িতে নাটমন্দিরে বসে বাবার মুখে পুষ্পক রথের কথা শুনেছিল গোরা। হংসচালিত এই রথ আকাশপথে মহাবেগে ছুটতে পারে। আরোহীদের ইচ্ছানুসারে যে-কোনও জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। একবার নাকি লঙ্কার রাজা রাবণ এই রথ কুবেরের কাছ থেকে কেড়ে নেন। দীর্ঘদিন পুষ্পক তাঁর দখলেই ছিল। রামচন্দ্র লঙ্কা জয়ের পর পুষ্পক কুবেরকে ফিরিয়ে দেন।

পুষ্পক রথের দিকে তাকিয়ে গোরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল। অপূর্ব তার কারুকার্য। বিশ্বামিত্র এই বিমান নির্মাণ করেছিলেন। কুবেরকে এই রথ দান করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। রথে শোভা পাচ্ছে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ আর প্রাণময় তুরঙ্গ। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত বক্র। পুষা খচিত। পদ্মপরাগ মণ্ডিত, শুণ্ডে পদ্মপত্র শোভিত হস্তী। কোথাও বা পদ্মের উপর কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমান। পরশুরাম ওকে সশ্রদ্ধায় তুলে দাঁড় করালেন। তারপর পুষ্পকে বসিয়ে দিলেন। আকাশ থেকে কারা যেন পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। রথে আসীন হওয়ার পরই গোরার মনে হল, ওর শরীরটা অনেক ভারশূন্য হয়ে গিয়েছে।

একশত শ্বেতহংস পুষ্পক রথ নিয়ে আকাশে উঠল। নিচের দিকে তাকিয়ে গোরা দেখল, সমুদ্রের জল ফুঁসছে। মাঝ সমুদ্রে বিশাল দু'তিনটে জলস্তম্ভ। ঘুরতে ঘুরতে স্থলের দিকে এগোচ্ছে। ঘরবাড়ি সমূলে উৎপাটিত করে দিচ্ছে। বহু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির এমন রুদ্ররূপ আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি গোরা। দূর থেকে ও দেখল, হাজার হাজার পাখি দক্ষিণদিকে উড়ে যাচ্ছে। তাদের আর্ত চিৎকার ওর কানে তালা লাগিয়ে দিল। প্রলয়ের বার্তা পেয়েছে। সেই কারণেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ। ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ পেরিয়ে আরও উপরে ওঠার সময় জগন্নাথের মন্দিরের চুড়ো গোরার চোখে পড়ল। যেন ছোট্ট একটা ঢিবি। ওর মনে পড়ল, বাবা একদিন বলেছিল, সমুদ্রে যতই জলোচ্ছ্বাস হোক না কেন, জগন্নাথের মন্দির কোনওদিন ডুববে না। যদি ডোবে, তাহলে জানবি, সেই দিনটাই পৃথিবীর শেষদিন। কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো ও বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছে। কথাটা মনে হতেই মায়ের কথা গোরার মনে এল। দিনকয়েক আগে ভুবনেশ্বরের বাড়ি থেকে পুরীতে যাওয়ার জন্য ও যখন গাড়িতে উঠছিল, তখন মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে আর বোধহয় আমার দেখা হবে না বাছা। বলতে পারিস, কাকে নিয়ে আমি বাঁচব?'

মাকে বুকে টেনে নিয়ে গোরা সান্ত্বনা দিয়েছিল, 'এ কথা কেন বলছ মা? পুরী তো মাত্র দেড় ঘণ্টার রাস্তা। তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন গম্ভীরায় চলে এসো। একটু অপেক্ষা করো। কয়েকদিন পরেই পুরন্দরদাকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

মা বলেছিল, 'তুই যে শ্রীক্ষেত্রে থাকবি না বাছা। তোর অনেক কাজ। ঈশ্বর তোকে দিয়ে অনেক কাজ করাবেন। আমি জানি। জানি বলেই, আমার আরও বেশি কষ্ট প্রিয়ার জন্য। মেয়েটা তোকে মনে মনে স্বামী বলে জেনে এসেছে। ওর সামনে লম্বা জীবন। কীভাবে বাঁচবে রে মেয়েটা?'

বারান্দায় প্রিয়া তখন দাঁড়িয়ে। নিথর এক মূর্তির মতো। ওর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। ওকে ধরে রয়েছেন বেলি নানী... অচেতন হয়ে হঠাৎ যাতে পড়ে না যায়। একটু আগেই প্রিয়া জুঁই ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে, গড় হয়ে প্রণাম করেছে ওকে। গোরা সেই মালাটা ওর গলায় ফিরিয়ে দিতেই চমকে উঠেছিল প্রিয়া। আর তখনই ওর চোখে টলটল করে উঠেছিল অশ্রু। ওর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। প্রিয়া হয়তো সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল, যা পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভুকে বলেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। 'আমায় ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন। আমি বাঁচব কী নিয়ে?' মহাপ্রভুকে অবশ্য ওর মতো বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি সেই দিন। কেননা, বিষ্ণুপ্রিয়া যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন।

রাজহংসের দল আকাশপথ দিয়ে পুষ্পক রথ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিচে বিচিত্র বর্ণের মেঘমালা। সেই মেঘের কোলে প্রিয়ার মুখটা দেখতে পাচ্ছে গোরা। সাংসারিক মায়ায় কখনো আবদ্ধ হয়নি ও। মা ছাড়া আর কোনও নারী ওর জীবনে আসেওনি। তবুও কেন পিছটান? প্রিয়ার মুখটা কেন যে ওকে এত টানছে, গোরা বুঝতে পারল না। সেই মুখটা ক্রমেই বদলে যেতে শুরু করল। আশপাশের পরিবেশও। গোরা দেখল, পালঙ্কে ও শুয়ে রয়েছে। প্রিয়া ওর পদসেবা করতে করতে অশ্রুমোচন করছে। ঘরের এককোণে পিদিম জ্বলছে। তবুও সেই আলোয় প্রিয়ার সিঁথিতে সিঁদুর উজ্জ্বল। গোরা বলল, 'কাঁদো কেন প্রিয়ে? তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া। আমায় দুঃখ দিচ্ছ কেন?'

প্রিয়া বলল, 'লোকে বলছে, তোমার দাদা যা করেছিলেন, তুমিও নাকি তা করবে?'

'লোকের কথা শুনছ কেন? আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমার অনুমতি নিয়ে যাব।'

'তুমি আর যা-ই করো, বাড়ি ছেড়ে যেয়ো না। লোকে তাহলে আমার নিন্দে করবে। বলবে, আমি তোমায় উত্যক্ত করেছি। তাই তুমি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছ।'

'গার্হস্থ্য জীবন আমার জন্য নয় প্রিয়ে। শ্রীকৃষ্ণভজনা করার জন্যই আমার জন্ম। তুমিও কৃষ্ণভজনা করো। তাহলেই আমায় কাছে পাবে।'

রাত কেটে গিয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুমতি আদায় করতে। বিশ্বরূপ দর্শন করাতে হয়েছিল। শেষে প্রিয়া বলেছিল, 'জানি, তোমাকে আটকানোর সাধ্য আমার নেই। এও জানি, এই জীবনে আপনার সঙ্গে আমার আর কোনওদিন দেখা হবে না। কিন্তু কীভাবে আমি বুঝতে পারব, তুমি আর নেই?'

'আমার একটা দারুমূর্তি তৈরি করাবে তুমি। দু'হাত তোলা, নৃত্যরত অবস্থায়। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তুমি, নিত্য আমার পূজা করবে। যেদিন দেখবে, দারুমূর্তিতে আমার

দু'হাত নিচে নেমে এসেছে, সেদিনই বুঝবে আমি আর ইহলোকে নেই।'

পাঁচশো বছর আগে বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পেরেছিলেন, মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে তার নিদর্শন এখনও রয়েছে... নিমকাঠের তৈরি মহাপ্রভুর সেই মূর্তি। উর্ধ্ববাহু নয়, তার দু'হাত এখন সামনের দিকে বাড়ানো। আলিঙ্গনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু প্রিয়া কী করে বুঝবে, পুষ্পক রথে ও এখন বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছে?... চোখের সামনে থেকে দৃশ্যপট সব বদলে গেল। গোরার মনে হল, মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে শান্তি পেত। কথাটা ওর মনে হওয়া মাত্র, গোরা দেখল পুষ্পক রথের দিক পরিবর্তন হয়েছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই ওর চোখে পড়ল, বিছানায় শুয়ে মা কাঁদছে। মায়ের পায়ের তলায় বসে রয়েছে প্রিয়া আর অম্বা। ওদের দুজনেরই চোখ টিভির পর্দার দিকে।

রথে ওঠার আগে ওর চোখে রেবন্ত অগ্নিবলা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাই উপর থেকেই গোরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। কাঁদতে কাঁদতে মা বলছে, 'ছেলেটা সারাজীবন আমায় কাঁদিয়ে যাবে প্রিয়া। আমি কোনওদিন শান্তি পাব না।'

প্রিয়া বলল, 'অহেতুক উদ্বিগ্ন হয়ো না মা। তোমার ছেলে স্বয়ং ঈশ্বর। কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না। টিভির খবর বিশ্বাস কোরো না মা। ওরা অনেক খবর দেখায়, যা সত্যি নয়।'

'না রে মা। আমার মনে কুডাক দিচ্ছে। গোরার কুষ্ঠিতে গুপ্তহত্যার যোগ রয়েছে। এতদিন তোদের বলিনি। বহুদিন আগে কথাটা আমায় বলেছিলেন, এক মহাযোগী।'

'টিভিতে বলল, তোমার ছেলে জগন্নাথ মন্দিরেই রয়েছেন মা। চিফ মিনিস্টারও সেখানে আছেন। তুমি চিন্তা কোরো না। কেউ ওঁর ক্ষতি করতে পারবে না।'

'চিন্তা করছি কী আর সাধে? দেখছিস না, মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মন্দিরের ইতিহাসে এর আগে একবারই দরজা বন্ধ হয়েছিল, যেদিন মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছিলেন। লোকে বলে, ওঁকে খুন করা হয়েছিল। আমার গোরার কপালে কী আছে, কে জানে?' কথাগুলো বলেই মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওর অন্তর্ধানের খবরটা তাহলে টিভিতে দেখাচ্ছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাটেলাইট টেলিভিশনের যুগে এখন একমুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের ভিতর ওর সঙ্গে গোবিন্দ সাহু আর পদ্মনাভর দল কী আচরণ করেছে, মা হয়তো তাও জেনে যাবে, অল্প সময়ের মধ্যে। মা কি সহ্য করতে পারবে সেই খবর? কথাটা ভাবতে ভাবতে গোরা দেখল, ঝড় উঠেছে। ঘূর্ণি বাতাসের দুটি স্তম্ভ ভুবনেশ্বর ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছে। জলস্রোত গ্রাস করছে জনপদ। ওদের বাড়ির মন্দির ঘেরা নারকেল আর সুপারি গাছগুলো উপড়ে গেল। শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে প্রিয়া আর অম্বা। বিস্ফারিত চোখে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মৃত পাখি উড়ে এসে পড়ল বারান্দায়। একটার পর একটা। কাছাকাছি কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

তারপরই পাঁচিল টপকে প্রবল বেগে জলস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওদের বাড়ি!

শেষ পর্ব

গোরার কানের পিছনে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে, কী যেন দেখে আত্মানন্দ বলল, 'জয়দেব কুইক, মহাপ্রভুকে এখুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

টুবাই বলল, 'এই দুর্যোগে যাবে কী করে?'

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে আত্মানন্দ বলল, 'বৃষ্টি ধরে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তবে তার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। সবথেকে কাছে কোন নার্সিংহোম আছে, কেউ বলতে পারবে?'

'বৈকুণ্ঠ নার্সিং ক্লিনিক। এই কাছেই, গঙ্গামাতা মঠের উলটোদিকে।'

'তাহলে চলো সেখানে। সিংহদ্বার দিয়ে এখন যাওয়া যাবে না। বাইরে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের সামনে দিয়ে মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় নিয়ে গেলে মন্দিরে ভাঙচুর হয়ে যাবে। মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোনও রাস্তা আছে? কেউ জানো?'

পুরন্দর চুপচাপ দাঁড়িয়ে টুবাই আর আত্মানন্দের কথোপকথন শুনছিল। গঙ্গামাতা মঠের নামটা শুনতেই ও বলল, 'আমি জানি। এসো, আমার সঙ্গে এসো।'

কথাগুলো বলেই মুক্তিমণ্ডপের মেঝে থেকে পুরন্দর পাঁজাকোলা করে তুলে নিল গোরাকে। তারপর আত্মানন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা খুব শর্টকাট রাস্তা আছে মন্দির থেকে। মিনিট কয়েক লাগবে বৈকুণ্ঠ ক্লিনিকে যেতে। ওই রাস্তা দিয়েই আমরা এখুনি মন্দিরে এলাম। রাস্তাটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বটে, তবে মন্দিরের বাইরে আমি বেরোব না। গঙ্গামাতা মঠ পর্যন্ত তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আমি আবার ফিরে আসব।'

আত্মানন্দ বলল, 'এই সময় কী তোমার একা মন্দিরে থাকা ঠিক হবে?'

'আমার কথা ভেবো না বন্ধু। জীবনে একটা কাজ করা এখনও আমার বাকি আছে। সেই কাজটা শেষ করেই আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব।'

মহাপ্রভুকে নিয়ে সবাই এমন উদ্বিগ্ন যে, কেউ আর কোনও প্রশ্ন করল না। পুরন্দরের পাশাপাশি বাকি তিনজন হাঁটতে লাগল। টুবাই আর জয়দেব চোখের জল মুছতে মুছতে যাচ্ছে। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়েই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল পুরন্দর। গোরাভাইয়ের শরীরটা নিস্তেজ হয়ে রয়েছে। পাঁজরের কাছে একটা বুলেটের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, পিঠের ও পাশ দিয়ে বুলেটটা বেরিয়ে গিয়েছে। তার মানে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে কেউ গোরাভাইকে গুলি করেছিল। পুরন্দর নিশ্চিত, এ আর কারও কাজ নয়। পদ্মনাভ ছাড়া আর কেউ এমন নির্মম আচরণ করতেই পারেন না। গর্ভগৃহের দিকে এগোনোর সময় পুরন্দর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, পদ্মনাভকে আজই ও এমন শাস্তি দেবে, লোকটা যা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

মন্দির থেকে গঙ্গামাতা পঠ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গপথ আছে। সেই পথ দিয়েই পুরন্দর বৈকুণ্ঠ নার্সিং ক্লিনিকে নিয়ে যাবে গোরাভাইকে। কয়েকদিন আগে এই সুড়ঙ্গপথটা আবিষ্কার করেছে আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার (এএসআই) লোকেরা। সুড়ঙ্গের কথা

ওরা অবশ্য জেনেছিল, প্রাচীন এক পুঁথি পড়ে। গোপনে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছিল। তখনই জানতে পারে, মঠের নিচ দিয়ে তিনদিকে সুড়ঙ্গপথ রয়েছে। একটা গিয়েছে রাজার বাড়ির দিকে। একটা এসেছে জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত। আর তৃতীয়টা গিয়েছে একেবারে সমুদ্রের তীরে। এই সুড়ঙ্গের কথা সরকারি দু'চারজন আমলা ছাড়া আর জানেন মঠের মোহান্তজি। পুরন্দরের জানার কথা নয়। কিন্তু ও জানতে পেরেছে মোহান্তজির কাছ থেকে। দুর্যোগ শুরু হওয়ার ঠিক দু'দিন পর মোহান্তজি গম্ভীরায় গিয়েছিলেন গোরাভাইয়ের কাছে। তখনই কথায় কথায় পুরন্দরকে বলেন, গঙ্গামাতা মঠে না কি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রায়ই যেতেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে গোপনে কথা বলার জন্য। রাজবাড়ি থেকে রাজা না কি প্রায়ই সুড়ঙ্গপথে মঠে যেতেন। যাতে তাঁর অমাত্যরাও টের না পান।

পুরন্দর তখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি মোহান্তজির কথা। যাতায়াতের পথে বাইরে থেকে গঙ্গামাতা মঠ ওর চোখে পড়েছে অনেকবার। বৈষ্ণবদের এইরকম অনেক মঠ পুরীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাজার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ওই মঠটাই বেছে নিয়েছিলেন কেন, তা জানার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল ওর। এই কথাগুলো আগে জানতে পারলে মোহান্তজিকে হয়তো ও খুন করত। কেননা, তখন জানত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভণ্ড, প্রতারক। কিন্তু গোরাভাইয়ের সংস্পর্শে এসে এখন ও নিজেকে অনেক বদলে ফেলেছে। তাই সেদিন মোহান্তজিকে ও বলেছিল, 'আমাকে একবার সুড়ঙ্গপথগুলো দেখাতে পারেন?'

মোহান্তজি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। আমরা তো শুনেছি, গোবিন্দ বিদ্যাধর যখন মহাপ্রভুকে হত্যা করার জন্য মন্দিরে নিয়ে যান, তখন তাঁর দলের লোকেরা অনেকেই বিদ্রোহ করেছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন মহাপ্রভুকে বাঁচানোর জন্য, এই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তাঁকে গোপনে রাজার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

সেদিনই বৃষ্টির মধ্যে মোহান্তজির সঙ্গে গঙ্গামাতা মঠে গিয়ে সুড়ঙ্গপথগুলো দেখে এসেছিল পুরন্দর। দুজন পাশাপাশি হাঁটা যায়, এমন পথ। খানিক দূরে দূরে আলো রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। সেইসঙ্গে বাতাস চলাচলেরও ব্যবস্থা। এএসআইয়ের লোকেদের না কি ধারণা, সুড়ঙ্গপথটা তৈরি করা হয়েছিল ছয়শো বছর আগে। তার মানে মহাপ্রভু পুরীতে আসার অনেক আগে। সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে আসার পর মোহান্তি বাবাজি সেদিন বলেছিলেন, এই গঙ্গামাতা মঠেই না কি বাস করতেন বাসুদেব সার্বভৌম নামে এক মহাপণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনিই প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলেন পুরীতে। পুরীর ইতিহাস অবশ্য পুরন্দর জানে না। মঠের ভিতর ঢুকে ওর মনে হয়েছিল, মহান এক মানুষের বাসস্থান কী অনাদরেই না পড়ে আছে। মঠের অবস্থা বিষ্ণুমন্দিরের থেকেও খারাপ।

আত্মানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এই আধ ঘণ্টা আগে, ওই সুড়ঙ্গপথ দিয়েই মঠের দিক থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যন্ত এসেছে পুরন্দর। এখন ওকে যেতে হবে গর্ভগৃহ থেকে মঠের দিকে। নিচে গলিঘুঁজি চিনে ঠিক পথে যেতে পারবে তো? পুরন্দর মনে মনে বলল, পারবে। ওকে পারতেই হবে। পরক্ষণেই ওর মনে একটা প্রশ্ন, দুপুরে ভোগের এই সময়টায়

মন্দিরের গর্ভগৃহের কাছাকাছি অনেকেরই থাকার কথা। তারা যদি বাধা দেয়, তাহলে মুশকিল হবে। কথাটা মনে হতে পুরন্দর ঠিক করে নিল, দ্বিধা করার কোনও প্রয়োজনই নেই। গোরাভাই সঙ্কটজনক অবস্থায়। যে করেই হোক, ওঁকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতেই হবে। তার জন্য যদি দেবতার সামনে কয়েকটা লাশ ওকে ফেলতে হয়, তাতেও পুরন্দর পিছপা হবে না। একে তো আত্মানন্দ ওদের সঙ্গে রয়েছে। তার উপর মন্দিরের পাঁচিল টপকানোর আগে আত্মানন্দ ওর হাতে ছয় ঘড়া একটা রিভলবার গুঁজে দিয়েছিল। সেটা এখন ওর কোমরে গোঁজা আছে। আর রয়েছে একটা মোবাইল ফোনের সেট।

ঘণ্টা দুয়েক আগে আত্মানন্দের সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটাও কিন্তু আশ্চর্যের! কোতোয়ালি থানায় জল ঢুকে যাওয়ার পর নিজেকে বাঁচানোর তাগিদেই পুরন্দর ছাদে উঠে গিয়েছিল। তখন বৃষ্টির তোড় কমতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের আলোয় ও দেখেছিল, থানার পিছনে খানিকটা জঙ্গল। তার পিছনে পিচের রাস্তায় মাঝেমধ্যে গাড়ি চলাচল করছে। তার মানে পিছনকার রাস্তায় জল জমেনি। ছাদ থেকেই জলের মধ্যে ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর কখনো সাঁতার কাটতে কাটতে, কখনো জল ঠেলে ও রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেই সময় একটা অ্যাম্বুলেন্স ওর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ড্রাইভারের সিট থেকে আত্মানন্দ ওকে ডাকে, 'পুরন্দর উঠে এসো। তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম। তোমার গোরাভাই খুব বিপদের মধ্যে পড়েছে। এখুনি মন্দিরের ভিতর আমাদের ঢুকতে হবে।' বাকি কথাগুলো গাড়ির মধ্যেই শুনে নিয়েছিল পুরন্দর। মন্দিরের রাস্তায় ঢুকে ওরা হঠাৎই জয়দেব আর টুবাইয়ের দেখা পেয়েছিল।

গর্ভগৃহের কাছে এসে পুরন্দর দেখল, পান্ডারা কেউই নেই। পুরো মন্দির চত্বর একেবারে শুনশান। বিগ্রহগুলো কাপড় দিয়ে ঢাকা। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে পুরন্দর ঠিক খুঁজে বের করল, সুড়ঙ্গপথের দরজাটা। তারপর আত্মানন্দকে বলল, 'আমি গঙ্গামাতা মঠ দিয়েই এখানে তোমাদের নিয়ে এসেছিলাম। এখান দিয়ে নেমে যাও। পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যেই তোমরা নার্সিংহোমে পৌঁছে যাবে।'

রেন কোটের পকেট থেকে টর্চ বের করে আত্মানন্দ সিঁড়িতে আলো ফেলল। টুবাই আর জয়দেব ধরাধরি করে গোরাভাইকে নামাচ্ছে। ওরা অদৃশ্য হওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল পুরন্দর। তারপর মনস্থির করার জন্য চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল। এবার ওকে আসল কাজটা করতে হবে। যে কাজটা করার জন্য ও মুখিয়ে আছে। পদ্মনাভকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে পদ্মনাভ মহারাজকে? সেবাইতদের অফিসে? বাড়িতে, না কি অন্য কোথাও?

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পদ্মনাভ, আজ খুঁজে বের করবেই পুরন্দর। সেবাইতদের অফিসের দিকে যাওয়ার আগে রত্নবেদির সামনে এসে দাঁড়াল ও। একটানে কাপড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে বিগ্রহগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বিড়বিড় করে বলল, 'না জেনে জীবনে অনেক পাপ করেছি। ক্ষমা করো হে প্রভু। আমায় ক্ষমা কোরো।'

বৃষ্টি পুরোপুরি থেমে গিয়েছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। সাতদিন তাণ্ডব

চালানোর পর প্রকৃতি হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছে। কোমরের গোঁজা থেকে রিভলবারটা বের করে হাতে নিয়ে এবার দৃপ্ত পায়ে সেবাইতদের অফিসের দিকে এগোতে লাগল পুরন্দর। একবার করে পা ফেলছে, আর ওর মনে পড়ছে বাল্যকালে নিগৃহীত হওয়ার কথা। পাতাল আশ্রমের অন্ধকারে, পূতিগন্ধময় চাতালে ক্লিন্ন জীবনযাপনের কথা। এই জীবন ওর প্রাপ্য ছিল না। 'না', বলেই মাথা নাড়ল পুরন্দর। পদ্মনাভ...হ্যাঁ, ওই ঘৃণ্য পশুটাই এর জন্য দায়ী। নিজের কাম চরিতার্থ করতে গিয়ে লোকটা ওকে পৃথিবীতে এনেছিল। ওকে মেরেও ফেলতে চেয়েছিল জন্মের পর। বেলি নানীর চোখে না পড়লে ও হয়তো বাঁচতই না। পাতাল ঘর থেকে তুলে এনে নানীই ওকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই পদ্মনাভ লোকটাকে ক্ষমা করা যায় না।

সেবাইতদের অফিস ঘরের সামনে এসে পুরন্দর দেখল, বাইরে লোকজন কেউ নেই। অন্য দিন এই মাঝদুপুরে লোকের ভিড়ে অফিস ঘরে ঢোকা যায় না। আজ ফাঁকা, দুর্যোগের কারণেই বোধহয়। বাইরে চাতালে দাঁড়িয়ে ও ভাবতে লাগল, কোথায় থাকতে পারেন পদ্মনাভ মহারাজ? বিষ্ণুমন্দিরে থাকার প্রশ্নই নেই। গ্রেনেড ছুড়ে বিষ্ণুমন্দিরের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা। তাহলে? এই মুহূর্তে উনি বাড়িতে থাকলেও থাকতে পারেন। ওঁর বাড়ি সেই স্বর্গদ্বারের কাছে। কিন্তু একবার মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলে, আর ফিরে আসা যাবে না। অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবার মাঝে হঠাৎই পুরন্দরের চোখে পড়ল, এক সেবাইত বেরিয়ে আসছেন। ওকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'এই তুই পুরন্দর না?'

মনে মনে প্রমাদ গুনল পুরন্দর। অস্বীকার করার কোনও মানে হয় না। সেবাইতকে ও চেনে, গদাধর দইতাপতি। পুরন্দরের ডান হাত। এঁরই জন্য ছোটোবেলায় একবার নাকখত দিতে হয়েছিল ওকে। খুব সামান্য অপরাধে। গদাধর দইতাপতির খড়মে না জেনে ও পা দিয়ে ফেলেছিল। বিষ্ণুমন্দিরে মাহেরিদের ঘরের বাইরে সেই খড়ম রাখা ছিল। সেই লাঞ্ছনার কথা এতদিন পরেও পুরন্দরের মনে পড়ে গেল। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হবে। গদাধর দইতাপতি নিশ্চয়ই জানেন, পদ্মনাভ এখন কোথায় আছেন? কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও দণ্ডবৎ হয়ে বলল, 'আজ্ঞে মহারাজ।'

'কোথায় ছিলিস তুই অ্যাদ্দিন?'

'কলকাতায়। পদ্মনাভ মহারাজ আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন। সেই কাজটা হয়ে গেছে। তাই ওকে তা জানাতে এসেছি। এ ক'দিন জল-ঝড়ে আটকে পড়েছিলাম।'

'তোর সঙ্গে পদ্মনাভর দেখা হয়নি?'

'না মহারাজ। মুক্তিমণ্ডপে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, উনি সেখানে নেই।'

'থাকবে কেন? যা করার, তা তো করে ফেলেছে। তুই কোইলি বৈকুণ্ঠে চলে যা। ওখানে এখনও পদ্মনাভ রয়েছে। ভণ্ডটাকে বোধহয় এতক্ষণে পুঁতে ফেলেছে।'

'না মহারাজ। উনি সেখানেও নেই।'

'তাহলে বোধহয় গোবিন্দ সাহুর সঙ্গে কোথাও গিয়েছে। দাঁড়া, একবার ফোন করে দেখি।'

কথাটা বলেই ফের অফিস ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন গদাধর দইতাপতি। পিছনে

পিছনে পুরন্দরও ভিতরে ঢুকল। ছোটোবেলা থেকেই ওর জীবন মন্দির চত্বরে কেটেছে। কিন্তু কোনওদিন সেবাইতদের অফিস ঘরে ঢোকার কথা ভাবতেও পারেনি। একটা পাপ কাজ করার জন্য ওকে আজ ঢুকতে হল। ঘরে ঢুকেই ও দরজাটা বন্ধ করে দিল। গদাধর দইতাপতি ল্যান্ড লাইন থেকে ফোন করায় ব্যস্ত। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে পুরন্দর ওঁর মাথায় ঠেকাল। তারপর হিমশীতল গলায় বলল, 'পদ্মনাভ কোথায় আছে, সেটা জেনে আমায় বলে দে। আমার কথা ওকে জানালে, এখুনি মাথা ফুটো করে দেব।'

রিভলবার দেখে আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে গদাধর দইতাপতির। কাঁপা হাতে রিসিভারটা ধরে রয়েছেন। লাইনটা কানেক্ট হয়েছে। ও পাশ থেকে পদ্মনাভ মহারাজের গলা শুনতে পেল পুরন্দর, 'হ্যালো'।

এ পাশ থেকে গদাধর বললেন, 'গদাধর বলছি। পদ্মনাভ, তুমি কোথায়? সব ঠিক আছে তো?'

'আমি এখন কোইলি বৈকুণ্ঠে। না, কিচ্ছু ঠিক নেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়েছে এখানে। ভণ্ড সাধুটার লাশ মুক্তিমণ্ডপ থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে লাশটা ওখানেই পড়েছিল। আমি লোকজন নিয়ে এখানে এসেছিলাম মাটিতে পুঁতে দেওয়ার সব ব্যবস্থা করতে। এখন ওরা এসে বলছে, লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে। কী করি বলো তো?'

গদাধর বললেন, 'তুমি কি ওখানে এখন একা?'

'হ্যাঁ, আমি অফিস ঘরের দিকে যাচ্ছি। তুমি থেকো।'

এ পর্যন্ত শুনেই গদাধর দইতাপতির হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে লাইন কেটে দিল পুরন্দর। ওর যা জানার, জেনে নিয়েছে। রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে রিভলবারের বাট দিয়ে ও মারাত্মক আঘাত করল গদাধর দইতাপতির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে দেহটা লুটিয়ে পড়ল কাটা গাছের মতো। পা থেকে খড়ম দুটো ছিটকে গিয়েছে। একটা খড়ম পায়ে গলিয়ে নিয়ে শরীরের সব শক্তি দিয়ে গদাধরের বুকে লাথি মারল পুরন্দর। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ছটফট করতে করতে দেহটা একসময় নিস্তেজ হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে গুলি করে গদাধর দইতাপতিকে ও মারতে পারত। কিন্তু ঘৃণ্য এই লোকটার জন্য একটা গুলি খরচ করার কোনও মানেই হয় না। দরজাটা ফের ভেজিয়ে দিয়ে ও বাইরে বেরিয়ে এল। আসল কাজটাই এখনও হল না। সেটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার।

মন্দির চত্বর এখনও শুনশান। মুক্তিমণ্ডপের দিকে হাঁটার সময় ও দূর থেকে দেখতে পেল, পদ্মনাভ মহারাজ ওর দিকেই হেঁটে আসছেন। দেখে প্রবল ক্রোধে ওর দু'হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল। বুকের ভিতর আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল। পদ্মনাভর সঙ্গে দূরত্বটা মেপে নিয়ে ও একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে... অপেক্ষা করতে লাগল। প্রথম আঘাতটা করার আগে লোকটা যাতে কিছুতেই আন্দাজ করতে না পারে। এই লোকটার জন্য ওঁর জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে। শুধু ওকেই নয়, বেলি নানী, বিশাখা মা,

অম্বালিকাকেও লোকটা শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এই লোকটার জন্যই ওর গোরাভাই এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। মন্দাকিনীর মতো ওর বাবাকেও এমনভাবে মারতে হবে, যাতে বুকের আগুন চিরদিনের জন্য ঠান্ডা হয়ে যায়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পদ্মনাভ মহারাজকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল পুরন্দর। পিছন থেকে লাফিয়ে উঠে ও ঘাড়ের পিছনে মারাত্মক একটা আঘাত করল। কুংফুর এই স্টাইল ও শিখেছিল ভুবনেশ্বরের এক ব্ল্যাকবেল্টের কাছে। কাঁধের পেশিতে এমন একটা জায়গায় আঘাত, যা দুটো হাতকে অবশ করে দেবে কিছুক্ষণের জন্য। ইচ্ছে করলেও পদ্মনাভ এখন আর হাত চালাতে পারবেন না। চাতালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছেন। চিবুক কেটে রক্ত ঝরছে। ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে গিয়েছে। ওকে দেখে কোনওরকমে পদ্মনাভ বললেন, 'পুরন্দর তুই!'

পদ্মনাভর মুখে নিজের নামটা শুনে ক্রোধ আরও বেড়ে গেল পুরন্দরের। কোনও উত্তর না দিয়ে ফের ও পা চালাল। মুক্তিমণ্ডপের দিকে ফের হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পদ্মনাভ। হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। পুরন্দর দু'পা এগিয়ে যেতেই, ডান হাত তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে উনি বললেন, 'আমায় মেরে ফেলিস না পুরন্দর। তোকে আমি প্রচুর টাকা দেব।'

মাস ছয়েক আগে পুরন্দর চিন্তাও করতে পারত না, দোর্দণ্ডপ্রতাপ পদ্মনাভ মহারাজ ওঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণভিক্ষা করছেন। তখন হেড কোয়ার্টার্স থেকে উনি নির্দেশ দিতেন। প্রাণ তুচ্ছ করে সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে ও পালন করে এসেছে। সফল হলে একটা সাধুবাদও জুটত না। আর ব্যর্থ হলে তাচ্ছিল্য, অপমান। প্রতি কথায় 'জারজ' শব্দটা ওকে শুনতে হত। লোকটা ওকে মানুষ বলেই মনে করত না। এখন টাকার টোপ দিচ্ছে! তীব্র ঘৃণায় ও ফের একটা লাথি মারল পদ্মনাভ মহারাজের কোমর লক্ষ্য করে। ওর শরীরে এখন অসুর ভর করেছে। এক একটা আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছেন পদ্মনাভ মহারাজ। টলতে চলতে উঠে দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি করছেন। ওঁর রক্তাক্ত মুখটা দেখে তৃপ্তি পেল পুরন্দর। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মুক্তিমণ্ডপের পাথুরে জমির উপর দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পদ্মনাভ মহারাজকে ও কোইলি বৈকুণ্ঠে নিয়ে এল।

নবকলেবরের সময় প্রভু জগন্নাথের দারুমূর্তি যেখানে সমাধিস্থ করা হয়, সেখানে পৌঁছে পুরন্দর দেখল, এক মানুষ সমান একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে। সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের হাতে কোদাল-গাঁইতি। তাহলে এই লোকগুলোই গোরাভাইকে পুঁতে দেওয়ার আয়োজন করছিল! তাদের উদ্দেশে হুঙ্কার দিল পুরন্দর, 'এই, ভাগ এখানে থেকে। না হলে তোদের সবাইকে কবর দেব।'

পদ্মনাভ মহারাজকে ওই অবস্থায় দেখবে, লোকগুলো আশা করেনি। পুরন্দরের রণমূর্তি দেখে লোকগুলো দৌড়ে গাছের আড়ালে সরে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন পদ্মনাভ মহারাজ। লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিচ্ছেন। কথা বলার ক্ষমতাটাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছেন। হাত দুটো ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বুকের কাছে জড়ো করা। দৃশ্যটা

দেখে খুব তৃপ্তি পেল পুরন্দর। তখনই ও সিদ্ধান্ত নিল, পদ্মনাভ মহারাজকে ও জ্যান্ত কবর দেবে। হ্যাঁ, সেটাই ওঁর উচিত শাস্তি হবে। গোরাভাইয়ের জায়গায় অনন্তকাল ধরে লোকটা শুয়ে থাকবে কোইলি বৈকুণ্ঠের জমির তলায়। পবিত্র ভূমিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কথাটা মনে হতেই লাথি মেরে ও পদ্মনাভ মহারাজকে গর্তের ভিতর ফেলে দিল। তারপর কোদাল দিয়ে মাটি ফেলতে লাগল, গর্তটা ভরাট করার জন্য।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার পর হঠাৎ ক্লান্তি অনুভব করল পুরন্দর। কয়েক পা হেঁটে ও গিয়ে বসল কল্পবটের তলায়। এবার ওকে যেতে হবে বৈকুণ্ঠ নার্সিং ক্লিনিকে। নাহ্, গোরাভাইকে ও আর পুরীতে থাকতে দেবে না। একটু সুস্থ হলে গোরাভাইকে ও নিয়ে যাবে বিশাখা মায়ের কাছে। দুই ভাই মিলে জীবনটা উৎসর্গ করবে ভগবদ্‌ভক্তিতে। ভুবনেশ্বরের বাড়ির নাটমন্দিরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরন্দরের। আহ্, কী শান্তি সেখানে। সন্ধে হলেই নাটমন্দিরের সিঁড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে অম্বা। মা কীর্তন শুরু করবে। উঠোনে ভক্তসমাগম হবে। আনন্দে ভরে যাবে জীবনটা। অম্বার কথা মনে হতেই অবসাদ কেটে গেল পুরন্দরের। বৈকুণ্ঠ নার্সিংহোমে যাওয়ার জন্য ও উঠে দাঁড়াল।

ঠিক তখনই আত্মানন্দের ফোন এল ওর কাছে, 'তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে ভাই?'

পুরন্দর বলল, 'হ্যাঁ, এইমাত্র শেষ করলাম। আগে বলো, গোরাভাই কেমন আছে?'

'একটা মিরাকল ঘটে গেছে। ওঁকে যখন এখানে নিয়ে আসি, তখন বুকে একটা বুলেট ইনজুরি ছিল, তুমি কি সেটা লক্ষ করেছিলে?'

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম।'

'বৈকুণ্ঠে নিয়ে আসার পর যখন ডাক্তাররা তোমার গোরাভাইকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রেখে, তৈরি হচ্ছিলেন, তখন দেখেন সেই ইনজুরিটা আর নেই। সিম্পলি ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে।'

'কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি। কেমন করে এই মিরাকল ঘটল, সেটা জানতে চেয়েছিলেন জয়দেব। গোরাভাই অদ্ভুত উত্তর দিলেন। কে এক ঋষি পরাশর নাকি ও টি-তে এসেছিলেন। তিনিই বিশল্যকরণী নামে এক ভেষজ ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন। কয়েক পলকের মধ্যে ক্ষত সেরে গেছে। ভাই, ঋষি পরাশর কে, তুমি কি জানো?'

পুরন্দর কোনওদিন নামও শোনেনি। মনে মনে ও বলল, 'আমি মহামূর্খ, জানব কী করে?' মুখে বলল, 'না, জানি না। গোরাভাই কেমন আছে, তা তো বললে না?'

'উঠে বসেছেন। টুবাইয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে চিফ মিনিস্টার দেখা করতে এসেছেন। তোমার গোরাভাই এখন কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে। পদ্মনাভ পান্ডাকে অ্যারেস্ট করার জন্য চিফ মিনিস্টার ফোর্স পাঠিয়েছেন মন্দিরে। তুমি ভাই এখন এদিকে এসো না। মিডিয়ার লোকজন কোত্থেকে খবর পেয়ে গিয়েছে। সব ভিড় করে আছে নার্সিং ক্লিনিকের বাইরে। আমরা পিছনের দরজা দিয়ে গম্ভীরায় যাচ্ছি। তুমি বরং ওখানেই চলে এসো।' বলে লাইন কেটে দিল আত্মানন্দ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পুরন্দর উঠে দাঁড়াল। মুক্তিমণ্ডপ থেকে ও গর্ভগৃহের দিকে হাঁটতে লাগল। সিংহদ্বারের দরজা বোধহয় খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে এখন বেশ ভিড়। একটু আগে নৃশংস দুটো ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার কোনও চিহ্নমাত্র এখন নেই। আশপাশে তাকাল পুরন্দর। মন্দিরের চুড়োর দিকে চোখ যেতেই ও দেখল, পতাকা নেই। গত কয়েকদিনের দুর্যোগে হয়তো উড়ে গিয়েছে। মন্দিরের চুড়োয় পতাকা লাগালে পুণ্য অর্জন করা যায়। অন্য লোকের জন্য বহুবার স্বল্প পারিশ্রমিকে পুরন্দর পতাকা লাগিয়ে এসেছে। চাতালে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল, গোরাভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে চুড়োয় একটা পতাকা লাগিয়ে এলে কেমন হয়?

প্রায় ছয় মাস পর দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে মন্দিরের চুড়োয় উঠে এল পুরন্দর। পতাকা লাগানোর পর চোখ বুজে প্রভু জগন্নাথকে স্মরণ করে প্রার্থনা করল, 'হে প্রভু, সবাইকে ভালো রেখো।' কথাগুলো বলেই ও সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্রের গাঢ় নীল রং দেখে ও অবাক হয়ে গেল। বিপুল জলরাশি তরঙ্গ হয়ে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। এত উঁচু থেকে সমুদ্রের দিকে আগে কখনো ও এমনভাবে তাকায়নি। পুরন্দর হঠাৎ লক্ষ করল, মাঝসমুদ্রে জল উথাল-পাথাল করছে। কোনও সামুদ্রিক প্রাণী না কি? মোহগ্রস্ত হয়ে ওই দিকেই তাকিয়ে রইল পুরন্দর। তারপর যা দেখল, তাতে ওর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিশাল এক শ্বেতসর্প তার লেজ আছড়াচ্ছে সমুদ্রের জলে। ক্রমে ক্রমে তার শরীর ও মুখ দেখা যেতে লাগল। ফণা তুলে ধরে সেই পঞ্চমুখী সর্প এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে।

এ কি। ফণার উপর কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে গোরাভাই? কেমন দু'হাত তুলে নাচছে? গায়ের রং নীল হয়ে যাচ্ছে কেন গোরাভাইয়ের? তীব্র একটা আলোর ছটা দেখতে পেল পুরন্দর। দেখতে দেখতে চেতনা হারাল।